শ্রীগুরবে নমঃ।

১ম খণ্ড | বৈশাখ ১৩২০ | ১ম সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

লেখকগণের নাম।

শ্রীরেবতীরমণ (রসিকলাল) ভট্টাচার্য্য, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন এম, এ, বি. এল, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

নিয়মাবলী।

—:•:—

শাশ্বতীর জন্য প্রবন্ধাদি ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এখোড়া পোষ্টাফিস্, ভায়া সীতারামপুর, ই, আই, রেলওয়ে ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

পত্রিকার উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কোন লেখক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে পারেন। নবীন লেখকগণের প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ অৰ্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

এখোড়া (Ethora) পো:
ভায়া সীতারামপুর,
ই, আই, রেলওয়ে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

———

শ্রীগুরবে নমঃ।

মঙ্গলাচরণ।

•—:•:—

জ্ঞান-তপনের করে হৃদয়-কমল,
ফুটাইয়া তার মাঝে যাঁর অধিষ্ঠান,
সেই বিদ্যাস্বরূপিণী কোমল অমল,
শ্রীকরে জগতে বৃষ্টি করুন কল্যাণ।

শ্রীগুরবে নমঃ।
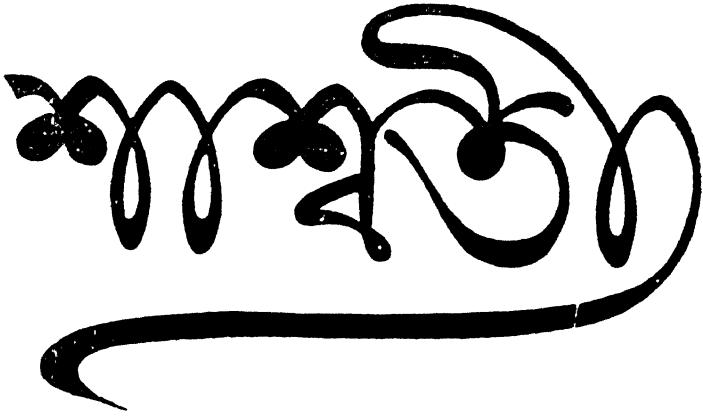
১ম খণ্ড। } বৈশাখ ১৩২০ { ১ম সংখ্যা।

শাশ্বতী।

দেবতার আশীর্ব্বাদ মস্তকে করিয়া,
ধীরে ধীরে পদক্ষেপ হউক তোমার।
তোমার গমন-পথে যাউক বহিয়া,
পুণ্যের শীতল মৃদু সমীরসম্ভার।
কল্যাণ-কুসুমরাশি হউক বর্ষিত,

উড়ে যা'ক পাপধূলি আবর্জ্জনাময়,
সুধী-পিককলতান দিগন্ত ধ্বনিত
করিতে থাকুক, তব ঘোষিয়া বিজয়।
জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা কহিতে কহিতে,
শাশ্বতী হইয়া থাক শাশ্বতী আমার,
সংসারের কোলাহল সহিতে সহিতে,
হউক তোমার মুখে অমৃত-উদ্গার।
জগতে প্রচার করি সত্যের মহিমা,
অক্ষয় করিয়া রাখ আপন গরিমা।

সূচনা।

—•—

বঙ্গসাহিত্যকুঞ্জ এক্ষণে নানাবিধ পত্রপত্রিকায় সুশোভিত, অগণ্য কুসুমসৌরভে আমোদিত, এবং অসংখ্য পক্ষিরবে মুখরিত। সেই সমস্ত পত্রপত্রিকার মধ্যে কখনও কোনটিতে দেশী বর্ণ এবং আবার কখনও বিদেশী বর্ণ ফুটিয়া উঠিতেছে। কুসুমসৌরভেও দেশী ও বিদেশী গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যাইতেছে, এবং পক্ষিরবেও দেশী ও বিদেশী স্বর প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু যতই দিন অগ্রসর হইতেছে, ততই দেশী অপেক্ষা বিদেশী ভাবটা যেন বঙ্গ সাহিত্যকে ছাইয়া ফেলিতেছে, এবং সমাজের মধ্যেও তাহার স্রোত ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য দেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু যদি দেশীয় ভাবটা একেবারেই অন্তরালে থাকিয়া যায়, এবং বিদেশী ভাবটাই যদি আমাদের দেশ, সমাজ ও সাহিত্য অধিকার করিয়া বসে, তাহা হইলে সেটা যে গৌরবের বিষয় হয়, ইহা বোধ হয় সকলে স্বীকার করিবেন না। বিশেষতঃ যে দেশের বা সমাজের একটা স্বতন্ত্র সত্তা এখনও অনুভব করা যায়, তাহার সেই সত্তাকে বৈদেশিকী মায়ার লীলায় অনন্তভূত করার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত কিনা তাহাও সাধারণে বিচার করিয়া দেখিবেন। সাহিত্য লোকশিক্ষার উপাদান, সৎসাহিত্যে সমাজকে উন্নত করিয়া থাকে। সাহিত্যে যে ভাব পরিস্ফুট হয়, সমাজও তদ্দ্বারায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। বঙ্গ সাহিত্যের যে স্রোত এক্ষণে অবিরামগতিতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা বঙ্গের শ্যামল পল্লী পর্য্যন্তও প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই জন্য বাঙ্গলার পল্লীভবন বিদেশী ভাবরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের বিবেচনায় সাহিত্যের এভাবের কিছু সংস্কারের প্রয়োজন। যাহাতে বঙ্গসাহিত্যে দেশীয় ভাবটিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। যাহাতে আমাদের ধর্ম্মের ব্যাখ্যা, আমাদের সমাজের চিত্র, আমাদের দর্শনের আলোচনা ও আমাদের সাহিত্যের কথা বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের মর্ম্মস্থল অধিকার করিয়া বসে, ইহাই আমাদের ঐকান্তিকী ইচ্ছা, এবং আশা

করি, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও তাহাই বিবেচনা করিবেন। তাই বলিয়া বৈদেশিক সমস্ত বিষয় আমরা বর্জ্জন করিতে বলিতেছি না। পাশ্চাত্য জাতি বিজ্ঞান-রত্নভাণ্ডারের যে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহার আলোকে আমরা ও আমাদের সাহিত্য যে আলোকিত হইয়া না উঠিবে, সে কথা আমরা বলিতেছিনা। তবে আমরা বলি যে, আমাদের অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রয়োজনানুসারে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানরত্ন সংগৃহীত হউক, কিন্তু তাহাকে বদ্ধ করিয়া বৈদেশিক ভাণ্ডারলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হওয়া দস্যুর কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা শাশ্বতীর অবতারণা করিলাম। শাশ্বতী যাহাতে বঙ্গসাহিত্যে দেশীয় ভাব পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারে, তাহারই জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। শাশ্বতী আমাদের ধর্ম্মের কথা, সমাজের কথা, দর্শনের কথা, সাহিত্যের কথা বলিবে, আবার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথাও মধ্যে মধ্যে শুনাইবে। বর্ত্তমান মাসিক পত্রিকা অপেক্ষা ইহা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ভাবেই পরিচালিত হইবে। যাহাতে দেশের লোকে দেশেই ফিরিয়া আসে, শাশ্বতী তাহারই চেষ্টা করিবে। যাহাতে আমাদের সমাজ শান্ত ও সংযত হয়, তাহাই তাহার উদ্দেশ্য থাকিবে, এবং লোককে ধর্ম্মালোচনারও পথ দেখাইয়া দিবে। ইহাই শাশ্বতীর মূলমন্ত্র থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যবিজ্ঞানালোচনাও ইহার কলেবরকে অলঙ্কৃত করিবে। রাজনীতির সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না। সাধারণ মাসিক পত্রিকা অপেক্ষা ইহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র বলিয়াই শাশ্বতী আজ সাধারণের সমক্ষে অবতীর্ণ হইল। অবশ্য চিন্তাশীল লেখকগণের দ্বারাই শাশ্বতী পরিচালিত হইবে। বিশেষতঃ যে শক্তির প্রভাবে বঙ্গের উচ্ছৃঙ্খল সমাজ শৃঙ্খলার দিকে ফিরিয়া আসিতেছে, সেই শক্তিই শাশ্বতীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতি করিবেন। তাই আশা আছে, শাশ্বতীর সাধনা সিদ্ধিলাভ করিবে। শাশ্বতীর সহিত ঘনিষ্ঠতাস্থাপনের জন্য একজনের আন্তরিক অভিলাষ ছিল। কিন্তু হায়! তিনি আজ এ জগৎ হইতে অন্তর্হিত! তিনি মায়ের নীরব সাধক ছিলেন। তাঁহার সেই সাধনার ফল শাশ্বতীকে সুশোভিত করিয়া তুলিত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাঁহার ন্যায় সাধক অকালে আমাদিগের নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ

করিয়াছেন। এই নীরব সাধকটির নাম মোহিনীমোহন।* প্রাচ্য জ্ঞান ও প্রতীচ্য বিজ্ঞানালোচনায়, শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম্মের চিন্তায়, মোহিনীমোহনের হৃদয়ভাণ্ডার যে সমস্ত অমূল্যরত্নে পরিপূর্ণ ছিল, তাহাই শাশ্বতীকে অলঙ্কৃত করিত। কিন্তু নীরব সাধকের নীরব সাধনার ফল নীরবেই শুষ্ক হইয়া গেল! মোহিনীমোহন আমাদের মধ্যে থাকিলে শাশ্বতীর গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিতেন। শাশ্বতী এক বৎসর পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইত, কিন্তু মোহিনীমোহনের অভাবে তাহাকে এক বৎসর লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি করিতে হইয়াছে। সে যাহা হউক, শাশ্বতী যে উদ্দেশ্য লইয়া অবতীর্ণ হইল, মায়ের ইচ্ছায় তাহাই সাধন করিতে থাকুক। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন শাশ্বতী শাশ্বতী হইয়াই থাকে।

আমরা ঐতিহাসিক চিত্রকে শাশ্বতীর অঙ্গীভূত করিলাম। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসালোচনা সম্ভবপর নহে। সেইজন্য ঐতিহাসিক চিত্রকে প্রতিসংহার করিতে হইল। আমাদের ইতিহাসালোচনার ফল অতঃপর শাশ্বতীতেই প্রকাশিত হইবে।

ধর্ম্ম ও সমাজ।

—:০:—

যাহার দ্বারা বস্তুর অবস্থিতি, যাহা না থাকিলে বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না, এবং যাহা বস্তুর প্রকৃতি বা স্বভাব, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। অগ্নির ধর্ম্ম তাপের ন্যায়, জলের ধর্ম্ম শৈত্যের ন্যায়, মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম্ম। অর্থাৎ যাহার দ্বারা মনুষ্য জাতির অবস্থিতি, যাহা আছে বলিয়া মনুষ্য মনুষ্যনামে অভিহিত হয়, যাহা না থাকিলে মনুষ্যভাব থাকিতে পারে না, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। আবার যথায় মনুষ্যগণ সঙ্গত হয়, অর্থাৎ মনুষ্যত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট জীবসঙ্ঘ মিলিত

* মোহিনীমোহন বহরমপুর কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক ছিলেন। গত ফাল্গুন মাসের গৃহস্থ পত্রে মোহিনীমোহনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

হয়, তাহাই মনুষ্য-সমাজ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।* সুতরাং যথায় মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, তাহাই মনুষ্য-সমাজ। মনুষ্যত্বের পূর্ণ ও আংশিক বিকাশানুসারে সমাজও পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হইয়া উঠে। যেখানে সম্পূর্ণ মানুষ থাকে, তাহাই পূর্ণ মনুষ্য সমাজ, তদ্ভিন্ন সমস্তই অসম্পূর্ণ। সুতরাং আদর্শ সমাজ বুঝিতে হইলে, তথায় পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিতে হয়। এই মনুষ্যত্ব বা মনুষ্যের ধর্ম্ম কি তাহাও আলোচনার বিষয়। উপাদান ও উপাদেয় অবস্থা ভেদে ধর্ম্ম নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে উপাদেয় অবস্থার বৃত্তিব্যূহ সাধারণের নিকট পরিজ্ঞাত, এস্থানে আমরা তাহারই উল্লেখ করিতেছি। সেই বৃত্তিব্যূহ সাধারণতঃ ধর্ম্ম নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। মহর্ষি মনু তাহাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন।

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যাসত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

অর্থাৎ ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, পরস্বগ্রহণে নিবৃত্তি, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান এই দশটি সাধারণতঃ ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়াই কথিত হয়। যে মনুষ্যে ইহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তিনিই সম্পূর্ণ মনুষ্য, এবং যে সমাজে ইহার বিকাশ হয়, তাহাই আদর্শ সমাজ। যে সমাজে ইহার আংশিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক যে, কোথায় ইহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে যে মনুষ্যত্বলক্ষণের উল্লেখ করিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটাইতে হইলে, আত্মোন্নতির প্রয়োজন। যে দেশের মনুষ্য সেই আত্মোন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, সেই দেশে বা সেই সমাজে যে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে সেকথা বোধ হয় সকলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একমাত্র

* ধৃ ধাতুর পরে মন্ প্রত্যয় করিয়া ধর্ম্ম কথাটি সাধিত হয়। ধৃ ধাতুর অর্থ অবস্থিতি, আর করণকারকবাচ্য মন্ প্রত্যয়ের অর্থ যাহার দ্বারা। অর্থাৎ যাহার দ্বারা বস্তুর অবস্থিতি তাহাই তাহার ধর্ম্ম। আর সম্ পূর্ব্বক অজ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া সমাজ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অজ্ ধাতুর অর্থ গমন, অর্থাৎ যেখানে সকলে একত্রে গমন করা হয় তাহাই সমাজ।

এই ভারতবর্ষেই অধ্যাত্মবিদ্যার চরমোন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনায় ও তাহার নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করায় যে আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, একথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। যে দেশের অধ্যাত্ম বিদ্যায় "সোঽহং" তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া জীব-বুদ্‌বুদকে সেই অনন্ত আত্মসমুদ্রে মিশাইয়া দিয়াছিল, যে দেশের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সেই মহত্ত্বের অনুভব করিতে হয়, এবং নিজত্ব বিসর্জ্জন দিতে হয়, সেই দেশের মনুষ্যই যে মনুষ্যত্বপূর্ণ এবং সেই দেশের সমাজেই যে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সাধারণের ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইবে না। তাই ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধের শত শত দৃষ্টান্ত উজ্জ্বলাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। দধীচি, দত্তাত্রেয়, বশিষ্ঠ, বামদেব, কপিল, কাত্যায়নি, পতঞ্জলি, পঞ্চশিখ যে দেশকে পবিত্রীকৃত করিয়াছিলেন, জনক, নল, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির যে দেশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, অরুন্ধতী, অনসূয়া, সীতা, সাবিত্রী যে দেশকে ধন্য করিয়াছিলেন, সেই দেশে যদি সম্পূর্ণ মানুষ না জন্মিয়া থাকে, তবে আর কোথায় জন্মিয়াছিল তাহা আমরা অবগত নহি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণাদি যাঁহাদের পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই মহাপুরুষ ও মহানারীবৃন্দই যে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়াছিলেন, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। তাই আমাদের এই ভারতবর্ষে ও আমাদের এই আর্য্য সমাজেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল।

মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম্ম একথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এই মনুষ্যত্ব বা মানুষ ধর্ম্মের বিকাশ হইতে হইলে, তদনুরূপ আকৃতিরও প্রয়োজন। কারণ শরীরের সহিত মনের, ও মনের সহিত আত্মারও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সেই জন্য আকৃতি অনুসারে প্রকৃতিও হইয়া থাকে। যেরূপ আকার ধারণ করিলে, ধৃতিপ্রভৃতি সমস্ত বৃত্তিরই বিকাশ হইতে পারে, তাহাই সম্পূর্ণ মনুষ্যের আকার। যে আকারে তাহাদের আংশিক বিকাশ হয়, তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ভারতের মানব দেহ ঐসমস্ত বৃত্তি বিকাশেরই অনুকূল। বর্ত্তমান সময়েও তাহাতে মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত আছে। কি কারণ

ভারতের মানবদেহ পূর্ণ ধর্ম্মবিকাশের উপযোগী হয়, তাহারও উল্লেখ করা যাইতেছে। ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থাই ভারতজাত মানবকেই এইরূপে গঠন করিয়া থাকে। এই সমুদ্রবসনা, নদীভূষণা, পর্ব্বতশেখরা ভারতভূমি ছয় ঋতুর পরিবর্ত্তনে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার সঞ্চারে যেরূপ নাতিশীতোষ্ণরূপে অবস্থিতা, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। তাই ভারতের প্রকৃতি তাহার সন্তানকে এরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়া থাকে যে, তদ্দ্বারা সমস্ত ধর্ম্মবৃত্তিগুলিই বিকাশিত হইতে পারে। সেই জন্য সম্পূর্ণ মনুষ্য ভারতবর্ষেই জন্মিয়া থাকে। যে দেশের প্রকৃতি ও যে দেশের শাস্ত্র মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে, সেই দেশেই যে সম্পূর্ণ মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবে, ইহা আলোচনা করিলেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।* যে সমাজ সেই সমস্ত সম্পূর্ণ মনুষ্যে পরিপূর্ণ ছিল, তাহাই যে আদর্শ সমাজ তাহাও বোধ হয় আর বলিবার প্রয়োজন নাই। তাই মহর্ষি মনুর সেই অমোঘ উক্তি

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥"

অনুসারে জগতের সর্ব্বজাতি ভারতের ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে আপনাপন আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল।

এই ধর্ম্মবিকাশের জন্য ভারতে যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হইত, তাহাও আমরা অবগত হইয়া থাকি, এবং তাহাই ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ বলিয়া অভিহিত হয়। মনু তাহা এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥"

বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মপ্রসাদ এই চারিটীই সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং বেদস্মৃতির নির্দ্দেশানুসারে যে সমস্ত বিধি প্রতিপালন করিতে হয়, এবং সদাচারে ও আত্মপ্রসাদে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই

* যাঁহারা ইহার বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পরমারাধ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রণীত ধর্ম্মব্যাখ্যা নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি

Mobile Press Ca
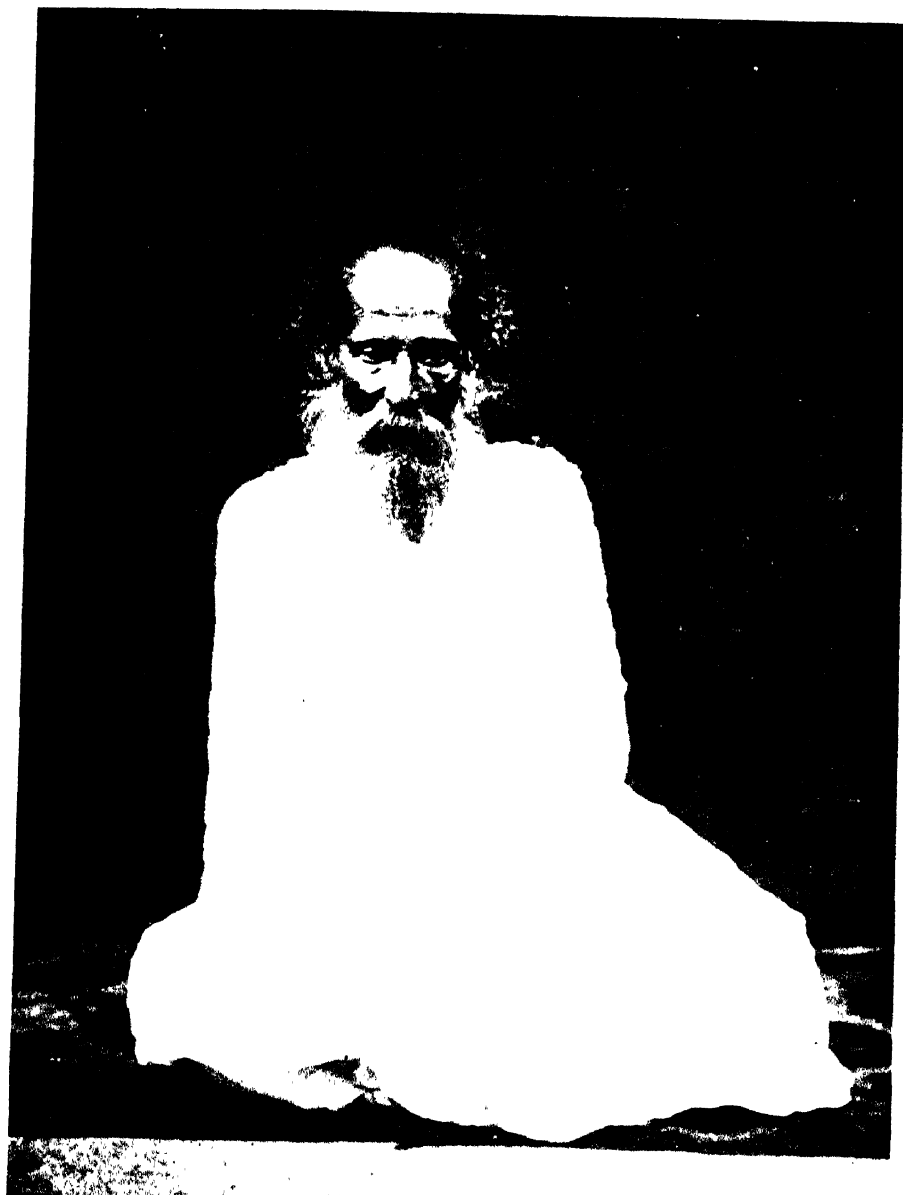
ধর্ম্মের বিকাশে সহায়তা করিয়া থাকে, এবং তাহাই মনুষ্যকে মনুষ্যত্বে পূর্ণ করিয়া দেয়। যে সমাজে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সেই সমাজে ধর্ম্ম বা মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছিল। এই পদ্ধতি মনুষ্যকে উচ্ছৃঙ্খলতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শান্ত ও সংযত করিয়া রাখিয়াছিল। উপাদানাবস্থায় ধর্ম্মকে সত্ত্ব, সংযম ও নিরোধাকারে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সত্ত্ব, সংযম ও নিরোধের এবং ধৃতি, ক্ষমাদির পূর্ণ বিকাশ ঘটাইতে হইলে, উপরোক্ত পদ্ধতিরই প্রয়োজন। তাই ভারতীয় আর্য্যগণ উক্ত চতুর্ব্বিধ পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মের উপাদান ও উপাদেয় অবস্থার বিকাশে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই যেমন তাঁহাদের চরিত্রে সত্ত্ব, সংযম ও নিরোধের লক্ষণ দেখা যাইত, সেইরূপ ধৃতি, ক্ষমা, দম প্রভৃতিরও বিকাশ পরিলক্ষিত হইত। সুতরাং মনুষ্যত্বের পূর্ণতা লাভের জন্য তাঁহারা যে সমস্ত ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতেন, জগতের অন্য কোন স্থানে বা সমাজে সে সকলের সর্ব্বাংশ দৃষ্ট হইত না। সেই জন্য পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের সমাজ, ধর্ম্মে বা মনুষ্যত্বে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই।

আমরা দেখাইলাম যে, আদর্শ সমাজ হইতে হইলে, তাহাতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের প্রয়োজন, এবং মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম্ম। তাহা হইলে সমাজের সহিত ধর্ম্মের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা বোধ হয় আর বলিবার প্রয়োজন নাই। যে সমাজ ধর্ম্মহীন তাহা মনুষ্যত্ববর্জ্জিত, এবং মনুষ্যত্ববর্জ্জিত সমাজ কদাচ মনুষ্যসমাজ নহে। যে স্থানে পাশব ধর্ম্মের আধিপত্য, তাহা কখনও মনুষ্যসমাজ বা সমাজ নামেই অভিহিত হইতে পারে না, এবং সমাজ শব্দ পশুসম্বন্ধে ব্যবহৃতও হয় না। সে যাহা হউক, যে সমাজের সহিত ধর্ম্মের বা মনুষ্যত্বের কোনই সম্বন্ধ নাই তাহাকে সমাজ না বলাই যুক্তিযুক্ত। আর যে সমাজে ধর্ম্মের বা মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ না ঘটে, তাহাকেও আদর্শ সমাজ বলা যাইতে পারে না। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশই যখন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, তখন সে সমাজে যে পদ্ধতির দ্বারা তাহা সাধিত হয়, সেই সমাজে সেই পদ্ধতিরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সেই পদ্ধতির অনুসরণ না করিয়া স্বেচ্ছাচারে সমাজকে কলুষিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা যে সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর্শ বলা যাইতে পারে না। আদর্শ মলিন হইয়া পড়িয়াছে, এই মলিনতা এক্ষণে দূর করা আবশ্যক। যাঁহারা সমাজসংস্কারের দোহাই দিয়া আদর্শের উপর নানা প্রকার লেপ-প্রদানে উদ্যত, তাঁহারা যে তাহাকে আরও মলিন করিয়া তুলিতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে সমাজ সংস্কৃত হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ দিনদিন ধ্বংসের পথে ধাবিত হইতেছে। আমাদের সমাজে বাহিরের কিছু প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিলে, তাহার নির্ম্মলতা যে নষ্ট হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সত্ত্ব, সংযম ও নিরোধ যাহার উপাদান, ধৃতি, ক্ষম, দম প্রভৃতি যাহার উপাদেয় অবস্থা, সেই ধর্ম্ম যাহার মর্ম্মস্থল, সমাজের সেই মর্ম্মস্থলে আঘাত করিলে তাহার অস্তিত্ব আর কতক্ষণ বিদ্যমান থাকিতে পারে? যে সমস্ত আচারের অনুষ্ঠানে সত্ত্ব, সংযম, নিরোধের বিনাশ ঘটে, ধৃতি, ক্ষম, দম প্রভৃতি দূরে পলায়ন করে, সে আচারব্যবহার কদাচ এ সমাজের উপযোগী হইতে পারে না। এই সমাজকে সংস্কৃত করিতে হইলে যে পদ্ধতিতে ধর্ম্মের উপাদান ও উপাদেয় উভয়বিধ অবস্থার বিকাশ ঘটিতে পারে সেই পদ্ধতিরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। কোন্ পদ্ধতির দ্বারা তাহা অনুষ্ঠিত হইতে পারে, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধ কোন পদ্ধতিতে আমাদের সমাজের সংস্কার ঘটিবে না। আমাদের সমাজের সহিত ধর্ম্ম অস্থি-মজ্জায় বিজড়িত। যাহাতে আবার আমাদের সমাজে সেই ধর্ম্মের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই অনুষ্ঠান করাই উচিত।

বর্ত্তমান সমাজ দুই প্রবল স্রোতের মধ্যে নিপতিত হইয়াছে। একদিকে প্রাচ্য পদ্ধতি ইহাকে আকর্ষণ করিতেছে, অপরদিকে প্রতীচ্য পদ্ধতি ইহাকে প্লাবিত করার জন্য খরবেগে ধাবিত হইতেছে। এই দুই স্রোতের মধ্যে পড়িয়া আমাদের সমাজ একবার এদিকে ও একবার ওদিকে হেলিয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ায়, সমাজও টলমল করিতেছে। কিন্তু তাহার এ অবস্থার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছে। যাহাতে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করা যায়, তাহাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা বলিয়াছি যে, আমাদের সমাজ যে ভাবে গঠিত, তাহাকে অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, তাহাকে একেবারে ধ্বংসের পথে তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাহার মূলভিত্তিকে

সুদৃঢ় রাখিয়া, যদি ধীরে ধীরে তাহার মলিনতা দূর করার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে তাহার প্রকৃত সংস্কার সাধন হইবে। নির্ম্মলীকরণের নামই সংস্কার। ধ্বংসসাধন বা পুনর্গঠনকে সংস্কার বলা যাইতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের সমাজসংস্কারকেরা নির্ম্মলীকরণকে আশ্রয় না করিয়া, ধ্বংস বা পুনর্গঠনের জন্যই বিশেষরূপ ব্যস্ত হইয়াছেন। আমরা সেরূপ সংস্কারের পক্ষপাতী নহি। সমাজ যাহাতে শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহাকে বিকৃতভাবাপন্ন করিয়া তাহার ধ্বংসসাধন অথবা তাহাকে অন্য প্রকারে গঠন করা কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি, সমাজ বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মপ্রসাদের অনুসরণ করিয়া সত্ত্ব, সংযম, নিরোধ এবং ধৃতি, ক্ষমা, দম প্রভৃতির বিকাশ দেখাইতে আরম্ভ করুক, এবং তাহার পূর্ণতা লাভের জন্য আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া রাখুক। ধর্ম্মই আমাদের সমাজের প্রাণ, তাহার জড় দেহে যাহাতে সেই মহাপ্রাণের সঞ্চার হয়, তাহারই চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কবিকথা।

(কালিদাস)

অভিজ্ঞান-শকুন্তল।

(১)

হিমালয়ের রমণীয় সানুদেশে মালিনী নদী কুলকুলস্বরে বহিয়া যাইতেছিল। হংসশ্রেণী শ্বেতপদ্মমালার ন্যায় তাহার কমনীয় কায়ে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, নানাবিধ তরুলতা শ্যামলতার ঢেউ খেলাইয়া তাহার তীরভূমিকে স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় করিয়া তুলে। সৌন্দর্য্যের লীলাস্থল সেই

মালিনীতীরে মহর্ষি কণ্বের শান্তিনিকেতন চারিদিকে পবিত্রতার ধারা ছুটাইতে থাকে। যে সময়ে তপোবনের তরুবিবরে লুক্কায়িত শুকপক্ষী-গুলির মুখভ্রষ্ট নীবারকণায় তরুতল সমাকীর্ণ হইয়া উঠে, ভগ্ন ইঙ্গুদী ফলের স্নেহসিক্ত উপলখণ্ডগুলি আশ্রমের স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া থাকে, মৃগকুল তপোবনের ইতস্ততঃ নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণে প্রবৃত্ত হয়, ও স্নাত আশ্রম-বাসিগণের বল্কলবিচ্যুত জলধারার দেবখাত পথগুলি রেখাঙ্কিত দেখায়, এবং যখন নবকিসলয়ে বিভূষিত সহকারপ্রভৃতি তরুরাজি তপোবন শোভাকে মনোহারিণী করিয়া তুলে, মাধবীপ্রভৃতি মুকুলিতা লতাশ্রেণীর সুগন্ধে আকৃষ্ট অলিকুল গুণ গুণ রবে গাহিয়া বেড়ায়, এবং তাহাদের সেই মধুর গুঞ্জনে সমগ্র আশ্রমটি মুখরিত হইয়া উঠে, সেই সময়ে পুরুবংশাবতংস হস্তিনাপুরাধিপতি মহারাজ দুষ্যন্ত মৃগয়ামোদ উপভোগের জন্য চিরশান্তি-বিরাজিত সেই তপোবনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক নিনাদিত করিয়া রাজরথ অগ্রসর হইতে লাগিল, আরণ্য ও আশ্রম্য প্রাণিকুল ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। একটী আশ্রমমৃগ অর্দ্ধচর্ব্বিত তৃণমুখে গ্রীবা বক্র করিয়া, রথের দিকে চাহিতে চাহিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছিল। রাজা তাহার প্রতি শরসন্ধানে উদ্যত হইলে, তপস্বিগণ সহসা রথসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই আশ্রমমৃগটির বধে নিষেধ করিয়া রাজাকে বাণ প্রতিসংহার করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং আরও বলিলেন যে, আর্ত্ত-ত্রাণেরই জন্য আপনারা শস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন, নিরপরাধ প্রাণীর প্রহারের নিমিত্ত নহে। রাজা তৎক্ষণাৎ শরসংহার করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তপস্বীরা দুষ্যন্তের বংশানুরূপ কার্য্যে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "আপনি চক্রবর্ত্তী লক্ষণযুক্ত পুত্রলাভ করুন"। পরে তাঁহারা তাঁহাকে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে বিশ্রামলাভের জন্য উপদেশ দিয়া সমিৎ আহরণের জন্য নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। অতিথিসৎকারের ভার কন্যা শকুন্তলার প্রতি অর্পিত ছিল। শকুন্তলা কণ্বের পালিতা কন্যা। সাক্ষাৎ তপোমূর্ত্তি বিশ্বামিত্র ও সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি মেনকার মিলনে শকুন্তলার

উৎপত্তি। তপঃপ্রভাব ও কান্তি মিলিয়া তাঁহাকে জগতের সমক্ষে আনয়ন করিয়াছিল। শকুন্তের পক্ষচ্ছায়ে লালিত হওয়ায় তাঁহার শরীরে ও হৃদয়ে কোমলতার সঞ্চার হইয়াছিল,এবং তিনি শকুন্তলা নামও লাভ করিয়াছিলেন। কণ্বের আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়া তিনি মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া হইয়া উঠেন। তপোবনের শান্তি ও পবিত্রতা তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিয়াছিল। মাধবী তাঁহাকে নম্রতা, মৃগশিশু সরলতা, ও মালিনী পরদুঃখ-কাতরতা শিখাইয়াছিল। তারকার মৃদুজ্যোতিঃ ও সুধাংশুর জ্যোৎস্নালহরী তাঁহার দেহে লাবণ্যের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। প্রাতঃসূর্য্যের রক্তিমাভা চক্ষে জ্যোতিঃ, কোকিলের কলধ্বনি কর্ণে প্রখরতা, প্রস্ফুটিত কুসুমসৌরভ নাসিকায় উৎকর্ষ, বনফলের মধুর রস জিহ্বায় সিক্ততা এবং মলয়ানিলের সুখস্পর্শ ত্বকে কোমলতা ঢালিয়া দেয়। বেদধ্বনির গম্ভীরতা, হোমাগ্নির নির্ম্মলতা ও তপস্যার কঠোরতা তাঁহাকে চিত্তসংযম ও আত্মসংযমের অধিকারিণী করিয়া তুলে। তিনি কখনও ছল বা চাতুরীর ছায়া মাত্র স্পর্শ করেন নাই। করুণা সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয় মধ্যে বহিয়া যাইত। পশুপক্ষীর দুঃখেও তিনি কাতর হইয়া উঠিতেন। অতিথিসৎকার তাঁহার জীবনের নিত্য ব্রত ছিল। তরুলতা হইতে ঋষিতপস্বীর পর্য্যন্ত সেবায় তিনি সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া শকুন্তলা তাই তরুলতাদিগকে জলসেচন, পশুপক্ষীদিগকে তৃণ-শস্যদান, এবং অতিথি-অভ্যাগতদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া, প্রীতি ও তৃপ্তিলাভ করিতেন। রাজা দুষ্যন্ত সেই পবিত্র আতিথ্যলাভের জন্য সারথিকে বিদায় দিয়া আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

আশ্রমে প্রবেশ করিতে রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইল। প্রশান্ত তপোবনে অভাবনীয় বস্তুলাভের লক্ষণে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে শকুন্তলা তাঁহার দুইটি প্রিয়সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সহিত আলবালে জলসেচন করিতেছিলেন। কেসর, সহকার, মাধবী, মল্লিকা সকলেই তাঁহাদের জলসেচনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। সখীরা পরস্পর হাস্যপরিহাসে শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। শকুন্তলার প্রতি তাঁহার প্রিয়সখীদিগের বিশেষতঃ প্রিয়ংবদার পরিহাস কিছু অধিক মাত্রায় চলিতেছিল। কখনও বা তাঁহারা শকুন্তলাকে জলসেচনে নিযুক্ত করার জন্য, তাঁহার অপেক্ষা

আশ্রমপাদপদিগের প্রতি কণ্বের ভালবাসার উল্লেখ করিয়া, কখনও বা কেসরবৃক্ষলগ্না শকুন্তলাকে তরুমিলিতা লতা আখ্যা দিয়া, কখনও বা সহকার-বেষ্টিতা মল্লিকায় জলসেচনে শকুন্তলার অনুরূপ বরলাভেচ্ছার ছল বলিয়া, তাঁহাকে পরিহাসবাণে বিদ্ধ করিয়া তুলিতেছিলেন। শকুন্তলা তাঁহাদের ন্যায় বাক্‌চতুরা ছিলেন না। তিনি আশ্রমপাদপ আমার সোদরপ্রতিম, প্রিয়ম্বদা যথার্থই প্রিয়ম্বদা, উহা প্রিয়ম্বদার নিজেরই মনোভাব ইত্যাদি মাত্র বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজা দুষ্যন্ত অলক্ষিত ভাবে এই সমস্ত শুনিতেছিলেন। যখন তপস্বিকন্যাদিগের মধুর ছবি প্রথমে তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়, তখন তিনি আপনার অন্তঃপুরে এরূপ লাবণ্য-প্রতিমার অভাব জানিয়া বলিয়া উঠেন যে, উদ্যানলতা যথার্থই বনলতার নিকট পরাজিত হইল। শকুন্তলার জলসেচনে নিয়োগ তাঁহার বড় ভাল লাগিল না। তিনি মহর্ষি কণ্বকে তত সুবিবেচক বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। শকুন্তলাকে তপঃসহ করার চেষ্টা তিনি নীলোৎপল দিয়া শমীলতা ছেদনের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন। শকুন্তলার স্বাভাবিক বেশ তাঁহার বড়ই ভাল লাগিতেছিল। শৈবালময় পদ্মের ন্যায়, কলঙ্কযুক্ত চন্দ্রমার ন্যায়, বল্কলবেষ্টিতা শকুন্তলাকে তিনি বড়ই মনোজ্ঞা বোধ করিতেছিলেন। রাজা সহজেই বুঝিয়াছিলেন যে, স্বভাবসুন্দর বস্তুর যাহা কিছু হউক না, সকলেই অলঙ্কারের কার্য্য করিতে পারে। সখীরা যখন শকুন্তলাকে লতার সহিত তুলনা করিতেছিলেন, রাজাও তখন সেই অনিন্দ্যসুন্দরীর অধরে নবকিশলয় রাগ, বাহুদুটিতে বিটপশোভা ও সর্ব্বাঙ্গবিকশিত নবযৌবনকে কুসুমরাশির ন্যায় দেখিতেছিলেন।

দুষ্যন্ত যতই শকুন্তলার বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন, ততই রাজার মন সেই চারুশীলার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। কিন্তু প্রথমে দুষ্যন্তের মনে নানা রূপ তরঙ্গের উদয় হয়। তপস্বিকন্যা শকুন্তলার প্রতি তাঁহার অনুরাগ-সঞ্চার যুক্তিযুক্ত কিনা ইহাই তিনি বারম্বার চিন্তা করিতেছিলেন। পরিশেষে যতই তাঁহার মন শকুন্তলার প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল, ততই তিনি তাঁহাকে ক্ষত্রিয়ের পরিগ্রহযোগ্যা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কারণ সন্দেহ-স্থলে অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তিই প্রমাণস্বরূপ হইয়া উঠে। যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ,

ধর্ম্মরক্ষার প্রতি সততই তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তাই ধর্ম্মপ্রাণ রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রতি অনুরাগসঞ্চারকে ধর্ম্মের নিকষপাষাণে কষিত করারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা শকুন্তলাকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নিকট অগ্রসর হওয়ার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, বিধাতার ইচ্ছায় সুযোগও উপস্থিত হইল। শকুন্তলা সাধ করিয়া একটী নবমল্লিকার নাম বনজ্যোৎস্না রাখিয়াছিলেন। বনজ্যোৎস্না বিকশিত কুসুমরাশিতে বিভূষিত হওয়ায় মধুকরসকল তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। শকুন্তলার জলসেচনে একটি মধুকর বনজ্যোৎস্নাকে পরিত্যাগ করিয়া শকুন্তলার প্রতি ধাবিত হইল। শকুন্তলা সেই দুর্বৃত্তের নিকট হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য সখীদের নিকট নানারূপ অনুনয়বিনয় করিতে লাগিলেন। সখীরা দুর্বৃত্তদমন-কারী রাজা দুষ্মন্তকে স্মরণ করিতে উপদেশ দিলেন। রাজা এই অবকাশে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, দুর্ব্বি-নীতদিগের শাস্তা পুরুবংশীয় রাজা দুষ্মন্তের শাসনকালে মুগ্ধা তপস্বীকন্য-দিগের প্রতি কে অশিষ্ট ব্যবহারে উদ্যত হইয়াছে? বাস্তবিক পুরুবংশীয়েরা চিরদিন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া প্রকৃত রাজধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। দুষ্মন্ত সেই বংশের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাকে মূর্ত্তিমান রাজধর্ম্ম বলিয়াই লোকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করিত। রাজাকে সহসা উপস্থিত হইতে দেখিয়া তপস্বিকন্যারা কিছু লজ্জিত ও বিস্মিত হইলেন। সখীরা রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, কেহ তাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করে নাই। কেবল শকুন্তলা মধুকরতাড়নে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজা শকু-ন্তলাকে তাঁহার তপোবৃদ্ধির কথা জিজ্ঞাসা করিলে শকুন্তলা লজ্জায় ম্রিয়মানা হইয়া পড়িলেন। সখীরা তাঁহাকে তাহার কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়া, এই বিশিষ্ট অতিথির সৎকারের জন্য কুটীর হইতে ফলমিশ্র অর্ঘ্য আনিতে ও ঘট-সলিলের দ্বারা পাদোদকের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। রাজা তাঁহাদের সত্য ও প্রিয় সম্ভাষণকেই আতিথ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, ও তাঁহাদিগকে কষ্টস্বীকারে নিষেধ করিলেন। তিনি সখীদিগের অনুরোধক্রমে সপ্তপর্ণ-বেদিকায় উপবিষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাদিগকেও বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহার পর সকলে আলাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শকুন্তলার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই রাজার অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। রাজাকেও দেখিবামাত্র শকুন্তলার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তিনি যথাসাধ্য চিত্তসংযমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু রাজার গম্ভীর অথচ মধুর আকৃতি ও সুমিষ্ট আলাপনে তাঁহার হৃদয়ে একটি ক্ষুদ্র তুফানের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। শকুন্তলা ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অথবা জন্মান্তরে তাঁহার সহিত বাসনানিশ্চল পরিচয় থাকায়, রাজার মনোজ্ঞ আকার ও মধুর সম্ভাষণ শকুন্তলার চিত্তকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। শকুন্তলার মনে মনে রাজার পরিচয় জানার ইচ্ছা হইতেছিল, সখীরা তাঁহার সে ইচ্ছার নিবৃত্তি করিয়া দিলেন। তাহারাও রাজার আকার প্রকার দেখিয়া নানারূপ সন্দেহ করিতেছিলেন। সখীদের পরিচয় জিজ্ঞাসায় রাজা আত্মগোপন করিয়া আপনাকে দুষ্মন্তের ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিলেন। রাজার ও শকুন্তলার চিত্তচাঞ্চল্য সখীরা লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহারা পরিহাস করিয়া গোপনে শকুন্তলাকে বলিলেন, "তাত কণ্ব আজ আশ্রমে উপস্থিত থাকিলে, জীবনসর্ব্বস্ব দিয়া এই অতিথির সংকার করিতেন।" শকুন্তলা তাঁহাদিগকে নিপাতের পথ দেখাইয়া কহিলেন, "তোমরা একটা কিছু মনে করিয়াই অবশ্য এইরূপ বলিতেছ, আমি আর তোমাদের কোন কথাই শুনিব না।" দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পরিগ্রহযোগ্য মনে করিলেও, তাঁহার পরিচয় না পাওয়া অবধি শান্ত হইতে পারেন নাই। রাজার জিজ্ঞাসায় সখীরা শকুন্তলার জন্মকাহিনী বিবৃত করিলেন। শুনিয়া রাজা কহিলেন, "মানুষীতে এরূপ রূপের সম্ভব হয় না, কারণ বসুধাতল হইতে কদাচ প্রভাতরল জ্যোতির উদয় হইতে পারে না।" পরে তিনি আরও জ্ঞাত হইলেন যে, মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে চিরকুমারী না রাখিয়া অনুরূপ পাত্রেই দান করিবেন। ইহা শুনিয়া রাজার উদ্বিগ্নচিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এই আশাপ্রদবাক্য তৈলবিন্দুর ন্যায় তাঁহার হৃদয়তুফানকে প্রশান্ত করিয়া তুলিল। তিনি পূর্ব্বে যাহাকে প্রজ্বলিত অনল বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাকে স্পর্শক্ষম রত্ন মনে করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সখীদের আলাপনে শকুন্তলার লজ্জা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি কণ্বভগিনী গৌতমীকে

শাশ্বতা

সমস্ত কথা জানাইবার জন্য সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। সখীরা এই বিশিষ্ট অতিথির যথোচিত সৎকার হয় নাই বলিয়া, তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু শকুন্তলা তাঁহাদের নিষেধে কর্ণপাত না করায়, অবশেষে তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন যে, জলসেচনের সময় আমাদের যে জল লইয়াছ, তাহা পরিশোধ না করিয়া যাইতে পারিবে না। রাজা শ্রম-কাতরা শকুন্তলার মুক্তির জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন। কারণ, তিনি তখন দেখিতেছিলেন যে, শকুন্তলার বাহু দুইটি স্কন্ধ হইতে অবনত হইয়া পড়িয়াছে, ঘটোৎক্ষেপনের জন্য তাহাদের তলদেশও লোহিত হইয়া উঠিয়াছে, শ্বাসাধিক্যের জন্য তাঁহার বক্ষঃস্থল ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, বদন স্বেদজালে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাঁহার কর্ণ-শিরীষও রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার একহস্তবদ্ধ কেশপাশ শিথিল হইয়া গিয়াছে। তৎপরে তিনি সখীদের ঋণমোচনের জন্য স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরী স্বীয় অঙ্গুলী হইতে উন্মোচন করিয়া দিলেন। দুষ্মন্তের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখিয়া সখীরা পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অঙ্গুরীটি রাজদত্ত প্রসাদচিহ্নমাত্র। কিন্তু চতুরা সখীদ্বয় রাজার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, "যখন মহারাজ দুষ্মন্ত তোমার ঋণমোচন করিয়াছেন, তখন তুমি অনায়াসেই যাইতে পার"।

এই সময়ে একটি আরণ্যগজ রাজরথদর্শনে ভীত হইয়া আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করায়, তপস্বীরা মহাকোলাহল করিয়া উঠিলেন। তজ্জন্য তপস্বি-কন্যারা আশ্রমের দিকে এবং রাজাও শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রস্থানকালে পরস্পরে পরস্পরের পুনঃসাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করিতে বিস্মৃত হন নাই। রাজা যাইতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনকে ফিরাইতে পারিতেছিলেন না। পতাকার বস্ত্রখণ্ড যেমন প্রতিকূল বায়ুভরে বিপরীত দিকে উড়িয়া যায়, রাজা শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেও তাঁহার মন কিন্তু শকুন্তলার প্রতি ধাবিত হইতেছিল। সে যাহা হউক, তিনি অতিকষ্টে শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

(২)

রাজার সঙ্গে মাধব্য নামে তাঁহার এক প্রিয় সহচর আসিয়াছিলেন।

মাধব্য ব্রাহ্মণসন্তান, কাজেই মৃগয়ামোদ তাঁহার তত ভাল লাগিত না। সর্ব্বদা রাজভোগে পরিতৃপ্ত থাকায়, মিষ্টান্নই তাঁহার একমাত্র প্রিয় পদার্থ ছিল। রাজার সহিত অশ্বারোহণে মৃগয়ায় লিপ্ত থাকিয়া, মাধব্য সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। মৃগ, বরাহ, শার্দ্দূল প্রভৃতির পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মধ্যাহ্নপর্য্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ, গলিতপত্রযুক্ত গিরিনদীর কটু জল পান ও শূলমাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া, তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠেন। গাত্রবেদনায় রাত্রিতে তাঁহার ভাল করিয়া নিদ্রা হইত না। প্রভাতে ব্যাধগণের কোলাহলে তাঁহার সামান্য নিদ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া যাইত। রাজার রাজধানীতে যাওয়ার সম্ভাবনা না দেখিয়া, তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ শকুন্তলার দর্শনাবধি রাজার মন অন্যরূপ হওয়ায়, মাধব্য তাঁহার নগরগমনাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মৃগয়া হইতে নিরস্ত হওয়ার জন্য তিনি রাজাকে দেখিয়া অঙ্গবৈকল্যের ভান করিতে লাগিলেন, ও রাজাকেও বিশ্রামলাভের জন্য অনুরোধ করিলেন। এদিকে সেনাপতি আসিয়া রাজাকে মৃগয়ার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সেনাপতি মৃগয়ার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, মৃগয়া মেদ নষ্ট করিয়া উদরকে কৃশ এবং শরীরকে লঘু ও কার্য্যক্ষম করিয়া থাকে। তাহা হইতে প্রাণিগণের ভয়ক্রোধজনিত চিত্তবিকার জানিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন চলিত লক্ষ্যে শর সন্ধান সিদ্ধ হয়। সুতরাং ইহার ব্যসনাপবাদ সম্পূর্ণরূপেই মিথ্যা। মাধব্য বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কোন দিন না কোন দিন নরনাসিকালোলুপ ভল্লুকের মুখে পড়িতে হইবে বলিয়া ভয় দেখাইলেন। রাজার মন শকুন্তলার চিন্তায় বিভোর হইয়াছিল, তিনি মৃগয়ায় যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সেই জন্য সেনাপতিকে নিরস্ত হওয়ার জন্য আদেশ দিয়া কহিলেন, "অদ্য মহিষেরা মুহুর্মুহু শৃঙ্গ তাড়না করিয়া নিপানে অবগাহন করিতে থাকুক, মৃগকুল তরুচ্ছায়ে বসিয়া রোমন্থন অভ্যাস করুক, বরাহগণ নিঃশঙ্কচিত্তে পল্বলে মুস্তা উৎখনন করিতে থাকুক, এবং আমার ধনুকও জ্যাবন্ধন শিথিল করিয়া বিশ্রাম লাভ করুক। সেনাপতি অগত্যা সম্মতি দান করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা মৃগয়াসহচরদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন, এবং সৈন্যগণ যাহাতে তপোবনে কোনরূপ উপদ্রব না করে

তাহারও আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি সেনাপতিকে সুস্পষ্ট রূপেই বুঝিইয়া দিলেন যে, শমপ্রধান তপোধনদিগের মধ্যে এমন গূঢ়দাহাত্মক তেজ আছে যে, স্পর্শানুকূল সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায় তাহা অন্য তেজ দ্বারা অভিভূত হইলেই আপনি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

সেনাপতি চলিয়া গেলে রাজা মাধব্যের সহিত নির্জ্জনে বসিয়া শকুন্তলার সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভার কিয়ৎ-পরিমাণে লঘু হইয়া আসিল। কারণ, প্রিয়জনসহ আলাপনে ভারগ্রস্ত হৃদয় লঘু বলিয়াই প্রতীত হয়। রাজা কহিলেন, "মাধব্য তোমার চক্ষের সফলতা হয় নাই, কারণ তুমি দর্শনীয় বস্তু দেখিতে পাও নাই। আশ্রম-ললামভূতা শকুন্তলার দর্শন তোমার ভাগ্যে ঘটে নাই।" মাধব্য বলিলেন, "সে কি বয়স্য শেষে কি তোমার তপস্বিকন্যায় অভিলাষ জন্মিল?" রাজা উত্তর দিলেন যে, পরিহার্য্য বস্তুতে কখনও পুরুবংশীয়দিগের মন ধাবিত হয় না। শকুন্তলা মেনকার কন্যা, আকন্দবৃক্ষোপরি নবমল্লিকা হইতে বিচ্যুত কুসুমটির ন্যায় মাতৃপরিত্যক্তা শকুন্তলা কণ্বের করগতা হইয়াছিলেন। মাধব্য পরিহাস করিয়া কহিলেন যে, তোমায় দেখিতেছি আকণ্ঠ পিণ্ড-খর্জ্জুর ভোজনের পর কিছু তিন্তিড়ী ভক্ষণের অভিলাষ হইয়াছে। নতুবা যাহার ভাণ্ডার স্ত্রীরত্নে পরিপূর্ণ, তাহার আবার বনবাসিনীতে স্পৃহা কেন? রাজা বলিলেন, "তুমি তাহাকে দেখ নাই বলিয়াই এরূপ উক্তি করিতেছ। সেই লাবণ্যপ্রতিমা দেখিয়া বোধ হয়, বিধাতা তাহাকে প্রথমে চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া, পরে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। অথবা সৌন্দর্য্য-রাশির দ্বারা তাহাকে মনে মনেই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ফলতঃ ইহা বিধাতার নূতনরূপ স্ত্রীরত্নসৃষ্টি। বিধাতার সামর্থ্য ও তাহার দেহলাবণ্য দেখিয়াই আমার এইরূপ অনুমান হইতেছে। তাহার রূপের কথা আর কি বলিব। অনাঘ্রাতপুষ্পসদৃশ, নখাক্ষতকিসলয়তুল্য, অনাবিদ্ধরত্নপ্রতিম, অনাস্বাদিতনবমধুসম, এবং পুণ্যরাশির অখণ্ডফলস্বরূপ তাহার সেই পবিত্র রূপ না জানি কোন্ ভাগ্যবানের তৃপ্তি সম্পাদন করিবে। মাধব্য শুনিয়া কহিলেন, "তবে তাহার প্রাপ্তিসম্বন্ধে তোমার কাল-বিলম্ব করা উচিত নহে। পাছে সে কোন ইঙ্গুদীতৈলমস্তক তপস্বীর

হাতে পড়িয়া যায়। রাজা বলিলেন, শকুন্তলা পরাধীনা. তাহাতে আবার তাহার গুরুজন নিকটে নাই। কাজেই কেমন করিয়া সে আশা করিতে পারি। মাধব্য রাজার প্রতি শকুন্তলার অনুরাগলক্ষণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা তাঁহার সলজ্জদৃষ্টি, কুশাঙ্কুরে চরণক্ষত ও বৃক্ষশাখায় বল্কললগ্ন হওয়ার ছলে অপেক্ষা করা প্রভৃতির উল্লেখ করিলেন। শুনিয়া মাধব্য বলিলেন, "তবে আর কি, আমার বোধ হইতেছে ইহা তোমার গন্তব্য পথের উপযুক্ত পাথেয়। এক্ষণে আর বিলম্ব কি, পাথেয়টি লইয়া লও। আমি দেখিতেছি, তুমি তপোবনকে উপবন করিয়া তুলিলে।" রাজা বলিলেন, রহস্য রাখ, এখন বল দেখি কি করিয়া কিছু কাল এখানে অবস্থিতি করা যায়? তপস্বীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমার পরিচয় অবগত হইয়া থাকিবেন। মাধব্য উত্তর দিলেন, "তাহার চিন্তা কি, নীবারের ষষ্ঠাংশসংগ্রহের জন্য থাকিয়া যাও। রাজা বলিলেন, "মূর্খ তপস্বীরা সামান্য রাজস্ব প্রদান করেন না। তাঁহাদের নিকট যে কর থাকে, তাহা রত্নরাশি অপেক্ষাও মূল্যবান। দেখ, অন্য লোকের নিকট হইতে সংগৃহীত কর ক্ষয় হইয়া যায়। কিন্তু তপস্বীদিগের নিকট হইতে আমরা তপস্যার ষষ্ঠাংশস্বরূপ অক্ষয় করই প্রাপ্ত হইয়া থাকি।"

তাঁহাদের এইরূপ আলাপনের সময় ঋষিকুমারেরা আসিয়া রাজাকে জানাইলেন যে, মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত না থাকায়, নিশাচরেরা যজ্ঞ বিঘ্ন ঘটাইতেছে। অতএব তপস্বীদিগের অনুরোধ রাজা কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করেন। রাজা তাহাতে সম্মত হইলে, তাঁহারা রাজার বংশানুরূপ কার্য্যে প্রীত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা মাধব্যকে বলিলেন, "বয়স্য শকুন্তলা দর্শনের ইচ্ছা আছে কি?" মাধব্য উত্তর দিলেন যে, প্রথমে ছিল বটে, এক্ষণে নিশাচরের কথা শুনিয়া নিজের প্রাণ লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। রাজা কহিলেন, "আমার নিকট থাকিলে তোমার সে আশঙ্কা ঘটিবে না।" এই সময়ে আবার সংবাদ আসিল যে, রাজমাতার কোন ব্রতানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য রাজাকে রাজধানীতে যাইতে হইবে। একদিকে তপস্বীদিগের ও অপরদিকে মাতার আদেশ, ইহার কোনটি অগ্রে প্রতিপালনীয় স্থির করিতে অশক্ত হইয়া, রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া

পড়িলেন। মাধব্য তাঁহাকে ত্রিশঙ্কুর ন্যায় মধ্যস্থলে থাকিতে উপদেশ দিলেন। সে যাহাহউক, রাজা অবশেষে তপস্বীদিগের আদেশই শিরোধার্য্য করিলেন। কিন্তু মাতার আদেশরক্ষার জন্যও ভ্রাতৃতুল্য মাধব্যকে রাজধানীতে যাইতে বলিলেন। মাধব্য সৈন্যসামন্তসহ যুবরাজের ন্যায় যাত্রা করিলেন। রাজা মাধব্যকে চঞ্চলমতি জানিয়া শকুন্তলাবৃত্তান্ত প্রকাশের ভয়ে তৎসমস্ত মিথ্যা বলিয়াই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। মাধব্যও তাহাই বিশ্বাস করিয়া মৃগয়া ও নিশাচরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় এবং রাজভোগ ও মিষ্টান্নের লালসায় রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

উদ্ভিদের জীবত্ব।

উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণীজগতের যতই আলোচনা করা যায়, ততই তাহাদের সৌসাদৃশ্য স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া তুলে। উভয় জগতের অতিনিম্নস্তরস্থ জীবের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহারা কোন্ জগদ্ভুক্ত তাহা স্থির করা সুকঠিন।

সাধারণতঃ আমরা আহার শ্বাসপ্রশ্বাস ও সন্তানোৎপাদন শক্তিকেই প্রাণীরাজ্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া থাকি, কিন্তু এই তিন শক্তিই উদ্ভিদ জগতে বিদ্যমান। জলে স্থলে মরুভূমিতে যেখানে যেরূপ আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে, বৃক্ষলতাদি সেখানে সেইরূপ আহার দ্বারাই আপনাদের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। দেশভেদে নৈসর্গিক অবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়, সেই সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনেরও ভেদ ঘটিয়া থাকে।

তুষারগোলক তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্রাকার

হইতে ক্রমশঃ বৃহদাকার প্রাপ্ত হয়। এই যে বৃদ্ধি, তাহা বাহির হইতে নূতন বস্তুর স্তরে স্তরে সংযোগ দ্বারা হয়। কিন্তু বৃক্ষলতাদির কি মনুষ্যপ্রভৃতি প্রাণীর যে বাল্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, উহা এপ্রকারের নহে। সে ক্ষেত্রে দেহের সূক্ষ্ম অণু সকলের মধ্যে মধ্যে নূতন অণুর আবির্ভাব দ্বারা হইয়া থাকে। ইহাকে Intussusception কহে।

অনেকে যে বস্তুর নড়িবার শক্তি আছে, ও জীবিকার জন্য (Proteid) প্রতীদ নামক (Complicated chemical compound) জটিল মিলিত দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তাহাকে প্রাণী বলিয়া থাকেন ; এবং আরও বলেন যে, ঐ সকল মিলিত দ্রব্য প্রায়শঃই তাহারা কঠিন অবস্থায় আহার করিয়া থাকে। তাঁহারা বৃক্ষাদি সম্বন্ধে বলেন যে, তাহারা কেবলমাত্র দ্রব বা ধূমাবস্থায় আহার গ্রহণ করিতে পারে, ও তাহারা যে মিলিত দ্রব্য আহার করে তাহা জটিল নহে ; এবং কেবল মাত্র বৃদ্ধিলাভ করার নিমিত্ত নড়াচড়া করিয়া থাকে।

প্রকৃত পক্ষে এই সূত্রের অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, দুই জগতের নিম্নস্তরের জীবের মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প। এমন কি অনেকে মনে করেন যে, এমন কোন জীব থাকা সম্ভব, যাহাতে উভয় জগতের ধর্ম্মই বিদ্যমান আছে ; এবং উভয় জগতের জীবই সেই সাধারণ ধর্ম্মাবলম্বী জীবের পরিণাম।

লজ্জাবতীলতা প্রভৃতি উদ্ভিদের স্পর্শমাত্রেই পাতাগুলি ঝুলিয়া পড়ে ও বদ্ধ হইয়া যায়। শম্বুকাদি জীবেরাও একটু তাড়া পাইলে আপনার খোলার মধ্যে শরীর গুটাইয়া লয়। কতকগুলি জীবদেহভোজী বৃক্ষ আছে, তাহাদের কোনটী পুষ্প দ্বারা কোনটী পত্র দ্বারা জীবদেহ আহার করে। কোনটীর পাতার উপর মক্ষিকাদি বসিলেই পাতাটী মুড়িয়া যায় ও পাতার ভিতর হইতে রস নির্গত হইয়া মক্ষিকাটীকে মারিয়া ফেলে, ও ক্রমশঃ মক্ষিকাদেহ সেই রসে জর্জ্জরিত হইয়া সেই উদ্ভিদের দেহের পুষ্টিসাধন করে। এখানে এই উদ্ভিদের পাতাই জীবদেহের পাকস্থলীর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।

উদ্ভিদের দেহের (Chlorophyll) হরিতরাগই তাহার বিশেষত্ব, ইহাই সাধারণ মত। কিন্তু জীবজগতের মধ্যে কয়েক প্রকার স্পঞ্জ (Sponge)

প্রভৃতিতেও ঐ রাগ বিদ্যমান আছে, আবার অনেক উদ্ভিদেও তাহার অভাব আছে।

জীবদেহে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ান একটী আবশ্যকীয় বিষয় দেখা যায়। কিন্তু প্রবালাদি জীব ও কয়েকটী শম্বুকাদি জীব একস্থানে থাকিয়া সমস্ত জীবন যাপন করে।

প্রাণীজগতে দেখিতে পাই যে, ভুক্তবস্তু নানাবিধ রসে জীর্ণ হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, এবং ক্রমশঃ রক্ত, মাংসপেশী প্রভৃতি দেহাংশে পরিণত হইয়া প্রাণীর পুষ্টিসাধন করে। তদ্রূপ উদ্ভিদ জগতেও আহার্য্য বস্তু উদ্ভিদদেহের মধ্যে নানাবিধ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের (Metabolism) পর তাহার দেহের বৃদ্ধিসাধন করে। বৃক্ষলতাদি মূলদ্বারা মৃত্তিকা হইতে রস সংগ্রহ করিয়া থাকে। আবার উপায়ান্তর না থাকিলে বায়ু হইতেই রস সংগ্রহ করিয়া লয়। রাস্নাদি (Orchids) বৃক্ষ তাহার একটী দৃষ্টান্তস্থল। গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত উত্তাপবশতঃ বৃক্ষলতাদির রস শুষ্ক হইয়া যায়। তন্নিমিত্ত সে সময়ে তাহারা মৃত্তিকা হইতে অধিক পরিমাণে রস শোষণ করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করে। হৃদ্‌যন্ত্র প্রাণীদেহের একস্থানে অবস্থিত হইয়া আকুঞ্চন প্রসারণ ক্রিয়ার বলে রক্তসঞ্চালনের ব্যবস্থা করিতেছে। উদ্ভিদ দেহেও তদ্রূপ আকুঞ্চন প্রসারণ ক্রিয়ামূলেই রস বৃক্ষমূল হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত উত্থিত হইতেছে। উদ্ভিদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তাহার হৃদ্‌যন্ত্র একস্থানে সন্নিবিষ্ট না হইয়া সমস্ত দেহে ছড়াইয়া আছে (Diffused heart) ভারতগৌরব অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানিয়াছি যে, প্রাণীদেহাংশে উত্তেজনামূলক যতপ্রকার ক্রিয়া দেখিতে পাই, উদ্ভিদদেহাংশেও অনুরূপ উত্তেজনায় অনুরূপ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। প্রাণীদেহাংশকে সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিলে, বা পাক দিলে, অথবা কোন বিষাক্ত বা মাদক দ্রব্যে উহাকে ডুবাইয়া দিলে, তাহার যেরূপ বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যায়, উদ্ভিদদেহাংশকেও তদনুরূপ ভাবে ব্যবহার করিলে একই প্রকার বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যায়। এমন কি মাদক দ্রব্যের মাত্রাভেদে যেমন প্রাণীদেহে উত্তেজনা বা অবসাদ দৃষ্ট হয়, উদ্ভিদ দেহেও মাত্রাভেদের ফল সেইরূপ। সময়ে সময়ে উদ্ভিদের ব্যবহার দেখিলে মনে হয় যেন সে

তাহার মস্তিষ্ক চালনা করিয়া কার্য্য করিতেছে। একটী লতা আকর্ষণী বাহু প্রসারিত করিয়া আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে থাকে, এবং আশ্রয় পাইলেই তাহাকে বেষ্টন করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, কিন্তু যদি আশ্রয়ের সন্ধান করিতে করিতে কোন প্রাচীর গাত্রে আসিয়া বাধাপায়, তৎক্ষণাৎ অনেক লতার বাহুর অগ্রভাগে একটী অবলম্বনীর (Sucker) আবির্ভাব হয়। এই অবলম্বনীর সাহায্যে সে প্রাচীর গাত্রে সজোরে আপনাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে।

একটী বীজ মৃত্তিকাতে যেভাবে প্রোথিতকরা হউক না কেন, তাহার মূল ঘুরিয়া ফিরিয়া মৃত্তিকাগামী হইবেই। এমন কি মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যাইতে যাইতে কোন কঠিন বস্তুতে বাধা পাইবামাত্র মূল তাহার গতি ফিরাইয়া লইয়া যেদিকে বাধা নাই, সেই পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। শীতকালে অনেক বৃক্ষের পত্রকোরক বাল্যাবস্থায় একটী আবরণীর সাহায্যে আত্মরক্ষা করে। সারাজীবন দুইজন পরস্পরের সাহায্যে (Symbiosis) বাস করিতেছে এরূপ দৃষ্টান্তও দুর্লভ নহে। শীম্বাদি (Leguminoseæ) বৃক্ষের মূলে এক প্রকার জীবাণু (Soil Bacteria) বাস করে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে পুষ্ট হয়।

পুষ্পরেণুতে জল লাগিলে তাহার গর্ভাধান শক্তি নষ্ট হয়। এইজন্যই বোধ হয় অনেক পুষ্প অধোমুখ হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, পুংকেশর জলসিক্ত হইবামাত্র রেণুকোষের আবরণ (Lid) বন্ধ হইয়া যায়। দারুহরিদ্রাজাতীয় (Berberis) বৃক্ষের পুষ্পের উপর মক্ষিকাদি উপবেশন করিবামাত্র রেণু মক্ষিকার গায়ে ছিটাইয়া পড়ে। মক্ষিকার সাহায্যে রেণু পুষ্পান্তরে নীত হয়। সেইরূপ কচুজাতীয় (Araceæ) বৃক্ষের পুষ্পের ভিতর অন্তর্মুখী কঠিন রোম থাকায়, মক্ষিকাদি কীট ভিতরে প্রবেশ করিয়া আর বাহিরে আসিতে পারে না। তাহার ফলে সে ভিতরেই ঘুরিয়া বেড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গে রেণু মাখে, এবং পরে ঐ রোমগুলি শুষ্ক হইয়া গেলে সে বাহির হইয়া আইসে। স্ত্রী ও পুরুষ লিঙ্গ প্রায়শঃ একপুষ্পে সন্নিবিষ্ট থাকে। কিন্তু তাহাদের উভয়ের মধ্যে যাহাতে রেণুসংযোগ (Self pollination) না হয়, তাহার জন্য বিধাতা বহুবিধ উপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উদ্ভিদজগতের

সন্তানোৎপাদনপ্রণালীর আলোচনা করিলে প্রাণীজগতের সহিত সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। নিম্নস্তরস্থ উদ্ভিদের মধ্যেও স্ত্রী পুরুষ লক্ষণাদি প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। সেখানেও দেখা যায় যে, পুংকোষ হইতে বীর্য্য নিঃসৃত হইয়া স্ত্রীকোষে প্রবেশ করে, ও গর্ভের সঞ্চার হয়। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, পুংবীর্য্য পুংবৃক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া সন্নিকটে স্ত্রী বৃক্ষ না পাইলে, তাহার অন্বেষণে বহুদূর ভ্রমণ করিতে থাকে। স্ত্রীবৃক্ষের সন্ধান না পাইলে ভ্রমণে বিরত হয় না। ৩।৪ মাইল পর্য্যন্ত এইভাবে পুংবীর্য্যকে ভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে।

এই সমস্ত আলোচনা করিলে উদ্ভিদের জীবত্ব প্রমাণীকৃত হয়, এবং যথার্থই মনে হয়,—

"তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ।" মনু ১।৪৯

ইহারা (বৃক্ষলতাদি) কর্ম্মফলে বহুবিধ তমোগুণে আক্রান্ত হয়। ইহাদের অন্তরে চৈতন্য থাকে, ও সুখ দুঃখের অনুভব হয়।

শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন।

পূর্ব্বজন্মে আকবর।

জাহ্নবীর শ্বেততরঙ্গ ও যমুনার নীলতরঙ্গ পরস্পর আলিঙ্গিত হইয়া যেখানে শারদাকাশের শোভাকেও পরাজিত করিয়াছে, এবং যথায় পূর্ব্বে পবিত্রসলিলা সরস্বতী কলকলস্বরে আপনার অঙ্গ ঢালিয়া দিতেন, সেই হিন্দুর মহাপুণ্যস্থল ত্রিবেণীসঙ্গমের কথা কে না অবগত আছে? আর তাহাই যে তীর্থরাজ প্রয়াগ নামে প্রসিদ্ধ, ইহাও বোধ হয় কাহারও অবিদিত

নাই। সেই ত্রিবেণীসঙ্গমের নিকট যে একটি ছায়ারহল বটবৃক্ষ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া অবস্থিত ছিল, তাহাই হিন্দুর নিকট অক্ষয়বট নামে পূজিত হইত। কত কত সাধু, মহাজন, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এই পবিত্র ক্ষেত্রের পবিত্র বটমূলে আপনাদের পবিত্র জীবন যে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কত কত লোক অনাদিকাল হইতে এই পবিত্র সঙ্গমে স্নান করিয়া আপনাদিগকে যে পবিত্রীকৃত করিয়াছে, তাহারই গণনা বা কে করিতে সক্ষম হইবে? আর সেই লোক-পাবন অক্ষয়বট সন্নিকটে কত কত লোক যে আপনাদের কামনাপরিপূরণের জন্য দিগ্দিগন্তর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ফলতঃ যে পুণ্যক্ষেত্রের এরূপ মহাকর্ষণের ক্ষমতা, তাহার নিকট, ব্রহ্মচারী হউন, গৃহী হউন, সন্ন্যাসী হউন, সকলকেই যে মস্তক অবনত করিতে হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, এই পবিত্র ত্রিবেণীসঙ্গম সকল আশ্রমের লোকের দ্বারা পূজিত ও অধ্যুষিত হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ মাঘের কল্পবাস ইহাকে জনাকীর্ণ করিয়া তুলে, এবং কুম্ভাদি মহামেলার সময় ইহা সাধুসন্ন্যাসীতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

প্রায় চারিশত বৎসর হইল, এই পবিত্র তীর্থের পবিত্র অক্ষয়বটমূলে একজন ব্রহ্মচারী কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তিনি তপস্যা করিতেন, "কেনাপি কামেন তপশ্চচার," তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। তবে তাঁহার শেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাই অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই ব্রহ্মচারীটির নাম মুকুন্দ, তিনি বালমুকুন্দ নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। তৎকালে মুকুন্দ ব্রহ্মচারীর নাম সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নানাদিগ্দেশ হইতে লোক-স্রোত প্রবাহিত হইয়া তাঁহার চরণতল বিধৌত করিয়া যাইত। অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার কঠোর তপস্যার অনুকরণেও প্রবৃত্ত হইত। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বিরণ নামে একজন মুকুন্দের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। মুকুন্দ অক্ষয়বটমূলে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে তপস্যায় ও শিষ্যমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রালাপনে সময় অতিবাহিত করিতেন।

এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এক মহাবিপ্লবের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। পাঠানের ক্ষীণচন্দ্র তখন অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িয়াছে, মোগলের প্রাতঃসূর্য্য মধ্যে মধ্যে কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে, এবং রাজপুতের জাতীয়তাবহ্নি থাকিয়া থাকিয়া প্রজ্বলিত হইতেছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন শক্তি পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করার চেষ্টা করিতেছে। ফলতঃ সমস্ত ভারতবর্ষেই অশান্তির এক বিরাট্ ছায়া দেখা যাইতেছিল,এবং ভারতের নরনারী আপনাদের ধনপ্রাণ লইয়া যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রবাদমুখে শুনিতে পাওয়া যায়, ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা মহাপ্রাণ মুকুন্দের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলে। জাহ্নবী, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনের ন্যায় ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্রোত কিরূপে এক কেন্দ্রে মিলিত হয়, ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে,এই সময়ে ভারতবর্ষে একজন সার্ব্বভৌম সম্রাটের আবির্ভাব হওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু কে সে সার্ব্বভৌম নরপতি হইবেন, তাহাও তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য আপনিই দেহত্যাগ করিবেন ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া, তাহারই আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। শিষ্যমণ্ডলীর সহিত তিনি সে বিষয়ের পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলে,তাঁহারাও গুরুর প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। তন্মধ্যে তিন জন তাঁহার অনুসরণ করিতে স্বীকৃত হন। তাঁহাদেরই একজন মুকুন্দের প্রিয়শিষ্য বিরণ। এই সমস্ত স্থির হইয়া গেলে, ব্রহ্মচারী মুকুন্দ এক তীক্ষ্ণধার করাতের* নিম্নে উপবিষ্ট হইয়া আপনার দেহকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে তাঁহার নখশিখাযুক্ত দেহ হোমকুণ্ডে ভস্মসাৎ করিয়া কতকাংশ ত্রিবেণীসঙ্গমে ও কতকাংশ কুটীরপ্রাঙ্গনে প্রোথিত করা হয়। দেহত্যাগের পূর্ব্বে মুকুন্দ একখানি তাম্রফলকে শ্লোকাকারে হোমের বৎসর, মাস, তিথি, উদ্দেশ্য ও স্বীয় নাম খোদিত করিয়াছিলেন। উক্ত তাম্রফলক ও তাঁহার দেহবিদারী করাতখানিও ভস্ম-

* কেহ কেহ তাহাকে করাত না বলিয়া গিলোটিনের ন্যায় চওড়া তরবারিবিশেষ বলিতে চাহেন, কিন্তু করাতের দ্বারাই যে লোকে কামনাসিদ্ধি ও উচ্চ জন্মের জন্য মস্তক বিদীর্ণ করিত, তাহা বদৌনি প্রভৃতি বলিয়া গিয়াছেন। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

রাশির সহিত প্রোথিত করা হয়। সেই শ্লোক যেরূপ আকারে চলিয়া আসিতেছে, আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

"বসুরন্ধ্রবাণচন্দ্রে তীর্থরাজে প্রয়াগে
তপসি বহুলপক্ষে দ্বাদশীপূর্ব্বযামে।
নখশিখতনুহোমী সার্ব্বভৌমাধিপত্যে
সকলদুরিতহারী ব্রহ্মচারী মুকুন্দঃ॥"

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, ১৪৯৮ সম্বতের মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশী-তিথির প্রথম প্রহরে তীর্থরাজ প্রয়াগে সার্ব্বভৌমাধিপত্যকামনায় সকলপাপহারী ব্রহ্মচারী মুকুন্দ নখশিখাতনুর দ্বারা হোম করাইয়াছিলেন।*

* শ্রীযুক্ত এইচ বেভারিজ সাহেব The Imperial and Asiatic Quarterly Review পত্রের নবম খণ্ডে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মার্ডক্ হোসেন প্রণীত হাদিকা অল আকালিম নামক গ্রন্থের সমালোচনায় উক্ত গ্রন্থ হইতে এই প্রবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থকার কোন হিন্দুর নিকট হইতে ঐরূপ শ্লোক শুনিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন তিনি শ্লোকের চতুর্থ চরণমাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং দুরিতহারী শব্দটীকে 'দরধারী' বলিয়া লিখিয়াছেন। বেভারিজ সাহেব সমস্ত শ্লোকটিকে এইরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"Bas randhra ban chandra tirtharajah : riyagi, Magur lahula pakhchi daudashi purab yami, Nakha sikha tan homi sarbbhumyan'upati, Sakal drathari Brahma hari Mukund"

সাহেব কোন কোন স্থানে শব্দের অর্থ করিতে ভ্রম করিয়াছেন, এবং দর্ধারি শব্দের অর্থ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়া পরে অকৃতকার্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা উহার প্রকৃত পাঠ প্রদান করিলাম। আমাদের প্রদত্ত পাঠটি স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় এলাহাবাদ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক আদিত্যরাম শর্ম্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্লোকটি উক্ত আকারেই আজ্ঞে চা প্রবাদসহ এলাহাবাদ প্রদেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত শ্লোকের তপসি শব্দের স্থলে সাহেব মগর বা মকর উদ্ধৃত করিয়াছেন। তপ ও মকর উভয়েরই অর্থ মাঘমাস, সুতরাং তাহাতে কোন বিরোধ নাই। তবে সাহেব যে শ্লোকটির অন্যান্য বিকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাকে শুদ্ধ করিয়া লইলে আমাদের উদ্ধৃত শ্লোকের সঙ্গে এক হইয়া উঠে। শ্লোকের অর্থ লইয়া কিছু আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া,আমরা নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি। অঙ্কটি বসুরন্ধ্রবাণচন্দ্র কথায় লিখিত হইয়াছে।

মুকুন্দ কি ভাবে দেহত্যাগ করেন, তাহা বুঝা যায় না। তবে তাঁহার দেহদ্বারা যে হোম কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, উক্ত শ্লোক হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিনি করাতের দ্বারা দেহ দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন কিনা, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। তবে আমরা মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, আপনাদের কামনাসিদ্ধির ও উচ্চজন্মের জন্য অনেক হিন্দু সে সময়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে করাতের দ্বারা মস্তক বিদীর্ণ করিতেন, আপনাদের জিহ্বাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিতেন, এবং অক্ষয়বটশাখা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া নদীগর্ভে নিপতিত হইতেন।* সে যাহা হউক, মুকুন্দ ব্রহ্মচারী যে সার্ব্বভৌমত্বকামনায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, উক্ত শ্লোকে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখই আছে। তদ্ভিন্ন তিনি যে কেবল নিজের পাপ দূর করিয়াছিলেন

বসু=৮, রন্ধ্র=৯, বাণ=৫, চন্দ্র=১ এইরূপ অর্থ করিয়া অঙ্কের বামাগতি অনুসারে ১৫৯৮ হয়। তবে ইহা সম্বৎ কি শকাব্দা তাহা প্রথমে বুঝা যায় না। তাহার পর রন্ধ্র শব্দের যদি শূন্য অর্থ করা যায়, তাহা হইলে ১৫৯৮ স্থলে ১৫০৮ হইয়া উঠে। কিন্তু আকবরের জন্মাব্দ লইয়া উহা স্থির করা উচিত। আমরা জানি যে আকবর ৯৪৯ হিজরী ৫ই রজব তারিখে বা ১৫৪২ খৃঃ অব্দের ১৫ই অক্টোবর ভূমিষ্ঠ হন। উক্ত সময় বিক্রম সম্বতের ১৫৯৯ চান্দ্র কার্ত্তিক হইয়া থাকে। সুতরাং প্রবাদানুসারে ১৫৯৮ সম্বতের মাঘমাসেই মুকুন্দ ব্রহ্মচারীর দেহত্যাগ হওয়াই সম্ভব।

* "On safar 23rd A. H. 982, His Majesty arrived at Payag (Prayaga) which is commonly called Illahabas, where the waters of the Ganges and Jumna unite. The infidels consider this a holy place, and with the object of obtaining the rewards which are promised in their creed, of which transmigration is one of the most prominent features, they submit themselves to all kinds of tortures. Some place their brainless heads under saws, others split their deceitful tongues in two! others enter hell by casting themselves down into the deep river from the top of a high tree. Here His Majesty laid the foundations of an Imperial city, which he called Illahabas". (Badauni Vol. II, Page 176. Elliot's History of India Vol. V, pp 512-13.)

এমন নহে, কিন্তু জগতের অনিষ্ট নিবারণেও সে সক্ষম ছিলেন, তাহা "সকলদুরিতহারী" কথা হইতে বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। ফলতঃ উক্ত শ্লোকের দ্বারাই প্রচলিত প্রবাদের সমর্থন হয়। এই প্রবাদের মূলে যদি কিছু সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে মুকুন্দ ব্রহ্মচারীর মহাপ্রাণতার কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। দেশের কল্যাণের জন্য যিনি দেহত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে মহাপুরুষ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য যদি মুকুন্দ ব্রহ্মচারী প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে সকলেরই প্রণম্য সে বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। ব্রহ্মচারীসন্ন্যাসীর পক্ষে সার্ব্বভৌমত্বের আকাঙ্খা কিছু গুরুতর বস্তু নহে। যাঁহারা এজগৎ ছাড়িয়া অন্য জগতের আশায় আপনাদের জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা যদি এ জগতের কোন বস্তুর অভিলাষী হন, তাহা হইলে, তাহা তাঁহাদের পক্ষে গৌরবের কথা নহে। কিন্তু যিনি নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জগতের বা দেশের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি যে মহাপ্রাণ তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সেই জন্য ভারতবর্ষের কল্যাণে মুকুন্দ ব্রহ্মচারীর দেহত্যাগকে আমরা মহাপ্রাণতারই দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকি। মুকুন্দের দেহত্যাগের পর তাঁহার তিনটি শিষ্যও একে একে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। বিরূপ শ্বাসরোধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

১৫৯৮ সম্বতের মাঘমাসে প্রয়োগতীর্থে মুকুন্দ ব্রহ্মচারীর দেহত্যাগ হইল। ১৫৯৯ সম্বতের কার্ত্তিকমাসে অমরকোটে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" আকবরশাহ ভূমিষ্ঠ হইলেন। সেই সময়ে ভারতে অশান্তি চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ছায়া ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে লাগিল। ক্রমে যখন মোগলের গৌরবসূর্য্য আপনার উজ্জ্বল কিরণে ভারতাকাশ আলোকিত করিতে লাগিল, তখন হইতে ভারতের সমস্ত অন্ধকারই বিদূরিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে শান্তির স্রোতও প্রবাহিত হইল। পাঠানরাজপুতপ্রভৃতিকে দলিত ও মিলিত করিয়া, যখন আকবরশাহ দিল্লীর সিংহাসনকে শান্তিবারিতে অভিষিক্ত করিয়া তুলেন, তখন ভারতের নরনারী

"দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বলিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে আরম্ভ করে। দাক্ষিণাত্যেও মোগল বিজয়পতাকা প্রশান্ত বায়ুস্তরে উড্ডীন হইতে থাকে। কেবল তাহা বলিয়া নহে, সেই আদর্শ সম্রাটের জীবন আশৈশব যেরূপ সংযম ও বিষয়ানাসক্তির দ্বারা গঠিত হইয়াছিল, এবং পদে পদে তাঁহার জীবনে যেরূপ আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হইতেছিল, তাহাতে লোকে তাঁহাকে নবকলেবরধারী মহাপুরুষ বলিয়াই অনুমান করিতেছিল। সেই সময়ে উত্তর ভারতবর্ষের মহাপুরুষ মুকুন্দ ব্রহ্মচারীর দেহাবসান হওয়ায়, তিনিই যে আকবররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাও লোকমুখে প্রচারিত হইতে লাগিল।

মুকুন্দের আকবররূপে জন্মগ্রহণের কথা সত্যই হউক, বা মিথ্যাই হউক, প্রবাদ যে তাহাই স্থির করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রমাণেরও সৃষ্টি করিল। আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি। আকবর বাদশাহ যে সংস্কৃতালোচনা ভাল বাসিতেন, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। একদিন বীরবল, তোড়রমল ও মিয়া তানসানের* সহিত আকবর অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোকের পাদপূরণের জন্য তিনজনকে অনুরোধ করিয়া নিজে বলিলেন, "বসুরন্ধ্রবাণচন্দ্রে তীর্থরাজে প্রয়াগে।" দ্বিতীয় উচ্চারণ করিলেন, "তপসি বহুলপক্ষে দ্বাদশীপূর্ব্বযামে।" তৃতীয় বলিলেন, "নখশিখ-তনুহোমী সার্ব্বভৌমাধিপত্যে।" চতুর্থ শ্লোক পূরণ করিয়া কহিলেন, "সকল-দুরিতহারী ব্রহ্মচারী মুকুন্দঃ"। এই চতুর্থ ব্যক্তিই বীরবল। আকবর বাল্যকাল হইতে শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেন, তিনি পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতেও পারিতেন, এবং আপনাকে মুকুন্দ ব্রহ্মচারী বলিয়াই জানিতেন।† কিন্তু আর কেহ যে তাঁহার জন্মরহস্য জানিত, ইহা তিনি অবগত ছিলেন না। শ্লোক পূরণ হইবামাত্র আকবর বুঝিতে পারিলেন যে, ইঁহারাও এ রহস্য অবগত আছেন। তখন তিনি হোম ও ভূপ্রোথিত তাম্রলিপির সম্বন্ধে

* কেহ কেহ তানসানের পরিবর্ত্তে খান খানান বলিয়া থাকেন।

† আকবর জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতেন (Badauni Vol II P. 300)

প্রশ্ন করিলেন, বীরবল সমস্ত কথারই উত্তর দিলেন। আকবর বুঝিতে পারিলেন যে, ইঁহারা পূর্ব্বজন্মে তাঁহারই শিষ্য ছিলেন, তন্মধ্যে বিরণই বীরবলরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আকবর অনিষ্টাশঙ্কায় পূর্ব্বস্মৃতিলোপের জন্য রাজা বীরবলের দ্বারা সেই করাত ও তাম্রলিপি উত্তোলন করিয়া আনাইয়া তাহা নষ্ট করিয়া ফেলেন।* তাহার পর অক্ষয়বটেরও শাখা প্রশাখা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল। তাহার একটু সামান্য মাত্র স্কন্ধ রাখিয়া সেই ত্রিবেণীসঙ্গমের উপর এক দুর্ভেদ্য দুর্গ স্থাপিত হইল। প্রয়াগ ইলাহাবাস নাম ধারণ করিল, পরে তাহা ইলাহাবাদ হইল, এক্ষণে এলাহাবাদ হইয়া উঠিয়াছে। প্রবাদ আকবর যে অনিষ্টাশঙ্কায় সেই করাত ও তাম্রলিপির বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। পাছে অপর কোন ব্যক্তি ঐরূপে দেহত্যাগ ও হোমের দ্বারা সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করে, এই আশঙ্কায় আকবর সে সমস্ত নষ্ট করিয়াছিলেন। প্রবাদমুখে যাহা থাকুক না কেন, যে স্থানে কামনাসিদ্ধি ও উচ্চজন্মলাভের জন্য লোকে ঐ সমস্ত উপায়ে জীবন বিসর্জ্জন দিত, সেই স্থানেই যে প্রয়াগদুর্গের ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল, ইহা মুসলমান ঐতিহাসিকগণও বলিয়া গিয়াছেন।†

এক্ষণে আমরা এই প্রবাদসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। যাঁহারা জন্মান্তরে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট এ প্রবাদ একেবারে অমূলক বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ, ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাট হইতে হইলে যে, পূর্ব্বজন্মে তজ্জন্য তপস্যা করিতে হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি সে তপস্যা করিয়াছিলেন, তিনি হিন্দু না হইয়া কেন মুসলমানরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহার উত্তর দেওয়া সুকঠিন। তবে যদি আমরা এরূপ বলি যে, সে সময়ে ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতি হইতে হইলে, বিধাতার নির্দ্দেশানুসারে মুসলমান হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না, তাহা হইলে তাহার একরূপ উত্তর হইতে পারে বটে। কিন্তু কি কারণে মুকুন্দ ব্রহ্মচারী মুসলমান সম্রাট হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা

* কেহ কেহ বলেন শাজাহান উক্ত করাতখানি নষ্ট করিয়াছিলেন।

† তৃতীয় টিপ্পনী দেখ।

শাশ্বতী

আকবর শাহ

Mohila Press, Cal.

তিনিই বলিতে পারিতেন। প্রবাদ ইহারও একটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। মুকুন্দ ব্রহ্মচারী একদিন না ছাঁকিয়া দুগ্ধপান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে পরজন্মে মুসলমান হইতে হইবে বলিয়া তিনি বুঝিতে পারেন। তখন তিনি ভারতবর্ষের কল্যাণে সার্ব্বভৌম নরপতি হইয়াই জন্মিবেন স্থির করিলেন। সে যাহাহউক,এবিষয় লইয়া আমরা আর কোন তর্ক বিতর্ক করিতে ইচ্ছা করি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, জন্মান্তরে বিশ্বাস থাকিলে, মুকুন্দ ব্রহ্মচারীর আকবররূপে জন্মগ্রহণ করা নিতান্ত অসম্ভব নহে। বিশেষ আকবরের জীবনী আলোচনা করিলে, এবিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়া উঠে। তিনি বাল্যকাল হইতে যেরূপ সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব-জন্মে ব্রহ্মচারী থাকা, অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার মাংস ভক্ষণে অপ্রবৃত্তি, জিতেন্দ্রিয় হওয়ার চেষ্টা, সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা, সকল ধর্ম্মে সমদৃষ্টি, নিজের এক নবধর্ম্ম প্রচার ও তজ্জন্য শিষ্য সংগ্রহ, বিশেষতঃ তাঁহার হোম কার্য্য সম্পাদন, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, হিন্দুর সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হওয়া প্রভৃতি তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মে হিন্দু, বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী থাকা বলিয়াই, প্রতিপন্ন করিয়া থাকে।* মুসলমান,

* "His life is an uninterrupted series of virtue and sound morality. God is witness, that the wise of all ranks, are unanimous in this declaration. He never laughs at, nor ridicules any religion or sect. He never wastes time, nor omits the performance of any duty so that through the blessing of his upright intentions every action of his life may be considered as an adoration of the deity.

"He abstains much from flesh, so that whole months pass away without his touching any animal food. He takes no delight in sensual gratifications, and in the course of twenty-four hours, never makes more than one meal. He spends the whole day and night in the performance of his necessary avocations excepting the small portion required for sleep.

"His Majesty, however did for some time cast a veil over this mystery that it might not be known to [strangers. But which

ঐতিহাসিকগণ তাঁহার জীবনীর যেরূপ চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহার সমস্ত সত্য না হইলেও, অধিকাংশই যে প্রকৃত তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং আকবরের জীবনই উক্ত প্রবাদের সমর্থন করিতেছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ সম্রাটের আবির্ভাব হইতে হইলে, যে মহাপুরুষ উত্তর

the Lord willeth to have done, who hath power to avoid? In his infancy, he involuntarily performed such actions as astonished the beholder, and when at length contrary to his inclination those wonderful actions exceeded all bounds discernible to every one, he considered it to be the will of the Almighty, that he should lead men in the paths of righteousness and began to teach" (Gladwin's Ayeen Akbery).

"Moreover Samanis and Brahmans managed to get frequent private interviews with His Majesty. As they surpass other learned men in their treatises on morals, and on physical and religious sciences, and reach a high degree in their knowledge of the future, in spiritual power and human perfection they brought proofs, based on reason and testimony for the truth of their own, and the fallacies of other religions and inculcated their doctrines so firmly and so skilfully represented things as quite self-evident which require consideration, that no man by expressing his doubts, could now raise a doubt in His Majesty even if mountains were to crumble to dust, or the heavens were to tear asunder" (Badauni Vol. II P. 255 Elliot Vol. V. P. 528).

"From his earliest youth, in compliment to his wives, the daughters of the Rajas of Hind, he had within the female apartments continued to burn the hom, which is a ceremony derived from fire-worship, but on the New-year festival of the 25th year after his accession, he prostrated himself both before the Sun and before the fire in public and in the evening the whole Court had to rise up respectfully when the lamps and candles were lighted (Badauni Vol. II P. 261 Elliot Vol V. pp 530-31).

ভারতবর্ষে আপনার মহিমা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রাণ মুকুন্দ ব্রহ্মচারীই যে তাঁহার দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহা স্বতঃই মনে উদয় হইয়া থাকে। জন্মান্তরবাদীদিগের নিকট তাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে না। আর যাঁহারা জন্মান্তরে বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, আকবর হিন্দু প্রীতির জন্য উক্ত শ্লোকের রচনা ও প্রবাদের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। অথবা হিন্দুরা তাঁহার রাজ্যশাসনে সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত প্রবাদের অবতারণা করিয়াছিলেন। সে যাহাহউক, মুকুন্দ ব্রহ্মচারী ও আকবরশাহ তৎকালে ভারতবর্ষে যে দুই মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আকবরের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, আর মুকুন্দের নাম এক্ষণে সেরূপ প্রচারিত না হইলেও অদ্যাপি তাঁহার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি প্রয়াগদুর্গের নিম্নে অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে অক্ষয়-বটকথিত শুষ্ক বৃক্ষমূলে পুষ্প চন্দন দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে। এই দুই মহাপুরুষের অভিন্নতা প্রতিপাদন যে কৌতুকাবহ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ধর্ম্ম-কথা।

সকল দেশে সকল কালে সভ্য অসভ্য প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই অল্লাধিক পরিমাণে ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির ভিন্নতানুসারে সে বিশ্বাসের কিছু কিছু পার্থক্য আছে বটে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ধর্ম্মের আদর্শ ও তাহার অনুষ্ঠানপ্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে এরূপ মনুষ্য অল্পই আছে, যাহারা এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন, বা যাহাদের এ বিষয়ে কোনও প্রকার ধারণাই নাই। সভ্য-

তার উচ্চতম সোপানারূঢ় সুশিক্ষিত জাতি হইতে অরণ্য ও পর্ব্বতগহ্বরনিবাসী বর্ব্বর, অশেষপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্মদাতা পৃথিবীর অতিবড় পণ্ডিত হইতে বর্ণজ্ঞানবিহীন মূর্খ, যাহার দিকেই দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, ধর্ম্মের নামে কোন না কোন একসুরে প্রায় সকলেরই অন্তরতন্ত্রী বাজিয়া উঠে। শতকর্ম্মব্যস্ত অবসরহীন জীবনের নিরন্তর প্রবহমান কর্ম্মস্রোতঃ মুহূর্ত্তের জন্যও স্তব্ধভাব ধারণ করে। স্পষ্টই হউক, আর অস্পষ্টই হউক, পূর্ণই হউক, আর অপূর্ণই হউক, ধর্ম্মের কোন না কোনরূপ ধারণা মনুষ্যসমাজের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত আছে। ধর্ম্ম কোন না কোনরূপে মনুষ্যহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বের প্রায় সমস্ত মানুষকেই অল্পাধিক পরিমাণে চরিতার্থ করিতেছেন। ধর্ম্মের এই সর্ব্বসঞ্চারিণী শক্তির মধ্য দিয়াই তাঁহার মহিমার প্রকাশ। এই বিশ্বালিঙ্গনভাবের মধ্যেই বিশ্বের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই মনে হয়, ধর্ম্ম কথাই বুঝি মনুষ্য জীবনের সার কথা, ধর্ম্ম কথার ন্যায় মানুষের এমন মর্ম্মকথা বুঝি আর কিছুই নাই।

মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম কি, মনুষ্যসমাজের সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহা লইয়া অনেক প্রকার আলোচনা হইয়াছে, এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে যে, পৃথিবীর আর কোনও বিষয় লইয়া বুঝি সেরূপ হয় নাই। তথাপি ইহার দ্বারাই যে সে আলোচনার প্রয়োজনীয়তার শেষ হইয়াছে, মানুষের পক্ষে জোর করিয়া সে কথা বলা বড়ই সুকঠিন। মনুষ্য সমাজের অনেক স্থলেই এক এক সময়ে এক এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের নির্দ্দোষ নির্ম্মল অন্তঃকরণে ধর্ম্মের যে সকল তত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন, কখনও বা সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশাদি রূপে যে সকল তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, ধর্ম্মের নামে তাহাই প্রচারিত হইয়া অসংখ্য নরনারীকে সেই দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। ইঁহারাই ধর্ম্মজগতের নেতা বা ধর্ম্মগুরু বলিয়া মনুষ্যসমাজে সম্মানিত। শতসহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, তাঁহাদের অস্থিমজ্জা মাটীতে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর কোটি শির আজিও তাঁহাদের নামে অবনত। পৃথিবীর কোটী কোটী নরনারী আজিও তাঁহাদের উপদেশ, তাঁহাদের ধর্ম্মমত, মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাদের অমরত্বের সাক্ষ্য

প্রদান করিতছে। এইরূপে মনুষ্যসমাজে অনেক প্রকার ধর্ম্মমতের প্রচার হইয়াছে,এবং তাহা লইয়া অনেক প্রকার বিরোধের সৃষ্টি, অনেক ওলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষেও ধর্ম্মের আলোচনা যথেষ্ট পরিমাণেই হইয়াছিল, এবং একথাও বোধ হয় নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায় যে, সে আলোচনা ভারতবর্ষে যেরূপ হইয়াছিল, যেরূপ বিস্তৃতি, যেরূপ পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল, পৃথিবীর আর কুত্রাপি সেইরূপ হয় নাই। কিন্তু ধর্ম্মালোচনায় ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির একটা বিশেষত্ব এই যে, এখানে ধর্ম্মের নামে কখনও কোন পুরুষ বা মহাপুরুষের মত পরিগৃহীত হয় নাই। ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে কোন পুরুষ বা মহাপুরুষ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক-রূপে কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। জ্ঞানবিজ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার নিত্যজ্ঞানপ্রসূত অনাদিসিদ্ধ অপৌরুষেয় শ্রুতিই ধর্ম্মের অদ্বিতীয় শিক্ষাদাত্রীরূপে ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে চিরকাল প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। ধর্ম্মে ও কর্ম্মে একমাত্র তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া হিন্দুজাতি আপনার সভ্যতার সকল অঙ্গ সংগঠন করিয়া তুলিয়াছেন। ধর্ম্ম নিত্য, তাঁহার প্রমাণও নিত্য, যাহা নিত্য তাহা কখনও অনিত্য পৌরুষেয় জ্ঞানের দ্বারা নিয়মিত হইতে পারেনা। ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস, ইহাই হিন্দুজাতির চিরন্তনী ধারণা। হিন্দুসমাজে অনেক শক্তিশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, অনেক তত্ত্বদর্শী ধর্ম্মগুরু অনেকবার ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও তাহার প্রচার করিয়াছেন, এমন কি ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দূর করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানকেও এদেশে একাধিকবার শরীর পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে, কিন্তু কেহই নূতন কথার, আপনার কথার, ধর্ম্মের নামে বেদবিরুদ্ধ স্বীয় অনুভবলব্ধ তত্ত্বকথার, প্রচার করিতে সাহস করেন নাই। স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্তও তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় অর্জ্জুনকে তত্ত্বোপদেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,হে অর্জ্জুন, তোমাকে যাহা বলিতেছি, তাহা যে আজ নূতন তোমাকেই বলিতেছি, তাহা নহে। বেদরূপে অনেক পূর্ব্বেই তাহা আমি প্রকাশ করিয়াছি। বেদবিদ্গণ যাহা বলিয়া থাকেন, তোমাকেও আমি সংক্ষেপে সেই তত্ত্বেরই উপদেশ করিতেছি। ঋষিকুলবরেণ্য ভগবান পতঞ্জলিদেব "অথযোগানুশাসনং" বলিয়া তাঁহার যোগশাস্ত্রের

আরম্ভ করিয়াছেন। 'শাসনং' বলিতে সাহস করেন নাই। হিন্দুর দৃষ্টিতে এক মাত্র অপৌরুষেয় বেদই শাসন, আর সকল শাস্ত্র তাহার অনুশাসনমাত্র। হিন্দুজাতি একমাত্র বেদব্যতীত আর কাহাকেও ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। হিন্দুসমাজে যিনি যখন এ নীতির লঙ্ঘন করিয়াছেন, স্বীয় অনুভবলব্ধ বেদবিরুদ্ধ অভিনব তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন, নূতন কথার প্রচার করিয়াছেন, অথবা বৈদিক সত্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তিনি যত বড় লোকই কেন হউন না, হিন্দুসমাজে তখনই তাঁহার কথা অগ্রাহ্য হইয়াছে। এরূপ বেদানুগত্য ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ অস্বতন্ত্রতার ফলে হিন্দুজাতি কতটুকু লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনার বিষয়। লাভ লোকসান যাহাই হউক, একথা ঠিক যে, ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দুর কোনও নূতন মত, কোনও নূতন তত্ত্ব, কোনও নূতন কথা নাই। যাহা পুরাতন, যাহা সনাতন, ধর্ম্মের নামে হিন্দুসমাজ তাহারই আদর করিয়া থাকেন। আমাদের বিশ্বাস, হিন্দুধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি কাহাকেও কিছু বলিতে হয়, তবে তাঁহাকে পুরাতন কথারই আবৃত্তি করিতে হইবে। শাস্ত্র ও আচার্য্যমুখে যাহা শত সহস্র বার ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহারই পুনরুক্তি করিতে হইবে। কোনও রূপ নূতন কথার অভিনব গবেষণায়, সনাতন আর্য্যধর্ম্মের আলোচনা কখনও হয় নাই, হইবে না, হওয়াও সম্ভব নহে।

ধর্ম্মের প্রমাণ প্রবর্ত্তক লইয়া অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত এই যে পার্থক্য, ইহাই তাহার একমাত্র পার্থক্য নহে। মূলধর্ম্মতত্ত্বের ধারণা সম্বন্ধেও অন্যান্য জাতির সঙ্গে হিন্দুজাতির একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য জাতিই ধর্ম্মের একটা আদর্শকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে আদর্শ ভারতবর্ষের হিন্দুর চক্ষে যেরূপ প্রস্ফুট ও উজ্জ্বল, সেরূপ বোধ হয় আর কোথাও নহে। সকল দেশেই কতকগুলি অনুষ্ঠান, সুধী ও সজ্জনসম্মত কতকগুলি বিধিনিষেধ, চিত্তপ্রসাদকর কয়েকটা সদ্বৃত্তির অনুশীলন, স্বকীয় প্রকৃতির অনুগত প্রণালীর আশ্রয়ে ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিধানের মধ্যদিয়াই ধর্ম্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, বাহিরের আচার, অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ধর্ম্মকে বাহিরেই ধরিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার ফলে ধর্ম্ম যেরূপ অনির্দ্দেশ্য ছিলেন, প্রায় সেই রূপই রহিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্ম বলিতে এ সকল দেশে কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট পদার্থকে লক্ষ্য করা হয় না। সে সকল আচার অনুষ্ঠান নামাজ উপাসনার পশ্চাতে ধর্ম্মকে কোনও কিছু একটা অলক্ষিত বস্তুরূপে ধরিয়া লওয়া হয় মাত্র। হিন্দুর দৃষ্টিতে ধর্ম্ম সেরূপ অলক্ষিত বস্তু, ধরিবার ছুঁইবার অযোগ্য কোনও কিছু একটা অনির্দ্দেশ্য পদার্থ নহে। ইহার লক্ষণ আছে, স্বরূপ আছে, হিন্দুর দৃষ্টিতে ধর্ম্ম সত্য, জাগ্রত, সতত মূর্ত্তিমান্ প্রত্যক্ষ বস্তু। হিন্দুর শাস্ত্র বলে, "ধর্ম্মোবিশ্বস্যজগতঃ প্রতিষ্ঠা", বিশ্বজগতের ধর্ম্মই একমাত্র প্রতিষ্ঠা। সততবিনাশশীল বিশ্বরাজ্যে একমাত্র ধর্ম্মই প্রাণরূপে অবস্থিতি করিয়া প্রতিনিয়ত তাহার রক্ষা বিধান করিতেছেন। "ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং", সমস্ত বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ একমাত্র ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। ভগবান্ কনাদ ধর্ম্মের লক্ষণ করিতে গিয়া ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। "যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সঃ সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ", যাহা হইতে জীবের প্রকৃত কল্যাণ সংসাধিত হয়, ও জীব অবশেষে মুক্তির অমৃতময় ফললাভ করে তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেও ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, যাহার দ্বারা পদার্থের অবস্থান, যাহার অভাবে পদার্থের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়, যাহা পদার্থের প্রকৃতিরূপে অবস্থিত, তাহাই ধর্ম্ম। যাহা আছে বলিয়া মনুষ্যজাতি আছে, যাহা দ্বারা মনুষ্য, মনুষ্য নামে অভিহিত, যাহার অভাবে মনুষ্যত্বের অভাব অবশ্যম্ভাবী, যাহার উন্নতি ও অবনতিতে মনুষ্যত্বের উন্নতি ও অবনতি, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। ধর্ম্মের এই লক্ষণ অনুসারে মানুষের ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হইলে, মনুষ্য প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া তাহার বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। যে সকল বৃত্তি অন্যজন্তু সাধারণ মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জন্তুমাত্রেই যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা মানুষের ধর্ম্ম নহে, তাহা জান্তব ধর্ম্ম। আর যাহা অনন্যজন্তুসাধারণ কেবল মনুষ্যপ্রকৃতির নিজস্ব বস্তু, একমাত্র মনুষ্য ব্যতীত আর কোনও প্রাণীতে যাহার কোনওরূপ ক্রিয়ার উপলব্ধি হয় না, যাহা সূক্ষ্মভাবে, শক্তিরূপে একমাত্র মনুষ্য প্রকৃতিতেই বর্ত্তমান, যাহা দ্বারা মনুষ্য প্রকৃতি সংগঠিত, তাহাই মানুষের ধর্ম্ম। ভগবান মনু মানুষের সেই বিশেষ গুণ বা বৃত্তিগুলিকে দশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽ-

স্তেয়ঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যাসত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥" এতদ্ব্যতীত বিবেক, বৈরাগ্য, শান্তি, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ঔদাসীন্য, অপূর্ব্ব আত্ম-সংস্কার প্রভৃতি আরও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বৃত্তি ও শক্তির বিষয় শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এ সকল বৃত্তি বা শক্তির বীজ একমাত্র মনুষ্য প্রকৃতিতেই বর্ত্তমান। একমাত্র মনুষ্যেই সেই বীজ হইতে এসকল ধর্ম্মের বিকাশ হইতে পারে। এ সকল বিশেষ শক্তিগুলি মনুষ্যপ্রকৃতিতে বর্ত্তমান বলিয়াই মানুষ মানুষ। মনুষ্যের আকার, প্রকার, বুদ্ধি, বিবেচনা এ সকল বিশেষ বিশেষ শক্তিরই কার্য্য। মানুষের এই প্রকৃতিগত বিশেষত্বের লোপের সঙ্গে তাহার মনুষ্যত্বের লোপও অপরিহার্য্য। এ সকল বৃত্তির অনুশীলন বা বিকাশ-সাধনই মানুষের ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত মানুষের আর কোনও প্রকার ধর্ম্ম নাই। ইহাই শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের লক্ষণ, হিন্দুর দৃষ্টিতে ইহাই ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষণ।

ধর্ম্মের এরূপ লক্ষণ একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রব্যতীত আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। প্রায় সকল সভ্যদেশেই ধর্ম্মকে একটা বাহিরের জিনিষ মনে করা হয়। আর ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে ধর্ম্ম মানুষের প্রকৃতিস্বরূপ আত্মার অন্তরঙ্গ পদার্থ। প্রায় সকল সভ্যদেশেই ধর্ম্মকে একটা বাহিরের জিনিষ মনে করিয়া, কতকগুলি আচার, অনুষ্ঠান, সাধন, উপাসনার মধ্যে বাহিরেই তাহার অন্বেষণ করা হয়। আর হিন্দুজাতি ধর্ম্মের নামে কোনও প্রকার বাহিরের বিষয়কে লক্ষ্য না করিয়া আপনার মধ্যেই তাহার সাক্ষাৎ লাভ করে। অন্যান্য দেশে ধর্ম্ম যেন একটা আগন্তুক জিনিষ, সাধনার দ্বারা তাহার সহিত আত্মার সম্বন্ধ সংস্থাপন করা হয় মাত্র, আর হিন্দুর দৃষ্টিতে ধর্ম্ম আত্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে অবস্থিত নিজস্ব বস্তু,সাধনার দ্বারা তাহার বিকাশ সম্পাদন করা হইয়া থাকে। হিন্দু জানে, ধর্ম্ম কোনও একটা আগন্তুক পদার্থ নহে, বাহির হইতে তাহাকে আপনার মধ্যে টানিয়া আনা হয় না। যাজনা বা সাধনার দ্বারা আপনার মধ্যেই অবস্থিত। আপনারই প্রকৃতস্বরূপ সেই সূক্ষ্ম শক্তি বা ধর্ম্মের বীজগুলিকে ফুটাইয়া তোলা হয়। আপনার শক্তিগুলিকে জাগ্রত করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। অন্যের দৃষ্টিতে ধর্ম্মদ্বারা মহত্বলাভ হইতে পারে, অতএব ধর্ম্মের সেবা সকলেরই কর্ত্তব্য। আর হিন্দুর দৃষ্টিতে ধর্ম্ম দ্বারা মানুষের আত্মলাভ হইয়া থাকে, অতএব তাহার সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যের দৃষ্টিতে ধর্ম্মের অনালোচনায় মানুষের

মহত্ত্ব লাভ না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মনুষ্যত্বের কোনই ক্ষতি হয় না। আর হিন্দুর দৃষ্টিতে ধর্ম্ম হইতেই মনুষ্যত্বের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি হইয়া থাকে, অতএব তাহার অমর্য্যাদায় মনুষ্যের আত্মনাশ অপরিহার্য্য। অন্তের দৃষ্টিতে ধর্ম্ম যেন মানুষের অঙ্গের ভূষণ, পরিধান করিলে শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু না করিলেও বিশেষ হানি নাই। আর হিন্দুর দৃষ্টিতে ধর্ম্ম যেন মানুষের শরীর, বাঁচিতে হইলে তাহাকে রক্ষা করিতেই হইবে, তাহাতে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। অন্তের দৃষ্টিতে ধর্ম্মের সেবা ধর্ম্মের জন্ত, আর হিন্দুর দৃষ্টিতে ধর্ম্মরক্ষা আপনার জন্ত। হিন্দুর দৃষ্টিতে ধর্ম্মরক্ষা তাহার আমিত্বেরই রক্ষা, ধর্ম্মের উন্নতিতে তাহার স্বীয় প্রকৃতিরই উন্নতি। আর ধর্ম্মক্ষয়ে তাহার আমিত্বেরই ক্ষয়, অবনতিতে তাহার আমিত্বেরই অবনতি। ইহাই হিন্দুজাতির ধর্ম্মধারণার বিশেষত্ব। ধর্ম্মের এরূপ বিশোদার ভাবের ধারণা একমাত্র ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি ব্যতীত আর কোথাও সম্ভব হইয়াছে বলিয়া জানি না। মুসলমান জানে, ধর্ম্ম কেবল তাহার মুসলমানীতেই আবদ্ধ। খ্রীষ্টানের ধারণা, তাহার খ্রীষ্টানীতেই কেবল ধর্ম্মের চরম পরিণতি, আর হিন্দু বলে, ধর্ম্ম কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের মধ্যেই বন্দী নহেন, মনুষ্যপ্রকৃতির সম্পূর্ণতা বা আমিত্বের পূর্ণপ্রসারেই তাহার কাষ্ঠাপ্রাপ্তি। মুসলমান তাঁহাকেই ধার্ম্মিক বলিয়া আদর করিবেন, যিনি মুসলমানীতে অনুরক্ত, খ্রীষ্টান তাঁহাকেই ধার্ম্মিকের উচ্চ আসন প্রদান করিবেন, যিনি তাঁহার খ্রীষ্টানীরই অনুগত। কোনওরূপ নিয়ম অনুষ্ঠান, কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িকতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া একমাত্র হিন্দুই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবেন, যাঁহার মনুষ্যত্ব পরিপুষ্ট; একমাত্র হিন্দুই তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া পূজা করিবেন, যাঁহার আত্মশক্তি যথোচিত বিকাশপ্রাপ্ত। অন্তান্ত সমাজে ধর্ম্ম একটা সংকীর্ণ জিনিষ, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মেই আবদ্ধ, হিন্দু সমাজে ধর্ম্ম উদার অসঙ্কীর্ণ ও মহান্, একমাত্র মনুষ্যপ্রকৃতির পূর্ণবিকাশেই প্রতিষ্ঠিত। জগতে ইস্লাম ধর্ম্মের বিস্তার হইয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, আরও কতশত ধর্ম্মের আবির্ভাব তিরোভাব সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুস্থানের সৌভাগ্য, হিন্দুজাতির গৌরব যে, মনুষ্যধর্ম্ম একমাত্র ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত আর কোথাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। ক্রমশঃ

৬

শ্রীরসিকলাল ভট্টাচার্য্য।

বঙ্কিম রেখা।

প্রসিদ্ধ কলাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত জন্‌ রস্‌কিন তাঁহার মডার্ণ পেইণ্টারস্‌ (Modern Painters) নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন বঙ্কিম রেখা (Curve) অশেষ সৌন্দর্য্যের আকর। একটী সরল রেখা সোজা একটানা চলিয়াছে তাহার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু একটী বক্র রেখাতে কল্পনার বৈচিত্র্য সুপরিস্ফুট। কি প্রকৃতি রাজ্যে, কি শিল্পকলায় বক্র রেখা আমাদের মনে ভাববৈচিত্র্য জাগাইয়া দেয়। দিগ্‌বলয় বর্ত্তুলাকার বলিয়া আকাশের সৌন্দর্য্য কত বৃদ্ধি করে। বারাণসীর গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, তাই সেই পুণ্য নগরীর শোভা সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভগবান্‌ ভবানিপতির ভালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজ করে। আবার স্বয়ং শিবানী ও ষোলকলায় পূর্ণ পূর্ণচন্দ্রের অনাদর করিয়া ললাটে শশিকলা ধারণ করেন। যে সকল সৌন্দর্য্যের সার কুলদল তাঁহাদের চরণ শোভা বর্দ্ধন করে, তাহারাও বঙ্কিম রেখার সমষ্টি। মায়ের আলুলায়িত কুন্তলে একবার দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে তাহার মধ্যেও বঙ্কিমরেখা সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়াছে। কেবল শ্যামার কুন্তল কলাপে নহে, শ্যামের চাচর চিকুরেও এই বঙ্কিম রেখার খেলা। কেবল তাঁহার চিকুর দামে নহে, তাঁহার সুবঙ্কিম ভ্রূযুগলে, তাঁহার নীলেন্দিবর দলনিভ নেত্র-দ্বয়ে সেই চারুনেত্রের বঙ্কিম কটাক্ষে, তাঁহার শুকচঞ্চুসম নাসিকায়, সেই নাসি-কার আবার তিলকুসুমতুল্য ঈষৎ বক্র অগ্রভাগে, তাঁহার সদামৃদুহাস সুবঙ্কিম বিম্বাধরে, তাঁহার কম্বু গ্রীবায় এই বঙ্কিম রেখার সৌন্দর্য্যলীলা প্রকটিত। সর্ব্বোপরি নটবর শ্যামের ত্রিভঙ্গ ঠামে অর্থাৎ শিরের শিখিপুচ্ছ ঈষৎ হেলাইয়া পীতধটীশোভিত কটিদেশ ঈষৎ বাঁকাইয়া, চরণে চরণ দিয়া, বামে হেলিয়া দাঁড়ানই তাঁহার 'বঙ্কুবিহারী' বা 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। এই বাঁকাশ্যাম মূর্ত্তিতে বৈষ্ণব কবিগণ জগতের সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের সার পুঞ্জীকৃত করিয়াছেন। তাই বাঁকা মানে সুন্দর। বঙ্কিম রেখা সর্ব্বসৌন্দর্য্যের প্রাণ।

শিল্পসৌন্দর্য্যের ন্যায় কাব্যকলার সৌন্দর্য্যও বঙ্কিমরেখায়। বঙ্কিম-

রেখার সাহায্যে কবিগণের কল্পিত নব নব ভাব বিকাশপ্রাপ্ত হয়। ইহাকেই আর্ট (Art) অর্থাৎ কলাকৌশল বলে।

মহাকবি কালিদাস উমার মুখ বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

চন্দ্রং শ্রিত পদ্মগুণান্ ন ভুঙ্‌ক্তে, পদ্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমভিখ্যাম্।
উমামুখন্তু প্রতিপদ্যলোলা, দ্বিসংশ্রয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মীঃ॥

লক্ষ্মী (শোভা) চন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া দেখিলেন সেখানে পদ্মের কোন গুণ নাই। আবার পদ্মকে আশ্রয় করিয়া দেখিলেন তাহাতে চন্দ্রের কোন গুণ নাই। তাই চঞ্চলা উমার মুখ আশ্রয় করিয়া চন্দ্র ও পদ্ম এই উভয়ের আশ্রয়-জনিত প্রীতিলাভ করিলেন।

এস্থলে কবির বক্তব্য হইতেছে একটী সোজা কথা—উমার মুখ খুব সুন্দর। কিন্তু সুধু এই কথা বলিলে কবিত্ব হয় না। ইহা ত "লাল ফুল" "ভাল জল" "সোজা পথের" মতন কাব্যগন্ধ বর্জ্জিত নিতান্ত সোজা কথা। তাই কবি এই সোজা কথাটাকে নানাভঙ্গিতে বাঁকিয়া চুরিয়া, ইহার উপর ফুল কাটিয়া, পালিস দিয়া ইহাকে একটী উজ্জল মনোহর বাক্যালঙ্কারে পরিণত করিলেন—যেন একগাছি সোণার তার একজন সুদক্ষ কারিগরের হাতে পড়িয়া একটী কবরীভূষণ গোলাপফুলে পরিণত হইল। বাক্যে এইরূপে বক্ররেখার সাহায্যে রসস্ফূর্ত্তি হয়। ইহারই নাম কাব্য।

কাব্যের কেবল রসসৃষ্টিতে নহে, আখ্যান বস্তুতেও বঙ্কিমরেখার কারচুপি দেখা যায়। মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাসাদির যে আখ্যায়িকা, তাহাও বক্ররেখার সাহায্যে রচিত। এই বক্ররেখা দ্বারাই নায়ক নায়িকার চরিত্র বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যে প্লটে বক্ররেখার কারিগরি যত অধিক তাহাই তত মনোজ্ঞ হয়।

এক ঋষির তপোবনে একটী ঋষিকন্যার সহিত একজন রাজার সাক্ষাৎকার হইল। উভয়ের মধ্যে প্রথম দর্শনেই প্রণয় সঞ্চার হইল। রাজা সেই ঋষিকন্যাকে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। ইহার পরে সেই ঋষিকন্যা রাজদর্শনে গিয়া যদি রাজার দ্বারা গৃহীত হইতেন, তবে এই আখ্যায়িকার এখানেই শেষ হইত। কিন্তু এরূপ মিলনের বিশেষত্ব কি? এরূপ মিলন দ্বারা নায়ক নায়িকার চরিত্রে সৌন্দর্য্য বিকাশের অবসর কোথায়? তাই মহাকবি কালিদাস এই সরল আখ্যায়িকার মধ্যে নানাস্থানে

বক্ররেখা টানিয়া দিলেন। তাহার ফলে মহাভারতের সরল আখ্যায়িকা একটী রত্নাঙ্গুরীয়ের ন্যায় বর্ত্তুলাকার ধারণ করিল। তাহার নাম হইল "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"।

রাজা দুষ্মন্ত গান্ধর্ব্ব বিবাহের পর চলিয়া গেলে, শকুন্তলা অতিথি পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়া, একদিন একাকিনী কুটীরদ্বারে উপবিষ্ট আছেন। তখন দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া বলিলেন "আমি অতিথি"। পতিচিন্তানিমগ্না বাহ্যজ্ঞান-শূন্যা শকুন্তলা ঋষির কথা শুনিতে পাইলেন না। অমনি সেই অবজ্ঞাত তেজোদৃপ্ত ঋষি শাপ দিলেন, "তুই যার চিন্তায় নিমগ্না হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিলি, আমি অভিশাপ দিতেছি, তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেও সে তোকে চিনিবে না।" পূর্ব্বকথিত আখ্যায়িকার সরলরেখা এখানে প্রথম বাঁকিয়া গেল।

শাপ দেওয়ার পর দুর্ব্বাসা চলিয়া গেলেন। কিন্তু প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া ধরিলেন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর তাঁহার রাগ থামিল। তখন তিনি বলিয়া গেলেন "আচ্ছা বেশ। শকুন্তলা অভিজ্ঞান দেখাইতে পারিলে শাপ মোচন হইবে।" শকুন্তলার সখীদ্বয় ইহাতে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, কারণ রাজার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরী ত' শকুন্তলার হাতেই রহিয়াছে।

কিন্তু তাহা থাকিলে কি হয়? মহাকবি জানেন "The course of true love never runs smooth." যথার্থ প্রেমের পথ বক্রগতি। তিনি কি অত সহজে মিলন ঘটাইবেন? তাই তিনি সেই বক্ররেখাটীকে আরও একটু নীচের দিকে টানিয়া দিলেন। শকুন্তলা রাজদর্শনে যাইবার সময় পথে সেই অঙ্গুরীটী হারাইয়া ফেলিলেন। কাজেই রাজা তাঁহাকে আর চিনিতে পারিলেন না, শকুন্তলা পতিকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলেন। এখানে বক্ররেখা নামিতে নামিতে অধোগমনের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মানবের ভাগ্যচক্র একস্থানে স্থির থাকে না। দুর্ভাগ্যের শেষ সীমায় আবার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী মূর্ত্তি দ্বারা অপহৃত হইলে, সেই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীটী ঘটনাক্রমে রাজার হস্তগত হইল। তখনই রাজার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইল, তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ

হইতে লাগিলেন। সেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে যখন তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল, তখন সেই বক্ররেখা আবার উর্দ্ধগামী হইল। দেবরাজের সারথি মাতলি আসিয়া দৈত্যদমনের জন্য রাজাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। সেই স্বর্গধামে দেবর্ষি কশ্যপের পুণ্যাশ্রমে রাজা তাঁহার পত্নী ও পুত্রের সহিত মিলিত হইলেন। এখানে সেই বক্ররেখার দুই মুখ একত্র মিলিত হইল।

মহাকবি বাল্মীকির রচনা আরও বৈচিত্র্যময়ী। রামায়ণ মহাকাব্যের আখ্যায়িকায় বক্ররেখার প্রাচুর্য্যে তাহার উচ্চতা, গভীরতা ও বিশালতা সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মহারাজচক্রবর্ত্তী দশরথ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, এই সময়ে মহিষী কৈকেয়ী বক্রভাব ধারণ করিলেন। মহারাজ তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে দুইটী অভিলষিত বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সেই সত্যরক্ষার জন্য রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। রামচন্দ্রও পিতৃসত্যপালনের জন্য অম্লান বদনে সীতা ও লক্ষণ সহ বনগমন করিলেন। তাঁহার শোকে দশরথ দেহ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু সেই চতুর্দ্দশ বৎসর নির্ব্বিঘ্নে বনে বাস করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে ক্ষতি ছিল কি? তাহা হইল না। তাঁহাদের ভাগ্যরেখা আরও বক্রভাব ধারণ করিল। তাঁহাদের বনবাস কালে রাবণ আসিয়া সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। তাঁহারা দুর্দ্দশার চরম সীমায় পৌঁছিলেন। তখন রাম ও লক্ষণ সীতার অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে সুগ্রীব হনুমান্ প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাইলেন, বালিবধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজা করিলেন, সীতার অন্বেষণে চারিদিকে বানর বীরবৃন্দ প্রেরিত হইল, হনুমান্ লঙ্কায় গিয়া সীতার সংবাদ আনিলেন, পরে তাঁহারা বানরবাহিনী সঙ্গে লইয়া সাগরে সেতু বাঁধিয়া রাবণের পুরী লঙ্কায় উপনীত হইলেন। সেখানে দীর্ঘকালব্যাপী ঘোরতর সংগ্রাম হইল। সেই সংগ্রামে কতবার জিতিলেন, আবার কতবার হারিলেন। এমন কি প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষ্মণের জীবন সংশয় হইয়া সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হওয়ার উপক্রম হইল। ভাগ্যচক্রের এইরূপ আবর্ত্তনের পর পরিশেষে বিজয়লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলেন। রাম রাবণকে সবংশে

নিধন করিয়া জানকীর উদ্ধার সাধন করিলেন। কিন্তু এখানে আবার আখ্যায়িকা-রেখা আর একটু বাঁকিয়া গেল। যে রাম সীতার বিরহে বনে বনে রোদন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, সীতার উদ্ধারের জন্য যিনি দীর্ঘকাল সমরক্লেশ সহ্য করিলেন, তিনি সেই সীতাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া কি করিলেন? তিনি জানকীকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। তখন সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা হইল, সেই অগ্নিপরীক্ষায় বৈদেহীর পুণ্যপ্রভা বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। তখন রাম তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন; এবং ভ্রাতৃবৎসল ভরতের নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আখ্যায়িকার বর্ত্তুল রেখার দুই মুখ এখানে মিলিত হইলেও আবার তাহা বিচ্ছিন্ন হইল। চিরদুঃখিনী জানকীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ে রামচন্দ্র তাঁহাকে বনবাসে প্রেরণ করিলেন। মহাকবি তাঁহার আখ্যায়িকার শেষে আবার এই বক্ররেখা টানিয়া দিয়া রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রেমের অতলস্পর্শ গভীরতা প্রতিপন্ন করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিলেন। পরে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া দিগ্‌বিজয়ার্থে যজ্ঞের অশ্ব প্রেরণ করিলেন, এবং সেই সুযোগে মহামুনি বাল্মীকির আশ্রমে সীতাদেবীর সন্ধান পাইলেন। কিন্তু মহাকবি রামসীতার আর মিলন ঘটাইলেন না। তাঁহার আখ্যায়িকারেখা বর্ত্তুলভাব (Ellipse) ধারণ করিয়া যে পুনর্ব্বার বিচ্ছিন্ন হইল, তাহা প্যারাবোলার মতন (parabola) মতন দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া অনন্ত আকাশে উড্ডীন হইল। মিলনান্ত আখ্যায়িকা বর্ত্তুলাকার, বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা প্যারাবোলার ন্যায় অনন্তগামী। বঙ্কিমরেখাসমন্বিত উভয়বিধ আখ্যায়িকাই বাগ্‌দেবীর কণ্ঠের মণিমুক্তা বিমণ্ডিত "পুষ্পহার"।

আমরা এইরূপে দেখিলাম যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বঙ্কিমরেখার সাহায্যে বিকাশ লাভ করে, সেইরূপ মানব চরিত্রের সৌন্দর্য্যও বক্ররেখার দ্বারা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। মানব শিল্পীর হস্তে যাহা বক্ররেখা, বিশ্বশিল্পী বা মহাকালের হস্তে তাহাই দশাবিপর্য্যয়। যে কবি কালের এই কুটিলগতি যত অধিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন, এবং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া

তাঁহার কাব্যে বক্ররেখার সাহায্যে তাহা প্রতিফলিত করিতে পারেন, তাঁহার কাব্যরচনা তত অধিক সফলতা লাভ করে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

সেই আর এই।

একবার দেখ! অমানিশার সূচিভেদ্য তমিস্রা ভেদ করিয়া দেখিতে পারিবে কি? কেবলই কি তমোময়ী রজনী! মহাশ্মশানে অমাবস্যার ঘোর বিকাশ; তাহার উপর বর্ষার ঘন ঘটা! উপরে ঘন ঘন বিদ্যুদ্বিকাশ, যেন রাক্ষসীর লোলজিহ্বা লহ-লহ করিয়া তাহার ব্যাদান মুখমণ্ডল গগনমণ্ডল হইতে বিস্তারিত হইয়া, মেদিনীর বক্ষকে শোষণ করিবার জন্য বারে বারে ব্যর্থ উদ্যম করিতেছে! নিম্নে অসীম কান্তারে অগণ্য চিতা চুল্লীর অগ্নি-জিহ্বাসকল নীলিম জ্যোতিঃফলক বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে। এই স্বর্গমর্ত্ত্যের আলোর খেলায় নিশীথিনীর ঘন তমিস্রা যেন প্রকট হইয়া উঠিতেছে! এই অন্ধকারকে ভেদ করিয়া ফেরুপাল হাহা করিয়া দিগ্বিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। স্তব্ধগগন পবনশব্দে মুখর হইতেছে। একবার দেখ! নয়নময় হইয়া শ্মশানকালীর নৃত্যরঙ্গ একবার দেখ!

(১)

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য সেকালের মানুষ। ব্রাহ্মণও বটেন, পণ্ডিতও বটেন; তবে আজকালকার হিসাবে ব্রাহ্মণপণ্ডিত নহেন। মৃত্যুঞ্জয়ের সংসারে পাঁচজন বাস করিত। তিনি ও তাঁহার পত্নী সর্ব্বমঙ্গলা, পুত্র বামদেব; শালগ্রাম শিলা দামোদর এবং বুধি গাই। পাথরের নুড়ী দামোদরকে এবং গবী জাতীয়া বুধিকে মৃত্যুঞ্জয়ের সংসারভুক্ত করিবার একটু হেতু আছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দামোদরের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ

করিতেন না ; বুধির অনুমতি না লইয়া বিদেশে শিষ্যবাড়ী যাইতেন না। দামোদর তাঁহার বুদ্ধি, বুধি তাঁহার মঙ্গলামঙ্গলের পরিচায়ক। সুতরাং বুধি ও দামোদর তাঁহার সংসারের দুইজন।

মৃত্যুঞ্জয় বাচস্পতির দশটি ছাত্র ছিল, দশবিঘা জমি ব্রহ্মত্রাণ ছিল। বাড়ির পূর্ব্বপার্শ্বে একটী পুষ্করিণী, দক্ষিণে গোশালা ও মরাই, উত্তরে বাঁশবন ও বাগান, পশ্চিমদিকে ঠাকুরঘর ও তাঁহার পার্শ্বে চণ্ডীমণ্ডপ। বাড়ির সকল ঘরগুলিই খড়ের। বাচস্পতি নিত্য স্বহস্তে দামোদরের সেবা করিতেন ; পূজা আরতি ভোগরাগ দিয়া ঠাকুরের প্রসাদ পাইতেন। সর্ব্বমঙ্গলা গো সেবা করিত ; দুরন্ত পুত্র রামদেবকে সামলাইয়া রাখিত। মৃত্যুঞ্জয় কখনই কাহারও কাছে বলিতেন না যে, আমার সংসার, আমার ঘর বাড়ি। তিনি বলিতেন, দামোদরের সংসার আমি প্রসাদ পাই মাত্র। শিষ্যবাড়ি যাইয়া নিজের জন্য কখনও কোন কিছুর প্রার্থনা করিতেন না ; বলিতেন, আমার দামোদরের ইহা চাই, উহা চাই! দামোদরের প্রসাদ ছাড়া তিনি খাইতেন না, দামোদরকে নিবেদন না করিয়া তিনি বস্ত্রাদি কিছুই ব্যবহার করিতেন না। দামোদর তাঁহার সঙ্গের সাথী ছিল—কণ্ঠের হার, মাথার মণি ছিল। বাচস্পতি জলযান নৌকা ছাড়া, কখনও অন্য কোন যানে চড়েন নাই। তিনি বলিতেন আমি দামোদরের বাহন, আমার আবার বাহন কে?

এতবড় বৈষ্ণবভক্ত মৃত্যুঞ্জয়, তাঁহার টোল ছিল বেদান্তদর্শনের। কাশীতে থাকিয়া তিনি বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন। তাঁহার গুরু ছিলেন একজন দণ্ডী। তিনিও মনে মনে দণ্ড গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন মণিকর্ণিকায় স্নান করিতে যাইয়া, তিনি দামোদরকে কুড়াইয়া পান। গুরু শিলা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ইহা গৃহীর সেব্য। তুমি যখন পাইয়াছ, তখন তোমার সেবা উনি চাহেন। অতএব তোমাকে গৃহী হইতে হইবে। ইহাই ভগবানের ইঙ্গিত। তুমি দেশে যাইয়া ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ কর, পৈতৃক ভিটায় দামোদরের স্থাপনা কর। সংসার দামোদরের, তুমি সেবক মাত্র। সংসারের ভাবনা দামোদর ভাবিবেন, তুমি সেবা করিয়া খালাস।

গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দামোদরকে গলায় ঝুলাইয়া, মৃত্যুঞ্জয় কাশী হইতে পদব্রজে স্বগ্রামে আসিয়াছিলেন। সেই অবধি

দামোদরের বাহন হইয়া মৃত্যুঞ্জয় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। দামোদরের কৃপায় মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরসংসার হইল। পত্নী হইল, পুত্র হইল, ধান পান জমিজেরাৎ, গোবৎস, ছাত্র শিষ্য, খ্যাতি প্রতিপত্তি সবই হইল। মৃত্যুঞ্জয় সুখী হইলেন। তাই দামোদরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি কোন কার্য্য করিতেন না। মানুষে যেমন মানুষের সহিত কথা কহে, মৃত্যুঞ্জয়ও তেমনি ভাবে দামোদরের সহিত কথা কহিতেন। প্রাত্যহিক ভোগরাগের পরামর্শ দামোদরের সহিত হইত; বিষয় আশয়ের কথা দামোদরকে না জানাইলে চলিত না। কে জানে দামোদরের কেমন মহিমা তাঁহার পরামর্শ অনুসারে মৃত্যুঞ্জয় যাহা করিত, তাহাতেই সাফল্য লাভ করিত। তাই লোকে বলিত যে, দামোদর জাগ্রত দেবতা এবং মৃত্যুঞ্জয় কৃপাসিন্ধু সেবক। এই হেতু মৃত্যুঞ্জয়ের বহুশিষ্যশাখা জুটিয়াছিল। তাহারা দামোদরের সেবায় পর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় করিত। মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ পাইতেন ও পাড়া প্রতিবাসীদিগকে প্রসাদ বণ্টন করিয়া সুখী হইতেন।

সর্ব্বমঙ্গলা স্বামীর যোগ্য পত্নীই ছিলেন। তিনি প্রত্যহ পাটঝাঁট সারিয়া স্নান করিয়া আসিয়া দামোদরের ঘরের দরজায় মাথা কুড়িতেন আর বলিতেন, "ঠাকুর আমিত তোমারই, একটা সন্ন্যাসী ফকিরকে ধরিয়া গৃহী সাজাইয়াছ, আর তাহারই ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া আছ। আমার স্বামীর যদি বুদ্ধি বিগড়ায়, ভাগ্য মন্দ হয় ত, তুমিই আছ আর আমিই আছি।" গুজব এই যে, সর্ব্বমঙ্গলার আবদার শুনিয়া দামোদর হাসিতেন। বুধি গাই সর্ব্বমঙ্গলার বাপের বাড়ি হইতে আসিয়াছিল। বুধি ঘনঘোর কৃষ্ণকায়া গবী, ছোট্ট-খাট্ট, শান্ত জীব। বুধি দুই বেলায় চারিসের দুধ দিত, তাহাতেই দামোদরের সেবা চলিত। বুধি বড়ই সুলক্ষণা গরু। বুধির সহিতও মৃত্যুঞ্জয় কথাবার্ত্তা চালাইতেন। তবে বুধির সঙ্গিনী ছিল স্বয়ং সর্ব্বমঙ্গলা। সর্ব্বমঙ্গলা বুধির সকল মনের ভাব বুঝিতে পারিত। ইদানীং বামদেবের জন্মগ্রহণের পর সংসারে আরও দুই তিনটি গবী হইয়াছিল; কিন্তু বুধি তাহাদের কাছে যাইত না। বুধি সিঙ্ না নাড়িলে, হাম্বারব করিয়া না ডাকিলে, মৃত্যুঞ্জয়ের যাত্রা করা হইত না। শিশু বামদেব গরুবাছুরের সহিত খেলা করিত, তাহাদের সঙ্গী ছিল।

মৃত্যুঞ্জয় কখনও জুতা পায়ে দেয় নাই, জামাজোড়া পরে নাই। যখন শিষ্যবাড়ি যাইত, তখন সঙ্গে দামোদর থাকিতেন, তাই পথ চলিতে এক বাঁশের ছাতা মাথায় দিত, পাছে দামোদরের রৌদ্র লাগে, কষ্ট হয়। "ত্বয়া হৃষীকেশ, হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"—এই মহাবাক্যের সার্থকতা এ জীবনে মৃত্যুঞ্জয়ই করিতেছিল। সে হৃদয়ের হৃষীকেশকে দামোদরে আরোপ করিয়া সংসারের সু-কুয়ের দ্বন্দ্ব মিটাইত। মৃত্যুঞ্জয় জানিত যে, তাহার গৃহসংসার তাহার নহে, দামোদরের ; গুরু সে নহে দামোদর। মৃত্যুঞ্জয় নিমিত্ত মাত্র হইয়া দামোদরের ইঙ্গিত অনুসারে সকল কাজ করিত। তাই মৃত্যুঞ্জয় সুখী, নির্ব্বিরোধী ছিলেন। ইহাই বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের আদর্শ, এই ব্রাহ্মণ ছিল, এখনও যোগদন্ড কোথায়ও লুকান আছে, তাই বাঙ্গালায় হিন্দুসমাজ এখনও কতকটা সজীব আছে। এই ভূদেব ব্রাহ্মণ যখন অন্তর্হিত হইবেন, তখন বাঙ্গালা শ্মশান হইবে।

(২)

বাবু কামিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল হাইকোর্টের উকীল, খুব উপার্জ্জনশীল, খুব বাবু। তাঁহার পিতা রামনাথ ভট্টাচার্য্য গ্রামে পৌরহিত্য করিতেন। রোডসেসের হাঙ্গামায় সাড়ে তিন বিঘা ব্রহ্মত্রাণ হস্তান্তরিত হওয়ায় রামনাথের দুঃখের সীমা ছিল না। এ দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে রামনাথ ভিক্ষাশিক্ষা করিয়া ছেলেকে ইংরেজি লেখাপড়া শিখাইল ছেলেও ধীমান্ ও উদ্‌যোগী। টপাটপ্ পাশ করিয়া নিজের দুঃখীরাম নাম ঘুচাইয়া রাম পুরোহিতের ছেলে বাবু কামিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, হইল। বলিতে পার ভট্টাচার্য্যের পুত্র কুলীনের উপাধি চট্টোপাধ্যায় হইল কেমন করিয়া ? উত্তরে বলিব—পাশের জোরে ; রাম পুরোহিতের কাশ্যপ গোত্র ছিল, কুলীন চট্টোপাধ্যায় সবাই কাশ্যপ গোত্র, অতএব কামিনীকুমারও চট্টো-পাধ্যায়। এমনত আজকাল অনেকেই মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় হই-তেছে। অথচ ইহাদেরই অনেকে আবার জাতিভেদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ঝাড়ে, সব একাকার করিতে চাহে। নিজেরা ভট্টাচার্য্য হইয়া পরিচিত থাকিতে চাহেন না, সেটা যে বড় ছোট উপাধি! কামিনীকুমারের কিছুরই অভাব নাই,—বাড়ি, গাড়ি, জুড়ি, মোটর, বাগান সবই আছে। ছেলেরা সব এক একটি

লাট পুত্র—ইয়া টেড়ি, ইয়া চসমা—কোন কিছুরই ক্রটি নাই। বাড়িতে রসুয়ে বামুন আছে। বাবুর্চ্চি চাচা আছে, ছিটে ডোমও আছে। বামুন শাক চচ্চড়ি, কলায়ের দাল রাঁধে,—বাবুরচী পোলাও কালিয়া রাঁধে, যা ভগবতীর সেবা করে, কেবল পারে না বরাহ অবতারের ব্যবস্থা করিতে; তাই ছিটে ডোমও আছে। উঃ সে রব্‌রবা কেমন! ঘন ঘন ছেলেমেয়ে বিলাত যাতায়াত করিতেছে; দুই একটা বোকা ছেলে মেম বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ সাহেব বিবাহ করিতে পণ করিয়াছে।

সহসা কামিনীকুমার ডিস্‌পেপসিয়া—ডায়াবিটিজ ইতি 'ড'কারাদি রোগে পীড়িত হইয়া ইহধাম ত্যাগ করিলেন। ছেলেদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইল, মামলাবাজি ঢুকিল, কামিনীকুমারের সুখের সংসার তাসের ঘরের মতন ভাঙ্গিয়া পড়িল। ছেলেদের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। তাহারা না ইংরেজ না বাঙ্গালী হইল—ধোবী কা কুত্তা ন ঘরকা ন ঘাটকা। সাহেব সাজা পয়সার খেলা; সে খেলাত আর খেলিবার উপায় নাই। হিন্দু হইয়া থাকিতে হইলে চাই মনুষ্যত্ব—সংযম, ত্যাগ, সন্ন্যাস না থাকিলে হিন্দু হইয়া থাকা যায় না। কাজেই কামিনীকুমারের ছেলেরা ফিরিঙ্গী হইয়া গেল। সামাজিক হিসাবে কামিনীকুমার নির্ব্বংশ হইলেন।

(৩)

তাই বলিতেছিলাম—একবার দেখ! যাহা ছিল তাহা দেখ, আর যাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তাহা দেখ। দেখিলে ও দেখাইতে পারিলে "তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী।" কিসে তেমন তৃপ্তি হয় তাহা পরে বলিব।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

একখানি কুলগ্রন্থ

ও

নূতন ঐতিহাসিক তথ্য।

অতীতের অন্ধকারময় গহ্বরে যে কত রত্ন লুক্কায়িত আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? ইতিহাসেরও উপাদান যে কতস্থানে গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বঙ্গদেশের ইতিহাসালোচনা করিতে হইলে, কুলগ্রন্থগুলিকে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। কিন্তু আজকাল কেহ কেহ কুলগ্রন্থের কোন কথায় আস্থা স্থাপন করিতে চাহেন না। অবশ্য সমস্ত কুলগ্রন্থই যে ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ সে কথা আমরাও বলি না, তাই বলিয়া কুলগ্রন্থকে একেবারে অগ্রাহ্য করাও যুক্তিযুক্ত নহে। আমরা অদ্য একখানি কুলগ্রন্থের পরিচয় দিতেছি। সাধারণে দেখিবেন, তাহা কিরূপ নব নব ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ সবডিবিসনের পুরুড়া বা পুরুড়ানিবাসী দেববংশীয়গণের নিকট এই কুলগ্রন্থখানি সযত্নে রক্ষিত আছে। তদ্বংশীয় কিশোরগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দেবরায় ও আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দেব রায় উক্ত গ্রন্থখানি আমাদিগকে দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দেব রায় মহাশয় গ্রন্থখানি আমাদের নিকট আনিয়াছিলেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটও তাঁহারা গ্রন্থখানিকে পাঠাইয়াছিলেন। গ্রন্থখানি ১৬০২ শকে লিখিত। "ইতি শকনরপতেরতীতাব্দা ১৬০২ সৌরবৈশাখস্য পঞ্চমদিবসে" এই কথাটী ইহার শেষে লিখিত আছে। লেখা ও কাগজ দেখিয়া তাহাই বলিয়া বোধ হয়। নগেন্দ্র বাবুও তাহাই অনুমান করেন। শুনিয়াছি রাখালবাবুও তাহাই বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, গ্রন্থখানি যে আধুনিক নহে, তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। আবার সেখানি একখানি পুরাতন গ্রন্থের নকল বলিয়াই বোধ হয়। কারণ তাহার একস্থলে

"একপত্রং নাস্তি" লিখিত আছে। এই কুলগ্রন্থখানি দেববংশের পরিচয়ে পূর্ণ। যে দেববংশীয়গণ বাঙ্গলার ইতিহাসের সহিত বিশেষরূপে বিজড়িত, ইহা তাঁহাদেরই পরিচয়। আমরা নিম্নে গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। ক্রমে আমরা ঐতিহাসিক টীপ্পনী সহ গ্রন্থখানি প্রকাশের চেষ্টা করিব।

বন্দ্যঘট্ট দেবকুল কর্ণসেনী নামে খ্যাত। তাঁহারা শাণ্ডিল্যগোত্রীয়। দেবগণ হরিদ্বার হইতে মগধে আসিয়া বাস করেন। পূর্ব্বে তাঁহারা দেবভূমি ব্রহ্মাবর্ত্তের হ্রদকূলে বাস করিতেন। তাঁহারা ক্ষত্রপ কায়স্থ, দ্বিজ ও ক্ষত্রিয়-কুলসম্ভব *। দাতাকর্ণসম ক্ষত্রপ রাজা কর্ণসেন কর্ণ ও ভাগীরথীর সন্ধি-স্থলে কর্ণপুর স্থাপন করেন। তিনি কর্ণস্বর্ণ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র বৃষকেতুর অন্নপ্রাশনের সময় লঙ্কেশ্বর বিভীষণ কর্ণস্বর্ণে উপস্থিত হইয়া সুবর্ণবৃষ্টি করেন, সেইজন্য তাহার নাম কর্ণস্বর্ণ হয়। দেববংশীয়েরা কর্ণপুরে সমাগত হইয়া রাজাকর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে বিভক্ত হন। তাঁহারা শাণ্ডিল্য, মৌদ্গল্য, বাৎস্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, ঘৃতকৌশিক ও আলম্যান এই সপ্তগোত্রীয় ছিলেন। শাণ্ডিল্য দেবগণ কুলনায়ক হন। রণপরায়ণ দেবগণ কর্ণস্বর্ণে থাকিয়া নানাস্থানে রাজ্য স্থাপিত করিতে আরম্ভ করেন। শাণ্ডিল্য দেবগণ গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থল কণ্টকদ্বীপে (কাটোয়া) রাজ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই বংশে সূর্য্য ও ইন্দ্রতুল্য সুরদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম দূর করিয়া সনাতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। † সুরদেবের পুত্র বিখ্যাত দনুজারি দেব। তিনি বেদবিদ্ ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ। সেনরাজগণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল এবং তিনি লক্ষ্মণের মিত্র ছিলেন। দনুজারি পালরাজদিগের নিকট হইতে বরেন্দ্র অধিকার করিয়া গৌড় রাজাভুক্ত করেন ‡। তিনি

* "ক্ষত্রপকায়স্থা দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভবাঃ"

† এক্ষণে যে সুরনগর সুরবংশীয়দিগের রাজধানী বলিয়া কথিত হইতেছে, সম্ভবতঃ তাহা এই সুরদেবেরই স্থাপিত।

‡ "সেনরাজ সম্পর্কোঽসৌ লক্ষ্মণস্য সুহৃন্মুনেঃ।
বরেন্দ্রং পালরাজেভ্যো গৌড়রাজ্যভুক্তং চক্রে॥"

সামন্ত বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন। দনুজারি অগ্রদ্বীপে ও নবদ্বীপে মহাকাল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার পর যবনাক্রান্ত হইয়া লক্ষণ তীর্থস্থানে গমন করেন। তাঁহার পুত্র মাধব ও দনুজারি অনেক দিন ধরিয়া যবনগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দনুজারি ভাগীরথীসলিলে দেহত্যাগ করেন। তিনি শ্রীশ্রীচণ্ডীপরায়ণ বন্দ্যবংশীয় মকরন্দের পুত্র দাশরথিকে কণ্টকদ্বীপে স্থাপন করেন, এবং তাঁহার পাঁচপুত্রকে হরিকোটি, নৈহাটি, লাট-গ্রাম, পৈর ও নবচর নামে পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। যবনপ্রাধান্য হওয়ায় মাধব বরেন্দ্রভূমে চলিয়া যান।

দনুজারির পুত্র হরিদেব কণ্টকদ্বীপ হইতে পাণ্ডুনগর গমন করেন। তাহার নারায়ণ নামে পুত্র জন্মে। নারায়ণের পুরন্দর ও পুরজিৎ নামে দুই পুত্র হয়। পুরন্দর সন্ন্যাসী হন। পুরজিতের আদিত্য নামে মহাতপা পুত্র জন্মে। শ্রীশ্রীচণ্ডীপরায়ণ দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্র নামে আদিত্যের দুই পুত্র হয়। ইঁহারা পাণ্ডুনগরের অধিপতি হইয়াছিলেন। * দেবেন্দ্রের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মহেন্দ্র। ইনি যবনদিগকে দূরীভূত ও কংসকুল নিহত করিয়া পাণ্ডুয়ায় দেবরাজ্য স্থাপন করেন। † মহেন্দ্র দুষ্টঘাতক কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র দনুজ-মর্দ্দন রাজা হন। তিনি বন্দ্যবংশীয় চন্দ্রাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দনুজমর্দ্দন যবনদিগকে মর্দ্দন করিয়াছিলেন। ‡ কিন্তু পরিশেষে গুরুর আদেশে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য সপরিবারে সমুদ্রোপকূলে গমন করেন, এবং রণচণ্ডী ও কালিকাকে প্রসন্ন করিয়া একটী নবোত্থিত দ্বীপে রাজ্যস্থাপন ও গুরুর প্রীতির জন্য তাহার চন্দ্রদ্বীপ নাম প্রদান করেন। দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপকে কামান, কিল্লা ও নৌকাদ্বারা সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি ৫৬ বৎসর (যুগত্রয়) রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজ্যের সীমা এই—উত্তরে ইচ্ছামতী; দক্ষিণে সমুদ্র; পূর্ব্বে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র); পশ্চিমে মধুমতী। দনুজ-

* "দেবেন্দ্র-ক্ষিতীন্দ্রদেবৌ শ্রীশ্রীচণ্ডীপরায়ণৌ।
রণচণ্ডীপ্রসাদাচ্চ বিভূতৌ পাণ্ডোয়াধিপৌ॥"

† "যবনাংশ্চ দূরীকৃত্য কংসকুলং নিহত্য চ।
পাণ্ডুয়ায়াং দেবরাজ্যমনেনৈব প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

‡ "দনুজান্ যবনান্ রাজা মর্দ্দয়েন বিধর্ম্মিণঃ।"

র্দ্দনের পুত্রের নাম রমাবল্লভ। রমাবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ। কৃষ্ণবল্লভের পুত্র হরিবল্লভ। হরিবল্লভের পুত্র জয়দেব। জয়দেবের পর চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য দৌহিত্র বসুবংশগণ কর্তৃক উত্তরাধিকারীত্বসূত্রে অধিকৃত হয়। তাঁহারা দেব-বংশীয়দিগকে গুপ্ত ঘাতকদ্বারা নিহত করিয়াছিলেন।

ক্ষিতীন্দ্র কণ্টকদ্বীপের গোষ্ঠীপতি হন। যবনপ্রাধান্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুবুদ্ধির্ণা গুরু পুরোহিত সহ ব্রহ্মপুত্রের নিকট সমুদ্রোপকূলে পুরুল্যা (বর্ত্তমান পুড্ডা বা পুরুড়া) গ্রামে আসিয়া বাস করেন। * তাঁহার সহিত হরিদেব এবং তৎকালে দত্ত, নন্দী ও কাঞ্জিলালবংশীয়গণ আসিয়াছিলেন। হরিদেব পুরুড়ার (পুড্ডার) দক্ষিণবর্ত্তী চরতল (বর্ত্তমানে চাতল্) † নামক জনপদে বাস করেন। ইহাই কুলগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ইহাতে কত ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা কুলগ্রন্থখানি প্রকাশের সহিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলি বিশ্লেষণের চেষ্টা করিব।

আত্মগ্লানি।

(১)

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ডেপুটী, প্রতিভাবলে তিনি ক্রমে ক্রমে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইতেছেন। উপরওয়ালা-দিগের নিকটও তাঁহার যথেষ্ট খাতির আছে। কালে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ারও আশা রাখেন। কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ বলিয়া পুত্র চারুচন্দ্রকে অগ্রেই

* এই সুবুদ্ধির্ণার বংশধর উক্ত পুড্ডাগ্রাম নিবাসী হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দেবরায় মহাশয় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কিশোরগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দেব রায় এবং তাঁহাদের অপরাপর জ্ঞাতিগণ অদ্যাপি পুরুল্যা (পুড্ডা) গ্রামে বাস করিতেছেন। পুরুল্যা যে পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলে ছিল সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

† চাতল্ গ্রামে অদ্যাপি শাণ্ডিল্যগোত্রীয় দেববংশীয় একটি পরিবার বর্ত্তমান আছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। চারুচন্দ্রের বয়স বিশ বৎসরের কিছু অধিক হইবে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরে তাহা বিশ বৎসর বলিয়াই লিখিত ছিল। চারুচন্দ্র বি. এ, পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। নবীনচন্দ্র তাঁহাকে সিবিলসার্ব্বিস্ পরীক্ষা দেওয়াইবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। নবীনচন্দ্রের পত্নী কমলা কিন্তু ইহাতে সম্মত ছিলেন না, তিনি একমাত্র পুত্রকে সাত সমুদ্র তেরনদী পারে পাঠাইয়া কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিবেন, ইহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়েন, তদ্ভিন্ন জাতি যাওয়ার ভয়টাও তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। বিশেষতঃ কন্যা প্রভাবতীর সহিত একেবারে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে জানিয়া তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে কঠোর বেদনাই অনুভব করিতেছিলেন। প্রভাবতীও তাঁহার একমাত্র কন্যা। তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে সম্ভ্রান্ত বংশ, কাজেই তাঁহারা আবার দশজনের সহিত নানাসম্বন্ধে জড়িত থাকায়, পুরাতন আচার ব্যবহারই প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। সেইজন্য প্রভাবতীর পিতৃকুলে কোনপ্রকারে নূতন প্রথার প্রচলন হইলে তাঁহার পতিকুল যে তাহাতে সম্মতি দিবেন না, অধিকন্তু তাহাদের সহিত একেবারে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবেন, ইহাই কমলার মনে উদয় হইয়াছিল। নবীনচন্দ্র তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কমলা কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছিলেন না। নবীনচন্দ্র বলিলেন,—"দেখ ছেলে ম্যাজিষ্ট্রেট হইবে, কমিশনার হইবে, এমন কি নিয়মের একটু পরিবর্ত্তন হইলে কালে ছোটলাটও হইতে পারে, বাপ মা ছেলেকে বড় পদেই দেখিতে চায়।"

কমলা।—"তাবটে, কিন্তু ছেলে কোথায় যাইবে মনে হইলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তারপর জাতি গেলে কেহ যখন আমাদের ছায়াটি পর্য্যন্ত মাড়াইবেনা, এমন কি আমার একমাত্র মেয়েও আমার দুয়ারে আসিবেনা, তখন আমাদের কি উপায় হইবে বল দেখি?"

নবীন।—"আমাদের জাতি মারে কে, আর জাত যাইবেই বা কেন? একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সমস্ত মিটিয়া যাইবে।"

কমলা।—"হাঁগা আমি শুনেছি বিলাতে গেলে সাহেবদের নাকি প্রায়শ্চিত্ত হয় না।"

নবীন।—"কে বল্লে সে কথা, প্রায়শ্চিত্ত সকলেই করতে পারে। তুমি কোথা হ'তে একটা মিথ্যা কথা শুনেছ।"

কমলা।—"তা প্রায়শ্চিত্ত করিলেই কি সকলে জাতিতে লইবে?"

নবীন।—"নিশ্চয়ই।"

কমলা।—"প্রভাবতীর শ্বশুর বাটীতে যেরূপ নিষ্ঠা, তাহাতে তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও আমাদের সহিত ব্যবহার করিবে কিনা সন্দেহ।"

নবীন।—"কেন করিবে না? অবশ্যই করিবে। সে তখন আমি দেখিয়া লইব, এক্ষণে তুমি মত দেও। আমি চারুর বিলাত যাত্রার আয়োজন করি।"

কমলা।—"আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা। আমার মনের মধ্যে সর্ব্বদাই তোলপাড় করিতেছে, তুমি আর কাহারও সহিত পরামর্শ করিয়াছ কি?"

নবীন।—"আর কাহার সহিত পরামর্শ করিব? তবে একবার রামহরিবাবুকে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা আছে, তিনি আমাদের মুরুব্বী কিনা, একবার তাঁহাকে কথাটা জানান ভাল।"

কমলা।—"আচ্ছা দেখ তিনিইবা কি বলেন, তাঁহার বয়স হয়েছে, অনেক দেখা শুনা করিয়াছেন, তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা ভাল।"

নবীন।—"তা যেন করিলাম। এখন তুমি মন স্থির কর, ছেলের যাহাতে ভাল হয়, মাবাপের তাহারই চেষ্টা করা উচিত। যাহা হউক একবার রামহরি বাবুর কাছে কথাটা তুলিতেই হইবে।"

তাহার পর নবীনচন্দ্র এ বিষয়ের পরামর্শজিজ্ঞাসার জন্য রামহরি বাবুর নিকট গমন করিলেন।

(২)

রামহরি বাবু সেকেলে ডেপুটী, জাতিতে কায়স্থ, তাঁহাদের উপাধি ঘোষ। পূর্ব্বে তাঁহাদের অবস্থা ভালই ছিল। তাঁহারা দেশের মধ্যে সম্ভ্রান্ত জমীদার বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিলেন। বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় জমিদারী বহু অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন প্রথানুসারে তাঁহাদের বাটিতে বারমাসে তেরপর্ব্ব হইত।

তজ্জন্য জমাজমির এরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, তাহা কখনও পড়িবার সম্ভাবনা ছিলনা। নিজ অংশে সম্পত্তির সেরূপ আয় না থাকায় রামহরি বাবুকে চাকরী গ্রহণ করিতে হয়, এবং সম্রান্ত বংশের সন্তান বলিয়া তিনি সহজেই ডেপুটী পদ পাইয়াছিলেন। আশৈশব নিজ পরিবারের আচার ব্যবহার পালন করিয়া আসায়, এবং উচ্চশিক্ষার মাদকতা তাঁহাকে স্পর্শ না করায়, রামহরি বাবুর চালচলন সাদাসিধে রকমেরই ছিল। তদ্ভিন্ন তিনি একজন চিন্তাশীল লোক ছিলেন। রামহরি বাবু ডেপুটি পদের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন, এবং সত্বরই অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। নবীন বাবুর সহিত তিনি একস্থানেই কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি বয়োবৃদ্ধ ও কর্ম্ম-প্রবীণ হওয়ায়, নবীন বাবু অনেক সময়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সেই জন্য তিনি চারুচন্দ্রকে বিলাত পাঠান সম্বন্ধে রামহরি বাবুর মত জানার অভিলাষ করিয়াছিলেন।

কাছারী হইতে আসিয়া একটু সান্ধ্যভ্রমণের পর রামহরি বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া যখন সটকার নল হইতে নিজমুখে ধূম্রপ্রবাহের চালনা করিতে ছিলেন, সেই সময়ে নবীনচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীন বাবু তামাক খাইতেন না, কাজেই রামহরি বাবু তাঁহাকে আর তজ্জন্য অভ্যর্থনা করিলেন না। দুই জনে বসিয়া নানা কথা আলোচনার পর নবীন বাবু বলিলেন—"আমি একটী বিষয়ের পরামর্শ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এ বিষয়ে আপনার মত কি?"

রামহরি।—"বিষয়টী কি শুনি?"

নবীন।—"চারু প্রশংসার সহিত বি. এ. পাশ করিয়াছে, আমি মনে করিতেছি, তাহাকে সিবিল সার্ব্বিস্ দেওয়ার জন্য বিলাত পাঠাইব।"

রামহরি বাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন;—"আমার সেটা কিন্তু ভাল বোধ হইতেছে না।"

নবীন।—"কেন বলুন দেখি?"

রামহরি।—"এ বিষয় আমি যাহা যাহা ভাবিয়াছি, তাহা তোমাকে বলিতেছি। প্রথমতঃ খরচের কথা। এক্ষণে যাহা তুমি বেতন পাইতেছ, তাহার অর্দ্ধেক তোমাকে দিতে হইবে। অবশ্য তুমি বলিবে যে আমার একমাত্র পুত্র,

তাহারই জন্য সঞ্চয় করিতাম, না হয় তাহার শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলাম, কেমন ?"

নবীন।—"হাঁ আমিত তাহাই বলিব।"

রামহরি।—"অবশ্য এই ব্যয়ে যে শিক্ষা লাভ হইবে, তাহার ফলে তোমার পুত্র তোমার সঞ্চয়ের অপেক্ষা যদি অধিক উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিতে পারে, তবে ওকথা বলা যায় বটে। কিন্তু তোমার পুত্র যে সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় পাশ হইবে ইহা অনিশ্চিত। হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, সুতরাং একটা অনিশ্চিত বিষয়ের জন্য এত গুলি অর্থব্যয় করা সঙ্গত নহে।"

নবীন।—"আচ্ছা আপনি আর কি বলিতে চান, বলুন।"

রামহরি।—"তাহার পর জাতি যাওয়ার একটা গোল আছে।"

নবীন।—"সেটা কিছু নহে, আজকাল জাত মানেবাই কে, আর কারইবা জাত আছে! এখানে ফিরিয়া আসিয়া একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইবে।"

রামহরি।—"অবশ্য আজকাল জাতিবিচার কমিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু এখনও আমাদের সমাজের ধ্বংস হয় নাই। কতক লোকে জাতি মানিতেছে, কতক আবার মানিতেছে না। তাহা হইলে দেখ, সমাজটা দুইভাগ হইয়া যাইতেছে, সেজন্য সমাজের শক্তি কমিয়া আসিতেছে। এই দুই ভাগের একটির লোপ না হইলে, সমাজশক্তির কোনই বল থাকিবে না। তবে কোন্ ভাগের লোপ হওয়া উচিত, তাহার কথা বলিতে গেলে অনেক সময় আবশ্যক। মোটামুটি বলিতে গেলে এই বলা যায় যে, যে ভাগ মূল শিকড়ের সহিত জড়িত আছে, তাহাকে সহজে উপড়ান চলিবে না, বরঞ্চ যাহা নূতন গজাইতেছে তাহাকে একটু চেষ্টা করিলে ছিঁড়িয়া ফেলা যায়। আর যে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিতেছ, শুনিতেছি ব্রাহ্মণেরা বারবার অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে নাকি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ব্যবহারযোগ্য হইতে পারেন না।"

নবীন।—"দুই একটা পণ্ডিত ঐরূপ বলিয়া থাকে বটে, তাহারা বঙ্গবাসীর দলের। তাদের মতের কোনই মূল্য নাই।"

রামহরি।—"যখন প্রায়শ্চিত্তে মতভেদ থাকিল, তখনত আবার তাহাতেও গোল বাঁধিল। এখানেও সমাজের লোক আবার দুইভাগে বিভক্ত হইল।

আচ্ছা, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পুত্র বিলাত গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে কেন?"

নবীন।—"অভক্ষ্যাদি ভক্ষণ করিতে হইবে বলিয়া। সমুদ্রযাত্রার কথা আজ কাল কেহ ধরিতেছে না।"

রামহরি।—"তাহাত বুঝিলাম, কিন্তু লোকে প্রায়শ্চিত্ত করে কেন?"

নবীন।—"কোন একটি দোষ বা পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।"

রামহরি।—"তাহা হইলে তোমার পুত্র শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য যে বিলাত যাইবে, তাহা কি তাহার অথবা তোমার মনে দোষ বা পাপ বলিয়া বোধ হইবে?"

নবীন।—"না তাহাই বা স্বীকার করিব কেন?"

রামহরি। "তাহা হইলে যাহা তোমাদের নিকট দোষ বা পাপ নহে, এবং যাহার জন্য কোন অনুতাপ না জন্মায়, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্তের কোনই প্রয়োজন নাই, এবং সেরূপ লোকে প্রায়শ্চিত্তের অধিকারীও নহে।"

নবীন।—"তবে লোকে করিয়া থাকে বলিয়া করিতে হয়।"

রামহরি।—"যাহারা এরূপ করে, তাহাদের উহা ভান ব্যতীত আর কিছুই নহে। এরূপ লোকেরা সমাজশক্তির খর্ব্বতাই করিয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আমার আরও একটা কথা বলিবার আছে।"

নবীন।—"বলুন শুনিতেছি।"

রামহরি।—"আচ্ছা প্রায়শ্চিত্তের কিরূপ অনুষ্ঠান করিবে?"

নবীন।—"পণ্ডিতেরা যাহা ব্যবস্থা দিবেন তাহাই করিতে হইবে।"

রামহরি।—"ভায়া, পণ্ডিতেরা চান্দ্রায়ণাদি যে কঠোর ব্যবস্থা বলেন, তাহা কি পালন করা যায়? লোকে গঙ্গায় একটী মাত্র ডুব দিয়া বা কয়েক কাহন কড়ি উৎসর্গ করিয়াই থাকে। যদি কেহ ব্রহ্মচার্য্য অবলম্বন করিয়া সত্য সত্য চান্দ্রায়ণাদি ব্রত অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা চিত্তের একটা নূতন সংস্কার হইয়া যায়। অশক্ত সাজিয়া কেবল গঙ্গায় ডুব বা কড়ি উৎসর্গ আমার মতে প্রায়শ্চিত্তের একটা অভিনয় মাত্র।"

নবীন।—"আচ্ছা, আপনার আর কিছু বলিবার আছে?"

রামহরি।—"আছে বৈকি, তাহার পর তুমি তোমার এই যুবাপুত্রকে

সেই নানাপ্রলোভনময় দেশে পাঠাইতেছ, সে প্রলোভন দমন করিতে পারিবে তাহার প্রমাণ কৈ? সে যদি কোন শ্বেতাঙ্গী যুবতীর কুহকে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তোমার বংশের পরিণাম কি হইবে. একবার ভাবিয়া দেখ দেখি?"

নবীন।—"ওটি আপনি বৃথা আশঙ্কা করিতেছেন।"

রামহরি।—"আমার আশঙ্কা বৃথা হইতে পারে, কিন্তু এরূপ ঘটা অসম্ভব নহে।"

নবীন।—"সেরূপ হইলে আমি নিজেই তাহার মুখদর্শন করিব না।"

রামহরি।—"তবেইত ভায়া, অনিশ্চিতকে নিশ্চিত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় কি? ফলকথা আমি ইহাতে মত দিতে পারি না।"

নবীন।—"বাটীতেও অমত করিয়াছে, আপনিও মত দিতেছেন না. এক্ষণে কি করা যায়।"

রামহরি।—"বাটীতে তাঁহারা কি বলিতেছেন?"

নবীন।—"তাহারাও কতকটা আপনার মতই বলিতেছে।"

রামহরি।—"তাহা হইলে ভায়া দেখিও তুমি একটা কাণ্ড করিয়া শেষে যেন ব্রাহ্মণকন্যার মনটাকে ভাঙ্গিয়া দিও না।"

নবীন।—"আচ্ছা এবিষয়ে আর একবার ভাবিয়া দেখি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া নবীনচন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিলেন। বাটীতে আসিতে আসিতে তাঁহার মনে নানারূপ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। কমলাও রামহরি বাবুর কথা শুনিলেন, তিনি আবার নিষেধ করিলেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র নিজের ইচ্ছাকে দমন করিতে পারিলেন না। সময় অধিক নাই জানিয়া তিনি চারুচন্দ্রকে বিলাত পাঠাইতেই কৃতসংকল্প হইলেন। আয়োজন চলিতে লাগিল।

(৩)

চারুচন্দ্র বিলাত যাইবেন. শুনিয়া, প্রভাবতী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে আর পিতৃগৃহে যাইতে হইবে না। সেই জন্য তিনি গুরুজনের অনুমতি লইয়া একবার পিতামাতাকে বুঝাইবার জন্য তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিলেন। প্রথমে তিনি মাতাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলেন যে, এখন হইতে তাঁহাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ

ঘুচিয়া গেল। শুনিয়া কমলা রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পর নবীনচন্দ্রকে তাঁহারা মায়েঝিয়ে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন।

প্রভাবতী বলিলেন—"বাবা শেষে কি আমাকে একেবারে পায়ে ঠেলিলেন।"

নবীন।—"আমিত তোমাদিগকে ঠেলিতেছি না, তোমরাই আমাকে ঠেলিবার যোগাড় করিতেছ।"

প্রভা।—"আমাদের দোষ কি? চারু বিলাত না গেলে কি তাহার আর কোন উচ্চ কর্ম্ম হইবে না?" চারুচন্দ্র প্রভাবতী অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।

নবীন।—"এখানে থাকিয়া আবার কোন্ উচ্চপদ পাওয়া যায়?"

প্রভা।—"কেন শুনিয়াছি, এখানে থাকিয়া হাইকোর্টের জজ হওয়া যায়, সে নাকি ম্যাজিষ্টারী অপেক্ষা বড়।"

নবীন।—"কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। আর সকলে হাইকোর্টের জজ হইতেও পারে না।"

প্রভা।—"তবে সকলে কি ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারে?"

নবীন।—"চারু পারিবে।"

প্রভা।—"চেষ্টা করিলে চারু কি হাইকোর্টের জজ হইতে পারে না?"

নবীন।—"তুমি সে সমস্ত কথা বুঝিতে পারিবে না।"

প্রভা।—"তা সে যাহা হউক, চারু বিলাতে গেলে আমাকে আর দেখিতে পাইবেন না।"

নবীন।—"কেন চারু আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে তোমার শ্বশুরবাটীর লোকেরা কি আমাদের সহিত ব্যবহার করিবেন না?"

প্রভা।—"কৈ তাঁহাদের ত সে ভাব দেখি না। বরঞ্চ চারুকে বিলাতে পাঠাইলেই তাঁহারা আর আমাকে আসিতে দিবেন না। তাঁহারা বলেন যাবনের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।"

নবীন।—"তাঁহারা যদি তাহাই স্থির করিয়া থাকেন, তবে, আর কি করিব। আমি তাহাকে পাঠাইবার সমস্ত আয়োজন করিয়াছি।"

প্রভা।—"তবে আমার সহিত আপনাদের এই শেষ দেখা। বুঝিলাম আপনি

লের বড় কাজের জন্য মেয়েকে একেবারেই ত্যাগ করিতেছেন। ছেলে য়ের এত তফাৎ কোন বাপ মা করেন না।"

এই বলিয়া প্রভাবতী রোদন করিতে লাগিলেন। কমলাও রোদন রিয়া বলিলেন।—"তোমার পায়ে ধরি, ক্ষান্ত হও, আমার একটা মেয়ে, াহাকে জন্মের মত ভাসাইয়া দিও না।"

নবীন।—"আমি কাহাকেও ভাসাইতেছি না। আমি যাহা স্থির করিয়াছি, কোন মতে তাহার অন্যথা হইবে না।"

এই বলিয়া নবীনচন্দ্র তথা হইতে চলিয়া গেলেন। প্রভাবতী কাঁদিয়া বলিলেন।—"মা চারুকে একবার ডাক, তাহাকে একবার জন্মের মত দেখিয়া যাই।" চারুচন্দ্র সংবাদ পাইয়া দিদির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। প্রভাবতী বলিলেন—"চারু ভাই! তোমার দিদি তোমাকে একবার, জন্মের মত দেখিতে আসিয়াছে।"

চারু।—"কেন দিদি, সে কথা বলিতেছ, আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার তোমার সহিত দেখা করিব।"

কমলা।—"ওর শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তোমার সহিত আর দেখা করিতে দিবে না।"

চারু।—"তারা ত ভারি গোঁড়া দেখ্ছি, আজ কালকার কালে এমন গোঁড়া লোকও আছে?"

কমলা।"—তা হ্ এক ঘর এখনও আছে বৈকি। সেকেলে ভাব দেশ থেকে কি একেবারে যায়?"

চারু।—"দিদি তুমি ভেবনা। আমি বিলাত হইতে আসিয়া যেরূপ করে হউক, তোমার সহিত দেখা করিব।"

প্রভা।—"অদৃষ্টে তাহা ঘটিবে কিনা বলিতে পারি না। আমি তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছিলাম কিন্তু তাহারা শুনিয়া পিছাইয়া যাইবে।"

চারু।—"তার জন্য তোমার কোনই চিন্তা নাই। আমি বিলাত হইতে আসিলে অনেকে মেয়ে লইয়া উপস্থিত হইবে। আমি যাওয়ার যোগাড়ে ব্যস্ত আছি, এখন চলিলাম।" এই বলিয়া চারুচন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

প্রভাবতী আর অধিক ক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া রোদন করিতে করিতে

মাতার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। মাতাও ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে চারুচন্দ্রের গমনের সময় হইলে, তিনি রীতিমত সজ্জিত হইয়া পিতামাতার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে সাবধানে থাকিতে উপদেশ দিলেন। নবীনচন্দ্র আরও বলিলেন যে, সেখানে অনেক প্রলোভন আছে, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যেন উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত ঘটাইও না। চারুচন্দ্র তাহাই স্বীকার করিয়া পিতামাতার পদধূলি লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রী——

অতিথি।

এস হে অতিথিরূপী নরনারায়ণ,
কর অধিষ্ঠান দেব, এ গৃহমণ্ডপে,
এ বাসে অতিথিপূজা দেবতাপূজন,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, কোথা হেন তপে।
দেখহ অতীত বেলা দ্বিতীয় প্রহর,
হয়নি অতিথিসেবা তোমারি বিহনে,
প্রদীপ্ত নিদাঘরৌদ্র মধ্যাহ্ন প্রখর,
কাতর ব্রাহ্মণ তুমি দীর্ঘ পর্য্যটনে।
রেখেছি তৃষ্ণার জল ক্ষুধার ওদন,
হও শান্ত, হও তৃপ্ত, শ্রান্তি কর দূর,
তোমারি প্রসাদে ধরি এ নরজীবন,
ওই পাদ্য অর্ঘ আশে চিত্ত তৃষাতুর।
হে সৌম্য! হিন্দুর দেশে দেবতা হে তুমি,
তব পুণ্য পদরজে পূত গৃহভূমি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

১ম খণ্ড। } জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ { ২য় সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

লেখকগণের নাম।

শ্রীসাতকড়ি অধিকারী এম, এ, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
শ্রীগুরুদাস সান্যাল, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এস, সি,
শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

নিয়মাবলী।

—:০:—

শাশ্বতীর জন্ত প্রবন্ধাদি ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এথোড়া পোষ্টাফিস্, ভায়া সীতারামপুর, ই, আই, রেলওয়ে ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

পত্রিকার উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কোন লেখক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে পারেন। নবীন লেখকগণের প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

এথোড়া (Ethora) পোঃ
ভায়া সীতারামপুর,
ই, আই, রেলওয়ে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রী গুরবে নমঃ।

শাশ্বতী ১ম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৩২০। ২য় সংখ্যা।

ধামশ্রেণী।

(রঙ্গপুর)

স্বদেশভক্ত বাঙ্গালী আমরা, সোনার বাঙ্গলা জন্মভূমি বলিয়া কতই আমরা গর্ব্ব করি! কিন্তু এই বাঙ্গলা দেশের কোন্ প্রান্তে কি অমূল্য রত্ন লুকায়িত আছে তাহার সংবাদ রাখেন কে? অধিক কি, নিজের জেলায় ঘরের কোণে, কোথায় কি রহিয়াছে তাহাই বা জানেন কয় জনে? অতীতের কত কীর্ত্তি-কাহিনী হয়ত লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া কালের কোলে মিশিয়া যাইতেছে। এ সব দেখিবার বা শুনিবার সুযোগ আমাদের হয় না। খুঁজিলে গৌরবের জিনিষ অনেক মিলে, কিন্তু সে বিষয়ে আমরা নিরুৎসাহ।

নবীন লেখকগণের অনেকেই অপরের চর্ব্বিত বিষয় চর্ব্বণ করিয়া অথবা পরের উপর মুনসীয়ানা ফলাইয়া বাহাদুরী লইতে তাঁহাদের মূল্যবান সময়নিয়োগে বিব্রত। গৃহে বসিয়া পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান চলে না। যদি তাঁহারা বিলাস-হর্ম্ম্য ভুলিয়া একবার প্রকৃতির কোলে ঝাঁপ দিবার অবসর পান, তবে হয়তঃ কত লুপ্ততত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে, কত ভ্রান্ত তথ্যের সংস্কার হইতে পারে, অতীতের তিমিরবিবর হইতে কত রহস্যের উদ্ধার হইতে পারে।

আমরা এক সময়ে গ্রীষ্মাবকাশোপলক্ষে কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জমিদারী বাহারবন্দ পরগণার সদর কাছারী উলিপুর গিয়াছিলাম। সেখানে শুনিলাম, নিকটেই ধামশ্রেণী নামে একটা গ্রাম

আছে, সেখানে বহু পুরাতন দেবমন্দির এবং অপর দ্রষ্টব্য বিষয় অনেক রহিয়াছে। একদিন কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিতে রওনা হইলাম। তাহার ফলে পাঠকবর্গকে এই অতীত জাতীয় গৌরবের জীর্ণস্মৃতির একটা আভাস দিতে সমর্থ হইতেছি। এই জনকোলাহলহীন শান্ত পল্লীর প্রান্তে এই প্রকৃতির লীলানিকেতনের সহিত যে বাঙ্গলার ইতিহাসের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে, একথা কখন কল্পনা করিতেও পারি নাই। যাহা-হউক যতদূর পারিয়াছিলাম, পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

বাঙ্গালার গৌরবস্থল, বাঙ্গালীর মুকুটমণি মাতৃরূপিণী তিনটী দেবীর সহিত এই ধামশ্রেণীর সম্বন্ধ থাকায়, ইহার মহিমাকে আরও বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহাদের একটী দানশীলা সাধিকা রাণী সত্যবতী, অপরটী নাটোরের জননীকল্পা পুণ্যশ্লোক দেবী রাণী ভবানী, আর অন্যটী পুণ্যশীলা কাশীমবাজারাধিশ্বরী মহারাণী স্বর্ণময়ী।

কাশিমবাজারের কান্তবাবুর জমীদারী প্রাপ্তির গল্প অনেকেই শুনিয়াছেন বোধ হয়। রঙ্গপুর জেলার বাহারবন্দ পরগণা বর্ত্তমানে তাঁহার উত্তরাধিকারী-বৃন্দের জমিদারী মধ্যে অন্যতম প্রধান। শুনা যায়, এই পরগণা নাটোরের রাণী ভবানীর ভগিনী-সম্পর্কীয়া রাণী সত্যবতী দেবীর সম্পত্তি ছিল। দেবী-কল্পা রাণী সত্যবতীর সাধনার প্রবাদ অনেকের নিকটই বোধ হয় অজ্ঞাত নহে। শুনা যায়, এই ধামশ্রেণীই তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র ছিল। দেবমন্দির-সমূহ এখনও তাঁহার মহীয়সী কীর্ত্তি সগৌরবে বহন করিতেছে। নিত্য অতিথি সেবা এখনও সেই অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারসম সদাব্রতের সাক্ষ্য দিতে জীর্ণবক্ষে বর্ত্তমান। তিনি পবিত্র নির্জ্জন স্থানই ইষ্ট সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়া, নিভৃতে ইষ্টদেবীকে প্রতিষ্ঠা করিয়া এই কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন। শুনা যায় সুবিস্তৃত বাহারবন্দ পরগণার সমস্ত আয় এই ধামশ্রেণীতে দেব ও অতিথি সেবায় ব্যয় করিয়া, নিজে অতি দীনভাবে ইষ্ট সাধনায় তৎপর থাকিয়া, সহস্র সহস্র আর্ত্ত বুভুক্ষিতকে স্বহস্তে অকাতরে অন্নদান করিতেন। প্রবাদ যে এখানে চিরদিনের জন্য সদাব্রত অন্নসত্র খোলা ছিল, উপস্থিত যে কোন ব্যক্তি এখানে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে পারিত। অন্ন-হীন ভিখারীও এখানে আসিলে দধি দুগ্ধ মিষ্টান্নের আস্বাদনে বঞ্চিত হইত

না। ধন্য দেবি সত্যবতি! তোমার সাধনা! ইষ্টসাধনার উপযুক্ত অবসরই হইয়াছিল। শুনা যায় এই অন্নসত্র ছিয়াত্তরের লোকধ্বংসী ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইতে রঙ্গপুর অঞ্চলের বহু অধিবাসীদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল।

দেবী সত্যবতী যখন বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন অতি দীনবেশে ধামশ্রেণী ত্যাগ করিয়া কাশীধামে চলিয়া যান। যাইবার সময় নাটোরের রাণী ভবানীকে যোগ্যা মনে করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে তাঁহারই হস্তে এই প্রকাণ্ড সম্পত্তি ও দেবসেবার ভার প্রদান করিয়া বিদায় হয়েন। উপযুক্ত পাত্রেই ভারার্পিত হইয়াছিল। তাঁহার সময় ধামশ্রেণীর গৌরব পূর্ণমাত্রাতেই বিদ্যমান ছিল। তৎপরে বাহারবন্দ পরগণা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কান্তবাবুকে প্রদান করেন। কালক্রমে এই দেবসেবা অনেক পরিবর্ত্তিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর হস্তগত হয়। মণিকাঞ্চনেরই যোগ হইয়াছিল। তবে তখন ধামশ্রেণীর অবস্থা ধ্বংসপ্রায়, বাহারবন্দের অবস্থাও সম্পূর্ণ অন্যরূপ। স্বর্ণময়ী জমীদারী প্রাপ্ত হইয়া যখন বাহারবন্দে আসেন, তখন কিছুদিন এখানে বাস করিয়া জীর্ণ মন্দিরাদির যথাসাধ্য সংস্কার ও দেবসেবার সাধ্যমত বন্দোবস্ত করিয়া যান। বর্ত্তমানে আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তিনি নিজে বাহারবন্দ পরিদর্শনকালীন ধমশ্রেণী দেখিয়া আসিয়াছেন। বলাবাহুল্য, সম্ভবমত তাঁহার যত্ন বা বন্দোবস্তের ত্রুটি নাই।

ধামশ্রেণী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবে স্থানটী বড়ই পবিত্র,বড়ই চিত্তাকর্ষক। নির্জ্জনতা এবং গাম্ভীর্য্যে বস্তুতঃই যেন প্রকৃতির অঞ্চলে অঙ্কিত আশ্রমের একখানি ছবি। উপস্থিত হইলেই মনে যেন কেমন একটা পবিত্র ভাবের উদয় হয়! জনকোলাহল নাই, মাঝে মাঝে বিহগকলরব নীরবতা ভঙ্গ করে মাত্র। সুদূর বাঙ্গালার নিভৃত কোণে, অমন সুন্দর শান্ত আশ্রমের মত স্থান—আবার অমন মানবরূপিণী দেবীবৃন্দের কীর্ত্তির অনন্ত স্মৃতি একবার চিন্তা করুন ত ?

মন্দিরপ্রাঙ্গণের পশ্চিমে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। উত্তরেও প্রকাণ্ড পুষ্করিণী। অপর দুইদিকে ফলবান বৃক্ষবাটিকা, পরে উন্মুক্ত প্রান্তর। আজকাল অনেকটা

জঙ্গলময় হইয়া আছে। পূর্ব্বে দীর্ঘিকার বাঁধা ঘাটের উপরেই এক শিব-মন্দির ছিল। প্রকাণ্ড লিঙ্গমূর্ত্তি। মন্দিরটী বহু পুরাতন বলিয়া অনুমিত হয়। খিলান করা ছাদ, বিশেষত্ব এই, ভিতরে কেহ ধীরে ধীরে কথা বলিলেও এক গম্ভীর শব্দ হইতে থাকে। কেহ স্তব স্তুতি পড়িলে এক অপূর্ব্ব গভীর রব উত্থিত হয়। মন্দিরটীর অবস্থা তত ভাল নহে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই দেখা যায়, এক বিশাল বটবৃক্ষতলে এক "বুড়ো শিব" রহিয়াছেন, কোন মন্দির নাই। প্রবাদ এই, এখানে মন্দিরনির্ম্মাণের অনেক সময় অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ইনি মন্দিরে থাকিবেন না, এইরূপ স্বপ্নাদেশ করায় মন্দির আর হয় নাই। ইহার সম্বন্ধে মুসলমানদের অত্যাচার বিষয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে, উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তৎপরে ফুলের বাগান, একটু অগ্রসর হইলেই প্রধান মন্দিরের বহির্ব্বাটী। বহু ইষ্টকস্তূপ এখনও নাট মন্দির প্রভৃতি হর্ম্ম্যাবলীর সাক্ষ্য দিতে বর্ত্তমান। তৎপরে প্রাচীর ও সিংহদ্বার। ভূমিকম্পে অথবা অন্য কারণে অনেকটা বসিয়া গিয়াছে। সিংহদ্বার দিয়া মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করিতে হয়। প্রাঙ্গণের উত্তর দিকেই প্রধান মন্দির ভিতরে দক্ষিণকালিকামূর্ত্তি। কালীমূর্ত্তি অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু অমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হৃদয়হারী বিগ্রহ আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। প্রকৃতই তাহা দেখিলে একসঙ্গে ভয় ও ভক্তির উদয় হয়। যেন একখানি পবিত্র ছবি হৃদয় ভরিয়া অঙ্কিত হইয়া যায়। ভাস্কর্য্যবিদ্যার বাহাদুরী বটে! এইটীই প্রধান মন্দির। ইনিই সত্যবতীর সিদ্ধেশ্বরী, কেহ কেহ মহামায়াও বলিয়া থাকেন। পার্শ্বের মন্দিরে শিলাময়ী মঙ্গলাচণ্ডীর মূর্ত্তি। এই মঙ্গলাচণ্ডীর মন্দিরই রাণী সত্যবতীর সাধনার স্থান। মন্দির চত্বরের পশ্চিমদিকে মহাকালের মন্দির, ভিতরে লিঙ্গমূর্ত্তি। পূর্ব্বে ৺গোবিন্দজীউর মন্দির, ইঁহার প্রভাবও এখানে যথেষ্ট এখানে শালগ্রামশিলা, হনুমানজী ও অপর অনেকগুলি বিগ্রহ আছেন। পার্শ্বে পাকের ঘর ভোগের ঘর ইত্যাদি। বাহিরের দিকে বর্ত্তমান জমিদারী কাছারী। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টকগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, বহুকারুকার্য্যখচিত। সমস্ত কাঠের কাজই পাথর দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। অনেক রকমের অনেক পাথর যেখানে সেখানে দেখা যায়। পশ্চিম দিকের জঙ্গলের ভিতর বহু ইষ্টকস্তূপ ও মন্দিরাদির

ভগ্নাবশেষ আছে। বোধ হয় অনুসন্ধান করিলে অনেক বিষয় আবিষ্কার হইতে পারে। মন্দিরগুলির মধ্যে কয়েকটী বহু পুরাতন বলিয়া মনে হয়। শিল্প-নৈপুণ্যের অভাব নাই।

যাহাহউক, আমরা দ্বিপ্রহরে পূজার পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছিলাম। পূজা শেষ হইলে দ্বাররুদ্ধ হয়। এখানে বলি হয় না। কয়েক জন অভ্যাগত ও কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত আমরা তৃপ্তির সহিত প্রসাদ পাইলাম। প্রসাদের বন্দোবস্ত বেশ, তবে আমরা "বিশিষ্ট" বলিয়া কিনা জানিনা। অতিথি সেবা রীতিমত আছে, একবার মাত্র নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাক হয়। মন্দিরগুলির মধ্যে, ঘাটের শিবমন্দিরটির সংস্কার আবশ্যক দেখিলাম।

এখানে আর একটী বিশেষত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধামশ্রেণীর সীমানার বাহিরেই মুসলমানদের মাদার সাহেবের দরগা। হিন্দুর এমন পবিত্রস্থানে মুসলমান পীরের দরগা কেন? কতকগুলি কিম্বদন্তী ভিন্ন আর কোন বিশ্বাসযোগ্য উত্তর পাওয়া কঠিন। শুনা যায় মুসলমান নবাব এই ধামশ্রেণী ধ্বংসের বিশেষ আয়োজন করেন, এমন কি বুড়োশিবকে পর্য্যন্ত তুলিয়া লইবার চেষ্টা করেন। পরে দেবীর তপঃপ্রভাবে অথবা দেবমহিমাদি অপর কোন কারণে নবাব নিরস্ত হইতে বাধ্য হন। শুধু তাহাই নয়, গোহত্যা-প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মবিঘ্নকর কার্য্যাদি পর্য্যন্ত বন্ধ হয়। বহু সম্পত্তি ধামশ্রেণীর দেবসেবার উদ্দেশে ছাড়িয়া দেন, এবং নিকটেই মাদার সাহেবের এক দরগা স্থাপন করিয়া রাণীর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। যাহা হউক, রাণী সত্যবতীর সময়ে হিন্দু মুসলমান সৌহার্দ্দসূত্রে বদ্ধ হইয়া কেমনে একত্রে বাস করিত, ইহা যে তাহারই নিদর্শন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃই এরূপ নীরব গম্ভীর পবিত্রতামাখা আশ্রমের মত শান্তির স্থান বাঙ্গলা দেশের পক্ষে বিরল। একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে, ধামশ্রেণীতে গেলে সকলেরই দিগ্‌ভ্রম হয়। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, তবে আমার কিন্তু উত্তরকে পশ্চিম বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাই বলিয়া সকলেরই যে আমার মত দশা হইবে একথা বলিবার আমি কে? তিস্তানদী পূর্ব্বে নিকটেই ছিল এখন কালপরিবর্ত্তনে গতির পরিবর্ত্তন হইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে।

ধামশ্রেণী দর্শন করিয়া প্রকৃতই মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। অতীত গৌরবের কত কথা মনে পড়িল, কত লুপ্ত স্মৃতি উজ্জ্বলতর হইয়া দেখা দিল। ধন্য ধামশ্রেণী, জীবন্ত দেবতার পদচিহ্ন ধারণ করিয়া প্রকৃতই তুমি গৌরবান্বিত হইয়াছিলে। পদধূলিস্পর্শে সত্যই তোমার দেহ পবিত্র হইয়াছিল। আর তোমরা দেবী অন্নপূর্ণারূপিণী হইয়া আমাদের মত পতিতকে ধন্য করিতে এই নির্জ্জন প্রান্তে এমন খেলাও খেলিয়া গিয়াছ!

আশা করি, যদি কেহ উত্তর বঙ্গে কখনও কোন উপলক্ষে আগমন করেন, তবে যেন একবার এই পুণ্যপবিত্র ভূমি দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিয়া যান। এই স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিলে পূর্ব্ববঙ্গ রেল পথে কুড়িগ্রাম ষ্টেসনে, অথবা ব্রহ্মপুত্রের ষ্টীমারে চিলমারি ঘাটে নামিয়া অক্লেশেই পৌঁছান যাইতে পারে।

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

কবিকথা

(কালিদাস)

অভিজ্ঞান শকুন্তল।

(৩)

মাধব্যকে বিদায় দিয়া রাজা যজ্ঞরক্ষার্থে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার জ্যানির্ঘোষ শুনিবামাত্র নিশাচরেরা পলায়ন করিতে লাগিল। তপোবনে শান্তি স্থাপিত হইলে, রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সত্বরই তাঁহাকে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতে হইবে। কিন্তু শকুন্তলার আশা তিনি কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন? তাঁহার চিন্তায় রাজা দিন দিন কৃশ ও মলিন হইয়া উঠিতেছিলেন। দুষ্মন্ত তপস্যার প্রভাব ও শকুন্তলাকে পরাধীনা জানিয়াও আপনার হৃদয়কে নিবৃত্ত করিতে পারেন

নাই। তখন নিদাঘকাল, এসময়ে চন্দ্ররশ্মি সকলেরই স্পৃহনীয় হয়। রাজা দুষ্যন্তের নিকট তাহা কিন্তু অগ্নিশিখার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি শকুন্তলার অদর্শনে অস্থির হইয়া, একদিন মধ্যাহ্নসময়ে মালিনীতীরস্থ লতা-মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আতপ-বেলায় শকুন্তলা সখীদের সহিত সেই লতাকুঞ্জে গমন করিয়া থাকেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি মালিনী তরঙ্গকণবাহী ও অরবিন্দসুরভি পবনস্পর্শে আপনাকে কিঞ্চিৎ শীতল মনে করিতে লাগিলেন। লতামণ্ডপের নিকট অগ্রসর হইয়া রাজা পদচিহ্ন দ্বারা বুঝিতে পরিলেন যে,শকুন্তলা তাঁহার সখীদের সহিত তন্মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছেন। রাজার অনুমান সত্যই হইয়াছিল। বাস্তবিক অনুরাগকাতরা শকুন্তলা আতপজ্বালা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। সখীরা তজ্জন্য তাঁহাকে সেই শীতলস্থানে আনিয়া শিলাতলস্থিত কুসুম শয্যায় শয়ন করাইয়া, পদ্মপত্র দ্বারা ব্যজন করিতেছিলেন। কিন্তু শকুন্তলা প্রথমে তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই। সখীরা বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, রাজার দর্শনাবধিই শকুন্তলার এইরূপ বিকার ঘটিয়াছে। তাঁহারা শকুন্তলাকে বলিলেন, "প্রিয়সখি! আমরা ইতিহাস নিবন্ধাদি হইতে যেরূপ অনুরাগলক্ষণের কথা শুনিয়াছি, তোমাকে দেখিয়া তাহাই বোধ হইতেছে। তোমার সন্তাপের কারণ কি প্রকাশ করিয়া বল।" শকুন্তলা প্রথমে কোন কথা বলিতে চাহেন নাই। কিন্তু সখীরা যখন তাঁহাকে দিনদিন কৃশ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া, লাবণ্যময়ী ছায়ামাত্র অবশিষ্ট থাকার কথা বলি-লেন, তখন শকুন্তলা উত্তর দিলেন যে, আমি কি আর বলিব,আমার সে কথা শুনিলে তোমরা কেবল কষ্ট পাইবে। সখীরা বলিলেন যে, তুমি কি জাননা, দুঃখ প্রিয়জনে বিভক্ত হইয়া গেলে সহ্যবেদন হইয়া উঠে? সখীদের পীড়া-পীড়িতে শকুন্তলা অবশেষে বলিয়া ফেলিলেন যে, সেই তপোবনরক্ষিত রাজর্ষির দর্শনাবধি আমার এই দশা ঘটিয়াছে। তখন তাঁহারা বলিলেন, "তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিনী হইয়াছ, সাগর পরিত্যাগ করিয়া মহানদী কি অন্য কোথাও অবতরণ করিতে পারে? পল্লবিতা অতিমুক্তলতা সহকারকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।" এইরূপ আলাপনের পর সখীরা কর্ত্তব্যাবধারণের পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহাতে গোপনে শীঘ্রই কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহাই

তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, অবশ্য তাঁহারা প্রথমে রাজার মনোভাবের বিষয়ও আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহাদের মনোমধ্যে দুষ্যন্তের কৃশ ও মলিন ছবির উদয় হইল, তখন তাঁহারা আশ্বস্ত হইয়া প্রতিকারের উপায় দেখিতে লাগিলেন। প্রিয়ম্বদা বলিলেন, "আমি শকুন্তলার পত্র লইয়া নির্ম্মাল্য-চ্ছলে রাজাকে দিয়া আসিব।" অনসূয়া তাহাই অনুমোদন করিলেন। শকুন্তলাও তাহাতে সম্মতি দিলেন। কিন্তু রাজার অবজ্ঞাভয়ে তিনি কিছু সঙ্কুচিতা হইতে-ছিলেন। তাহার পর পদ্মপত্রে নখচিহ্ন দ্বারা শকুন্তলা পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

দুষ্যন্ত লতামণ্ডপের নিকট আসিয়া এই সমস্ত লক্ষ্য করিতেছিলেন। অনুরাগক্লিষ্টা শকুন্তলার পাণ্ডুর ছবি তাঁহার নিকট শোচনীয় ও রমণীয় উভয়ই প্রতীত হইতেছিল। রাজা সেই সময়ে শকুন্তলাকে পত্রশোষণ-কারী মলয়ানিলকর্ত্তৃক স্পৃষ্টা মাধবীলতার ন্যায় মনে করিতেছিলেন। সখীরা রাজার কৃশত্বের কথা বলিলে, তিনি আপনার মনিবন্ধ হইতে কনকবলয় স্খলনের কথা ভাবিতেছিলেন। শকুন্তলার প্রতি তাঁহার অবজ্ঞার কথা শুনিয়া রাজা শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি যাহার অবজ্ঞা আশঙ্কা করিতেছ, সেই তোমার লাভের জন্য সমুৎসুক হইয়া আছে। যাচকই লক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে, লক্ষ্মী যাহাকে ইচ্ছা করেন সে কি কখনও দুর্ল্লভ হয়?"

শকুন্তলার পত্র লেখা শেষ হইলে, তিনি সখীদিগকে এইরূপ পড়িয়া শুনাইলেন, "নির্দ্দয়! আমি তোমার মন জানি না, কিন্তু আমার মন তোমাতে অনুরক্ত হওয়ায়, দিবানিশি সন্তাপিত হইতেছি।" রাজা থাকিতে না পারিয়া লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন। "তুমি সন্তাপিত হইতেছ বটে, আমি কিন্তু একেবারেই দগ্ধ হইয়া যাইতেছি। দিবস চন্দ্রকে যেরূপ ম্লান করে, কুমুদিনীকে সেরূপ করিতে পারে না।" রাজাকে সমাগত দেখিয়া শকুন্তলা উঠিবার চেষ্টা করিলে, দুষ্যন্ত তাঁহাকে উঠিতে নিষেধ করিলেন। সখীরা রাজাকে বয়স্য সম্বোধন করিয়া, শিলাতলে উপবেশনের জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা উপবিষ্ট হইলে, শকুন্তলা লজ্জাবনতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সখীরা রাজাকে বলিলেন, "আপনাদের পরস্পর অনুরাগের লক্ষণ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিপন্নের দুঃখহরণই রাজধর্ম্ম, এক্ষণে আমাদের সখীর জীবন দান করিয়া আপনি সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন।" শকুন্তলা সখীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "অন্তঃপুরবিরহকাতর রাজর্ষির নিকট এ অনুরোধের প্রয়োজন কি?" সখীরা পরে আরও বলিতে লাগিলেন "যে, আমরা শুনিয়াছি রাজাদের মহিষীর সংখ্যা থাকে না। কিন্তু আমাদের প্রিয়সখীর জন্য আমরা যেন পরিণামে দুঃখ না পাই। রাজা উত্তর দিলেন যে,সমুদ্রবসনা পৃথিবী ও তোমাদের সখী এই দুইজনকেই কেবল আমার প্রিয়তমা বলিয়া জানিবে। তাহার পর অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা একটি মৃগশাবককে তাহার মাতার নিকট পৌছাইয়া দিবার ছলে লতামণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শকুন্তলা বলিলেন, "আমাকে একাকিনী রাখিয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ? তোমাদের একজন আমার নিকট আইস।" সখীরা উত্তর দিলেন, "স্বয়ং পৃথিবীনাথই তোমার নিকট রহিলেন।"

সখীদের গমনে শকুন্তলা কিছু উৎকণ্ঠিতা হইলেন। রাজা তাঁহাকে ব্যাকুল হইতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "তোমার যে শুশ্রূষার প্রয়োজন হইবে আমিই তাহা সম্পন্ন করিব।" শকুন্তলা উত্তর দিলেন যে, মাননীয় লোককে আমি অপরাধী করিতে ইচ্ছা করি না। তাহার পর শকুন্তলা লতামণ্ডপ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, রাজা তাঁহাকে বলিলেন 'যে, এখনও দিবাবসান হয় নাই, তুমি এই কুসুমশয়ন ও পদ্মপত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া রৌদ্রে বাহিরে যাইতেছ কেন? শকুন্তলা তাঁহার কথা না শুনায়, রাজা তাঁহাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন। শকুন্তলা বলিলেন, "পুরুবংশীয়ের এরূপ অবিনয় শোভা পায় না, আমি স্বাধীনা নহি।" বাস্তবিক শকুন্তলার মনে অনুরাগসঞ্চার হইলেও, তিনি চিত্তসংযম ও আত্মসংযমের জন্য আপনাকে সহসা স্বাধীনা বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। রাজা কহিলেন, "রাজর্ষিকন্যারা গান্ধর্ব্ববিধানের দ্বারা পরিণীতা হইয়া থাকেন, গুরুজনেরা সে প্রথার অনুমোদনই করেন। শকুন্তলা তাহার কোন উত্তর না দিয়া রাজার বাধা অতিক্রমের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন,

"ব্যস্ত হইতেছ কেন, অধরপিপাসা নিবৃত্ত হইলেই ছাড়িয়া দিতেছি।" শকুন্তলা কিন্তু তৎক্ষণাৎ রাজার হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন। এই সময়ে বাহিরে শব্দ হইল,"চক্রবাকবধূ সহচরকে সম্ভাষণ করিয়া লও,রজনী উপস্থিত।" শকুন্তলা ইহা সখীদের সঙ্কেত বুঝিয়া রাজাকে কহিলেন, "আমার অসুস্থতা শুনিয়া,আর্য্যা গৌতমী দেখিতে আসিতেছেন,আপনি বৃক্ষান্তরালে গমন করুন।" রাজার লতামণ্ডপ পরিত্যাগের পর গৌতমী তথায় প্রবেশ করিলেন। তিনি শকুন্তলার অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার শরীরে কুশোদক ছিটাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন যে, ইহাতেই তোমার শরীর সুস্থ হইবে। এক্ষণে বেলা অবসান হইয়াছে চল আমরা কুটীরে যাই। অতঃপর শকুন্তলা শূন্য হৃদয়ে গৌতমীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা শকুন্তলা-পরিত্যক্ত লতামণ্ডপে তাঁহার ব্যবহৃত কুসুমশয়ন ও নলিনীপত্রাদি দেখিয়াই তৃপ্তিবোধ করিতেছিলেন, তথা হইতে যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল না। কিন্তু সে সময়ে যজ্ঞবেদীর নিকট নিশাচরদিগের ছায়া নিপাতিত হওয়ায়, তপস্বীরা রাজাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। দুষ্মন্ত অগত্যা সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

(৪)

রাজার প্রস্তাব অচিরেই কার্য্যে পরিণত হইল। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা গান্ধর্ব্বিবিধানে পরিণীত হইলেন। তাহার পর রাজ শকুন্তলা ও তপস্বী-দিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া হস্তিনাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় শকুন্তলা সজলনয়নে তাঁহাকে কবে লইয়া যাইবেন জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা তাঁহার অঙ্গুলীতে স্বনামাঙ্কিত একটী অঙ্গুরী পরাইয়া দিয়া বলিয়া যান যে, তাঁহার নামাক্ষরগণনা যে দিন শেষ হইবে, সে দিনই শকুন্তলাকে লওয়ার জন্য তাঁহার লোকজন আসিয়া পঁহুছিবে। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে আশ্বস্ত করিয়া গেলেও সখীরা তাঁহার পতিগৃহে না যাওয় অবধি নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন। পাছে রাজা শকুন্তলাকে বিস্মৃত হন, ইহাই তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। কিন্তু রাজার আকু-

তিতে তদ্বিরোধী গুণ থাকা অসম্ভব মনে করিয়া, তাঁহারা আপনাদের আশঙ্কা দূর করিতে চেষ্টা করেন। সহসা এক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। একদিন সখীরা যে সময়ে শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার অর্চ্চনার জন্য পুষ্পচয়নে ব্যাপৃত হন, সেই সময়ে শকুন্তলা অতিথিসৎকারের জন্য কুটীরদ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু পতিচিন্তায় তিনি এরূপ তন্ময়ী হইয়া পড়েন যে তাঁহার আত্মবিস্মৃতি পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে। এই সময়ে কোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসা আতিথ্যলাভের জন্য কুটীরদ্বারে উপস্থিত হন, এবং নিজের উপস্থিতিও জ্ঞাপন করেন, পতিধ্যানমগ্না শকুন্তলা মহর্ষির উপস্থিতি বা তাহার জ্ঞাপন কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। তখন দুর্ব্বাসা তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া কহিলেন যে, অতিথিকে অবজ্ঞা করিয়া তুমি যাহার চিন্তায় মগ্ন আছ, তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেও তোমার কথা তাহার মনে পড়িবে না। শকুন্তলা অভিশাপবাক্য পর্য্যন্ত শুনিতে পান নাই, কিন্তু সখীরা শ্রবণমাত্র মহর্ষির পদতলে নিপতিত হইয়া দুহিতৃতুল্যা শকুন্তলার প্রতি ক্রোধশান্তির জন্য বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বলিলেন যে, আমার বাক্য অন্যথা হইবে না, তবে কোন অভিজ্ঞানাভরণদর্শনে এ শাপের মোচন হইতে পারে। সখীরা শকুন্তলার অঙ্গুলীতে রাজার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরী সন্নিবেশের কথা স্মরণ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহারা এই অভিশাপ ব্যাপার শকুন্তলাকে অবগত করান নাই, কারণ উষ্ণজলে নবমল্লিকাসেচন তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না।

মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রাতর্হোমের সময়াবধারণের জন্য শিষ্যেরা আকাশের পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, একদিকে চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন, অপরদিকে রক্তিমাভা প্রকাশ করিয়া সূর্য্যের উদয় হইতেছে। তাঁহাদের উত্থানপতনের সহিত তাঁহারা লোকদিগেরও সুখদুঃখের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রের অস্তগমনে কুমুদিনীকে ম্লান দেখিয়া তাঁহারা প্রবাসগত পতিবিয়োগবিধুরা অবলাগণের অসহ্য দুঃখের কথাই স্মরণ করিতে লাগিলেন। প্রভাত উপস্থিত জানিয়া শিষ্যেরা মহর্ষিকে তৎসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। মহর্ষি হোমায়াতনে প্রবেশ করিয়া অভীষ্ট কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলে, এক অশরীরী বাণী তাঁহার কর্ণকুহরে

প্রবেশ করিল। তিনি তদ্দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, শকুন্তলা দুষ্যন্তের সহিত পরিণীতা হইয়াছেন, এবং তাঁহার গর্ভসঞ্চার হওয়ায়, এক্ষণে তিনি অগ্নিগর্ভা শমীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। কণ্ব শকুন্তলাকে তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়ার কথা বলিলে, শকুন্তলা লজ্জাবনতমুখী হইয়া উঠিলেন। অনুরূপ পাত্রের সহিত পরিণীতা হওয়ায় কণ্ব শকুন্তলার প্রতি অসন্তুষ্ট হন নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণে তিনি শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সখীরা শুনিয়া হর্ষবিষাদের মধ্যে নিপতিত হইলেন। শকুন্তলার পতিগৃহে গমন শুনিয়া তাঁহাদের হর্ষ হইল বটে, কিন্তু তিনি যে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের বিষাদের সীমা রহিল না। সে যাহা হউক, তাঁহারা শকুন্তলার শুভযাত্রার জন্য মাঙ্গল্য আহরণে ব্যাপৃত হইলেন। চূতপল্লব, নারিকেল,বকুলমালা,গোরোচনা, তীর্থমৃত্তিকা এবং দূর্ব্বাদলাদি মাঙ্গল্যদ্রব্য অচিরেই সংগৃহীত হইল। মঙ্গলালয় তপোবনে মাঙ্গল্যের অভাব ঘটিবে কেন? তাপসীরা আসিয়া দূর্ব্বাক্ষত দ্বারা শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "তুমি মহাদেবী আখ্যা লাভ কর, কেহ বলিলেন "তুমি বীর প্রসবিনী হও", এবং অন্য কেহ বলিলেন, "তুমি পতির আদরিণী হইয়া থাক" সখীরা তাঁহার মঙ্গলস্নান সমাধান করিয়া, মাঙ্গল্যানুলেপনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর শকুন্তলাকে সুসজ্জিত করা হইল। বনস্পতির ক্ষৌমবস্ত্র ও লাক্ষারস এবং বনদেবতারা অলঙ্কার প্রদান করিলেন। সখীরা অঙ্গে চিত্রকার্য্য করিয়া শকুন্তলার বেশভূষা সমাধা করিলেন। তাহার পর মহর্ষি তাঁহার পতিগৃহযাত্রার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কণ্ব শকুন্তলাকে পাঠাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গমনচিন্তায় ঋষির হৃদয় উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর স্তম্ভ হইয়া গেল, দৃষ্টি মলিন হইয়া আসিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "বনবাসী আমার যখন এরূপ বিকলতা ঘটিতেছে, না জানি নূতনতনয়াবিয়োগদুঃখে গৃহীরা কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।" যাত্রার সময় উপস্থিত হইলে গৌতমী কণ্বকে প্রণাম করিবার জন্য শকুন্তলাকে উপদেশ দিলেন, শকুন্তলা তাহাই প্রতিপাদন করিলেন। কণ্ব আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "যযাতির নিকট শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় তুমি পতির আদরিণী হও, এবং

পুরুর ন্যায় সম্রাট পুত্র লাভ কর।" গৌতমী বলিলেন, "ইহা কেবল আশীর্বাদ নহে, কিন্তু শকুন্তলার প্রতি ভগবানের বরপ্রদান।" মহর্ষি শকুন্তলাকে হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে বলিয়া কহিলেন, "এই যজ্ঞাগ্নির দ্বারা তুমি পবিত্রতা লাভ কর।" তাহার পর তিনি শার্ঙ্গরব নামক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া শকুন্তলাকে হস্তিনাপুর লইয়া যাওয়ার জন্য উপদেশ দিলেন। শার্ঙ্গরবের সহিত শারদ্বত নামে অপর এক শিষ্যের এবং গৌতমীরও যাওয়া স্থির হইল। কণ্ব তাঁহাদের সহিত কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

তাঁহারা ক্রমে তপোবনতরুগণের নিকটবর্তী হইলে, মহর্ষি তরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমাদের জলসেচন শেষ না হইলে যিনি কখনও জলপান করিতেন না, যাঁহার অলঙ্কারপ্রিয়তা থাকিলেও, স্নেহময়ী যিনি কখনও তোমাদের একটিমাত্রও পল্লব ভঙ্গ করেন নাই, তোমাদের প্রথম-কুসুমবিকাশসময়ে যাঁহার পরমানন্দ হইত, সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে তাহাতে সম্মতি দান কর।" "সেই সময়ে বৃক্ষ-শাখা হইতে কোকিল রব করিয়া উঠিল। কণ্ব বলিলেন, বুঝিতেছি শকু-ন্তলার বনবাসবন্ধু তরুগণ কোকিলরবচ্ছলে তাঁহার পতিগৃহযাত্রায় সম্মতি দান করিতেছে।" আবার তৎক্ষণাৎ আকাশবাণী হইল, "শকুন্তলার পথে সরসী সকল শ্যামলপদ্মিনীপত্রে আচ্ছাদিত হইয়া থাকুক, ছায়াদ্রুম দ্বারা রবিকর প্রশমিত হইয়া যাউক, পদ্মরেণুতে তাহার ধূলিসকল মৃদু হইয়া উঠুক, পবন শান্ত ও অনুকূল হউক, এবং তাহাতে অবিরত কল্যাণবৃষ্টি হইতে থাকুক।" গৌতমী বলিল, "শকুন্তলে! স্নেহময়ী তপোবনদেবতারা তোমার পতিগৃহযাত্রায় অনুমতি দিতেছেন, ভগবতীদিগকে প্রণাম কর।" শকুন্তলা তাঁহাদিগকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। যদিও শকুন্তলা পতিদর্শ-নোৎসুকা হইয়া পতিগৃহে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার চরণ অগ্রসর হইতেছিল না। সখীদের নিকট সে কথা ব্যক্ত করিলে, তাঁহারা বলিলেন, "তুমিই যে তপোবনবিরহে কাতর হইতেছ কেবল তাহা নহে, কিন্তু তপোবনের দশাও একবার দেখিয়া লও। ঐ দেখ, মৃগগণের মুখ হইতে চর্বিত কুশাঙ্কুর সকল পড়িয়া যাই

তেছে, ময়ূরেরা নৃত্য ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং লতাসকল অশ্রুর ন্যায় পাণ্ডু পত্র পরিত্যাগ করিতেছে।" যাইতে যাইতে শকুন্তলার বনজ্যোৎস্নার কথা মনে হইল। তিনি তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, "বনজ্যোৎস্নে! এখন আমি দূরে চলিলাম, সহকারের সহিত সম্মিলিতা হইলেও শাখাবাহুদ্বারা আমাকে আলিঙ্গন কর।" কণ্ব কহিলেন, "জানি, ইহার প্রতি তোমার চিরদিনই সহোদরার ন্যায় স্নেহ আছে। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, তোমাকে অনুরূপ পাত্রে দান করিব, তোমার পুণ্যফলে তোমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। নবমল্লিকাও সহকারকে আশ্রয় করিয়াছে, এক্ষণে আমার তোমাদের উভয়ের জন্যই চিন্তা অন্তর্হিত হইল।" শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাকে সখীদের হস্তে অর্পণ করিলে, তাঁহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, "আমাদিগকে কাহার হস্তে দিয়া যাইতেছ ?" কণ্ব তাঁহাদিগকে কাতর হইতে নিষেধ করিয়া শকুন্তলাকে শান্ত করিতে উপদেশ দিলেন। তাহার পর আবার সকলে কিছুদূর অগ্রসর হইলে শকুন্তলা একটি হরিণীকে দেখিয়া কণ্বকে কহিলেন, "পিতঃ! এই কুটীরপ্রান্তচারিণী গর্ভমন্থরা হরিণী নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করিলে আমাকে সংবাদ দিবেন।" মহর্ষি তাহাই স্বীকার করিলেন। যাইতে যাইতে একটি মৃগশিশু শকুন্তলার অঞ্চল ধরিয়া টান দিল। শকুন্তলা বলিলেন, "কে যেন আমার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে।" কণ্ব বলিলেন, "তুমি যাহার কুশাগ্রক্ষতমুখে ইঙ্গুদীতৈল সেচন করিতে, শ্যামাকমুষ্টির দ্বারা যাহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলে, সেই তোমার পুত্রস্থানীয় মৃগশিশুটি তোমার পথরোধ করিতেছে।" শকুন্তলা রোদন করিয়া কহিলেন, "মাতৃহীন তোমায় প্রতিপালন করিয়াছি, এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে, কেন আর বৃথা আমার অনুসরণ করিতেছ ? অতঃপর পিতাই তোমার বিষয় চিন্তা করিবেন।" শকুন্তলার নয়ন অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠায়, তিনি ভাল করিয়া পথ দেখিতে পাইতেছিলেন না, তজ্জন্য তাঁহার পদস্খলন হইতেছিল, কণ্ব সে কারণে তাঁহাকে শান্ত হইতে বলিলেন। তাঁহারা একটী সরোবরতীরে উপস্থিত হইলে, শার্ঙ্গরব কণ্বকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, স্নেহাস্পদদিগের উদকান্ত পর্য্যন্ত আসাই বিধি। অতএব আপনারা এইখান হইতেই সম্ভাষণ শেষ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হউন। তখন

সকলে মিলিয়া সেই সরোবরতীরস্থ বটবৃক্ষছায়ায় বিশ্রামলাভে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে সরোবরমধ্যে একটি চক্রবাক পদ্মপত্রের অন্তরালে গমন করায়, চক্রবাকী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া চীৎকার করিতেছিল। শকুন্তলা সখীদিগকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিয়া কহিলেন, "প্রিয়বিরহে কাতরা চক্রবাকী রাত্রিকে সুদীর্ঘ মনে করিয়া কোনরূপে তাহা যাপন করিয়া থাকে, একমাত্র আশাই গুরুবিরহদুঃখ সহ্য করাইতে সমর্থ হয়।" কণ্ব শার্ঙ্গরবকে কহিলেন যে, রাজার প্রতি আমার যাহা বক্তব্য এক্ষণে তোমাকে তাহাই বলিতেছি। তুমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানাইবে যে, আমাদিগকে তপস্বী, আপনার উচ্চকুল এবং বান্ধবপ্রণোদিত না হইয়া শকুন্তলার আপনার প্রতি অনুরাগ, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায় তাহার প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখিবেন। তাহার পর তাহার ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবে। ইহার অধিক বধূবন্ধুদিগের আর কিছু বলিবার নাই। তৎপরে তিনি শকুন্তলাকে উপদেশ দিয়া কহিলেন, তুমি যখন পতিকুলে যাইতেছ, তখন তথায় তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই পালন করিতে হইবে। সেই জন্য তোমায় বলিতেছি যে, সর্ব্বদা গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীগণকে প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহারে সন্তুষ্ট রাখিবে, স্বামীকর্তৃক তিরস্কৃত হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না, দাসদাসী পরিজনের সহিত সরল ব্যবহার করিবে, সৌভাগ্যসময়ে কদাচ গর্ব্বিত হইবে না। যে সকল মহিলা এই সমস্ত আচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহিণীপদবাচ্য হন, বিরুদ্ধগামিনীরা কুলের কণ্টকস্বরূপই হইয়া থাকে। বাস্তবিক মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে যে মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার তুলনা জগতে দুর্লভ। শকুন্তলা যখন গৃহিণী বিশেষতঃ রাজ্ঞী হইতে যাইতেছেন, তখন তাঁহার সকলের প্রতি ব্যবহারনীতি শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। মহর্ষি কণ্ব সেকথা বুঝিয়াই তাঁহাকে এই অমূল্য উপদেশ প্রদানের ইচ্ছা করেন। তিনি শান্তি ও পবিত্রতার পুণ্যক্ষেত্র তপোবনে শকুন্তলাকে শিক্ষা ও সংযমের দ্বারা যেরূপ মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া করিয়া তুলিয়াছিলেন, দুষ্যন্তের গৃহে ও সাম্রাজ্যে তাহারই অপূর্ব্ব লীলা সুপ্রতিষ্ঠিত

করার জন্যই এই উপদেশের অবতারণা করিয়াছিলেন। গৃহিণী শকুন্তলার প্রতি উপদেশ যে রাজ্ঞী শকুন্তলারও পালনীয়, সেকথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কণ্ব স্বীয় উপদেশ গৌতমীর অনুমোদিত কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, গৌতমী উত্তর দিলেন যে, ইহার অপেক্ষা বধূদিগের প্রতি আর কি উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে? পরে তিনি শকুন্তলাকে এই উপদেশ বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতেও বলিলেন। কণ্ব শকুন্তলাকে তাঁহায় ও সখীদিগকে আলিঙ্গন করিতে কহিলেন। শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখীরা কি এখান হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইবে?" কণ্ব উত্তর দিলেন, "ইহাদিগকেও অনুরূপ পাত্রে দান করিতে হইবে, গৌতমী তোমার সঙ্গে যাইতেছেন।" তাহার পর কণ্বকে আলিঙ্গন করিয়া শকুন্তলা বলিতে লাগিলেন, মলয়তরু হইতে উন্মূলিতা চন্দনলতার ন্যায় পিতার অঙ্কচ্যুতা হইয়া আমি এক্ষণে দূরদেশে কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব? কণ্ব কহিলেন, "মা, কাতর হইও না। কুলবান্ পতির গৌরবাস্পদ গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, যখন গুরুতর কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিবে, এবং যখন প্রাচীদিকের ন্যায় তপনতুল্য পবিত্র পুত্র লাভ করিবে, তখন আমার বিয়োগজনিত দুঃখ তোমাকে আর কষ্ট প্রদান করিবে না।" সে কথা শুনিয়া শকুন্তলা পিতার চরণতলে নিপাতিত হইলেন। কণ্ব তাঁহাকে উঠাইয়া বলিলেন, "আমি যাহা ইচ্ছা করিতেছি তোমার তাহাই ঘটিবে।" তাহার পর শকুন্তলা সখীদিগকে একসঙ্গে আলিঙ্গন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা দুইজনে শকুন্তলাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন যে, রাজা যদি তোমাকে চিনিতে ইতস্ততঃ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীটি দেখাইও। শুনিয়া শকুন্তলা বলিলেন, "সে আবার কি? তোমাদের সন্দেহে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে।" সখীরা উত্তর দিলেন, "ভয় করিও না, স্নেহে পাপাশঙ্কা করিয়া থাকে।" বেলা হইতেছে দেখিয়া শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। শকুন্তলা আশ্রমের দিকে চাহিয়া কণ্বকে কহিলেন, "পিতঃ আবার কবে তপোবন দেখিতে পাইব?" কণ্ব উত্তর দিলেন, "দীর্ঘকাল চতুঃসাগরব্যাপিনী ধরিত্রীর সপত্নী থাকিয়া, অপ্রতিহিতপ্রভাব পুত্রকে তাহার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, পতির সহিত আবার এই প্রশান্ত আশ্রমে আগমন করিবে।"

তাঁহাদের আলাপন গাঢ় হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, গৌতমী শকুন্তলাকে বলিলেন যে, বেলা হইয়া উঠিতেছে আর বিলম্ব করিও না, এবং কণ্বকেও কহিলেন যে, আপনিও প্রতিনিবৃত্ত হউন। কণ্ব শকুন্তলাকে বলিলেন, "যাই মা, তপস্যার ব্যাঘাত হইতেছে।" শকুন্তলা পুনর্ব্বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তপঃক্লিষ্ট পিতার শরীর আমার চিন্তায় আরও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিবে।" কণ্ব দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত উত্তর দিলেন,"তোমার স্থাপিত কুটীরদ্বারে অঙ্কুরিত নীবারাবলি অবলোকন করিয়া আমার সকল কষ্টই দূর হইবে,যাও মা আর বিলম্ব করিও না,তোমার পথে কল্যাণ বর্ষিত হউক।"তাহার পর শকুন্তল গৌতমী,শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শকুন্তলাকে যাইতে দেখিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা বলিয়া উঠিলেন,"সত্য সত্যই কি শকুন্তলা বনরাজ্য হইতে অন্তর্হিত হইল ?"কণ্ব তাঁহাদিগকে শান্ত হইতে কহিলে,তাঁহারা বলিলেন, "শকুন্তলাশূন্য তপোবনে কিরূপ প্রবেশ করিব ?" মহর্ষি তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন। "শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইয়া শান্তিলাভ করিলাম ; কন্যা পরের ন্যাস্তধনস্বরূপ, আজ যাহার ধন তাহাকে তাহার নিকট পাঠাইয়া আমার অন্তরাত্মা প্রসন্নতা লাভ করিল।"

সদাচার।

বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুই প্রকার। তন্মধ্যে যেটি বাহ্য শৌচ তাহাই সদাচারের প্রধান অঙ্গ। সদাচার অর্থে সাধুসম্মত আচার বা শিষ্টাচার। ইহা একাধিক অর্থবোধক। তাহার মধ্যে বাহ্য সদাচারই উপস্থিত

আলোচ্য বিষয়। সদাচার ও সদাচারণ এক নহে। সদাচার স্বদেহ-সাপেক্ষ, সদাচারণ বা সদ্ব্যবহার পরদেহমনসাপেক্ষ। সদাচারণ সদাচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম হইতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের অনুষ্ঠেয় ধর্ম বলিয়া প্রথম স্তরের অনুষ্ঠেয় ধর্ম সদাচারের সহিত ইহার আপেক্ষিকতা আছে। ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে কেহ কেহ এই আপেক্ষিকতা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বোধ হয় বিনা নক্সায় কেবল এক তুলির টানেই সুন্দর চিত্রকার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব হইতে পারে। ইহা যে ভ্রমাত্মক সংস্কার তাহা পরে প্রমাণিত হইবে।

সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই স্ব স্ব ধর্ম্মোক্ত সদাচারের প্রশংসা আছে। অন্তরে অন্তরে তুমি ধার্ম্মিক হও, কিন্তু তোমার শিষ্টপরম্পরাগত সদাচার পালনের প্রয়োজন নাই, কোনও ধর্ম্মে এরূপ উপদেশ দিবে না। মনে কর, জন (John) এক জন ধর্ম্মপরায়ণ খ্রীষ্টান। হিন্দুর আচরিত সদাচারে আকৃষ্ট হইয়া যদি জন (John) যীশুমামের নামাবলী গায়ে দিয়া গির্জ্জাঘরে কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক "Our father which art in heaven." হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা ইত্যাদি প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ভালমন্দ কোনও খৃষ্টানই এই বিসদৃশ দৃশ্য সহ্য করিবে না, প্রত্যুত শিষ্টপরম্পারগত আচারভ্রষ্ট জনকে (John) উচিত শাস্তি দিবে, কারণ আচার ও ধর্ম্মের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে এ বিশ্বাস তাহাদের আছে।

যেমন সকল বস্তরই স্থূল সূক্ষ্ম দুইটা অবস্থা আছে, ধর্ম্মেরও সেইরূপ সূক্ষ্মাবস্থার অতিরিক্ত একটা স্থূল অবস্থা না থাকিয়া পারে না। আমাদের আলোচ্য বিষয় সদাচার ধর্ম্মেরই স্থূল অবস্থা বা বিকাশ বলা যাইতে পারে। তোমার দেহটা কে গড়িয়াছে? তুমিই গড়িয়াছ। কেবল জাননা যে তুমিই তোমার স্রষ্টা। অথচ একটু বোধ হয় চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিবে যে সূক্ষ্মরূপী তুমিই তোমার দেহের মধ্যে আপাদমস্তক অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছ। কেবল বুঝিতে পারিতেছ না যে কিসে কি হইতেছে। তাহা যদি হয়, তবে ধর্ম্মই যে শাস্ত্রের মধ্যদিয়া সূচিত হন, এবং আচাররূপে স্থূলাবস্থায় প্রকটিত হন, ইহা স্বীকার করিতে বাধা কি?

সদাচারপালন ব্যতীত ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যাইতে পারে এই অভিনব মতটী

ভারতের নব্যযুগে একটি নূতন সৃষ্টি। বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের যুবক ও প্রৌঢ়দিগের মধ্যে এই অভিনব মতের দিন দিন প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। বৃদ্ধদের মধ্যে কেহ কেহ দায়ে পড়িয়া কিয়ৎপরিমাণে সদাচার পালন করেন বটে, কিন্তু তাহা অল্প দিনের জন্য, আর আচারের প্রতি নিষ্ঠা তাহার কারণ নহে, মহিষগললগ্নঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ তাহার কারণ।

কেন যে আমাদের মধ্য হইতে দিন দিন সদাচারের লোপ হইতেছে, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অনেকের মুখে সেই পুরাতন কথাই শুনিতে পাই, যথা, ইংরাজীশিক্ষাই আমাদিগকে আচার ভ্রষ্ট করিতেছে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সঙ্ঘর্ষে প্রাচ্যের অবনতি অবশ্যম্ভাবী ইত্যাদি।

এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। চোরে চুরী করিলে কামারকে ধরিয়া মারপিট করিতে পার না। ইংরাজীশিক্ষা মুমূর্ষু ভারতের জীবন দান করিয়াছে। ভারতের এখন পুনঃস্বাস্থ্যলাভোন্মুখ অবস্থা। যে সকল কদাচার আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাদেরই দোষে। ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়া যে পাশ্চাত্য জ্ঞান আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছে, তাহাকে জীর্ণ করিয়া তদুৎপন্ন সুধাপানের ভাগী হইতে আমরা সকলে সমর্থ নহি। তাহা হইলে আজি এদশা ঘটিত না। কেবল ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে কেন সকল প্রকার শিক্ষাসম্বন্ধেই এ কথা বলা অন্যায় হইবে না যে, অধিকারীভেদই শিক্ষার ফলবৈষম্যের প্রধান কারণ। যেমন সূর্য্য বিভিন্ন বর্ণের সার্সির ভিতর দিয়া তত্তদ্বর্ণের আলোকে গৃহমধ্য আলোকিত করেন, সেইরূপ একই উপদেশ বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন মানবের আপনাপন সংস্কারানুরূপ জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে।

যাহা হউক এই যে বিভিন্ন প্রকৃতির কথা বলা হইল, সেই প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র মানবের জীবনসমস্যার একটি সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। বিষয়টি একটু জটিল, তর্কের বিষয় নহে, অনুভবের বিষয়। মানবের বিবিধ গৌণ প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে সকল তিনটি প্রধান প্রকৃতির অন্তর্ভূত। যে কোনও প্রকার দোষগুণবিশিষ্ট হউক না কেন, মানুষ সেই তিনটি প্রকৃতির একটিকে মুখ্যরূপে আশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই জন্য বলা হইয়া থাকে, মানুষের তিন

প্রকৃতি; একটির নাম দৈবী, একটির নাম আসুরী ও একটির নাম রাক্ষসী। দৈবী প্রকৃতি সত্বগুণপ্রধান, আসুরী প্রকৃতি রজোগুণ প্রধান, আর রাক্ষসী প্রকৃতি তমোগুণপ্রধান। যে মানুষ দৈবী প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিই তাহার প্রধান লক্ষ্য। সকলে যেমন সংসার করে সেও তেমনি সংসার করে, বরং সে সকলকে লইয়া অপরের অপেক্ষা ভালরূপেই সংসার করিতে পারে। প্রভেদ এই যে, সকলকে ছাড়িয়া থাকিতে তাহার তত অসুবিধা বোধ হয় না, কিন্তু সে না থাকিলে সকলেরই অসুবিধা ঘটে। ত্যাগই তাহার ধর্ম্ম। যে আসুরী প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে, বিষয়ভোগের প্রতিই তাহার লক্ষ্য এবং ভোগ্য বস্তুমাত্রের প্রতি তাহার প্রবল অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। অনুরাগে ভেদজ্ঞান জন্মায়, সুতরাং সে ব্যক্তি সকলকে লইয়াই সংসার করিতে পারে না, সকলেও তাহাকে চাহে না। যে রাক্ষসী প্রকৃতি লইয়া সংসারে আসিয়াছে, তাহারও বিষয়ভোগেই লক্ষ্য, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, আসুরীপ্রকৃতিসম্পন্ন লোক অনুরাগপ্রধান, আর রাক্ষসী-প্রকৃতিবান্ লোক হিংসাপ্রধান, আসুরিক প্রকৃতির অনুরাগ কৌশলদ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিরক্ষিত হয়, রাক্ষসীপ্রকৃতির ভোগেচ্ছা হিংসা, অসূয়া ও ক্রূরতা দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাঁহারা অবহিত হইয়া পরীক্ষা করিলে ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, সংসারের প্রায় চৌদ্দ আনারও অধিক লোক আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতির আদান লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। শাস্ত্র ইহাদের লইয়া যত ব্যস্ত, যত উৎকণ্ঠিত, ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র দৈবীপ্রকৃতিবান্ মানবের জন্য তত ব্যস্ত, তত উৎকণ্ঠিত নহেন। দরিদ্র পুত্রের প্রতিই মাতার অধিক দয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এমন মাকেও (শাস্ত্রজননীকে) আমরা যত্নের সহিত বাড়ির বাহির করিয়া দিতেছি। আমরা দেশহিতৈষী কিনা, সেইজন্য এরূপ ঘটিতেছে। ব্যবহারিক জগতেও দেখিতে পাই দিনরাত 'খুঁটিনাটি' ধরেন বলিয়া দেশের বসবাস রক্ষা করিবার জন্য আমরা জননীকে দেশে রাখিয়া পত্নীকে লইয়া বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বিদেশে দূরে বাস করিয়া থাকি। শাস্ত্রজননীকেও বোধ হয় সেই জন্য অর্থাৎ বিষয়ভোগের বিঘ্নবিবেচনায় দূরে রাখিবার জন্য

ভট্টাচার্য্যের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি। ভাবি,মা দেশের বসবাস রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু দেশেও ম্যালেরিয়া, মার আর নিস্তার দেখি না। তবে মা যদি সাধুর হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা।

ত্রিবিধপ্রকৃতিসম্পন্ন মানবের লক্ষণ সঙ্ক্ষিপ্ত ভাবে বলিয়াছি। এখন বলি যে, এই আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করাই মানবের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং এই কর্ত্তব্য আচরণের প্রথম সোপানই সদাচার-পালন। কে কোন্ প্রকৃতির মানুষ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য শাস্ত্রে প্রথমতঃ অধিকারীনির্ব্বিশেষে সমান আচার ও সমান উপাসনাবিধি আদিষ্ট হইয়াছে। উদ্দেশ্য, আচার ও উপাসনার (প্রাথমিক উপাসনা সন্ধ্যাবন্দনাদির) কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া প্রকৃতিগুলি ধরা পড়িবে। একবার প্রকৃতিগুলি ধরা পড়িলে অনুষ্ঠানবিধির নির্ব্বাচন করিতে সময় লাগে না। এই জন্য প্রথমেই সদাচারপালনের আদেশ। প্রবল জ্বরাবস্থায় প্রয়োজনানুরূপ বিবিধ ঔষধপ্রয়োগের ব্যবস্থা থাকিলেও উপবাসটি যেমন রোগীর পক্ষে প্রথম ও প্রধান পথ্য, সেইরূপ সংসারব্যাধিপীড়িত মানবের পক্ষে সদাচারপালনই প্রথম প্রধান পথ্য। এই সদাচার যাহাতে বিদ্যমান্ নাই, তাহার প্রতি উচ্চ অঙ্গের কঠোর আচার বা অনুষ্ঠানবিধি কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না।

আর এককথা এই যে, মানবে কতটুকু ভাল ধাতু ও প্রকৃতি আছে, আর কতখানিই বা মন্দ ধাতু ও প্রকৃতি আছে, তদ্বিষয়ে প্রথম জীবনেই কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। সময় থাকিতে দেহকে সুস্থ ও দৃঢ় করায়, এবং প্রাথমিক উপাসনা, সন্ধ্যাবন্দনাদি দ্বারা মনকে কিঞ্চিৎ সবল ও নির্ম্মল করায় অনিষ্ট হইতে পারে, একথা পৃথিবীর ইতিহাসে লেখে না, তবে বাঙ্গলার ইতিহাসের কথা স্বতন্ত্র। কৈশোর হইতে দেহ-মনপ্রাণকে অল্পে অল্পে সুযন্ত্রিত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে জমাখরচের খাতায় কিছু কিছু ওয়াশীল পড়িবারই কথা। নচেৎ চিরকাল স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রেরণায় তাবৎকর্ম্ম চালিয়া দিয়া হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর মানব যদি খাতাখুলিয়া ওয়াশীলের স্থানে শূন্য দেখে, তখন বিরলে নীরবরোদনে

তাহার বুকে বড়ই ব্যথা পাইবার কথা। তখন স্তোত্রপাঠে দুনয়নে দর-দরিতধারা বহিলে ফল বেশি হইবে না, কেননা তখন ভিতরে বাহিরে পচিতে আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রেয়মার্গের আশ্রয়ে ঈশ্বরসাধনাই কর, বা প্রেয়মার্গের আশ্রয়ে বিষয়-সুখসাধনাই কর, উভয় সাধনাতেই প্রাণান্তপণ যুদ্ধের প্রয়োজন। দুই প্রকার যুদ্ধেই দুর্গের আশ্রয় লইতে হয়, নচেৎ শত্রুর বল বাড়িবে। আচার ও সংযম শ্রেয়মার্গে সাধকের পক্ষে দুর্গস্বরূপ, আচার ও নীতি প্রেয়মার্গে সাধকের দুর্গস্বরূপ বিবেচনা করা উচিত। উভয় পথের সাধকেরই আচার অবলম্বন অপরিহার্য্য। আচার ব্যতীত ধর্ম্ম টিকে না, ধর্ম্ম ব্যতীত ভোগে সাফল্যলাভ হয় না। কোনও সম্রাট্ কোনও রাজা ধর্ম্মহীন জীবন লইয়া বিষয়-ভোগে সফলতালাভ করিতে পারেন নাই। ফ্রান্সনরপতি পঞ্চদশ লুই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

যেমন অশ্বকে চালকের ইচ্ছাধীনে চালিতে হইলে প্রগ্রহের প্রয়োজন, তদ্রূপ মনকে বশে রাখিতে হইলে শাসনের প্রয়োজন। এই চিত্তশাসনের নাম শম অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয়নিগ্রহ। ইহা আলোচ্য বিষয় সদাচার অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম। এমন অবস্থা ঘটিতে পারে যে, যদিও দেহ সদাচারে রক্ষিত হইতেছে বটে, কিন্তু স্বাধীন মন পাপচিন্তায় রত আছে, ভিতরে ভিতরে বড়ই দাহ, সেইরূপ অবস্থায় আচারপালনে ফল কি? ইহার উত্তর এই যে, যাহার মনে নরক, দেহপাতের পর তাহারই নরকে পতিত হইবে, কিন্তু জীবনে তাহার দেহটা আচার কর্তৃক রক্ষিত থাকায় সমাজ তাহা কর্তৃক উদ্বেজিত হইবে না। লজ্জা দৈবীপ্রকৃতির একটি লক্ষণ। আচারবান্ লোক লজ্জার খাতিরেও পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হয়, সমাজের উদ্বেজক হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত শত শত। অন্তরেন্দ্রিয়নিগ্রহে অসমর্থ ব্যক্তিকেও সদাচার পালন করিতে হইবে। যেখানে দুইদিক্ নষ্ট হইতে-ছিল, সেখানে একদিক রক্ষা পাইবে। এখন বোধ হয় বলিলে অন্যায় হইবে না যে, সদাচার কর্ত্তার ইচ্ছামূলক নহে, বরং বাধ্যতামূলক।

এখন হিন্দুর সর্ব্ববাদীসম্মত পরলোকতত্ত্বসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ইহা হইতে আরও বুঝিতে পারা যাইবে

যে, আচারপালন কেন বাধ্যতামূলক বলিলাম। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, দুর্ব্বলাধিকারীর পক্ষে কেবল শাস্ত্রবিহিত আচারপালন করিয়াই কাল-যাপন করা কর্ত্তব্য, কেননা তাহা হইলে মৃত্যুর পরে তাহার উচ্চগতি না হইতে পারে, কিন্তু অধোগতি হইবে না। মৃত্যুর পরে তিন প্রকার গতি হইতে পারে। প্রথম দেবযানে, দ্বিতীয় পিতৃযানে, তৃতীয় অসূর্য্যালোকে। কঠিন জ্ঞান ভক্তি সাধনা দ্বারা জন্মিলে, অর্থাৎ আত্মযোগে অদ্বৈতপরমাত্ম-জ্ঞান, অথবা ঈশ্বরযোগে আত্মা ইষ্টদেবতার অভেদজ্ঞান জন্মিলে, উত্তম গতি দেবযান মার্গে গমন হইতে পারে। শ্রুতিস্মৃতিবিহিত আচারপালন ও সঙ্গে সঙ্গে দেবতার উপাসনা করিলে, সকাম উপাসক মধ্যমগতি প্রাপ্ত অর্থাৎ পিতৃ-যানমার্গে গমন করিতে পারেন। আর শাস্ত্রবিধি (বেদ ও বেদের অবিরোধী স্মৃতিপুরাণ তন্ত্রমাত্র, অন্যশাস্ত্রাখ্য গ্রন্থ নহে) না মানিয়া কামকারতঃ অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ও স্বেচ্ছাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া কেবলই প্রাণধারণ ও পানভোজনাদি ব্যাপারে নিরত থাকিলে, অথবা ঐ সকল কর্ম্মের সহিত আপনার ঈপ্সিত বিধানে দেবতার উপাসনা করিলে, দেহত্যাগের পর নিকৃষ্ট জীব বা স্থাবরাদি জন্ম হইতে পারে। ইহাকে অসূর্য্যালোক অর্থাৎ অসুরগণের গন্তব্য লোক বলে। আত্মজ্ঞানবিমুখ লোককে অসুর বলা হইল। এবিষয়ে প্রমাণ—

> "অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
> তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ শ্রুতি।
> অথৈতয়োঃ পথোর্ন্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রানি
> অসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি। জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ
> তৃতীয়ং স্থানম্। শ্রুতি।
> যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।"
> ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥ ভঃ গীতা।

আচার ও উপাসনা আপনার পছন্দমত করিয়া লইতে পারা যায় না। কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য আর কোন্ কর্ম্মই বা অকর্ত্তব্য ইহার অবধারণবিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।

সদাচার মানবের আত্মজ্ঞানলাভের অনুকূলেই কার্য্য করে, কদাচ শুভানুষ্ঠানের প্রতিকূল হইতে দেখা যায় না। যদি কেহ যথার্থ ই আধ্যাত্মিক উন্নত স্তরে উঠিয়া থাকেন, তাহা হইলে সদাচার (কর্ম্ম) তাঁহাকে আপনিই ত্যাগ করিয়া যাইবে, সে অবস্থায় তাঁহার আচার ত্যাগ করিবার প্রয়োজনই হইবে না। "প্রারব্ধান্তে ঘনা ইব" কর্ম্ম তখন আপনিই চলিয়া যায়। কোথাও কিছু নাই, অবিচার ছাড়িয়া বিচারে নামিলে কেবল কালনষ্টমাত্র। সদাচার মানুষকে পাকাইয়া কমলালেবুর মত করিতে পারে, মাকালফলের মত করিবে এইরূপ ভয়ের কারণ দেখিনা। সদাচারের মাণদণ্ড আত্মপ্রসাদ। যদি আচারপালনে আত্মপ্রসাদ উদ্রিক্ত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে কোথাও দোষ ঘটিতেছে। যেহেতু দোষ থাকিতে আত্মপ্রাসাদ আসিবে না। সদাচার-বর্জ্জিত ধর্ম্মধ্বজী হওয়া অপেক্ষা আচারপূত নগণ্য হইয়া থাকাই ভাল।

শ্রীগুরুদাস সান্ন্যাল।

আলিবৰ্দ্দী খাঁ।

(চরিত্রসমালোচনা।)

যাঁহারা মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হইয়া বঙ্গরাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রজাপালন ও শত্রুদমন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগের অত্যাচারে যখন সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিতেছিল, নবাব আলিবর্দ্দী তখন তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য আপনার সমস্ত রাজত্বকালই অতিবাহিত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থ,সর্ব্ব-সাধারণ প্রজা। বিশেষতঃ কৃষকদিগকে অভয় বাণী প্রদান করিয়া,তাহাদিগের কষ্ট নিবারণ ও শান্তভাবে অবস্থানের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন। রাজ্য

আলিবর্দী খাঁ
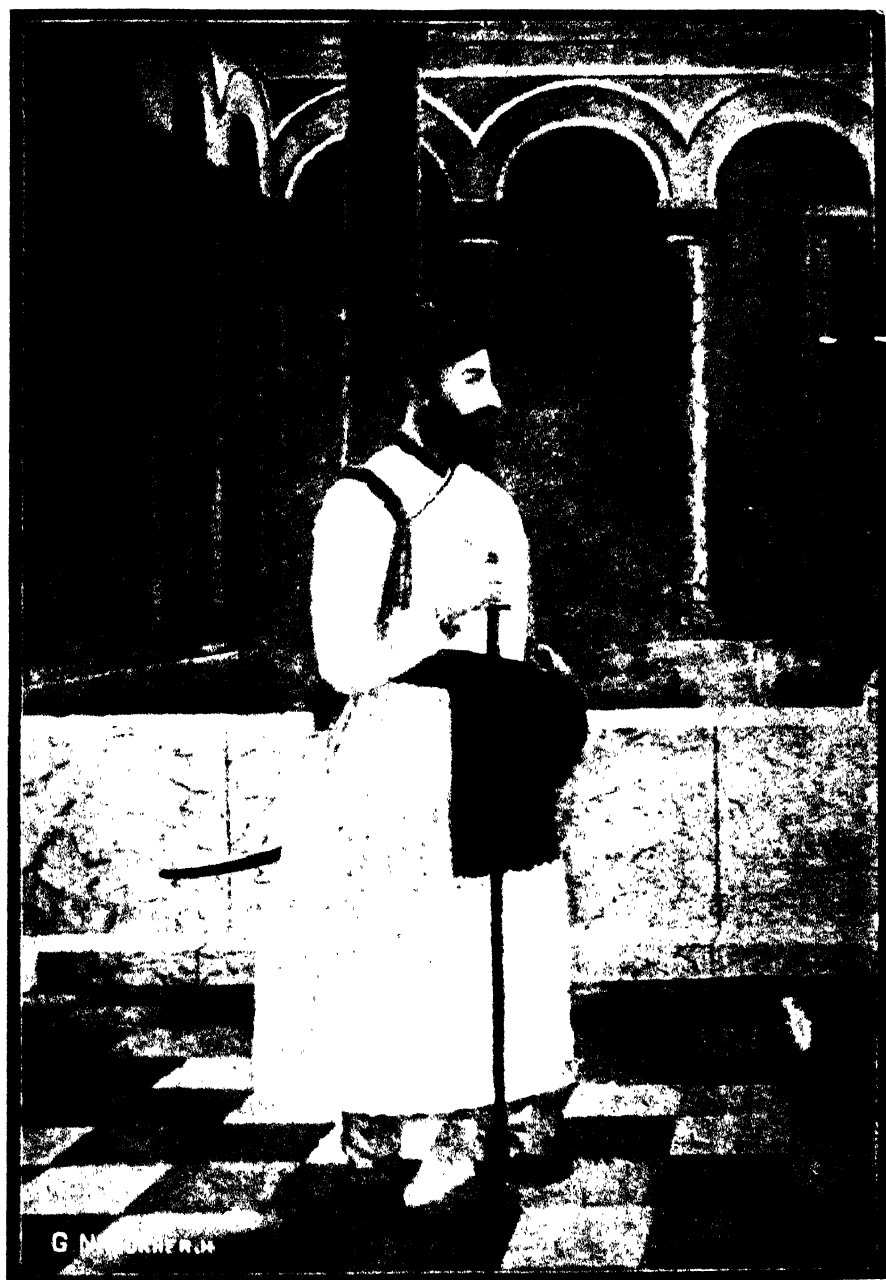
Mohila Press, Calcutta.

শাসনে কোমলতা বা দয়াই তাঁহার প্রধান অবলম্বনীয় ছিল, তাঁহার রাজত্বে বাস করিয়া লোকে পিতার জানুদেশে অথবা মাতার ক্রোড়ে অবস্থান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শান্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। * আমরাও তাঁহাদের উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া থাকি। বাস্তবিক, মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত প্রজাগণের প্রতি শান্তিবিতরণের জন্য নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ যেরূপ আন্তরিক যত্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল বলিয়াই বোধ হয়। সাধারণ প্রজার ন্যায় জমীদারেরাও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। আলিবর্দ্দীর রাজত্বকালে জমীদারদিগের স্কন্ধে কোন কোন করভার স্থাপিত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের সময় নবাবকে সার্দ্ধকোটি টাকা অগ্রিম প্রদান করিয়াছিলেন। † কর্ম্মচারিগণের প্রতি তিনি শতধারে অনুগ্রহ বর্ষণ করিতেন, সেই অনুগ্রহফলে তাঁহাদের প্রায় সকলেই সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। উদারতায়ও তিনি অতুলনীয় ছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ হিন্দু মুসলমাননির্ব্বিশেষে উচ্চপদে কর্ম্মচারিনিয়োগ করিতেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালীগণের হস্তে সেনাপতিত্ব ও রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করিয়া তিনি ঔদার্য্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ উদারতায় তিনি দিল্লীশ্বর আকবরশাহ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না।

সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার চরিত্রবলই শ্রেষ্ঠ ছিল। এই চরিত্রবলে তিনি

* His administration was so full of lenity, and his attention so intense to the security and quiet of the subject and of the husbandman especially, that none of them can be said to have been so much at their ease on their father's knees or in their mother's lap." (Mutaqherin)

† "The Zemindars were so well pleased with his conduct, that during the war with the Mahrattas they advanced him a crore and a half of rupees." (Stewart)

আকবরকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। ইতিহাসে তাঁহার একমাত্র বেগমের কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। আকবরের জীবনীলেখক তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নৌরোজা ব্যাপার লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। আলিবর্দ্দী খাঁ কিন্তু নৃত্য, গীত বা স্ত্রীলোকদিগের সহিত আলাপন পর্য্যন্ত ভাল বাসিতেন না। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি গাম্ভীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। চরিত্রদোষ বা পানদোষপ্রভৃতি তাঁহার জীবনে কখনই লক্ষিত হয় নাই।* এই চরিত্রদোষ ও পানদোষের জন্য তিনি তাঁহার আত্মীয়স্বজনকেও সতর্ক করিয়া দিতেন। তাঁহার প্রিয়পাত্র সিরাজউদ্দৌলাকেও তিনি তজ্জন্য উপদেশ প্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু সিরাজ তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে পারেন নাই। তবে নবাবের অন্তিম শয্যায় কোরান স্পর্শ করিয়া তিনি যে পানদোষ পরিহারের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিপালনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রসম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ থাকায়, তিনি অন্য পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের সহিত তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। আফগানগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া আনার সময় আমরা তাহা অবগত হইয়া থাকি। সিরাজউদ্দৌলাকে তিনি প্রায়ই একাকী থাকিতে দিতেন না। মহারাষ্ট্রীয় দমনের সময় সিরাজ সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিতেন, এবং কোন কোন সময়ে স্বীয় বীরত্বেরও পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজ যখনই অবকাশ পাইতেন, তখনই উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় প্রদান করিতেন। নবাব তাহা জ্ঞাত হইয়াই তাঁহার প্রতি বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিতেন। এই জন্য আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে, আলিবর্দ্দী খাঁ

* "Aaly-verdy-qhan from his very youth shewed a serious turn of mind, averse from profligacy and debauch, and from everything that savoured of drunkenness; nor did he seem to have much taste for such amusements as music and dancing, or for the conversation of women."

(Muta-qherin)

কখনও সিরাজউদ্দৌলাকে "আলালের ঘরের দুলাল" করিতে চেষ্টা করেন নাই। সিরাজের উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহারই নিজকৃত, আলিবর্দ্দী কদাচ তাহার সমর্থন করেন নাই। বরঞ্চ তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষরূপ লক্ষ্য ছিল। তিনি সিরাজ উদ্দৌলাকে যার পর নাই স্নেহ করিতেন সত্য, এবং তাঁহার সে স্নেহে অনেক সময়ে দুর্ব্বলতাও প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সিরাজের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি যে তাঁহার সর্ব্বদাই লক্ষ্য থাকিত ইহাও সত্য। যিনি নিজ চরিত্রবলে সুদৃঢ়, প্রিয়পাত্রই হউক, বা অপ্রিয়পাত্র হউক, তিনি কখনও কাহারও উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থন করিতে পারেন না।

নবাব চরিত্রবলে সুদৃঢ় থাকিলেও, তাঁহার পরিবারমধ্যে কিন্তু পদে পদে চরিত্রহীনতারই পরিচয় পাওয়া যাইত। নবাব তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখিত থাকিতেন। তিনি অথবা তাঁহার মহয়সী বেগম পরিবারবর্গের দুশ্চরিত্রতা-নিবারণে সমর্থ হন নাই। তাঁহার ন্যায় তাঁহার বেগমও বহুগুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিও গাম্ভীর্য্যপরিপূর্ণ ছিল, নবাব অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়বলও প্রবল ছিল, অনেক সময়ে তিনি নবাবের হৃদয়দৌর্ব্বল্য দূর করার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এরূপ বুদ্ধিমতী ছিলেন যে, রাজ্য-শাসনেও তিনি নবাবের সহায়তা করিতেন।

গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য ও চারিত্র্যে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ যে উন্নতচরিত্র পুরুষ ছিলেন আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম। তদ্ভিন্ন দয়াদাক্ষিণ্যে, রাজ্যশাসনে, ও প্রজাপালনেও যে তিনি অতুলনীয় ছিলেন, আমরা তাহারও আলোচনা করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত তিনি একজন দূরদর্শী ও রাজনীতিবিদ্ পুরুষ ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত অবিরত যুদ্ধ করিয়া তিনি তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেও তৎকালে তাহাদের প্রবল শক্তিকে অভিভূত করা সম্ভবপর নহে বিবেচনা করিয়া, তিনি তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া বঙ্গরাজ্য শান্তিবারিতে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে বৈদেশিক ইংরেজ, ফরাসীগণ দিন দিন আপনাদের ক্ষমতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করায়, তিনি ভবিষ্যৎ দৃষ্টিবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, উঁহারাই কালে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিবেন, এবং সে বিষয়ে ইংরেজদিগকেই তিনি

অগ্রণী বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করার জন্য তিনি সিরাজ উদ্দৌলাকে উপদেশ দিয়া যান। তাঁহার কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যাহারা গোপনে ষড়যন্ত্রের ভাব প্রকাশ করিত, তিনি তাহা অচিরেই বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করিতেন। আলিবর্দ্দী খাঁ জমীদার, প্রজা, হিন্দু মুসলমান সকলকেই সন্তুষ্ট রাখিতে যত্ন পাইতেন। ফলতঃ তিনি যে একজন বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা থাকায়, তিনি দুই এক স্থলে কৌশল প্রদর্শন করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন করিয়া স্বীয় চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়া গিয়াছেন। সরফরাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করিয়া তিনি যেরূপ কৌশলে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার চরিত্রের ভীষণ কলঙ্ক তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। তদ্ব্যতীত মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যাকাণ্ড বিশ্বাসঘাতকতার আর একটি দৃষ্টান্ত ও তাঁহার চরিত্রের আর একটি প্রধান কলঙ্ক। ইহাতেই বলিতে হয়, মনুষ্য চরিত্র কদাচ নির্ম্মল হইতে পারে না। বিশেষতঃ যাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত, তাঁহাদের নির্ম্মলচরিত্র হওয়া অসম্ভব। আলিবর্দ্দী খাঁর বীরত্বও চিরপ্রসিদ্ধ। তিনি যেমন বিবেচক ও তীক্ষবুদ্ধি সেনাপতি ছিলেন, সেইরূপ নির্ভীক সৈনিকের ন্যায়ও কার্য্য করিতেন।* সরফরাজের সহিত যুদ্ধে, মহারাষ্ট্রীয় ও আফগান সমরে তাঁহার রণকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। রণপ্রিয়তার ন্যায় তাঁহার শিল্পপ্রিয়তারও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ক্রীড়াকৌতুকেও তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি শিকার করিতেও ভাল বাসিতেন। ফলতঃ তাঁহার চরিত্র নানাবিধ সদ্গুণেরই আধার ছিল।

চরিত্রবলে উন্নত হওয়ায়, তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানেও রত থাকিতেন, তিনি স্বীয়

* "A prudent, keen, general, and a valorous soldier, there are hardly any qualifications which he did not possess; and few are the virtues which shall not be found to have made part of his character." (Muta-qherin)

ধর্ম্মপ্রতিপালনে সর্ব্বদা যত্নবান ছিলেন। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি নিজ ধর্ম্মের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। আমরা নিম্নে মুতাক্ষরীনকারের লিখিত তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছি। সূর্য্যোদয়ের প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আলিবর্দ্দী খাঁ শয্যা পরিত্যাগ করিতেন, এবং শৌচ ও স্নানাদি শেষ করিয়া ও কর্ত্তব্যাতিরিক্ত উপাসনায় রত হইতেন। তাহার পর সূর্য্যোদয়ের পর নিয়মানুসারে নমাজাদি করিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত কাফি পান করিতেন। সপ্তম ঘটিকার সময় নবাব দরবারগৃহে উপবিষ্ট হইতেন, সেই সময়ে সৈনিক ও শাসন সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ও সম্ভ্রান্ত জনগণ সমাগত হইয়া আপনাপন বক্তব্য প্রকাশ করিলে, নবাব স্থির ভাবে সমস্ত শ্রবণ করিয়া যথাযথ উপদেশ প্রদান করিতেন। ইহাতেও প্রায় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইত। তাহার পর তিনি একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধুগণ এবং নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ, সৈয়দ আহাম্মদ খাঁ ও সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতি আত্মীয়গণ সমাগত হইতেন। তৎপরে প্রায় এক ঘণ্টা কাল নানাপ্রকার গল্পকথনে অতিবাহিত হইত। এই সময়ে তিনি কোন কোন আহার্য্য প্রস্তুতের জন্য পাচকগণকেও উপদেশ দিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিয়াও আপনাদের প্রার্থনা জ্ঞাত করাইতেন। আহার প্রস্তুত হইলে তিনি বিশিষ্ট বন্ধু ও অভ্যাগতগণের সহিত ভোজনে রত হইতেন। কখনও কখনও তিনি অন্তঃপুরবাসিনীগণের সহিতও ভোজন করিতেন। কিন্তু কোন অপরিচিত মহিলা তাঁহার সহিত ভোজন করিতে পাইতেন না। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তিনি শয়নাগারে প্রবিষ্ট হইয়া কাহিনীকথকের কথা শুনিতে শুনিতে কিছুক্ষণ নিদ্রামগ্ন থাকিতেন। দ্বিপ্রহরের এক ঘটিকার সময় শয্যা হইতে উথিত হইয়া শৌচাদি শেষ করিয়া মধ্যাহ্ন নামাজ সম্পন্ন করিতেন। তাহার পর কোরানের এক অধ্যায় উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া বৈকালিক নামাজ শেষ করিয়া লইতেন। এই সময়ে তিনি বরফ বা সোরা দ্বারা শীতলীকৃত একপাত্র জল পান করিতেন। সমস্ত দিনের মধ্যে তাঁহার আর জলপানের প্রয়োজন হইত না। তৎপরে পর্দ্দা উত্তোলিত হইলে শিক্ষিত ও শাস্ত্রোক্ত ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিতেন।

অনেক সময়ে একটি স্বতন্ত্র গৃহে তাঁহাদের সহিত কথোপকথন হইত। নবাবের মসনদের সম্মুখে আর একটি মসনদ স্থাপিত হইত। মীর মহম্মদ আলি ফজিল নামে এক সম্ভ্রান্ত শাস্ত্রবিৎ তথায় উপবিষ্ট হইতেন। এই সময়ে কোরান পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা এবং প্রশ্নোত্তরে জটিল বিষয়ের মীমাংসা হইত। এই সকল শাস্ত্রোক্ত ব্যক্তিগণের জন্য তামাকু সেবনেরও ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু নবাব কখনও ধূম্রপান করিতেন না। ইঁহারা গৃহ পরিত্যাগ করিলে, বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃপক্ষ, সংবাদবাহক ও জগৎশেঠ প্রবেশ করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের সংবাদ অবগত করাইতেন। এই সময় রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়ের কথাবার্তা হইত। প্রাতঃকালের ন্যায় এসময়েও রাজ্য-সম্বন্ধে নানা বিষয় কার্য্যের পরামর্শের ব্যবস্থা ছিল। নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ, সৈয়দ মহম্মদ ও সিরাজদ্দৌলাও এই সময়ে সমাগত হইতেন। তদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারীরাও উপদেশ লইতে আসিতেন। তৎকালে আমোদকৌতুকও হইত। এইরূপে দুই ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া যাইত। তাহার পর সন্ধ্যা হইলে গৃহ সকল আলোকিত হইত। নবাব সেই সময়ে নৈশ নামাজ শেষ করিয়া লইতেন। তৎপরে পুরুষগণ গৃহ পরিত্যাগ করিলে, নবাব বেগম সিরাজের বেগম ও অন্যান্য বেগমগণকে লইয়া সমাগত হইতেন। নবাব রাত্রিতে কেবল ফল ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভোজন করিতেন। বেগমগণকে সেই সমস্ত বিতরণ করিয়া দিয়া তিনি স্বয়ং সামান্য মাত্র ভোজনে তৃপ্ত থাকিতেন। বেগমেরা অন্তঃপুরে গমন করিলে প্রহরীগণের অধ্যক্ষ, কাহিনীকথক প্রভৃতি প্রবেশ করিত, এবং শেষোক্ত ব্যক্তি নানা কৌতুকপ্রদ কথায় নবাবের নিদ্রাকর্ষণের চেষ্টা পাইত। রাত্রিতে তিন চারিবার তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইত, এবং সেই সেই সময়ে তিনি কত রাত্রি ও কে কে উপস্থিত তাহার সংবাদ লইতেন। এইরূপে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হইত। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি কিরূপ প্রকৃতির লোকে ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার রাজ্যশাসনে সকলেই যে যারপর নাই সন্তুষ্ট ছিল, আমরা পূর্ব্বে সে কথার উল্লেখ করিয়াছি। বিশেষতঃ তিনি বাঙ্গালীদিগের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ

বর্দ্ধণ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালার আর কোনও নবাব সেরূপ করেন নাই। তজ্জন্য বাঙ্গালীগণ চিরদিনই যে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

মদন-ভস্ম।

(কুমার সম্ভব)

(১)

স্বহস্তে চয়ন করি কুসুমপল্লব
রক্তকরপুটে ধরি আইলা পার্ব্বতী,
মহেশচরণতলে নিবেদি সে সব
ভক্তিভরে নতশিরে করিলা প্রণতি।

(২)

নীলালকমধ্যশোভী নব কর্ণিকার
প্রণামের কালে তাঁর পড়িল ভূতলে;
আশীষি কহিলা শম্ভু—চিত্ত নির্ব্বিকার
"সর্ব্বোত্তম পতিলাভ কর সুমঙ্গলে"।

(৩)

বহ্নিমুখে পতনেচ্ছু পতঙ্গের মত
মদন ধরিল ধনু বুঝি অবসর,
গ্রহণ করিল শর হইয়া আনত
উমার সমক্ষে লক্ষ্য করিয়া শঙ্কর।

(৪)

পদ্মবীজ তুলি উমা মন্দাকিনী হতে
শুষ্ক করি সূর্য্যাতপে গাঁথিয়া যে মালা
আনিলেন করতলে ধরি কোনমতে
তপস্বী গিরিশে দিতে নাগরাজবালা।

(৫)

পার্ব্বতীর প্রীতিহেতু দেব ত্রিলোচন
করিছেন উপক্রম অভীষ্ট-পূরণে,
অমনি অব্যর্থ শর নাম সম্মোহন
যোজিত করিল কাম পুষ্পশরাসনে।

(৬)

চন্দ্রোদয়ে সিন্ধুবক্ষ আকুল যেমন
সহসা তেমনি শিব হইলা বিকল,
উমাবিম্বাধরে দৃষ্টি করিলা স্থাপন
জিতেন্দ্রিয় তবু তিনি ঈষৎ চঞ্চল।

(৭)

উমার (ও) সর্ব্বাঙ্গ বাল কদম্ব সমান
রোমাঞ্চিত, প্রেমভাব করিয়া প্রকাশ,
আনত হইল তাঁর সলজ্জ নয়ান
ঈষৎ বঙ্কিমমুখে আরক্ত আভাস।

(৮)

দমিয়া ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ বলবৎ অতি
চিত্তবিকারের হেতু করি অন্বেষণ
চারিদিকে ত্রিলোচন চান দ্রুতগতি
হেরিলেন কামদেবে বদ্ধশরাসন।

(৯)

মহাক্রোধে রুদ্রদেব ভ্রুকুটি ভীষণ
তপনাশ চেষ্টা হেরি উঠিল জ্বলিয়া,
সহসা ললাটস্থিত তৃতীয় নয়ন
উজলিয়া কালানল এল বাহিরিয়া।

(১০)

"সংহর সংহর প্রভো" ভীম ক্রোধানল,
আকাশে দেবতাকণ্ঠে উঠে আর্তধ্বনি ;
ভবনেত্রজাত বহ্নি হইয়া প্রবল
মীনধ্বজে ভস্মীভূত করিল তখনি।

(১১)

সে দুঃসহ দুঃখপাকে হইল মূর্চ্ছিত
রতি, মদনের প্রিয়, বিগতচেতনা,
সকল ইন্দ্রিয় তাঁর স্তম্ভিত মোহিত,
ভুলিল মুহূর্ত্ততরে হৃদয়যাতনা।

(১২)

বজ্রাঘাতে বৃক্ষসম নাশিয়া মদনে
তপস্যার বিঘ্ন দূর করি মহেশ্বর
অন্তর্হিত হইলেন ভূতগণসনে
স্ত্রীসান্নিধ্য পরিহার করি স্থানান্তর।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ।

আত্মগ্লানি।

(৪)

নীল সমুদ্রের তরঙ্গরাশিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া জাহাজ ছুটিতে লাগিল। চারু "ঊর্ম্মির উপর ঊর্ম্মি, ঊর্ম্মি তদুপরি" দেখিয়া যারপর নাই পুলকিত হইতে লাগিলেন, তিনি সমুদ্রবক্ষে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্তেও তাঁহার মন আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে "অনন্ত সাগরমাঝে দেও তরী ভাসাইয়া" গান করিতে লাগিলেন তাহার পর এক এক বন্দরে প্রতীচ্য-জগতের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইতে লাগিলেন। এইরূপে যথাসময়ে তিনি বিলাতে উপস্থিত হইলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিয়া পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

চারুচন্দ্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিলাতের প্রলোভন ক্রমেই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি প্রথমে দোকানে দোকানে ফিরিতে লাগিলেন, তাহার পর মিটিংএ মিটিংএ বক্তৃতাশ্রবণে ব্যাপৃত হইলেন, অবশেষে থিয়েটারে থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার নেশা বেশ জমিয়া আসিল, পড়াশুনায় ঢিল পড়িতে লাগিল। এক এক বার তিনি পড়িবার জন্য আঁটিয়া বসেন বটে, কিন্তু সেই সময়ে এমন একটি হুজুগ উপস্থিত হয় যে, তিনি তাহাতে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। ফলতঃ বিলাতের নানাপ্রকার প্রলোভনতরঙ্গে চারুচন্দ্র ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার পড়াশুনা কোথায় চলিয়া গেল। তাহার পর পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইলে চারুচন্দ্র কোনরূপে পরীক্ষা দিলেন বটে, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। যথাসময়ে সে সংবাদ নবীনচন্দ্রের নিকট গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন, রামহরি বাবুর একটা কথা খাটিল। তিনি এখানে থাকিলে তাঁহার কথাগুলি নিশ্চয়ই আবার স্মরণ করাইয়া দিতেন। "রামহরি বাবু তখন অবসর গ্রহণ করিয়া নিজ পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এবং নবীনচন্দ্রও অন্যস্থানে বদলী হইয়াছিলেন।

চারুচন্দ্রের যাওয়া অবধি কমলার মন দুঃসহ কষ্টে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, তাঁহার শরীরও দিন দিন কৃশ হইয়া উঠিতেছিল। পুত্রের দূরদেশে যাওয়ায় এবং ভবিষ্যতের নানা চিন্তায় তিনি দিন দিন শুখাইয়া যাইতে ছিলেন। চারুচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই শুনিয়া তিনি বলিলেন, "এখন উপায় ?"

নবীন। উপায় একটা করিতেই হইবে।

কমলা। আর কি পরীক্ষা দেওয়া যাইবে না ?

নবীন। না চারুর বয়স হইয়াছে। এ পরীক্ষা আর দেওয়া যাইবে না।

চারুচন্দ্র যে বয়সে বিলাত গিয়াছিলেন তাহাতে তিনি পড়াশুনা করিয়া একবার মাত্র সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা দেওয়ারই সময় পাইয়াছিলেন। আর পরীক্ষা দেওয়া চলিবে না শুনিয়া কমলা কহিলেন, "তবে চারুকে বাটি আসিতে লিখ. আমি তাহাকে ছাড়িয়া আর থাকিতে পারিতেছি না। বোধ হয় আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না।"

নবীন। ও সব কথা মনে করিতে নাই। এত টাকা খরচ করিয়া পাঠাইলাম, একটা কিছু না হইয়া আসিলে চলিবে কেন ?

কমলা। আবার কি হইবে ?

নবীন। এবার ব্যারিষ্টারী পড়ুক।

কমলা। সে কত দিন পড়িতে হইবে ?

নবীন। তাহা শেষ করিয়া আসিতে তিন চারি বৎসর লাগিবে।

কমলা। আমি তত দিন বাঁচিব না।

নবীন। কেন তুমি মনে ওরূপ ভাবিতেছ ! এতগুলা টাকা নষ্ট করিলাম, তাহার ত একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কমলা। এখন কি আর টাকা লাগিবে না ?

নবীন তার চেয়ে কম লাগিবে। সে যাহা হউক তাহার একটা ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

কমলা। দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন "তোমার যা ইচ্ছা কর, আমি আর কিছুতেই কথা কহিব না। তবে আমার মনে হইতেছে, আমার দিন ফুরাইয়া আসিতেছে।"

নবীনচন্দ্রও মনে মনে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার বহুদিনের রোপিত আশালতা হৃদয়ক্ষেত্র হইতে একেবারে উন্মূলিতা হইয়া গেল। পুত্রকে ম্যাজিষ্ট্রেট করার আশায় তিনি তাঁহাকে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আশার পূরণ হইল না। এদিকে পত্নীর অবস্থা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। নবীনচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে চারুচন্দ্র বিলাতের প্রলোভনতরঙ্গে ডুবিয়া আপনার উদ্দেশ্য পালন করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহাকে আরো কিছুকাল বিলাতে থাকিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন।

প্রিয় চারু,

তোমার পরীক্ষার সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমি অত্যন্ত আশা করিয়া তোমাকে বিলাত পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সে আশা নির্ম্মূল করিয়াছ। যাইবার সময় আমি তোমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলাম, দেখিতেছি তুমি একেবারে তাহা বিস্মৃত হইয়াছ। বিলাতের প্রলোভনে তোমার উদ্দেশ্য ভাসিয়া গিয়াছে। আমি পুনর্ব্বার তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। অতঃপর তুমি ব্যারিষ্টারি পড়িতে আরম্ভ কর

তোমার পিতা

পিতার পত্র পড়িয়া চারুচন্দ্র আনন্দিত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পিতা তাঁহাকে যারপর নাই তিরস্কার করিয়া বাটী যাইতে বলিবেন। বিলাত হইতে বাটী যাইতে তাঁহার আর ইচ্ছা ছিল না। সে যাহা হউক, তিনি পিতার পত্রের উত্তরে শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই বলিয়া জানাইলেন, এবং তাহার পর হইতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

(৫)

ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করিয়া চারুচন্দ্রের সকল বিষয়ের সুযোগ ঘটিল। সিবিল সার্ব্বিসের মত তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে হইত না, তদ্ব্যতীত

অবকাশ ও যথেষ্ট ছিল। তিনি সেই অবকাশে ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ফরাসী দেশে বিলাসের স্রোতটা কিছু বেশী মাত্রায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। ক্রমে চারুচন্দ্র বিলাসস্রোতে ভাসিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পানদোষ, চরিত্রদোষ প্রভৃতি ঘটিল। ব্রাহ্মণসন্তানের নিকট নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম অনেক দিন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিল, এক্ষণে নরকের নানা কেন্দ্র তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া ক্রমে আবর্ত্তমধ্যে নিমজ্জিত করিতে লাগিল। চারুচন্দ্র অধঃপতনের শেষ সময়ে উপস্থিত হইলেন।

এইরূপে কিছুকাল চলিয়া গেলে, চারু চন্দ্রের শেষ পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। তিনি কোনরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। পিতাকে সে সংবাদ পাঠাইলে, তিনি কিছু আশ্বস্ত হইয়া উঠিলেন, এবং চারুচন্দ্রকে সত্বর বাটী আসিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন; কারণ চারুচন্দ্রের মাতা শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। চারুচন্দ্র আজ যাই কাল যাই করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তিনি আর এক খেলা খেলিবার চেষ্টায় ছিলেন। তিনি যে বাসায় থাকিতেন, তথাকার বিধবা ধাত্রীর কন্যা লুসীর সহিত অনেকদিন হইতে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। সেই পরিচয় ক্রমে প্রণয়ে পরিণত হয়। প্রণয় এক্ষণে বিবাহে দাঁড়াইবে কিনা ইহাই চারুচন্দ্র চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি এক এক বার ভাবিতেছিলেন যে, পিতা এ কার্য্যে হয়ত তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন, আবার মনে করিতেছিলেন, মাতাকে বুঝাইয়া বলিলে মাতা পিতাকে শান্ত করিতে পারিবেন। আবার ভাবিতে-ছিলেন, পিতা যদি নিতান্তই শান্ত না হন, তাহা হইলে আমি পৃথক হইয়া থাকিব। আর ব্যারিষ্টারী করিতে হইলে আমাকেত পৃথক হইয়া থাকিবেই হইবে। আহারে পরিচ্ছদে সাহেব না সাজিলে ব্যারিষ্টারীতে কিছুমাত্র পশার জমিবে না। এই সমস্ত ভাবিয়া চারুচন্দ্র লুসীকে বিবাহ করিবেন স্থির করিয়া ফেলিলেন।

চারুচন্দ্র প্রথমে লুসীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। লুসীর বয়সও চারুচন্দ্রের সমান ছিল, সামান্য কিছু কম হইতে পারে।

লুসী বলিল, "আমার অমত নাই। এত দিনের পরিচয় যদি স্থায়ী

হয় তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? তবে মা কি বলিবেন জানি না, কারণ, তোমারা বিদেশী, তোমাদের দেশে মা যাইতে দিবেন কি না বলিতে পারি না।"

চারু। আমি তোমার মাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিব। এক্ষণে তোমার মত হইলে, আমি পৃথিবীকে স্বর্গের ন্যায় মনে করিব।

লুসী। আমার কথাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

চারু। তবে চল, তোমার মার নিকটে যাই।

তাহার পর উভয়ে ধাত্রীর নিকট গমন করিয়া চারুচন্দ্র তাহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলেন। ধাত্রী এদেশের অনেকের সহিত পরিচিত ছিল, সে অনেক বিদেশী ব্যক্তির সেবা করিয়াছে। তদ্ভিন্ন ভারতভূমিকে স্বর্ণ-প্রসবিনী বলিয়াও জানিত। কন্যার ভাগ্য প্রসন্ন জানিয়া সে অনায়াসেই মত দিল। তার পর চারুচন্দ্র লুসীর সহিত বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইলেন। সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি পিতাকে বিবাহের সংবাদটী এইরূপ ভাবে লিখিয়া পাঠাইলেন।

"প্রিয় পিতঃ,

আমি বিশেষ কোন কারণ বশতঃ এখানকার কোন ভদ্রমহিলার কন্যার সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের উভয়েরই পাথেয় সত্বর পাঠাইয়া দিবেন। পাথেয় পাইবামাত্র আমরা ভারতাভিমুখে যাত্রা করিব।

আপনার স্নেহের চারু।"

পত্র পাইয়া নবীনচন্দ্রের মস্তকে অশনিসম্পাত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, "রামহরি বাবুর আর একটী কথা খাটিল। একটী একটী করিয়া তাঁহার সমস্ত কথাই খাটিতেছে। আমি মনে করিয়াছিলাম চারুকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ঘরে লইব, এক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিবেই বা কে, এবং করাইবেই বা কে? বুঝিলাম, এতদিনে আমার বংশলোপ হইল। হায়, হায়! আমার বংশের শেষে কি এই পরিণাম ঘটিল? এদিকেও আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলাম।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দারুণ আত্মগ্লানিতে

দগ্ধ হইতে লাগিলেন। নবীনচন্দ্র নিজে তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, এখন হইতে চারুচন্দ্রের সহিত তিনি আর কোনরূপ সম্পর্ক রাখিবেন না।

(৬)

কমলা সমস্ত শুনিলেন। অনেক দিন হইতে তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন. আধি ও ব্যাধি তাঁহাকে জীর্ণশীর্ণ অবশেষে কঙ্কালাবশিষ্ট করিয়া ফেলিল। চারুচন্দ্র আসিবেন শুনিয়া মধ্যে তিনি একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিলাতে বিবাহ ও নবীনচন্দ্রের সংকল্প শুনিয়া কমলা হৃদয়ে এক তীব্র বেদনা অনুভব করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার ব্যাধি প্রবল হইয়া উঠিল। নবীনচন্দ্র তাঁহার চিকিৎসার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিলেন। কলিকাতায় লইয়া গিয়া বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই রোগের উপসম হইল না। তাঁহারা বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য নবীনচন্দ্রকে উপদেশ দিলেন। কমলা বলিলেন যে, "আমি যখন বাঁচিব না, তখন আমাকে আর কোথায় লইয়া যাইবে, আমার শেষ অনুরোধটি রক্ষা কর। যদি আমাকে পশ্চিমে লইয়া যাইবে, তাহা হইলে কাশীতেই লইয়া চল।" নবীনচন্দ্র কমলার অনুরোধই রক্ষা করিলেন। তাঁহাকে কাশী লইয়া যাওয়াই ব্যবস্থা হইল, এদিকে মাতার অবস্থা শুনিয়া প্রভাবতী তাঁহার সেবাশুশ্রূষার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। চারুচন্দ্রের সহিত নবীনচন্দ্র কোনই সম্পর্ক রাখিবেন না শুনিয়া প্রভাবতীর শ্বশুর বাটির লোকেরা তাঁহাকে মাতার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে কাশী পর্য্যন্ত যাইতেও উপদেশ দিলেন। প্রভাবতী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মাতার অবস্থা দেখিয়া তিনি শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর পিতামাতার সহিত আপনার শিশু পুত্রকন্যা লইয়া তিনিও কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নবীনচন্দ্র চারুচন্দ্রের পত্রের কোনই উত্তর দেন নাই। উত্তর না পাইয়া চারুচন্দ্র অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নবীনচন্দ্র তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি

যে পত্রের উত্তর দিবেন না, ইহা কখনও চারুচন্দ্র মনে করিতে পারেন নাই। তিনি বাটির অসুখবিসুখের কথাও এক একবার মনে করিতেছিলেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত কোন সংবাদ না পাইয়া, বিশেষতঃ তাঁহার হাতে টাকাকড়ি না থাকায়, চারুচন্দ্র অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার একজন বন্ধুকে সমস্ত বিষয় লিখিয়া পাঠাইলেন। চারুচন্দ্রের বন্ধুটি এক অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরসন্তান। তিনি চারুচন্দ্রদিগের বাড়ীর সকল কথা জানিতেন। নবীনচন্দ্রের সংকল্প, কমলার অসুখ, তাঁহাদের কাশীযাত্রা কিছুই তাঁহার অবিদিত ছিল না। চারুচন্দ্র যে দূরদেশে অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি তাহাও বুঝিতে পারিলেন। তিনি সকল কথার উল্লেখ না করিয়া কেবল চারুচন্দ্রের মাতা অসুস্থ এবং তাঁহার চিকিৎসার জন্য নবীনচন্দ্র ব্যস্ত থাকায় টাকাকড়ি পাঠাইতে পারেন নাই, একণে চারুচন্দ্র বিপন্ন জানিয়া তিনি তাঁহাদের পাথেয় পাঠাইতেছেন। এইটুকু পর্য্যন্ত লিখিয়া পাঠাইলেন, এবং তাহাদের আসার জন্য টাকাও পাঠাইয়া দিলেন। চারুচন্দ্র টাকা পাইয়া শ্রীমতী লুসীর সহিত বিলাত পরিত্যাগ করিলেন। জাহাজে আসিতে আসিতে তাঁহার মনে আশা ও নিরাশার নানারূপ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।

এ দিকে নবীনচন্দ্র কমলা প্রভাবতী প্রভৃতি লইয়া কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তথায় একা বাস করিয়া সকলে কমলার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পুণ্যভূমির স্পর্শে কমলার চিত্তে প্রসন্নতা দেখা দিল। তিনি কিছু সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। কষ্ট করিয়া শিবিকার সাহায্যে একদিন অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বরও দর্শন করিলেন, দশাশ্বমেধে গঙ্গাজলও মাথায় লইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার চিত্ত ও শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। একদিন তিনি নবীনচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমারত সময় হইয়া আসিল; একণে চারুকে কি তুমি সত্য সত্যই ত্যাগ করিবে ?"

নবীন।—কি করিয়া তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিব বল দেখি ?

কমলা—সে যদি মেমকে পরিত্যাগ করে !

নবীন—তাহা হইলে পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যবস্থা লওয়ার চেষ্টা করিব।

কমলা—আমার অনুরোধ, যদি পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন তাহা হইলে তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিও না।

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "বিশ্বেশ্বরের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে।"

প্রভাবতীও কহিলেন, "মা তুমি ভাবিও না, বাবা কি চারুকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন?"

কমলা—তুই কি একেবারেই চারুর সহিত দেখা করিবি না?

প্রভা—দেখা হইলেই বা কি? তুমি ওসব ভাবিও না; এক্ষণে সর্ব্বদা অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের কথা মনে কর।

কমলা—তাহাত করিতেছি, কিন্তু মধ্যে মধ্যে চারুর মুখখানা মনে পড়ায় আমার প্রাণটা যেন ধড়ফড় করিয়া উঠিতেছে।

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "তাহার কথা তুমি ভাবিও না, যতই ভাবিবে ততই তোমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িবে।" কমলা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ভাবিব না মনে করিলেও না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। আমি বাঁচি আর না বাঁচি, তাহার আসার খবর পাঠাইয়া দিও।"

নবীন—আগে তুমি সুস্থ হও, পরে সে কথা বিবেচনা করা যাইবে।

নবীনচন্দ্র বা কমলা জানিতেন না যে, চারুচন্দ্রের বন্ধু তাঁহাদের পাথের পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারা বিলাত হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

এইরূপে দুই চারি দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু কমলা ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কাশীতেও দুই একজন কবিরাজ কমলাকে দেখিলেন, কিন্তু তাঁহারাও জীবনের আশা নাই বলিয়া প্রকাশ করিলেন। ক্রমে তিনি শয্যার সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার পর তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত হইল। কমলা নবীনচন্দ্রের পদে মস্তক রাখিয়া কাশীধামে আপনার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। নবীনচন্দ্রের চক্ষু বাহিয়া দরদরধারে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। প্রভাবতী ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, এবং অভিমানভরে পিতাকে বলিলেন, "বাবা, তোমারই জন্য আমরা মাকে হারাইলাম।"

নবীনচন্দ্র "তাহাই সত্য" বলিয়া উত্তর দিলেন। তাহার পর নবীনচন্দ্র আরও দুই একজন সদ্‌ব্রাহ্মণের সাহায্যে সেই সাধ্বী স্নেহময়ী কমলার

পবিত্র দেহ বহন করিয়া মনিকর্ণিকাঘাটে লইয়া গেলেন, প্রভাবতীও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। তাহার পর তথায় চিতা সজ্জিত করিয়া কমলার দেহ তাহার উপর স্থাপন করা হইল। নবীনচন্দ্র তাঁহার মুখাগ্নি করিয়া চিতায় অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কমলার দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। ভস্মাবশেষ গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া নবীনচন্দ্র শ্মশানভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। সেই মহাশ্মশানে বসিয়া নবীনচন্দ্রের মনে বিবেকের উদয় হইল। আত্মগ্লানি আসিয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার ন্যায় নির্ব্বোধ জগতে কে আছে? আমি ব্রাহ্মণসন্তান, প্রথমে উদরান্নের জন্য চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, তাহাতে অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছি। সাক্ষাৎ কমলা আমার গৃহ আলোকিত করিয়াছিলেন। আমি পুত্র-কন্যাও লাভ করিয়াছি। কিন্তু আমার বুদ্ধির দোষে আজ সমস্তই শূন্যময়। এক্ষণে একমাত্র আত্মগ্লানি আমার জীবনের সম্বল। আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন ইহাতেই দগ্ধ হইয়া মরিব। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা কি আমার মনে শান্তি প্রদান করিবেন না? আজ অবধি আমার মন সংসার হইতে ফিরাইয়া লইলাম। যতদিন বাঁচিব এই পুণ্যভূমির ধূলাতে গড়াগড়ি দিব। যাও কমলা, তোমার জন্য অক্ষয় স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। আমি তোমার অকালমৃত্যুর কারণ হইয়া কিছুকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করি। তবে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার দ্বারে পড়িয়া থাকিয়া যদি তাহার উপশম হয়।" এই বলিয়া নবীনচন্দ্র ধূলায় লুটাইয়া পড়িলেন, প্রভাবতীও ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে সকলে তুলিয়া ধরাধরি করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রী—

———

বেদ।

মানবমাত্রেরই সুখ উপাদেয় ও দুঃখ হেয়। এই উপাদেয় সুখপ্রাপ্তি ও হেয় দুঃখ পরিহারের জন্য মানব নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। সাধারণ মানবের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার কোন উপায়ই আত্যন্তিক সুখলাভ বা দুঃখের আত্যন্তিক পরিহার হয় না। এই জন্য মানবগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে মহাপুরুষগণপ্রকাশিত ধর্ম্মমত ঈশ্বরপ্রত্যাদেশলব্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী সাধনপ্রণালী অবলম্বনকরতঃ সুখলাভ ও দুঃখপরিহারের চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভারতীয় আর্য্যমনীষিগণ যে ধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়া আত্যন্তিক সুখলাভ ও দুঃখের আত্যন্তিক পরিহারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, সেই ধর্ম্মমত যে বাক্যাবলীর দ্বারা প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাই বেদনামে প্রসিদ্ধ।

"প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা॥"

প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা যে উপায় অবগত হওয়া যায় না, বেদ হইতে সেই উপায় জ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া বেদের (জ্ঞানার্থ বিদ ধাতুনিষ্পন্ন-হেতু) বেদ এই আখ্যা হইয়াছে। সায়নাচার্য্য যজুর্ব্বেদভাষ্যে "ননু-কোঽয়ং বেদনাম" এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তরে "ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্ট-পরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ।" যে গ্রন্থ ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায় অবগত করায় তাহাকে বেদ কহে, এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। বেদোক্ত যজ্ঞাদির দ্বারা স্বর্গাদি অভ্যুদয়-লাভ ও আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। ইহা প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না। আর্য্যমনীষিগণ বেদ হইতেই এই অলৌকিক উপায় অবগত হইয়া আসিতেছেন বলিয়া ইহার নাম বেদ হইয়াছে।

পরম্পরাপ্রাপ্ত যে বাক্যাবলী এই অলৌকিক উপায়ে ভারতীয় আর্য্য-

সমাজে প্রচার করিয়া আসিতেছে, তাহা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার এক ভাগকে মন্ত্র ও অপর ভাগকে ব্রাহ্মণ কহে। এই জন্য কল্পসূত্র-কার "মন্ত্রব্রাহ্মণয়ো র্বেদনামধেয়ম্" মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নাম বেদ, এইরূপ বেদের লক্ষণ করিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার প্রস্থানভেদে "ধর্ম্ম-ব্রহ্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয়ং প্রমাণং বাক্যং বেদঃ স চ মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকঃ" এইরূপ বেদের লক্ষণাদি করিয়াছেন। যে বাক্য, বাক্যাংশ বা পদ বেদোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকালে যজমান বা ঋত্বিগ্‌গণ দ্বারা পঠিত বা গীত হইয়া থাকে, তাহাকে মন্ত্র কহে। যে বাক্যাবলী উক্ত মন্ত্রের বিনিয়োগ (ব্যবহার) ও ব্যাখ্যাদি, বেদোক্ত ক্রিয়া ও আচারাদির উপদেশ ও বর্ণনাদি করিয়া থাকে, তাহাকে ব্রাহ্মণ কহে। বেদোক্ত মন্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত। কতক-গুলি মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ ও পাদসমন্বিত, কতকগুলি প্রথমে ছন্দোবদ্ধ হইয়া গীত-কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়ায়, পরিবর্ত্তিত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, অপর গুলি এই উভয়াকারবিলক্ষণ গদ্যময়। ছন্দোবদ্ধ শ্লোকাকার মন্ত্রগুলি ঋক্, গীতাকার মন্ত্রগুলি সাম, এবং গদ্যময় মন্ত্রগুলি যজুনামে অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-গুলি প্রায়ই গদ্যময়, তবে তাহারও কোন কোন অংশ শ্লোকাকার। মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদ ঋক্, যজু ও সামাকার বলিয়া অতি প্রাচীন কাল হইতে ত্রয়ী নাম প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।*

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগও তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ বেদোক্ত যজ্ঞা-দির বিধিব্যবস্থা ও মন্ত্রাদির বিনিয়োগ ও ব্যাখ্যাপ্রবৃত্তিসমন্বিত, তাহাই সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় অংশে চিত্তশুদ্ধির উপযোগী হোম, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনাদি প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাকে আরণ্যক কহে। তৃতীয় অংশে উপাসনা, ব্রহ্মবিদ্যাদি ও আত্মজ্ঞানাদি সবিশেষ বর্ণিত আছে, ইহাকেই উপনিষৎ কহে। উপনিষৎ বেদের শেষাংশ বলিয়া ইহার নাম বেদান্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভাগের এই তিনাংশ সম্পূর্ণ পৃথক্

* "ঋগ্‌যজুঃ সামসংজ্ঞেয়ং ত্রয়ী" ইতি বিষ্ণুপুরাণম্।
"এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না" গীতা।
"দেবা বৈ মৃত্যো র্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রবিশন্" ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

নহে। ব্রাহ্মণের অন্তর্গত আরণ্যক, আবার আরণ্যকের অন্তর্গত উপনিষৎ। ঋগ্বেদের এক শাখার ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত, ইহার অন্তর্গত ঐতরেয় আরণ্যক। এই ঐতরেয় আরণ্যকের অন্তর্গত ঐতরেয়োপনিষৎ। এইরূপ শুক্ল যজুর্বেদের এক শাখার ব্রাহ্মণ শতপথ ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ, ইহারই অন্তর্গত বৃহদারণ্যক, আবার উহারই অন্তর্গত বৃহদারোণ্যকোপনিষৎ। এইরূপ কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত, ইহার অন্তর্গত আরণ্যক তৈত্তিরীয় আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ, আবার উহার অন্তর্গত উপনিষৎ তৈত্তিরীয় উপনিষৎ নামে কথিত।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বেদরাশি শ্লোক, গীতি ও গদ্যময় বলিয়া ত্রয়ী নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে। যজ্ঞাদিকার্য্যের সুবিধার জন্য বেদরাশি পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারি নামে কথিত হইয়া থাকে। বৈদিক কার্য্যে প্রধানতঃ তিন প্রকার ঋত্বিগের প্রয়োজন হয়, এই তিন প্রকার ঋত্বিগ্‌গণের নাম অধ্বর্য্যু, হোতা এবং উদ্গাতা। অপর এক প্রকার ঋত্বিগ্ ব্রহ্মা নামে অভিহিত। অধ্বর্য্যু একভাবে প্রধান পুরোহিত, তিনি যজ্ঞবেদিকা প্রস্তুত ও অগ্নিস্থাপনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। হোতা আহুতিপ্রদান-পূর্ব্বক হোম করেন, এবং উদ্গাতা আহুতিদানকালে সামগান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা উক্ত তিন প্রকার ঋত্বিগ্‌গণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে বৃষোৎসর্গাদি বৈদিকক্রিয়ার অনুষ্ঠানকালেও চারি প্রকার পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। তাঁহাদের নাম আচার্য্য, হোতা, সদস্য ও ব্রহ্মা। বর্ত্তমান সময়ে আচার্য্য মন্ত্র পাঠ করেন, হোতা অগ্নিতে আহুতি-প্রদানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন, ব্রহ্মা অগ্নিস্থাপনকার্য্য ও সদস্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে অধ্বর্য্যুপ্রভৃতির কার্য্য করিতে হইলে, সম্যগ্‌বেদজ্ঞ হইতে হইত, অতি প্রাচীন কালে সকল ঋত্বিগ্ই সমগ্র বেদে পারদর্শী হইতেন। কালক্রমে মানবের আয়ু ও মেধাশক্তির হ্রাস হইলে একজনের পক্ষে সমস্ত বেদপাঠ ও ধারণা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের শিষ্যগণের আয়ু ও মেধাশক্তির হ্রাস দেখিয়া এক এক প্রকার ঋত্বিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য বেদাংশ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সঙ্কলন করিলেন। অধ্বর্য্যুর অবশ্য জ্ঞাতব্য মন্ত্রসমূহ একত্রে সঙ্কলিত হইয়া যজুর্বেদসংহিতা, হোতার

অবশ্য জ্ঞাতব্য মন্ত্রসমূহ একত্র সঙ্কলিত হইয়া ঋগ্বেদসংহিতা ও উদ্গাতার অবশ্য জ্ঞাতব্য গীতিময় মন্ত্রগুলি একত্র সঙ্কলিত হইয়া সামবেদসংহিতা হইল। অপর শ্লোকাত্মক মন্ত্রসমূহ যাহা প্রধানতঃ যজ্ঞকার্য্যে ব্যবহৃত হইত না, কিন্তু শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি ও অভিচারাদিকার্য্যে ব্যবহৃত হইত, তাহা পৃথক্রূপে সঙ্কলিত হইল। এই শেষোক্ত সঙ্কলনকার্য্য অঙ্গিরসের পুত্র অথর্ব্বঋষি দ্বারা প্রথমে সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহা অথর্ব্বসংহিতানামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদসংহিতার মন্ত্রগুলি ঋক্ অর্থাৎ শ্লোক বলিয়া ইহার নাম ঋগ্বেদ বা বহ্বৃচ বেদ হইয়াছে। যজুর্ব্বেদসংহিতার অধিকাংশ মন্ত্র যজু বা গদ্য বলিয়া ইহার নাম যজুর্ব্বেদ হইয়াছে। অধ্বর্য্যুর ব্যবহারোপযোগী বলিয়া ইহা অধ্বর্য্যু বেদ নামেও খ্যাত হইয়া আসিতেছে। সামবেদসংহিতার মন্ত্রগুলি সাম বা গীতি বলিয়া ইহা সামবেদ নামে কথিত।

বেদবিভাগ বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

"দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী মহামুনে।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে জগতঃ হিতঃ॥
বীর্য্যং তেজো বলঞ্চাল্পং মনুষ্যাণামবেক্ষ্য বৈ।
হিতায় সর্ব্বভূতানাং বেদভেদান্ করোতি যঃ॥
যয়া স কুরুতে তথা বেদমেকং পৃথক্ প্রভুঃ।
বেদব্যাসাভিধানো তু সা মূর্ত্তি র্মধুবিদ্বিষঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশে ৩।৫-৯

হে মহামুনি মৈত্রেয়! জগতের হিতকারী ভগবান্ বিষ্ণু ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া প্রতি দ্বাপর যুগে এক বেদ বহুভাগে বিভক্ত করেন। তিনি মনুষ্যগণের বীর্য্য, তেজ ও বল অল্প দেখিয়া সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনের জন্য বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন। প্রভু মধুসূদন যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বেদ বিভাগ করেন, সেই মূর্ত্তির নাম বেদব্যাস।

"আদ্যো বেদশ্চতুষ্পাদঃ শতসাহস্রকঃ মিতঃ।
ততো দশগুণঃ কৃৎস্নো যজ্ঞোঽয়ং সর্ব্বকামধুক্॥

ততোঽত্র মৎসুতো ব্যাসোঽষ্টাবিংশতিমেঽন্তরে।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ॥"

বিষ্ণুপুরাণে ৩য় অংশে ৪।১-২

"এক আসীদ্ যজুর্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূদ্ যস্মিং স্তেন যজ্ঞমথাকরোৎ॥
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথা মুনিঃ।
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ॥
ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
রাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥"

বিষ্ণুপুরাণে ৩য় অংশে ৪।১১-১৪

আদি বেদ ঋগাদি চতুষ্পাদযুক্ত ও শতসহস্রপরিমিত (লক্ষ শ্লোক বা মন্ত্রাত্মক) এই বেদ হইতে সর্ব্বকামনাসিদ্ধিপ্রদ অগ্নিহোত্রাদি পঞ্চ ও ব্রহ্মযজ্ঞাদি পঞ্চ এই দশবিধ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তদনন্তর এই অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপর যুগে মৎপুত্র ব্যাস সেই চতুষ্পাদ বেদকে একীভূত দেখিয়া পুনর্ব্বার চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন।* পূর্ব্বে যজুঃপ্রধান বেদ এক ছিল, বেদব্যাস ঐ যজুঃপ্রধান বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। এই বিভাগ হেতু বৈদিকক্রিয়া চারিপ্রকার হোতার দ্বারা নিষ্পাদিত হইতে লাগিল। তিনি চারিভাগে বিভক্ত বেদের দ্বারা যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করিলেন। যজুর্ব্বেদমন্ত্র দ্বারা অধ্বর্য্যু কার্য্য, ঋগ্‌বেদ মন্ত্রদ্বারা হোতৃকার্য্য, সামবেদ মন্ত্র দ্বারা উদ্গাতৃ

* "অত্র মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতমে দ্বাপরে চতুষ্পাদং একং সন্তং বেদং চতুর্দ্ধা ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বরূপেণ পৃথগ্‌ ভজৎ প্রভুঃ ঈশ্বরঃ, অবতারস্বরূপঃ" ইতি টীকাকার শ্রীধরস্বামী।

এক আসীদিতি যজুর্ব্বৈদিকাধ্বর্য্যবক্রিয়াবাহুল্যাৎ প্রধানকর্ম্মণশ্চ যাজনস্য তদ্বিহিতত্বাৎ যজুঃপ্রাধান্যাদেবমুক্তম্।

"যজ্ঞস্যৈব যজুর্ব্বেদে তেন যজ্ঞমযুক্তত।
যাজনাদ্ধি যজুর্ব্বেদ ইতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ।"

ইতি বায়ুক্তে শ্রীধরস্বামী।

কার্য্য ও অথর্ব্ববেদ মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মকার্য্য সংস্থাপিত করিলেন। অনন্তর তিনি ঋক্ সকল উদ্ধৃত (সংকলিত) করিয়া ঋগ্‌বেদসংহিতা, যজুঃসমুদায় উদ্ধৃত করিয়া যজুর্ব্বেদসংহিতা ও সামসকল সংগ্রহ করিয়া সামবেদ সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। হে মৈত্রেয়! তিনি অথর্ব্ববেদ দ্বারা রাজগণের শান্তিপুষ্ট্যাদি সমুদায় কার্য্য সম্পাদিত করাইবার ব্যবস্থা করিলেন, এবং যথা বিধানে ব্রহ্মকার্য্য সংস্থাপন করিলেন। রাজগণের পুরোহিত অথর্ব্ববেদোক্ত শান্তি ও পুষ্টি কার্য্য সর্ব্বথা সম্পাদন করিবেন। কামন্দক তাঁহার নীতিশাস্ত্রে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

"ত্রয্যাঞ্চ দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলঃ স্যাৎ পুরোহিতঃ।
অথর্ব্ববিহিতং কুর্য্যান্নিত্যং শান্তিকপৌষ্টিকম্"॥

বেদব্যাস বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চারিজন শিষ্যকে শিক্ষা দান করিলেন। পৈল তাঁহার ঋগ্‌বেদের শিষ্য, বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদের শিষ্য, জৈমিনি সামবেদের শিষ্য ও সুমন্ত অথর্ব্ববেদের শিষ্য হইলেন। এই সকল শিষ্যের শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে বেদ নানা শাখায় বিভক্ত হইল। কালক্রমে যজুর্ব্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ শুক্ল যজুর্ব্বেদ ও অপর ভাগ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ নামে খ্যাত হইল। বিষ্ণুপুরাণে যজুর্ব্বেদের শুক্ল ও কৃষ্ণরূপে বিভাগ নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত আছে। বেদব্যাসের যজুর্ব্বেদশিষ্য বৈশম্পায়নের ব্রহ্মরাতপুত্র পরমধর্ম্মজ্ঞ ও গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্য নামে শিষ্য ছিলেন। এক সময়ে গুরুর অপর শিষ্যগণ গুরুর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয়ের জন্য ব্রতানুষ্ঠান করিতে আদিষ্ট হইলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, তাঁহার অপর শিষ্যগণ তেজস্বী ব্রাহ্মণ নহেন, তজ্জন্য তিনি একাই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। বৈশম্পায়ন এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং বলিলেন, তুমি ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিয়াছ, অতএব আমার নিকট অধীত বেদ পরিত্যাগ কর। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমি আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ এইরূপ কহিয়াছি। যাহা হউক, আমারও আপনার মত গুরুতে প্রয়োজন নাই, আপনার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহা এই গ্রহণ করুন। এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য রুধিরাক্ত আকার যজুর্ব্বেদ উদ্গীরণ করিয়া যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর যে শিষ্যগণ গুরুর আদেশে তাঁহার

ব্রহ্মহত্যাপাপনাশক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তিত্তিরি-পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্গীরিত বেদ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তিত্তিরি হইয়া বেদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের গৃহীত বেদ তৈত্তিরীয় নামে খ্যাত হইল। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া যজুর্ব্বেদপ্রাপ্তিকামনায় সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব তাঁহার স্তবে প্রীত হইয়া বাজিরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিলষিত বর লইতে অনুরোধ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যে যজুর্ব্বেদ আমার গুরুও জ্ঞাত নহেন, তাহাই আমাকে প্রদান করুন, সূর্য্যদেব অযাতযামসংজ্ঞক যাজ্ঞবল্ক্যের গুরুর অনধীত যজুর্ব্বেদ তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্গীরিত বেদ বৈশম্পায়নের অপর শিষ্যগণ দ্বারা গৃহীত হওয়ার পর তাঁহাদের বুদ্ধিমালিন্যহেতু কৃষ্ণ বা দূষিত হইয়াছিল বলিয়া উহা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ নামে খ্যাত হইল। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার মহীধর স্বকীয় ভাষ্যের উপক্রমণিকায় বিষ্ণুপুরাণোক্ত বেদবিভাগপ্রণালীরই উল্লেখ করিয়াছেন। *

যাস্ক তাঁহার প্রণীত নিরুক্তগ্রন্থে বেদাদির বিভাগ এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন। "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণঃ ঋষয়ো বভূবু স্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃত-ধর্ম্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুরুপদেশায় গ্লায়ন্তোঽবরে বিল্ম গ্রহণায়েমং গ্রন্থং সমাম্নাসিষুর্ব্বেদঞ্চ বেদাঙ্গানি১"। অতি প্রাচীন কালে ঋষিগণ ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও বেদমন্ত্রাদি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী ঋষিগণ তাঁহাদের ন্যায় অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মতত্ত্বাদি ও বেদমন্ত্রাদি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে

* "তত্রাদৌ ব্রহ্মপরম্পরয়াপ্রাপ্তং বেদং বেদব্যাসো মন্দমতীন্ মনুষ্যান্ বিচিন্ত্য তৎকৃপয়া চতুর্দ্ধা ব্যস্য ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যাংশ্চতুরো বেদান্ পৈলবৈশম্পায়নজৈমিনিসুমন্তুভ্যঃ ক্রমাদুপদিদেশ তেচ স্বশিষ্যেভ্যঃ এবংপরম্পরয়া সহস্রশাখো বেদো জাতঃ। তত্র ব্যাস-শিষ্যোবৈশম্পায়নঃ যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ স্বশিষ্যেভ্যো যজুর্ব্বেদমধ্যাপয়ৎ। তত্র দৈবাৎ কেনাপি হেতুনা ক্রুদ্ধো বৈশম্পায়নো যাজ্ঞবল্ক্যং প্রত্যুবাচ মদধীতং ত্যজেতি। স যোগসামর্থ্যাৎ মূর্ত্তাং বিদ্যাং বিধায়োদ্ববাম। বান্তানি যজূংষি গৃহ্ণীতেতি গুরূক্তা অন্যে বৈশম্পায়নশিষ্যা-স্তিত্তিরয়ো ভূত্বা যজুংষ্যভক্ষয়ন্। তানি যজূংষি বুদ্ধিমালিন্যাৎ কৃষ্ণানি জাতানি। ততো দুঃখিতো যাজ্ঞবল্ক্যো সূর্য্যমারাধ্যান্যানি শুক্লানি যজূংষি প্রাপ্তবান্।"

পারিতেন না। এইজন্য পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ পরবর্ত্তী ঋষিগণকে উপদেশ দ্বারা মন্ত্র শিক্ষা দিতেন। কালক্রমে পরবর্ত্তী ঋষিগণের আয়ু ও গ্রহণশক্তি অল্প হইয়া আসিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ যাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণের নিকট হইতে বেদমন্ত্রাদির উপদেশ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের পরবর্ত্তী ঋষিগণের আয়ু ও গ্রহণশক্তি অল্প দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, এবং তাঁহাদের প্রতি কৃপান্বিত হইয়া বেদ, বেদাঙ্গ ও নিরুক্তাদি প্রত্যেক বিষয় একজন সমগ্র ভাবে ধারণা করিতে পারিবে না দেখিয়া, নানাভাগে বিভক্ত করিয়া উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে বেদ, বেদাঙ্গ, নিরুক্তাদি নানা শাখায় বিভক্ত হইল। পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বেদব্যাস মনুষ্যগণের বীর্য্য, তেজ ও বল অল্প দেখিয়া সর্ব্বপ্রাণীর হিতের জন্য প্রতি দ্বাপর যুগে বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্য দ্বারা বেদ বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। যাস্কের নিরুক্তগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, পরবর্ত্তী ঋষিগণের আয়ু ও ধারণাশক্তি অল্প দেখিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ পরবর্ত্তী ঋষিগণের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ শুদ্ধ বেদ নহে, বেদাঙ্গাদিও নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। সেইজন্য বেদ ও বেদাঙ্গ বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। যাস্কনিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য বলেন, ঋগ্বেদ একবিংশতি শাখায়, যজুর্ব্বেদ একাদশ শাখায়, সামবেদ সহস্র শাখায় ও অথর্ব্ব বেদ নব শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। বেদাঙ্গও এইরূপ বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। যথা ব্যাকরণ অষ্টশাখায়, নিরুক্ত চতুর্দ্দশ শাখায় ইত্যাদি ইত্যাদি।* দুর্গাচার্য্যকথিত বেদের শাখাভেদসম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক পুরাণের শাখা সংখ্যার সহিত অপর পুরাণের শাখা

* "বেদং তাবদেকং সন্তম্ অতিমহত্ত্বাদ্ দুরধ্যেয়মনেকশাখাভেদেন সমাম্নাসিষুঃ সুখগ্রহণায় ব্যাসেন সমাম্নাতবন্তঃ। তদ্যথা—একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যম্ একদশধা আধ্বর্যবম্। সহস্রধা সামবেদম্, নবধা আথর্ব্বণম্। বেদাঙ্গান্যপি, তদ্যথা—ব্যাকরণমষ্টধা; নিরুক্তং চতুর্দ্দশধা ইত্যেবমাদি কথং নাম ছিন্নান্যেতানি শাখান্তরাণি নর্ণেন সুখং গৃহ্নীয়ুরেতে শক্তিহীনা অল্পায়ুষো মনুষ্যাঃ ইত্যেবমর্থং সমাম্নাসিষুরিতি"।

ইতি দুর্গাচার্য্যকৃত নিরুক্ত টীকা।

সংখ্যার মিল নাই। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে যে, বেদব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন যুজুর্ব্বেদের সপ্তবিংশতিশাখা প্রকাশ করেন। আবার যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত শুক্ল যজুর্ব্বেদের পঞ্চদশ শাখা প্রবর্ত্তিত করেন।* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত আছে যে, আপস্তম্ভ যজুর্ব্বেদের একাধিক শতশাখা প্রকাশ করেন। বিষ্ণুপুরাণে ঋগ্‌বেদের যেরূপ বিভাগ বর্ণিত আছে তাহাতে ঋগ্‌বেদের শাখা সংখ্যা পঞ্চদশ হয়, কিন্তু দুর্গাচার্য্য ঋগ্‌বেদের শাখা সংখ্যা একবিংশতি বলিয়াছেন। ইহাতে এইরূপ বোধ হয় যে, কালক্রমে কখন কোন শাখা বিলুপ্ত হইয়াছে, আবার কোন শাখা শিষ্যপ্রশিষ্যে বিভক্ত হইয়া নানাভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই কারণেই মহীধর তাঁহার ভাষ্যো-পক্রমণিকায় লিখিয়াছেন যে, শিষ্যপরম্পরায় বেদ সহস্র (অর্থাৎ বহু) শাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

সাধারণতঃ সকলেই অবগত আছেন যে. বেদব্যাসই প্রথমে বেদকে ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বেদব্যাস আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা বেদের ব্রাহ্মণ ভাগেই পূর্ব্বোক্ত নামে বেদের চারিভাগে বিভাগ দেখিতে পাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদের বৃহদারণ্যকে পরমেশ্বর হইতে বেদের বিকাশ এইরূপে বর্ণিত আছে "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদো সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বসিতানি"। ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক. সূত্র, অনুব্যাখ্যান এই মহদ্ভূত (ব্রহ্ম) হইতে নিশ্বাসের ন্যায় বিনা আয়াসে উদ্ভূত হইয়াছে। সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া

* "যজুর্ব্বেদতরোঃ শাখা সপ্তবিংশন্মহামতিঃ।
বৈশম্পায়ননামাসৌ ব্যাসশিষ্যশ্চকার বৈ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৩।৫.১
শাখাভেদাস্তু তেষাংবৈ দশ পঞ্চ চ বাজিনাম্।
কাণ্বাদ্যাস্তু মহাভাগ যাজ্ঞবল্ক্যপ্রবর্ত্তিতাঃ॥" ৩।৫।২৯
ব্রহ্মাণ্ডেতু একাধিকশতমধ্বর্য্যুশাখা আপস্তম্বোক্তা ইতি বিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামী।

তাঁহাকে বলিলেন, ভগবন্ আমাকে অধ্যয়ন করান (আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন)। সনৎকুমার বলিলেন, তুমি যাহা জ্ঞাত আছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তাহাতে নারদ বলিলেন, হে ভগবন্ আমি ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র স্মরণ করিতেছি (অধ্যয়ন করিয়াছি)।* অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে বিদ্যা দুই প্রকার পরা ও অপরা। ইহার মধ্যে ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষকে অপরা বিদ্যা, ও যাহাদ্বারা সেই অক্ষর পদার্থ (ব্রহ্ম) জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকেই পরাবিদ্যা কহে। বৃহদারণ্যকে অথর্ব্ববেদ অথর্ব্বাঙ্গিরস ও ছান্দোগ্যে আথর্ব্বণ নামে অভিহিত হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদে অথর্ব্ববেদ এই নামেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এমনকি বেদোক্ত আখ্যান ও সৃষ্টি-সংহারাদির বর্ণনাগুলি ইতিহাস ও পুরাণ নামে অভিহিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যের "ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং" এই অংশের ব্যাখ্যায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, "বেদশব্দস্য প্রকৃতত্বাৎ ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদঃ"। অর্থাৎ এখানে বেদ শব্দের কথাই বলা হইতেছে। সুতরাং "আথর্ব্বণং চতুর্থং" দ্বারা আথর্ব্বন্ চতুর্থবেদ ও ইতিহাস পুরাণ পঞ্চম বেদ এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, যে বিষয় লইয়া বেদব্যাস ইতিহাসপুরাণ রচনা করিয়াছেন, তাহাও বেদের অন্তর্গত ও পূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। বেদব্যাস তাহাই সঙ্কলন করিয়া ইতিহাস ও পুরাণ রচনা করিয়াছেন। বেদব্যাস নিজেই একথা প্রকারান্তরে বলিয়াছেন,—

"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসাপূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা"।*

* স "হোবাচর্গ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থং ইতিহাসপুরাণং-পঞ্চম। ইতি ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭ম প্র ১।২

× "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে × × × তত্রাপরা ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ, শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ ১।৫।

যুগান্তে অর্থাৎ প্রলয় কালে ইতিহাসসহিত বেদ অন্তর্হিত হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে স্বয়ম্ভূ (ব্রহ্মা) দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া ঋষিগণ তপস্যা দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য বিষ্ণুপুরাণে "আদ্যবেদশ্চতুষ্পাদঃ ইত্যাদি বর্ণনা আছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, বেদব্যাস যজুর্ব্বেদ দ্বারা অধ্বর্য্যুকার্য্য, ঋগ্‌বেদ দ্বারা হোতৃকার্য্য, সামবেদদ্বারা উদ্‌গাতৃকার্য্য ও অথর্ব্ববেদ দ্বারা ব্রহ্মকার্য্য সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইহারও মূল বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। "ঋগ্বেদেনৈব হৌত্রং কুর্ব্বন্ যজুর্ব্বেদেনাধ্বর্য্যবং সামবেদেনোদ্‌গাত্রং যদেব ত্রয্যৈ বিদ্যায়ৈঃ সুকৃতং তেন ব্রহ্মত্বম্" কুল্লুকভট্ট এই শ্রুতিটী তাঁহার মনুর টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ দ্বারা হোতৃকার্য্য অধ্বর্য্যুকার্য্য ও উদ্‌গাতৃকার্য্য বর্ণিত আছে। অতএব ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বেদব্যাসকর্ত্তৃক বেদবিভাগের পূর্ব্বেও হোত্রাদি কার্য্য ঋগ্বেদাদি মন্ত্রদ্বারা সম্পাদিত হইত, পরে দ্বাপর যুগে চারিভাগে বিভক্ত বেদ সম্মিলিত হইয়া যায়। বেদব্যাস পুনরায় তাহা যজ্ঞকার্য্যের উপযোগী করিয়া চারিভাগে বিভক্ত করেন, এবং বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের আখ্যানাদি অবলম্বন করিয়া মহাভারত ও পুরাণ রচনা করেন। প্রবন্ধান্তরে আমরা বেদের উৎপত্তি ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা করিব।

শ্রীসাতকড়ি অধিকারী।

---

* "বেদান্ কার্য্যজ্ঞানার্থান্ মন্ত্রব্রাহ্মণবাদান্ সেতিহাসান্ ইতিহাসসহিতবানার্থ-বাদোপেতান্" ইতি আনন্দগিরি।

* আদ্য ইত্যাদ্যুক্তচতুষ্পাদ ঋগাদিচতুর্ভেদসমূহরূপঃ ইতি শ্রীধরস্বামী।

রাঙাদিদি।

(১)

"ভাবনা কি ? গাছে নারিকেল আছে, পুকুরভরা মাছ আছে ; তিন মরাই ধান আছে, বাগানে মোচা, থোড়, লাউ কুমড়া আছে। বামুনের ঘরে আর কি থাকবে। মাকে আনিবে না কেন—অবশ্যই আনবে, কথায় আছে—এস বিপত্তি রয়ো না ; সকলের কি সব সময় সমান যায় ? এত ভয় কিসের ?"

হাত মুখ নাড়িয়া রাঙাদিদি, স্বামী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্মুখে বলিলেন। মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ; কুড়ি বিঘা ব্রহ্মত্তর আছে, দুইবিঘা জমীর উপর বাস্তু ভিটা, ইহা ছাড়া পুষ্করিণী বাগান আছে, গরু বাছুর, বলদ রাখাল আছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পনরটি ছাত্র বাড়ীতে থাকে এবং আহার আচ্ছাদন পায়। শিষ্যশাখা যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাই, এমন কথা বলিতে পারি না ; তবে তিনি কদাচিৎ শিষ্যবাড়ী যাইতেন। যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসর দেশে অজন্মা হইয়াছিল ; সেবার তিনি ধান পান কিছুই পান নাই ; নগদ টাকার ত কথাই নাই। তাই সম্মুখে দুর্গোৎসব, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে পুরুষানুক্রমে মায়ের পূজা হইয়া আসিতেছে। আউসের অবস্থা দেখিয়া ভট্টাচার্য্য ভাবিতেছিলেন যে এবার বুঝি বা মায়ের সেবা না হয়। গৃহিণী কর্ত্তার মনের ভাব জানিয়া হাত মুখ নাড়িয়া উপরের কয়টি কথা বলিয়া দিলেন।

রাঙাদিদি, গ্রামের রাঙাদিদি। সদানন্দময়ী হাস্যময়ী। ব্রাহ্মণী গ্রামের ইতর ভদ্র সকলের বাড়ীতে যাইয়া রোগের সেবা করিতেন, প্রসূতির যত্ন করিতেন। রাঙাদিদি বিখ্যাত ধাত্রী, তিনি যাহার সূতিকাগারে যাইয়া মা বলিতেন তাহার সন্তান পসব করাই হইত না। শিশুরোগের

রাঙাদিদি ধন্বন্তরি; তাঁহার ন্যাতা কাতার হাঁড়িতে থাকিত না এমন জিনিষ নাই। তিনি আমুই করিতে অদ্বিতীয়া ছিলেন। পাচন তাঁহার মত কেহ পাক করিতে জানিত না; শিশুকে কোলে করিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, তাহার কি রোগ হইয়াছে। ইহার উপর হাম, জলবসন্ত, ইজ্জেবসন্ত, প্রভৃতি কঠিন ব্যারামে রাঙাদিদির চিকিৎসার বিশেষত্ব ছিল। তিনি যে কত টোট্‌কা ঔষধ জানিতেন, তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না,। সকল রোগের টোট্‌কা তাঁহার জানা ছিল। এ সকল বিদ্যা ছাড়া রাঙাদিদি দশকর্ম্মান্বিতা ছিলেন। ষষ্ঠী মাকাল পূজা হইতে ষোল দুর্গোৎসব, কালীপূজা, রাস, লক্ষ্মী প্রভৃতি সকল পূজার ক্রম ও পদ্ধতি তাঁহার জানা ছিল। তিনি পূজার ঘরে দাঁড়াইলে পুরোহিত থরহরি কম্পান্বিত হইত; তাঁহার কাছে কাহারও ফাঁকি দিবার যোটি ছিল না। রন্ধনে রাঙাদিদি অন্নপূর্ণা ছিলেন। যে ভোজযজ্ঞে রাঙাদিদি হাতা বেড়ী না ধরিতেন, সে যজ্ঞ পণ্ড হইত। একা রাঙাদিদি রন্ধন করিয়া পাঁচশত ব্রাহ্মণকে খাওয়াইতে পারিতেন। তিনি যাহা রন্ধন করিতেন, তাহা অমৃততুল্য হইত।

দেখিতে রাঙাদিদি অপ্সরী রূপসী ছিলেন। পাটনায়ে খাড়ি মুক্তরী ঢাকাই মসলিন দিয়া ঢাকিলে যেমন রূপও বর্ণ ফুটিয়া উঠে রাঙাদিদির তেমনি রূপ তেমনি বর্ণ ছিল। তাই তাঁহার নাম রাঙাদিদি ছিল। এক পিঠ চুল জানু ছাড়াইয়া পায়ের কাছে পড়িতেছে; গড়ন নিখুঁত—সুগোল, সুদৃঢ় ও সুন্দর। দোহারা দেহ—কোনখানে একছটাক মাংস অধিক নাই, একছটাক কম নাই। টানা চোক, টানা ভ্রূ, নাকটি টিকলো, যেন সত্যই তিলফুল নাসা, ঠোঁট দুইখানি পাতলা—পাকা করমচার মতন। রাঙাদিদি সুগায়িকা ছিলেন; তিনি না থাকিলে কোন বাসর জমিত না, কাহারও কাদার আমোদ হইত না। তিনি হাজারও ছড়া জানিতেন, হাজারও গান জানিতেন; আবার তাঁহার ভট্টাচার্য্যের কৃপায় দু' দশটা উদ্ভট শ্লোকও আবৃত্তি করিতে পারিতেন। প্রসাধন কলায় রাঙাদিদি পটীয়সী ছিলেন; কনে সাজাইতে তিনি অদ্বিতীয়া; ঝী বউরা তাঁহার নিকট হইতে রসটান মাথা ঘসা প্রভৃতির মালমসলা শিখিয়া ও তৈয়ার করাইয়া আনিত।

শাখা পরিতে হইলে রাঙাদিদি, নাক ও কান বিঁধাইতে হইলে রাঙাদিদি, এমন কি কাহারও স্বামী বশ করিতে হইলে রাঙাদিদি তাহারও উপায় করিয়া দিতেন।

এ হেন রাঙাদিদি মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের পত্নী; সুতরাং বলিতে হয়, ভট্টাচার্য্যের সংসারে সুখ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। রাঙাদিদিকে ভয় করিত না গ্রামে এমন মেয়ে পুরুষ ছিল না। রাঙাদিদিকে সবাই ভয় করিত, সবাই ভক্তি করিত; কেন না রাঙাদিদি না হইলে গ্রামের অর্দ্ধেক লোকের ঘর সংসার চলিত না। রাঙাদিদি ইতর ভদ্রের পক্ষে অন্নপূর্ণা ছিলেন, যাহার বাড়িতে হাঁড়ি চড়িত না সেই থালা হাতে করিয়া রাঙাদিদির প্রাঙ্গনে দাঁড়াইলে একথালা ভাত তরকারি পাইত। তাই রাঙাদিদি গ্রামের একরূপ শাসনকর্ত্রী ছিলেন।

(২)

"তুমিই বলিলে নারিকেল আছে ধান আছে; দুর্গোৎসব হইবে না কেন? কিন্তু পূজার খরচ ত আছে। সেটা কে দিবে?" ভট্টাচার্য্য রাঙাদিদির কথায় এই উত্তর করিলেন।

রাঙাদিদি—আ মর মিন্‌সে! এই বুঝি তোমার শাস্ত্র পড়া! যাকে ঘরে আনিবে সে কিছু করিবে না? চণ্ডী পাঠ করেন, না আমার মাথা মুণ্ড করেন!

ভট্টা—বটে বটে ব্রাহ্মণী! কথাটা জবর রকমের বলেছ বটে! কিন্তু সে ভক্তি কৈ!

রাঙা—ওরে বিট্‌লে বামুন। তুমি বুঝি এতদিন দেশের লোককে কেবল ঠকিয়ে খাচ্ছিলে! কেবল মুখে ঢিঢ়িং চড়াং ক্লীং ক্লাং! আ মর! বাবা এমন হতভাগার হাতেও আমাকে সঁপে দিয়েছিলেন!

ভট্টা—ব্রাহ্মণী আমাকে তোমার সম্মার্জ্জনীর প্রভাবে সায়েস্তা রাখিতে পার! তোমার রোদনের নাকি সুর শুনিলেই আমি হাঁকে না বলিতে পারি, না কে হাঁ বলিতে পারি কিন্তু দেবতা শুনিবে কেন? গত সন ভাল বর্ষা

হয় নাই, অর্দ্ধেক ধান পাইয়াছি। এমন্ কি আসৃত মাটি, আমনের যা হাল হইবে, তাহা আকাশ দেখিয়া বুঝিতেছি। প্রজারা কি খাইয়া খাজনা দিবে। লক্ষণ যেমন, তাহাতে ত আমার স্থির বিশ্বাস আগামী চৈত্র বৈশাখে লোকে না খাইতে পাইয়া মরিবে। ইহার উপর ঘর সংসার আছে—ছেলে মেয়ে আছে—ছাত্র কয়জন আছে—অতিথি অভ্যাগত আছে। সবত বজায় রাখিতে হইবে। জানত—সঞ্চয়ী নাবসীদতি। কুল্লেত তিন মরাই ধান, এক দুর্গোৎসবে সব খরচ করিলে পরে খাইব কি?

রাঙাদিদি—মুখে আগুন—মুখে আগুন! তোমার মরণই ভাল। এই অজন্মার দিনে দুর্গোৎসব করিব না ত, যে বৎসর সবাই করে সেই বৎসর করিব! ব্রাহ্মণ বাড়ি—মায়ের প্রসাদ পাইতে সবাই আসিবে। পূজার সময়ে রেয়োৎ জন আসিবে, তিন দিন দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইয়া যাইবে। পরে প্রয়োজন হইলে নিজেদের পেট কাটিয়া আমাদের খাওয়াইবে। ব্রাহ্মণ তুমি—তোমার আবার উপবাসের ভাবনা? যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দিতে হইবে, যখন না থাকিবে তখন না খাইয়া মরিতে হয়ত মরিব। এমনই বা কি করিয়াছি যে না খাইয়া মরিতে হইবে? নয় বৎসরের মেয়েটি তোমাদের বাড়ি আসিয়াছি—আজ আমার পঞ্চাশ পার হইল। আগাগোড়া পূজার সময় ঠাকরুণের সঙ্গে পূজার কাজ করিয়াছি। আজ দুইবৎসর তিনি স্বর্গে যাইতে না যাইতে, আমার গৃহিণীপণার সময়ে মাকে আনিতে পারিব না? এও কি হয়। বাড়িতে প্রতিমা না আসিলে পূজার কয়দিন যে বুক ফাটিয়া মরিয়া যাইব। তোমার সাহসে না কুলায় ত আমি নিজে মাকে আনিব। আমার ছেলে মূর্খ নহে, এবার তাকেই ব্রতী করিব। পঞ্চগ্রামী প্রায় সবাই আমার হাতের রান্না খাইবার জন্য, আমার বাড়ি পায়ের ধূলা দেয়—মিন্‌সে বলে কি না দুর্ভিক্ষ হয়েছে মাকে আনিব না। "মা দেবী,"—"মা দেবী" করে মুখে ফেকো উড়াও—সেই দেবীর কাছে সত্য সত্য একবার মাথা কুটনা—দেখিবে ধূলামুঠা সোণামুঠা হইবে।

বিতণ্ডায় রাঙাদিদির জয় হইল। ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে সেবার দুর্গোৎসবটা একটু ধুম করিয়া হইল। গ্রামের লোক যখন শুনিল এবার রাঙাদিদির খাস পূজা, তখন যে যাহা পাইল তাহাই আনিয়া রাঙাদিদিকে

যোগাইয়া দিল। রাঙাদিদিকে মরাই ভাঙিতে হইল না। বিজয়ার দিন স্বামীকে প্রণাম করিতে যাইয়া রাঙাদিদি বলিলেন—"দেখ্‌লি মিন্‌সে, কার পূজা কে করে! তোমার বড়সাধের মরাই যেমন তেমনি আছে, অথচ এবার তিনদিনে হাজার বামুন পাত পাড়িয়াছে, দুই হাজার ইতর শূদ্রে প্রসাদ লইয়া গিয়াছে!" এই বলিয়া স্বামীকে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিলেন, এবং যাইবার সময়ে "সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি" এই গান্‌টি গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে, বিজয়াজনিত শোকাশ্রু মুছিতে মুছিতে, রাঙাদিদি ভিতরে যাইয়া বসিলেন। পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিল; তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া মিষ্টমুখ করিয়া চলিয়া গেল।

এমন আদর্শ গৃহিণী ছিল বলিয়া এতকাল হিন্দুর ঘর গৃহস্থলী অটুট ছিল। ইঁহারা অল্প আয়ে সংসার চালাইতে পারিতেন, সেবাগুণে সকলকে বশে রাখিতেন—গৃহস্থের সংসারের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। রাঙাদিদি কাল্পনিক চিত্র নহে—এখনও দুই একটা গ্রাম খুঁজিলে এমন রাঙাদিদি দেখিতে পাওয়া যায়। হায় সে আদর্শ! হায় সে সুখের গৃহস্থলী!

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
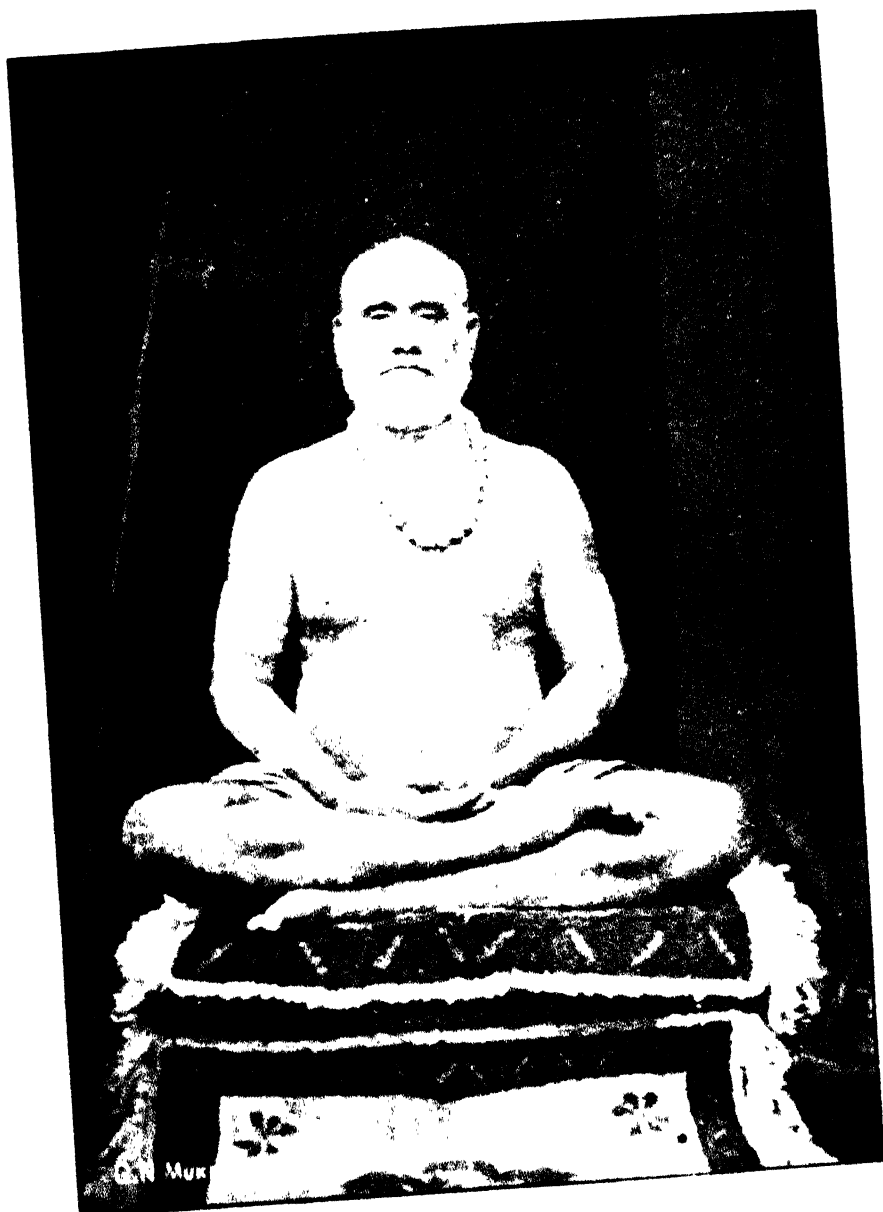
শ্রীমধুসূদন তীর্থস্বামী।

বৈদিক ধর্ম্ম ভারতবর্ষের প্রাণস্বরূপ, যাঁহারা ইহার সংরক্ষণের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামে ভারতবাসী যে মস্তক অবনত করিবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সত্যযুগে ব্রহ্মা, ত্রেতায় বশিষ্ঠ, দ্বাপরে ব্যাস ও কলিতে শঙ্করাচার্য্য বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রচার ও সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। তাই ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন,—

"কৃতে বিশ্বগুরুর্ব্রহ্মা ত্রেতায়াং ঋষিসত্তমঃ।
দ্বাপরে ব্যাস এব স্যাৎ কলাবত্র ভবাম্যহং॥"

ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, ও ব্যাসের প্রচারিত বৈদিক ধর্ম্ম যখন বৌদ্ধবিপ্লবে বিকলাঙ্গ হইয়া যায়, তখন তাহাকে রক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আজন্ম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থাকিয়া তিনি আসমুদ্র হিমালয় সেই সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বৈদিক ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ বেদান্তপ্রচারই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল, এবং তাহাকেই তিনি জাতীয় ধর্ম্মরূপে প্রচার করিয়াছিলেন। বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি অধিকারভেদে উচ্চশ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত সকলেরই নিকট সনাতন ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যান। তাই সত্য সত্যই একজন ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন,—

"He moulded the Vedanta philosophy of the Brahmans into its final form, and popularised it into a national religion, • • • He addressed himself to the highcaste philosophers on the one hand, and to the low caste multitude on the other ;*

* W. W. Hunter.

জ্ঞানগরিমাবিমণ্ডিত অদ্বৈতবাদের বিজয়পতাকা হস্তে লইয়া তিনি নিম্ন অধিকারীর জন্য ভক্তিচন্দনচর্চ্চিত দ্বৈতবাদের কুসুম-রাশি নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। শারীরকাদি জ্ঞানগর্ভ ভাষ্য যেমন অদ্বৈতবাদের অক্ষয় সাক্ষ্যরূপে বিদ্যমান, তেমনি ভক্তিরসাপ্লুত তাঁহার স্তবমালা দ্বৈতবাদের জলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ। বর্ণাশ্রম ও অধিকারী অনুসারে যে অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের প্রচার আবশ্যক, এবং তাহাই যে বৈদিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, তাহা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বৈদিক ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যই প্রচার করেন। জ্ঞানের জলন্ত-মূর্ত্তি শিষ্যগণসহ তিনি দেশে দেশে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এবং সুধন্বাদি রাজাধিরাজগণের সাহায্যে তাহাকে ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বৈদিক বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য তিনি যে কেবল প্রচারকার্য্যেই ব্যাপৃত ছিলেন এমন নহে, কিন্তু তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তিনি বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভারতের চারিটি পুণ্যক্ষেত্রে চারিটি মঠপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে দেবতা ও আচার্য্য স্থাপনই প্রধান। ভারতের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দ্বারকায় যে মঠ স্থাপিত হয়, তাহা শারদা নামে খ্যাত, তথায় সিদ্ধেশ্বর দেব ও ভদ্রকালী দেবী অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠাত্রী হন। তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য বিশ্বরূপ আচার্য্যপদের নিয়োগ লাভ করেন। সিন্ধু সৌবীর, সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি এই মঠের অধীন হয়। পূর্ব্বপ্রান্তে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। জগন্নাথ দেব ও বিমলা দেবী অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠাত্রীরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। সনন্দন বা পদ্মপাদ আচার্য্যরূপে বরিত হন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, উৎকল, ও বর্ব্বরাদি দেশ গোবর্দ্ধন মঠের অধীন হইয়াছিল। উত্তরদিকে বদরিকাশ্রমক্ষেত্রে জ্যোতিষ্মান্ বা জ্যোতির্ম্মঠ স্থাপিত হয়। বদরীনারায়ণ দেব ও পুন্নাগিরী (পূর্ণাগিরী) দেবীরূপে পূজিত এবং তোটক (ত্রোটক) আচার্য্য পদে নিযুক্ত হন; কুরু, কাশ্মীর, কাম্বোজ পাঞ্চালাদি প্রদেশ জ্যোতির্ম্মঠের অধীন করা হয়। দক্ষিণদিকে রামেশ্বর ক্ষেত্রে শৃঙ্গেরী মঠের প্রতিষ্ঠা ও আদিবরাহ দেব ও কামাক্ষী দেবীকে অধিষ্ঠাতা ও

অধীষ্ঠাত্রীরূপে অর্চনা করা হয়। পৃথ্বীধর তাহার আচার্য্যরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং অন্ধ্র, দ্রবিড়, কর্ণাট, কেরল প্রভৃতি তাহার অধীনে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই মঠচতুষ্টয় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে অবস্থিত থাকিয়া বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্রস্বরূপে বিরাজ করিতেছে। ইহাদের আচার্য্যগণ জগদ্গুরু শ রাচার্য্য উপাধি ধারণ করিয়া ভারতবাসীমাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন। যদিও নানারূপ ধর্ম্মবিপ্লবে কোন কোন সময়ে মঠাচার্য্যগণ সম্যগ্রূপে সনাতনধর্ম্ম প্রচারে সক্ষম হন নাই, তথাপি তাঁহারাই যে বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারের মূলস্বরূপ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মঠাচার্য্য পরম্পরা নানা ধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষে আপনাদের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মহিমা প্রকাশ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যে অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাস্তবিক তাঁহাদের জন্য ভারতে বৈদিকধর্ম্ম অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে যখন জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারে সনাতন বৈদিক ধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া রাখে, তখন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যপরম্পরা তাহাকে সঞ্জীবিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য একাকীই বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত ও জৈনধর্ম্মকে বিলীন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। অবশ্য ভগবানের মহীয়সী শক্তিতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম যে হীনপ্রভ হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা যে একেবারে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত বা তথায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল, ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে বিরাজ করিতেছিল, এবং কখনও কখনও রাজধর্ম্ম হইয়া ভারতসমাজকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাহা অল্পদিন মধ্যে কদাচ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে পারে না। আমরা ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা অবগত হইতে পারি যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন আকারে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল এবং অদ্যাপি কোন কোন স্থানে তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। জৈন ধর্ম্মও আজিও ভারতবর্ষের অনেক

স্থলে বিরাজ করিতেছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহাদিগকে নিস্তেজ ও বিকলাঙ্গ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার শিষ্যপরম্পরা তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে ভারতসমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চেষ্টা করেন। এই মঠচতুষ্টয়ের শঙ্করাচার্য্যগণ বৌদ্ধ ও জৈন মনীষিগণের সহিত বহুকাল ধরিয়া বিচার করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মমতের খণ্ডন ও বৈদিকধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছিলেন। কেবল আদি শঙ্করাচার্য্য নহেন, পরবর্ত্তী শঙ্করাচার্য্যগণও এই সকল ধর্ম্মের সহিত অবিরত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ভারত সমাজ হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান আচার্য্যগণও তাঁহাদের পদবীর অনুসরণ করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারে সচেষ্ট রহিয়াছেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে মহাপুরুষের বিষয় আলোচনা করিতেছি, তিনি পুরীর গোবর্দ্ধন মঠের বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্য। গোবর্দ্ধন মঠ অনেক মহাপুরুষ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছে। ইহার প্রথম আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য সনন্দন বা পদ্মপাদ। তাঁহার পর বিদ্যারণ্য, শ্রীধরস্বামী, বোপদেব প্রভৃতি মহাপুরুষ গোবর্দ্ধনের গৌরব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু শ্রীমধুসূদন তীর্থস্বামীও একজন জ্ঞান ও বৈরাগ্যপূর্ণ মহাপুরুষ। তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভারতের কল্যাণের জন্য বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন। বেদ বেদান্তপ্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহার হৃদয় করুণা পরিপূর্ণ। অনেক বিপথগামী ব্যক্তি তাঁহার করুণায় স্বধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জগতের কল্যাণ, গোব্রাহ্মণের হিতসাধন এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য মধুসূদন প্রকৃত মধুসূদনের ন্যায়ই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি দেশে দেশে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন ও সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিলে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। ভারতবাসীকে ধর্ম্মকথা শুনাইবার জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত। আবার সাধনা দ্বারা পরমতত্ত্ব অনুভবের জন্যও তাঁহাকে ব্যাকুল দেখা যায়। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে এরূপ মহাপুরুষ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। যতদিন ভারতবর্ষে এই সকল মহাপুরুষ বিদ্যমান থাকিবেন, ততদিন যে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জ্ঞান বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্য, বেদ বেদান্তের পবিত্র

আবার, সদাচারের পূত প্রস্রবণ,গোব্রাহ্মণের কল্যাণ পরায়ণ সেই মহাপুরুষের পদে সকলেরই মস্তক অবনত করা কর্ত্তব্য। আমাদের প্রতি তাঁহার করুণাবৃষ্টি নিপতিত হইলে আমরা যে পবিত্র ও ধন্য হইব সেকথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। আসুন, আমরা সকলে এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার পদে বারবার প্রণাম করি।

"অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যানদ্বৈতার্থপ্রবোধকান্।
আসেতুহিমবচ্ছৈলাঃ সদাচার প্রবর্ত্তকান্॥
আদ্যশ্রীশঙ্করাচার্য্যপ্রতিমূর্ত্তি বদান্বিতান্
তীর্থৈশ্চতুর্ভিঃ সচ্ছিষ্যৈর্বোধিতান্ শাস্ত্রকোবিদৈঃ॥
গোবর্দ্ধনমঠাধীশান্ গোব্রাহ্মণহিতে রতান্।
মধুসূদনতীর্থাখ্যান্ প্রণমামি জগদ্গুরূন্॥"

অবিশ্বাসী।

সভয়ে মেলিল আঁখি দেখিল চাহিয়া,
প্রীতিপ্রেমবিস্ফারিত নয়ন দুখানি
রয়েছে জাগিয়া, কিবা করুণ-নির্ঝর,
কাঁপিল মুহূর্ত্তে তার প্রতি মর্ম্মস্তর।
সাপটি চাপিল নেত্র দৃঢ়মুষ্টি দিয়া,
নিষ্ফল প্রয়াস হায়! অবশ পরাণী,
দুরন্ত নিবিড় কৃষ্ণ অন্ধকারতলে
করুণার হাসিমাখা সেই আঁখি জ্বলে।
টুটিল মোহের বাঁধ উঠিল শিহরি,
অবিশ্বাসী ভূমে পড়ি যায় গড়াগড়ি।

শ্রীঅঃ—

———

ধর্ম্মভাণ্ডার লিমিটেড।

মূলধন ২৫০০০ হাজার টাকা।

প্রতি অংশ ৫৲ করিয়া ৫০০০ হাজার অংশে বিভক্ত।

কোম্পানীর উদ্দেশ্য— যাহাতে স্বদেশী শিল্পের প্রচার হইয়া প্রকৃত স্বদেশী শিল্পের উন্নতি হয়, তাহাই আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদা চেষ্টা করিব। মুখে স্বদেশী বলিয়া চীৎকার করিয়া তাহা কার্য্যের দ্বারা দেখা নই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাতে আমাদের এই মহাব্রত রক্ষা হয় তৎপ্রতি আমাদিগকে সাহায্য করা প্রত্যেক বঙ্গবাসীরই কর্ত্তব্য। আশা করি কোন স্বদেশভক্ত বঙ্গবাসীই তাহাতে কৃপণতা করিবেন না।

সুখের বিষয় এই : যিনি সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত এবং তাহা পালন করিবার জন্য ঘোরতর দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, এমন কি সত্যই যাঁহার অবলম্বন, সত্যই যাঁহার একমাত্র জীবনের ধ্রুবতারা, সেই মহানব্যক্তি আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতৃবন্ধু শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস এই কোম্পানীর পরিচালনার ভার লইয়াছেন। ইনি ঢাকা বিক্রমপুরনিবাসী পরলোকগত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজ স্বর্গীয় রাধাকান্ত কবিরাজ মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র।

স্বদেশী শিল্পের যতপ্রকার দ্রব্য আছে তাহা আমাদের নিকট সর্ব্বদাই পাইবেন। বিশেষ কোন কারণ বশতঃ ভাদ্রমাসের পূর্ব্বে ভাণ্ডার খুলিতে পারিব না। অফিস শীঘ্রই খুলিব, যিনি অংশ ক্রয় করিবেন তিনি ২।২ নং নীলমণি সরকারের ষ্ট্রীট, ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিবেন।

ম্যানেজার—শ্রীজগদীন্দ্রনাথ দাস।

২।২ নীলমণি সরকারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহর্ষিপরমানন্দ ব্রহ্মচারীকৃত।

শক্তিসাধন-মহাতন্ত্র।

ইহাতে তন্ত্রোক্ত প্রাতঃকৃত্য, মালা-সংস্কার, মালানির্ণয়, মালাবর্ণমালা, নানাবিধ আসন, ন্যাস, সাধারণ পূজা, পুরশ্চরণাদি ও দশমহাবিদ্যার ক্রমাবয়ে সম্পূর্ণ পূজা, পুরশ্চরণাদি, স্তব, কবচ, গ্রহ পুরশ্চরণাদি যোগিন্যাদি সাধন, বশীকরণাদি ষট্‌কর্ম্মসাধন, প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তন্ত্রের গ্রন্থ অতি বিরল। লাল কালিতে ছাপা, বোর্ড বাঁধাই মূল্য ১৷০ মাত্র।

আসল সজীব **গুপ্ত-মন্ত্র** মূল্য ২৷৷০ স্থলে ১৷০

প্রসিদ্ধ ওঝা গঙ্গামরয়া, কালীকামার প্রভৃতি ওস্তাদগণ—যে সকল মন্ত্র বলে অমানবিক কার্য্যকলাপ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন. সেই সকল প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ মন্ত্র একত্র সন্নিবেশিত। ইহাতে ষট্-কর্ম্ম সাধন, বিষ চিকিৎসা, নানাবিধ ঝাড়া, চালান কৃত্যাদি আনয়ন. চিকিৎসা প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নি-বেশিত। বহু প্রশংসাপত্র আছে। যাঁহাদের মন্ত্রাদিতে বিশ্বাস নাই তাঁহারা একবার পরীক্ষা করুন।

বিশুদ্ধ স্তবকবচমালা। মূল্য ।৵০ আনা। ঐ বাঁধাই ।৶০ আনা।

সানুবাদ ধ্যানমালা। সমস্ত দেবদেবীর মন্ত্র, ধ্যান, অনুবাদসহ মূল্য ।৵০ আনা।

হরিদাসের গুপ্ত কথা প্রণেতার নূতন উপন্যাস।

সংসার-সাগর।

এইরূপ নূতন ধরণের উপন্যাস এই প্রথম, সংসারের অদ্ভুত লীলা খেলা, বর্ত্তমান সামাজিক চিত্র স্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস অতি বিরল। যেমনই ভাষার বৈচিত্র. তেমনই লেখার মাধুর্য্য। গল্পের অলৌকিক ঘটনা, পড়িতে পড়িতে আগ্রহ লালসা ক্রমেই বলবতী হইবে. শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারিবেন না। উৎকৃষ্ট কাগজে, বিলাতী বাঁধাই মূল্য ১৷০ মাত্র।

গৌরহরি পালের।

সর্ব্বপ্রকার বিশুদ্ধ স্বদেশী আতর ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাঁটী গোলাপ জল ব্যবহার করুন।

আমাদের সুগন্ধি দ্রব্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারণ, এই সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্য স্বদেশজাত মহাসুগন্ধি পুষ্প হইতে স্বদেশীয় লোক দ্বারায় বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, এই সমস্ত মনোমুগ্ধকর ও আয়ুবৃদ্ধিকর সুগন্ধি দ্রব্য কোন প্রকার বিদেশী সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারায় অপবিত্র করা হয় নাই। কাজেই সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়াছে। আমরা বহুব্যয়ে গাজীপুর হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ গোলাপ জল এবং কেওয়া জল আনাইয়া বাজার অপেক্ষা সুলভ মূল্যে সহর ও মফঃস্বলে সাপ্লাই করিয়া থাকি। মফঃস্বলের অর্ডার সাপ্লাই করাই আমাদের প্রধান কার্য্য। ভিপিতে মাল পাঠান হয়, কিন্তু অগ্রিম সিকি মূল্য না পাঠাইলে মফঃস্বলে মাল পাঠাইতে পারিব না। পাইকারদিগের বিশেষ সুবিধা। বিস্তারিত পত্র লিখিয়া জানুন।

আতর প্রতিশিশি ।০ তোলা মূল্য		আতর প্রতিশিশি ।০ তোলা মূল্য		আতর প্রতিশিশি ।০ তোলা মূল্য		গোলাপ জল পাইট বোতল।	
১নং গোলাপী	৸০	১নং কেওরা	৸০	১নং বকুল	৸০	১০০নং	৵০
২নং "	।৶০	২নং "	।৵০	২নং "	।৶০	১০০০নং	।০
৩নং "	॥০	১নং চামেলি	।০	১নং চাপা	॥৶০	১৫০০নং	॥৶০
৪নং "	।৶০	২নং "	৶০	২নং "	।৶০	২০০০নং	৸০
১নং মতিয়া	৸০	১নং জুই	৸০	১নং হেনা	।০	৩০০০নং	১৲
২নং "	॥০	১নং খসখস	৷৶০	১নং কামিনী	॥৶০	কেওড়া জল পাইট বোতল।	
৩নং "	।৶০	২নং "	।৶০			।৵০ ও ৷০ আনা।	

মূল ঠিকানা—

শ্রীযুক্ত গৌরহরি পাল।

৩১ নং বেনেটোলা ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

এজেন্টগণ—

বিজয়কৃষ্ণ এণ্ড নেফিউ।
কেনিং ষ্ট্রীট, মুর্গিহাটা, কলিকাতা।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
প্রভাতচন্দ্র সেন।
নূতনবাজার, কলিকাতা।

এজেন্টগণ—

নাগ এণ্ড ব্রাদার্স।
কেনিং ষ্ট্রীট, মুরগিহাটা, কলিকাতা।
যোগেন্দ্রনাথ দাস।
শোভাবাজার কলিকাতা।
মহম্মদ এসমাইল।
কেনিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীগুরবে নমঃ।

১ম খণ্ড। আষাঢ় ১৩২০ ৩য় সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক
শ্রীনিখিলনাথ রায়।

লেখকগণের নাম।

শ্রীরেবতীরমণ (রসিকলাল) ভট্টাচার্য্য, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি-এ, শ্রীঅশ্বিনী কুমার সেন, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় বি, এস্‌, সি, শ্রীনিরঞ্জন সান্ন্যাল, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীক্ষিরোদবিহারী সোম, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাহারা শাশ্বতীর মূল্য প্রদান না করিয়াছেন, শ্রাবণ সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভি পিতে পাঠান হইবে। তবে কেহ অন্য মাসে ভি পি করিতে বলিলে আমরা তাহাও করিতে পারি। গ্রাহকগণের কোন পত্র না পাইলে শ্রাবণ মাসেই ভি পি করিব। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

নিয়মাবলী।

—:০:—

সাহিত্যে দেশীয় ভাববিকাশই শাশ্বতীর উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কোন লেখক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে পারেন। নবীন লেখক-গণের প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

শাশ্বতীর জন্য প্রবন্ধাদি ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি এবং চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এথোড়া পোঃ ভায়া সীতারামপুর ই, আই, রেলওয়ে ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য

শাশ্বতীর প্রতি সংখ্যা পর মাসে প্রকাশিত হইবে। ক্রমে আমরা মাসমধ্যে প্রকাশের চেষ্টা করিব।

এথোড়া (Ethora) পোঃ
ভায়া সীতারামপুর,
ই, আই, রেলওয়ে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শাশ্বতী ১ম খণ্ড। আষাঢ় ১৩২০। ৩য় সংখ্যা।

মথুরা।

মথুরা হিন্দুর এক পবিত্র তীর্থস্থান। ত্রেতাযুগে এস্থানে এক বৃহৎ জঙ্গল ছিল সে জঙ্গলের অধীশ্বর ছিল, মধু নামক এক দৈত্য। মধুর পরে তাহার পুত্র লবণ এই বনের কর্ত্তা হইল। লবণ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও অত্যাচারী ছিল। তাহার দৌরাত্মে মুনিঋষি, সাধুতপস্বীরা সর্ব্বদাই সশঙ্কচিত্তে কাল কাটাইতেন, তাঁহাদের জপ তপ কিছুই হইত না। তাই তাঁহারা রঘুকুলপতি রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। রামচন্দ্র লবণকে দমন করিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে প্রেরণ করেন। শত্রুঘ্ন লবণকে সংহার করিয়া এখানে লোকালয় স্থাপন করেন। শত্রুঘ্নের পুত্র শূরসেন এখানে রাজত্ব করেন।

তাপরে কংস মথুরায় রাজত্ব করিতেন। কংস অত্যন্ত দুরাচার ছিলেন। কৃষ্ণ ইহাকে স্বহস্তে নিধন করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকে মথুরা রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই গেল পৌরাণিক যুগের কথা।

বৌদ্ধযুগে।

বৌদ্ধযুগের অতি বিশ্বস্ত ও প্রামাণিক গ্রন্থপৃষ্ঠায়ও আমরা মথুরার নাম দেখিতে পাই। প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতে আগমন করেন। তখন মথুরা বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রস্থান ছিল। ফা-হিয়ান এখানে ছয়টি সঙ্ঘারাম, অসংখ্য স্তূপ ও তিন সহস্রাধিক বৌদ্ধ শ্রমণ দেখিয়াছিলেন। ইহার দুইশত বৎসর পরে হোয়েন্থ-সাং যখন

ভারতে আসিয়াছিলেন তখনও মথুরায় সঙ্ঘরামের সংখ্যা ছয়টি ছিল বটে কিন্তু শ্রমণের সংখ্যা তখন অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। কারণ তখন হইতেই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হয়।

মুসলমান্-আমলে।

মুসলমানদিগের সময়ে মথুরার দশাবিপর্য্যয় আরম্ভ হয়। সুল্তান মামুদ হইতে আরম্ভ করিয়া আরঙ্গজেব পর্য্যন্ত ধর্ম্মোন্মত্ত লুণ্ঠনকারী ও গোঁড়া শাসন-কর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক বারবার লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হওয়ায়, মথুরার এমন শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল যে, ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ভ্রমণকারী ট্যাভারনিয়ার একটীমাত্র দেবমন্দির ভিন্ন মথুরায় আর কিছু উল্লেখযোগ্য সম্পদ দেখিতে পান নাই।

ব্রিটিশ শাসনে।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মথুরা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে আইসে। বর্ত্তমানে ইহা যুক্ত প্রদেশান্তর্গত আগ্রাবিভাগের একটী জেলা।

দেব-মন্দির।

কেশবদেবের মন্দিরই মথুরার প্রাচীনতম বিখ্যাত মন্দির ছিল আওরঙ্গজেবের রাজত্বের একাদশবর্ষে এই মন্দির বিধ্বস্ত হইয়া তৎস্থলে এক মসজিদ নির্ম্মিত হয়। ট্যাভারনিয়ার কেশবদেবের মন্দিরকেই ভারতবর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দিরসমূহের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই মন্দির সুবৃহৎ ও সুগঠিত ছিল এবং এত উচ্চ ছিল যে, পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর হইতে লোকে ইহার উচ্চচূড়া দেখিতে পাইত। কিন্তু হায়! সে মন্দির আর নাই! এখন আওরঙ্গজেবের মস্‌জিদের অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র নগণ্য মন্দিরই কেশবদেবের মন্দির বলিয়া পরিচিত।

কেশবদেবের মন্দিরের নিকটেই ভূতেশ্বরের মন্দির। মিঃ গ্রোস বলেন যে, এই মন্দির অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার একটু দূরেই দ্বারকাধীশের মন্দির ২০০০০৲ টাকা ব্যয়ে পারিখজি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বৃন্দাবনের মন্দিরও দর্শ

যোগ্য। ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা প্রাণনাথ শাস্ত্রী। ব্যয় ২৫০০০৲ টাকা। নির্ম্মাণাব্দ ১৮০০ খৃঃ। আধুনিক মন্দিরগুলির মধ্যে মদনমোহন, বিহারীজী ও গোপীনাথের মন্দিরই তীর্থযাত্রিগণ দর্শন করিয়া থাকেন।

সরোবর, কুণ্ড ও ঘাট।

মথুরায় যত সরোবর ও কুণ্ড আছে ভারতের আর কোথায়ও তত দেখা যায় না। এখানকার কুণ্ডগুলির মধ্যে পাত্রকুণ্ড সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ। যাত্রিগণ শুধু এখানেই স্নানাবগাহন করিয়া থাকেন। কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের শিশুকালের কাপড় চোপড় পাত্রকুণ্ডে ধৌত করা হইত। কুণ্ডের জল অত্যন্ত পরিষ্কার, কিন্তু গ্রীষ্মকালে জল একেবারে শুকাইয়া যায়।

মথুরার ঘাটগুলির মধ্যে বিশ্রামঘাটই বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ মাতুল কংসকে বধ করিয়া এই ঘাটে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম বিশ্রামঘাট। মথুরায় আসিলে প্রত্যেক যাত্রীরই এই ঘাটে আসিয়া স্নান করিতে হয়। এই ঘাটে স্নান করিলে মানুষ সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া মৃত্যু অন্তে ভগবানে লীন হইয়া যায়, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

অট্টালিকা ও স্মৃতিমন্দির।

ধনীদিগের প্রাসাদমধ্যে মথুরার শেঠদিগের বাসভবনই দেখিবার যোগ্য ইহা নির্ম্মাণ করিতে লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। শেঠদিগের যমুনাবাগনামক বাগান এক সময় মথুরার মধ্যে শুধু মথুরায় কেন—এ অঞ্চলের মধ্যে প্রশংসার জিনিষ ছিল। কিন্তু যত্নের অভাবে এখন সে বাগ ক্রমেই ধ্বংসের মুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ভরতপুরের মহারাজের প্রাসাদ মথুরার অট্টালিকাসমূহের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানে আফিস আদালতের জন্য অনেকগুলি অট্টালিকা আছে, কিন্তু তাহার কোনটি স্থাপত্যসৌন্দর্য্যশালী নহে। মথুরায় একটী ক্ষুদ্র সেনানিবাস আছে, সেখানে একদল গোরাসৈন্য বাস করে। এখানকার যাদুঘর একটা অবশ্য দেখিবার জিনিষ, এটি ঠিক তহশীল অফিসের সম্মুখেই অবস্থিত। যাদুঘরে প্রবেশজন্য পয়সাকড়ি দিতে হয় না, কিন্তু তহশীলদারের অনুমতি আবশ্যক। যাদুঘরে সহর এবং জেলা হইতে

সংগৃহীত বৌদ্ধযুগের বহুসংখ্যক স্থাপত্য ও শিল্পকীর্ত্তিচিহ্ন সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রায় ৫০০০০৲ টাকা ব্যয়ে মথুরার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্রোসের যত্ন ও চেষ্টায় এই যাদুঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। এইজন্য মথুরা জেলার অধিবাসিবর্গ মিঃ গ্রোসের নিকট কৃতজ্ঞ।

এখানকার হার্ডিঞ্জ-ফটকও উল্লেখযোগ্য। মথুরার অন্যতম ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হার্ডিঞ্জের স্মৃতিকল্পেই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। যমুনাতীরের সতীবুরুজ অন্যতম প্রসিদ্ধ স্মৃতি-মন্দির। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে রাজা ভগবান দাস স্বীয় জননীদেবীর স্মরণার্থে ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সতী বুরুজ চারিতলা বিশিষ্ট। ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা ৮২ হস্ত।

অধিবাসী ও উৎপন্ন দ্রব্য।

মথুরার অধিবাসিবর্গ প্রায়ই হিন্দু। আবার হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সনাঢ, গৌড় ও চোবে উপাধিধারী লোক দৃষ্ট হয়। চোবেঠাকুরেরা অদ্ভুত ধরণের। তাঁহারা সকলেই প্রথম শ্রেণীর পালোয়ান, কিন্তু সর্ব্বদাই সিদ্ধিপানে মস্‌গুল হইয়া আছেন। আহিরিয়েরা জেলার অন্যতম অদ্ভুত জাতি। ইহারা সাধারণতঃ মুটের কাষ করে। লবণের ব্যবসায় ইহাদের একচেটিয়া। বাণিয়াদিগের মধ্যে অধিকাংশ আগরওয়ালাবংশোদ্ভব। মথুরায় মুসলমানের সংখ্যা খুব কম। যাহারাও আছে তাহারা বংশগৌরবে অতি হীন। একমাত্র সদাবাদের মুসলমানেরাই জেলার মধ্যে সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়া পরিচিত।

এস্থানের উৎপন্ন জিনিসের মধ্যে পিতলের বাসন সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবনী ধুতিও মন্দ নহে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

কবিকথা।

(কালিদাস)

অভিজ্ঞানশকুন্তল।

(৫)

দুর্ব্বাসার অভিশাপ ফলিল, পতিচিন্তা অপেক্ষা অতিথিসংকারেরই গৌরব ঘোষিত হইল। তপোবন হইতে রাজধানীতে আসিয়া রাজা শকুন্তলার কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার মনোমধ্যে উৎকণ্ঠার ছায়া মধ্যে মধ্যে উদয় হইত। একদিন মাধব্যের সহিত নির্জ্জনে বসিয়া যখন তিনি আলাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সঙ্গীতশালা হইতে হংসপদিকা নামে কোন অন্তঃপুরবাসিনী মধুরকণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন, "অভিনব মধুলোলুপ মধুকর তুমি চূতমঞ্জরীকে পরিচুম্বন করিয়া এক্ষণে কমলে বসতিমাত্রেই তাহাকে বিস্মৃত হইলে কেন?" মাধব্য ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা বলিলেন, "উহা আমাকেই লক্ষ্য করিয়া গাহিয়া থাকিবে।" গানটি শুনিয়া কিন্তু রাজা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, তবে কি কারণে তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মিতেছে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, রম্য বস্তু দেখিয়া বা মধুর শব্দ শুনিয়া সুখীজনও যে উৎকণ্ঠিত হয়, ইহার কারণ এই যে, নিশ্চয়ই সে বাসনা দ্বারা নিশ্চল জন্মান্তরীণ পরিচয় অজ্ঞাতভাবে স্মরণ করিয়া থাকে। রাজা যখন এইরূপ ভাবে নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্ট, সেই সময়ে কণ্বশিষ্যেরা শকুন্তলা ও গৌতমীর সহিত আসিয়া উপস্থিত হন। অন্তঃপুরের অতিবৃদ্ধ কঞ্চুকী রাজাকে সেই সংবাদ দিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। কঞ্চুকী প্রথমে অন্তঃপুররক্ষার নিয়মের জন্য যে বেত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে বার্দ্ধক্যের চরমসীমায় উপনীত হওয়ায়, তাহাই তাঁহার অবলম্বন-যষ্টি হইয়া উঠে। রাজাদের বিশ্রাম নাই জানিয়া তিনি বলিতেছিলেন যে, সূর্য্য একবারেই অশ্ব জুড়িয়া ছুটিতে থাকেন, বায়ু

দিবানিশি বহিয়াই যান, অনন্ত সর্ব্বদা ভূমিভার বহন করিতেই থাকেন, রাজাদেরও তাহাই দেখিতেছি। তাহার পর কঞ্চুকী দুষ্মন্তকে অন্বেষণ করিতে আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আছেন। তাহা দেখিয়া কঞ্চুকীর মনে হইল, রৌদ্রতপ্ত হস্তীপতি যূথদিগকে চালিত করিয়া অবশেষে যেমন শীতল স্থানে অবস্থিতি করে, রাজা দুষ্মন্তও সেইরূপ আপনার প্রজাদিগকে নিয়মিত করিয়া এক্ষণ নির্জ্জন স্থানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পর তিনি রাজার নিকট অগ্রসর হইয়া জয়কামনা করিলেন, এবং তাঁহাকে কণ্বশিষ্যদিগের উপস্থিতির কথাও জানাইলেন। রাজা তপস্বীদিগের আগমন শুনিয়া সাদরে কহিলেন, "উপাধ্যায় সোমরাতকে বল, তাঁহাদিগকে শ্রৌতাবধি অনুসারে সৎকার করিয়া লইয়া আসেন, আমিও তপস্বী দর্শন যোগ্য স্থানে যাইতেছি।" কঞ্চুকী চলিয়া গেলে রাজা প্রতীহারীর সহিত অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজাসম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন, "সকলে আপনাপন প্রার্থিত বস্তু লাভ করিয়া সুখী হয়, কিন্তু রাজার ভাগ্যে কখনও অমিশ্র সুখ ঘটিয়া উঠে না। রাজ্যশাসনের গৌরবে উৎকণ্ঠা দূরে যায় বটে, কিন্তু রাজ্যপালনে যথেষ্ট ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। স্বহস্তধৃত ছত্রের ন্যায় রাজ্য একেবারে শ্রম দূরও করে না, বা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত করিয়াও তুলে না।" এই সময়ে বৈতালিকেরা রাজার জয় ঘোষণা করিয়া গাহিতে লাগিল, "রাজন্! উচ্চশীর্ষ পাদপ যেমন মস্তকে তীক্ষ্ণ রবিকর ধারণ করিয়া ছায়াদানে আশ্রিতদিগের শ্রান্তি দূর করে, তুমিও সেইরূপ আত্মসুখে নিরভিলাষ হইয়া প্রতিদিন খিন্ন হইতেছ। কুমার্গগামীদিগের শাসনের জন্য তোমার দণ্ড সর্ব্বদা উদ্যত রহিয়াছে। প্রজাদিগের বিবাদ তুমি অবিলম্বে মীমাংসা করিয়া দিতেছ, এবং তাহাদের রক্ষণের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছ। তোমার জ্ঞাতিগণ বহুসম্পত্তি লাভ করিয়া বিভক্ত হইয়া আছেন, তাঁহাদের কোনদিকে দৃষ্টি নাই, কিন্তু একমাত্র তুমিই প্রজাদিগের বন্ধুর কার্য্য করিয়া থাক।" গান শুনিয়া রাজার মনে উৎসাহের সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু তপস্বীরা কি কারণে আগমন করিয়াছেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি কিছু উৎকণ্ঠিত হইলেন। রাজা মনে করিলেন হয়ত কোন প্রকারে

তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকিবে। এই সময়ে শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত শকুন্তলা ও গৌতমীর সহিত কঞ্চুকীর দর্শিত পথে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। নগরের কোলাহল ঋষিকুমারদের নিকট ভাল লাগিতেছিল না। শার্ঙ্গরব শারদ্বতকে কহিতেছিলেন, "দেখ, রাজা মহাভাগ, এবং তাঁহার ন্যায়পথে স্থিতিও অব্যাহত; তদ্ভিন্ন এখানে অপকৃষ্টবর্ণও কুপথগামী নহে। তথাপি নিরন্তর নির্জ্জনবাসী আমার নিকট এই জনাকীর্ণ স্থানকে অগ্নিময় বলিয়াই বোধ হইতেছে।" শারদ্বত উত্তর দিলেন, "বুঝিতেছি পুরপ্রবেশ অবধি তুমি ঐরূপ বোধ করিতেছ। আমার নিকট আবার এই সুখাসক্ত লোকগুলা স্নাতের নিকট তৈলাক্তের, শুচির নিকট অশুচির, জাগরিতের নিকট সুপ্তের, স্বেচ্ছাগামীর নিকট বদ্ধের ন্যায় অনুমিত হইতেছে।" রাজার নিকট উপস্থিত হইলে শকুন্তলার মন বিচলিত হইয়া উঠিল, তাঁহার ভাগ্যে কি আছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না। এই সময়ে আবার তাঁহার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হওয়ায়, তিনি তাহাকে অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করিয়া গৌতমীকে সে কথা জানাইলেন। গৌতমী উত্তর দিলেন যে, "তুমি কোন আশঙ্কা করিও না, পতিকুল দেবতারা তোমার মঙ্গল করিবেন।" কিন্তু শকুন্তলা তাহাতে আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। পুরোহিত সোমরাত রাজাকে দেখাইয়া তপস্বীদিগকে বলিলেন, "ঐ দেখুন বর্ণাশ্রমের রক্ষিতা মহারাজ দুষ্মন্ত আপনাদের আগমনপ্রতীক্ষায় পূর্ব্ব হইতেই আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।" তপস্বীরা কিছু বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন, "অহে মহাব্রাহ্মণ! আপনাকে সে কথা বলিতে হইবে না, আমরাই তাহার বিচার করিব। আর এরূপ না হইবেই বা কেন? ফলাগমে তরুগণ নম্র হয়, নবাম্বুসংযোগে মেঘসকল অনতিদূরবর্ত্তী হয়। সমৃদ্ধিলাভে সাধুপুরুষেরা অনুদ্ধত হন, পরোপকারীদিগের ইহাই স্বভাব।" রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া অস্পষ্টভাবে বলিতেছিলেন, "পাণ্ডুপত্রের ন্যায় তপস্বীদিগের মধ্যে নবকিশলয়শোভা অপরিস্ফুটলাবণ্যা এই অবগুণ্ঠনবতী রমণীটী কে?" কিন্তু পরস্ত্রীর আলোচনা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া তিনি আর তাঁহার প্রতি মনোযোগ দিলেন না। তাহার পর তপস্বীরা নিকটবর্ত্তী হইলে রাজা

তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তপস্বীরা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, মহারাজের জয় হউক। রাজা তাঁহাদের তপস্যা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, তপস্বীরা উত্তর দিলেন যে,"আপনি রক্ষিতা থাকিতে ধর্ম্মক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটিবে কেন ? সূর্য্যোদয়ে কি অন্ধকারের আবির্ভাব হইতে পারে ?" রাজা কৃতার্থ হইয়া কহিলেন, "আমার রাজশব্দের সার্থকতা হইল।" তাহার পর তিনি মহর্ষি কণ্বের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, ঋষিকুমারেরা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বলিয়া উত্তর দিলেন। পরে তাঁহারা রাজাকে কহিলেন যে, "আমরা তাঁহার নিকট হইতে এক্ষণে যে সংবাদ লইয়া আসিয়াছি, তাহাই মহারাজকে নিবেদন করিতেছি।" তৎপরে শার্ঙ্গরব বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মহর্ষি বলিয়া দিয়াছেন যে, আপনি তাঁহার কন্যাকে যে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রীত হইয়াছেন এবং সম্মতিদানও করিতেছেন। তাঁহার মতে আপনাদের অনুরূপ মিলনই ঘটিয়াছে। কারণ আপনি সৎক্রিয়াশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শকুন্তলাও মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া। এই তুল্যগুণ বরবধূর মিলনে বিধাতাকে কেহ নিন্দা করিতে পারিবে না।" শার্ঙ্গরব কণ্বের যে উক্তির কথা রাজাকে জ্ঞাপন করাইয়াছিলেন, দুষ্মন্ত শকুন্তলা সম্বন্ধে তাহাই প্রকৃত কথা। কারণ মূর্ত্তিমান্ রাজধর্ম্ম দুষ্মন্ত সৎক্রিয়ারই আধার ছিলেন, এবং তপোবনপালিতা শকুন্তলা মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাঁহাদের এই অনুরূপ মিলন যে বিধাতার অভি-প্রেত ছিল, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেবল তাহা বলিয়া নহে, এই মিলনের ফল হইতে এক অভাবনীয় কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, পরে তাহার উল্লেখ করা যাইবে। শার্ঙ্গরব আরও বলিলেন যে, "শকুন্তলা এক্ষণে গর্ভধারণ করিয়াছেন, সুতরাং আপনি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হউন।" গৌতমীও কহিলেন,"রাজন ? আমিও বলিতেছি যে, শকুন্তলা গুরুজনের অপেক্ষা করে নাই, আপনিও বন্ধুজনকে জিজ্ঞাসা করেন নাই, আপনাদের পরস্পরের সম্মতিতে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে আর বলিবার কি আছে ?" রাজা সমস্ত ঘটনা বিস্মৃত হওয়ায় বলিয়া উঠিলেন, "আপনারা যে কি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" শার্ঙ্গরব উত্তর দিলেন, "আপনি লোকবৃত্তান্ত অব

গত থাকিয়াও ওরূপ কথা বলিতেছেন কেন? পরিণীতা মহিলারা পিতৃকুলে বাস করিলে লোকে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিয়া থাকে। সে পতির প্রিয় হউক বা অপ্রিয়ই হউক, তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে পতিকুলবাসিনী করিতেই ইচ্ছা করেন।" রাজা কহিলেন, "ইঁহাকে আমি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছি বলিয়াও মনে হইতেছে না।" শার্ঙ্গরব বলিলেন, "একি কৃতকার্য্যে বিরাগ, না ধর্ম্মে অনাস্থা, অথবা অনুভূত বিষয়ে অবজ্ঞা?" রাজা কহিলেন, "ওরূপ অসাধু কল্পনা করিতেছেন কেন?" শার্ঙ্গরব উত্তর দিলেন "ঐশ্বর্য্যমত্ত ব্যক্তিগণের প্রায়ই এইরূপ বিকার ঘটিয়া থাকে।" রাজা বলিয়া উঠিলেন যে, "আমাকে যারপরনাই তিরস্কার করা হইতেছে।" গৌতমী দেখিলেন যে, সমস্যা বড়ই জটিল হইয়া উঠিতেছে, তখন তিনি শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। শকুন্তলার অনিন্দ্যসুন্দর রূপলাবণ্য দেখিয়া রাজা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এই অযত্নসুলভ অম্লান রূপরাশি পূর্ব্বে কখনও মনপ্রাণ শীতল করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। সংশয়স্থলে পড়িয়া আমি এক্ষণে প্রভাতে নীহারসিক্ত কুন্দকুসুমকে পরিচুম্বনে ও পরিত্যাগে অশক্ত ভ্রমরের ন্যায় হইয়া উঠিতেছি।" শার্ঙ্গরব রাজার নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা উত্তর দিলেন যে,"আমি চিন্তা করিয়াও ইঁহার পরিগ্রহের কথা স্মরণ করিতে পারিতেছি না।" শার্ঙ্গরব বলিলেন, "রত্নস্বামীর দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত ও পরিত্যক্ত রত্নকে দস্যুহস্তে প্রদানের ন্যায় যে মুনি গোপনে কন্যাপরিগ্রহ অনুমোদন করিয়া, সেই কন্যাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার অপমান করিবেন না ত কি?" শারদ্বত এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, যখন তিনি দেখিলেন, শার্ঙ্গরব রাজাকে কিছুতেই স্বীকৃত করাইতে পারিতেছেন না, তখন তিনি তাঁহাকে নীরব হইতে বলিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, "শকুন্তলে, আমাদের বক্তব্য যাহা তাহা বলা হইয়াছে, মহারাজের কথাও শুনিলে, এক্ষণে তুমি বিশ্বাসযোগ্য কি উত্তর দিবে দাও।" শকুন্তলা প্রথম হইতেই যার পর নাই উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিতেছিলেন। রাজার বাক্য বজ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতেছিল। রাজার পরিণয়ে সন্দেহ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়রোপিতা আশালতা একেবারে উন্মূলিতা হইয়া পড়িল। শারদ্বতের কথায় তিনি মনে মনে

বলিতে লাগিলেন, "ইহাতে যদি তাঁহার মনে হইল না, তবে আমি কি করিয়া স্মরণ করাইয়া দিব। আমি এক্ষণে নিজের আত্মাকেই শোচনীয় জ্ঞান করিতেছি।" পরে তিনি রাজাকে আর্য্যপুত্র সম্বোধন করিয়া সংশয়-স্থলে ও কথা উচ্চারণ করা উচিত নহে বলিয়া কহিলেন, "পৌরব! তপো-বনে আমাকে সরলহৃদয়া পাইয়া শপথপূর্ব্বক প্রবঞ্চনা করিয়া এক্ষণে ওরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা কি উচিত হইতেছে?" রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ছি ছি, কূলঘাতিনী নদীর স্বসলিলকে মলিন ও তটতরুকে পাতিত করার ন্যায় তুমি দেখিতেছি আমার কুলকে কলঙ্কিত ও আমাকে পতিত করার চেষ্টা করিতেছ"! শুনিয়া শকুন্তলা শিহরিয়া উঠিলেন, এবং পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "ভাল, যদি তোমার নিতান্ত সংশয় হয়, আমি অভিজ্ঞান দ্বারা প্রত্যয় জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি রাজদত্ত অঙ্গুরীয়টি অঞ্চল হইতে উন্মোচন করিতে গেলেন। কিন্তু হায়! সে অঙ্গুরীয় কোথায়? শকুন্তলার অঞ্চল হইতে তাহাত অপহৃত হইয়াছে। গৌতমী বলিলেন, "হয়ত শচীতীর্থে স্নানের সময় তাহা পড়িয়া গিয়া থাকিবে।" শুনিয়া রাজা বলিলেন, "স্ত্রীলোকদিগের এইরূপই প্রত্যুৎপন্ন-মতি হইয়া থাকে।" শকুন্তলা উত্তর দিলেন, "বিধির বিপাকে যাহা ঘটি-য়াছে, তাহাতে আর কথা কি? সে যাহা হউক, অভিজ্ঞান দেখান ঘটিল না বটে, আমি এক্ষণে কিছু অভিজ্ঞান শুনাইতে ইচ্ছা করিতেছি।" রাজা তাহাতে সম্মত হইলে শকুন্তলা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "এক দিন নব-মল্লিকামণ্ডপে তোমাতে আমাতে বসিয়াছিলাম, তোমার হস্তে একটি পদ্মপত্র-নির্ম্মিত জলাধার ছিল, সেই সময়ে আমার কৃতপুত্র হারণ শিশু দীর্ঘাপাঙ্গ তথায় আসিলে, তুমি তাহাকে জলপানের জন্য আহ্বান করিয়াছিলে। তোমাকে অপরিচিত জানিয়া সে তোমার নিকট যায় নাই। তাহার পর আমি তাহা হস্তে লইলে, সে আসিয়া সেই জল পান করিল। তুমি ইহাতে হাসিয়া বলিলে যে, স্বজাতীয়তেই বিশ্বাস জন্মে, তোমরা দুই জনই যে বন্য!" রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন যে, "স্বকার্য্যসাধিনী রমণীগণ এই রূপ মিষ্ট বাক্যের দ্বারাই বিষয়ীদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।" গৌতমী কহিলেন যে, "তপোবনে থাকিয়া যে কখনও প্রবঞ্চনা অভ্যাস করে নাই তাহাকে ওরূপ

কথা বলা উচিত নহে।" রাজা উত্তর দিলেন যে, "প্রবঞ্চনা স্ত্রীজাতি আপনা হইতেই শিক্ষা করে। পশু পক্ষীতেও ইহার অভাব নাই, মানুষীর কথা কি আর বলিব। দেখুন, কোকিলারা আপন শাবকদিগকে উড়িবার পূর্ব্বে অন্য পক্ষীর দ্বারা প্রতিপালিত করাইয়া লয়।" শকুন্তলা সরোষে বলিতে লাগিলেন, "অনার্য্য! তুমি সকলকেই নিজ হৃদয়ানুরূপ দেখিতেছ। ধর্ম্মাবরণ-বেষ্টিত তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় তোমাকে কে অনুসরণ করিবে?" রাজা কহিলেন, "দুষ্যন্তের চরিত্র সকলেই অবগত আছে।" শকুন্তলা বলিলেন, "হায়! মুখে মধু ও হৃদয়ে হলাহল যাহাকে পুরুবংশীয়জ্ঞানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম, আজ আমি তাহারই দ্বারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠিলাম।" অতঃপর তিনি বসন দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শকুন্তলার অবস্থা দেখিয়া শার্ঙ্গরব বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তোমার আত্মকৃত চপলতা এক্ষণে তোমাকে দগ্ধ করিতেছে। সকল কার্য্যই বিশেষতঃ যাহা গোপনে সাধিত হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া করাই কর্ত্তব্য। অজ্ঞাত হৃদয়ের মিত্রতা শেষে শত্রুতায় পরিণত হইয়া থাকে।" রাজা কহিলেন, "ইঁহার কথা শুনিয়া আমায় কেন মিথ্যা দোষ দিতেছেন?" শার্ঙ্গরব তাহার এইরূপ উত্তর দিলেন যে, "যাহারা জন্মে কখনও শঠতা শিক্ষা করে নাই, তাহাদের বচন যদি অপ্রমাণ্য হয়, তাহা হইলে যাহারা পরপ্রতারণাকে 'বিদ্যা' বলিয়া শিক্ষা করে, তাহাদিগকেই কি সত্যবাদী বলিতে হইবে?" রাজা বলিলেন," আপনারাই সত্যবাদী, আপনাদের সমস্ত কথাই বুঝিয়াছি। এক্ষণে বলুন দেখি ইহাকে বঞ্চনা করিয়া আমার কি লাভ হইবে?" শার্ঙ্গরব বলিয়া উঠিলেন, "বিনিপাত"। রাজা বলিলেন, "পুর-বংশীয়ের নিকট ইহা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়।" তখন শারদ্বত কহিতে লাগিলেন, "শার্ঙ্গরব, আর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই। আমরা গুরুর আদেশ পালন করিলাম, এক্ষণে চল, প্রস্থান করি।" তাহার পর তিনি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই আপনার পত্নী, আপনার নিকট রহিল, উহাকে গ্রহণ করা না করা আপনার ইচ্ছা, পত্নীর উপর পতির সর্ব্বতোমুখী প্রভুতাই আছে।" তাহার পর তাঁহারা গৌতমীকে লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, শকুন্তলাও যাইতে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন, "আমি এই শঠের দ্বারা প্রতারিত হইলাম, আবার

তোমরাও আমাকে ফেলিয়া যাইতেছ ?" গৌতমী বলিলেন, "শার্ঙ্গরব দুঃখিনী শকুন্তলার কি হইবে ?" তখন শার্ঙ্গরব সক্রোধে শকুন্তলাকে বলিলেন, "পাপীয়সি, তুমি স্বাধীনা হইতে চাহিতেছ ? রাজা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য হইলে, কুলটা তোমাকে লইয়া পিতা কি করিবেন ? আর যদি তুমি আপনাকে পবিত্র বলিয়াই জান, তাহা হইলে পতিগৃহে থাকিয়া তোমার দাসীবৃত্তি করাও ভাল।" রাজা কহিলেন, "আপনারা ইঁহাকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন কেন ? যেমন চন্দ্র কুমুদিনীকে ও সূর্য্য কমলিনীকে প্রফুল্ল করে, কখনও তাহার অন্যথা হয় না, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরাও কদাচ পরদারাকাঙ্ক্ষী হন না।" শুনিয়া শার্ঙ্গরব বলিলেন, "এরূপ হইতে পারে যে, আপনার বিস্মৃতি ঘটায় আপনি ইহাকে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছেন, সুতরাং সেস্থলে আপনার অধর্ম নাও হইতে পারে।" রাজা তখন পুরোহিতের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য, আপনারা বিচার করিয়া বলুন। এরূপ সংশয়স্থলে আমি দারত্যাগী হইব, না পরস্ত্রীস্পর্শী হইব ?" পুরোহিত কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সাধুদিগের নিকট হইতে জানা আছে যে, আপনার প্রথম পুত্র চক্রবর্ত্তীলক্ষণযুক্ত হইবেন। সেইজন্য বলিতেছি, ঋষিকন্যা প্রসবসময় পর্য্যন্ত আমার নিকটে থাকুন। প্রসবের পর সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য করা যাইবে।" রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। পুরোহিতও শকুন্তলাকে লইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। যাইতে যাইতে শকুন্তলা বলিতে লাগিলেন, "পৃথিবী বিদীর্ণ হও আমি তোমাতে প্রবেশ করি।" অব্যবহিত পরে পুরোহিত আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ ! এক আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইল। ঋষিকন্যাকে লইয়া যাইতে যাইতে অপ্সরাতীর্থের নিকট তিনি আপনার ভাগ্যকে নিন্দা করিয়া যখন রোদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়া তাঁহাকে ঊর্দ্ধে লইয়া গেল।" রাজা উত্তর দিলেন যে, "যাহাকে পূর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।" তাহার পর পুরোহিত চলিয়া গেলে রাজা শকুন্তলার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহার উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও তাহার ক্রমোন্নতি।

প্রথম স্তর—গ্রীস।

সে এককাল ছিল। জগতের কোথাও কিছু ছিল না। কাহারও মতে শুধু জল, আবার কাহারও মতে শুধু আগুন তখন পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল! আবার কেহ কেহ বলেন তখন ছিল শুধু বায়ু! বায়ুতে সোণা ছিল, রূপা ছিল, প্রায়ই সব ধাতু বর্ত্তমান ছিল; আবার বায়ুর প্রত্যেক অণুতে অণুতে আকর্ষণ ছিল! সেই আকর্ষণই আমাদের সূর্য্য, পৃথিবী এবং গ্রহউপগ্রহাদির সৃষ্টি করিয়াছে। সেত বহুযুগের কথা। তাহার পর কত যুগ যে অতীত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পৃথিবী সৃষ্ট হইল। তাহাতে জীবজন্তু লতাপাতার আবির্ভাব হইল। ক্রমে ক্রমে পৃথিবী শৈশব হইতে যৌবনে পদার্পণ করিল। জীবের আবির্ভাব হওয়াতে আহারের প্রয়োজন হইল। পৃথিবীতে ফল, মূল সব হইল। সকলের আহারও জুটিল। সে এক মজার সময় ছিল। ঘর ছিল না, বাড়ী ছিল না, বনই তাহাদের আশ্রয়, গভীর অরণ্যই তাহাদের বাসভূমি ছিল। কোন চিন্তা ছিল না। চোর-ডাকাতের কোন উপদ্রব ছিল না। দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইত।

ক্রমে তাহাদের মাটী খুঁড়িবার, গাছ কাটিবার, শিকড় তুলিবার প্রয়োজন হইল। কি করিবে অস্ত্রাদি নাই। পাথর ঘষিয়া অস্ত্র করিল। সেই সকল অস্ত্রে তাহাদের কাজ চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহারা তাহাদের কার্য্যোপযোগী অন্যান্য অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। এইত গেল সে যুগের কথা। তাহার পর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানজগতের কত উন্নতি সাধন হইয়াছে।

ক্রমশঃ তাহারা জ্ঞানের চর্চ্চা করিতে লাগিল, এবং কোন কোন বিষয়ে পারদর্শিতাও লাভ করিল। দেখা যাউক অন্যান্য বিদ্যার সহিত সে কালে বিজ্ঞানের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল।

কবে কোন দেশে পদার্থবিদ্যার প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হয় তাহা ঠিক বলা যায় না। আতি-পাতি খুঁজিয়া যাহা কিছু জানা যায় তাহা হইতে বুঝা যায় যে, গ্রীসবাসীরাই প্রথম ইহার চর্চ্চা আরম্ভ করেন। পদার্থ-বিদ্যার ইতিহাস কোন ভাষায় বিশদরূপে লিখিত হয় নাই। ইংরাজীতে যাহা আছে তাহাও খুব অল্প। যাহা আছে তাহা বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া ইতিহাসের মত করিয়া লিখিত হয় নাই। সম্যগ্‌রূপে বিজ্ঞানের ইতিহাস জানিবার ইচ্ছা থাকিলেও জানিবার উপায় নাই। পণ্ডিত কাজোরির (Cajori) কৃপায় পদার্থবিদ্যার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে সমর্থ হই। কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দীতে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণের কার্য্যাবলী এবং তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাসের অভাব কতকপরিমাণে দূর করিতে সমর্থ হইবে। বাস্তবিক ইহা বড় দুঃখের কথা। এত বড় একটা বিজ্ঞান, যাহার বলে সমস্ত জগৎ চালিত হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে কোন ইতিহাস না থাকা বাস্তবিকই সমস্ত জগতের নিন্দার বিষয়।

গ্রীকেরা গণিত, বিজ্ঞান, অধ্যাত্মবিদ্যা, সাহিত্য এবং কলাবিদ্যার প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু পদার্থবিদ্যার বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে সমর্থ হন নাই। ইহার কারণনির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। পাঁজি পুঁথি ঘাঁটিলেও প্রকৃত কারণ ঠিক করা কঠিন। কেন না ভাল কোন ইতিহাস নাই, এবং যাহা কিছু আছে তাহাতেও বড় বিশেষ কিছু নাই। কাজে কাজেই কারণ-নির্দ্দেশের পথ প্রায় একেবারেই রুদ্ধ। তবে এইটুকু বলা যায়, যে, তাঁহারা মনে মনে অনেক জিনিষের তোলাপাড়া করিতেন। নানাপ্রকারে কল্পনা করিতেন, হয়ত সেই সকল কল্পনা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইলে অনেক উপকার হইত, কিন্তু তাঁহারা সে পথে যান নাই। তাঁহারা কল্পনাগুলির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করিতেন না। সবই যেন খেয়ালের উপর চলিত। যাহা ভাবিতেন তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিতেন। কোন প্রমাণ বা বিচারের ধার ধারিতেন না। একটি ঘটনা বলিলে বেশ বুঝা যাইবে। এক সময়ে এরিষ্টটল (Aristotle) ঠিক করিলেন যে, পৃথিবী একটি সম্পূর্ণ বস্তু, অর্থাৎ ইহার কোন কিছুর অভাব নাই। ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে কারণটি ভুল,

ভ্রান্তি এবং অনেকটা পাগলামীতে পূর্ণ, এবং তিনি যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা শুনিলে না হাসিয়া থাকা যায় না। তিনি বলেন "পৃথিবী অতি কঠিন পদার্থে গঠিত।" কঠিন পদার্থের তিনটি পরিসর আছে। তিন একটি পূর্ণ সংখ্যা। কাজে কাজেই পৃথিবী একটি পূর্ণ বস্তু। এইরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা বিজ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অন্ধগবেষণার ফলেই বুঝি চিরদিনের তরে বিজ্ঞান গ্রীস হইতে লুপ্ত হইয়াছে।' অবজ্ঞা কি অজ্ঞতা তাহা বুঝা বড়ই কঠিন।

মধ্যযুগ এবং Renaissance এর সময় এরিষ্টটলের খুব প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তখন তিনি বিজ্ঞানের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বলিয়া আদৃত হইতেন। তিনি একসময় পতনশীল দ্রব্যের গতি নিরূপণ করিয়া তাহাদের ওজনের তারতম্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি বলেন "যে দ্রব্য যত বেশী জোরে পড়ে তাহার ভার তত অধিক।" এই মত বৈজ্ঞানিক জগতে হুলস্থুল ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছিল। সকলে এইটি স্থির বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এরিষ্টটলের মত ধীর ব্যক্তি যদি একটুকু চিন্তাশক্তির চালনা করিতেন, তাহা হইলে এরূপ ভুল বোধ হয় জগতে শিক্ষা দিতে সাহসী হইতেন না। তিনি যদি Athens বিদ্যালয়ে বেড়াইতে বেড়াইতে দুইটি দ্রব্য এক সঙ্গে ফেলিয়া দিতেন, তবে দেখিতেন যে, দুই দ্রব্য প্রায় এক সময়ে একস্থানে পড়ে। দশ গুণ ভারীদ্রব্য দশগুণ সময় আগে পড়ে না। এ ভারটা পড়িয়াছিল গ্যালিলিওর (Galileo) উপর। সে পরের কথা পরে বলিব। শেষে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী সকল বস্তুকে সমান জোরে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণী শক্তির নাম মাধ্যাকর্ষণ।

খৃষ্ট জন্মের ২৮৭ বৎসর পূর্ব্বে আর্কিমেডিস (Archimedis) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্ভবে বৈজ্ঞানিক জগতে এক মহাসুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। পদার্থবিদ্যা ইঁহার সময়ে বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার কার্য্যাবলীর সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া পরীক্ষার দ্বারা তন্ন তন্ন রূপে প্রমাণিত করিয়া আমাদিগের নিকট চিরপূজ্য হইয়া গিয়াছেন। যন্ত্রবিদ্যার ইনিই প্রকৃত জন্মদাতা। তাঁহার সময়ে বস্তুভারমধ্য (Centre of Gravity) এবং দণ্ড যন্ত্রের (Lever) আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

ইহার পর হইতেই বিজ্ঞানের পথ উন্মুক্ত হইল। জ্ঞানভাণ্ডারের অতুল ঐশ্বর্য্য সকলের নিকট মধুর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইল। আর্কেমেডিসের দণ্ডযন্ত্রের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি একসময়ে বলিয়াছিলেন, "একটী কীলক এবং দণ্ডযন্ত্র পাইলে আমি পৃথিবী উত্তোলন করিব " অবশ্য এই বাক্যটী পালন করা সহজসাধ্য নহে, তথাপি ইহা হইতে বুঝা যায় কি অসীম বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। Archimedis এর সম্বন্ধে আরও একটী গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। গ্রীসের রাজা হেরন একদিন Archimedis কে ডাকাইয়া একটী স্বর্ণমুকুটে রৌপ্য মিশ্রিত আছে কিনা পরীক্ষা করিতে বলিলেন। Archimedis ত মহা চিন্তায় প'ড়লেন। মনের মধ্যে এ বিষয়ের তোলপাড় করিতে লাগিলেন। একদিন স্নানাগারে পা ডুবাইয়া গা পরিষ্কার করিতেছেন এমন সময় তাঁহার বোধ হইল যে তাঁহার পা যেন হালকা বোধ হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ঠিক ক'রলেন যে, দ্রব্য জলে নিমজ্জিত হইলে তাহার ভারের লাঘব হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থায় নগ্নগাত্রে রাস্তা দিয়া চীৎকার করিতে করিতে দৌড়িলেন। অবশেষে একেবারে রাজার কাছে উপস্থিত। রাজা সব শুনিলেন।

তাহার পর মুকুটের সমান ওজন করিয়া একতাল সোণা এবং এক তাল রূপা লইয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি মুকুট, সোণা এবং রূপা প্রত্যেককে জলে ডুবাইয়াছিলেন। প্রত্যেক দ্রব্য কতখানি জল সরাইয়া দেয় ইহা নির্ণয় করিয়া তিনি মুকুটে সোণা এবং রূপার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, Archimedis প্রত্যেক দ্রব্যকে জলে ডুবাইয়া ওজন করেন। তাহা হইতে প্রত্যেক দ্রব্যের ভারের লাঘবের পরিমাণ ঠিক করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই Archimedis এর নাম দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইল। তিনি ভাসমান বস্তুর সম্বন্ধে নানা নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। যন্ত্রবিদ্যার বিষয়ে গ্রীকেরা ইহার অধিক আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গ্রীকেরা জলমান (Hydrometer) যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা Archimedis এর প্রস্তুত নয় বলিয়া অনেকে সন্দেহ করেন।

এইত গেল যন্ত্রবিদ্যার কথা। এক্ষণে দেখা যাউক আলোকবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহারা কিরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন। এ বিষয়েও তাঁহাদের কিছু কিছু জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য্যের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আয়তন দেখিয়া তাঁহাদের মনে প্রথমে একটা খট্‌কা লাগে। কিছুদিন সূর্য্যের আয়তন লক্ষ্য করার পর তাঁহারা দেখিলেন যে, সূর্য্য যখন আকাশকক্ষে (Horizon) অবস্থান করে, সে সময়ে তাহার আয়তন সূর্য্যের উর্দ্ধে অবস্থানের সময় যে আয়তন পরিলক্ষিত হয় তাহা অপেক্ষা বৃহৎ। তাঁহারা কারণের বড় একটা অনুসন্ধান করিলেন না। যাহা দেখিলেন তাহাই বুঝিয়া গেলেন।

ইহাদের সময় কাঁচপুটক (Convex lens) আবিষ্কৃত হয়। Nineveh তে প্রথমে একটী প্রস্তরের কাঁচপুটক পাওয়া যায়। এই কাঁচপুটক সম্বন্ধে গ্রীস দেশে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। এমন কি তখনকার নাটকেও ইহার উক্তি আছে। গ্রীকদের সময়ই আলোকরশ্মির সরল গতির বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সেকালে সমতল গোলাকার এবং বক্র (Parabolical) আয়নার প্রাদুর্ভাব ছিল। বক্র আয়নার বিষয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে। রোম-বাসীরা Syeracus আক্রমণ করিলে, গ্রীকেরা মহাচিন্তায় পড়িয়া গেলেন। তাঁহারা দুর্ব্বল জাতি। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার রক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। সকলে Archimedis এর কাছে গেলেন Archimedis ইহাদিগকে অভয় দিয়া শত্রুধ্বংসের চিন্তায় ব্যাপৃত হইলেন। তিনি কতকগুলি বক্র আয়নার দ্বারা সূর্য্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া শত্রুদের সমস্ত জাহাজে আগুন ধরাইয়া পুড়াইয়া দিলেন।

এই গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অনেক কারণ বর্ত্তমান আছে। গ্রীকদের সময়ে আলোকতত্ত্বের অনেক সিদ্ধান্ত উদ্ভাবিত হইয়াছিল। বস্তুর গোচরীভূত হওয়ার কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ তাহারা মনে করিত, যে বস্তু দেখা যায়, সেই বস্তু হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুসমূহ ইতঃস্তত: প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই অণুসমূহ যখন চক্ষে আঘাত করে তখনই আমরা বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করি। আবার কাহারও মতে চক্ষু হইতে বহির্গত কোন সূক্ষ্ম বস্তুর এবং দৃষ্ট বস্তু হইতে নিক্ষিপ্ত কোন বস্তুর সংমিলনই এই দৃষ্টি-শক্তির বিকাশ করে। এখন এই মতের পরিবর্ত্তে আর এক প্রকার মতের

আবিষ্কার হইয়াছে। সে বিষয়ের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আলোকবিদ্যার বিষয় আর বেশী কিছু জানা যায় না।

তাড়িৎ এবং চৌম্বকশক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞানের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬৪০ খৃষ্টাব্দে গ্রীসে সাত জন জ্ঞানী মনুষ্য বর্ত্তমান ছিলেন। তন্মধ্যে একজন হঠাৎ একদিন ম্যাম্বার (Amber, কাঁচবৎ নির্ম্মল পদার্থ) ঘর্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, ইহা পাতলা কাগজের টুকরা আকর্ষণ করিতেছে। এই আকর্ষণশক্তির মূলীভূত কারণই তাড়িৎ শক্তি। এই ম্যাম্বর সে কালে সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হইত। ইহা দেখিতে বেশ উজ্জ্বল। সোনা রূপার মত ঝক্ ঝক্ করে বলিয়া ইহাকে ইলেক্ট্রণ (Electron) বলা হইত। এই নাম হইতেই ইলেক্ট্রিসিটী (Electricity) নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

তাড়িৎ শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই চৌম্বক শক্তির আবিষ্কার হয়। ইহার আবিষ্কার সম্বন্ধে নানা দেশে নানা প্রকার গল্প প্রচলিত আছে। একদা ম্যাগ্নেস নামক এক মেষপালক ইদা (Ida) পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছিল, সেই সময়ে সে অনুভব করিল যে, কিসে যেন তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। সে পায়ের নীচে মাটী খুঁড়িতে লাগিল। পরিশেষে দেখিল যে, একটী প্রস্তর সেইখানে নিহিত আছে। এই প্রস্তরই চুম্বক প্রস্তর। ম্যাগ্নেসের পাদুকা ও ছড়িতে লৌহ থাকার জন্যই এই আকর্ষণী শক্তি অনুভূত হইয়াছিল। গ্রীকদের সময়ে চুম্বক আবিষ্কৃত হয় বটে, তবে তাহারা ইহাকে কোন কাজে লাগাইতে সমর্থ হয় নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়।

প্রতিভা।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঈশানীমন্দিরে।

—:০:—

মা জগদম্বা দীনতারিণি! লোকে তোমায় আশাপূর্ণা বলিয়া ডাকে। কৈলাসী মা! কই আমার আশা ত পূর্ণ হইল না? আমাকে এ দুঃখসাগরে কেন ভাসাইলে? দয়াময়ি! তোমার কি এমনি ধারা? মা! লোকে কত আশায় তোমায় ভক্তি করে, পূজা করে, আরতি করে, তোমাকে আপন আপন গৃহে প্রতিষ্ঠা করে, কেন! আমি কি তাহাই পারি না বলিয়া আমার উপর কুপিত হইয়াছ? মা গো! তোমার নাম দুর্গতিনাশিনী, তুমি এ নামের সার্থকতা কই দেখাইলে না? মা গো! তুমি মহাধনী ব্রাহ্মণের মণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়াও, নীচাবংশোদ্ভব শূদ্র যদি তোমায় কায়মনে ডাকে তাহা হইলে তুমি তথায় ছুটিয়া যাও, কেন? মা! যে ভক্ত সে তোমায় পাইয়াছে। আমি কি কায়মনে তোমায় ডাকি না, আমি কি ভক্তিসহকারে বিল্বপত্র পুষ্পদল তোমায় দিই না, আমার ডাক কি তোমার চরণে পৌঁছায় না? মা! তবে কেন আমার পানে ফিরিয়া চাহ না?

মা! আমাকে জীবনের শেষকালটা কি দুঃখে ভাসাইলে? যদি দুঃখই আমার জীবনের সহচর, তবে কেন আমাকে এক সময়ে হাসাইয়াছিলে? মা! এক সময়ে সব দিয়াছিলে, আবার কোন্ অপরাধে তাহা কাড়িয়া লইলে? তোমারই কৃপাকটাক্ষে কত লোককেই খাওয়াইয়াছি, কত অনাথ অনাথাকে অন্নদান করিয়াছি, কত অর্থ দেবসেবায় ব্যয় করিয়াছি, কত ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিয়াছি, কত আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিপালন করিয়াছি। মা গো! সে সকল কেবল তোমারই দয়ায় করিয়াছি। দয়াময়ি! সে

সকল দয়া এখন কোথায় লুকাইলে? কি পাপে আমাকে এ দারুণ বিপদ-সাগরে ভাসাইলে?

মা! আমার নিজের জন্য ভাবিনা। আমার কেবল ভাবনা সেই মেয়েটার উপর। যদি তোমার পূর্ব্ব হইতে এই সঙ্কল্প ছিল, তবে এ রত্ন কেন আমায় দিয়াছিলে? চামুণ্ডারূপিণি! তোমারই প্রসাদে এই হস্তে কত লোককে খাওয়াইয়াছি। আজ মা আমি দুহিতাসহ এক মুষ্টি অন্নের কাঙ্গালিনী! মা! আজ খাইয়া কাল কি খাইব সে ভাবনা কবে দূর হইবে? পাষাণি! আর কত কাল আমাকে এ বিপদে ডুবাইয়া রাখিবে?

দুর্গতিনাশিনি! আমার পাপ কি কাটিবে না? আর কত কাল আমাকে সংসারের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে? মা! আর যে পারি না। বুকে আর কত সয় মা? অন্তর্যামিনি! তুমি ত সকলই বুঝিতেছ, দেখিতেছ, তবুও আমার প্রতি করুণা হইতেছে না?

মা গো! তুমি মা হইয়া সন্তানের দুঃখ বুঝিতেছ না? তুমি যদি আমার ব্যথায় ব্যথিত না হইবে, তবে কে হইবে মা! যখন সেই অপগণ্ড শিশুটা ক্ষুধায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে খাবারের জন্য কাঁদিয়া আসে, তখন কি ভাবে তাহাকে ভুলাইয়া রাখি জানত মা? আর কত কাল তাহাকে ভুলাইয়া রাখিব? তাহার ত এখন ক্রমে বুদ্ধি হইতেছে, ক্রমে বয়স বাড়িতেছে। আদরে লালিতপালিতা কন্যার এত দুঃখ আর যে চক্ষে দেখা যায় না। অনাহারের কষ্ট বড় কষ্ট, তাহা ত তুমি জান? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপালিনি! এই কি তোমার বিশ্বপালন? এই কি তোমার অনাথ ও অনাথার আহার্য্য দান! মা! তোমার নাম না বিপদবারিণী? ধন্য তোমার খেলা, ধন্য তোমার মায়া!

তারিণি! আর যে সহে না। আর যে আশাপথে চাহিতে পারি না। পাষাণি! তোমার হৃদয় কি এতই পাষাণে গঠিত? মায়ের প্রাণ কি এতই নির্ম্মম! যদি তোমার প্রাণ এরূপ পাষাণে নির্ম্মিত, তবে লোকে তোমায় দয়াময়ী বলিয়া থাকে কেন? মা! এখন আমি কোন্ পথে যাই? মরিব না থাকিব? মা! এত দিনে মরিতাম, কিন্তু ঐ অপগণ্ড শিশুটার মায়ায় তাহাকে ছাড়িতে পারি নাই। অপমান, লজ্জাত্যাগ, দাসীবৃত্তি, লোকনিন্দা,

খণ প্রভৃতি সকলই সহিয়াছি ; কেবল ঐ শিশুর জন্য। এখন তোমার চরণে স্থান পাইলে আমার জীবন সার্থক হইবে। তবে মা! এই নিবেদন করি যে, আমার অন্তিমে শিশুটার একটা উপায় করিও।

অতি প্রত্যুষে একজন বিধবা সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া, মায়ের মন্দিরে, মায়ের সম্মুখে নতজানু এবং গলবস্ত্র সংলগ্ন হইয়া যোড়করে এইরূপ খেদোক্তি করিয়া মায়ের চরণে কাঁদিতেছিল। বিধবার বয়স অনুমান ৩০।৩৫ হইবে। বিধবার এক সময়ে রূপ ছিল, কিন্তু সংসারের নানা প্রকার ঘাতপ্রতিঘাতে সে রূপ লুকাইয়াছে ; চক্ষুতে জ্যোতি ছিল, কিন্তু এখন আভা-হীন, নিষ্প্রভ ; নিতম্বলম্বিত কেশগুচ্ছ তৈল অভাবে রুক্ষ ; সুচারুবদন নানা-দুশ্চিন্তায়, অনাহারে, শোকে শুষ্ক ; সুকোমল অঙ্গযষ্টি বৈধব্যের দারুণ যন্ত্রণায় এবং সংসারের তাড়নায় কাষ্ঠতুল্য বিল্বপত্রে এবং পুষ্পে বিধবার অঞ্জলি পূরিত। কন্যাকে নিদ্রিতা রাখিয়া বিধবা মায়ের মন্দিরে পূজা করিতে আসিয়াছে। গ্রামের লোকে এখনও কেহ উঠে নাই, কৃষকেরা কেহই মাঠে আইসে নাই, শিবাগণ এখনও গহ্বর আশ্রয় করে নাই. দিননাথ উঠিতে এখন অনেক বিলম্ব আছে। নীলাকাশপটে তারকামণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া শশধর পশ্চিমগগনে ধীরে ধীরে বিলীন হইতেছিলেন। পুষ্পপত্র সকল নীহারহারে আবৃত রহিয়াছিল। দূর্ব্বাদলশয্যায় শিশির বিন্দু বিন্দু হইয়া জ্বলিতেছিল। উপরে, গাছের শাখায়, পাতায় খদ্যোতকুল জ্বলিতেছিল, নিভিতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কি খাব ?

যশোহর জেলার অন্তর্গত অবন্তীপুর একখানি প্রাচীন গ্রাম। এখন আর গ্রামের পূর্ব্বের ন্যায় শ্রী ছাঁদ নাই। আগে যেখানে যেখানে এক

একটা "পাড়া" ছিল, এখন সেখানে এক একটী ক্ষুদ্র পল্লী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবন্তীপুর পূর্ব্বে একটা বড় গ্রাম ছিল। কিন্তু কালের কুটিলগতিতে গ্রামের কীর্ত্তি সকল লোপ পাইয়াছে। মহামারী তাহার প্রধান মূল। এখন অবন্তীপুরে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "পাড়ার" এক একটী নূতন নাম দিয়াছেন। এখন অবন্তীপুরের নাম অন্যরূপ হইয়াছে। আসল নাম ধরিয়া এখন কেহই আর ডাকে না। বলাবাহুল্য পূর্ব্বের মহামারী প্রকোপের পর হইতে অবন্তীপুরের লোকসংখ্যার অনেক হ্রাস পাইয়াছে। যাহাই হউক অবন্তীপুরের নাম পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলেও, আমরা ঐ নামে এই পুস্তকের আখ্যায়িকা বর্ণন করিব।

অবন্তীপুরে একটী প্রকাণ্ড দ্বিতল বাটী আছে। আজকাল যশোহর জিলায় এই ধরণের বড়বাটী অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। বাড়ীর অবস্থা এখন বড়ই হীন, সৌন্দর্য্য লোপ পাইয়াছে, বাটী প্রায় ভগ্নাবশেষ। উঠানে জঙ্গল হইয়াছে, প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, গৃহ ভাঙ্গিয়াছে। যাহা দুই দশটা গৃহ এখনও দাঁড়াইয়া আছে তাহাদেরও জীর্ণ অবস্থা। গৃহের কড়ি বরগা উঁয়ে খাইয়াছে, জানালা দরজা প্রভৃতি আড়াইয়া গিয়াছে; বালি চূণ খসিয়া পড়িয়াছে, ইন্দুর আরসোলায় বাসা করিয়াছে, ঝুল কালিতে গৃহ পরিপূরিত হইয়াছে। কোন্ দিক্ ছাড়িয়া কোন্ দিকের কথা বলিব? বাড়ীর সর্ব্বত্রই প্রায় এইরূপ দশা। চারিদিকে কেবল ইটের স্তূপ। পূজার দালানের আর পূর্ব্বের ন্যায় শ্রী নাই। ছাদ খসিয়া পড়িয়াছে, ইট, কড়ি ও বরগা মেজের উপরে ঢিবি হইয়াছে; স্থানে স্থানে পারাবতে বাসা করিয়াছে, কারনিসের চূণ বালি খসিয়াছে, দেওয়ালের মাথায় বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতির গাছ হইয়াছে, প্রাচীরের গায় শৈবাল ধরিয়াছে। তোষাখানা খাজাঞ্চীখানা, নাটমন্দির, নহবৎখানা, দেউড়ি, বৈঠকখানা প্রভৃতির সকলেরই অল্পবিস্তর এইরূপ দশা হইয়াছে। খিড়কীতে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, তাহারও চাতাল ভাঙ্গিয়াছে, ঘাটের রানা খসিয়াছে, পইটার উপর শৈবাল জন্মিয়াছে, পুকুরে পঙ্ক হইয়াছে, মাছ লোকে ধরিয়া খাইয়াছে, জলে পানা জন্মিয়াছে। যেদিকে চাহিবে সেইদিকে পতনের অবস্থা দেখিবে। এবাড়ীর লক্ষ্মী ছাড়িয়াছে। চঞ্চলা লক্ষ্মীকে ইহারা বুঝি বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।

এই ধ্বংসাবশেষ অট্টালিকার ত্রিতলের এক ভগ্নকক্ষে একটী ৭।৮ বৎসরের কন্যা তাহার মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মা কি খাব" ?

গৃহে একজন বিধবা ছিলেন তিনিই কন্যার মাতা। মাতা কন্যার কথা শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

কন্যা পুনরায় বিধবাকে লক্ষ্য করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, কি খাব" ?

বিধবা এবারে আর কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া নীরবে চক্ষের জল মুছিলেন। কন্যা তাহা জানিতে পারিল না। তাহার পর মাতা কহিলেন, "কি আর খাবি—ঘরে খই আছে তাহাই দিব ?"

বালিকা বলিল, "না, খই খাব না, শুধু খই কি খাওয়া যায় ?"

মাতা কহিলেন, "আর কি পাব যে তোকে দিব।"

বালিকা পুনরায় বলিল, "কেন গুড় দিয়ে খাব ?"

বিধবা বলিলেন, "গুড় কি আর আছে মা, যে গুড় দিয়ে খই খাবি ?"

বালিকা আবার কাঁদিল। মাতাও চক্ষের জল ফেলিলেন। বালিকা ভাবিল যে, সে নিজে কাঁদিতেছে বলিয়া তাহার মাতাও কাঁদিতেছেন। বালিকা চোখ মুছিয়া বলিল "মা তবে শুধুই খই দাও" ?

বিধবার চক্ষে জল তবুও ঝরিতেছিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তোর কপালেও এত দুঃখ ছিল। আহা, বাছা আমার দুটো পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। জন্মিয়া পর্য্যন্ত বাছা কষ্টের মুখ দেখিতেছে। যাহাই হউক কষ্টে সৃষ্টে যদি কোন রকমে উহাকে মানুষ করিতে পারি, তখন যে আর এক দায় সম্মুখে। উহার বিবাহের কি করিব ? টেনেটুনে আর বছর তিনেক রাখা যাইতে পারে! তাহার পর কি উপায় ? ভগবান্ তুমিই ভরসা।"

বিধবা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, উঠিয়া গিয়া একটা মাটির ভাণ্ড হইতে মুঠা কয়েক খই কন্যার কাপড়ে দিলেন। তাহার পর ভাণ্ডে হাত দিয়া বলিলেন "হারে খই যে আর অল্প দুটী আছে" ?

বালিকা খই খাইতে খাইতে কহিল, "কালকে ঐ গুলো খাব।"

মাতা বলিল, "কাল যেন খাইলি, তাহার পরদিন কি করিবি ?"

বালিকা বলিল, "আবার খই আনিলে তাহাই খাইব ?

মাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রোজ রোজ খই কোথায় পাব ?

বালিকা বলিল, "কেন তুমি আনিবে" ?

মাতা কহিলেন, "খই আমি কোথায় পাব ?"

বালিকা কহিলেন, "ওপাড়ার পিসামা দিবে"।

মাতা কহিলেন, "পরে কি আর রোজ রোজ জিনিষ দেয় — চাইতেও যে লজ্জা করে"।

শ্রীনিরঞ্জন সান্যাল।

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম হইল কেন ?

কষিতকাঞ্চনকায় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আমাদের নিকট নানা নামে পরিচিত। তাঁহার প্রকৃত নাম বিশ্বম্ভর, কিন্তু সে নামে অনেকেই তাঁহাকে চিনেন না। তাঁহার নিমাই নামটি অনেকে জানিলেও গৌর নামটিকেই সকলে ভালবাসিয়া থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার চৈতন্য নামটিই সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু চৈতন্যের সহিত আর একটি শব্দ যুক্ত আছে, তাহা সকলে জানেন কিনা সন্দেহ। তবে যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের সমস্ত পরিচয় অবগত আছেন, তাঁহারা সেটিও বিশেষ করিয়া জানেন। সে শব্দটি শ্রীকৃষ্ণ। গৌরাঙ্গের এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামটি কেন হইল, আমরা এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব।

বিশ্বম্ভরের গৌর, নিমাই প্রভৃতি নাম বাল্যকৈশোরাদি জীবনের সহিতই

ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু গৌরাঙ্গসুন্দর যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই সময়ে তিনি স্বীয় গুরুর নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রধানতঃ দুই জনকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ঈশ্বর পুরীর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন, পরে কেশব ভারতীকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আখ্যা প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর পুরীর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণসম্বন্ধে চৈতন্য ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে।—

"আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরীর স্থানে।
মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে॥
পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥
তবে তাঁর স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ।"

আদি খণ্ড।

কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণকালে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামপ্রাপ্তিসম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, আমরা নিম্নে তাহারও উল্লেখ করিতেছি।—

"প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশবভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি॥
চতুর্দ্দিকে হরিনাম সুমঙ্গলধ্বনি।
সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি॥
পরিলেন অরুণ বসন মনোহর।
তাহাতে হইলা কোটি কন্দর্প সুন্দর॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত।
মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত॥

দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল।
নিরবধি নিজ প্রেম আনন্দে বিহ্বল॥
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শোভে শ্রীবদন।
প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল নয়ন॥
কিবা সে সন্ন্যাসীরূপ হইল প্রকাশ।
পূর্ণ করি তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস॥
সহস্র নামেতে যে কহিল বেদব্যাস।
কোন অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস॥
এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ।
এ অর্থ জানেন সব বৈষ্ণবসমাজ॥

তথাহি সহস্রনাম স্তোত্রে।

সন্ন্যাসকৃতসমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

তবে নাম থুইবারে কেশবভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব॥
অতএব কোথাও না থাকে যেই নাম
হেন নাম থুইলে মোর পূর্ণ হয় কাম॥
দশ ভারতীর শিষ্য ভারতী সে হয়।
ইহার সে নাম থুইবারে যোগ্য নয়॥
ভাগ্যবান্ ন্যাসীবর এতেক চিন্তিতে।
শুদ্ধা সরস্বতী তান আইলা জিহ্বাতে॥
পাইয়া উচিত নাম কেশবভারতী।
প্রভুবক্ষে হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধমতি॥
যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইলা।
করাইলা চৈতন্য কীর্ত্তন প্রকাশিলা॥
এতেক তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্বলোক তোমা হইতে হইলেন ধন্য॥

এত যদি ন্যাসীবর বলিলা বচন।
জয়ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হইল তখন॥
চতুর্দ্দিগে মহাহরিধ্বনি কোলাহল।
করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব সকল॥
ভারতীরে সর্ব্বভক্ত করেন প্রণাম।
প্রভুও হইলা তুষ্ট লভি নিজ নাম॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম হইল প্রকাশ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সর্ব্বদাস॥
হেন মতে সন্ন্যাস করিলা প্রভু ধন্য।
প্রকাশিল আত্মনাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥"

মধ্যখণ্ড।

চৈতন্য ভাগবত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, জগতের মুখ হইতে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাইবার জন্য এবং তাহার চৈতন্যবিধান ও কীর্ত্তন প্রকাশের জন্য কেশব ভারতী মনে মনে চিন্তা করিয়া গৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম রাখিয়াছিলেন। অবশ্য সন্ন্যাসগ্রহণকালে পূর্ব্ব নাম ও উপাধি পরিত্যাগ করিয়া যে নূতন নাম ও উপাধি গ্রহণ করিতে হয় তাহা চির-প্রসিদ্ধ। কিন্তু চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস গৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামকরণের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত কিনা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণনামপ্রচার ও জগতের চৈতন্য-বিধান ও কীর্ত্তন প্রকাশ সত্য হইলেও তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের সময় কেশব ভারতী যে তাঁহার নামকরণের উক্ত হেতু প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা সুকঠিন। কারণ উপাসনা, দীক্ষা ও সংস্কারাদির কতকগুলি কার্য্য গোপনে রাখিতে হয়। তন্মধ্যে সন্ন্যাসাবস্থার নামকরণাদির কারণও বটে। সুতরাং তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশযোগ্য নহে, এমনকি গুরুও শিষ্যকে তাহার কারণ বলিয়া দেন না। তবে শিষ্যের নিকট তিনি প্রকাশ করিলেও করিতে পারেন। চৈতন্যভাগবতকারের মতে কেশব ভারতী যদি গৌরাঙ্গের নিকট তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামকরণের হেতু উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা সাধারণে জানিবার কোন কারণ দেখা যায় না। সুতরাং চৈতন্য-

ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ তাঁহার নিজকৃত অথবা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবসমাজের কৃত। চৈতন্য-দেবের তিরোধানের পর চৈতন্যভাগবত রচিত হয়, সুতরাং কেশব ভারতী ও চৈতন্যের কথোপকথন যে বৃন্দাবনদাসের শোনা কথা ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্যভাগবতকারের মতে কেশব ভারতী একটি নূতন নাম আবিষ্কার করিয়া গৌরাঙ্গকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। কারণ তিনি পূর্ব্ব প্রথার লোপ করিয়া যে নূতন কিছু করিয়াছিলেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, এবং তিনি যে তাহা করেন নাই, আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে যখন বৈদিক ধর্ম্মের অস্তিত্বলোপের সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠে, সেই সময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া আবার সেই সনাতন ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনিই বর্ত্তমান সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। যদিও এক্ষণে কোন কোন সম্প্রদায় সন্ন্যাসীসম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করিতেছে, তথাপি সন্ন্যাসীসম্প্রদায় যে সকলেরই মূল ইহা অস্বীকার করা যায় না। যাঁহারা বৈদিক সন্ন্যাসের পক্ষপাতী, তাঁহারা যে সন্ন্যাসীসম্প্রদায়কে গুরু বলিয়া স্বীকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণের ইচ্ছা হওয়ায়, তিনি সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ভুক্ত কেশব ভারতীকে গুরুরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার গুরু হওয়ায়, তিনি যে তাঁহাদের প্রথার অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, এবং শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাই করায়, তিনি গুরুকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণ শব্দটি নাম ও চৈতন্য শব্দটি উপাধি। যেমন তাঁহার গুরু কেশব ভারতীর কেশব শব্দটি নাম ও ভারতী উপাধি ছিল। তাঁহার পূর্ব্বগুরু ঈশ্বর পুরীরও ঐরূপ ঈশ্বর শব্দটি নাম ও পুরী শব্দটি উপাধি। আমরা নিম্নে ইহা বিশদভাবেই আলোচনা করিতেছি।

সনাতন বৈদিক ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভারতের চারিটি পুণ্যক্ষেত্রে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়া চারি দেবদেবীকে অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠাত্রীরূপে এবং আপনার চারিটি প্রধান শিষ্যকে মঠচতুষ্টয়ের আচার্য্য-

পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তন্মধ্যে দ্বারকায় শারদামঠ ও বিশ্বরূপ আচার্য্য, পুরুষোত্তমে গোবর্দ্ধনমঠ ও পদ্মপাদ আচার্য্য, বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্ম্মঠ ও তোটক আচার্য্য ও রামেশ্বরক্ষেত্রে শৃঙ্গেরীমঠ ও পৃথ্বীধর আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। মঠ হইতে যাঁহারা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতেন, তাঁহারাই দশনামা সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজক নামে খ্যাত, এবং যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন তাঁহারাও চারি নামে প্রসিদ্ধ। এই দশনামা পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারী চতুষ্টয়ের মধ্যে কাঁহারা কোন্ মঠের অন্তর্গত আমরা নিম্নে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। এই চারি মঠের পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারিগণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়াও কথিত হইতেন। নিম্নে তাহারও উল্লেখ করা যাইতেছে

প্রথমঃ পশ্চিমাম্নায়ঃ শারদামঠ উচ্যতে।
কীটবারঃ সম্প্রদায় স্তস্য তীর্থাশ্রমৌ শুভৌ॥
দ্বারকাখ্যং হি ক্ষেত্রং স্যাৎ দেবঃ সিদ্ধেশ্বরঃ স্মৃতঃ।
ভদ্রকালীতি দেবী স্যাদাচার্য্যো বিশ্বরূপকঃ॥
গোমতীতীর্থমমলং ব্রহ্মচারী স্বরূপকঃ।
সামবেদস্য বক্তা চ তত্র ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥
জীবাত্মপরমাত্মৈক্যং বোধো যত্র ভবিষ্যতি।
তত্ত্বমসি মহাবাক্যং গোত্রোঽবিগত উচ্যতে॥
সিন্ধুসৌবীরসৌরাষ্ট্রমহারাষ্ট্রস্তথান্তরাঃ।
দেশাঃ পশ্চিমদিক্স্থা যে শারদামঠভাগিনঃ॥
পূর্ব্বাম্নায়ো দ্বিতীয়ঃ স্যাদ্গোবর্দ্ধনমঠঃ স্মৃতঃ।
ভোগবারঃ সম্প্রদায়ো বনারণ্যে পদে স্মৃতে॥
পুরুষোত্তমন্তু ক্ষেত্রং স্যাজ্জগন্নাথোঽস্য দেবতা।
বিমলাখ্যাহি দেবী স্যাদাচার্য্যঃ পদ্মপাদকঃ॥
তীর্থং মহোদধিঃ প্রোক্তং বহ্মচারী প্রকাশকঃ।
মহাবাক্যঞ্চ তত্র স্যাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মচোচ্যতে॥
ঋগ্বেদপঠনঞ্চৈব কশ্যপগোত্রমুচ্যতে।
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাশ্চ মগধোৎকলবর্ব্বরাঃ॥
গোবর্দ্ধনমঠাধীনাঃ দেশাঃ প্রাচীব্যবস্থিতাঃ॥

তৃতীয়স্তূত্তরাম্নায়ো জ্যোতির্ণাম মঠোভবেৎ।
শ্রীমঠশ্চেতি বা তস্য নামান্তরমুদীরিতম্॥
আনন্দবারো বিজ্ঞেয়ঃ সম্প্রদায়োঽস্য সিদ্ধিদঃ।
পদানি তস্য খ্যাতানি গিরিপর্ব্বতসাগরাঃ॥
বদরীশাশ্রমঃ ক্ষেত্রং দেবোনারায়ণঃ স্মৃতঃ।
পূর্ণাগিরী চ দেবীস্যাদাচার্য্য স্তোটকঃ স্মৃতঃ॥
তীর্থকালকনন্দাখ্যং হ্যানন্দো ব্রহ্মচার্য্যভূৎ।
অয়মাত্মা ব্রহ্মচেতি মহাবাক্যমুদাহৃতম্॥
অথর্ব্ববেদবক্তাচ ভৃধাখ্যং-গোত্রমুচ্যতে।
কুরুকাশ্মীরকাম্বোজপাঞ্চালাদিবিভাগতঃ।
জ্যোতির্মঠবশা দেশা হ্যুদীচীদিগবস্থিতাঃ॥
চতুর্থো দক্ষিণাম্নায়ঃ শৃঙ্গেরীতু মঠোভবেৎ।
সম্প্রদায়ো ভূরিবারো ভূভবগোত্রমুচ্যতে॥
পদানি ত্রীণি খ্যাতানি সরস্বতীভারতীপুরী।
রামেশ্বরাহ্বয়ং ক্ষেত্র মাদিবারাহদেবতা॥
কামাক্ষী তস্য দেবী স্যাৎ সর্ব্বকামফলপ্রদা।
পৃথ্বীধরাখ্য আচার্য্য শুক্লভদ্রেতি তীর্থকম্॥
চৈতন্যাখ্যো ব্রহ্মচারী যজুর্ব্বেদস্য পাঠকঃ।
অহং ব্রহ্মাস্মি তত্রৈব মহাবাক্যং সমীরিতম্॥
আন্ধ্রদ্রাবিড়কর্ণাটকেরলাদিপ্রভেদতঃ
শৃঙ্গের্য্যধীনা দেশাস্তে হ্যবাচী দিগবস্থিতাঃ॥"

শঙ্করাচার্য্যকৃত মঠাম্নায়।

উদ্ধৃত অংশ হইতে সকলে বুঝিতে পারিতেছেন যে, শারদা মঠে কীট-বার সম্প্রদায় তীর্থ ও আশ্রম পরিব্রাজক ও স্বরূপ ব্রহ্মচারী, গোবর্দ্ধন মঠে ভোগবার সম্প্রদায় বন ও অরণ্য পরিব্রাজক প্রকাশ ব্রহ্মচারী, জ্যোতির্মঠে আনন্দবার সম্প্রদায়, গিরি, পর্ব্বত, সাগর পরিব্রাজক ও আনন্দ ব্রহ্মচারী এবং শৃঙ্গেরীমঠে ভূরিবার সম্প্রদায়, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী পরিব্রাজক ও চৈতন্য ব্রহ্মচারী এইরূপ নামকরণ করা হয়। পরিব্রাজকগণ দেশে দেশে

ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, এবং ব্রহ্মচারিগণ বেদপাঠে নিরত থাকিয়া পরিব্রাজকপদলাভের জন্য শিক্ষিত হইতে থাকিতেন। বৈদিক নিয়মও তাহাই। কালক্রমে তাহার যে কিছু কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছিল, ইহাও বুঝিতে পারা যায়। প্রথমে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে হইলে তাঁহাকে কিছুকাল ব্রহ্মচারী হইয়া থাকাই নিয়ম, পরে তিনি পরিব্রাজক হইতে পারেন। শৃঙ্গেরীমঠভুক্ত কেশব ভারতী পরিব্রাজকরূপে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে অন্ধ্র, দ্রাবিড়, কর্ণাট, কেরল প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের দেশগুলিতেই তাঁহার প্রচারকার্য্যে রত থাকাই কর্ত্তব্য ছিল, এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, উৎকল ও বর্ব্বরাদি দেশ গোবর্দ্ধনমঠের অধীন থাকাই কর্ত্তব্য। কিন্তু এ নিয়ম সুচারুরূপে রক্ষিত হয় নাই। বিশেষতঃ সে সময়ে গোবর্দ্ধন মঠের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহাও বিশেষরূপে জানা যায় না। সে যাহা হউক, কেশব ভারতী যে শৃঙ্গেরীমঠভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ করিলেও যাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন, তিনিও যে শৃঙ্গেরীমঠভুক্ত হইতেন তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ কেশব ভারতীর শিষ্য হওয়ায় যে শৃঙ্গেরী মঠভুক্ত হইয়াছিলেন তাহাও সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। চৈতন্যভাগবতকার সত্যই লিখিয়াছেন।—

"মূলে ভারতীর শিষ্য ভারতী সে হয়।
ইহার সে নাম থুইবারে যোগ্য নয়॥"

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গৌরাঙ্গ শৃঙ্গেরীমঠভুক্ত হইয়াছিলেন, তবে তিনি ভারতী না হইয়া চৈতন্য হইলেন কেন তাহাই এক্ষণে আলোচ্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শৃঙ্গেরীমঠের ব্রহ্মচারীর নাম চৈতন্য এবং সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ভুক্ত হইতে হইলে প্রথমে কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয়, কেশব ভারতী শ্রীগৌরাঙ্গকে দীক্ষিত করিয়া ব্রহ্মচারীই করিয়াছিলেন, এবং শৃঙ্গেরীমঠের চৈতন্য উপাধি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। কোন দেবতার বা সাধুপুরুষের অথবা কোন সুনাম প্রদান প্রয়োজন মনে করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ নাম প্রদান করেন। তাঁহার নিজ নামও কেশব

ছিল। তবে গৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ, কৃষ্ণনামপ্রচারের জন্য তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ নামকরণ ভারতীর অভিপ্রেত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু চৈতন্য উপাধি তিনি যে মঠপ্রথানুসারে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি সন্ন্যাসী না হইবেন কেন? অবশ্য প্রব্রজ্যাশ্রমে দণ্ডকমণ্ডলু গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেও তাহার বিধি আছে

"ব্রাহ্মণো বৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।
পৈলবৌদুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ॥
মেখলামজিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুম্।
অপ্সু প্রাস্য বিনষ্টানি গৃহ্ণীতান্যানি মন্ত্রবৎ॥"

ইত্যাদি মনূক্তি ব্রহ্মচারীর পক্ষেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৈদিক নিয়মানুসারে উপনয়নসংস্কারের পর দ্বিজগণ আয়ুর প্রথম চতুর্থভাগ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতেন। পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া কৃতদার ও সন্তানের জনক হইয়া দ্বিতীয় ভাগ যাপন করা হইত। তাহার পর বনে গমন ও বানপ্রস্থ অবলম্বনে তৃতীয়ভাগ অতিবাহিত করিতেন। অবশেষে আয়ুর চতুর্থভাগ সন্ন্যাস বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে যাপিত হইত।

"চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ॥
বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ॥"

মনু।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদপাঠ, গৃহস্থাশ্রমে সন্তানোৎপাদন, বানপ্রস্থাশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান, সন্ন্যাসাশ্রমে মোক্ষসাধনের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট ছিল। বেদপাঠকে ঋষিঋণপরিশোধ, সন্তানোৎপাদনকে পিতৃঋণপরিশোধ, যজ্ঞানুষ্ঠানকে দেবঋণপরিশোধ বলা হইত। উপরোক্ত তিন ঋণ পরিশোধ না করিয়া মোক্ষসাধনে রত হইলে তিনি নরকগামী হইতেন বলিয়া শাস্ত্রকারেরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন।

"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥
অনধীত্য দ্বিজো বেদানমুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ ॥"

মনু।

তবে যাঁহারা আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা অন্যান্য আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া মোক্ষসাধনে রত হইতে পারেন।

"এবং চরতি যো বিপ্রো ব্রহ্মচর্য্যমবিপ্লুতঃ।
স গচ্ছত্যুত্তমং স্থানং ন চেহ জায়তে পুনঃ ॥"

উক্ত প্রকার ব্রহ্মচারী শাস্ত্রে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হন, তাঁহারা উপকুর্ব্বাণ নামে অভিহিত।

"যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাব্রজেৎ।
উপকুর্ব্বাণকো জ্ঞেয়ো নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ ॥"

কূর্ম্মপুরাণ

এই সমস্ত আলোচনা করিলে বৈদিক নিয়মানুসারে চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ অসম্ভব হইয়া উঠে। বিশেষতঃ তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর মাত্র ছিল। তবে দারগ্রহণের পর তাঁহার ব্রহ্মচারী হওয়াও বিধিসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য বৈদিক নিয়মানুসারে মঠপ্রথার প্রবর্ত্তন করিলেও কালক্রমে যে তাহার অনেক শৈথিল্য হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইজন্য কৃতদার শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা ব্রহ্মচারীরূপে দেখিতে পাইতেছি। তিনি সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজক হইলে সরস্বতী, ভারতী, অথবা পুরী উপাধি গ্রহণ করিতেন। কিন্তু যখন চৈতন্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলিতেই হইবে। তিনি ঈশ্বর পুরী ও কেশব ভারতী উভয়েরই শিষ্য হওয়ায় যে শৃঙ্গেরীমঠভুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা আলোচনা দ্বারা স্থির

হয়। সুতরাং সেই মঠের ব্রহ্মচারীর যখন চৈতন্য উপাধি দেখিতে পাইতেছি, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ যে ব্রহ্মচারীই হইয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বৃন্দাবনদাস চৈতন্য শব্দের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, মঠাম্নায়ে তাহার অন্য প্রকার অর্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে সম্প্রদায়, পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারিগণের নামার্থ প্রদান করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"কীটাদয়ো বিশেষেণ বার্য্যন্তে জীবজন্তবঃ।
ভূতানুকম্পয়া নিত্যং কীটবারঃ স উচ্যতে ॥
ভোগো বিষয় ইত্যুক্তো বার্য্যতে যেন জীবিনাম্।
সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চ ভোগবারঃ স উচ্যতে ॥
আনন্দো হি বিলাসশ্চ বার্য্যতে যেন জীবিনাম্।
সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চানন্দবারঃ স উচ্যতে ॥
ভূরিশব্দেন সৌবর্ণ্যং বার্য্যতে যেন জীবিনাম্।
সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চ ভূরিবারঃ স উচ্যতে ॥
তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বতসাগরাঃ
সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ ॥
ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে ॥
আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ় আশাপাশবিবর্জ্জিতঃ।
যাতায়াতবিনির্ম্মুক্ত এষ আশ্রম উচ্যতে ॥
সুরম্যে নির্ঝরে স্থানে বনে বাসং করোতি যঃ
আশাবন্ধবিনির্ম্মুক্তো বননামা স উচ্যতে ॥
অরণ্যে সংস্থিতো নিত্য মানন্দে নন্দনে বনে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদং বিশ্বমরণ্যঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥
বাসো গিরিবনে নিত্যং গীতাধ্যয়নতৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে।
বসন্ পর্ব্বতমূলেষু প্রৌঢ়ং জ্ঞানং বিভর্ত্তি যঃ।
সারাসারং বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥
তত্ত্বসাগরগম্ভীরো জ্ঞানরত্নপরিগ্রহঃ।

মর্য্যাদাং নৈব লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥
স্বরজ্ঞানরতো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।
সংসারসাগরাসারহন্তাসৌ হি সরস্বতী ॥
বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজন্‌।
দুঃখভারং না জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্ত্যতে ॥
জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনামা স উচ্যতে ॥
স্বং স্বং রূপং বিজানাতি স্বধর্ম্মপরিপালকঃ।
স্বানন্দে ক্রীড়িতো নিত্যং স্বরূপো বটুরুচ্যতে ॥
স্বয়ং জ্যোতি র্বিজানাতি যোগযুক্তিবিশারদঃ।
তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশেন তেন প্রোক্তঃ প্রকাশকঃ ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যো নিত্যং ধ্যায়েত তত্ত্ববিৎ।
স্বানন্দে রমতে চৈব আনন্দঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
চিন্মাত্রং চৈত্যরহিত মনন্তমজরং শিবম্‌।
যো জানাতি স বৈ বিদ্বান্‌ চৈতন্যং তদ্বিধীয়তে ॥”

শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায় চৈতন্যের উক্ত রূপই অর্থ করিয়া থাকেন উপরোক্ত দশনামা সন্ন্যাসীর মধ্যে যাঁহারা আচার্য্য হওয়ার উপযুক্ত মঠান্নায়ে তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে !

“শারদামঠআচার্য্য আশ্রমাখ্যো বহুভবঃ।
গোবর্দ্ধনস্য বিজ্ঞেয়োঽরণ্যনামা বিচক্ষণঃ ॥
জ্যোতির্ম্মঠস্য সততং পর্ব্বতাখ্যো নিগদ্যতে।
শৃঙ্গবেরমঠে নিত্যং ভারতী বহুভাবনঃ ॥”

শৃঙ্গেরী মঠের আচার্য্যপদ গ্রহণে অধিকারী কেশব ভারতীর ন্যায় উপযুক্ত গুরুরই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। নানাপ্রকারে গোলোযোগ ঘটিলেও ভারতী উপাধিধারী পরিব্রাজকগণকে অদ্যাপি অনেক সময়েই শৃঙ্গেরী মঠের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। সম্প্রতি তিরোভূত শৃঙ্গেরী মঠাধীশ সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব নৃসিংহ ভারতী একজন মহাপুরুষ ছিলেন।

জাতীয় জীবন ও জাতীয় মৃত্যু।

সকলেই জানেন সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ নাবিক কাপ্তান স্কট সংপ্রতি দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করিতে গিয়া সেই চিরতুষারময় প্রদেশে প্রাণ হারাইয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে সমগ্র সভ্যজগতের মর্ম্মস্থলে এক সুতীব্র হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। বিলাতের মুখপত্র Times (টাইমস্) পত্র এই উপলক্ষে লিখিয়াছেন :—

"The Antartic Expedition has a value of its own altogether independent of tangible gains, whether material or intellectual. Its real value is moral and spiritual, and therefore in the truest sense national. It is a proof that in an age of depressing materialism men can still be found to face known hardship, heavy risk and even death in pursuit of an idea, and that the unconquerable will can carry them through loyal to the last to the charge they have undertaken. That is the temper of men who build empires, and while it lives among us we shall be capable of maintaining the empire that our fathers builded."

The Times, weekly edition, February 14, 1913.

ইহার তাৎপর্য এই :—কাপ্তান স্কটের দক্ষিণ মেরুযাত্রায় আমাদের লাভ কি? কেহ বলিবেন, নূতনদেশ আবিষ্কার দ্বারা দেশের সাম্রাজ্যবৃদ্ধি; আবার কেহ বলিবেন, নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্যসংগ্রহ দ্বারা জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি, কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটী গুরুতর লাভ আছে। তাহা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লাভ। সুতরাং তাহা যথার্থই আমাদের জাতির পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্। এই দক্ষিণমেরুযাত্রার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বর্ত্তমান সুখবিলাসের দিনেও আমাদের মধ্যে এরূপ লোক আছেন, যাঁহারা কোন একটী উচ্চ

ভাবকে লক্ষ্য করিয়া অসীম ক্লেশ, ঘোর বিপদ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত সহ্য করিতে প্রস্তুত—যাঁহাদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি সমস্ত প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগকে ঈপ্সিত পথে লইয়া যাইতে পারে। যে সকল পুরুষ-সিংহ সাম্রাজ্যস্থাপন করিতে সমর্থ হন, এইরূপ চিত্তবৃত্তি তাঁহাদেরই উপযুক্ত। যতদিন এইরূপ চিত্তবৃত্তি ইংরেজ জাতির মধ্যে থাকিবে, ততদিন আমরা নিশ্চয়ই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইব।

অতি যথার্থ কথা--অতি সুন্দর ভাবে বলা হইয়াছে। ইংরেজের মধ্যে যতদিন এই জাতীয় ভাব প্রবল থাকিবে ততদিন এই জাতি জীবিত থাকিবে। এই জাতীয় ভাবের অভাব হইলে ইংরেজ জাতির মৃত্যু ঘটিবে। তাই ইংরেজ জাতির মুখপত্র টাইমস্ কাপ্তান স্কটের দক্ষিণমেরুযাত্রায় এই জাতীয় জীবনের স্পন্দন অনুভব করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পড়িতে পড়িতে মনে হইল, একদিন হিন্দুজাতিরও জাতীয় জীবন ছিল--ভারতবর্ষেও জনসাধারণের মধ্যে এরূপ চিত্তবৃত্তি, এরূপ অদম্য ইচ্ছাশক্তি ছিল যাহা কোন একটী উচ্চভাবকে লক্ষ্য করিয়া অসীম ক্লেশ, ঘোর বিপদ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া ঈপ্সিত পথে অগ্রসর হইতে পারিত। ইহা ভাবিতে ভাবিতে দুইচক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল—ভাবিলাম বিধাতার কোন্ অভিশাপে আজ সেই চিত্তবৃত্তির অভাব হইল? কি ছিল—কি হইয়াছে!

ইংরেজের জাতীয়জীবন প্রধানতঃ সাম্রাজ্যস্থাপন ও বাণিজ্যবিস্তারকে অবলম্বন করিয়া স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতির মধ্যে যে নিতান্ত ক্ষুদ্র, নগণ্য ব্যক্তি সে স্বদেশে থাকুক কি বিদেশে থাকুক, যেখানে যেরূপ অবস্থায়ই থাকুক এই জাতীয় ভাবের উদয় হইলে তাহার মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে—সে জাতীয় সম্মান, জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য অসীম ক্লেশ, ঘোরতর বিপদ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে এরূপ কোন বিশেষ জাতীয় ভাব আছে কি? এখন নাই, কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। পূর্ব্বে হিন্দুজাতির মধ্যে এরূপ একটী উচ্চভাব ছিল, যাহা সমাজের ছোট বড় সমস্ত লোকমণ্ডলীর মনে একাধিপত্য বিস্তার করিত--যে ভাবের সাড়া পাইলে সমাজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তিও সেই ভাবের মোহে মুগ্ধ হইয়া জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে পারিত। সেই উচ্চ ভাবের নাম

ধর্ম্ম। এই উচ্চ ভাবকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ যাবজ্জীবন যে অসীম ক্লেশ সহ্য করিতেন তাহার নাম ছিল তপস্যা। আবার তাঁহাদের উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়া সমাজের মধ্যস্তরের ও নিম্নস্তরের জনগণও ধর্ম্মের জন্য সুখবিলাস বিসর্জ্জন দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ভারতবর্ষের যে সকল জাতি সেই ধর্ম্মের শাসন মানিয়া চলিতে স্বীকার করে নাই বা সমর্থ হয় নাই, তাহারা হিন্দুসমাজের বাহিরে অথবা অতি নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে।

ভারতের উচ্চ শ্রেণীর জনগণ ধর্ম্মলাভের জন্য যেরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিতেন, তাহার তুলনায় কাপ্তান স্কটের দক্ষিণমেরুযাত্রা কিছুই নহে! পুরাণে দেখিতে পাই, কোন ঋষি গিরিগহ্বরে বা বৃক্ষমূলে বসিয়া তপস্যা করিতেছেন—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ চলিয়া যাইতেছে—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সমান ভাবে তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে,—তিনি স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল, তাঁহার চিত্ত সমাধিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কোন ঋষির সমস্ত শরীর বল্মীক মৃত্তিকায় সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া গিয়াছে, কেবল চক্ষু দুইটী খালি রহিয়াছে। কোন ঋষি ঘোর গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া একদৃষ্টে সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া তপস্যা করিতেছেন। কেহ বা গলিত বৃক্ষপত্র ভক্ষণ করিয়া, কেহ বা বায়ু ভক্ষণ করিয়া, কেহ বা সম্পূর্ণ নিরাহারে তপস্যা করিতেছেন। এ সকল পৌরাণিক কাহিনী অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু ইহার মূলেও যে সত্য আছে তাহা বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন তপস্বীর চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়। এখনও ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসমূহে অথবা হিমালয়াদি গিরিকন্দরে এরূপ সব মহাত্মা আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বপ্রকার বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া অতিকঠোর ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়েও ভারতবর্ষে মহাত্মা ভাস্করানন্দস্বামী, ত্রৈলিঙ্গস্বামী বা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ন্যায় তপস্বীর অভাব হয় নাই। ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মের জন্য পাগল, হিন্দুর জাতীয় জীবন ইঁহাদের মধ্যে চরম স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, ইঁহারাই হিন্দু জাতির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা-স্থল। ঋষিতপস্বীর কথা

ছাড়িয়া দাও ; প্রাচীন কালে যাঁহারা ভারতের রাজাধিরাজ সম্রাট ছিলেন, তাঁহারাও একমাত্র ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। রামায়ণ মহাভারতে এমন অনেক রাজর্ষির পূত চরিত্রগাথা পাঠ করা যায়, যাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়াও কেবল ধর্ম্মের জন্য সেই রাজ্য ঐশ্বর্য্য নিমেষের মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছেন। মহাকবি কালিদাস যে সকল রঘুকুলধুরন্ধরের চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নহে হিন্দুর এই জাতীয় ভাব এক সময়ে সমগ্র সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া সকল জাতির সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়াছিল। প্রবল প্লাবন হইলে যেরূপ নদীর জল নাল খাল বিল সমস্ত পরিপূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হয়, সেইরূপ একসময়ে ভারতীয় সমাজের প্রত্যেক স্তর ধর্ম্মরূপ মহাভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। তাই হিন্দুর সমাজগঠন, জাতিভেদ, জীবনযাত্রা, আহারবিহার, আমোদ-উৎসব পালপার্ব্বণ সমস্ত ধর্ম্মমূলক। হিন্দুর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্য ধর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান ভগ্নদশায়ও ধর্ম্মের প্রভাব সমাজের মধ্যে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। হিন্দুসমাজের জনসাধারণ মধ্যে এখনও প্রবল ধর্ম্মভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও হিন্দু নরনারী ধর্ম্মের জন্য যেরূপ কঠোরতা ও স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত, আর কোন কারণে সেরূপ নহে। কাপ্তেন স্কটের দক্ষিণমেরুযাত্রার ন্যায় এখনও হিন্দু সমাজের কত নরনারী অদম্য উৎসাহের সহিত অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া কত কত দুর্গম তীর্থস্থানে যাইতেছেন। যখন পুরীতে যাওয়ার রেল হয় নাই, তখন জগন্নাথ রোড দিয়া পিপীলিকা শ্রেণীবৎ কত শত শত যাত্রীকে যাইতে দেখিয়াছি, যাহারা অনবরত দশ পনর কুড়ি দিন যাবৎ রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য করিয়া চলিয়াছে—অনাহারে অনিদ্রায় শরীর ক্ষিন্ন হইয়াছে, চলিবার শক্তি নাই, কোন কোন কুলবধূ বা বৃদ্ধার দীর্ঘপথ চলিতে চলিতে পদতল ফাটিয়া রক্তধারা বহিতেছে, সেই ক্ষতবিক্ষত পদতলে কাপড় জড়াইয়া তাঁহারা চলিতেছেন, তবুও তাঁহাদের উৎসাহের বিরাম নাই, তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা একবার গিয়া সেই

পুরীধামে জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। কাহারও বা যাইতে যাইতে পথে পড়িয়া ভবলীলা সাঙ্গ হইতেছে—কিন্তু দৃক্‌পাত নাই—যাহারা বাঁচিল তাহারা জীবন যায় তাহাও স্বীকার তবুও একবার সেই মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া মানবজীবন সার্থক করিবে। মনের একটা উচ্চ ভাবের পরিতৃপ্তির জন্ত এতদূর ক্লেশ স্বীকার, এতদূর স্বার্থত্যাগ যে জাতি করিতে এখনও প্রস্তুত, সে জাতি মৃতবৎ হইলেও এখনও মরে নাই। এখনও তাহার প্রাণ ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছে। উপযুক্ত পুষ্টি পাইলে আবার তাহা সতেজ হইবে, আবার সে জাতি বাঁচিয়া উঠিতে পারে।

কিন্তু সেই পুষ্টি কোথা হইতে পাইবে? বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষা দ্বারা তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। আমরা স্কুল কলেজে যেরূপ শিক্ষা পাইয়া থাকি, তদ্দ্বারা ধর্ম্মভাবের পরিপুষ্টি হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার সম্পূর্ণ মূলচ্ছেদ হইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ, ঈশ্বরবিশ্বাসী লোকের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। অথচ এই সকল শিক্ষিত ব্যক্তি জাতীয়তার ধ্বজা তুলিয়া সময় সময় আস্ফালন করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ হিন্দুজাতির মধ্যে ধর্ম্মভাব বাদ দিয়া কখনও জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। যে ভাব ভারতীয় সমাজের সমগ্র স্তর স্পর্শ করিতে পারে, এক ধর্ম্মের দ্বারা ভিন্ন কিছুতেই তাহার পরিস্ফুরণ হইবে না। স্বদেশপ্রেম (patriotism) বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা ভারতবর্ষে কখনও ছিল না জননী জন্মভূমি বলিয়া সহস্র চীৎকার করিলেও ভারতের জনসাধারণ সাড়া দিবে না। তাহা বিগত দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের সময় বেশ বুঝা গিয়াছে। তুমি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত জীবগণ—আমরা মুখে সাড়া দিতে পারি, কিন্তু যে হৃদয় সেই উচ্চভাবের সাড়া পাইলে ইংরেজ বা জাপানীর হৃদয়ের মত নাচিয়া উঠিবে, আমাদের সে হৃদয় নাই—যে অদম্য ইচ্ছাশক্তিবলে জগন্নাথযাত্রিগণ অসীম ক্লেশ সহ্য করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারে, আমাদের সে ইচ্ছাশক্তি নাই। যে ধৈর্য্য, যে সহিষ্ণুতা বৎসরের পর বৎসর যুগের পর যুগ বারম্বার বিফল মনোরথেও ক্ষীণ হয় না, আমাদের সে ধৈর্য্য সে সহিষ্ণুতা নাই। আমাদের জাতীয়তা, আমাদের

দেশহিতৈষিতা কেবল কথা মাত্র, সুতরাং তাহার দ্বারা জাতীয় জীবন আসিবে কিরূপে?

জাতীয় জীবন বিকাশের জন্য এখন চাই সংযম—চাই ত্যাগ—চাই তপস্যা। যেরূপ সংযমের দ্বারা সুরথ রাজা যতাহার, নিরাহার, সমনস্ক, সদাশুচি হইয়া দেবী ভগবতীর নিকট হৃতরাজ্যোদ্ধারের বর পাইয়াছিলেন, আমাদিগকে এখন সেইরূপ সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। যেরূপ ত্যাগের দ্বারা মহামুনি দধীচি দেবগণের স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের জন্য নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, আমাদিগকে সেইরূপ ত্যাগ শিক্ষা করিতে হইবে। যেরূপ তপস্যার দ্বারা রাজর্ষি ভগীরথ পিতৃকুলের উদ্ধারের জন্য স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যধামে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন, আমাদিগকে সেইরূপ তপস্যার অনুশীলন করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি হিন্দুর জাতীয় জীবনের যাহা মূলমন্ত্র অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ঈশ্বরারাধনা, আমাদিগকে কায়মনোবাক্যে তাহারই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সাংসারিক হউক, আধ্যাত্মিক হউক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সোপান ঈশ্বরারাধনা বলিয়া জানিতেন। সেজন্য দেখিতে পাই, যিনি যখন যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহার জন্য ঈশ্বরারাধনা বা তপস্যা করিয়াছেন। কেহ অমর বর লাভের জন্য তপস্যা করিয়াছেন, কেহ রাজ্য লাভের জন্য তপস্যা করিয়াছেন, কেহ অন্নলাভের জন্য তপস্যা করিয়াছেন, কেহ বা ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য তপস্যা করিয়াছেন। ঈশ্বরারাধনাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির একমাত্র উপায় ছিল। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহকে ভুলিয়া দিন দিন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িতেছি। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলে হিন্দুজাতির নিশ্চয়ই অপমৃত্যু হইবে। ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া, সংযম, ত্যাগ, তপস্যার অনুশীলন করিলে হিন্দুজাতি বাঁচিয়া থাকিবে। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের একজন প্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর স্বামী বিবেকানন্দ কি বলিতেছেন শুনুন :—

"India cannot be killed. Deathless she stands, and will stand, so long as her old spirit remains as the background, so long as her people do not give up the God of India, so

long as they do not believe in materialism ; so long as they do not abandon spirituality. Beggars they may remain, low and poverty-stricken ; dirt and squalor may surround them perhaps throughont all time, but let them not give up their God, let them not forget that they are the children of the sages. Just as every one in the West, even the man in the street, wants to trace his descent from some robber baron of the Middle Ages, so in India even an Emperor on the throne seeks to trace his from some beggar-sage in the forest, from one who wore for clothing the bark of a tree, lived upon the wild fruit of the forest, and commu. ned with God. That is the type of descent to which we aspire, and so long as her pride of birth takes such a form, India cannot die."

ইহার ভাবার্থ এই :—ভারতবর্ষ কখনও মরিতে পারেনা। ভারতবর্ষ অমর হইয়া আছে এবং তত দিন অমর থাকিবে, যত দিন তাহার প্রাচীন ধর্ম্মভাব তাহার ভিত্তিস্বরূপ থাকিবে, যতদিন তাহার নরনারীগণ তাহাদের দেবতাকে পরিত্যাগ না করিবে—যতদিন তাহারা পার্থিব ভোগ-বিলাসে মুগ্ধ হইয়া আধ্যাত্মিক ভাবকে বিসর্জ্জন না দিবে। হয়ত পার্থিব উন্নতিবিমুখ হওয়াতে তাহারা চিরদিন দারিদ্র্যপীড়িত ভিক্ষুক হইয়া থাকিবে—হয়ত তাহারা চিরদিন ধূলি-মলিনতা-সমাচ্ছন্ন হইয়া জীবন যাপন করিবে, কিন্তু তাহারা যেন কখনও তাহাদের দেবতাকে বিস্মৃত না হয়—তাহারা যেন কখনও না ভুলে যে, তাহারা ঋষিদিগের সন্তান। যেমন পাশ্চাত্য প্রদেশের প্রত্যেক ব্যক্তি, এমন কি রাস্তার ভিক্ষুকও নিজকে মধ্যযুগের কোন ডাকাত জমীদারের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গৌরব অনুভব করে—সেইরূপ ভারতবর্ষের সিংহাসনারূঢ় নরপতি পর্য্যন্ত কোন অরণ্যবাসী ভিক্ষুক বশিষ্ঠ বা ভরদ্বাজের গোত্রোৎপন্ন বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন—যাঁহারা বৃক্ষবল্কল পরিধান করিতেন, বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিতেন,

কিন্তু সর্ব্বদা ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। আমরা যথার্থই সেইরূপ বংশ-গৌরব আকাঙ্ক্ষা করি, এবং যতদিন আমরা সেইরূপ বংশগৌরবের আদর করিতে থাকিব, ততদিন ভারতবর্ষের মৃত্যু নাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

গঙ্গার প্রতি ভীষ্ম।

সার্থক জনম মম হে মহাজননি,
ধন্য এ জীবন মাগো, পূজি রাঙ্গাপদ,
ধন্য দেবব্রত নাম রাখিলা আপনি,
প্রদানি জীবনশিক্ষা চিরমনোমদ।
কি বিচিত্র শস্ত্রবিদ্যা শিখালে সন্তানে,
মহাবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা—সর্ব্ববিদ্যাসার,
দিলা দাসে ব্রহ্মচর্য্য শাস্ত্রমহাজ্ঞানে,
পালিতে প্রতিজ্ঞা শত জীবনে আমার।
তুচ্ছ মাতা হস্তিনার রাজসিংহাসন,
পিতার প্রীতির হেতু ঘৃণ্য সে বিলাস,
শুধু বাঞ্ছা করি ল'য়ে এ দীর্ঘ জীবন,
তোমারি চরণতলে বাঁধিতে নিবাস।
নাহি চাহি কীর্ত্তি ভবে কোন কর্ম্মফল,
তোমারি সাধনা মম জীবনসম্বল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

যশোবন্ত সিংহ।

(১)

মোগলের বিজয়-বৈজয়ন্তীকে ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি দূরদর্শী আকবরশাহ যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজপুতগণের সহিত ঘনিষ্ঠতাস্থাপন অন্যতম। তাঁহার পিতামহ বাবরশাহ ভারতে মোগলসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেও রাজপুত সম্প্রদায়ের অসি-চালনায় তিনি যে ভীত ও চকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন। হুমায়ুন রাজপুতদিগের সহিত মিলনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন, আকবর তাহার পূর্ণতা সাধন করেন। আকবরের পরও সে প্রথা রক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু আরঙ্গজেব তাহার শৈথিল্যে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তাঁহার সাম্রাজ্যের পরিণাম যে কল্যাণকর হয় নাই, তাহা ইতিহাস আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধি হয়। সে যাহা হউক, আরঙ্গজেব একেবারে রাজপুতসাহায্য পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। রাজা জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহের সাহায্যে তিনিও মোগলসাম্রাজ্যের গৌরববিস্তারে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শাজাহান বাদশাহের ময়ূরাসনকে অবিচলিত রাখার জন্য যাঁহারা স্তম্ভস্বরূপে বিদ্যমান ছিলেন, রাজা যশোবন্ত তাঁহাদের অন্যতম। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে সেই পুরুষসিংহ রাজা যশোবন্তের কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের অভিলাষ করিতেছি।

মরুস্থান বা মাড়বার আপনার কঠোর প্রকৃতির ক্রোড়ে রাঠোর জাতিকে আশ্রয় দান করিয়া, ভারতেতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের অবতারণা করিয়া তুলে। রাঠোর বংশের গৌরবস্তম্ভ কণোজাধিপতি রাজা জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘোরীর ভীষণ আঘাতে নিপাতিত হইলে, তাঁহারই বংশকণিকা মরুস্থলীতে আসিয়া উপনীত হয়। বাস্তবিক রাজা জয়চন্দ্রের বংশধরেরা নানা-স্থানে নিবসতি করিতে করিতে পরিশেষে মাড়বারকেই আপনাদের লীলা-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তুলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাঠোরাধিপ

রাজা যোধকর্ত্তৃক যোধপুরে রাজধানী স্থাপিত হয়। তৎপরে মালদেব, উদয়সিংহ প্রভৃতি মাড়বারের গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন। ক্রমে রাঠোর-বংশের সহিত মোগলবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায়, রাঠোর-রাজগণ মোগলসাম্রাজ্যসংরক্ষণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন।

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রাজা গজসিংহ যোধপুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি মোগলসাম্রাজ্যের গৌরবরক্ষার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যশোবন্ত সিংহ গজসিংহেরই কনিষ্ঠ পুত্র। গজের জ্যেষ্ঠ-পুত্রের নাম অমরসিংহ। অমরসিংহ একজন নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতার দক্ষিণহস্তস্বরূপ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি রাঠোর যুবকের সহিত মিলিত হইয়া তিনি রাজ্যমধ্যে অশান্তির স্রোত প্রবাহিত করিতে আরম্ভ করায়, তাহার পরিণাম বড়ই বিষময় হইয়া উঠে। রাজা গজ জ্যেষ্ঠপুত্রের ঔদ্ধত্যের জন্য তাঁহাকে ত্যজ্য পুত্র ও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করেন গজসিংহের মৃত্যুর পাঁচবৎসর পূর্ব্বে অমর সিংহকে উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত ও নির্ব্বাসিত করার জন্য এক মহাসভার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। রাজ্য হইতে নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে তাঁহাকে কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত করিয়া বহিষ্কৃত করা হয়। অমর-সিংহের অনুচর কতকগুলি রাঠোরযুবকও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মাড়বার পরি-ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এই সময়ে বাদশাহ সাজাহান মোগল সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, মাড়বারের রাঠোররাজগণ তাঁহার সামন্ত নৃপতিরূপে গণ্য হওয়ায়, গজসিংহ অমরসিংহকে উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত ও তাঁহাকে মাড়বার হইতে নির্ব্বাসিত করার জন্য বাদশাহের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বাদশাহ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। অমরসিংহ মাড়বার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হন। যদিও বাদশাহ তাঁহার নির্ব্বাসনে সম্মতি দান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহাকে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করেন। নিজ সাহসিকতার গুণে অমর-সিংহ শীঘ্রই রাও উপাধি ও তিনহাজারী মনসবদারী পদ লাভ করিতে সমর্থ হন, এবং মাড়বারের নাগর নামক স্থান বাদশাহদরবার হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র

ভূসম্পত্তিরূপে বৃত্তি প্রদান করা হয়।* কিন্তু অমর সিংহের ঔদ্ধত্য অধিকদিন তাঁহাকে সে অধিকার ভোগ করিতে দেয় নাই। তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করায়, বাদশাহ তাঁহার অর্থদণ্ড বিধান করেন। বকৃসী শালাবৎ খাঁ অমরসিংহের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ না হওয়ায়, বাদশাহ স্বয়ংই তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠান। দরবারে উপস্থিত হইয়া সালাবতের সহিত বচসায় অমর তাঁহার হত্যা সম্পাদন করেন, এমনকি বাদশাহকে পর্য্যন্ত আক্রমণে উদ্যত হইলে, অবশেষে নিজেও প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। এইরূপে অমরসিংহের পরিণামফল শোচনীয় হইয়া উঠে। অমরসিংহ সিংহাসনচ্যুত হইলে যশোবন্ত সিংহ যে মাড়বারের রাজছত্র ধারণের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেকথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। তাঁহার অপর ভ্রাতা অচল বাল্যকালেই ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

গজসিংহের মৃত্যুর পর ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ যোধপুরের সিংহাসনে আরূঢ় হন। তিনি সে সময়ে বাদশাহ দরবার হইতে চারিহাজারী মনসবদারী পদ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়।† যশোবন্ত মেবারের কোন রাজকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

* "He repaired to the imperial Court, and although the emperor approved and sanctioned his banishment, he employed him. His gallantry soon won him the title of Rao and the munsub of a leader of three thousand, with the grant of Nagore as an independent domain to be held directly from the crown. Tod.

† "The eleventh year of the reign of Shawjehan commenced with the death of Mah-Raja prince of the Rajaputs. He was succeeded in the throne by his second son Hussinet Singh; it being the established custom of the branch of the Rajputs called Mahrattors, to leave the sceptre to the disposal of the sovereigns by their latter will. The Rajputs, properly so called, did not acquiesce in the right of Hussinet. He had an elder brother and they

রাঠোর ও শিশোদীয়ের রক্ত তাঁহার শরীরে প্রবাহিত হওয়ায়, তিনি বীর্য্যবত্তা ও গুণবত্তায় বিভূষিত হইয়াছিলেন। ভারতেতিহাসের বহুপৃষ্ঠা তাঁহার গৌরব-প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালে মাড়বার হইতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল, এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে তাহার গৌরব চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইতে থাকে। অনেক সদ্‌গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়া সুশিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিল। * ভট্টগণ তজ্জন্য তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মাড়বারের রাজছত্র ধারণ করিয়া তিনি মোগলসাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বাদশাহ শাজাহানের পতাকামূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি বিংশতি ভাগে বিভক্ত এক বৃহৎ বাহিনী লইয়া আরঙ্গজেবের সহিত গোঁড়বানার (গণ্ডওয়ানা) যুদ্ধে উপস্থিত হন। † এই যুদ্ধে ও অন্যান্য সময়ে রাঠোরগণ অত্যদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল! ক্রমে যুবরাজ দারার সহিত যশোবন্তের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। মোগলেতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কিছুকাল পরে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কর দিতে অসম্মত হওয়ায়, বাদশাহ উজীর সাদুল্লার

adhered to him. The flames of a civil war were kindled; but the emperor interfered; and after having examined the claims of both the princes, he confirmed the Raja's will in favour of Hussinet whom he raised to the rank of four thousand horse. His elder brother, who was deprived of all hopes of the throne by the decision of the emperor was also created an Omra of three thousand. (Dow's). History of Hindustan Vol. III pp. 173-74.

টডের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহারাজ গজসিংহের মৃত্যুর পাঁচবৎসর পূর্ব্বে অমরসিংহ মাড়বার হইতে নির্ব্বাসিত হন, তাহাতে ভ্রাতৃবিরোধের কোনই উল্লেখ নাই।

* "Jeswunt (says the Bardai) was unequalled amongst the princes of his time stupidity and ignorance were banished; and science flourished where he ruled; many were the books composed under his auspices." Tod.

† "The first service of Jeswunt was in the war of Gondwana when he led a body composed of 'twenty two different contingents" in the army under Arangzebe.' Tod.

সহিত ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন। যশোবন্ত প্রথমতঃ সমর-পতাকা উড্ডীন করিলেও অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হন। বাদশাহের নিকট হইতে অনুমতি আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, যশোবন্ত যুবরাজ দারার নিকট উপহার প্রেরণ করিয়া, বাদশাহের ক্রোধশান্তির ব্যবস্থা করিয়া লন। * তাহার পর হইতে দেখা যায় যে, যশোবন্ত সিংহ মোগল গৌরবরক্ষার জন্য বরাবরই উদ্যোগী ছিলেন।

* "The Maraja, who owed his throne to an Imperial decision against his elder brother the unfortunate Amar Singh, forgot, about this time the gratitude which he owed to Shawjehan. He stopt the payment of the stipulated tribute, and began to fortify the strong city of Chitor. The emperor detached thirty thousand horse under Sadulla the visier to chastise him for his insolence and to demolish the works. The Hindoo prince hung out the flag of defiance, and the visier invested Chitor. Parties were at the same time detached on all sides to lay waste the open country. The refractory prince had not the spirit necessary to support his rebellion. He sent, on the eleventh day, to Sadulla a most submissive overture of peace. The minister referred him to the emperor who still remained at Ajmere ; but that monarch would not receive that letters. Orders were sent to prosecute the siege with vigour ; and to give no terms. The Maraja, in this extremity found means to convey a present to Dara. That prince softened his father's resentment ; and the Maraja upon paying the expence of the war, was reinstated In his hereditary dominions."

(Dow, Vol. III pp. 212-13.)

উদ্ধৃত অংশে চিতোরের যে উল্লেখ আছে উহা ভ্রম বলিয়া বোধ হয়। উক্ত বিবরণে সুস্পষ্ট রূপে যশোবন্ত সিংহকেই বুঝাইতেছে। চিতোর মেবারের অধীন, তৎকালে রাজা জগৎসিংহ মেবারের অধিপতি ছিলেন। তিনি চিতোরের সংস্কার করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু অমরসিংহ নামে তাঁহার কোন ভ্রাতা ছিলেন না বা তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির এরূপ কোন ব্যবস্থা হয় নাই। প্রতাপসিংহের পর মেবারের রাণাগণ দিল্লীর বাদশাহের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেও অন্যান্য রাজপুত রাজাগণের ন্যায় অধীনতা স্বীকার করেন নাই। উদ্ধৃত অংশের চিতোর সম্ভবতঃ যোধপুর হইবে।

Block and Printed by the Mohila Press, Calcutta.

সাম্রাজ্যগ্রহণের পর হইতেই বাদশাহ শাজাহানকে নানাস্থানের বিদ্রোহ-দমনের জন্য ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে তাঁহাকে অনেকবার মোগলবাহিনী প্রেরণ করিতে হয়। তাঁহার পুত্রগণ বয়ঃ-প্রাপ্ত না হইতেই পিতার সাহায্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহা-দের যৌবনকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহারা অদম্য উৎসাহসহকারে মোগল-সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হন। সুপ্রসিদ্ধ মুসল্‌মান বীরগণের সাহায্য ব্যতীত রাজপুত বীরগণও তাঁহাদের সহায়তা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তন্মধ্যে অম্বরের জয়সিংহ ও মাড়বারের যশোবন্ত সিংহের নামই উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা শাজাহানের রাজত্বকালের অনেক ব্যাপারের সহিত লিপ্ত ছিলেন।

শাজাহান অনিন্দ্যসুন্দরী আরজমন্দ বানু বা মমতাজ জমানিকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শাজাহানের সাম্রাজ্য লাভের পর মমতাজ অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। তাঁহার গর্ভে শাজাহানের অনেক গুলি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে চারিটি পুত্র ও চারিটি কন্যা মমতাজের মৃত্যুর পর জীবিত থাকে। পুত্রচতুষ্টয়ের নাম দারা, সুজা, আরঙ্গজেব ও মোরাদ। কন্যাচতুষ্টয়ের মধ্যে তিন জনের নাম অবগত হওয়া যায়। জ্যেষ্ঠা জাহানারা, মধ্যমা রোশেনারা এবং কনিষ্ঠা সুরিয়াবানু। শাজাহান পুত্র কন্যাগণের শিক্ষার জন্য সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলে সুচারুরূপে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, তাঁহারা অনেক বিষয়ে পিতার সাহায্য করিয়াছিলেন। ক্রমে শাজাহান বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে, পুত্রগণের মধ্যে ঈর্ষার ভাবের সঞ্চার হয়। কারণ, তাঁহারা সাম্রাজ্যলাভের জন্য মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হন। এমন কি, বাদশাহের জীবিত অবস্থাতে তাঁহারা আপনাপন ইচ্ছাকে ফলবতী করিতে চেষ্টা করেন, এবং তাঁহাদের সে চেষ্টা যে নিষ্ফল হয় নাই, তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। শাজাহান পুত্রগণকে শান্ত করার অভিপ্রায়ে চারি পুত্রকে চারি দূর প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া আপনার নিকট হইতে অপসৃত করিয়া দেন। দারা কাবুল ও মুল্‌তানের, সুজা বাঙ্গলার, আরঙ্গজেব দাক্ষি-ণাত্যের এবং মোরাদ গুজরাটের শাসনভার প্রাপ্ত হন। দারা কিন্তু আপ-

নাকে সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী মনে করিয়া, একেবারে রাজধানী পরিত্যাগ করেন নাই। শাজাহানও দারার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বাদশাহের অন্যান্য পুত্রেরা পিতার বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অভিলাষ পূরণ করিতে দেন নাই। বাদশাহের পরিবারবর্গের ও কর্ম্মচারিগণের মধ্যেও এ বিষয় লইয়া পক্ষাপক্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল। জাহানারা বেগম দারার এবং রোশেনারা বেগম আরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করেন। সুরিয়া বানু কিন্তু উদাসীন ভাবেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কর্ম্মচারিগণের মধ্যে মহারাজা যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি দারার ও সায়েস্তা খাঁ প্রভৃতি আরঙ্গজেবের সহায়তায় প্রবৃত্ত হন। আমরা পরে দেখাইতেছি যে, বাদশাহ শাজাহানের জীবিত অবস্থাতেই কিরূপে তাঁহার পুত্রগণ সাম্রাজ্যলাভের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ ও পিতৃদ্রোহের অবতারণা করিয়া, অবশেষে বাদশাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন।

একখানি ছবি।

"কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো ?
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো।"

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গীতাঞ্জলি" হইতে উদ্ধৃত এই দুই পংক্তিতে যে ভাব নিহিত আছে, সেই ভাবকে শরীর দান করিয়া শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে নামক একজন চিত্রকর একখানি ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার সেই চিত্র আষাঢ় মাসের ভারতীতে বাহির হইয়াছে। উক্ত কবিতা এবং তাহার এই টীকা দেখিয়া আমার মনে নিম্নলিখিত ছবি ফুটিয়া উঠিল।

একজন প্রবাসী গৃহস্থ অনেক দিন পরে গৃহে প্রত্যাগত। কাল—সন্ধ্যা অতীত। তিনি বাড়ী আসিয়া দেখেন যে ঘর অন্ধকার। তখন তিনি চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন—

"ওরে হারাণে,---

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো?" হারাণে বলিল "বাবু, ঘরে দেয়াশলাই নাই, আলো জালিব কি করিয়া? মা শোবার ঘরে কাঁদো কাঁদো হইয়া মুখে হাত দিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া আছেন। ডাকিলেও সাড়া দেন না, আমি কি করিব?"

বাবু অমনি বলিলেন—"বুঝিয়াছি—

বিরহানলে জালোরে তারে জালো!"

ইহা বলিয়াই তিনি নিতান্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখিলেন যথার্থই তাঁহার নবপরিণীতা গৃহিণী (সম্ভবতঃ দ্বিতীয় পক্ষের) পালঙ্কের এক পার্শ্বে গালে হাত দিয়া কাঁদো কাঁদো হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার কুসুমসমৃদ্ধ কবরীবন্ধন শিথিল হইয়াছে, তবে অন্য বেশভূষার কিছুমাত্র ত্রুটী ঘটে নাই। তাঁহার সম্মুখে দীপাধারে একটী প্রদীপ রহিয়াছে তাহা জালান হয় নাই। গৃহস্বামী এক নিমেষে ব্যাপার কি বুঝিলেন। তিনি অমনি অন্ধকারগৃহে সেই প্রদীপটী হাতে করিয়া আবার বলিলেন—

"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো?

বিরহানলে জালোরে তারে জালো!"

ইহা বলিয়াই তিনি গৃহিণীর বিরহশ্বাসকম্পিত বক্ষঃস্থলে সেই প্রদীপটী স্পর্শ করিলেন, আর অমনি সেই প্রদীপ জলিয়া উঠিল!

তাঁহার এই অদ্ভুত ব্যাপারে গৃহিণী ঝাঁটা লইয়া উঠিলেন কিনা তাহা কবি বা চিত্রকর কেহই বলেন নাই। কর্ত্তাটী কিন্তু এক সম্পূর্ণ অতর্কিত মুহূর্ত্তে তাঁহার উদ্ভাবনী প্রতিভার স্ফুরণে চমকিত হইয়া চাকরকে বলিলেন—

"দ্যাখ্ হারাণে! আমার বাড়ীতে আর কখনও দেয়াশলাই কিনিতে হইবে না। আর উনান ধরাণর জন্য কাঠ কি ঘসীরও প্রয়োজন নাই। আমি মধ্যে মধ্যে বাড়ী থেকে গা ঢাকা দিলেই বিরহানলে আলো জলিয়া উঠিবে। আমি আজই কলিকাতা গিয়া ইহার একটা পেটেন্ট্ করিব। সাবধান, কাহাকেও একথা বলিস্ না!"

শ্রীঅন্ধকার।

বাসনা।

তোমার এ আর্য্যাবর্ত্তে, জীবন-আবর্ত্তে ঘুরি'
যেন আমি আসি বার বার,
সর্ব্বকর্ম্ম-বিরহিত, জড়-সম মৃত্যু, প্রভু,
সেত নয় কাঙ্ক্ষিত আমার।
অশ্রান্ত গতির মধ্যে, আমি সদা চাহি স্থিতি,
এক জন্ম শেষ নহে মোর,
নহে ভোগ, শুধু ত্যাগ, ত্যাগের বিমলানন্দে,
চিত্ত মোর রবে ভরপূর।
ধরার কর্ত্তব্য যত, তব কর্ম্ম মনে করি'
অনুদিন সাধিব নীরবে,
সর্ব্ব কোলাহল মাঝে, আত্মা সদা র'বে মগ্ন
তব যুগ্ম চরণ-রাজীবে।
আজ যাহা পারি নাই, জন্মে জন্মে উদযাপিব,
একমনে সে মহাসাধনা।
সংসারের শোক দুঃখ, বহিয়া আনিবে প্রাণে
শান্তিভরা তোমারি সান্ত্বনা।
হৃদয়-কমলাসনে, যেদিন হেরিব প্রভু!
সুমঙ্গল তব অধিষ্ঠান।
দেবতা গো, সে মুহূর্ত্তে, তোমার চরণ-তলে
হয় যেন মোর অবসান।

শ্রীক্ষীরোদবিহারী সোম।

ধর্ম্মকথা।

মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম কি? মনুষ্যহৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত এই মহাপ্রশ্নের উত্তরে হিন্দুর শাস্ত্র ও আচার্য্যমুখে যে মহাসত্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, মনুষ্যপ্রকৃতির সম্পূর্ণতা বা মনুষ্যপ্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ ব্যতীত আর কোথাও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হিন্দুশাস্ত্র ও আর্য্যমনীষিগণের অভিপ্রেত নহে। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ, আচার অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপসকল একমাত্র এই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়াই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সে সকল অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই একমাত্র মূল উদ্দেশ্যের সহায়তা করে বলিয়া তাহাও ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাঁহারা আমিত্বের সম্প্রসারণ বা মনুষ্যত্বের বিকাশরূপ উক্ত প্রকার ধর্ম্মের মূল সূত্রকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ, আচার অনুষ্ঠান ও হিন্দুসমাজপ্রবর্ত্তিত যাগযজ্ঞাদি বাহ্য অনুষ্ঠান গুলির উপর অনাস্থা প্রদর্শন করেন, অথবা সে সকল অনুষ্ঠানের সহিত তাহার প্রবর্ত্তক, উপদেশক ও অনুমোদকগণের নানারূপ নীচ স্বার্থসম্বন্ধের কল্পনা করিয়া এ সকলের মূলে একটা অন্যায় অভিসন্ধির আরোপ করিয়া থাকেন, আমরা কিছুতেই তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না।

সাধারণতঃ যেগুলিকে বাহিরের ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা মানুষের আভ্যন্তরিক শক্তিসমূহের বহির্ব্বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আভ্যন্তরিক শক্তিসমূহ যখন বিকাশ লাভ করিয়া বাহ্য পদার্থের সহিত সম্মিলিত হয়, তখনই তাহা ক্রিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মানুষের এক এক জাতীয় ক্রিয়া তাহার আত্মগত এক এক জাতীয় শক্তিরই প্রকাশমান অবস্থাবিশেষ—তাহার অন্তঃশক্তিরই এক একটা অভিব্যক্তিমাত্র। সকল ক্রিয়ার মধ্য দিয়া মানুষ প্রতিনিয়ত আপনাকেই প্রকাশ করিয়া থাকে, বাহিরের সকল অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে তাহার অন্তর্মূর্ত্তিটীই ফুটিয়া উঠে। যখন তাহার যে শক্তিটী স্ফুরিত হয়, প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বীজগুলির মধ্যে যখন

যেটী আত্মলাভ করে,বাহিরেই হউক,আর ভিতরেই হউক,এক এক রূপ ক্রিয়া, ব্যাপার, বা অনুষ্ঠানরূপে তখনই তাহার পরিণতি সংঘটিত হয়। আভ্যন্তরিক শক্তিসমূহের এরূপ পরিণতি, ক্রিয়ারূপে এরূপ পরিবর্ত্তনই তাহার বিকাশ। সাধারণতঃ এ বিকাশের মানদণ্ডেই মনুষ্যপ্রকৃতি পরিমাপিত হইয়া থাকে। যাহার যে শক্তি যে পরিমাণে ক্রিয়াশীল, তাহার সেই শক্তি ঠিক সে পরিমাণেই বিকাশ প্রাপ্ত, আর এই বিকাশের মাত্রার পূর্ণতা ও অপূর্ণতার উপরেই মনুষ্যপ্রকৃতির পূর্ণতা ও অপূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যাঁহারা ধর্ম্মকে মানুষের প্রকৃতিগত বিকোষস্বরূপ সূক্ষ্মশক্তিময় পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, আমরা বুঝিতে পারি না, বাহিরের আকার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ কি প্রকারে তাঁহাদের নিকট উপেক্ষিত হইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাহিরের ক্রিয়া মানুষের আভ্যন্তরিক শক্তিসমূহের বাহ্য অভিব্যক্তি মাত্র। মনুষ্য প্রকৃতিতে যখন যে ভাব আত্মলাভ করে, সূক্ষ্মশক্তিরূপে সংস্থিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বীজগুলির মধ্যে যখন যেটী মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, বাহিরে তাহার অনুরূপ এক একটী ক্রিয়া দ্বারা তখনই তাহা প্রকাশিত হয়, সে সকল ক্রিয়ার মধ্য দিয়া তাহার আভ্যন্তরিক অবস্থাই সূচিত হইয়া থাকে। বাহিরের ক্রিয়া যদি কেবল বাহিরেরই একটা পদার্থ হইত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাকে উপেক্ষা করা যাইত, কিন্তু বাহিরের সঙ্গে যখন অন্তরের যোগ রহিয়াছে, বাহ্য ক্রিয়ার অন্তরালে যখন অন্তঃশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তখন কেবল "বাহিরের অনুষ্ঠান" এই অপরাধে সে গুলিকে ধর্ম্মের অভিধান হইতে বঞ্চিত করা খুবই সঙ্গত কার্য্য হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

ক্রোধপ্রবৃত্তির উত্তেজনাকালে যখন মানুষের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে, চক্ষুর্দ্বয় লোহিতাকার ধারণ করে, স্নায়ুমণ্ডলের অত্যধিক উত্তেজনার ফলে, হস্তপদাদির অস্বাভাবিকরূপ ঘন ঘন আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তখন তাহার সেই বাহিরের অবস্থাও উন্মত্তের ন্যায় অস্বাভাবিকরূপ ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়া কি, তাহার আভ্যন্তরিক অবস্থাটীই সূচিত হয় না? তাহার আত্মার মধ্যে যে একটা তরঙ্গ উঠিয়াছে—তাহার শক্তিময়-অন্তঃশরীরের মধ্যে একটা প্রবল ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সেই

বাহ্য ভাবান্তরের মুখে কি সে কথাই ঘোষিত হয় না? সেইরূপ মানুষের মধ্যে যখন ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হয়, ঈশ্বরানুরাগের রক্তিম আভায় তাহার সকল শরীর, তাহার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্ক প্রভৃতি সকল অঙ্গ রঞ্জিত হইয়া উঠে, জগদীশ্বরের পিতৃত্বাদিভাবের অনুভবের সঙ্গে তাঁহার অভয়প্রদপ্রশান্ত মূর্ত্তি কখনও বা সদাশিবরূপে জগৎপিতৃত্বের পুণ্যপ্রভায়, কখনও বা ভুবনেশ্বরীরূপে জগন্মাতৃত্বের স্নিগ্ধ মহিমায়, কখনও বা বৃন্দাবনবিহারী রাসেশ্বরের ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় তাহার হৃদয়ের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসে, বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য অনন্তদেবের সেই শান্তমূর্ত্তিতে কেন্দ্রীভূত দেখিয়া যখন তাহার হৃদয়ের সকল অনুরাগ, সকল ভালবাসা সংসারের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহাতেই আশ্রয় গ্রহণ করে, সংসারের সকল প্রিয়জনকে ঘুচাইয়া দিয়া প্রিয় হইতে প্রিয়তর প্রিয়তমরূপে ভগবান্ যখন তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, তখন তাহার বদনে, কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, নয়নে কি আনন্দপ্রভা, হৃদয়ে কি অমৃতাভাস! তখন তাহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত, বক্ষঃস্থল আনন্দধারায় পরিপ্লাবিত, ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাসে কণ্ঠস্বর অর্দ্ধস্ফুট ও অর্দ্ধজড়িত। তখন তাহার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সেই প্রাণারাম প্রাণারাধ্যের অভিমুখেই প্রবাহিত। তাহার সকল চেষ্টা হৃদয়েশ্বরের তৃপ্তিসম্পাদনেই নিয়োজিত। কিসে যে তাঁহার তৃপ্তি হইবে, কি উপায়ে যে বাঞ্ছিত দেবতা সন্তোষ লাভ করিবেন, এই চিন্তাতেই তাহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ। বিশ্বের যাবতীয় ভোগ্য পদার্থের মধ্যে যখন যেটী তাহার দৃষ্টিপথে উপনীত হইতেছে, যখন যেটীর মধুরতা তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতেছে, অতিসন্তর্পণে তখনই তিনি তাহা স্বীয় অভীষ্টদেবতার সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন। আজ ভগবান্ তাহার নিকট আপনা হইতেও অধিক প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন, তাই আজ তাহার চিত্ত সংসারের প্রিয় ভোগ্যপদার্থগুলি স্বয়ং উপভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। একে একে তাহার সমস্তগুলিই আনিয়া তাহার জীবনসর্ব্বস্বের সমীপে উপস্থিত করিতেছে। সে কখনও মন্দাকিনীর পবিত্রসলিলে আরাধ্য দেবতার চরণযুগল প্রক্ষালিত করিতেছে, কখনও বা সযত্নসজ্জিত পুষ্পাক্ষতের শোভন অর্ঘ্য তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিয়া, সেই ভুবনমোহন সৌন্দর্য্যে আপনিই আত্মহারা হইয়া যাইতেছে, কখনও সুগন্ধ বারিধারায় তাঁহাকে স্নান করাইতেছে, বিচিত্র বসন ও মহার্হ

ভূষণে তাঁহার দেবতাঙ্গ ভূষিত করিয়া হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিতেছে। কখনও বা সচন্দনপুষ্পপত্রাঞ্জলি তাঁহার বিশ্ববাঞ্ছিত চরণকমলে অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। তখন তাহার দৃষ্টি এ লোক পরিত্যাগ করিয়া ত্রিলোকনাথের চরণকমলেই নিবদ্ধ; তাহার সমস্ত শক্তি বিশ্বের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথের পূজাতেই ব্যাপৃত। সে যে কি ভাব, সে যে কি আনন্দ, তাহা কেমন করিয়া বলিব! মূঢ় আমি, দুর্ভাগা আমি, অতি তুচ্ছ অতি ঘৃণ্য সংসারের ক্ষুদ্র কীট আমি, দুষ্প্রবৃত্তির আজ্ঞাবহ বিশ্বস্ত ভৃত্য আমি, তাহা কেমন করিয়া বলিব। কখনও সে সৌভাগ্যের উদয় হয় নাই, জীবনে কখনও সে ভাবের অনুভব করি নাই, সে আনন্দের রসাস্বাদন ঘটে নাই। কখনও যে ঘটিবে সেরূপ ভরসাও নাই আমি সে চিত্র কেমন করিয়া অঙ্কিত করিব! যদি পারিতাম যদি সে আনন্দের অস্ফুট আভাসও পাইতাম, তাহা হইলে আজ তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রবন্ধ পাঠাইতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া "শাশ্বতী" সম্পাদকের নিকট হইতে দীর্ঘ অনুযোগপূর্ণ পত্র পাইয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় দিবসের অতিশ্রমক্লিষ্ট অবসন্ন দেহ লইয়া রজনীর মধ্যযামে নিদ্রাললসচক্ষে কখনও এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে বসিতাম না। কিন্তু তাহা বলিতে পারি আর নাই পারি, ভক্তহৃদয়ের সেই অনির্বচনীয় মধুর ভাব শব্দের তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া তাহা দেখাইতে পারি আর নাই পারি, অভিজ্ঞ পাঠক! তুমি তোমার মানসপটে সেই ভক্তবরের পবিত্র চিত্রটী আঁকিয়া লও, মানসচক্ষে তাঁহার সেই তৎকালিক ভাব, তৎকালিক ক্রিয়া সকল অবলোকন কর, তাহার পর বল দেখি ভাই, তোমার কি মনে হয়, তাহার সেই ভাব কি কেবল বাহিরের না ভিতরের? তাহার সেই ক্রিয়া—তাহার সেই অনুষ্ঠানের মূলে কেবল কি কতকগুলি বাহিরেরই শক্তি, না উহা তাহার অন্তরেরই অভিব্যক্তি?

এইরূপ কেবল ভক্তিপ্রবৃত্তির উত্তেজনাতেই নয়, মানুষের প্রকৃতিগত অন্যান্য সদ্বৃত্তিগুলিরও এরূপ এক একটা বহির্বিকাশ আছে। ধ্যান, ধারণা, শৌচ, সদাচার ও যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপসকল, এরূপ এক একটা বিশেষ বিশেষ শক্তিরই বাহ্য বিকাশ মাত্র। সে সকল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠাতার সে সকল বিশেষ বিশেষ ভাব বা বিশেষ শক্তির ক্রিয়াই সূচিত হইয়া

থাকে। সুতরাং "ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ, বাহিরের অনুষ্ঠানে তাহার কখনও স্থান হইতে পারেনা," এরূপ মন্তব্য আমরা অসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। বাহিরের অনুষ্ঠানের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ অসম্ভব হইলে তাহার সহিত অধর্ম্মের সম্বন্ধ থাকাও সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে প্রাণিহত্যা মহাপাপ বলিয়া গণ্য হয় কেন? দস্যুতাকে অধর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা কর কেন? সে সকল কার্য্যের মধ্যদিয়া নরঘাতক দস্যুর প্রকৃতিগত ভীষণ নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাইয়া মনুষ্য প্রকৃতির এতাদৃশ শোচনীয় পরিণাম দর্শনে শিহরিয়া উঠ কেন? নরহত্যা পাপের মধ্যে গণ্য হইবে, চৌর্য্য, দস্যুতা অধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, সে সকল কার্য্যের মধ্য দিয়া সে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠাতা ও সহায়কারিগণের প্রকৃতিগত শোচনীয় পরিণামদর্শনে শিহরিয়া উঠিবে, আর যাগযজ্ঞ, শৌচসদাচার, ধ্যানধারণা,সাধন-উপাসনা প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের অনুষ্ঠানগুলিকে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মানিবে না, তাহার অন্তরালে যে সদ্ভাব সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যদিয়া যে অনুষ্ঠাতার প্রকৃতিগত সদ্বৃত্তিগুলি ফুটিয়া বাহির হইতেছে সেদিকে লক্ষ্য করিবে না, ইহা কিরূপ যুক্তি, ইহা কিরূপ বিবেচনা আমরা তাহার মর্ম্মগ্রহণে একেবারে অসমর্থ।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, যে ক্রিয়া মানুষের ভাবানুগত, অর্থাৎ যে সকল ক্রিয়া তাহার আভ্যন্তরিক প্রেরণা দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, সে সকল ক্রিয়ার সহিত তাহার আন্তরিক যোগ, সে সকল অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়া তাহার অন্তঃশক্তির বাহ্যবিকাশ স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হইলেও মানুষের সকল ক্রিয়াকেই সে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত নহে। প্রতিনিয়ত এরূপ ক্রিয়া শত শতই সংঘটিত হইতেছে, যাহার মূলে স্থূল দৃষ্টিতে কতগুলি বাহ্য ঘটনা ব্যতীত অন্তঃপ্রেরণার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক স্থলে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধমূলক ধর্ম্মকার্য্যগুলিও সে শ্রেণীরই অন্তর্গত হইয়া পড়ে। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, যে যাগযজ্ঞ, শ্রাদ্ধতর্পণ, পূজা-উপাসনাদি ক্রিয়াকলাপ যথাযথরূপে সম্পাদিত হইতেছে, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ প্রতিপালিত হইতেছে, বাহিরের আবার আচার-অনুষ্ঠানে শাস্ত্রের মর্য্যাদা, ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে, কিন্তু সে সকল অনুষ্ঠানের মূলে অনুষ্ঠাতার অন্তর হইতে কোনও একটা বিশেষ প্রেরণা আসিতেছেনা, সে সকল

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাহার কোনও একটা সদ্‌বৃত্তির বিকাশের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। চিরাগত সংস্কার অথবা অন্য কোনও বাহ্য কারণে বাহিরে বাহিরেই যেন তাহা অনুষ্ঠিত হইয়া যাইতেছে। আমরা এ জাতীয় অনুষ্ঠানের প্রশংসা করি না, কিন্তু যাহারা এ জাতীয় অনুষ্ঠানগুলিকে ধর্ম্মনামের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া মনে করেন, এবং ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ প্রবঞ্চনা মানুষের পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত ও অকল্যাণকর বিবেচনা করিয়া সমাজ হইতে অনুষ্ঠানগুলির উচ্ছেদসাধনে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করাও আমাদের পক্ষে অসাধ্য। এ জাতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষের অন্তর্হিত ধর্ম্মবৃত্তিবিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তা বলিয়া মানুষের ধর্ম্মসাধনায় যে সে জাতীয় অনুষ্ঠানের কোনওরূপ উপযোগিতা নাই একথা বলাও অসঙ্গত। প্রকৃতির অভ্যন্তরে কোনও একটা বিশেষ ভাব বা শক্তির স্ফুরণ হইলে তাহা যেমন মানুষের বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-প্রণালীর মধ্য দিয়া তাহাদের জড়ানোন্মন ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার বিরুদ্ধে আপনার অনুকূল এক একটা তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে স্বীয় অনুরূপ পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহিরে ক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করে, এবং বাহিরের ক্রিয়াও তাহার আত্মলাভের সহায়স্বরূপ বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় যেরূপ সেই আভ্যন্তরিক শক্তির রাগেই রঞ্জিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বাহিরে এক এক রূপ ক্রিয়া এক এক জাতীয় অনুষ্ঠান বারবার অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে যে সকল ক্রিয়ার তরঙ্গ মানুষের মন বুদ্ধি মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয় পথে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে করিতে তাহাদের জড়ানোন্মন, তদ্রূপ অবস্থাও বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াগুলিকে স্বীয় অনুকূলরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া, মনুষ্যপ্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, এবং অন্তর্নিহিত স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ ভাব বা শক্তিগুলিকে জাগাইয়া দিয়া আভ্যন্তরিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন সংঘটন করে। এইরূপে সেই সেই ক্রিয়ার অনুকূল অভ্যন্তরস্থিত প্রচ্ছন্ন শক্তি বা ভাবগুলি জাগ্রত হইয়া মন, বুদ্ধি, মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াসকলকে স্বীয় প্রবাহের উপযোগীরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া সেই সেই ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানরূপে বাহিরে বিকাশ লাভ করে। তখন যে সকল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া মানুষের আভ্যন্তরিক অবস্থাই সূচিত হয়, এবং সে সকল অনুষ্ঠান তখন অন্তর শক্তির

বিকাশরূপ ধর্ম্মের আখ্যাগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে। এরূপ মানুষের ভাব-বিহীন বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহার আভ্যন্তরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ও তাদৃশ ভাবানুগত ক্রিয়ার সম্প্রসারণ কোনও প্রকার আকস্মিক বা বিস্ময়কর ঘটনা নহে।

অনেকস্থলেই দেখা যায়, সঙ্গদোষ অথবা সেরূপ অন্য কোনও কারণে অনেক পবিত্র চরিত্র ভ্রষ্ট হইয়াছে, অনেক দেবমন্দির পিশাচের ঘৃণিত আবাসে পরিণত হইয়াছে, একদিন যাহাকে কুপ্রবৃত্তির ছায়ামাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই, হয়ত আজ তাহার এরূপ শোচনীয় অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে যে তাহার হৃদয়ে যেন আর কোনও প্রকার সদ্বৃত্তিরই স্থান নাই। তাহার আচারে ও ব্যবহারে প্রতিনিয়তই যেন পাশববৃত্তিগুলি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এই যে অধঃপতন, ইহার পূর্ব্বাপর সমস্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে একদিনে ইহা সংঘটিত হয় নাই। যেদিন প্রথম ইহার সূত্রপাত হয়, যে অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়া সয়তান প্রথম ইহাকে আশ্রয় করে, হয়ত সে অনুষ্ঠান সেদিন ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। সহযোগিগণের প্রেরণা অথবা অন্য কোন কারণে তাহা সংঘটিত হইয়াছিল মাত্র। তখন তাহার শরীর তাহাতে যোগদান করিয়াছিল, হস্তপদাদি বহিরিন্দ্রিয়গণও তাহার সহায়তা করিয়াছিল, কিন্তু সে সময়েও তাহার মন তাহা অনুমোদন করে নাই, বরং ভিতরে ভিতরে থাকিয়া বিদ্রোহাচরণই করিতেছিল। তখনও তাহার মনের অবস্থা এরূপ নহে যে কোনওরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া অবনত মস্তকে সেরূপ নীচক্রিয়ার ভার বহন করিতে পারে। তাই তাহার মনে থাকিয়া থাকিয়া কেবল তাহার অনুষ্ঠানের অযথার্থতার বিষয়ই উদিত হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাবও আসিতেছিল, এবং আর কখনও এরূপ কার্য্যে যোগদান করিবে না মনে মনে এরূপ প্রতিজ্ঞাও যে না করিতেছিল তাহাও নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে আবার সেইরূপ কারণের সংঘটন হইল, আবার সেরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন হইল, মন এবারও যে বিদ্রোহভাব প্রকাশ করিলনা তাহা নয়, কিন্তু তাহার তীব্রতা পূর্ব্বাপেক্ষা এবার কিছু কম। এইরূপে সেরূপ ক্রিয়া যতই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, মনের বিদ্রোহিতাও ততই

শান্তভাব ধারণ করিল, অবশেষে সর্ব্বপ্রকার বিদ্রোহ ভাব পরিত্যাগ করিয়া মন সে সকল ক্রিয়ার সহায়তাই করিতে লাগিল। এইরূপে মন বুদ্ধি প্রভৃতির ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইল। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতিগত সদ্বৃত্তিগুলি অন্তর্হিত হইয়া গেল, অন্তরে ও বাহিরে পাশব প্রবৃত্তির রুক্ষ তরঙ্গবিপাকে একটী মানুষ আর একটী মানুষে পরিণত হইল। কাজেই ভাবহীন বাহ্য ক্রিয়ার যে কোনওরূপ উপযোগিতাই নাই একথা বলা সঙ্গত নহে। একারণেই হিন্দুসমাজে এরূপ ক্রিয়া সমর্থিত হইয়া আসিতেছে এবং ইহার দ্বারা ধর্ম্মবিকাশের সহায়তা হয় বলিয়া ইহাও ধর্ম্মনামে অভিহিত হয়। যাহাদের প্রকৃতিতে ধর্ম্মভাব স্বভাবতঃ তত প্রবল নহে তাহারা এ জাতীয় অনুষ্ঠানগুলিকেও যদি ধর্ম্মের আবর্জ্জনা বলিয়া পরিত্যাগ করে, আমরা বুঝিতে পারি না তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে আর কিপ্রকারে ধর্ম্মের বিকাশ লাভ সম্ভব হইতে পারে।

শুনিয়াছি কেহ কেহ নাকি ধর্ম্মের বাহ্যপরিণাম বা বহির্বিকাশকে ধর্ম্মসাধনার অনুকূল বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, ধর্ম্ম কোনওরূপ বাহিরের বস্তু নহে, ধর্ম্ম মানুষের আভ্যন্তরিক পদার্থ, অভ্যন্তরপ্রদেশই তাহার উপযুক্ত ক্রিয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাহার আবার বাহ্য বিকাশের আবশ্যকতা কি? অন্তরে অন্তরে ধর্ম্মকে জাগাইয়া তুল, ভিতরে ভিতরে তাহার চিরস্নিগ্ধ পবিত্রস্পর্শ অনুভব করিতে থাক, মনে মনে তাহাকে আশ্রয় করিতে চেষ্টা কর, বাহিরে তাহার কোনও রূপ পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। অন্তরের দেবতাকে অন্তরেই থাকিতে দেও, বাহিরে তাহাকে লইয়া টানাটানি করিও না।

যাঁহারা এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উক্তির সত্যতা-সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া ধর্ম্ম মানুষের প্রকৃতিস্বরূপ অন্তরঙ্গ পদার্থ, ধর্ম্মদ্বারাই মানুষের মানবত্ব সংগঠিত হইয়া থাকে, মনুষ্যত্ব মানুষের ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। ধর্ম্মের এই ভাবটীকে লক্ষ্য করিয়াই তাহাকে আভ্যন্তরিক পদার্থ নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম মানুষের অন্তরেও নহে, বাহিরেও নহে।

ধর্ম্মবিষয়ে অন্তর ও বাহির কল্পনা একটা কথার কথা মাত্র। ধর্ম্ম মানুষের আত্মাতেই * বিরাজিত, আমিত্বেই প্রতিষ্ঠিত। এক কথায় মানুষের ধর্ম্ম মানুষেতেই সংস্থিত রহিয়াছে। মানুষের এই আত্মা বা আমি, তাহার শরীরের অভ্যন্তরস্থ একটা শক্তিময় অবস্থাবিশেষ বলিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মকেও আভ্যন্তরিক পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ইহাই ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক স্থিতির প্রকৃত অর্থ। যদি আমাদের এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের এই আমি যখন যেরূপ অবস্থায় থাকে, মানুষের ধর্ম্মও তখন তাহার সঙ্গে যেরূপ অবস্থায়ই অবস্থান করে। মানুষের আত্মা বা আমি যখন শক্তিময়রূপে শরীরের আভ্যন্তরে অবস্থিত, তখন তাহার ধর্ম্মও অভ্যান্তরস্থিত শক্তিময় পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু আবার সেই আমিই যখন বাহিরে ক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করে, একটা পরিবর্ত্তনের মধ্যদিয়া সেই আমিই যখন শক্তিময় অবস্থা হইতে বাহিরে ক্রিয়ার আকারে পরিণত হয়, তখন তাহার সেই রূপান্তরিত আমি বা ক্রিয়ারূপ অবস্থার মধ্যে তাহার ধর্ম্মেরও তৎকালোচিত বাহ্য বিকাশ স্বাভাবিক বিষয়।

আমিত্বের বহির্ব্বিকাশ ব মানুষের শক্তিময় অবস্থার ক্রিয়ারূপে বাহ্য পরিণতি কাহারও কাহারও নিকট একটা অপ্রকৃত অলীক কল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু অধ্যাত্মতত্ত্বের চিন্তাশীল অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, ইহারই সত্যতাসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার কোনই কারণ নাই। কতকগুলি ভাব, সংস্কার বা বিশেষ বিশেষ শক্তির দ্বারাই মানুষের আমিত্ব সংগঠিত হইয়া থাকে। এই সংস্কার বা শক্তিসমষ্টিই মানুষের "আমি"। বাহিরের সকল ক্রিয়া সে শক্তিসমূহেরই কার্য্য, সেই শক্তিসমূহই বাহিরে ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হয়. মানুষের আমি সেই শক্তিসমূহ হইতে অভিন্ন বস্তু। তাহা হইলে বোধ হয় একথা বলা অসঙ্গত নহে যে, ক্রিয়ার মধ্যদিয়া মানুষের শক্তিময় আমি বা শক্তির মানুষই বাহিরে প্রকাশিত হয়। বাহিরের ক্রিয়া মানুষের আভ্যন্তরিক শক্তিময় অবস্থারই বাহ্যরূপ

* এস্থলে আত্মা বলিতে আমরা ব্যবহারিক আত্মাকেই বুঝিবে।

যাঁহারা ধর্ম্মের কোনও রূপ বাহ্যক্রিয়া বা বাহিরের অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী নহেন আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের এরূপ ধারণার প্রকৃত হেতু কি? বাহিরে মানুষের আভ্যন্তরিক আমি বা শক্তিময় সূক্ষ্মস্বরূপের স্থান হইতে পারিলে, সেই সঙ্গে তাহার অভ্যন্তরস্থ শক্তিস্বরূপ ধর্ম্মেরও একটু স্থান হইতে পারিবে না কেন? ধর্ম্ম যদি মানুষের আত্মা বা আমির মধ্যগত কোনও পদার্থ হয়, তাহা হইলে সেই আমির অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ধর্ম্মের অবস্থার পরিবর্ত্তন নিতান্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার এরূপ মনে করিবার কারণ কি? তোমার অভ্যন্তরস্থ "আমি" ফুটিয়া বাহির হইতেছে, প্রতিনিয়ত ক্রিয়ার মধ্যদিয়া ভিতরের শক্তিময় তুমি বাহিরে ছুটিয়া বেড়াইতেছ, তাহাতে তোমার কোনরূপ সন্দেহ হইতেছে না, কিন্তু কখনও কোন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়া তোমার সেই শক্তিরূপ ধর্ম্মের কোনও রূপ বহিঃপ্রকাশ দেখিলে এরূপ চমকিয়া উঠিতেছ কেন? তুমি বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছ, কিন্তু তোমার ধর্ম্মকে সঙ্গে রাখিতে চাহিতেছ না। ধর্ম্মহীন জগতে বেড়াইবার তোমার এরূপ অস্বাভাবিক আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে কেন? হিন্দুর ধারণা এরূপ নহে, হিন্দু জানে ধর্ম্ম তাহার সঙ্গের সঙ্গী, তাহার আত্মার যতদিন বাহিরের দিকে গতি আছে, বাহিরে ততদিন তাহার ধর্ম্মেরও স্থান আছে। ধর্ম্মও তাহার আত্মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তাহার আত্মাও তাহার সকল অবস্থার মধ্যেই ধর্ম্মকে অন্বেষণ করে।

শ্রীরসিকলাল ভট্টাচার্য্য।

প্রার্থনা।

বিবেকরহিত প্রকৃতি দূষিত,
ভজনে সাধনে উদাসীন চিত,
অজ্ঞান তামসী, দারিদ্র্য রাক্ষসী,
রয়েছে সদাই ঘেরিয়া।
বল গো জননি!
কোন বল লয়ে, জুড়াইব হিয়ে,
কোন গুণে তোমা ডাকিব॥

অকৃতি সন্তান, তাই গো কমলে!
নাহিক আশ্রয় ও পদ কমলে,
এবে—কোন ভক্তি বলে, কোন শতদলে,
কোন্ রূপে তোমা পূজিব।
বল গো জননি!
ঘৃণিত অধম পশুর মতন,
কিরূপে জীবন যাপিব।

দুখের আগুন হইয়া প্রবল,
দহিছে অন্তর, করিতে শীতল,
না দেখি উপায়, বিনা অশ্রুজল,
(তাই) দিবা নিশি তারে ঢালিব।
শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে, বচনে,
মা গো! মা বলিয়া কাঁদিব॥

আহ্বানে ক্রন্দনে, তোমার পরাণে,
বাজে না কি ওগো ভারতি!
তাহে নাহি দুখ, দশজন মুখ
চাহি, রাখ এক মিনতি ॥
করুণা বরষি, সস্নেহে আশিষি,
অনিমিষ আঁখি রাখিয়া,
বিশুদ্ধ প্রকৃতি, পাল গো "শাশ্বতী"
রাখ মা শাশ্বতী করিয়া ॥

কৃতী কর্ম্মী পুত্রগণে করি নিয়োজিত,
করাও মা "শাশ্বতী"র কার্য্য সম্পাদন,
অমৃতসদৃশ ভাষা করিয়া বর্ষিত,
সমাজ দেশের কর মঙ্গলসাধন।
তব আশীর্ব্বাদে লভি অক্ষুণ্ণ গৌরব,
"শাশ্বতী" ঘোষে মা যেন তোমার বৈভব

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শাশ্বতী প্রথম খণ্ড। শ্রাবণ, ১৩২০। ৪র্থ সংখ্যা।

কৃতজ্ঞতা।

তুমি মোরে এই বিশ্বে যা করেছ দান,
তাহার তুলনা নাই হে দেব মহান্!
প্রতিদিন শশী ভানু আলো দিয়ে যায়,
অনিল সদাই মম লেগে থাকে গায়!
বর্ষণ করিলে তুমি পান করি জল,
গ্রীষ্ম দূরে যায় চলে ধরণী শীতল!
ছয় ঋতু নানারূপ ফল প্রসবিয়া,
আমারে করিছে দান তৃপ্ত মোর হিয়া।
হে বিশ্বদেবতা! তব কাননের ফুল,
আমার পরাণ নিত্য করিছে আকুল!
যা দিয়েছ তাহা মোর মহামূল্য ধন,
ভুলিতে দিয়োনা কভু থাকিতে জীবন।
কল্পতরু তুমি দেব চরণে তোমায়,
কৃতজ্ঞ অন্তরে আজি করি নমস্কার।

শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী।

বেদ।

(২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, বেদ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, এই দুই ভাগের নাম মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। বেদের রচনানুসারে অর্থাৎ বেদবাক্যাবলী শ্লোক, গীতি ও গদ্যময় বলিয়া বেদ তিন ভাগে বিভক্ত, এই জন্য বেদত্রয়ী নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে। যজ্ঞকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে বেদ পুনরায় চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে। অন্য প্রকারেও বেদ আবার চারি ভাগে বিভক্ত, যথা মন্ত্র, বিধি, অর্থবাদ ও বিধ্যর্থবাদবিলক্ষণ, ব্রহ্মবাদ। পূর্ব্ব প্রবন্ধে কথিত হইয়াছে যে, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায় বিজ্ঞাপিত করে বলিয়া বেদের বেদ নাম হইয়াছে। বেদের বিধিভাগ দ্বারাই মুখ্য ভাবে উক্ত উপায় জ্ঞাপিত হয় বলিয়া, আর্য্যগণ বিধিভাগেরই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। এই বিধির দ্বারাই বেদ আর্য্যগণকে কার্য্যবিশেষে প্রবৃত্ত হইতে, কোন কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিতে, বা কার্য্যবিশেষ হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়া থাকে। বেদ আর্য্যগণকে যে কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়া থাকে, তাহারই নাম ধর্ম্ম ও যাহা হইতে নিবৃত্তির উপদেশ দিয়া থাকে, তাহাই অধর্ম্ম। তাই জৈমিনি তাঁহার মীমাংসাদর্শনে "চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" অর্থাৎ যে বিষয় বেদোক্ত প্রবর্ত্তক বাক্যের দ্বারা লক্ষিত হয় তাহাই ধর্ম্ম, ও শবর স্বামী মীমাংসাদর্শনভাষ্যে "চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকবচনম্" অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্যকে চোদনা কহে, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আবার জৈমিনি বেদের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁহার মীমাংসাদর্শনে লিখিয়াছেন, "দৃষ্টোহি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনং নাম।" বেদের অর্থ (মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন) কর্ম্মের অববোধন (কার্য্যের জ্ঞাপন) দৃষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ বেদ প্রধানতঃ কার্য্যবিশেষে প্রবৃত্তির ও কার্য্যবিশেষ হইতে নিবৃত্তির উপদেশ দিয়া থাকে। (প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপ্রয়োজনত্বাজ্জ্ঞানস্য)।

বেদের এই বিধিভাগকে অবলম্বন করিয়া অপর দুই ভাগের অর্থাৎ মন্ত্র ও অর্থবাদ ভাগের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। বিধিভাগ যে বিষয়ের উপদেশ দিয়া থাকে, অর্থবাদ তাহার প্রশংসা বা নিন্দা দ্বারা সেই বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা বা বিরক্তি উৎপাদন করায়, বিধিভাগের সহায়তা করিয়া থাকে। মন্ত্রভাগও বিধিভাগকে ক্রিয়ার উপযোগী দ্রব্য ও দেবতাদির বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করিয়া বিধিভাগের সাহায্য করিয়া থাকে। বেদ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপদেশ দিয়া থাকে, কর্মকাণ্ডে প্রধানতঃ অভ্যুদয়ফলক অনুষ্ঠানাদির বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, সেজন্য জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসায় বেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "দৃষ্টোহি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনং নাম" এইরূপ লিখিয়াছেন। আবার বেদ নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষের উপদেশ দিয়া থাকে, একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, তজ্জন্য বেদান্তে ব্রহ্মের উপদেশ আছে। ইহা বিধি ও অর্থবাদ হইতে ভিন্ন বলিয়া ইহাকে তদুভয়বিলক্ষণ ব্রহ্মবাদ বলা যাইতে পারে। এ জন্য মধুসূদন সরস্বতী এই অংশকে লক্ষ্য করিয়া "বিধ্যর্থবাদোভয়বিলক্ষণং তু বেদান্তবাক্যং" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অর্থবাদভাগ আবার তিন ভাগে বিভক্ত, যথা অনুবাদ, গুণবাদ ও বিদ্যমানবাদ বা ভূতার্থবাদ। যে বিষয় প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় (অর্থাৎ বেদবাক্য ব্যতীত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণলব্ধ), তদ্বিষয়বোধক বাক্যকে অনুবাদ কহে। যে বিষয় বেদবাক্য ব্যতীত অন্য প্রমাণের বিরুদ্ধ, তদ্বিষয়বোধক বাক্যকে গুণবাদ কহে। যে বিষয় বেদবাক্য ব্যতীত অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অথচ অন্য প্রমাণের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয় না, তাহাকে বিদ্যমানবাদ বলে। * এই তিন প্রকার অর্থবাদই বিধিবাক্যের

* "ধর্ম্মব্রহ্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয়ং প্রমাণং বাক্যং বেদঃ স চ মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকঃ, তত্র মন্ত্রা অনুষ্ঠানকারণভূতদ্রব্যদেবতাপ্রকাশাঃ তেপি ত্রিবিধা ঋগ্যজুঃসামভেদাৎ, ব্রাহ্মণমপি ত্রিবিধম্ বিধিরূপং অর্থবাদরূপং তদুভয়বিলক্ষণঞ্চ, প্রাশস্ত্যনিন্দান্যতরলক্ষণয়া বিধিশেষভূতং বাক্যমর্থবাদঃ স চ ত্রিবিধঃ গুণবাদোঽনুবাদো ভূতার্থবাদশ্চেতি"।

ইতি প্রস্থানভেদে মধুসূদনসরস্বতী

বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদ স্তদ্ধানাদর্থবাদ স্ত্রিধা মতঃ॥

স্তুতি বা নিন্দা প্রকাশ দ্বারা নিজের অর্থবত্তা রক্ষা করে। বেদাচার্য্য জৈমিনি তাঁহার দর্শনে মীমাংসা করিয়াছেন যে, বেদের বিধিভাগই প্রমাণস্বরূপ যন্ত্র-বিধির উপযোগী দ্রব্যদেবতাদির প্রকাশ করিয়া এবং অর্থবাদ বিধিবোধিত বিষয়ের স্তুতি বা নিন্দার দ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি বা বিরক্তি উৎপাদন দ্বারা বিধিবাক্যের সহিত অন্বিত হইয়া নিজ নিজ অর্থবত্তা রক্ষা করিয়া থাকে।

"বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ। বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি।" এই একটি ব্রাহ্মণ বাক্য। "ইহার বায়ব্যং শ্বেত মালভেত ভূতিকামঃ" অর্থাৎ সম্পৎকামী বায়ু দেবতার উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ পশু আলম্ভন (হনন) করিয়া যজ্ঞ করিবে, এই অংশটি বিধি। বায়ু দেবতা ক্ষিপ্রতমগামিনী, যজমান স্বীয় ভাগধেয় দ্বারা তাঁহার সন্নিহিত হয়, তিনি যজমানের সম্পৎপ্রাপ্তি বিধান করেন, এই অংশটি অর্থবাদ। ইহাতে বায়ু-দেবতার গুণ বর্ণনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধিবিষয়ে যজমানের রুচি উৎপাদনের দ্বারা বিধিবাক্যের সহায়তা করা হইতেছে, এই জন্যই ইহার অর্থবত্তা, স্বতন্ত্রভাবে এই বাক্যের কোন সার্থকতা নাই। বায়ু যে ক্ষিপ্রগামী ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, এজন্য ইহাকে অনুবাদ বলা যাইতে পারে। "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্" অর্থাৎ অগ্নি হিমনিবারক (অগ্নি হিমের ঔষধ) ইহা অর্থবাদ অংশ। অগ্নি দ্বারা হিম নিবারণ হয়, ইহা বেদ-বাক্য ব্যতীত প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, এজন্য ইহাও অনুবাদ। "আদিত্যো যূপঃ" অর্থাৎ আদিত্য যূপ (পশুবন্ধনার্থ সংস্কৃত দারুবিশেষ)। অর্থবাদগত এই অংশ প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিরোধী, কারণ, আদিত্য কখনও যূপ বলিয়া উপলব্ধ হয় না। এই বাক্য দ্বারা যূপের তেজস্বিত্ব বর্ণন করা হইতেছে, সুতরাং প্রমাণান্তর বিরোধী বলিয়া ইহা গুণবাদ। আবার "বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ" অর্থবাদগত এই অংশ বেদবাক্য ব্যতীত অন্য প্রমাণগম্য নয়, অন্য প্রমাণ-

* "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্।" মীমাংসা সূত্র ১।২।১

"বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ।" মীমাংসাসূত্র ১।২।১

বিরোধীও নয়। কারণ ইন্দ্র যে বজ্রহস্ত নয়, তাহা কেহ বলিতে পারেনা। এজন্য এই অংশে ইন্দ্রের স্বরূপ বর্ণন করিতেছে বলিয়া বিদ্যমানবাদ বা ভূতার্থবাদ। এইরূপে বেদোক্ত মন্ত্রগুলি কখন দ্রব্যদেবতাদির স্বরূপ অনুবাদ রূপে, কোন স্থানে গুণবাদরূপে এবং কোন স্থানে ভূতার্থবাদরূপে প্রকাশ করিয়া বিধির সহায়তা করিয়া থাকে।

ব্রহ্মস্বরূপপ্রকাশক "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি বেদান্তবাক্য বিধি বা অর্থবাদ নহে। ইহা স্বতন্ত্র ভাবেই প্রমাণস্বরূপ, এজন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যদ্যপি অন্যত্র বেদবাক্যের বিধিসংস্পর্শ ব্যতীত প্রামাণ্য নাই, তথাপি আত্মবিজ্ঞানপ্রকাশক বেদান্তবাক্যের স্বতঃ প্রামাণ্য প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে না। *

পূর্ব্বকথিত বেদের এই চারি প্রকার বিভাগের মধ্যে বিধিপ্রকাশক বাক্য ও ব্রহ্মপ্রকাশক বাক্যগুলি স্বাধীন ভাবে প্রমাণস্বরূপ। "অবাধিতা জ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বং হি প্রামাণ্যম্" অর্থাৎ যাহা অন্য প্রমাণের দ্বারা বাধিত নয় ও যাহা পূর্ব্বে জ্ঞাত হওয়া যায় নাই, এরূপ বিষয়ের বিজ্ঞাপন দ্বারাই প্রমাণের প্রমাণত্ব নিশ্চিত হয়। যাহা অন্য প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় বা যাহা পূর্ব্বে জ্ঞাত আছে, এরূপ বিষয়ের উপদেশ বেদ মুখ্যভাবে প্রদান করে না। যাহা অন্য প্রমাণের বিষয় নহে মানবগণের হিতসাধনের জন্য কৃপাপরবশ হইয়া বেদপুরুষ তাহারই উপদেশ দিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা গেল যে, এভাবে বেদের মন্ত্রভাগের প্রাধান্য নাই। বিধিভাগের উপকারকভাবে মন্ত্রের উপযোগিতা আছে।

এই বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বিশেষরূপ লক্ষ্য করা উচিত বলিয়া মনে হয়। কারণ আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদানুসরণ করিয়া অনেকেই ঋক্‌বেদের মন্ত্রভাগ দ্বারা প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া মন্ত্রভাগই প্রকৃত বেদ, অপর অংশ বা ব্রাহ্মণভাগ পরবর্ত্তী ঋষিগণের কুসংস্কারপ্রসূত অদ্ভুত অনুষ্ঠানপ্রকাশক বাক্যাবলীমাত্র এইরূপ

* "যদ্যপ্যন্যত্র বেদবাক্যানাং বিধিসংস্পর্শমন্তরেণ প্রমাণত্বং ন দৃষ্টং তথাপ্যাত্মবিজ্ঞানস্য ফলপর্য্যন্তত্বাৎ ন তদ্বিষয়স্য শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং শক্যং প্রত্যাখ্যাতুম্" ইতি ১।১।৪ সূত্রভাষ্যে।

কথা বলিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, অতি প্রাচীন কালে আর্য্যগণ সূর্য্য বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থগুলি দেখিয়া ভীত বা বিস্মিত হইয়া যে স্তবাকারে শ্লোকময় রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই ঋগ্বেদের মন্ত্র নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে। পরবর্ত্তী কালে আবার নানারূপ অনুষ্ঠান প্রণালী তাহার সহিত যুক্ত হয়। পরে সেই অনুষ্ঠান প্রনালীর বর্ণনা প্রভৃতির জন্য ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল যখন রচিত হয়, তখন ঋষিগণ ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাই শেষে নানা আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া উপনিষদের ব্রহ্মবাদ হইয়াছে। এই সব কারণেই তাঁহারা ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগের প্রাধান্য দিয়া থাকেন ও তাহারই বিশেষরূপ আলোচনা করেন। আর্য্যগণ কিন্তু ঋগ্বেদকে ও চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহাদের মতে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল অগ্রে রচিত হইয়াছিল বলিয়া সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হইয়াছে এরূপ নহে। তাঁহারা সকল মন্ত্রকেই একরূপ ভাবে দেখেন। যজ্ঞকার্য্যের জন্যই মন্ত্রের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনের সুবিধার জন্য এক এক কার্য্যের উপযোগী মন্ত্রগুলি এক এক ভাবে সজ্জিত হইয়া মণ্ডলাকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা রচনার কালানুসারে (chronological order) মন্ত্রগুলি সজ্জিত করিয়া ঋগ্বেদসংহিতা করেন নাই। বেদবিধিবোধিত যজ্ঞাদি কার্য্যের জন্যই তাঁহারা মন্ত্রের আলোচনা করিতেন। এই যজ্ঞাদি কার্য্যের স্বরূপ অনুপূর্ব্বক্রমে যজুর্ব্বেদেই বর্ণিত আছে, এজন্য তাঁহারা যজুর্ব্বেদেরই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালের প্রধান বেদব্যাখ্যাতা সায়নাচার্য্য তাঁহার মাধবীয় যজুর্ব্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, "আনুপূর্ব্যেন কর্ম্মণাম্ স্বরূপং যজুর্ব্বেদে সমাম্নাতং • • • তথা সতি ভিত্তিস্থানীয়ো যজুর্ব্বেদঃ চিত্রস্থানীয়বিতরৌ, তস্মাৎ কর্ম্মসু যজুর্ব্বেদস্য প্রাধান্যম্" অর্থাৎ অনুপূর্ব্বক্রমে যজ্ঞাদি কর্ম্মের স্বরূপ যজুর্ব্বেদেই কথিত হইয়াছে। • • • তাহা হইলে যজুর্ব্বেদই ভিত্তিস্বরূপ, অপর বেদ দ্বয় (সাম ও ঋগ্বেদ) চিত্রস্বরূপ। কোন একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে অগ্রে ভিত্তির প্রয়োজন হয়। ভিত্তি দ্বারা গৃহ নির্ম্মিত হইলে তাহার সজ্জার জন্য চিত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে, চিত্রাদির দ্বারা গৃহ সজ্জিত হইয়া মনোরম আকার ধারণ করে। তদ্রূপ যজ্ঞরূপ গৃহের মূলভিত্তিই

যজুর্ব্বেদ, সেই গূঢ় সাম ও ঋগ্বেদ দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া মনোজ্ঞ আকার ধারণ করিয়াছে। আমরা প্রবন্ধান্তরে যখন বেদত্রয়ের পর্য্যালোচনা করিব, তখন দেখাইব যে, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে নিগূঢ় কথার উল্লেখ আছে, পরবর্ত্তী উপনিষদে তাহাই বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীসাতকড়ি অধিকারী।

কবিকথা।

(কালিদাস)

অভিজ্ঞানশকুন্তল।

(৬)

এইবার অভিজ্ঞানের কথা। রাজার সন্দেহস্থলে যে অভিজ্ঞানের আশায় বুক বাঁধিয়া শকুন্তলা আপনার অঞ্চল অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই রাজদত্ত অঙ্গুরীস্বরূপ অভিজ্ঞানটি বাস্তবিকই তাঁহার অঞ্চল হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। শক্রাবতার মধ্যে শচীতীর্থে স্নানকালে অঙ্গুরীটি সলিলমধ্যে নিপতিত হয়, একটি রোহিত মৎস্য আবার তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। সেই রোহিত মৎস্যটি এক ধীবরের জালে পড়িলে, ধীবর তাহাকে বিক্রয়ের জন্য খণ্ড খণ্ড করিতে আরম্ভ করায়, তাহার উদর হইতে অঙ্গুরীটি বাহির হইয়া পড়ে। ধীবর পরমানন্দে যেমন সেই অঙ্গুরীটি বিক্রয় করিতে যাইতে-

ছিল, অমনি নগররক্ষক রাজশ্যালকের চক্ষে পড়ায়, তিনি তাহাকে চোর-জ্ঞানে রক্ষীর দ্বারা ধৃত করিয়া তাড়না করাইতে আরম্ভ করেন। ধীবর অঙ্গুরী চুরি করে নাই বলিয়া প্রকাশ করায়, রক্ষীরা বলিতে লাগিল, তবে রাজা কি তোমাকে সুব্রাহ্মণ দেখিয়া অঙ্গুরীটি দান করিয়াছেন? তাহার পর ধীবর অঙ্গুরীপ্রাপ্তির প্রকৃত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল, আপনাদের জীবিকা মৎস্যধরার জন্যই যে অঙ্গুরী প্রাপ্তি ঘটে, এই কথা বলার উদ্দেশ্যে সে জীবিকার উল্লেখ করিবামাত্র রক্ষীরা বলিয়া উঠিল যে, জীবিকার উপায়টি ত বেশ বিশুদ্ধ দেখিতেছি। তাহাতে ধীবর উত্তর করিল যে, যে কার্য্য স্বাভা-বিক তাহা নিন্দনীয় হইলেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে, করুণাপরবশ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞীয় পশুহননে কদাচ ক্ষান্ত হন না। তাহার পর সে শচীতীর্থ হইতে মৎস্য ধরা ও তাহার গর্ভ হইতে অঙ্গুরীপ্রাপ্তির কথা প্রকাশ করিলে, নগররক্ষক অঙ্গুরীতে আমিষগন্ধের ঘ্রাণ পাইয়া তাহার কথায় একেবারে অবিশ্বাস করিলেন না। তিনি ধীবরকে রক্ষীদের নিকট রাখিয়া অঙ্গুরী সহ রাজার নিকট গমন করেন। অঙ্গুরী হস্তে লইবামাত্র রাজার সমস্ত কথাই মনে পড়িয়া যায়, তিনি তৎক্ষণাৎ অঙ্গুরীর মূল্য ও পারিতোষিক দিয়া ধীবরকে নিষ্কৃতি দেওয়ার আদেশ প্রদান করেন। নগর-রক্ষক তদনুসারে ফিরিয়া আসিয়া ধীবরকে ছাড়িয়া দেন।

অঙ্গুরীস্পর্শে রাজার মনে সমস্ত ঘটনা স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল, তিনি যারপরনাই অধীর হইয়া পড়িলেন। শকুন্তলার প্রত্যা-খ্যান তাঁহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইতেছিল, সেই সময়ে আবার বসন্তোৎসব, রাজার আদেশে কিন্তু উৎসব নিষিদ্ধ হইল। পরিচারি-কারা সকলে তাহা জ্ঞাত না থাকায়, চূতমঞ্জরী ভঙ্গে প্রবৃত্ত হইলে, কঞ্চুকী আসিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া রাজাজ্ঞা শুনাইয়া দিলেন, এবং আরও বলিলেন যে, লোকের কথা দূরে থাকুক, বনরাজি পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশপালনে রত হইয়াছে। তাহার প্রমাণ এই যে, ঐ দেখ, বহুদিন-বিনির্গত চূতমঞ্জরীতে আজিও পরাগ দেখা যাইতেছে না। কুরুবক কোরকা-বস্থাতেই রহিয়াছে, শিশির গত হইলেও কোকিলের কণ্ঠখলন যায় নাই। এমন কি মনে হইতেছে, স্বয়ং কামদেবকেও ভীত হইয়া তূণার্দ্ধকৃষ্ট

শারক প্রতিসংহার করিতে হইয়াছে। পরিচারিকারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কঞ্চুকী তাহাদের নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন, এবং অঙ্গুরী-প্রাপ্তির পর হইতে রাজার যে অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাও জানাইয়া কহিলেন যে, রাজার এক্ষণে কোন সুন্দর বস্তুতে আস্থা নাই, অমাত্যগণের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আলাপনও করেন না, শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া থাকেন, অন্তঃপুরবাসিনীদের বিশেষ অনুরোধে কোন কথার উত্তর দিলেও তাঁহাদের নামভ্রম করিয়া লজ্জিত হইয়া উঠেন। তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথনের সময় রাজাও মাধব্যের সহিত সেইদিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন। পরিচারিকারা তাহা জানিতে পারিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। রাজার সংবাদ লওয়ার জন্য মেনকা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সানুমতী নামে অপ্সরা অলক্ষ্যে থাকিয়া এই সমস্ত পরিদর্শন করিতেছিলেন। কঞ্চুকী রাজাকে দেখিয়া বলিতেছিলেন যে, এই উৎকণ্ঠিত অবস্থাতেও রাজাকে ভাল লাগিতেছে। যাহাদের আকৃতির বিশিষ্টতা আছে, তাহারা সকল অবস্থাতেই সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। মহামণিকে ঘর্ষিত করিলেও তাহার দীপ্তির জন্য যেমন তাহাকে ক্ষীণ বলিয়া বোধ হয় না, তেমনি আমাদের মহারাজ সমস্ত ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কণকবলয় ধারণ করিলেও, এবং তাঁহার শরীরে পাণ্ডুতা ও নয়নে আরক্তিমা দেখা দিলেও, তিনি নিজ তেজঃপ্রভাবে রমণীয়ই দেখাইতেছেন। রাজা আসিতে আসিতে বলিতে লাগিলেন, "প্রথমে প্রিয়তমার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াও মুগ্ধের ন্যায় ছিলাম, এক্ষণে হতহৃদয় অনুতাপ-দুঃখে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে।" কঞ্চুকী রাজাজ্ঞাপ্রতিপালনের কথা বলিয়া রাজাদেশেই নিষ্ক্রান্ত হইলেন, রাজা প্রতিহারীকেও মন্ত্রীর নিকট রাজ-কার্য্যের ভার গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিলেন। জনশূন্য দেখিয়া মাধব্য বলি-লেন, "এক্ষণেত এস্থান নির্মক্ষিক হইল, আইস আমরা এই রমণীয় প্রদেশে কিছুকাল অতিবাহিত করি।" রাজা প্রিয়াবিরহজন্য চ্যুতাঙ্কুর দেখিয়া কষ্ট বোধ করিলে, মাধব্য যষ্টির দ্বারা তাড়িতে উদ্যত হইলেন। রাজা বলিলেন, "নিবৃত্ত হও, তোমার ব্রহ্মতেজ দেখা গেল, এক্ষণে চল, কোন একটি স্থানে বসিয়া প্রিয়ার অনুরূপ লতায় প্রতি দৃষ্টি করিয়া চিত্তকে শান্ত করিবার চেষ্টা করি।" মাধব্য উত্তর দিলেন, "বেশ কথা, চল মাধবীমণ্ডপে যাই,

তথায় তোমার অঙ্কিত শকুন্তলার চিত্র দেখা যাইবে।" তাহার পর তাঁহারা মাধবীমণ্ডপে মণিশিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া শকুন্তলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "সখে, তুমিত সমস্ত কথা জানিতে, তবে তুমি আমাকে কেন স্মরণ করাইয়া দেও নাই।" মাধব্য কহিলেন, "আমিও একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, বিশেষতঃ তুমি শকুন্তলাবৃত্তান্ত সত্য নহে বলিয়া আমাকে বুঝাইয়া দেওয়ায়, মৃৎপিণ্ডবুদ্ধি আমি তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম।" ক্রমে শকুন্তলার কথা চিন্তা করিতে করিতে রাজা অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। মাধব্য তাঁহাকে শান্ত হইতে বলিয়া কহিলেন, "তোমার এরূপ বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সৎপুরুষেরা শোকে কখনও গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করেন না, প্রবল ঝটিকাতেও পর্ব্বত কখনও বিচলিত হয় না।" রাজা বলিলেন, "তাহা সত্য হইলেও আমার প্রত্যাখ্যানের পর প্রিয়তমা তপস্বীদিগের সহিত যাইতে ইচ্ছা করিলে, যখন গুরুতুল্য কণ্বশিষ্য তাঁহাকে থাকিবার জন্য তিরস্কার করিয়া উঠেন, তখন অশ্রুপরিপূর্ণ নয়নে প্রিয়তমা এই ক্রূরের প্রতি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাই আমাকে শল্যের ন্যায় বিদ্ধ করিতেছে।" মাধব্য বলিলেন, "আচ্ছা, শকুন্তলাকে কে লইয়া গেলেন?" রাজা উত্তর দিলেন, "সম্ভবতঃ তাঁহার মাতা মেনকাই সেই পতিদেবতাকে লইয়া গিয়া থাকিবেন।" মাধব্য কহিলেন, "তাহা হইলে আবার সমাগমের আশা করা যাইতে পারে। কারণ, পিতা মাতা কি কখনও কন্যার কষ্ট সহ্য করিতে পারেন?" রাজা উত্তর দিলেন, "বয়স্য শকুন্তলার দর্শন আমার ভাগ্যে স্বপ্ন, বা মায়িক ব্যাপার, কিম্বা মতিভ্রম ঘটনার ন্যায়, অথবা জন্মান্তরীয় ক্ষীণ পুণ্যের ফলস্বরূপ একবার মাত্রই ঘটিয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, একেবারেই অতীতের গর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। তটাভিহত তরঙ্গরাশি যেমন একটীর পর একটী পতিত হইয়া অদৃশ্য হইতে থাকে, তেমনি তাহার প্রাপ্তির আশা এক একবার উদয় হইয়া হৃদয়কে আঘাত করিয়াই আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে।" মাধব্য বলিলেন, "তোমার এরূপ চিন্তা করা উচিত নহে। শকুন্তলার সমাগম যে কখনও হইবে না এরূপ বলা যায় না। অঙ্গুরী আবার যে করগত হইবে ইহা কে জানিত?" রাজা কহিলেন, "এই অঙ্গুরীটির

পুণ্যফলও দেখিতেছি আমার ন্যায় ক্ষীণ, তাহা না হইলে, যে সেই অনিন্দ্যসুন্দরীর অঙ্গুলীতে স্থান লাভ করিয়াছিল, সে আবার ভ্রষ্ট হইবে কেন?" মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বয়স্য, তাঁহার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীটি সন্নিবেশিত করিয়াছিলে কেন?" রাজা উত্তর দিলেন, "রাজধানী আসার সময় প্রিয়তমা সজলনয়নে বলিয়াছিলেন, কতদিন পরে আমার সংবাদ লইবে। আমি তখন তাঁহার অঙ্গুলীতে আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীটি পরাইয়া বলিয়াছিলাম যে, এক এক দিবসে ইহার এক একটী অক্ষর গণনা করিয়া যেদিন তাহা শেষ হইবে, সেই দিনই তোমাকে লইতে আমার লোকজন আসিবে। কিন্তু মোহান্ধ আমি তৎসমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তাহার পর অঙ্গুরীটিও শচীতীর্থে পড়িয়া যায়। আমিই যখন তাঁহার সম্মান রক্ষা করিতে পারি নাই, তখন এই অচেতন অঙ্গুরী কি করিয়া তাঁহার গুণ গ্রহণ করিবে?" রাজাকে উত্তরোত্তর বিচলিত হইতে দেখিয়া মাধব্যের মনে তাঁহার স্থিরমস্তিষ্ক সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে লাগিল। এই সময়ে পরিচারিকা শকুন্তলার চিত্র লইয়া উপস্থিত হইল। চিত্র দেখিয়া মাধব্য অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "চিত্রে সমস্ত বিষয় প্রকৃতরূপে অঙ্কিত হয় না, তথাপি যতদূর সম্ভব তুলিকার দ্বারা তাঁহার লাবণ্য পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা হইয়াছে।" চিত্রে শকুন্তলা ও তাঁহার সখীদ্বয়ও অঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাও চিত্রিত হয়। মাধব্য শকুন্তলার একটি চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "যাঁহার শিথিলকেশবন্ধনের জন্য কবরী হইতে কুসুমরাশি বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, বদনে স্বেদবিন্দু দৃষ্ট হইতেছে, ও বাহুদ্বয় নত হইয়া পড়িয়াছে, এবং যিনি তরুণপল্লবযুক্ত চূতপাদপের পার্শ্বে ঈষৎপরিশ্রান্তার ন্যায় রহিয়াছেন, তিনিই শকুন্তলা, অন্য দুইজন সখী বলিয়াই বোধ হইতেছে।" রাজা বলিলেন, "তুমি যথার্থই স্থির করিয়াছ। তদ্ভিন্ন আমার ভাবচিহ্ন স্বেদ ও অশ্রুপতনের নিদর্শনও আছে।" তাহার পর রাজা স্বহস্তে চিত্রখানি লইয়া বলিতে লাগিলেন। "সাক্ষাৎ প্রিয়তমাকে উপস্থিত দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহাকে চিত্রার্পিত করিয়া সম্মান দেখান হইতেছে। সলিলপরিপূর্ণ স্রোতস্বিনী পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে মরীচিকাই আমার আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছে।" মাধব্য আর কি কি

অঙ্কিত করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা কহিলেন যে,"স্রোতস্বিনী মালিনীকে অঙ্কিত করিয়া তাহার সৈকতে হংসহংসীকে চিত্রিত করিতে হইবে, হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে হরিণগণের বিচরণ দেখাইতে হইবে। আর ঋষিদিগের বল্কলসংলগ্ন শাখাযুক্ত তরুগণের তলদেশে কৃষ্ণসার মৃগের শৃঙ্গে মৃগীর বামনয়নকণ্ডূয়ন অঙ্কিত করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন প্রিয়ার কর্ণে কপোলপরিচুম্বী শিরীষকুসুম ও বক্ষঃস্থলে শারদজ্যোৎস্নাতুল্য কোমল মৃণালহারও সন্নিবেশিত করিতে হইবে।" শকুন্তলার আর একটি চিত্র দেখিয়া মাধব্য বলিলেন যে, "রক্তকুবলয়শোভিত হস্তাগ্রের দ্বারা শকুন্তলা মুখ আবরণ করিয়া চকিতার ন্যায় রহিয়াছেন কেন?" তাহার পর বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া নিজেই বলিলেন যে, বুঝিয়াছি, কুসুমরসচোর মধুকরটী তাঁহার বদনে পড়িবার উপক্রম করিতেছে। এই কথায় রাজার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইল, তিনি চিত্রকে সজীব মনে করিয়া অঙ্কিত মধুকর যাহাতে শকুন্তলার বদনে নিপতিত না হয় তজ্জন্য অনেক অনুনয়বিনয় করিতে লাগিলেন. পরে তাহাকে কমলোদরে বদ্ধ করার ইচ্ছা করিলে. মাধব্য তাঁহার বিকৃত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "বয়স্য ইহা চিত্রমাত্র।" সে কথায় রাজার মোহ গত হইল বটে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আমি তন্ময় হৃদয়ে প্রিয়ার সাক্ষাদ্দর্শনসুখ অনুভব করিতেছিলাম, কিন্তু সখে, তুমি স্মরণ করাইয়া দেওয়ায়, তিনি আবার চিত্রিতা হইয়া উঠিলেন। বয়স্য! এ অবিশ্রান্ত দুঃখ আর কত সহ্য করিব? স্বপ্নে তাহার সমাগম জাগরণে রুদ্ধ হইয়া যায়। বিগলিত অশ্রুধারা তাঁহার চিত্রকেও দেখিতে দিতেছে না।" যে পরিচারিকা চিত্রপট আনিয়াছিল, অবশিষ্টাংশ অঙ্কনের জন্য সে উপকরণাদি আনিতে যায়। ফিরিয়া আসিবার সময় রাজ্ঞী বসুমতী তাহার নিকট হইতে তৎসমস্ত কাড়িয়া লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইতেছিলেন। পরিচারিকার নিকট তাহা শুনিয়া রাজা অভিমানিনী রাজ্ঞীর ভয়ে মাধব্যের হস্তে চিত্রফলক প্রদান করিয়া তাঁহাকে তথা হইতে পলায়ন করিতে বলিলেন। মাধব্য পলায়ন করিলে প্রতিহারী তথায় পত্রহস্তে উপস্থিত হইল। পত্র সহ প্রতিহারীকে আসিতে দেখিয়া রাজা রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন জানিয়া রাণী অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করেন। যে পত্রখানি প্রতিহারী লইয়া আসিয়া-

ছিল মন্ত্রী তাহা রাজাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে, ধনমিত্র নামে বণিক সমুদ্রপথে বিনষ্ট হওয়ায়, অপুত্রক তাহার ধন রাজারই প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রাজা তাহার কোন পত্নী অন্তঃসত্ত্বা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রতিহারী কহিল যে, তাহার এক পত্নী অযোধ্যা-বাসী শ্রেষ্ঠীর কন্যা গর্ভবতী আছে শুনিয়াছি। রাজা বলিলেন, "গর্ভস্থ সন্তানও ধনাধিকারী, সুতরাং তাহার সন্তান হইলে সেই ধনলাভ করিবে, এই কথা মন্ত্রীকে গিয়া জ্ঞাপন কর, এবং তাঁহাকে রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিতে বল যে যে সকল প্রজা বন্ধুহীন হইবে, দুষ্মন্তই তাহাদের বন্ধুস্থানীয় হইবেন।" তাহার পর রাজা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানে আপনাকে অপুত্রক বলিয়া বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন যে, আমার পর হইতে আর আমার বংশে যথাশ্রুতি পিণ্ডোদক ক্রিয়া হইবে না। পিতৃ-গণ অতঃপর আমার হস্ত হইতে অশ্রুসিক্ত উদকই পান করিবেন। অপ্সরা সানুমতী এতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সমস্ত লক্ষ্য করিতেছিলেন, তিনি মেনকাকে সমস্ত সংবাদ প্রদানের জন্য তথা হইতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিতা হইলেন। এই সময়ে দেবকার্য্য সম্পাদনের জন্য রাজাকে স্বর্গে লইয়া যাইতে ইন্দ্রসারথি মাতলি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি রাজাকে উন্মনা দেখিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করার জন্য মাধব্যকে ধরিয়া পীড়ন করিতে আরম্ভ করি-লেন। মাতলি উচ্চৈঃস্বরে মাধব্যকে বলিতে লাগিলেন, "অভিনব রক্ত-লোলুপ শার্দ্দূল তোমাকে পশুর ন্যায় হনন করিতেছে, ধনুর্দ্ধারী দুষ্মন্ত এক্ষণে তোমাকে রক্ষা করুন।" মাধব্যও তাঁহার রক্ষার জন্য বারম্বার চীৎকার করিতে লাগিলেন। রাজা উত্তেজিত হইয়া ধনুর্গ্রহণে যেই অগ্রসর হইলেন, অমনি মাতলি মাধব্যকে পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "দেবরাজ অসুরদিগকেই আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের প্রতিই শরাসন আকর্ষণ করুন। সুহৃদ্‌দিগের প্রতি সাধুজনের প্রসাদসৌম্য দৃষ্টিই পড়িয়া থাকে, কদাচ দারুণ শর নিপতিত হয় না।" রাজা মাতলিকে দেখিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিলে, মাতলি বলিলেন, "আপনার সখা দেবরাজের আদেশ লইয়া আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। কালনেমির সন্তান দুর্জ্জয় নামে দানবগণের দমনের প্রয়োজন ঘটিয়াছে, তাহারা আপনার সখার অজেয়, কিন্তু

যুদ্ধে আপনিই তাহাদের নিহন্তা। নৈশ অন্ধকারকে সূর্য্য দূর করিতে পারেন না, কিন্তু চন্দ্রই সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।" রাজা বলিলেন, "দেবরাজের সম্মানে অনুগৃহীত হইলাম, কিন্তু মাধব্যের প্রতি আপনার এরূপ ব্যবহারের কারণ কি?" মাতলি বলিলেন যে, "আপনার চিত্তবিকার দেখিয়া উত্তেজিত করিবার জন্য ঐরূপ কৌশল করিয়াছিলাম। দেখুন, অগ্নি চালিত হইলেই জ্বলিয়া উঠে, সর্প ক্রুদ্ধ হইলেই ফণা উত্তোলন করে। সেইরূপ লোকে ক্রুদ্ধ হইলেই আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে।" তাহার পর রাজা দুষ্মন্ত মাধব্যের দ্বারা মন্ত্রীকে রাজকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য বলিয়া পাঠাইয়া, মাতলির সহিত তাঁহার আনীত রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

(৭)

রাজা দুষ্মন্ত স্বর্গে উপস্থিত হইয়া দেবকার্য্য সাধন করিলেন, দানবগণকে উন্মূলিত করায় স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়া গেল. দেবরাজ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দেবমণ্ডলীমধ্যে রাজাকে অর্দ্ধাসনে উপবেশন করাইয়া বক্ষানুলিপ্ত হরিচন্দনের দ্বারা অঙ্কিত মন্দারমালা আপনার কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। তাহার পর রাজা মাতলির সহিত রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। অবতরণের সময় তিনি দেবরাজের সৎকারের কথা বারম্বার মাতলিকে বলিতেছিলেন। বিশেষতঃ আগমনকালীন সম্মানকে তিনি যারপরনাই গৌরবের চিহ্ন মনে করিয়াছিলেন, মাতলি সে কথা শুনিয়া কহিলেন "দেবরাজ যেমন আপনার সৎকার করিয়াছেন, আপনিও তেমনি তাঁহার কম উপকার করেন নাই। কারণ আপনার কর্তৃকই এক্ষণে স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে।" রাজা উত্তর দিলেন, "প্রভু কর্তৃক নিযুক্ত হইলেই লোকে কার্য্যসাধনে সক্ষম হইয়া থাকে। সূর্য্যদেব অরুণকে রথাগ্রে না রাখিলে, তিনি কখনও অন্ধকার দূর করিতে সক্ষম হইতেন না।" মাতলি রাজার বিনয়ের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "দেখুন, স্বর্গলোকে আপনার কিরূপ যশ বিঘোষিত হইতেছে। ঐ দেখুন, সুরসুন্দরীদিগের অঙ্গরাগাবশেষ দ্বারা স্বর্গবাসিগণ কল্পলতাংশুকে আপনার গীতযোগ্য চরিত্র অঙ্কিত করিতেছেন।"

ক্রমে তাঁহারা অবতরণ করিতে লাগিলেন। স্বর্গে গমনকালে রাজা আকাশ পথের দিকে সেরূপ লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্বর্গপথের সমস্ত বিষয় অবগত হইতে লাগিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহারা মন্দাকিনী প্রবাহিত জ্যোতিষ্কসমন্বিত ত্রিবিক্রমের পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃত বায়ুপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর আবার মেঘপথে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন, তথায় চাতকগণ রথের অরবিবরে প্রবেশ করিয়া আবার তথা হইতে নিপতিত হইতে লাগিল, বিদ্যুদ্দামে অশ্বগণের অঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, এবং চক্রনেমিও জলকণায় আর্দ্র হইতে লাগিল, ক্রমে পৃথিবী নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে, তাঁহাদের এইরূপ অনুমান হইতেছিল, যেন উন্নত শৈলশিখর হইতে মেদিনী অবরোহণ করিতেছে। বৃক্ষসকলের স্কন্ধ পত্ররাশির মধ্য হইতে প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছে। ক্ষীণসলিলা স্রোতস্বিনীগণ সহসা সলিল বিস্তার করিয়েছে। এক কথায় কে যেন পৃথিবীকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহাদের নিকটে ফেলিয়া দিল। সেই সময়ে পূর্ব্বাপর সমুদ্রাবগাহী কণকদ্রবনিষ্যন্দী সান্ধ্যমেঘপ্রতিম হেমকূট পর্ব্বত দৃষ্ট হইলে, রাজা মাতলিকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতলি হেমকূটের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "উহা কিংপুরুষ বর্ষান্তর্গত এবং তপস্যার সিদ্ধিক্ষেত্র; এইখানে প্রজাপতি কশ্যপ সস্ত্রীক তপস্যায় নিরত আছেন।" রাজা বলিলেন, "তাহা হইলে ভগবান্‌কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।" মাতলি তাঁহার অভিপ্রায়ের প্রশংসা করিয়া রথ নামাইতে লাগিলেন। তাঁহার আকাশচারী রথের চক্র হইতে কোন শব্দ বা তদ্দ্বারা ধূলিও উত্থিত হইল না। রাজা কশ্যপাশ্রম কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, মাতলি হস্তের দ্বারা দেখাইয়া কহিলেন, "ঐ দেখুন, যেখানে বল্মীকস্তূপনিমগ্ন শরীরে, সর্পত্বক্‌লগ্ন বক্ষে, লতাবলয়বেষ্টিত কণ্ঠে, পক্ষিনীড়ব্যাপ্ত স্কন্ধে এবং জটাজালমস্তকে স্থাণুর ন্যায় মুনিপ্রবর সূর্য্যবিম্বের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন, সেই খানেই ভগবানের আশ্রম, রাজা সেই কষ্টতপস্বীকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর তাঁহারা কশ্যপ পত্নী অদিতিপরিবর্দ্ধিত মন্দারবৃক্ষসমন্বিত স্বর্গ হইতেও রমণীয় কশ্যপাশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। সেই অপূর্ব্ব তপোবনে অপূর্ব্ব তপস্যা দেখিয়া রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠি-

লেন। তিনি দেখিতেছিলেন, তপস্বীরা যে সমস্ত ফললাভের জন্ত তপস্যা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত ফল চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান থাকিতেও তথাকার তপস্বীরা আবার অন্ত ফলের আকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করিতেছেন, এই সমস্ত তপস্বীদিগের চতুর্দ্দিকে কল্পবৃক্ষের বন থাকিলেও তাঁহারা বায়ুর দ্বারাই প্রাণ ধারণে রত আছেন। কাঞ্চনপদ্মরেণু দ্বারা পিঙ্গলজলে তাঁহাদের ধর্ম্মাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। রত্নশিলাতলে ধ্যান এবং স্বর্গ নারীগণের নিকটে তাঁহারা সংযম অভ্যাস করিতেছেন। মাতলি বুঝাইয়া দিলেন যে, মহাজনদিগের বাসনা উত্তরোত্তরই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার পর তাঁহারা অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, ধর্ম্মপত্নী অদিতির প্রশ্নানুসারে প্রজাপতি কশ্যপই তাঁহাকে পতিব্রতা-ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করাইতেছেন। মাতলি দুষ্মন্তকে এক অশোক বৃক্ষতলে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিয়া প্রজাপতির নিকট রাজার আগমন সংবাদ প্রদানের জন্ত গমন করিলেন। এখানেও রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাজা বলিতে লাগিলেন, "আবার আমার বৃথা বাহুস্পন্দন হয় কেন; এক্ষণে আমি আর তাহার আশা পর্য্যন্ত করিতে পারি না, প্রাপ্তির কথা ত দূরে থাকুক। যে কল্যাণকে পূর্ব্বে দূরে পরিহার করিয়াছি, এক্ষণে তাহার দুঃখে পরিণতি ব্যতীত আর কি হইতে পারে?" এই সময়ে একটি বালক ক্রীড়ার জন্ত একটি অর্দ্ধপীতস্তন সিংহশিশুর কেশরাকর্ষণ করিয়া তাহার মাতার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক লইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাপসীরা তাহাকে নিষেধ বা ভয় প্রদর্শন করিলেও সে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলনা। তাহাদের মধ্যে জনৈক তাহাকে কোন ক্রীড়নক দানে শান্ত করার ইচ্ছায় কুটীর হইতে মৃত্তিকানির্ম্মিত ময়ূর আনিতে গমন করিলেন। বালক ততক্ষণ সেই সিংহশিশুকে আকর্ষণ করিতেই লাগিল। তাপসীরা তাহার নিবারণের জন্ত নিকটে কেহ আছে কি না জানিতে ইচ্ছা করিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাজা দুষ্মন্তের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নিপতিত হইলে, তাঁহারা বালকের হস্ত হইতে সিংহশিশুর উদ্ধারের জন্ত দুষ্মন্তকে অনুরোধ করিলেন, রাজা বালকের সাহস ও তেজ দেখিয়া তাহাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মনে করিতেছিলেন, এবং সে যখন ক্রীড়নকের কথা শুনিয়া হস্ত প্রসারণ করিল, তখন তাহার আকৃতিম ও

অঙ্গুলিগুলি কয়টিকে তিনি ঘনদলযুক্ত নবোষার ঈষৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় মনে করিতেছিলেন। তদ্ভিন্ন তাহাতে চক্রবর্ত্তী লক্ষণও দেখিতে পাইতেছিলেন। রাজা তাহার ঈষৎ বিকসিত দন্তপাতি ও অব্যক্ত মধুর বাণী শুনিয়া মনে মনে বলিতেছিলেন, "লোকে এই জন্যই পুত্র ক্রোড়ে করিয়া তাহার অঙ্গধূলিতে আপনাকেও ধূসরিত করিয়া থাকে।" রাজা তাপসীদিগের অনুরোধে বালকের নিকট অগ্রসর হইয়া তাহাকে মহর্ষিপুত্র সম্বোধনে কহিলেন যে, তুমি কৃষ্ণ সর্প শিশুর চন্দনতরুদূষণের ন্যায় জন্ম হইতেই তপোবনবিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা প্রাণিরক্ষাকর ও সুখকর সংযমকে দূষিত করিতেছ কেন? তাপসীরা কহিলেন যে, এ বালক ঋষিকুমার নহে। রাজা তাহার আকারানুরূপ কার্য্যে কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তবে এরূপ স্থানে ঋষিকুমার ব্যতীত আর কাহারও আগমন সম্ভাবনা নাই বলিয়া তিনি তাহাই অনুমান করিয়াছিলেন। পরে তিনি বালককে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্রই অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন, তৎক্ষণাৎ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "উহাকে স্পর্শ করিয়াই আমার যখন সুখবোধ হইতেছে, না জানি যাহার ক্রোড়ে এ বালক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহার স্পর্শে তাহার কত সুখ উপস্থিত হয়।" রাজা বালককে ধরিবামাত্র বালক শান্তভাব অবলম্বন করিল। তাপসীরা তাহা এবং রাজার ও বালকের আকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সে কথা প্রকাশও করিলেন। রাজা বালক কোন্ বংশে জাত জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা তাহাকে পুরুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন, এবং আরও বলিলেন যে, তাহার মাতা অপ্সরাসম্বন্ধে এই তপোবনে আসিয়া তাহাকে প্রসব করিয়াছে। রাজার মনে হইল যে, পুরুবংশীয়েরা রাজ্যপালন শেষ করার পর পরিণত বয়সে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মপত্নীসহ তপোবনে বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু অপ্সরাসম্বন্ধে তাহার মাতার আগমন শুনিয়া সন্দেহ হলে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহার মাতা কোন্ রাজর্ষির ধর্ম্মপত্নী। তাপসীরা বলিলেন, "আমরা সেই ধর্ম্মপত্নীত্যাগীর নাম মুখে উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা করি না।" রাজা তখন আপনাকে তাহাই মনে করিয়া কৌশলে ইহার মাতার নাম জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে মৃন্ময় ময়ূর হস্তে করিয়া কুটীরগতা

তাপসী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বালককে তাহা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস, শকুন্ত-লাবণ্য দেখ।" বালক তাহা শুনিয়া কহিল, "আমার মা কোথায়?" তাপসীরা রাজাকে বলিলেন, "এই বালকের মাতার নাম শকুন্তলা, শকুন্ত-লাবণ্য কথায় তাহার মাতার নামশব্দ শুনিয়া সে জননীর জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।" রাজাও মনে মনে অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইতে লাগিলেন। বালকের মৃন্ময়-ময়ূরে প্রীতি জন্মিল না। কিন্তু রাজার নিকটে থাকায় সে শান্ত ভাবই অবলম্বন করিল। এই সময়ে আর এক ব্যাপারও ঘটিল। বালকের জাতকর্ম্ম সময়ে তাহার মণিবন্ধে একটি ঔষধি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহা ভূমিতে পড়িয়া গেলে বালকের মাতা পিতা ও সে নিজে ব্যতীত যদি আর কেহ তাহা স্পর্শ করিতে যাইত, তাহা হইলে তাহা সর্প হইয়া দংশন করিত। সিংহ শিশুর আকর্ষণের সময় ঔষধিটি বালকের হস্ত হইতে পড়িয়া গেলে, রাজা তাহা উত্তোলন করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনই বিঘ্ন ঘটে নাই। তাপসীরা এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। তাঁহারা শকুন্তলাকে সংবাদ দিবার জন্য তথা হইতে গমন করিলেন। রাজার প্রত্যাখ্যানের পর শকুন্তলা মেনকা কর্তৃক আনীত হইয়া এই তপোবনেই অবস্থিতি করিতেছিলেন, এবং তথায় তিনি এই বালককেই প্রসব করেন। মহর্ষি কশ্যপ তাহার জাতকর্ম্ম সমাধান করিয়া বালককে সর্ব্বদমন নাম প্রদান করেন। পরে এই বালক ভরত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বালক সর্ব্বদমন রাজার নিকট হইতে মাতার সন্নিকটে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইতেছিল। রাজা বলিলেন, "পুত্র, চল, আমরা উভয়েই তোমার মাতার নিকট যাইতেছি।" বালক তাহাকে পুত্র সম্বোধনে উত্তর দিল, "তুমিত আমার পিতা নহ, দুষ্মন্তই আমার পিতা। এমন সময়ে শকুন্তলা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও পূর্ব্বে সানুমতীর নিকট হইতে রাজার অবস্থার কথা শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে ঔষধির কথা শুনিয়া মনোমধ্যে নানারূপ আন্দোলন করিতেছিলেন। রাজা তাঁহার সেই পরিধূসর বসন পরিধান, পরিক্ষাম বদন, একা বেণীধারণ, ও পরিশুদ্ধ স্বভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারই নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি সুদীর্ঘ বিরহব্রত পালন করিতেছেন। শকুন্তলার দৃষ্টিও রাজার প্রতি নিপতিত

হইল। তিনি দেখিলেন যে, রাজা তাঁহার অঙ্গনিধিকে ধরিয়া দণ্ডায়মান আছেন, বালক বলিল, "মা, এ কে আমাকে পুত্র বলিয়া ক্রোড়ে লইতে চাহিতেছে?" এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া শকুন্তলার শোক যেন উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজাও থাকিতে না পারিয়া কহিলেন, "মোহান্ধকারবিস্মৃত আমার সমক্ষে আমার প্রিয়তমাকে দেখিতে পাইতেছি। এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যেন রাহুমুক্ত চন্দ্রের নিকট রোহিণী অবস্থিতি করিতেছেন।" শকুন্তলা অশ্রু-কণ্ঠে বলিলেন, "আর্য্যপুত্রের জয় হউক।" রাজা কহিলেন, "তোমার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারিত জয়-শব্দে আমি জিত হইয়াছি।" বালক আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মা এ কে?" শকুন্তলা উত্তর দিলেন, "আপনার ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর।" এই সময়ে রাজা শকুন্তলার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "প্রিয়ে, পূর্ব্বের কথা সমস্ত ভুলিয়া যাও। কি এক মোহে তখন আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাই আমি অন্ধের ন্যায় শিরঃস্থিতা পুষ্পমালাকে সর্পভ্রম করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলাম।" শকুন্তলা রাজার হাত ধরিয়া উঠাইলেন। রাজা তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার অধরবিগলিত যে অশ্রু আমি পূর্ব্বে মুছাই নাই, এক্ষণে তাহাকে নয়ন হইতেই মুছাইতেছি।" তাহার পর শকুন্তলা কেমন করিয়া রাজা তাঁহাকে স্মরণ করিলেন জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা তাঁহার সেই স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখাইয়া কহিলেন যে, ইহাকে পাইয়াই সমস্ত কথা আমার স্মৃতিপথে উদয় হয়। তিনি তৎপরে সেই অঙ্গুরীটি শকুন্তলার অঙ্গুলীতে পুনর্ব্বার পরাইয়া দিতে গেলে, শকুন্তলা বলিলেন যে, উহা তোমার অঙ্গুলীতেই থাকুক। আমি আর উহাকে বিশ্বাস করিতে চাহি না। এই সময়ে মাতলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজাকে ধর্ম্মপত্নী ও পুত্রের সহিত মিলিত দেখিয়া তাঁহার যার পর নাই আনন্দ সঞ্চার হইল। তিনি রাজাকে কশ্যপের দর্শনলাভের জন্য যাইতে বলিলে, রাজা শকুন্তলা ও পুত্রের সহিত তথায় যাইতে ইচ্ছা করিলেন। শকুন্তলা কিন্তু স্বামীসহ গুরুজন সাক্ষাতে যাইতে লজ্জিত হইতেছিলেন। রাজা মঙ্গলোৎসব সময়ে কোন দোষ নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়াই প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন।

কশ্যপ সে সময়ে অদিতির সহিত একাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। দুষ্মন্তকে আসিতে দেখিয়া তিনি অদিতিকে বলিলেন, "ঐ দেখ, রাজা দুষ্মন্ত আসিতেছেন। ইঁহারই ধনুক তোমার পুত্র ইন্দ্রের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করায়, বজ্র একণে তাঁহার আভরণ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।" কশ্যপাদিতিকে দেখাইয়া মাতলি রাজাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। রাজা বলিতে লাগিলেন, "যাঁহাদের যুগল মিলন হইতে দ্বাদশাদিত্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, চতেশ্বর ইন্দ্র ও ভগবান্ বিষ্ণু যেখান হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, সেই সৃষ্টিকর্ত্তার একান্তর দক্ষমরীচিসম্ভূত ইঁহাদিগকে দেখিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিলাম।" রাজা তৎপরে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, শকুন্তলাও পুত্র সহিত তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। উভয়ে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করার পর কশ্যপ শকুন্তলাকে বলিলেন, "যাঁহার আখণ্ডলসম স্বামী ও জয়ন্তপ্রতিম পুত্র তাঁহার পক্ষে পৌলমীসদৃশী হও, ব্যতীত অন্য আশীর্ব্বাদ নাই।" অদিতিও তাঁহাকে "পতির আদরিণী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং সকলকে উপবেশন করিতে বলিলেন। সকলে উপবেশন করিলে কশ্যপ তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য শ্রদ্ধা, চিত্ত ও বিধি এই ত্রিতয়েরই সমাগম হয়, তেমনি কোন মহৎকার্য্য সাধনের জন্য সাধ্বী শকুন্তলা, তাহার সদপত্য, ও মহারাজ দুষ্মন্তের মিলন ঘটিয়াছে।" ঋষির এ বাক্যের অন্যথা হয় নাই। পরে তাহা উল্লিখিত হইবে। রাজা বলিলেন, "ভগবানের নিকটস্থ হইয়া প্রথমে অভীষ্টসিদ্ধি পরে দর্শনলাভ ঘটিল। অগ্রে কুসুমোদগম হয় পশ্চাৎ ফলোদয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মেঘ দেখা দেয় পরে বারিবর্ষণ হয়। সুতরাং প্রথমে কারণ এবং শেষেই কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহাই ক্রমনিয়ম। কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে ভগবানের দর্শনলাভের পূর্ব্বেই সম্পৎ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। রাজা শকুন্তলার প্রতি তাঁহার মতিভ্রমের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কশ্যপ দুর্ব্বাসার অভিশাপের জন্য সমস্ত ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করেন। অতএব ইহাতে তাঁহাদের কাহারও যে দোষ নাই সে কথাও বলিয়া দিলেন, শুনিয়া রাজা যারপর নাই প্রীত হইলেন, এবং শকুন্তলার হৃদয় হইতেও সন্দেহভার নামিয়া পড়িল। কশ্যপ শকুন্তলাকে বুঝাইয়াই বলিয়া দিলেন যে, শাপের জন্যই তোমার স্বামীর মোহময় হৃদয়ে তুমি স্থান পাও

নাই। এক্ষণে তাহা অপসৃত হওয়ায় তাহাতে তোমার মূর্ত্তি প্রতিভাত হই-তেছে। মলিন দর্পণে কখনও ছায়া প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু নির্ম্মল আদর্শেই তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তৎপরে পুত্র সর্ব্বদমনকে দেখাইয়া কশ্যপ কহিলেন, তোমাদের এই পুত্র অপ্রতিহত বলে জলধি অতিক্রম করিয়া সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা জয় করিবে। এখানে সকল প্রাণীকে দমন করার জন্য বালক সর্ব্বদমন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পরে সর্ব্ব লোককে ভরণ করিয়া ভরত আখ্যা লাভ করিবে। শুনিয়া রাজা ও শকুন্তলা প্রীতিলাভ করিলেন। বাস্তবিকই মহাপ্রভাব ভরত সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী জয় করিয়া ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার নামে যে ভারতবাসীমাত্রই মস্তক অবনত করিবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অতঃপর মহর্ষি কণ্বের নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইল। রাজাও প্রজাপতির আদেশে পত্নী ও পুত্রকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গরথে রাজধানী যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি প্রজাপালনে রত হইলেন। শকুন্তলাও দুষ্মন্তের গৃহে ও রাজ্যে তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন।

দুষ্মন্ত মূর্ত্তিমান রাজধর্ম্ম ও শকুন্তলা মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া। সাম্রাজ্যের প্রভাব ও তপোবনের শান্তি একত্র মিলিত হইয়াছিল। সেই মিলনের ফলে ভরতের উৎপত্তি। তিনিই আবার ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা। তাই ভারত-বর্ষের একদিকে যেমন সাম্রাজ্যের প্রভাব অভ্রভেদী হিমালয়ের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, তেমনি অপরদিকে শান্তির জাহ্নবীধারা কুল কুল স্বরে প্রবাহিত হইত। ঋষিবাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রদ্ধা, বিত্ত ও বিধির ন্যায় শকুন্তলা, ভরত, দুষ্মন্তের সমাগম হইয়াছিল। বাস্তবিক কর্ম্মানুষ্ঠান ও তদ্দ্বারা সুফল লাভের জন্য শ্রদ্ধা, চিত্ত ও বিধি এই তিনেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেই শ্রদ্ধা, চিত্ত ও বিধি স্বরূপ শকুন্তলা, ভরত ও দুষ্মন্তের সমাগমে যে কর্ম্মানুষ্ঠান হয়, তাহারই ফল এই ভারতবর্ষ। প্রকৃত কর্ম্মফলের ন্যায় এই কর্ম্মফলও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পিত হইয়া-ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, ইহাতে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সে কথা স্মরণ করিতে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, এবং আমরা তাহার সঙ্গে "যতঃ কৃষ্ণ ততো ধর্ম্মো

যতো ধর্ম্ম ততো জয়ঃ" এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকি।

ক্রমমুক্তি।

যিনি এই দেহের কর্ত্তা, কর্ম্মের সাক্ষী, যাঁহার ঈক্ষণ মাত্রে স্থূল সূক্ষ্ম তাবৎ যন্ত্র ও শক্তিগুলি আপনাপন কার্য্যে নিযুক্ত; যিনি না থাকিলে সবই শব;—অনেক সময়ে দেখা যায় তাঁহার ভূতগণ তাঁহারই কাঁধে চড়িয়া নাচিতে থাকে। খেলারাম ঘুঘুঘোর মৃত্যু হইয়াছিল ভূতের হাতে। সে কালে খেলারাম ঘুঘুঘোর মত ভূতের ওঝা কেহ না কি ছিল না। তাহা হইলে কি হয়, ভূতের ওঝাকে ভূতের হাতেই মরিতে হইবে। ইহা চিরন্তন নিয়ম। এ সংসারে সকলেই ভূত নাচাইতে, আবার ভূতের হাতে নাচিতে আসে আবার মরণও সেই ভূতের হাতে।

এক অনির্ব্বচনীয় আবরণ শক্তির প্রভাবে মানব আত্ম-হারা।

জীব অত্যন্ত স্বাধীনতা প্রিয়, অথচ তাঁহার তুল্য পরাধীন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। এই পরাধীনতার মাত্রা চরমে উঠিলে মানবকে কখনও কখনও বলিতে শুনা যায় "আঃ মরণ হয় ত বাঁচি"।

এই "মরণ হয় ত বাঁচি" কথাটার ভিতর একটু অর্থ আছে। অজীর্ণ রোগের রোগী রোগের যন্ত্রণায় এ কথা বলিতে পারে। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, মরণের পর পূর্ব্বের আহারটা যত জীর্ণ হউক বা না হউক, মন্দাগ্নির উপর জোর করিয়া কেহ খাওয়াইয়া দিবে না। সে অজ্ঞাত দেশে খাবার নাও মিলিতে পারে। আর সে দেশে নূতন করিয়া খাইবার প্রয়োজনও হয় না, শক্তিও থাকে না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত ভূতগণের মধ্যে দুইটা—ক্ষিতি আর অপ্‌—এখানে পড়িয়া থাকে, কেবল তাহাদের সারটুকু সঙ্গ

ছাড়ে না, বাকি তিনটা ভূত সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। সুতরাং লাভ হইতেছে এই যে, ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত সময়টা কেবল রোমন্থন করিয়া কাটাইতে হয়, নূতন করিয়া ঘাস খাওয়া ঘটে না। সে কার্য্যের জন্ম ভবধাম নির্দ্দিষ্ট, কারণ ইহা কর্মভূমি।

জীব অন্তরে অন্তরে লঘু, পরিচালক সত্বগুণকে ভালবাসেন। সত্বগুণ এক দিন তাঁহাকে নষ্ট স্বাধীনতা মিলাইয়া দিতে পারে এ প্রত্যয় তাঁহার আছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, কেন না, তিনি ত্রিগুণ-রজ্জু দ্বারা বদ্ধ, সাধ্য কি পলাইবেন। তথাপি পরীক্ষাস্থলে দেখিতে পাই, জীবের বাসনা যেমন এক দিকে বিশ্বগ্রাসী, অন্য দিকে তেমনি জীবন সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইলে উহার তীব্রতা একেবারেই নষ্ট হয়,—অবশ্য ক্ষণিকের জন্য,—তথাপি ইহা ঘটে। এই ক্ষণিক পরিবর্ত্তন জীবের পক্ষে শুভক্ষণ, যাহারা সিদ্ধির কামনা এই সময় উঁকি ঝুঁকি মারিয়া থাকে। দারুণ মনঃপীড়া আর সাধু সঙ্গ ব্যতীত অন্য সময়ে এই ইচ্ছা প্রায় জাগে না। ইহা মুমুক্ষত্ব নহে, ইহাকে পরিত্রাণের ইচ্ছা বলিতে পারা যায়। ইহার ফল অপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ, অপূর্ণ হইলেও ইহা পরম লাভ। এক দিক দিয়া দেখিলে যেমন বুঝা যায় যে, ইহাতে স্বার্থকতা আছে; অন্য দিক দিয়া দেখিলে ইহা সুনিশ্চিত বিবেচিত হইবে যে, সংসার-রণে ভঙ্গ দিয়া পুনরায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে ইহার তুল্য প্রবল সহায় আর দ্বিতীয় নাই। যে পরিত্রাণের কথা বলা হইতেছে তাহা যে কেবল মরণান্তেই ঘটে, তাহার পূর্ব্বে ঘটেনা, এমন কোনও কথা নাই; তাহা জীবনেও ঘটিয়া থাকে। রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকদিগের গানগুলি স্মরণ করিলে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

আত্মা স্বরাট্, অতএব স্বপ্রকাশ। জীব অবিদ্যার দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, যুগযুগান্তরগত স্বপ্ন-স্মৃতির ন্যায় জীবের এটুকু মনে আছে যে, "সর্ব্বমাত্মবশং সুখং"। জীবের এ প্রত্যয় স্বাভাবিক। তাই মায়াময় দেহে অবস্থিত হইলেও, মায়ার সহিত আপনি মাখামাখি ভাবাপন্ন,—তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াও স্বরাজের প্রত্যয়টি ভুলেন না। তাই বড় জ্বালায় যখন জ্বলিতে থাকেন, মরীচিকাতে জলভ্রম যখন ঘুচিয়া যায়, তখন দাশরথি রায়ের মুখ দিয়া তাঁহাকে বলিতে শুনি,—

দোষ কারও নয় গো মা।
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

আপনার প্রসার তখন গুটাইয়া আসে, স্বরাজ্যসিদ্ধির ক্ষীণ আশা বিদ্যুৎবৎ চমকিয়া উঠে। ভিতরে কি হইতেছে তাহার বিশ্লেষণে সমর্থ না হইলেও ইনি বেশ বুঝিতেছেন যে, একটা বৃহত্তর আত্মা ব্যতীত তাঁহার পরিত্রাণের উপায় নাই।

ইহাই হইল দ্বৈতজ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বর, জীবাত্মা ও জগতের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য জ্ঞানের সূচনা।

অবস্থা যখন এইরূপ অর্থাৎ একটা বৃহত্তর বা বৃহত্তম আত্মা ব্যতীত যখন জীবের পরিত্রাণের উপায় নাই তখন ব্যবস্থার কথা আপনা হইতেই উঠে। আরও এক কথা এই যে, জগতের সহিত সমানভাবে কারবার বজায় রাখিয়া চলা অসম্ভব। ইহাতে পদে পদে লাভলোকসান। আবার, মহিষবাহন আসিবার পূর্ব্বে সমাচার দেন না। যাহাদের হাত এড়াইবার জন্য এক দিন "মরণ হয় ত বাঁচি" বলিয়া মরণের কামনা করা হইয়াছিল, মহাযাত্রা-কালে সেই ভূতমহাশয়গণকে বুকে করিয়া শুভযাত্রা করিতে হইবে,— "বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" বায়ু যেরূপ গন্ধযুক্ত দ্রব্য পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া যায় তদ্বৎ। জীব তখন বায়ুবাহনে,—বায়ু কুসুমগুলির সারটুকু লইয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত,—কাযেই দলবলসহ মহাযাত্রা।

কিন্তু যাইবেন কোথায়?

কোথায় যাইবেন? ও কথা জিজ্ঞাসা করিও না। ও কথার উত্তর এক কথায় নাই। ও কথার উত্তর দিতে হইলে বিধাতার আসনে সিয়া বসিতে হয়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বর বা সয়তানের কল্পনা নাই। তবে ওকথার উত্তরে শাস্ত্র সকলে এইরূপ একটা কিছু বলিয়া থাকেন;—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাং স্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ। শ্রুতি।

যাহারা আত্মজ্ঞানরহিত অতএব অজ্ঞানী তাহারা শরীরপাতের পরে অন্ধ[illegible]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব

পরের প্রাণা অদর্শনাত্মক অর্থাৎ অন্ধতমসাবৃত লোকে গিয়া তথায় নরকভোগ করে ;—স্থাবরাদি হীনযোনি প্রাপ্ত হয়।

যদি ইহাই বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম হইল, যদি রাজা আর ভিখারীকে, ব্রাহ্মণ আর চণ্ডালকে এক দিন একই উপাদের শয্যায় শুইতে হইল, যদি সাধনাদিবর্জ্জিত অসংস্কৃত হৃদয়কে মানবজীবনের অগ্নি-পরীক্ষাতে বিশ্বাস করিতে না পারিল, যদি কর্ম্ম এবং শরীর গ্রহণ উভয়ের মধ্যে বীজাঙ্কুর সম্বন্ধই রহিয়া গেল,—এ সম্বন্ধের আর ছাড়াছাড়ি নাই—ইহাই সাব্যস্ত হইল, তখন সময় হাতে থাকিতে একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে বই কি।

কিন্তু ব্যবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে এখনকার দিনে একটু বিপদের আশঙ্কা আছে। ভবনদীর কাণ্ডারীগণ "পারে যাবার না" আনিয়া যাত্রীকে ঘিরিয়া কোলাহল করিবে। তখন যাত্রীর দশা, বাঁশবনে ডোমের দশার তুল্য হইবে। অনেকেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব নিরাপদে পারে যাইবার ইচ্ছা থাকিলে নদীর অবস্থা ও যাত্রীর যোগ্যতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা স্বতঃই আবশ্যক হইয়া পড়ে।

শাস্ত্র এখানে স্পষ্ট ও নির্ভীক। শাস্ত্র বলেন, যতদিন তোমার আমি বোধ থাকিবে, দেহাভিমান থাকিবে,—আমি ব্রাহ্মণ, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি পত্নী, আমি সুখী, আমি দুঃখী, এক কথায় ভেদজ্ঞান থাকিবে, তত দিন তোমাকে সগুণ ঈশ্বরের সহিত একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া,—তাঁহার সহিত পিতৃ, মাতৃ, প্রভু, পতি, পুত্র ইত্যাদি সম্বন্ধের মধ্যে, অধিকার অনুসারে, একটি মাত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া উপাসনা করিতে হইবে। ইহা হইল সাধনার প্রথমাবস্থা। এ অবস্থায় সেব্য সেবক ভাব থাকিবে, প্রার্থনা, বিরহ, মিলনাদি সবই থাকিবে। জীব, ঈশ্বর ও বাহ্যজগৎ এ তিনেরই পার্থক্য জ্ঞান থাকিবে। পরে সাধনার পরিপক্ব অবস্থায় যখন ঈশ্বরকে (ইষ্টদেবতাকে) নিজের আত্মস্বরূপ বলিয়া বুঝা যাইবে, যখন জীবাত্মা বলিয়া একটা পৃথক্ সত্তার বোধ অন্তর্হিত হইয়া যাইবে,—তদবস্থায় নিজের (জীবাভিমানী) আত্মার উপর পূর্ব্বে যে প্রীতি বা ভালবাসা ছিল, তাহা প্রকারান্তরে ঈশ্বররূপী স্বদয়স্থ আত্মার উপরই অর্পিত হইবে, এ-আমি ডুবিয়া যাইবে, সে-

আমি ইষ্টদেবতারূপে ভাসিয়া উঠিবে, তখনই উপাসনার সার্থকতা লাভ হইবে। তখন আর বড় একটা ভেদ জ্ঞান থাকিবে না। ইহাই হইল অদ্বৈত জ্ঞান অর্থাৎ আত্মা, জীব ও বাহ্যজগতের মধ্যে পরস্পর ঐক্য জ্ঞানের সূচনা।

সাধনার দুইটী অবস্থার কথামাত্র বলা হইল। ইহার পরে আরও দুইটি উচ্চতর স্তর আছে। সে কথা এখন থাক।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বাভাবিক প্রকৃতির দাস মানবকে বর্ণাশ্রমের মধ্য দিয়া কি প্রকারে স্তরে স্তরে ক্রমমুক্তির রাজ্যে যাইতে হইবে তাহার জন্য অতি পরিষ্কার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রামানুজ স্বামী প্রবর্ত্তিত দ্বৈতবাদ আসিয়া একটি বিশাল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্বে যে সাধনার দ্বিতীয় অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, যে অবস্থায় জীবেশ্বরের মধ্যে অভেদ জ্ঞান জন্মায়, যে জ্ঞান নিষ্কাম কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতর সাধন, সেই অদ্বয় জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া দ্বৈতবাদী বিবিধ জল্পনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের বিদ্রূপ, ভ্রূকুটি, গর্জ্জন ও কোলাহলের পরিচয় ধর্ম্ম ও সাহিত্য গ্রন্থাদিতে যথেষ্ট বিদ্যমান্।

এখন, দুই আমি-কে এক করা উচিত বলিলে তাঁহাদের পক্ষ হইতে অমনি কোলাহল উঠিবে। কি, তুমি আর তিনি এক? দেহধারী কলির জীবের মুখে এতবড় কথা? আকাশকুসুমের তোড়া বাঁধিয়া বন্ধ্যা নারীর পুত্রের শুভবিবাহে উপহার দিতে তোমাদের ইচ্ছা হইয়া থাকে দাও, আমরা কিন্তু এরূপ আপনাকে আপনি প্রতারিত করিতে পারিব না। জন্মমরণশীল, ইন্দ্রিয়ের ষোল আনা দাস তোমাতে ষড়্‌রিপু যৌরসীসত্ত্বে সত্ত্ববান্। তুমি অনন্ত বাসনা-আগুনে নিশিদিন দগ্ধ। তুমি দুই গাছি তৃণকে এক করিতে অশক্ত, তুমি কিনা সেই বিশ্বম্ভরে আর তোমাতে এক হইতে চাও? জগতের স্বাধীন অস্তিত্বের ষোল আনা প্রমাণ পাইতেছ, অথচ মুখে বলিতেছ, জগৎ স্বপ্ন, জগৎ মরীচিকা, জগৎ মায়া। তুমি উপনিষদাদির সাঙ্কেতিক ভাষার অর্থ যথার্থ উপলব্ধি করিতে অশক্ত, অতএব সময় থাকিতে সাবধান হও, নচেৎ হে অল্পায়ু মানব, তুমি আপনিই আপনার অনর্থ ঘটাইবে। ভাবিয়া দেখ, তিনটি পদার্থই স্বাধীন, তিনি, তুমি, আর এই বাহ্যজগৎ। সেবা,

সেবক, আর সেবার উপচার,—নূপুরমুখরিতচরণ, এই অযোগ্য হাতখানা, আর তুলসী বা বিল্ব,—এ তিনই স্বতন্ত্র। ক্ষুদ্র জীবকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলা, আর ভেককে ঐরাবতের স্বজাতি বলা একই কথা। উভয়ের চারিখানি পা আছে বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তুমি সেবা ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা কর। জগতের নাথের হাতে আপনাকে ও আপনার সংসারটিকে তুলিয়া দিয়া কেবল প্রসাদের অধিকারী হও। বাগানের মালীর মত ভাল ভাল ফুলগুলি তুলিয়া আনিয়া প্রভুর চরণে ঢালিয়া দাও। কলির মানবকে মোক্ষ মার্গ হইতে দূরে রাখিবার জন্যই শঙ্করাচার্য্যকৃত মায়াবাদের সৃষ্টি। ভক্তির উপর আর সাধনা নাই, সেব্য সেবক অপেক্ষা উচ্চ সম্বন্ধ নাই, রসিকের উপর সাধক নাই, (তা, কি শাক্তমতে, কি বৈষ্ণবমতে), প্রেমের উপর রস নাই, পরতত্ত্বের উপর তত্ত্ব নাই,—ইত্যাদি।

দ্বৈতবাদীর গর্জ্জনে অদ্বৈতবাদী বলিতে পারেন,—ভায়া, তুমিও যে তিমিরে, আমিও সেই তিমিরে। দুজনাই যখন এক পথের পথিক, তখন আপনারা রাগারাগি করিয়া ডাকাতগুলার সাহস বাড়াইয়া দিই কেন? দেখিতেছ না এপথের মোড়ে মোড়ে, এ নদীর বাঁকে বাঁকে ডাকাতের থানা? তা যদি হইল, তবে একটু চুপিসাড়ে সাবধানে হাসিতে হাসিতে পথ চলা কি ভাল নয়?

তুমি বলিতেছ, চরমতত্ত্ব ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম, তিনি নির্গুণ নহেন। আমি বলিতেছি, তিনি সগুণ নির্গুণ দুই। যখন সগুণ তখন তিনি ঈশ্বর, আর যখন নির্গুণ তখন তিনি ব্রহ্ম বা আত্মা। সাপের মাথাটাও যা ফণাটাও তা, প্রভেদ এই যে মাথাটা সঙ্কুচিত অবস্থায় আছে, আর ফণাটা বিকাশিত বা বিস্তৃত অবস্থায় আছে। ঈশ্বর নির্গুণ নহেন একথা বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়। আমার জ্ঞানের গণ্ডীর ভিতরে তাঁহাকে আনিতে আমি নারাজ। আমি তত বড়লোক হইতে চাই না। আমার অটল বিশ্বাস তিনি নিত্য, অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী এ সকল উপাধির অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহাকে নিত্য, অনাদি, অনন্ত বলিলে কালব্যাপ্তির অর্থ আসিয়া পড়ে, কিন্তু তিনি কালের বাহিরে। কাল তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি কালের সঙ্গে নাই। তাঁহাকে অনন্ত সর্ব্বব্যাপী বলিলে দেশব্যাপ্তি বুঝায়,

কিন্তু তিনি দেশের বাহিরে। দেশ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি দেশের সঙ্গে নাই। তবে, তুমি আমি দুজনেই যখন রাগদ্বেষাদির অধীন, তখন তোমার আমার হিতের জন্য তিনি সগুণ, অবশ্য সগুণ।

সগুণা নির্গুণা সা তু দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ॥ দেবীভাগবত।

তারপর কথা হইতেছে; আমি (জীব) জন্মমরণশীল, রাগদ্বেষাদির অধীন, এক কথায় ত্রিগুণরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ, অতএব আমি ক্ষুদ্র, দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদির তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। ভাল, এ ক্ষুদ্রত্ব কাহার? তুমি বলিবে আমার, আমি বলিতে চাই আমার নহে। দেখ, আমি (আত্মা) হাতীর উপাদানের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, ওতঃপ্রোতভাবে আছি বলিয়াই হাতীটা হাতী, আবার মশার উপাদানের মধ্যে ঐরূপে আছি বলিয়াই মশাটা মশা। এরূপ ছোট বড় করা আমার কায। আমি-কে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের কি ছোট বড় থাকে? কখনই নয়। দেখ, মরীচিকাতে যতক্ষণ জল দেখিব ততক্ষণ জলের প্রত্যয় থাকিবেই; আবার জলভ্রমটা ছুটিয়া গেলে তুমি মাথা কুটিলেও আমার জলের প্রত্যয় আসিবে না। ক্ষুদ্রত্ব, বৃহত্ব প্রভৃতি ঐরূপ এক একটা প্রত্যয় মাত্র। তাহা যদি হইল, তবে হাতী বড়, মশা ছোট, এটা জল, ওটা জল নয় এ সকল প্রত্যয়গুলি আমারই। আমি আছি বলিয়াই উহারা আছে। আমি না থাকিলে উহারা থাকিবে না, অথবা থাকিলেও উহাদের অস্তিত্বের সাক্ষী কেহ থাকিবে না। অতএব, আমি ক্ষুদ্র এ প্রত্যয় আমার ক্ষণিক, অর্থাৎ যতক্ষণ দুর্ব্বলতা বলিয়া একটা প্রত্যয়ের অধ্যাস হইতেছে ততক্ষণ মাত্র আমি দুর্ব্বল, অধ্যাস কাটিয়া গেলে আমি দুর্ব্বল নহি।

এখন একবার সুষুপ্তির কথাটা স্মরণ কর। ইহাকে দৈনন্দিন প্রলয় বলিতেও পার। তৎকালে সুখদুঃখ ইচ্ছা দ্বেষাদি এক কথায় অবিদ্যা কিছু কালের জন্য আমাকে ছাড়িয়া থাকে, কেন না তখন আমি পূর্ণমাত্রায় নিষ্কাম। আবার, যখনই জাগরণ তখনই অবিদ্যাচ্ছন্ন, অতএব সকাম। যদি জিজ্ঞাসা করি, এই নিষ্কাম—এই নিষ্ক্রৈগুণ্য অবস্থায় আমি (জীব)

কোথায় থাকি? আমি তখন কোথাও থাকিনা একথা তুমি বলিবে না, কারণ তোমার অসদ্-অপ্রত্যয় নাই।

প্রথমে দেখা যাক জাগ্রত অবস্থায় আমি কোথায় থাকি। আমি বুঝিতেছি যে, আমি কি বাহ্যজগতে কি অন্তর্জগতে যখনই কোন বিষয়ের সহিত অর্থাৎ আত্মেতর পদার্থের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া পড়ি—একাত্মতা প্রাপ্ত হই, তখনই যেন আর এক আমি আসিয়া সাক্ষীস্বরূপে আমার সেই পরিবর্ত্তন অর্থাৎ অনাত্মবস্তুতে আত্মাভিমান দর্শন করিতে থাকেন। এই আমির পারিভাষিক নাম বিষয়ী। জীব-আমি, অহর্নিশ সেই বিষয়ীর নির্নিমেষ নিষ্পন্দ দৃষ্টির সম্মুখে আছি। যাহা কিছু স্পন্দন কম্পন—এক কথায় কর্ম্ম সব আমারই, তাঁহার নহে। এই বিষয়ীর নিকট আত্মেতর তাবৎ পদার্থই বিষয়। জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় জীব—আমিও তাঁহার নিকট বিষয়। এখন দেখা যাক সুষুপ্তিকালে জীব-আমি কোথায় থাকি।

সুষুপ্তিকালে আমার অনাত্ম বস্তুতে আত্মাভিমান থাকে না, সুতরাং কোনরূপ কম্পন থাকে না, নিষ্কম্প প্রদীপতুল্য হইয়া পড়ি। সে অবস্থায় আমাকে দেখিবার কেহ থাকে না। দেখাইবার কিছু না থাকিলে দেখিবে কি? তখন আমার দেখাইবার কিছু থাকে না। তখন থাকে মাত্র জ্ঞান। সে পদার্থ তখন আর আমি-পদবাচ্য হইতে পারে না। কারণ জ্ঞেয় পদার্থের অভাব হইলে জ্ঞাতার অভিমানের লয় হইবার কথা। অবশিষ্ট থাকিল জ্ঞান। এই জীব-আমি তখন জ্ঞানমাত্রে অবস্থিত। সে জ্ঞানের তখন জ্ঞেয় বা বিষয় কে হইবে? কেহই নয়। আত্মা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে তিনি বিষয়ী না হইয়া বিষয় হইয়া পড়েন। অতএব তখন জ্ঞান বা জ্ঞানমাত্রে অবস্থিত জীবাভিমানশূন্য পদার্থ ও আত্মা (বিষয়ী) এক হইয়া পড়েন। যদি বল, যখন জ্ঞেয় পদার্থ থাকিল না, জ্ঞাতার কল্পনাও করা যায় না, তখন জ্ঞানের কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি, সুষুপ্তিতে জীব-আমির সমস্তই লয় হয় বলিব না কেন? তাহা বলিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে নিদ্রাভঙ্গের পর আমি যে সুষুপ্ত হইয়াছিলাম এ অসদ্-প্রত্যয় থাকিত না। কিন্তু সকলেরই তাহা থাকে, নিদ্রাভঙ্গের পরে অজ্ঞান-বোধক জ্ঞান থাকে।

তবেই বুঝা গেল, আমি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র নহি, এবং অবস্থা বিশেষে আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে স্বতন্ত্র নহি, আবার ব্যবহারিক জগতে আমি এ দুয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার কারণ এই যে, আমি মায়ার (অবিদ্যার) অধীন, আর মায়া ঈশ্বরের অধীন এবং ঈশ্বরকর্তৃক উপাদানস্বরূপে জগৎরূপে বিবর্ত্তিত।

এখন আমাদের এই মায়ার ভিতর দিয়া মায়ীকে ধরিতে হইবে।

মনে কর আমরা মায়া-চক্রের নেমিকে আশ্রয় করিয়া ঘুরিতেছি। আমাদের উভয়কে সেই চক্রের এক একটা পাখি ধরিয়া চক্র-নাভিতে উপস্থিত হইতে হইবে। ধর, সেই চক্র-নাভির মধ্যে ঈশ্বর অবস্থিত। এ চক্র অনন্ত কাল ধরিয়া ঘুরিতেছে। অনন্ত সৃষ্টবস্তু চক্রনেমির সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণিত, পিষ্ট, চূর্ণ হইতেছে। কদাচিৎ কেহ—"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু"—সাহস ও আশাযুক্ত হইয়া চক্রের এক একটা পাখি (অর) অবলম্বনে রথ-নাভির দিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কি জানি কেন, তোমার আমার মত অযোগ্য লোকেরও ঐ পথে যাইতে মতি হইয়াছে। ইহা ছাড়া আমিত আর কিছু দেখিনা। তবে তোমাদের মধ্যে এত গর্জন, এত কোলাহল কেন? তুমি যে এক নিশ্বাসে ভক্তি, রসিক, প্রেম, রস, পরতত্ত্ব প্রভৃতি কতকগুলা কথা বলিয়া ফেলিলে, এ অভ্যাসটা তোমাদের মধ্যে অনেকেরই আছে জানি; এগুলা ছাড়। একটু মুখ বুজিবার অভ্যাস কর, ভাল হইবে। একটু একটু করিয়া মৌনভাব ধর, তাহা না করিলে বুদ্ধি প্রদীপ্ত হইবে না। প্রদীপ্ত বুদ্ধি দর্পণ, দেবতা বিম্ব; যাহা দেখিবে সেটি প্রতিবিম্ব। সেই প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইলে পর, তোমার গুরু তোমার অধিকার অনুরূপ উপযুক্ত পথ দেখাইয়া দিবেন। তখন তাহা দ্বৈতমার্গ, কি অদ্বৈতমার্গ, তাহা লইয়া বাদানুবাদ করিবার তোমার আবশ্যকই হইবে না।

অদ্বৈতজ্ঞান সাধনাতে নিরঞ্জনের ভক্তির প্রয়োজন হয় না একথা যেন তোমার মনেও স্থান না পায়। আত্মযোগে ভক্তির প্রয়োজন না হইতেও পারে কিন্তু ঈশ্বরযোগ ভক্তি ব্যতীত হইতে পারে না। ভাবশূন্য ধ্যান অপেক্ষা ভাবগর্ভ ধ্যান শ্রেষ্ঠ। মনে রাখিও, আমরা ঈশ্বর-যোগের কথাই বলিতেছি। ইহার ফল নির্ব্বাণ মুক্তি নহে।

অদ্বৈত জ্ঞানের সাধক প্রথমে দেবতাময় হইয়া যান, পরে ব্যুত্থান শক্তি প্রদীপ্ত হইলে জগতে দেবতাকেই দেখেন। দ্বৈত জ্ঞানের সাধক প্রথমে আপনাকে দেবতাতে সমাহিত করেন, পরে ব্যুত্থানশক্তির আধিক্য হইলে জগৎকে দেবতাতে ধরিয়া রাখেন। তখন উভয় সাধকেরই নিকট দেবতা বিশ্বরূপ বা বিশ্বরূপা হইয়া পড়েন, দেশকালব্যবচ্ছিন্ন হন না, হইতে পারেন না।

এই অবস্থায় জীবাত্মার নষ্ট স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তি হয়। অদ্বৈতপথের সাধক তখন মায়াকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বাত্মাতে ও আপনাতে অভেদ-ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। আহার বিহারাদি যত প্রকার আত্ম-সেবা আছে, তাহার সমস্তই তখন সুতরাং দেবতার সেবা না হইয়া পারে না। তখনই তাঁহার সোঽহং জ্ঞান হয়। তিনি তখন সোঽহং জ্ঞানের কলসী বুকে করিয়া ভবনদী পার হইতে পারেন।

পক্ষান্তরে, যিনি দ্বৈতপথের সাধক তিনিও তখন নষ্ট স্বাধীনতা লাভ করেন। তিনি মায়াকে বশীভূত করিয়া বিশ্বাত্মাতে আত্ম নিবেদন করেন। তখন জগতে কেহই তাঁহার দত্ত উপহার গ্রহণ করিতে যোগ্য হয় না। তাঁহার সংসারের যাবৎ কারবার সেই একই ব্যক্তিকে লইয়া। তিনি বিশ্বাত্মায় নিবেদিত।

আমরা বিশস্ত সূত্রে অবগত আছি, এই সকল কথাবার্ত্তার পর উভয় ব্যক্তির মধ্যে সখ্য স্থাপিত হইয়াছিল। না হইবে কেন, সেই পরতত্ত্ব যে দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত।

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং বিজানন্তো দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্। কুলার্ণব।

শ্রীগুরুদাস সান্যাল।

করুণাময়ী।

মধ্যবঙ্গের কোন এক প্রসিদ্ধ পল্লীগ্রামে করুণাময়ীর শ্বশুরালয়। তাঁহার পিত্রালয়ও শ্বশুর-পল্লীর নিকটে—মাত্র দুই তিন মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। করুণাময়ী সম্পন্ন গৃহস্থের কন্যা। তাঁহার স্বামী একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় দেশমান্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন।

সেন মহাশয় প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হইলে উপযুক্ত পুত্রকন্যা বর্ত্তমান থাকিতেও দ্বিতীয়বার করুণাময়ীকে বিবাহ করেন। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ অদৃষ্ট-বাদী হিন্দুগৃহস্থের কন্যা করুণাময়ীর মুখে সেজন্য কেহ কখনও বিষাদ বা বেদনার চিহ্ন দেখে নাই। তিনি সে জন্য কোনও দিন নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন নাই। সেন মহাশয়ও কখন "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যো ঽপি গরীয়সী" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্ত্রীর অন্যায় আবদারে প্রশ্রয় দিয়া নিজ বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ও সংযমের অবমাননা করেন নাই।

বালিকা করুণাময়ী স্বীয় বিনয়নম্র ব্যবহার, প্রবীণোচিত সহিষ্ণুতা; নিরপেক্ষ বিচার ক্ষমতা ও বুদ্ধি বিবেচনাগুণে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সকলের শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণ করিয়া সেন মহাশয়ের বৃহৎ সংসারের কর্ত্রী হইয়া বসিলেন। তিনি যেদিকে না যাইতেন সেই দিকেই যেন একটা অপ্রতুল ও গোলযোগের সৃষ্টি হইত। তিনি যাহাকে নিকটে আসিয়া না খাওয়া-ইতেন—তাহার যেন খাওয়াই হইত না; এইরূপে করুণাময়ী বেশ সুশৃঙ্খলতার সহিত শান্তিতে সংসার চালাইয়া আসিতে ছিলেন। বন্ধু বান্ধবের মুখে তাঁহার প্রশংসা ধরিত না। পাড়া প্রতিবেশীগণ নিজ নিজ পুত্রবধূ ও কন্যাকে করুণাময়ীর ন্যায় আদর্শ গৃহিণী হইবার উপদেশ দিয়া তাঁহার সম্মান করিতেন। করুণাময়ীর এ প্রশংসা, এ সম্মানে বাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে সুখ ও গৌরব অনুভব করিতেন—কিন্তু একজনের তাহা ভাল লাগিত না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেন মহাশয়ের বিবাহ করিবার সময় তাঁহার প্রথমপক্ষের

স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণ উপযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বেই বিবাহিত হইয়াছিলেন। সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ অতি শিষ্ট শান্ত, সরল ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি চিরদিনই সংসারে খাটিতেন, কিন্তু খাটাইতে জানিতেন না। আর সেন মহাশয়ের দ্বিতীয়া পুত্রবধূর প্রকৃতি কিছু ভিন্ন রকমের ছিল। তিনি গর্ব্বিতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়া ছিলেন। পরের শাসন তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। শাশুড়ির মৃত্যু হইলে তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন—'আমার বা তো সাতেও না সতরতেও নন। এখন শাশুড়ির অবর্ত্তমানে আমিই ঘরের কর্ত্রী—সংসারের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা—আমাকে আর পায় কে?' কিন্তু তাহা হইল কই? মানুষ যাহা ভাবে, যাহা আশা করে, তাহা যদি কার্য্যতঃ হইত তবে কি দুঃখীর কষ্টে, ব্যথিতের আর্ত্তনাদে, হতাশের বিলাপধ্বনির করুণঝঙ্কারে জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এমন আকুলিত হইয়া উঠিত? মানুষ যাহা চিরজীবন বসিয়া গড়ে ভগবান্ তাহা মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া দেন—ইহাই তাঁহার বিধান!

সেন মহাশয়ের পুত্রবধূ যখন কল্পনাবলে নিশ্চিন্ত মনে বৃহৎ সংসারে কর্ত্রীগিরির গৌরবস্বপ্নে আবিষ্ট, তাহারই এক রাত্রিকালে সেন মহাশয়ের বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহার কুলপুরোহিত এবং আত্মীয় বন্ধুগণ সেন মহাশয়ের সহিত করুণাময়ীর শুভ পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। পরদিন এ সংবাদ জানিয়া দ্বিতীয়া বধূর যে অবস্থা হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। সংসারের কর্ত্রী হওয়ার সকল সুযোগ, সকল সুবিধা উপস্থিত হওয়া সত্বেও তাঁহার অদৃষ্টে আর তাহা ঘটিয়া উঠিল না। একি কম দুঃখ, কম লজ্জা, কম অপমানের কথা! তাঁহার হৃদয় হতাশানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। সুতরাং কিছুদিন পরে যখন বালিকা করুণাময়ী কর্ত্রীরূপে সংসারে প্রবেশ করিলেন, তখন যে দ্বিতীয়া বধূ তাঁহাকে বিশেষ সহানুভূতি বা প্রীতির চক্ষে দেখিবেন না তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

একেত করুণাময়ীর আগমনে দ্বিতীয়া বধূ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাহার উপর আবার যখন তিনি নিজ স্বভাবগুণে ক্রমে সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া উঠিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রতি দ্বিতীয়া বধূর বিদ্বেষভাব আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি সদাসর্ব্বদা ডিটেক্টিভের ন্যায় শাশুড়ির দোষ ও ত্রুটি অনু-

সন্ধান করিতে লাগিলেন। সংসারে মানুষ ত্রয়েরই অধীন। তাহার উপর যদি নিতান্ত অন্তরঙ্গ, ঘরের লোকেই সদাসর্ব্বদা দোষ ও ত্রুটি ধরিতে ব্যগ্র ও সচেষ্ট থাকে, তবে অতি বড় সাবধানীরও তাহার হাত হইতে উদ্ধার হইবার উপায় নাই। বাহিরের শত্রু খুব প্রবল হইলেও সে হঠাৎ কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু ঘরশত্রুর সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে দুনিয়ায় এমন লোক আজিও জন্মে নাই। এমন যে বিশ্বজয়ী রাবণ তাহাকেও যখন ঘরশত্রুর জ্বালায় পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া অবশেষে সবংশে নির্ব্বংশ হইতে হইয়াছিল, তখন যে বালিকা করুণাময়ী তাঁহার ঘরশত্রু দ্বিতীয়া বধূর সহিত পারিয়া উঠিবেন না ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা।

সেন মহাশয়েরা দুই সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ বাড়ীতে থাকিতেন কনিষ্ঠ ভিন্ন স্থানে থাকিয়া কবিরাজী করিতেন। ছোট সেন মহাশয়ের কন্যার নাম রমাসুন্দরী। রমা বালবিধবা তাই কন্যা-স্নেহ-কাতর পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত তাহাকে কখনও শশুরালয়ে যাইতে দিতেন না, নিজেদের বাড়ীতেই রাখিতেন।

বাড়ীর সকলেই রমাকে যত্ন ও আদর করিত। করুণাময়ী নিজহাতে রমার জন্য সব করিতেন। তিনি রমার জন্য পাক করিতেন, নিজে নিকটে বসিয়া থাকিয়া তাহাকে খাওয়াইতেন। নিজ হাতে রমার জন্য জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, এমন কি তাহার উচ্ছিষ্টস্থান পর্য্যন্ত মার্জ্জনা করিতেন। রমাও জেঠীমার ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু অদৃষ্ট বড়ই শক্ত পদার্থ! কোন অনিবার্য্য কারণে একদিন করুণাময়ী রমার জন্য পাক করিতে যাইতে পারিলেন না। দ্বিতীয়া বধূর প্রতি সে ভার পড়িল। তৃতীয় বধূ রমার পাকশালে ঢুকিয়া উননের নিকট একস্থানে একটু কালির চিহ্ন দেখিতে পাইলেন—আর যায় কোথায়! দ্রুতপদবিক্ষেপে একদম রমার নিকট হাজির হইয়া বলিলেন—"ঠাকুরঝি আপনার জেঠীমার কাণ্ড দেখিয়া যান। তিনি যে কাল আপনার উনন লেপিয়া গিয়াছেন সেখানে এঁটো কালি রহিয়াছে।"

ভ্রাতৃজায়ার কথা শুনিয়া রমা 'কি! জেঠীমা আমাকে বাসি এঁটো খাওয়ান?'—বলিয়াই কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রমার কান্না বড় সোজা

কথা নয়। বাড়ীর যে যেখানে ছিলেন সকলে ভীত হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেন মহাশয় বহির্ব্বাটীতে ছিলেন। তিনিও গোলমাল শুনিয়া ত্রস্তপদে ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং রমার ক্রন্দনের কারণ অবগত হইয়াই সম্মুখস্থিতা করুণাময়ীকে কঠিন পদাঘাতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া—'যে স্ত্রী আমার রমার চোখে জল বাহির করিয়াছে এ জীবনে আমি আর তার মুখ দেখিব না। সে বাঁচিয়া থাকিতে আমি আর এবাড়ী ফিরিয়া আসিব না' বলিয়াই দ্রুতগতিতে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। কোথায় গেলেন কেহই তাহা জানিল না।

সেন মহাশয় চলিয়া গেলে সকলেরই যেন চমক ভাঙ্গিল। করুণাময়ীর গুণে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। নিজে রমাও বড় অপ্রতিভ হইলেন—এতটা গড়াইবে তাহা তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। সকলে দুঃখিত হইল কিন্তু একজনের হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। তিনি আর কেহই নন—আমাদের সেন মহাশয়ের দ্বিতীয়া পুত্রবধূ। পতিপদাহতা, মর্ম্মপীড়িতা সতী সেই যে শয্যা গ্রহণ করিলেন আর উঠিলেন না। পতিপরিত্যক্তা হইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে অনাহারেই প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃ—এই সঙ্কল্প করিয়া করুণাময়ী আহার বন্ধ করিলেন। বাড়ীসমেত লোক তাঁহাকে কত উপরোধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সতীর প্রতিজ্ঞা অটল। তিনি কাহারও সহিত কথা বলিতেন না—রাত্রিদিন একই ভাবে অনাহারে শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া সন্ধ্যাকালে পুকুরে গিয়া শুধু তিন অঞ্জলি জলপান করিয়া আসিতেন। বাড়ীর লোকে এ ব্যাপার দেখিয়া ছোট সেন মহাশয়কে সংবাদ দিলেন। ছোট সেন মহাশয় করুণাময়ীকে সংসারে লক্ষ্মী বলিয়া জানিতেন এবং সেইরূপ সম্মানও করিতেন। তিনি বাড়ী আসিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া ও করুণাময়ীর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তারপর নিতান্ত অপরাধীর স্থায় অশ্রুপূর্ণলোচনে ভ্রাতৃবধূকে আহারের জন্ত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন।

করুণাময়ী বয়োজ্যেষ্ঠ দেবরকে ভাসুরের ন্যায় মান্ত করিতেন। তিনি তাঁহার কথা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না—তাই উঠিয়া আহার করিতে বসিলেন। কিন্তু বসা-মাত্র দুই চারিগ্রাস ভাত মুখে দিতে না দিতে বমি হইয়া

সব উঠিয়া পড়িল। সেই হইতে তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। খাদ্যদ্রব্য ত দূরের কথা সামান্য জলটুকু পান করিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িত, পেটে কিছুই দাঁড়াইত না। ক্রমে রোগ অতি সাংঘাতিক অবস্থায় দাঁড়াইল। অবশেষে স্বামীকর্তৃক পরিত্যক্তা হইবার ত্রিপক্ষের মধ্যে সাধ্বী সতী করুণাময়ী সংসারের দুঃখ কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা, হিংসাদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের হাত এড়াইয়া আপনার সঙ্কল্প ও পতির প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতঃ হাসিতে হাসিতে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেন মহাশয়ের বৃহৎ সংসার প্রকৃতই-'লক্ষীছাড়া' হইল।

যথাসময়ে সতীর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া হইয়া গেল। সেন মহাশয়ের খোঁজে দেশে দেশে লোক প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহই তাঁহার কোন সংবাদ আনিতে পারিল না। হঠাৎ শ্রাদ্ধের পরে তিনি কোথা হইতে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন শ্রাদ্ধাঙ্গীয় নিয়ম ভঙ্গ বা 'মৎস্য মুখের' নিমন্ত্রণ। বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—গৃহ আত্মীয় কুটুম্ব ও নিমন্ত্রিত লোকজনে পরিপূর্ণ। সেন মহাশয় প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে সতীর শিশুপুত্র মুণ্ডিত মস্তকে সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই সেন মহাশয় সব বুঝিলেন। কাহাকে কিছু না বলিয়া গম্ভীর বদনে নিজের বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। ছোট সেন মহাশয়ও সেখানে ছিলেন। তিনি দাদাকে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মিষ্ট অনুযোগবাক্যে আদ্যোপান্ত সব বলিলেন।

সেন মহাশয়ের গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইল। তিনি অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"আমিই স্ত্রী হত্যা করিলাম। আমি বলিয়া গিয়াছিলাম 'আর তাহার মুখ দেখিব না—সে থাকিতে আমি বাড়ী ফিরিব না।' তাই সাধ্বী আমাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি বাড়ী আসিবার পূর্ব্বেই আমাকে অপরাধী করিয়া রাখিয়া পলাইয়া গেল। যাও, সতি! যাও! যদি পাতিব্রত্য ধর্ম্মের কোন পুণ্য থাকে তবে আশীর্ব্বাদ করি তুমি সে পুণ্যের অধিকারিণী হইয়া অনন্তকাল স্বর্গভোগ করিবে। আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অনুশোচনা করিয়া স্ত্রীহত্যা মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব" হায়! বৃদ্ধসেন! এখন এ অনুশোচনা বৃথা! এক মুহূর্ত্তের ভুলে

যে সাধ্বী সতী সোণার লক্ষীকে পায়ে ঠেলিয়াছ জীবন ভরিয়া অনুশোচনা করিলেও আর সে ফিরিয়া আসিবে না।

করুণাময়ী গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাম করিতে পল্লীর ইতর ভদ্র বালবৃদ্ধা যুবতীর মস্তক ভক্তিভরে অবনত হইয়া আইসে। হিন্দুর গৃহে এই-রূপ স্ত্রীর অস্তিত্ব আছে বলিয়াই আজিও হিন্দুর হিন্দুত্ব বর্ত্তমান। যেদিন সংসারে এইরূপ সতীলক্ষীদিগের অভাব হইবে, সেদিন হিন্দুর হিন্দুত্ব—হিন্দু গৃহের প্রীতি—সখ্য পবিত্রতা কোন বিস্মৃতির দেশে ভাসিয়া যাইবে তাহা কে বলিতে পারে ?

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

———

বিদায়।

(হিন্দুর গৃহে কন্যার বিদায়।)

আজিকে চারিদিকে হাসির কলরোল,
সুষমা রাশি মাঝে হরষ তান।
তাহার মাঝে মাগো হৃদয় হতে তুলি,
বিদায় দিতে তোরে বিদরে প্রাণ।

করুণ তান বাজে সানায়ে থাকি থাকি,
দারুণ নিপীড়নে অরুণ জাগে আঁখি ।

এমনি একদিন মালিনী তপোবনে,
ঋষিরও ঝরেছিল আঁখির জল।
আমরা গৃহী মাগো তনয়াগত প্রাণ,
মোদের ক্ষীণবুকে কতটা বল ?

গৃহের প্রাণসমা, বিদায় দিয়ে তোমা,
কেমনে জিয়ে রবে এ গৃহাবাস ?
বিজয়া পর দিনে পূজার গৃহ সম
শুষ্ক লতাফুলে ফেলিবে শ্বাস।

মোদের ঘর দোর সকলি তোমা মাখা,
তোমারি পদরেখা আঙিনাভরা আঁকা।

রোপিত লতা তব ঢালিবে ফুলরাশি,
ডাকিয়া সারা হবে পালিতা শারী।
তোমারি করে সাঁজে প্রদীপ জ্বলিবেনা,
কেমনে রবো মাগো তোমারে ছাড়ি !

তবুও মাগো আজি বিদায় দিতে হবে,
অশ্রুভরা আঁখি কাতরে চুমি।
এখানে কেন রবে ? এ তব খেলাঘর,
এ তব নহে মাগো করম ভূমি।

মোদের গৃহ হেথা আঁধার হবে হোক্,
সেখানে জাগে যেন তোমারি প্রেমালোক।

অশেষ কাজ ভার নিয়েছ বিধাতার,
সাধগে তথা গিয়ে প্রাণের ব্রত।
জীবন অভিনব সেখানে তপ তব,
হিন্দু রমণীর সাধনা শত।

যে জন পদতলে সঁপিনু আজি তোমা,
সে যে গো সবা হ'তে প্রাণের প্রিয়,
তাঁহারি পদ দুটি বিপদে সম্পদে,
হৃদয় মাঝে যেন আঁকড়ি নিও।

ও কর গৃহকাজে কঠিন হয় হোক্,
প্রাণের সহ শাঁখা উজল হয়ে রোক্।

কুহেলি উজলিয়া তরুণারুণ সম
সীঁথিতে সিন্দূর যেন মা জাগে।
তুমি মা ভগবতী ছলিতে এলে ব'লে
দেশের লোক যেন করুণা মাগে।

আমার সাধ যাহা তোমার হোক তাহা,
ইহার বেশী কি মা আশিষবাণী।
কুসুম ফুটে থাক্, জ্যোছনা ছুটে যাক্,
চরণ দিবে যথা ফুলের রাণী।

দু'কূল পূত করি শ্যামল শোভাময়,
জহ্নুসুতা সম গাও মা তাঁরি জয়।

যেন অনাথ পায় বাসা, হতাশ পায় আশা,
তাপিত লভে যেন আঁচল ছায়া,
মানব সংসারে জননীরূপা হ'য়ে
রও মা বিথারিয়া মমতা মায়া।

শ্রীকালিদাস রায়।

পরেশনাথ পর্ব্বত।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর নবলৌহবর্ত্ম গ্রাণ্ডকর্ড লাইনে গমনাগমন কালে উভয় পার্শ্বে অনেকগুলি পর্ব্বত নয়নপথে নিপতিত হইয়া থাকে। নীল আকাশের কোণে ঘনীভূত মেঘখণ্ডের ন্যায় সেই পর্ব্বতমালা যে কিরূপ প্রীতিপ্রদ, তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না। প্রাতঃ ও সান্ধ্য সূর্য্যের কিরণ-লহরী তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া যখন মনোমুগ্ধকর শোভা বিস্তার করিতে থাকে, তখন সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশ পথিকগণের নিকট প্রকৃতির রম্য নিকেতন বলিয়াই বোধ হয়। এই পার্ব্বত্য ভূখণ্ডে যে সমস্ত পর্ব্বত মস্তক উত্তোলন করিয়া মেঘমালার গতিরোধে উদ্যত হইয়াছে তন্মধ্যে পরেশনাথ পর্ব্বতই সর্ব্বোচ্চ। প্রায় সার্দ্ধ চারি সহস্র ফুট * উচ্চে আপনার মস্তক উন্নত করিয়া পরেশনাথ দক্ষিণ বিহারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে ও স্বাস্থ্যে পরেশনাথ দক্ষিণ বিহারে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। তদ্ব্যতীত ইহার সহিত অনেক পুরাতত্ত্বেরও সম্বন্ধ রহিয়াছে। জৈন সম্প্রদায়ের একটি প্রধান তীর্থ হওয়ায় পরেশনাথের সহিত অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বও বিজড়িত আছে। আমরা নিম্নে পরেশনাথ পর্ব্বতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

পরেশনাথ বর্ত্তমান হাজারিবাগ জেলায় অবস্থিত। গ্রাণ্ডকর্ড রেল-লাইনের নিমিয়াঘাট বা ইবারী ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া দক্ষিণ বিহারের এই সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বততলে উপনীত হওয়া যায়। চারিদিকে বিশাল অরণ্য দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সাধারণতঃ দুর্গম হইলেও, পরেশনাথ একেবারে অগম্য নহে। বিশেষতঃ ইহা জৈন সম্প্রদায়ের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হওয়ায়, ইহাতে গমনা-গমনের জন্য পথের সুবন্দোবস্তই আছে। পরেশনাথের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। ঘনীভূত মেঘখণ্ডে গাঢ় চন্দ্ররশ্মির ন্যায় ইহার সুধাধবলিত মন্দিরগুলি দূর হইতে লোকলোচনের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া থাকে। নিকটে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ইহার ধূম্রবর্ণ অপসারিত হইয়া নিবিড় হরি-

* পরেশনাথ উচ্চে ৪,৪৭৯ ফুট।

স্বর্ণের শোভায় সকলকেই চমৎকৃত করিয়া তুলে। নানা শ্রেণীর বৃক্ষরাজি ইহার বিরাট্ স্কন্ধে আরোহণ করিয়া শ্যামলতার ঢেউ খেলাইতে থাকে। বংশ, শাল প্রভৃতি বৃক্ষ ইহার গাত্রে মস্তকে সম্মুখে পশ্চাতে অবস্থিতি করিয়া ইহার বিশাল বপুকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। কুটজ, শেফালিকা প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ ইহার পাষাণবক্ষ ভেদ করিয়া আপনাদের পুষ্পসম্ভার দর্শকগণকে উপহার দিবার জন্য উত্থিত হইয়াছে। বিরহী যক্ষ রামগিরি আশ্রমে যে কুটজ পুষ্পের অর্ঘ্য দিয়া পুষ্করবংশসম্ভূত মেঘবরকে বন্দনা করিয়াছিল, সেই রাশি রাশি কুটজ পুষ্প পরেশনাথের পাদদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রস্ফুটিত হইয়া কালিদাসের অপূর্ব্ব রচনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তাহার সহিত শেফালিকাদি অন্যান্য পুষ্প মিলিত হইয়া পরেশনাথকে শান্তিনিকেতন করিয়া রাখিয়াছে। নানা প্রকার উপবৃক্ষ সুন্দর সুন্দর পুষ্পস্তবকে বিভূষিত হইয়া পরেশনাথের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে এবং নানাপ্রকার শৈবাল ইহার পাষাণগাত্রকে আচ্ছাদন করিয়া ইহাকে স্নিগ্ধতর করিয়া তুলিয়াছে। স্থানে স্থানে লতাকুঞ্জ ছায়াদান করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আম, জাম, ডুমুর প্রভৃতি ফল বৃক্ষশাখা হইতে নিপতিত হইয়া ইহার পাষাণ গাত্রে গড়াগড়ি যাইতেছে; দর্শকগণ সেই সমস্ত ফলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া নির্ঝরের সুশীতল জলপানে আপনাদের পিপাসা শান্তি করিয়া থাকে। নির্ঝরের স্বচ্ছ সলিল ইহার গাত্র বাহিয়া রজতধারার ন্যায় নিপতিত হইতেছে। ফলতঃ পরেশনাথের প্রাকৃতিক দৃশ্য যে অতুলনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের ন্যায় অত্যুত্তম স্বাস্থ্যেও পরেশনাথ সুপ্রসিদ্ধ। ইহার নাতি শীতোষ্ণ জলবায়ু শরীরের সুস্থতা সম্পাদন করিয়া থাকে। পরেশনাথের স্বাস্থ্যের জন্য ইহা এক সময়ে সৈনিকগণের স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, এবং কতকগুলি রুগ্ন সৈনিক এখানে আগমন করিয়া আরোগ্যলাভও করিয়াছিল। ইহাতে যে সৈন্যাবাস নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহার অধ্যক্ষনিবাস এক্ষণে ডাক বাঙ্গলায় পরিণত হইয়া পরেশনাথ শিখরে বিদ্যমান রহিয়াছে। অনেকে স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে তথায় অবস্থিতি করিয়া থাকেন। সংপ্রতিও ইহাকে স্বাস্থ্যনিবাস করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে আয়োজন হইতেছিল, কিন্তু জৈনসম্প্রদায়ের ঘোরতর প্রতিবাদে তাহা

কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আবার আজকাল ইহাতে নব বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ছোটনাগপুরের শৈলাবাস স্থাপনেরও কথা উঠিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, পরেশনাথ হাজারিবাগ জেলায় অবস্থিত। ইহা হাজারিবাগ জেলায় পালগঞ্জ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিম বঙ্গের যে পঞ্চকূট রাজ্য বহুদিন হইতে বঙ্গের সীমান্ত প্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল, পালগঞ্জের রাজা সেই পঞ্চকূটাধিপের ঘাটওয়াল বা সীমারক্ষক গণ্য হইতেন। পালগঞ্জের ন্যায় ঝাড়িয়া, নওয়াগড় ও কাত্রাসের রাজগণও পঞ্চকূটের ঘাটওয়াল ছিলেন। পরেশনাথের অর্দ্ধাংশ পালগঞ্জ রাজের ও অপরার্দ্ধ ঝাড়িয়া, নওয়াগড় ও কাত্রাসের রাজার সম্পত্তি, কিন্তু উহা বহুদিন হইতে জৈন সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থান হওয়ায়, ইহাতে জৈনগণেরও কিছু কিছু অধিকার আছে। পরেশনাথের পূর্ব্বনাম সম্মেত শৈল বা সম্মেত শিখর। কিন্তু ইহাতে জৈনগণের ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ সমাধিলাভ করা অবধি ইহা পরেশনাথ পর্ব্বত নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে।* পার্শ্ব-

* পরেশনাথের পূর্ব্বনাম লইয়া হণ্টার প্রভৃতি নানারূপ গোলযোগ করিয়াছেন। প্রথমতঃ—Colonel Franklien ইহাকে Asmid sikhar on the peak of bliss বলিয়া উল্লেখ করেন। হণ্টার উহার বর্ণশুদ্ধিতে সন্দেহ করিয়া তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন "The name of the summit is misspelt. Wilson writes it Samat Sikhar but gives no derivation. It would seem that colonel Frankliens interpretation. "The peak of bliss" is the correct one, samet being possibly a local corruption of the Sanskrit samad happiness" ফ্রাঙ্কলিনের Asmid sikhar শুদ্ধ নহে তাহা আমরাও স্বীকার করিতেছি, কিন্তু উইলসনের Samet sikharকে হণ্টার যে সন্দেহ করিয়াছেন তাহার কোন কারণ নাই। উইলসনের Samet সম্মেতেরই অপভ্রংশ। পরেশনাথ পূর্ব্বে সম্মেত শৈল নামেই অভিহিত হইত, আমরা জৈন গ্রন্থ হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"আয়ুর্ব্বর্ষশতং প্রপাল্য ভগবান্ সম্মেতশৈলং গতো
মাসেনাব সমেন বর্ষবিলয়ং কৃত্বা ত্রয়স্ত্রিংশতা,
সার্দ্ধং তৈঃ শ্রমণৈঃ সিতাষ্টমদিনে মাসে শুচৌ নির্বৃতে
রাধায়াং জিনশৈঃ কৃতান্তকরণঃ শ্রীপার্শ্বনাথো জিনঃ।"

সুতরাং পরেশনাথের পূর্ব্ব নাম যে সম্মেত শৈল ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হণ্টার

নাথের পূর্ব্বে সম্মেত শৈলে নবাধিক তীর্থঙ্করের সমাধি লাভের কথা অবগত হওয়া যায়, জৈন সম্প্রদায়ের চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্করের মধ্যে শেষ দুইজনের নামই প্রসিদ্ধ ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ এবং চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীরই সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পরেশনাথ পর্ব্বতও পার্শ্বনাথের সমাধির পর হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করে, এবং তাঁহার নামে অভিহিত হইয়া উহা জৈন সম্প্রদায়ের একটি প্রধান তীর্থে পরিণত হইয়াছে। যে পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথের জন্য সম্মেত শৈল পরেশনাথ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, আমরা নিম্নে তাঁহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বারাণসীধামে জন্মগ্রহণ করেন, বারাণসীর উপকণ্ঠস্থ ভেলুপুরা তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া কথিত হয়। তিনি ইক্ষাকুবংশীয় অশ্বসেন নামক জৈন রাজার পুত্র। তাঁহার মাতার নাম বামাদেবী। বামাদেবী এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেন চৈত্র শুক্লচতুর্থ তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রে আদিজিনেশ্বর তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইলে, বামাদেবী পৌষমাসের দশমী তিথিতে অনুরাধা নক্ষত্রে পার্শ্বনাথকে প্রসব করেন। পার্শ্বনাথ শ্যামবর্ণ ও সর্পচিহ্ন যুক্ত ছিলেন, তিনি সকলের পূজ্য হইয়া উঠেন। পার্শ্বনাথ যখন মাতৃগর্ভে বাস করিতেন, সেই সময় তাঁহার মাতা মনে করিতেন, যেন তাঁহার সন্তান পার্শ্বে একটি সর্প ধারণ করিয়া আছেন। একথা তিনি কখন কখন প্রকাশও করিতেন। সেই কারণে তাঁহার পিতা তাঁহাকে পার্শ্ব বলিয়া অভিহিত করেন। বাল্যে ও যৌবনে পার্শ্বনাথ জৈনধর্ম্মোক্ত নীতি অবলম্বন করিয়া আপনার চরিত্রকে নির্ম্মল রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। জৈনধর্ম্মের উন্নতির জন্যও তিনি নানারূপ উপায় অবলম্বন করেন। বার্দ্ধক্যে তিনি কাশীবাস পরিত্যাগ করিয়া সম্মেত পর্ব্বতে উপস্থিত হন, এবং তথায় সমাধি লাভ করেন। তাঁহার সমাধিভঙ্গের জন্য তাঁহার কোন শত্রুপক্ষ তাঁহার মস্তকে বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করায়, রাজসর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাহা নিবারণ করিয়াছিল বলিয়া জৈন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। পার্শ্বনাথ ত্রিশ জন শ্রমণের সহিত সম্মেত

যে উহাকে Samad এর অপভ্রংশ বলিতে চাহেন তাহা ঠিক নহে সংস্কৃতে সমদ অর্থেও happiness বুঝায় না, তবে সম্পদ অর্থে হর্ষ বা আহ্লাদ বুঝাইয়া থাকে।

পর্ব্বতে অনশনে অবস্থিতি করিয়া নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন, তিনি শত বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পার্শ্বনাথের ধর্ম্মমত ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। পার্শ্বনাথের পর মহাবীর জৈন-ধর্ম্মের প্রচারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে, পার্শ্বনাথ শ্বেতাম্বর ও মহাবীর দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। বাস্তবিক তাহা না হইলেও পার্শ্বনাথ শ্বেতাম্বরদের ও মহাবীর যে দিগম্বরদের পক্ষপাতী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল বসন পরিধান ব্যাপার বলিয়া নহে, উভয় সম্প্রদায়ের অনেক বিষয়ে ধর্ম্মমতের পার্থক্য আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে মহাবীর খৃষ্ট জন্মের ৫৬৯ বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাণলাভ করেন। তাহার প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে পার্শ্বনাথের সমাধিপ্রাপ্তি ঘটে। জৈনধর্ম্ম ক্রমে প্রবল হইয়া উঠায় জৈন মনীষিগণের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বৈদান্তিক সম্প্রদায় ক্রমাগত বিচারের পর তাঁহাদের মতসঙ্কোচ করিয়া বৈদিকধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, পরেশনাথ পর্ব্বতে জৈনদিগের অনেক গুলি তীর্থঙ্করের সমাধি হওয়ার জন্য উহা উক্ত সম্প্রদায়ের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানরূপে গণ্য হয়। জৈনগণের এই সুপ্রসিদ্ধ তীর্থে তীর্থঙ্করগণের স্মৃতি ও অর্চ্চনার জন্য অনেকগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠগণের স্থাপিত কয়েকটি মন্দির দেখা যায়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ধনী জৈনগণের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরও আছে। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে যে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহা কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বদ্রিদাসের নির্ম্মিত। ইহাতে পরেশনাথের চরণপদ্ম পূজিত হইয়া থাকে। এই মন্দির বহুদূর হইতে নয়নপথে পতিত হয়। পর্ব্বতগাত্রে যে সমস্ত মন্দির বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে জগৎশেঠগণের স্থাপিত মন্দিরই সুন্দর। পর্ব্বত শিখর হইতে দক্ষিণদিকে অবতরণ করিয়া এই মন্দির-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হওয়া যায়, চতুর্দ্দিকে অরণ্য পরিবেষ্টিত এই মন্দিরটি দর্শকগণের নিকট অত্যন্ত মনোহর বলিয়াই বোধ হয়। তচ্ছিরে গোলাকার গম্বুজগুলি ইহার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে মন্দিরভবন ভগ্নদশায় উপনীত হইয়াছে, কেবল মন্দির দুইটি কিয়ৎপরিমাণে সুরক্ষিত অবস্থায়

আছে। মন্দিরতল শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মরফলকে আচ্ছাদিত হইয়া তাহাকে অত্যন্ত রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে, মন্দির মধ্যে পঞ্চ তীর্থঙ্করের মর্ম্মরমূর্ত্তি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। মধ্যস্থলে পরেশনাথের কৃষ্ণ মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রথমেই নয়নপথে পতিত হয়। তাহার দুইপার্শ্বে দুইটি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন।* মূর্ত্তির নিম্নে ১৮২২ সংবৎ খোদিত আছে। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে একজন সরকারী কর্ম্মচারী পর্য্যটক রূপে পরেশনাথ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত মূর্ত্তিগুলির নিম্নে সুগলচাঁদ জগৎশেঠ ও ১৮২২ সংবৎ ক্ষোদিত আছে বলিয়া উল্লেখ করেন। আমরা সংবৎ ব্যতীত আর কিছুরই উদ্ধার করিতে পারি নাই। জগৎশেঠদিগের মধ্যে সুগলচাঁদ বলিয়া কাহারও উল্লেখ দেখা যায় না। দ্বিতীয় জগৎশেঠ মহাতপচাঁদের সুখলালচাঁদ নামে একপুত্র ছিলেন তিনি কখনও জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই, মহাতাপচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র খোশাল-চাঁদ জগৎশেঠ উপাধি লাভ করেন, এবং পরেশনাথ পর্ব্বতে তাঁহারই কীর্ত্তি স্থাপিত আছে বলিয়া তথায় ও মুর্শিদাবাদে শ্রুত হওয়া যায়। পরেশনাথ মন্দিরবাসিগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন যে, জৈনদিগের এই প্রসিদ্ধ তীর্থ এককালে লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় জগৎশেঠ খোশালচাঁদ ইহার পুনরাবিষ্কার করেন। তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই দুর্গম ও দুর্ভেদ্য অরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে উপনীত হন। কিন্তু প্রকৃত তীর্থস্থান আবিষ্কারে অসমর্থ হইলে, তিনি স্বপ্নে যে পর্ব্বতগাত্রে পীত চন্দনের চিহ্ন আছে তাহাই পরেশনাথের সমাধিস্থান এই প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া, জৈনদিগের এই প্রসিদ্ধ তীর্থের স্থান নির্ণয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

* পরেশনাথ ব্যতীত মন্দিরের পূজকেরা আরও চারিজন তীর্থঙ্করের যে নামোল্লেখ করিয়াছিল তাহার মধ্যে অভিনন্দনজি ব্যতীত আর তিনজনের নাম স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায় না, তাহারা চিন্তামণি, শম্ভুনাথ, পার্শ্বনাথ, অভিনন্দন, বাসপুজ্য এই পাঁচ নামের উল্লেখ করে, কিন্তু আমরা জৈনদিগের এই চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্করের নামোল্লেখ দেখিতে পাই, ঋষভ, অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভা, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভা, পুষ্পদন্ত, শীতল, শ্রেয়াংস বসুপুজ্য, বিমল, অনন্ত, ধর্ম্ম, শান্তি, কুণ্ঠ, অরা, মালি, সুব্রত, নাম, নেমি, পার্শ্ব ও মহাবীর। সুতরাং চিন্তামণি, শান্তি বা কুণ্ঠ, শম্ভুনাথ, সম্ভব ও নাম, বসু, পূজ্য হইতে পারেন।

খোশালচাঁদ ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে জগৎশেঠ উপাধি লাভ করেন। কিন্তু ১৮২২ সংবৎ বা ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে এই মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল, দেখা যাইতেছে। খোশালচাঁদ ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে জগৎশেঠ উপাধি লাভ করিলেও তিনি ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে গদীতে আরোহণ করেন। সুতরাং এই মূর্ত্তিগুলি খোশালচাঁদ বা সুখলালচাঁদ কাহার প্রতিষ্ঠিত তাহা সুস্পষ্টরূপে বলা যায় না। সুগলচাঁদের নাম সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকিলে ইহা সুখলালচাঁদের স্থাপিত হওয়াই সম্ভব। সে যাহা হউক ইহা যে জগৎশেঠ বংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই মন্দির ব্যতীত প্রত্যেক তীর্থঙ্করের চরণপূজার জন্য এক একটি গুম্‌টি বা ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহা পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়। মন্দিরে প্রত্যেক তীর্থঙ্করের নাম খোদিত আছে। ১৮২৫ সংবৎ ও সুগলচাঁদ জগৎশেঠের নাম খোদিত আছে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত পর্য্যটক উল্লেখ করিয়াছেন। একণে পর্ব্বতগাত্রে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিংশত্যধিক মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে।

পরেশনাথ পর্ব্বতের উত্তরদিকের পাদদেশে মধুবন নামক গ্রাম অবস্থিত। এই মধুবন হইতে পরেশনাথ পর্ব্বতে আরোহণের জন্য পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমে একটি সর্পাকৃতি পথ পর্ব্বতগাত্রে জড়াইয়া একবার ঊর্দ্ধে একবার নিম্নে আরোহণ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। পরে তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে; একটি ডাক বাঙ্গলাভিমুখে ও অপরটী জৈন মন্দিরাভিমুখে গমন করিয়াছে। পরেশনাথ পর্ব্বতের ন্যায় মধুবনেও কয়েকটি মন্দির আছে, তন্মধ্যে উপরালি বা গোয়ালিয়র, মাঝালি বা মুর্শিদাবাদ ও নীচালি বা কলিকাতা মন্দির প্রসিদ্ধ। উপরালি মন্দির রাজেন্দ্রভূষণ ভট্টা-রকজী নামক একজন গোয়ালিয়রবাসী ব্যবসায়ীর স্থাপিত এবং ইহা দিগম্বর জৈনদিগের অধিকারে রহিয়াছে। মাঝালি মুর্শিদাবাদের শেঠদিগের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা শ্বেতাম্বর জৈনদিগের সম্পত্তি। নীচালি কলিকাতার কোন ব্যবসায়ীর নির্ম্মিত। এই সকল মন্দিরে তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তি ও চরণপদ্ম স্থাপিত আছে। মুর্শিদাবাদের শেঠদিগের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিতে সম্বৎ ১৮২৫ ও সুগলচাঁদ ও খোশালচাঁদের নাম খোদিত আছে বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। এই তিনটি মন্দিরের মধ্যে মাঝালি মন্দিরই শ্রেষ্ঠ। ইহার বিরাট ধর্ম্মশালার

তীর্থযাত্রিগণ নিরাপদে কালযাপন করিতে পারেন। ধর্ম্মশালায় বাসের জন্য সুচারুরূপ বন্দোবস্তই আছে। মধুবনে সাধারণতঃ সামান্যরূপ খাদ্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। তবে কার্ত্তিক মাস হইতে পৌষমাস পর্য্যন্ত যে মেলা হইয়া থাকে তাহাতে অনেক দ্রব্যাদির আমদানী হয়। সেই সময়ে যাত্রিগণ নানা দেশ হইতে পরেশনাথে আগমন করেন, এবং তৎকালেই পরেশনাথে আসিবার জন্য নানাপ্রকার যানেরও ব্যবস্থা থাকে। এই তিনটী প্রসিদ্ধ মন্দিরে ব্যতীত আরও যে কয়েকটি মন্দির আছে তন্মধ্যে একটি মন্দির নেমিনাথ ও পুষ্পদন্ত নামক তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি আছে। আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত ভ্রমণকারী উক্ত মূর্ত্তির নিম্নে সংবৎ ১৮৭৩ এ রূপচাঁদ জগৎশেঠের নামাঙ্কণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৭৩ সংবৎ বা ১৮১৮ খৃঃ অব্দে রূপচাঁদ জগৎশেঠ নামে শেঠ বংশের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায় না, ভ্রমণকারী মহাশয় আবার উক্ত মন্দির দিগম্বর সম্প্রদায়ের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদের শেঠগণ কোনকালে দিগম্বর জৈন ছিলেন না। তাঁহারা চিরকালই শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদীয় মহাজনদিগের পঞ্চায়েতগণের প্রতিষ্ঠিত আর একটি মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। মাঝালি মন্দিরও উক্ত পঞ্চায়েতগণের হস্তে ন্যস্ত আছে। বর্ত্তমান সময়ে মহারাজ বাহাদুর সিংহ ইহার অধ্যক্ষ স্বরূপে মনোনীত আছেন।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, পরেশনাথ পর্ব্বত পালগঞ্জ রাজার অধিকারভুক্ত। পালগঞ্জ পরেশনাথের অতি নিকটেই অবস্থিত। পালগঞ্জ রাজধানীতে তিনটি পরেশনাথের মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে একটি পালগঞ্জের কোন রাজা স্বপ্নাদেশে একটি পুষ্করিণীগর্ভে পাইয়াছিলেন বলিয়া, জৈনদিগের নিকট তাহা জাগ্রত দেবতারূপে পূজিত হইত। কিন্তু পূজোপহার প্রদান লইয়া শ্বেতাম্বর জৈনদিগের সহিত গোলযোগ হওয়ায়, শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় আর পালগঞ্জে পূজা করিতে যান না। পালগঞ্জের রাজা ঋণগ্রস্ত হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে পরেশনাথ পর্ব্বতে স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করিয়া ঋণ পরিশোধের চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু জৈনদিগের ঘোরতর প্রতিবাদে গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে নীরবে অবস্থিতি করিতেছেন।

আমরা পরেশনাথের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম ইহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাকৃতিক দৃশ্যে, স্বাস্থ্যে ও ঐতিহাসিকতত্বে পরেশনাথ দক্ষিণ বিহারের কিরূপ প্রসিদ্ধ স্থান। ফলতঃ এই সমস্ত কারণে পরেশনাথ যে একটি দর্শনীয় স্থান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পর্য্যটকগণ পরেশনাথদর্শনে যে অপরিসীম প্রীতিলাভ করিবেন ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

একখানি কুলগ্রন্থ।

ও

নূতন ঐতিহাসিক তথ্য।

বৈশাখের শাশ্বতীতে আমরা একখানি কুলগ্রন্থ ও নূতন ঐতিহাসিক তথ্য নামে একটি প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া কুলগ্রন্থ খানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম, এবং ক্রমে ঐতিহাসিক টিপ্পনীসহ গ্রন্থখানি প্রকাশের চেষ্টা করা হইবে বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। কুলগ্রন্থ খানিতে ১৬২২ শকাব্দা লিখিত থাকায়, আমরা উহার লেখা ও কাগজ দেখিয়া তাহাই অনুমান করিয়াছিলাম, এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও পুঁথি খানি দেখিয়া তাহাই অনুমান করিয়াছেন বলিয়া আমরা প্রকাশ করি, নগেন্দ্র বাবু তাঁহার অনুমান আমাদের সাক্ষাতেও প্রকাশ করেন। তবে রাখাল বাবুর মত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দেব রায় মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন। দেব রায় মহাশয় রাখাল বাবুর মতের কথা বিশ্লেষণ করিয়া আমাদিগকে জানান নাই, মোটামুটি রূপে তাঁহার মত অবগত করাইয়াছিলেন। সেই জন্ত আমরা লিখিয়াছিলাম, "শুনিয়াছি রাখাল বাবুও তাহাই বলিয়াছেন।" এক্ষণে রাখাল বাবুর

মতসম্বন্ধে তিনি স্বয়ং যাহা বলিতেছেন, এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দেবরায় মহাশয় তাহার যে উত্তর দিতেছেন, আমরা নিম্নে তাহা প্রদান করিতেছি। রাখাল বাবুর প্রতিবাদের উত্তর দেবরায় মহাশয় বিশেষরূপেই দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই জন্য আমরা সে সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাহি না। আমরা তাঁহার দুই একটি মাত্র কথার উত্তর দিয়া আমাদের কার্য্য শেষ করিতেছি।

রাখাল বাবুর মতে পুঁথিখানি কৃত্রিম, অথবা ইহার ঐতিহাসিক অংশ প্রক্ষিপ্ত। তিনি পুঁথির অক্ষরকে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষর বলিতেছেন, সুতরাং তাহা ১৬২২ শকাব্দে লিখিত হওয়া সম্ভব নহে, কাজেই উহাকে কৃত্রিম বলিতে হয়। দুঃখের বিষয়, আমরা রাখাল বাবুর সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া আমরা সে সময়ের যে সমস্ত প্রাচীন কাগজ পত্র দেখিয়াছি, তাহাতে পুঁথি খানির অক্ষর সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীরই বলিয়া আমরা বিবেচনা করি এবং তাহার কাগজও তাহাই বলিয়া বোধ হয়। সুহৃদ্বর নগেন্দ্রনাথ বসুও অনেক পুঁথি পত্র ঘাঁটিয়াছেন, তিনিও তাহাই অনুমান করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে আমরা জানাইতেছি যে, বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নেতা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও উক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত হইয়াছি। রাখাল বাবু সাহসসহকারে বর্ত্তমান যুগের শত শত কুলপঞ্জিকার ন্যায় পুঁথিখানিকে যে দুই দশ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় "প্রাচীনীকৃত" বলিতেছেন, আমরা অকারণে সেরূপ সাহস প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি। বিশেষতঃ পুঁথিখানি যাঁহাদের কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের বিশেষরূপই শ্রদ্ধা আছে। ইহাতে ঐতিহাসিক অংশ প্রক্ষেপের সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বোক্ত মতেরই পোষণ করিতেছি। ঐতিহাসিক তত্ত্বে অভিজ্ঞ একজন সুশিক্ষিত লোক ব্যতীত উহার ঐতিহাসিক অংশ রচিত ও প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না। কোন শিক্ষিত লোকের অকারণে এরূপ অপবাদ দিতে আমরা কদাচ সাহস করিতে পারি না। পুঁথিখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখিয়া যদি রাখাল

বাবুর তাহাকে কৃত্রিম বলিয়া মনে হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত পুঁথি-খানি প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলেই ভাল হইত।

রাখাল বাবু পুঁথিখানির কৃত্রিমতা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন প্রাচীন পুঁথিতে কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় আখ্যা দেখা যায় না বলিয়া যে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাও আমাদের মতে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। রাখাল বাবু প্রাচীন পুঁথি সম্বন্ধে কিরূপ অভিপ্রায় করিতেছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে আমরা আমাদের মতের কোন কোন প্রাচীন পুঁথিতে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্থলে ধ্রুবানন্দ মিশ্র কৃত কায়স্থকারিকা হইতে আমরা দুই এক স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। কায়স্থকারিকায় উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে ব্রহ্মার উক্তিতে লিখিত আছে,—

"অনেকব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্র বৈ।
এতেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ"॥

কায়স্থগণের আদিপুরুষ চিত্র বিচিত্রকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মা বলিতেছেন,

"ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ।
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ॥"

পাতালখণ্ডের এই সকল শ্লোকের অস্তিত্বসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, কায়স্থকারিকায় যে তাহার উল্লেখ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। উক্ত গ্রন্থে আদিশূরের সেনাপতির প্রতি কান্যকুব্জরাজকে বলিবার জন্য তাঁহার উক্তি,

"যজ্ঞার্থং যাচতে বিপ্রান্ ক্ষত্রাদিংশ্চ নরাধিপঃ।"

ইত্যাদি, ও ব্রাহ্মণ কায়স্থগণকে কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে প্রেরণ উপলক্ষে "বঙ্গেশ্বরো মহারাজ, পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতং। তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ।" ইত্যাদি বচন হইতেও তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের কথা বুঝা যায়। তদ্ভিন্ন আদিশূরের নিকট আপনাদের বংশপরিচয় প্রদানকালে ঘোষ সূর্য্যবংশ (ইনি চিত্রগুপ্ত সম্পর্কীয়, ইঁহার বংশধরেরা দ্বিতীয় দ্বিজ) বংশীয়, বসু চেদি-বংশীয়, গুহ অগ্নিকুলোদ্ভব, মিত্র চন্দ্রবংশীয় ও দত্ত সর্ব্বজ্ঞ সূতাই বংশের

অন্যতম শাখা সকসেনকুলোদ্ভব ইত্যাদি উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা হইতেও কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয় বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কারিকা মুখ্যত বঙ্গজকায়স্থগণের কুলগ্রন্থ কিন্তু উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুলাচার্য্য পঞ্চানন দেবশর্ম্মা বিরচিত উত্তর-রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায়ও এইরূপ লিখিত আছে,

"অযোধ্যানিবাসী সিংহো ঘোষশ্চৈব তথা পুনঃ।
মথুরানিবাসী দাসঃ কোলাঞ্চাদ্দ্বয়মাগতাঃ॥
মায়াপুরীনিবাসিনৌ দত্তমিত্রৌ তথাগতৌ।
ক্ষত্রিয়ৌ সূর্য্যবংশিনৌ কুলীনৌ কুলদীপকৌ॥
অনাদিবরসেনৌ তৌ সিংহঘোষাবুভাবপি॥
চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ ক্ষত্রঃ সুচারুসংজ্ঞকঃ॥
স গৌড়দেশমাগত্য শ্রীগৌড়নামসংজ্ঞকঃ।
তদ্বংশসম্ভূতৌ ঘোষশ্চাসৌ শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ॥"

সুতরাং কোন কোন প্রাচীন পুঁথিতে যে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা আমরা অনায়াসে বলিতে পারি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের কায়স্থকাণ্ডে এবিষয়ে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক চলিলেও কোন কোন কুলাচার্য্য যে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং রাখাল বাবুর এ উক্তির সহিতও আমরা একমত হইতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইতেছি।

তাহার পর গ্রন্থখানিতে উল্লিখিত ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে তিনি যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন, আমরা যখন আমাদের টিপ্পনীসহ কুলগ্রন্থখানি প্রকাশ করিব, তখন আমরা আমাদের বক্তব্য জানাইব। উক্ত গ্রন্থখানিকে যখন আমরা কৃত্রিম বলিতে সাহস করিতেছি না, তখন আমরা দেখাইব যে, উহাতে ঐতিহাসিক তথ্য আছে কি না? রাখাল বাবু উহাতে কোনই ঐতিহাসিক তথ্য নাই বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, আমরা সে সময়ে তাহার বিশেষরূপে আলোচনা করিব। তাঁহার শেষোক্তি চন্দ্রদ্বীপের নামকরণ-সম্বন্ধে। দনুজমর্দ্দনের পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপের নামোল্লেখ দৃষ্ট হইলেও তাঁহার কর্ত্তৃক

উহার নাম সুদৃঢ় হওয়া আশ্চর্য্য নহে। জব চার্ণকের পূর্ব্বে বারাকপুরের চানক নাম থাকিলেও, তাঁহার সময় হইতে উহা খ্যাত হওয়ায় তাঁহারই কর্ত্তৃক চানক নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া কথা চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ কিছু কাল আবার সমুদ্রগর্ভেও যাইতে পারে। তাহা আবার নবোত্থিত হওয়ায়, দনুজমর্দ্দন গুরুদেবের নামানুসারে তাহার প্রাচীন নামকেই নূতন করিয়া প্রচার করিতেও পারেন। সে যাহা হউক, তাহাতে আমাদের উল্লিখিত কুলগ্রন্থের দোষ নাই। কারণ দনুজমর্দ্দন কর্ত্তৃক চন্দ্রদ্বীপের নামকরণ একটি প্রাচীন প্রবাদ বলিয়া রাখাল বাবু নিজেও উল্লেখ করিয়াছেন।

অতঃপর আমরা রাখাল বাবুর প্রতিবাদ ও তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি। প্রতিবাদের উত্তর স্থানে স্থানে কিছু তীব্র হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। রাখাল বাবু পুঁথিখানিকে কৃত্রিম প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করায়, দেব রায় মহাশয়েরা একটু উত্তেজিত হইয়াছেন বলিয়াই ঐরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে যদি কোন পক্ষ শাশ্বতীতে তাঁহাদের কোন বক্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে একটু সংযতভাবে লিখিয়া পাঠাইলে আমরা সুখী হইব।

প্রতিবাদ।

"শাশ্বতীর" প্রথম সংখ্যায় একজন অজ্ঞাতনামা লেখক একখানি নূতন কুলগ্রন্থের আবিষ্কারবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহা "ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ সবডিভিসনের পুরুড়া বা পুড্ডা নিবাসী দেব বংশীয়গণের নিকট এই কুলগ্রন্থখানি সযত্নে রক্ষিত আছে।" কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন কুলশাস্ত্রের একখানি প্রাচীন পুঁথি পরীক্ষার জন্য আমার নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন। আমাদুর যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে মনে হয় তাঁহার

সহিত ময়মনসিংহনিবাসী আর একজন ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন, এবং পুঁথি খানি দেখিয়া আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে পুঁথিখানি কৃত্রিম হওয়াই সম্ভব। "শাশ্বতীর" লেখক মহাশয় বলিতেছেন :—

"শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দেব রায় মহাশয় গ্রন্থখানি আমাদের নিকট আনিয়াছিলেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটও গ্রন্থখানিকে পাঠাইয়াছিলেন। গ্রন্থখানি ১৬২২ শকে লিখিত। 'ইতিশকনরপতেরতীতাব্দা ১৬২২ সৌরবৈশাখস্ত পঞ্চম দিবসে' এই কথাটি ইহার শেষে লিখিত আছে। লেখা ও কাগজ দেখিয়া তাহাই বলিয়া বোধ হয়। নগেন্দ্রবাবুও তাহাই অনুমান করেন। শুনিয়াছি রাখাল বাবুও তাহাই বলিয়াছেন।"

অজ্ঞাতনামা লেখক মহাশয় যে ব্যক্তির নিকট এই সকল কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি হয় আমার কথা শুনিতে ভুল করিয়াছেন, না হয় স্বয়ং লেখক মহাশয়ের শুনিতে ভুল হইয়াছে। যিনি আমার নিকট পুঁথি লইয়া আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, দুই এক ঘণ্টার মধ্যে পুঁথির কৃত্রিমত্ব বা অকৃত্রিমত্ব নিরূপণ করা অসম্ভব। পুঁথিখানি লিখিবার সময় যে আকারের বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বের। সুতরাং পুঁথিখানি ১৬২২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭০০ খৃষ্টাব্দে লিখিত বলিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ইহা হয় খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত, নতুবা ইহা কৃত্রিম। বর্ত্তমান যুগের শত শত কুলপঞ্জিকার ন্যায় দুই দশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় "প্রাচীনীকৃত।" অজ্ঞাতনামা লেখক মহাশয় পুঁথিখানির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, ইহা কৃত্রিম। এপর্য্যন্ত কোন প্রাচীন পুঁথিতে কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় আখ্যা দেখা যায় না। লেখক বলিতেছেন যে, এই গ্রন্থের মতে "ক্ষত্রপকায়স্থা দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভবাঃ।" এই গ্রন্থ অনুসারে "শূরদেবের পুত্র মহুআরিদেব পাল রাজগণের নিকট হইতে বরেন্দ্র অধিকার করিয়া গৌড় রাজ্যভুক্ত করেন।" গ্রন্থকার বোধ হয় অবগত নহেন যে, গৌড়নগর বরেন্দ্র দেশে অবস্থিত। "সেন রাজগণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল এবং তিনি লক্ষ্মণের মিত্র

ছিলেন।" গত বৎসরে শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী"তে আমি লিখিয়াছিলাম, "চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের সহিত সেনরাজবংশের কোন সম্পর্ক প্রমাণ করা যায় না,প্রমাণ করিতে হইলে নূতন কুলগ্রন্থের আবিষ্কার করিতে হইবে।" (প্রবাসী, ১৩১৯ পৃঃ ৩৮৯)। একথা যখন লিখিতেছিলাম তখন আমার ধারণা ছিল না যে, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি এবং তাহা এত শীঘ্র ফলিয়া যাইবে। দনুজারি সেনরাজগণের সম্পর্কিত ব্যক্তি হইলেই চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের সহিত সেনবংশের সম্পর্ক পুনঃ স্থাপিত হইল এবং সেই সঙ্গে সেনরাজবংশের কায়স্থত্ব প্রমাণিত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নূতন কুলগ্রন্থখানির কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নাই। ইহা সম্ভবতঃ ৺ রাধেশ চন্দ্র শেঠ ও অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রার আবিষ্কারের পরে রচিত হইয়াছে! কারণ ইহার পূর্ব্বে কোন কুলগ্রন্থে পাণ্ডুনগররাজ মহেন্দ্রদেবের নাম বা তৎকর্ত্তৃক কংসকুলনিধনের সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থকার কংসকুল শব্দ দ্বারা ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা (?)কানস্ বা গণেশের বংশ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মহেন্দ্র দেবের একটি মাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা যে বৎসরে মুদ্রিত হইয়াছিল সেই বৎসরই রাজা কানসের মৃত্যু হইয়াছিল (প্রবাসী ১৩১৯ পৃঃ ৩৮৮)। ইহাই ফলে দাঁড়াইয়াছে :—

"যবনাঞ্চ দূরীকৃত্য কংসকুলং নিহত্য চ।
পাণ্ডুয়ায়াং দেবরাজামনেনৈব প্রতিষ্ঠিতং॥"

আমি বলিয়াছিলাম "দনুজমর্দ্দন দেবের রাজত্ব বরেন্দ্রভূমি হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। • • • দনুজমর্দ্দনদেব বোধ হয় তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির বৎসরেই চন্দ্রদ্বীপে রাজ্যস্থাপন করিয়া স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।" দেববংশের প্রশস্তি রচয়িতা আমার অনুমানগুলির যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া আমাকে উচ্চপদবী প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা বোধ হয় আমার ভোগ হইবে না, কারণ তাঁহার রচিত কুলগ্রন্থখানি অকৃত্রিম বলিয়া মানিয়া লইয়া যশস্বী হইবার সাহস এখনও আমার হয় নাই। কুলগ্রন্থরচয়িতা বলেন :—

"মহেন্দ্র দুষ্টঘাতক কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র দনুজমর্দ্দন রাজা হন।

তিনি বন্দ্যবংশীয় চন্দ্রাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দনুজমর্দ্দন যবনদিগকে মর্দ্দন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে গুরুর আদেশে ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনের জন্য সপরিবারে সমুদ্রোপকূলে গমন করেন, এবং রণচণ্ডী ও কালিকাকে প্রসন্ন করিয়া একটি নবোত্থিত দ্বীপে রাজ্যস্থাপন ও গুরুর প্রীতির জন্য তাহার চন্দ্রদ্বীপ নাম প্রদান করেন।"

চন্দ্রদ্বীপের নামকরণ সম্বন্ধে যে উপাখ্যানটি বিবৃত হইয়াছে তাহা প্রাচীন হইলেও সত্য নহে। দনুজমর্দ্দন দেবের আবির্ভাবের চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও এই নামটি বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। ফরাসীপণ্ডিত ফুসে তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, তখনও চন্দ্রদ্বীপে ভগবতী তারা পূজিতা হইতেন। কুলগ্রন্থের বর্ত্তমান অধিকারী শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দেব রায়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দেবরায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দেব রায় মহাশয়গণের সহিত আমার পরিচয় নাই, এই প্রবন্ধের কোন কথায় তাঁহারা যদি ক্লেশ অনুভব করেন তাহাহইলে ভরসা করি তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি ইতিহাসের দিক্ হইতে এবং সত্যানুরোধে নূতন কুলগ্রন্থসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহাদিগের বংশাবলীসম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। আমার মতে গ্রন্থখানি হয় কৃত্রিম না হয় অতি অল্পদিনের মধ্যে ইহার ঐতিহাসিক অংশটি "প্রক্ষিপ্ত" হইয়াছে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তর।

সম্পাদক মহাশয়,

আপনার প্রেরিত "রাখাল বাবুর প্রতিবাদ" পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম এবং তিনি "সত্যানুরোধে" সত্যের অপলাপ করিতে যে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই এজন্য দুঃখিতও হইলাম। ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতিবাদের বিস্তৃত প্রতিবাদ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। বর্ত্তমানে মহাশয়ের জ্ঞাতার্থে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

বিগত চৈত্র মাসে পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় আমাদের কুল-গ্রন্থখানি একবার দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থ দেখিবার জন্য আমাদের ভবানীপুরস্থ বাটীতে দুই বার আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎও করিয়া গিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে গ্রন্থ দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। এজন্য গত বৈশাখের শেষভাগে গ্রন্থখানি লইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের ৪৫।৫ নং সিমলা ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে উপস্থিত হই। পণ্ডিতমহাশয় প্রথমতঃ গ্রন্থখানি দেখিতে না চাহিয়া আমার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হন। নানা গ্রন্থের সাহায্যে ও যুক্তির বলে আমাদিগকে এবং পূর্ব্ব ময়মনসিংহের প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশকে বৈদ্যবংশীয় প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হন। তিনি আমাকে নানা গ্রন্থ দেখাইয়া ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থগণ নীচকুলোদ্ভব এবং বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব,—অতএব বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ,—ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করেন। আমি ইহাতে প্রতিবাদ করি। ইহাতে তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করেন। অতঃপর আমাদের কুল গ্রন্থখানির প্রথম পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া, ইহাতে—"কত্রপ-কায়স্থা দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়-কুলসম্ভবাঃ" এইরূপ লিখিত আছে দেখিয়া বলেন,—"কোন প্রাচীন কুলগ্রন্থেই কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব—এরূপ দেখা যায় না। অতএব এই কুলগ্রন্থ অবশ্য আন্দুলের রাজা ৺ রাজনারায়ণ বসুর কায়স্থ আন্দোলনের পর লিখিত হইয়াছে। অতএব ইহা ৮০ বৎসরের অধিক প্রাচীন হইতে পারে না।"

পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত একমত না হওয়ায় আমি গ্রন্থ খানি রাখাল বাবুকে দেখাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করি। রাখাল বাবু তাঁহার পার্শ্বের বাটীতে বাস করেন (একই বাড়ীর পৃথকাংশ বলিয়া বোধ হয়)। এই সময়ে রাখাল বাবু দারজিলিং রওয়ানা হইবেন, মাল পত্র গাড়ীতে উঠান হইয়াছে, তিনিও কোট পেন্ট পরিয়া প্রস্তুত হইয়া বৈঠকখানার ঘরে দণ্ডায়মান। সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ "তাঁহার ঘোড়াটা শিয়ালদহ হইতে আসিবার সময় রাস্তায় পড়িয়া গিয়া চোট খাইয়াছে" এই সংবাদ আসায় তিনি ভাড়াটিয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে উন্মুক্তাবস্থায় গ্রন্থখানি হাতে লইয়া পণ্ডিত মহাশয় রাখাল বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং হাসিমুখে রাখাল বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখুন দেখি রাখাল বাবু এই এঁরা একটা কুলুজি এনেছেন, এ কিছুতেই প্রাচীন হইতে পারে না। আপনি খাঁটি লোক আপনি খাঁটি কথা বলবেন।" রাখাল বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমি মশায় কুলুজি ফুলুজি বিশ্বাস করি না। আর দেখুন আমি সংস্কৃতও ভাল জানি না। কেন মিছামিছি এ আমার কাছে এনেছেন।" কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি গ্রন্থখানি হাতে লইলেন এবং প্রথম পৃষ্ঠার এপীঠ ওপীঠ উল্টাইয়া বলিলেন, "কাগজ গুলি দেড় শ" একটু থামিলেন, অতঃপর বলিলেন "দুইশত সোয়া দুইশত বৎসরের হইতে পারে।" আমি এই সময়ে বলিলাম, "গ্রন্থখানি কতদিনের প্রাচীন হইতে পারে এই বিষয়ে মহাশয়ের মতামত জানিতে চাই।" এই সময়ে তিনি বলিলেন, "অক্ষর গুলি কিন্তু খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়।" অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দীর অক্ষরের ফটোগ্রাফ অঙ্কিত আছে—এইরূপ একখানি পুস্তক চাহিয়া লইয়া তাহার সহিত উক্ত কুলগ্রন্থের অক্ষর গুলি মিলাইয়া লইয়া বলিলেন, "এত তাড়াতাড়ি অক্ষর গুলির ঠিক সময় নিরূপণ করা কঠিন। আপনি জুলাই মাসের শেষভাগে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সেই সময়ে আমি ঠিক করিয়া বলিয়া দিব।"

রাখাল বাবুর সহিত আমার যখন কথাবার্ত্তা হইতেছিল—পণ্ডিত মহাশয় গ্রন্থ খানি হাতে লইয়া স্থির দৃষ্টিতে ইহার অক্ষর গুলি নিরীক্ষণ

করিতেছিলেন—হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "রাখাল বাবু দেখুন দেখি—এ যেন কাগজে কালিতে মিল নাই—গ্রন্থ খানি নিশ্চয়ই আধুনিক।" রাখাল বাবু বলিলেন,"—তা—আ—পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ বলিতে পারিনা।" রাখাল বাবুর সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের মিল না হওয়ায় তিনি একটু অপ্রতিভ হইলেন আমি পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম,—"আপনি এক কথা বলিয়াছিলেন, রাখাল বাবু অন্যরূপ বলিতেছেন। এক্ষেত্রে ইহা অন্যান্য Expert দিগকেও দেখান কর্ত্তব্য ;" এই বলিয়া চলিয়া আসি।

ইহা হইতে উক্তগ্রন্থ সম্বন্ধে রাখাল বাবুর মত অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন। বলা বাহুল্য উক্ত গ্রন্থে যে, "কত্রপকায়স্থা দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়-কুলসম্ভবাঃ ", এবং মহেন্দ্রের সমাবেশ আছে, ইহা রাখাল বাবু পূর্ব্বে দেখেন নাই এবং কল্পনাও করেন নাই। তাই সরলপ্রাণে এত কথা বলিয়াছিলেন।

রাখাল বাবু এক বিষয়ের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া অনেক বিষয়েরই উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রতিবাদের প্রথমেই বলিতেছেন,

"পুঁথি খানি দেখিয়া আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, পুঁথি খানি কৃত্রিম হওয়াই সম্ভব।" উক্ত গ্রন্থ কৃত্রিম, একথা তিনি কোন সময়ই মুখে আনেন নাই। অথচ "সত্যানুরাগের" দোহাই দিয়া তিনি এখন তাঁহার কথা সত্য প্রমাণ করিতে চান। ধন্য তাঁহার সত্যানুরাগ!

তাঁহার প্রতিবাদ পড়িয়া মনে হয় তিনি দুই এক ঘণ্টা পুঁথি খানি পাঠ করিয়াছিলেন,—কিন্তু তিনি যদি দু দশ মিনিট মনোযোগের সহিত গ্রন্থখানি দেখিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতিবাদের সারবত্তা কতক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিতাম।

প্রতিবাদের একস্থলে বলিতেছেন, "যিনি আমার নিকট পুঁথি লইয়া আসিয়াছিলেন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে ইহা হয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত নতুবা ইহা কৃত্রিম, বর্ত্তমান যুগের শত শত কুলপঞ্জিকার ন্যায় দুই দশ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রাচীনীকৃত।" ইহার প্রত্যেকটি কথা মিথ্যা। ইহার একটি কথাও

তৎকালে তিনি উচ্চারণ করেন নাই। তাই বলিতেছিলাম তিনি সত্যানুরোধে সত্যের অপলাপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

ইহার পরে বলিতেছেন, "অজ্ঞাতনামা লেখক মহাশয় পুঁথি খানির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতেই বুঝা যায় যে ইহা কৃত্রিম।" রাখাল বাবুর এই কথার কোন প্রতিবাদ করিতে চাই না। যদি সংক্ষিপ্ত বিবরণে ইহা কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয় ভবিষ্যতে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইলেই ইহার কৃত্রিমতা দোষ অপসারিত হইবে, সন্দেহ নাই। আশা করি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাখাল বাবুরও "ধাক্কা" দূর হইবে। রাখাল বাবু "অজ্ঞাত নামা লেখক মহাশয়" লিখিয়া নিজেরই অজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধটি সম্পাদকীয় বলিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিয়াছেন।

"এ পর্য্যন্ত কোনও প্রাচীন পুঁথিতে কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় আখ্যা দেখা যায় না।" একথা গুলি রাখাল বাবুর নিজের বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ তাঁহার প্রতিবাসীর নিকট হইতেই এই ভ্রমাত্মক ধারণা হৃদয়স্থ করিয়াছেন। যাহা হউক এ বিষয়ে তাঁহার প্রতিবাসীর কথা বেদবাক্য-স্বরূপ না মানিয়া লইয়া শ্রদ্ধেয় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" কায়স্থ কাণ্ড তাঁহাকে একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

রাখাল বাবু তাঁহার প্রতিবাদের একস্থলে বলিতেছেন, "এই গ্রন্থঅনুসারে, "শূরদেবের পুত্র দনুজারিদেব পালরাজগণের নিকট হইতে বরেন্দ্র অধিকার করিয়া গৌড়রাজ্যভুক্ত করেন।" গ্রন্থকার বোধ হয় অবগত নহেন যে, গৌড় নগর বরেন্দ্র দেশে অবস্থিত।

গ্রন্থকারের অজ্ঞতা দর্শাইতে যাইয়া রাখাল বাবু নিজেরই অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। গৌড়রাজ্য বলিলে গৌড়নগর বুঝিতে হইবে একথা রাখাল বাবুর নিকটই প্রথম শুনিলাম। "দনুজারিপাল রাজগণের নিকট হইতে বরেন্দ্র অধিকার করিয়া গৌড়রাজ্যভুক্ত করিলেন।" ইহা দ্বারা দুইটি বিষয় মনে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ হয়ত তৎকালে গৌড়রাজ্য বলিলে শুধু বরেন্দ্র না বুঝাইয়া বরেন্দ্রের পশ্চিমাংশ এবং মগধের পূর্ব্বাংশ বুঝাইত। বঙ্গেরও কতকাংশ যে গৌড়রাজ্য ভুক্ত ছিলনা, একথা বলা যায়

না। কারণ বল্লালসেন পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন বলিয়াই আমরা জানি। এই পঞ্চ গৌড় বলিতে শুধু বরেন্দ্র বুঝাইত না। মিথিলা, রাঢ়, বঙ্গ, বাগড়ি ও বরেন্দ্র এই পঞ্চরাজ্যের সমষ্টিকেই গৌড়রাজ্য বলিত। দ্বিতীয়তঃ তৎকালে সমুদয় বরেন্দ্র ভূমিই গৌড় রাজ্যভুক্ত ছিল একথা প্রমাণ করা যায় না। কারণ সেই সময়ে পালরাজগণ বরেন্দ্রের পূর্ব ও উত্তরাংশে স্থানে স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় "বরেন্দ্রং" বলিতে "সমগ্রং বরেন্দ্রং" এই অর্থ করিলেই সমুদয় গোল চুকিয়া যায়। বিষয়টি আরও সহজে বুঝাইয়া দিতেছি। তুর্কি সাম্রাজ্য বলিলে এসিয়াটিক তুর্কি এবং তুর্কি অব য়ুরোপ বুঝা যায়। Allies গণ তুর্কি অব য়ুরোপ তুর্কি সাম্রাজ্য হইতে বাহির করিয়া লইয়াছেন। এখন যদি কোন পাশা তুর্কি অব য়ুরোপকে পুনরায় নিজ বাহুবলে তুর্কিসাম্রাজ্য ভুক্ত করেন। তবে একথা বলা কি অসঙ্গত হইবে যে, অমুক পাসা তুর্কি অব য়ুরোপকে তুর্কিসাম্রাজ্য ভুক্ত করিলেন।

তৎপর বলিতেছেন, "দনুজারি সেন রাজগণের সম্পর্কিত ব্যক্তি হইলেই চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের সহিত সেনবংশের সম্পর্ক পুনঃ স্থাপিত হইল এবং সেই সঙ্গে সেনরাজবংশের কায়স্থত্ব প্রমাণিত হইল।" "পুনঃ স্থাপিত" কথা দ্বারা বুঝা যায় পূর্ব্বে কেহ স্থাপিত করিয়াছিল এবং অতঃপর কোন কারণে সেই ব্যক্তিই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু "তাহার" বিজ্ঞাপন ত এ পর্য্যন্ত দেখিলাম না!

রাখাল বাবু কি জানেন না, পূর্ব্বে কায়স্থ বৈদ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ চলিত। এখনও বাংলার স্থানে স্থানে ঐ ভাব লক্ষিত হয়। শুধু সম্পর্কের দ্বারা সেনরাজগণের কায়স্থত্ব প্রমাণ হয় নাই। তাঁহারা যে শুদ্ধ শ্রীচন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন তাঁহাদের প্রদত্ত শাসনগুলিই তাহা প্রমাণ করিতেছে। অতঃপর বৈবাহিক সম্বন্ধ এই প্রমাণকে আরও দৃঢ়ীভূত করিয়াছে।

রাখাল বাবু বলিতে চান, মহেন্দ্রদেবের এবং দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা আবিষ্কারের পর এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশ টুকু প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কংসফুলের নিধনবার্ত্তা অবলম্বনে কোন ব্যক্তি

কুলগ্রন্থের দুইটি পৃষ্ঠা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

"যবনাঞ্চ দূরীকৃত্য কংসকুলং নিহত্য চ।
পাণ্ডুয়ায়াং দেবরাজ্যমনেনৈব প্রতিষ্ঠিতম্॥''

এই শ্লোক রচনা করিয়াছেন। যদি ইহা সম্ভব হয়, তবে ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, এই কুলগ্রন্থের অন্য কোন কপি ইতিপূর্ব্বেই মুদ্রা আবিষ্কর্ত্তাগণের এবং মুদ্রাসম্বন্ধে বিজ্ঞাপনদাতাগণের হস্তগত হইয়াছিল। তৎপর গ্রন্থোল্লিখিত বিবরণ অবলম্বনে ঐ মুদ্রাগুলি জাল করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে "প্রাচীনীকৃত'' করা হইয়াছে। আমরাও বিজ্ঞানের দুই এক পাতা পড়িয়াছি। কিন্তু "বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রাচীনীকৃত" কথা এই প্রথম শুনিলাম। বাল্যকালে শুনিতাম মন্ত্রের বলে অদৃশ্য হওয়া যায়, আকাশে উড়া যায় ইত্যাদি। তৎকালে ইহা বিশ্বাসও করিতাম। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত লোকও বিজ্ঞানকে মন্ত্রের বলের ন্যায় একটা কিছু মনে করেন। এবং ইহাদ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যায় এমত বিশ্বাস করেন। কিন্তু রাখাল বাবুর ইহা বুঝা উচিত ছিল, বিজ্ঞান অসম্ভব কিছুই করিতে পারে না। যাহা সম্ভব বিজ্ঞান কেবল তাহাই সহজে করিতে পারে। তবে রাখাল বাবু যদি কোন নূতন বৈজ্ঞানিক সূত্রের বিষয় অবগত থাকেন তাহা বলিতে পারি না। এই প্রতিবাদ কায়স্থবিদ্বেষমূলক বলিয়াই মনে হয়। অথবা ব্যক্তিগত কোন স্বার্থসিদ্ধির প্রথম উপায়। যাহা হউক আমরা রাখাল বাবু অথবা কোন কায়স্থবিদ্বেষীর সহিত বাদানুবাদ করিতে প্রস্তুত নহি। কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশের এবং কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিবাদক অংশের "ফটোগ্রাফিক কপি'' এই সঙ্গে পাঠাইলাম। মহাশয়, রাখাল বাবুর প্রতিবাদ যদি প্রকাশ করেন তবে আমার পত্র খানাও আপনার "শাশ্বতী" পত্রিকার শ্রাবণের সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। অক্ষরগুলি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কি না এবং ঐতিহাসিক অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত কি না ইহা সাধারণেই বিচার করিয়া দেখিবেন।

রাখাল বাবু বলেন, গ্রন্থখানির কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। আমরা বলি, তাঁহার মুদ্রার বিজ্ঞাপনেই ইহার ঐতিহাসিক মূল্য শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এবং ভবিষ্যতে তাঁহার নব নব বিজ্ঞাপনের সহিত ইহার

ঐতিহাসিক মূল্য আরও বৰ্দ্ধিত হইবে। তবে রাখাল বাবুর নিকট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রাচীনীকৃত সম্বন্ধে যে বার্ত্তা অবগত হইলাম, তাহাতে ভবিষ্যতে বিজ্ঞাপনগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কতদূর সাহসী হইব বলিতে পারি না।

"চন্দ্রদ্বীপ" শব্দটী লইয়াও রাখাল বাবু নাড়া চাড়া করিয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি এবং নামকরণ সম্বন্ধে আমাদের কুলগ্রন্থ-বিবরণই যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। কারণ উক্ত দ্বীপ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

তস্থাবত্র নবোত্থিতং সমুদ্রকূলসন্নতম্।
দ্বীপদেশং সুবিস্তৃতং নানাবৃক্ষোপশোভিতম্॥

তস্থৌ শব্দের ব্যবহারে দ্বীপটী পূর্ব্বেই ছিল বুঝা যায়। তবে দ্বীপটী নবোত্থিত ছিল। আমাদের মতে তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। চীনপরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠেও তাহাই মনে হয়। সেই সময়ে এই সকল প্রদেশের অস্তিত্বও ছিলনা। বরিশাল হইতে উত্তরে গারো পর্ব্বতের পাদ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। কুলগ্রন্থে ভগবতী তারার কথা উল্লেখ নাই। চণ্ডিকা এবং কালিকা দেবীর কথারই উল্লেখ আছে। "চণ্ডিকা এবং কালিকা দেবী পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপে ছিলেন না, দনুজমর্দ্দন উক্ত দেবীদিগকে প্রথমতঃ স্থাপন করেন" এমন কোন কথারও কুলগ্রন্থে উল্লেখ নাই। চন্দ্রদ্বীপ নাম দনুজ-মর্দ্দনের পূর্ব্বে ছিল কিনা একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। আর যদি "ছিলই" এমন প্রমাণ হয়, তাহাতেই বা দোষ কি? দনুজমর্দ্দন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। তিনি চন্দ্রদ্বীপ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের ইচ্ছামত নামও রাখিতে পারিতেন, তবে গুরুর নামে নাম দেখিয়া শ্রদ্ধাবশতঃ তাহাই রক্ষা করিলেন। পূজ্য ব্যক্তির নামে যাহারা নামীয় তাহাদিগকে সম্মান করা ভারতবাসীর চিরপ্রথা। প্রবাদটী যখন পুরাতন তখন একথাও বলা যাইতে পারে, প্রবরচরিতা প্রকৃতাবস্থায় বা কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃতাবস্থার প্রবাদটী যে ভাবে শুনিয়াছিলেন সেই ভাবেই লিপি-বদ্ধ করিয়াছিলেন।

এইসঙ্গে এই কথাও বলিয়া রাখি—১৯০৩ সালের শ্রাবণ মাসে এই গ্রন্থ কালনানিবাসী পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এম্ এম্ এস্ কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত প্রণবেশ বিদ্যাম্বুধি মহাশয়ের নিকট আনয়ন করেন। উক্ত পণ্ডিতমহাশয় দেববংশোদ্ভব ছিলেন। তিনি তৎকালে ৩নং স্কটস্ লেনে বাস করিতেন। আমার যতদূর স্মরণ হয় উক্ত দিবসে বারাকপুর কেণ্টনমেণ্ট থানার ইনিস্‌পেক্টার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সরকার, এলাহাবাদ অভ্যুদয় পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, ৫নং কালীঘাট রোড নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ চাটার্জি (পুলিস সবইনিস্পেক্টার) কড়েয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ আঢ্য, ৫নং মুনসীগঞ্জ রোড্ নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ সমাদ্দার প্রভৃতি আরও অনেক গণ্য মান্য লোক এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব এই বিষয় লইয়াও অনেক আলোচনা হইয়াছিল।"

সর্ব্বশেষে বলিতে চাই, রাখাল বাবু তাঁহার প্রতিবাদের শেষভাগে যে দুই মত প্রকাশ করিতেছেন তাহা হইতেই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। রাখাল বাবু বলিতেছেন "গ্রন্থখানি হয় কৃত্রিম না হয় ইহার ঐতিহাসিক অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত।" অর্থাৎ ইহার ঐতিহাসিক অংশটুকু বাদ দিলে, গ্রন্থখানি অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করিতে রাখাল বাবুর কোন আপত্তি নাই। বস্তুত রাখাল বাবুর সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক অংশটুকুর বিষয় অবগত ছিলেন না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, গ্রন্থখানি তৎকালে অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করিতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই। সে যাহা হউক, ইহা হইতে তিনি যে উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। অর্থাৎ শত শত কুলগ্রন্থে বিশ্বাস নাই, অথচ এখানাকে বিশ্বাস না করিয়াও পারিতেছেন না।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠার অক্ষরগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, গ্রন্থের অক্ষরগুলি খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষর বলিয়া কিছুতেই

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

লেখকগণের নাম।

সূচী।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শাশ্বতী ১ম খণ্ড। ভাদ্র ১৩২০। ৫ম সংখ্যা।

বর্ষাসুন্দরী।

—:•:—

(১)

হে বর্ষাসুন্দরি এ'স এলাইত করি' তব
মেঘময়ী বেণী,
নিবিড় নীলিম কণ্ঠে পরিয়া মুক্তিকাহার
বলাকার শ্রেণী।
বিভাময় হেমাঞ্চল স্খলিত কবরী কোলে
দাও বিথারিয়া,
এস গো গম্ভীর তানে মেঘমল্লারের গানে
বীণাটী বাঁধিয়া।

(২)

তুমি এ'লে থেমে যাবে বিশ্বের অশ্রান্ত যন্ত্রে
উদ্দাম ঝঙ্কার,
কর্ম্মক্লান্ত নরনারী পাইবে খুঁজিয়া পুনঃ
বিশ্রাম-আগার।
আবার শ্যামল-হাস্যে জাগিয়া উঠিবে এই
শীর্ণা বসুন্ধরা,
তাই ডাকি এ'স ত্বরা অবাধ আকাশ পথে
লাবণ্য-মন্থরা!

(৩)

তাপিতা ধরণীশিরে ধর নীল তোমার সে
চন্দ্রাতপখানি,

ঘর্ঘর জীমূতমন্দ্রে তোমার মা ভৈঃ মন্ত্র
জানাও কল্যাণি!
করুণা-সজল নেত্রে সমবেদনার অশ্রু
ঝরি অবিরল,
স্নিগ্ধ হোক্, শান্ত হোক্ নিদাঘ-সন্তপ্তা এই
ধরা-বক্ষঃস্থল।

(৪)

তোমার ও স্নেহময় শ্যামল করুণ ছবি
হেরি পড়ে মনে,
কত অতীতের কথা আকুল বিরহ-ব্যথা
প্রেমের স্বপনে!
কোথা সেই কত দূরে কোন মেঘময় পুরে
গৈরিক নিবাসে,
একটী নিঃসঙ্গ প্রাণ কেঁদেছিল কার তরে
বিজন প্রবাসে!

(৫)

আষাঢ়ের ধারা-সিক্ত শ্রান্ত প্রকৃতির বুকে
আজো করে বাস,
কবেকার লুপ্ত সেই ক্রন্দনের প্লুত স্বর
বিরহ-উচ্ছ্বাস!
তাই বুঝি হে শ্যামাঙ্গি, তোমার লোচনাসারে
মিশিছে কেবল,
পরশোক-সন্তাপিত নিত্য-নীর-বর্ষী এই
নয়নাশ্রু জল!

শ্রীকামিনীকান্ত নিয়োগী।

যশোবন্ত সিংহ।

(২)

১৭৫৭ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীনগরীতে শাজাহান বাদসাহ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন, অবশ্য সে সময়ে তিনি বার্দ্ধক্যেও উপনীত হইয়াছিলেন। কয়েক দিন পর্য্যন্ত বাদসাহ অজ্ঞানাবস্থায় থাকায়, সকলে তাঁহার জীবনের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠে। মসজীদে মসজীদে তাঁহার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা হইতে থাকে, গরীব ও ফকীরদিগকে ধন বিতরণ করা হয়, প্রজাবর্গ সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। দিল্লী নগরে কর্ম্মস্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং সর্ব্বত্র নীরবতা বিরাজ করিতে থাকে। ক্রমে তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে সমর্থ হন। দারা এই সময়ে বাদসাহের নিকটেই অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি পিতার অসুস্থতায় সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন, এবং বাদসাহকে স্বাস্থ্য ও বিশ্রামলাভের জন্য নৌকাযোগে দিল্লী হইতে আগরায় পাঠাইয়া দিলেন। যমুনাতরঙ্গকণাবাহী মৃদুল পবনে তাঁহার শরীর স্নিগ্ধ হইতে লাগিল, এবং সে সময়ে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থতাই লাভ করিয়াছিলেন। সুস্থ শরীরে বাদসাহকে নগরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল, এবং সম্রাটও দীন দুঃখীকে ধন বিতরণের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। বাদসাহ সুস্থ শরীরেই আগরাদুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এবং নীল যমুনার তীরে শারদ জ্যোৎস্নাস্নাত তাজমহলের শ্বেতচ্ছবি তাঁহার নয়নে ও হৃদয়ে শান্তিধারা ঢালিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ শান্তি অধিক দিন তাঁহার জীবনে ঘটিয়া উঠিল না।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, শাজাহানের পুত্রগণ অনেক দিন হইতে ময়ূরাসনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের চিরপোষিতা আশালতাকে ফলবতী করার জন্য সচেষ্ট হইলেন। দারা পিতার অভিপ্রায়ানুসারে সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য ভ্রাতাদের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল, তাঁহাদের

কর্ণে সমস্ত সংবাদই পঁহুছিতে লাগিল, এমন কি অন্তঃপুর হইতেও তাঁহারা বাদসাহের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধেও অবগত হইতে লাগিলেন, বাহিরের ত কথাই নাই, আরঙ্গজেবের ভাগ্যেই ইহা বিশেষরূপেই ঘটিয়াছিল। তিনি রোশেনারা বেগমের অনুগ্রহে সমস্ত সংবাদই বিদিত হইয়াছিলেন। সুজা কিন্তু লোকপরম্পরায় পিতার পীড়ার কথা শুনিয়া সর্ব্বাগ্রেই যাত্রা করেন। তিনি বাঙ্গালার রাজধানী রাজমহল হইতে আগরার দিকে অগ্রসর হইলে, রাজা জয়সিংহ বাদসাহ কর্তৃক এবং দারার পুত্র সোলেমান শেকো স্বীয় পিতা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সুজার সম্মুখীন হন। জয়সিংহ উভয় পক্ষের বিবাদ নিবৃত্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, সুজা অবশেষে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য হইতে যাত্রা করিয়া মোরাদের সহিত মিলিত হওয়ার চেষ্টা করেন। দারা তাঁহাদের গতিরোধের জন্ত মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ও কাশীম খাঁকে প্রেরণ করেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, দারার সহিতই যশোবন্ত সিংহের ঘনিষ্ঠতা স্থাপন হইয়াছিল, এবং বাদসাহ দারাকেই স্নেহ করায়, যশোবন্ত তাঁহারই পক্ষাবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। দারা যশোবন্তকে পাঁচ হাজারী মনসবদারী পদ প্রদান করিয়া মালবের শাসনকর্ত্তা করিয়াও পাঠান। যশোবন্ত সিংহ ও কাশীম খাঁ নর্ম্মদাতীরে উপনীত হইলে আরঙ্গজেব ও মোরাদের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। আমরা নিম্নে তাঁহাদের সংঘর্ষের বিবরণ প্রদান করিতেছি।

দাক্ষিণাত্য হইতে যাত্রা করার পূর্ব্বে আরঙ্গজেব মীরজুম্লাকে হস্তগত করিয়া ফেলেন। জুম্লা ইতিপূর্ব্বে উজীরের পদে নিযুক্ত ছিলেন, দারা তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। দ্বিতীয় পুত্র মোয়াজিমের প্রতি দাক্ষিণাত্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া আরঙ্গজেব অগ্রসর হইলেন। তিনি দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহীর সহিত প্রথমে বুরহানপুরে উপস্থিত হন, এবং তথা হইতে মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী অভিমুখে গমন করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মোরাদও আমেদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহার সহিত উজ্জয়িনীতে যোগদান করিবেন বলিয়া লিখিয়া পাঠান। নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইয়া আরঙ্গজেব অবগত হইলেন যে, মহারাজ যশোবন্ত সিংহ দারার পক্ষ হইতে উজ্জয়িনী

অধিকার করিয়া সত্তর হাজার অশ্বারোহীর সহিত অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু তিনি তথায় তাঁহাদিগকে বাধা দেওয়ার জন্য মহারাজের কোন সৈন্য উপস্থিত থাকিতে না দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বাস্তবিক মহারাজ যশোবন্ত সিংহ যদি সেই সময়ে আরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি যে জয়লাভে সমর্থ হইতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ তখন আরঙ্গজেব মোরাদের সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই। আরঙ্গজেব নর্ম্মদা পার হইতে চেষ্টা না করিয়া মোরাদের অপেক্ষায় পরপারেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

যশোবন্ত সিংহ একটি সুরক্ষিত স্থান হইতে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবেন, মনে করিয়া আরঙ্গজেবের শিবির হইতে পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে* একটি জঙ্গল বেষ্টিত পর্ব্বতের মস্তকস্থিত সমতল ক্ষেত্রে আপনার শিবির সন্নিবেশ করেন, এবং তিনি মনে করিয়াছিলেন যে,মোরাদ আরঙ্গজেবের সহিত যোগদান করিলে একদিনেই দুই সাজাদারই দর্প চূর্ণ করিবেন। সেই জন্য তিনি আরঙ্গজেবের অল্পসংখ্যক পরিশ্রান্ত সৈনিকগণকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি রাজপুত, রাজপুতের ন্যায়ই বীরত্ব প্রকাশে তাঁহার অভিলাষ ছিল, কিন্তু রণনীতি অনুসারে তাহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই বলিয়া ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন। কারণ তাঁহার সামান্যমাত্র আক্রমণেই আরঙ্গজেবের পরিশ্রান্ত সৈনিকগণ নর্ম্মদাসলিলে চিরদিনের জন্য ভাসিয়া যাইত। যে যাহা হউক, রাজপুত এরূপ কৌশলকে কখনও মনে স্থান দান করেন না, তজ্জন্য রাজপুতগৌরব মহারাজ যশোবন্ত সিংহ নর্ম্মদার ভীষণ সমরে শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করিতে সমর্থ না হইলেও উক্তরূপ কৌশল অবলম্বনকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে মোরাদের কতক সেনা উপস্থিত হইল। পশ্চাতে মোরাদ আসিতেছেন জানিয়া আরঙ্গজেব তাঁহাকে শীঘ্র আসিবার জন্য সংবাদ দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি নিদাঘে ক্ষীণসলিলা নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে

* টড ঐ স্থানকে ফতেয়াবাদ বলিতেছেন। বার্ণিয়ার কিন্তু ইহার পর যমুনা তীরের সামনগড় নামক স্থানে যেখানে বরং দারার সহিত আরঙ্গজেব ও মোরাদের সংঘর্ষ ঘটে তাহাকেই ফতেয়াবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। টড আবার ঐ স্থানকে চোলপুর বলিতেছেন।

আসিলেন। নদীতীরস্থ উচ্চভূমিতে, তিনি ফরাসী গোলন্দাজচালিত কামানশ্রেণী স্থাপন করিয়া তাঁহাদের সৈন্যের নদীগর্ভে প্রবেশ করিলেন ও নদী অতিক্রম করিয়া পরপারে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। যশোবন্ত সিংহের কতক সৈন্য বাধা প্রদান করিয়াও আরঙ্গজেবকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। রাজা নদীতীরের উচ্চতা ও তাঁহার প্রেরিত সৈন্যগণের কার্য্যদক্ষতায় বিশ্বাস করিয়া নিজে কিছু দূরে সৈন্য সংস্থাপনেই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, আরঙ্গজেব এত সহজেই নদী পার হইবেন। পর দিন মোরাদ আসিয়া আরঙ্গজেবের সহিত মিলিত হইলে তাঁহারা প্রাতঃকালে রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া পরামর্শ স্থির করিলেন।* তখনও পর্য্যন্ত মোরাদের সমস্ত সৈন্য উপস্থিত হয় নাই।

মহারাজ যশোবন্ত শাহজাদাদিগের গতিবিধি অবগত হইয়া প্রাতঃকালে সৈন্যগণকে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কাশীম খাঁ তাঁহার সহিত আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বরাবরই ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছিলেন, এমন কি আরঙ্গজেবের সহিত তিনি যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়াও তাঁহার প্রতি সন্দেহ জন্মে। যশোবন্ত সিংহ জয়লাভ করিলে ভারতে মুসলমান বংশের শেষ হইবে বলিয়া মোগলশিবিরে এক রবও উঠিয়াছিল, এবং তাহা আরঙ্গজেবের কৌশল বলিয়াই বিবেচিত হয়। সে যাহা হউক, প্রথমে কাশীম খাঁর মোগলসৈন্যই আরঙ্গজেবের সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু অল্পক্ষণ পরে তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ তখন আপনার রাজপুত সৈন্য লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে বিপক্ষগণের প্রতি ধাবিত হন। তাঁহার আক্রমণে আরঙ্গজেবের সৈন্যেরা অস্থির হইয়া উঠিল। ফরাসী গোলন্দাজচালিত কামানশ্রেণীর গোলায় রাজপুতগণ বিধ্বস্ত হইলেও রাঠোরগণ আপনাদের

* খাফি খাঁ বলেন যে, আরঙ্গজেব কবরাজ নামে একজন ব্রাহ্মণসন্তান ও হিন্দি কবির দ্বারা যশোবন্তকে বলিয়া পাঠান যে, তিনি তাঁহার পিতাকে দেখিতে যাইতেছেন, তাঁহার যুদ্ধের কোন ইচ্ছা নাই। সুতরাং কোনরূপ রক্তপাত না করিয়া তাঁহারা উভয়পক্ষ মিলিত হইয়া আগরা যাইতে চান। যশোবন্ত কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য করেন নাই।

(Elliot Vol. VII P. 218)

জাতিগত অমানুষিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বিপক্ষসৈন্য মথিত করিতে লাগিল। বিজয়লক্ষ্মী যশোবন্তের মস্তকে জয়মালা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে মোরাদ সহসা উপস্থিত হইয়া রাজপুতগণের পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং জয়মাল্য কাড়িয়া লওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সম্মুখে ও পার্শ্বে আক্রান্ত হইয়া রাজপুতেরা অস্থির হইয়া উঠিল। যশোবন্ত তাঁহার প্রিয় অশ্ববরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বর্শাহস্তে মধ্যস্থলে বিপক্ষগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজপুতেরা ক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়াও আপনাদের বীরত্ব প্রদর্শনে ক্রটি করে নাই। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় যুদ্ধ জটিল হইয়া উঠিল। অন্ধকারে মিত্র শত্রু বলিয়া আক্রান্ত হইতে লাগিল; শত্রু মিত্র বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। ক্রমে যুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়া গেল, যশোবন্ত সিংহ রক্তাক্ত কলেবরে রক্তাক্ত মবুবের পৃষ্ঠে বসিয়া ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় অবশেষে লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধস্থান হইতে অপসৃত হইলেন।* মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, যুদ্ধনিবৃত্তির পর যশোবন্ত সিংহ দম্ভসহকারে যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে আপনার রথ চালিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চাদনুসরণের জন্য আরঙ্গজেবের নিকট প্রস্তাব হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে, আহত বরাহকে পলায়ন করার অবকাশ দেওয়াই কর্ত্তব্য।† ১০৬৮

* Jeswunt, spear in hand, mounted his steed Maboob, and charged the imperial brothers, ten thousand Moslems fell in the onset, which cost seventeen hundred Rahtores, besides Gehlotes, Haras, Gores, and some of every clan of Rajwarra. Arung and Morad only escaped because their days were not yet numbered. Maboob and his rider were covered with blood; Jeswunt looked like a famished lion, and like one he relinquished his prey. Tod (টডের উক্তি)

† The Maraja, after the battle was over, drove his chariot, by way of bravados, qiute round the army of the victors, and when it was proposed to Aurungzeb that a party

হিজরার ২২এ রজব ১৬৫৮ খৃঃ অব্দের ২০ এপ্রিল * এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেক সৈন্ত হতাহত হয়। † যে সমস্ত রাঠোর ইহাতে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে রত্ন রাওএর নামই উল্লেখযোগ্য। যশোবন্ত মাড়োয়ারাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং আরঙ্গজেব ও মোরাদ উজ্জয়িনীতে উপনীত হন। পরে তথা হইতে তাঁহারা আগরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

নর্মদার যুদ্ধে যশোবন্ত যে অসীম পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু কেন যে তিনি জয়লাভে সমর্থ হন নাই, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি রাজপুত, রাজপুতেরা তৎকালে অধঃপতিত হিন্দুজাতির শেষ নিদর্শনস্বরূপ ভারতপৃষ্ঠে বিরাজ করিতেছিলেন। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ধর্ম্মযুদ্ধকে আপনাদের একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করিতেন, এবং পুরাণ ইতিহাস যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্মযুদ্ধের বিবরণে সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারা সেই প্রাচীন আদর্শ কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তজ্জন্ত রাঠোরকুলগৌরব মহারাজ যশোবন্ত সিংহ আরঙ্গজেবের পথশ্রান্ত সৈন্তদিগকে আক্রমণ করিয়া রাজপুতগৌরব নষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি দুই শাজাদাকে এক সঙ্গে আক্রমণ করিয়া রাজপুত পরাক্রম প্রদর্শন করিতে

should be detached in pursuit of that prince,"No", he replied, "let the wounded boar have time to fly."

(Dow. Vol. III P. 242.)

* Elliot's History of India Vol. VII P. 219. কিন্তু Dow ২০এ এপ্রিল স্থলে ২২এ লিখিয়াছেন। (Dow Vo. III P. 242.)

† Ten thousand Moslems fell in the onset, which cost seventeen hundred Rahtores, besides Gehlotes, Haras, Gores, and some of every clan of Rajwarra.

About the setting of the sun, the field, covered with ten thousand dead bodies on the side of the enemy, was left to Aurungzebe and Morad,

অভিলাষী হন ; এবং তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রাজপুত "সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ, ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি," এই মহা বাক্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। কাজেই তাঁহারা জয়লাভের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ জয়লাভের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রাঠোরগৌরব রক্ষার জন্যই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তৎসঙ্গে জয়লাভ করিয়া যদি দারার সিংহাসন প্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি আনন্দিত হইতেন, কিন্তু তিনি তদপেক্ষা যে জাতীয় গৌরবকেই অধিকতর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মোগল কর্মচারী হইয়া তিনি মোগল গৌরব রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তদপেক্ষা তিনি যে আত্মগৌরব ও জাতীয়গৌরব রক্ষণেই ব্যস্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। মহারাজ যশোবন্ত নর্ম্মদা-যুদ্ধে জয়লাভ না করিলেও ইহাতে তিনি ও তাঁহার সহচরগণ যে অসীম বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রাত্রির অন্ধকারই যে রাজপুতগণকে শেষ পর্য্যন্ত পরাক্রম প্রদর্শন করিতে দেয় নাই সে কথারও উল্লেখ করিতে তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই।* সুতরাং রাত্রি সমাগত না হইলে কোন্ পক্ষ যে জয়লাভ করিত তাহাই বা কে বলিতে পারে ? ফলতঃ নর্ম্মদার যুদ্ধে

. Fewer than six hundred of these brave men, whose number at the commencement of the action amounted to nearly eight thousand, survived the carnage of that dreadful day.

* Jeswant Singh displayed extraordinary valour, disputing every inch of ground with skill and pertinacity. That undaunted raja was beset on all sides by an overwhelming force, and saved only by the affecting devotion of his rajputs, the far greater part of whom died at his feet. (Bernier)

The Maraja advanced with impetuosity, and the prince met him half way. The shock was extremely violent, and the rebels were on the point of giving way, when Morad, with

শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ না হইলেও উহাতে যে যশোবন্ত সিংহ ও রাজপুতগণের গৌরব ঘোষিত হইয়াছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

his troops, just arrived on the field, attacked the enemy in flank; and Aurungzebe, who had been on the point of retreating, advanced again to the charge. The Rajaputs behaved with their usual bravery; but they were surrounded on all sides. The action became mixed and undistinguished. Friends were mistaken for foes and foes for friends. Uncertainty would have suspended the sword; but fear made it fall every where. About the setting of the sun, the field, covered with ten thousand dead bodies on the side of the enemy, was left to Aurangzebe and Morad. (Dow)

The bard is fully confirmed in his relation of the day, both by the Moghul historian and by Bernier, who says, that notwithstanding the immense superiority of the imperial princes, aided by a numerous artillery served by Frenchmen, night alone put a stop to the contest of science, numbers, and artillery, against Rajpoot courage. Both armies remained on the field of battle, and though we have no notice of the anecdote related by the first translator of Ferishta, who makes Jeswunt "in bravado drive his car round the field," it is certain that Aurangzebe was two politic to revew the combat or molest the retreat which took place next day towards his native dominions. Although, for the sake of alliteration, the bard especially singles out the Gehlotes and Gores, the tribes of Murar and Seopur, all and every tribe was engaged; and if the Rajpoot ever dared to mourn the fall of kindred in battle, this day should have covered every house with the emblems of grief; for it is stated by the Moghul historian that fifteen thousand fell, chiefly Rajputs. This was one of the events glorious to the Rajpoot, shewing his devotion to whom fidelity (Swamidharma) had been pledged the aged and enfeebled emperor Shah Jahan whose "salt

they ate,"—against all the temptations offered by youthful ambition. It is forcibly contrasted with the conduct of the immediate household troops of the emperor, who even in the moment of battle, worshipped the rising sun, whilst the Rajpoot sealed his faith in his blood ; and none more liberally than the brave Haras of Kotah and Boondi. The annals of no nation on earth can furnish such an example, as an entire family, six royal brothers, stretched on the field, and all but one in death.

এই সমস্ত নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণের উক্তি সত্ত্বেও কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক রাজা যশোবন্ত ও রাজপুতদিগকে কিরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

Every minute the dark ranks of the infidel Rajputs were dispersed by the prowess of the followers of Islam. Dismay and great fear fell upon the heart of Jaswant, their leader, and he, for from acting like one of the renowned class of rajas, turned his back upon the battle, and was content to bring upon himself everlasting infamy.

(Khafi khan, Elliot Vol. VII.)

———

প্রতিভা।

—:•:—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূজার কাপড়।

বালিকার নিত্য নূতন আব্দার। কখন কি আব্দার করিয়া বসে তাহার কোন ঠিক নাই। আব্দারের চোটে তাহার মাতা বিরক্ত হইয়া গিয়াছেন। আজ এ পাড়ার ছেলেদিগকে একটা খেলনা খেলিতে দেখিয়া তাহাই আব্দার করিয়া বসিল; কাল ওপাড়ার মেয়েদিগকে একটা খেলনা খেলিতে দেখিয়া তাহাই আব্দার করিয়া বসিল। তাহার মাতা সহায় সম্পত্তিহীনা বিধবা, তিনি এ সকল আব্দার কোথা হইতে রক্ষা করিবেন? ভগবান্ তাঁহাকে সব দিয়াছিলেন, আবার সব কাড়িয়া লইয়াছেন। কন্যা বালিকা, সে তাহার কিছুই বুঝে না। তাহার আব্দার রক্ষা না করিলে সে কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করে। ক্রন্দনই তাহার ঔষধ।

বালিকার নাম প্রতিভা। সে ওপাড়ার ঘোষেদের ছোট মেয়ের পূজার ঢাকাই সাড়ী দেখিয়া আসিয়া, তাহার মাতার নিকট কাপড়ের বায়না করিয়া বসিল। কন্যার কাপড়ের বায়না শুনিয়া তাহার মাতা মাথায় হাত দিয়া বসিলেন; নীরবে অশ্রুপাত করিলেন। কন্যার অন্যকার আবদার অসঙ্গত নহে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা অসঙ্গত করিয়া তুলিয়াছিল। কন্যার মাতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! এখন এক খানা ঢাকাই সাড়ী কি দিয়া কিনিব তাহাই ভাবিতেছি। এমন দিন গিয়াছে যখন আমি স্বহস্তে কত ভাল ভাল ঢাকাই সাড়ী গ্রামের সধবাদিগকে পূজার সময় দান করিয়াছি। এখন সে সকল স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ না হইলে, আজ ঢাকাই সাড়ীর জন্য আমাকে অশ্রু ফেলিতে হইত? সকলই সময়েতে করিয়া থাকে! ইচ্ছাময়ী ধন্য তোমার খেলা! আবার বলি, ধন্য তোমার বিশ্ব-পালন! তুমি একজনকে কাঁদাইয়া আর এক জনকে হাসাও।"

কন্যার মাতা আবার ভাবিতে লাগিলেন, "এখন কি করি, কোথায় যাই? কোথায় যাইলে ঢাকাই সাড়ী পাই? কন্যা অবোধ; কিছুই বুঝে না। সংসারের সুখ দুঃখ বালিকা কি বুঝিবে? যদি সে তাহাই বুঝিত, তাহা হইলে ঢাকাই সাড়ীর জন্য আব্দার করিয়া বসিবে কেন? যাহার এক মুষ্টি অন্নের অভাব সে ঢাকাই সাড়ী কি দিয়া কিনিবে? লোকে শুনিলেই বা কি বলিবে? শিশুর সব সাজে।" মাতা পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন।

এ ক্রন্দন বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, হৃদয়বিদারক। মনুষ্যসংসারের এ চরম সময়। দরিদ্রতা যে কি জিনিষ তাহা ধনীতে বুঝিতে পারে না। যে ভোগ করিয়াছে সে ইহার ফল উপলব্ধি করিয়াছে।

অসুরনাশিনি! তুমি আবার বঙ্গে আসিতেছ কেন? তোমার সব খেলা ছায়াবাজী! তুমি মা হইয়া সন্তানের দুঃখ কি করিয়া দেখ? মা হইয়া সন্তানকে অনশনে রাখিয়া কি করিয়া তুমি মুখে গ্রাস তুল? ইহার নাম কি মায়া,—ধন্য তোমার মায়া! দুর্গে! তুমি বঙ্গে আসিতেছ লোককে কাঁদাইতে না হাসাইতে? তোমার আগমনে কয়জনে হাসিতেছে? তোমার কি চক্ষু নাই? দেখ চাহিয়া তোমার সন্তানেরা কি জন্য তোমার আগমনে কাঁদিতেছে; –? কই তাহারাত হাসিতেছে না;—?

দশভুজে! তুমি বাপের আলয়ে আসিয়া দশহাতে খাও। খাও, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া খাইও। তুমি মর্ত্ত্যে আসিয়া দশহাতে খাইয়া তোমার সন্তানদিগকে পথের ফকীর করিও না এইটী আমাদের মিনতি। তোমার অন্ন প্রচুর। কিন্তু তোমার সন্তানদিগের অন্ন অপ্রচুর। তুমি এমনি মা যে, তুমি সন্তানদিগের পশ্চাতে ফিরিয়া চাহ না। তুমি পাহাড়ে বাস করিয়া পাহাড়ী হইয়া গিয়াছ,— !

পাষাণি! একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ যে, তুমি খাইয়া অবন্তীপুরের ঘোষেদের কি দুর্দ্দশা করিয়াছ? কেন, তাহারা তোমার কি করিয়াছিল? তুমি এমনি লোভী যে, খাইতে বসিয়া তাহাদের শিশুরও খাদ্য পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখ নাই,—! মা হইয়া তোমার সন্তানের উপর খুব বিচার! মহেশ্বরি! এরূপ বিচার কি চির কাল থাকিবে?

ত্রিলোচনে! তুমি তাহাদের কাঁদাইয়াছ কেন? যে তোমায় প্রতি-

বৎসর পট্টবস্ত্রে মণ্ডিত করিয়া থাকে তাহার প্রতি এত বাম কেন? তাহারই প্রতি তুমি এমনি সদয়া যে, সে কন্যার নিমিত্ত এক খানা ঢাকাই সাড়ী কিনিতে অসমর্থা! বাহাদুরি তোমার চাতুরি! তবে তাহার যথাসর্ব্বস্ব দিয়া সে প্রতিবৎসর তোমায় আনিয়াছিল কেন? তুমি খাইয়া তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছ। অবশেষে তুমি তাহাদের বাটীর ইটগুলি পর্য্যন্ত খাইতে ধরিয়াছ। এখন তাহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহ না কেন? এখন আর তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে উঁকি মার না কেন? তোমারই জন্য তাহারা এত সুন্দর করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ তৈয়ার করিয়াছিল। কই এখন যাও কই? তুমি যাওনা বলিয়া তাহাদের এমন সাধের পূজার দালান রসাতলে যাইতে বসিয়াছে! লজ্জাভয়বারিণি! এখন তাহাদের লজ্জাভয় নিবারণ কর?

জগদম্বে! তুমি কি পাপে ইহাদের উপর কুপিত হইলে? ইহারা কি তোমার অনাদর করিত তাহাই তুমি ইহাদের উপর বিরক্ত হইয়াছ? মা! ভুলে যাও,—ভুলে যাও, এখন ভুলে যাও। তাহাদের প্রতি দয়া কর; যে তোমায় এক দিন আনিয়াছে,—সে তোমায় কি ভুলিতে পারে? মা! সেই বিধবার বুকের উপর হাত দিয়া দেখ সে কিরূপ করিতেছে। তোমার আগমনের দিন যতই নিকটে আসিতেছ, ততই তাহার বক্ষঃ স্পন্দন হইতেছে; অশ্রুপাত হইতেছে। অন্তর্য্যামিনি! তোমাকে আর কি বুঝাইব? তোমাকে আর কি দেখাইব? আবার বলি, তুমি আসিতেছ কাঁদাইতে না হাসাইতে? অবন্তীপুরের ঘোষেদের যেরূপ কাঁদাইতেছ, এরূপ কত লোককে তুমি কাঁদাইয়াছ। এ বৎসর যে হাসিয়াছে আবার আগামী বৎসরে সে কাঁদিবে। তোমার এমনি ধারা! মা গো! তুমি'ত সব দেখিতেছ সব শুনিতেছ; আবার কি তোমায় দেখাইতে হইবে? তোমার চক্ষু যে সহস্র!

প্রতিভা বালিকা। সে প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া তাহার সঙ্গিনীদিগের সহিত পাড়ায় খেলা করিতে গিয়াছিল। ঘোষেদের বাড়ী যেই বোধনের ঢাকে বাড়ি পড়িল, অমনি ছেলেমেয়েরা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ছুটিল। তাহার সঙ্গিনীরা পূজার নূতন কাপড় পরিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া প্রতিমা দেখিতে যাইল। প্রতিভা তাহাই দেখিল। সে ছেলেমানুষ; মার কাছে কাঁদিয়া আসিয়া বলিল, "মা আমায় কাপড় দাও?"

প্রতিভার জননী কাপড়ের কথা শুনিয়া দিশেহারা হইলেন। তিনি কন্যার কাপড়ের কথা শুনিয়াও কোন কিনারা করিতে পারেন নাই। কেবল অকূল চিন্তারূপ সমুদ্রে ডুব দিয়া ভাবিতেছিলেন, "হায়! এখন কাপড় কি দিয়া কিনিব।"

প্রতিভা তাহার মাতাকে কথা বলিবার অবসর না দিয়া বলিল, "মা আমার কাপড় দাও? তারা সব চ'লে গেল।"

জননী কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। দুই চক্ষে শ্রাবণের ন্যায় ধারা বহিল। মাতা অতি কষ্টে বলিলেন, "আজ তোমার পুরাতন কাপড় পরিয়া যাও, কাল নূতন কাপড় পরিও।"

কন্যা কিছুতেই শুনিল না। সে চক্ষার হানিতে লাগিল—মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জননী কন্যাকে সস্নেহে কোলে তুলিলেন। বালিকাকে চুম্বন খাইয়া বলিলেন, "মা, তুমি খুব ঠাণ্ডা মেয়ে, ছিঃ! কাপড়ের জন্য কি বায়না করিতে আছে? তোমার বিয়ে হইলে তোমাকে কত ভাল ভাল কাপড় কিনিয়া দিব। নূতন কাপড় পরিয়া শ্বশুর বাড়ী যাইবে।"

জননী কন্যার কান্না ভুলাইবেন কি? তিনি নিজেই কাঁদিতে লাগিলেন। আহা! তাঁহার ক্রন্দন কত নৈরাশ্যের, কত নিদারুণ মর্ম্মযাতনার।

কন্যা কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। তাহার মাতার স্তোভ বাক্যে তাহার কিছুই হইল না। অনেকক্ষণ পর প্রতিভা চুপ করিল। তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, আমার কাপড় কাল দিতে হইবে?"

জননী বলিলেন,"আজ এই কাপড় পরিয়া যাও.কাল নূতন কাপড় দিব।"

এমন সময়ে বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ হইল। যিনি আসিতেছিলেন তিনি একজন প্রাচীন পুরুষ। তিনি গলা ঝাড়া দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রতিভাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কিরে কাঁদিতেছিস্ কেন?"

প্রাচীন পুরুষ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে প্রতিভার মাতা ঘোম্‌টা দিয়া সরিয়া গেলেন এবং প্রতিভার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "প্রতিভা, তোর জ্যাঠা মহাশয় আসিয়াছেন। তুই উঠিয়া বস।"

বৃদ্ধগৃহে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ডাকিলেন,"প্রতিভা,তুমি কাঁদিতেছ কেন ?"

প্রতিভার তখন ক্রন্দন থামিয়াছিল, কিন্তু তাহার দুই গণ্ডে তখনও অশ্রু বহিতে ছিল। জ্যাঠা মহাশয় ডাকিতেছেন শুনিয়া প্রতিভা ভগ্নস্বরে কহিল, "আমি মার কাছে পূজার কাপড় চাহিয়াছিলাম, মা আজও কাপড় আনেন নাই।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "এই কথা! আচ্ছা, তুমি কি রকম কাপড় চাও?"

প্রতিভা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল,"ওপাড়ার ঘোষেদের ছোট মেয়ের মতন ঢাকাই সাড়ী আমি পরিব। আমি ঐ রকম ঢাকাই সাড়ী চাই।"

বৃদ্ধ মুচ্‌কি হাসিয়া বালিকার মুখে চুম্বন খাইয়া কহিলেন, "আচ্ছা মা, আমি ঐ রকম ঢাকাই সাড়ী তোমার কাল কিনিয়া দিব, তাহা হইলে তোমার হইবে?

প্রতিভা কহিল, "হঁ্যা।"

বৃদ্ধ কোল হইতে প্রতিভাকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, "মা, আমি এখন যাই। কাল তোমার ঢাকাই সাড়ী আমি লইয়া আসিব।"

প্রতিভা ঢাকাই সাড়ীর নামে আনন্দে উৎফুল্লিতা হইল।

তাহার পর বৃদ্ধ প্রতিভার মাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ছোট বউ, তুমি খুব সাবধানে থাকিও। রাত্রিতে যদি একলা থাকিতে ভয় করে, তাহা হইলে আমাদের বাড়ীতে গিয়া শুইও। আর একটা বিষয়ে তোমাকে সাবধান করিয়া দিই। তুমি যেন প্রতিভাকে উজ্জলপুরের ঘোষেদের বাড়ীতে পূজা দেখিতে পাঠাইও না। যদি কোন লোক পাঠায়,তাহা হইলে প্রতিভাকে যাইতে দিবে না। আমি এইকথা বলিবার জন্য এখন আসিয়াছিলাম।"

বৃদ্ধ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রতিভার মাতার আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হইল। তিনি যুক্ত করে ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া কহিলেন, "দয়াময়ি! তোমার চরণে যেন মতি থাকে। তুমি বিনা দুর্ব্বলের আর বল নাই। আজ তুমি আমার মুখ রক্ষা করিলে। তুমি না মুখ তুলিয়া চাহিলে আমি কি করিয়া কন্যার আবদার রক্ষা করিতাম? আর তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার যে, তুমি এ শত্রুসঙ্কুল দেশে আমার একজন বন্ধু দিয়াছ। এ যথার্থ বন্ধু।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বন্ধু।

এ সংসারে বন্ধু কয় জন? প্রকৃত বন্ধু খুব বিরল। যাঁহার বন্ধু নাই, তিনি ভাবিয়া থাকেন আমি বন্ধুহীন। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, "দুষ্ট বলদ অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল"। যখন মানুষের সুসময় থাকে তখন অনেক রকমের অনেক বন্ধু আসিয়া জুটে। যেই পতন অবস্থা হয় অমনি তাহারা সরিয়া পড়ে। কে যে কোথা দিয়া পলাইয়া যায় তাহার কোন ঠিক নাই। হায় মনুষ্য! হায় তোমার বন্ধু!

যে বৃদ্ধ প্রতিভাকে কাপড় দিবেন বলিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের একজন প্রতিবাসী। তাঁহার নাম যদুনাথ চৌধুরী। যদুনাথ চৌধুরী ন্যায়নিষ্ঠ, পরহিতৈষী, ধার্ম্মিক পুরুষ। তিনি এক সময়ে প্রতিভার পিতার নিমক খাইয়াছিলেন। সে নিমকের গুণ তিনি অদ্যাবধি ভুলিতে পারেন নাই। তখন তাঁহার প্রভুর সুসময় ছিল; সুতরাং যদুনাথ চৌধুরী প্রতিদানের বিশেষ সুবিধাজনক সুযোগ খুঁজিয়া পান নাই। এখন প্রতিভার পিতা ইহ-জগতে নাই এবং তাঁহার পরিবারদিগের যারপরনাই দুরবস্থা হইয়াছে। যদুনাথ চৌধুরী তাঁহার কর্ত্তব্যের এই উপযুক্ত অবসর পাইয়াছেন। তিনি প্রাণ দিয়া তাঁহার প্রভুপত্নী এবং কন্যার উপকার করিতেছেন। যদুনাথ চৌধুরী "দলের" বন্ধু নহেন। তাহা যদি হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এখন কেহ আর খুঁজিয়া পাইত না।

যদুনাথ চৌধুরী প্রতিভার পিতার সদর কাছারির তহশীলদার ছিলেন। এ চাকুরীতে বেশ দু পয়সা ছিল। যদুনাথ চৌধুরী ধর্ম্মভীরু পুরুষ। তিনি আপন বাঁচাইয়া, আপন চাকুরীতে বসিয়া দু পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রতিভার পিতা ইহা জানিয়াও তাঁহার উপার্জ্জনের পথের কণ্টক হন নাই। প্রতিভার পিতা যদুনাথ চৌধুরী অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন। তিনি যদুনাথ চৌধুরীকে দাদা বলিতেন।

যদুনাথ চৌধুরীর বিবাহের পর তাঁহার স্ত্রী ছোট দুইটী কন্যা রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি আর দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করেন নাই। অনেকে এমন কি প্রতিভার পিতা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা শুনেন নাই। আজ কালকার উদাহরণ লইলে, যদুনাথ চৌধুরী অনায়াসে বিবাহ করিতে পারিতেন। তখন তাঁহার কন্যা শিশু ছিল এবং তাঁহার বিবাহের বয়সও কাছে ছিল। তাঁহার সংসারে এক বিধবা ভগিনী ছাড়া অন্য কোন স্ত্রী লোক ছিল না। এক্ষণে তাঁহার কন্যারা সকলেই বিবাহিতা। যদুনাথ ইন্দ্রিয়-জয়ী পুরুষ। তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

যদুনাথ চৌধুরীর আর একটি মহৎ গুণ ছিল। তিনি গ্রামের লোক দিগের সদা সর্ব্বদা উপকার করিতেন। কাহারও বা ছেলের জ্বর হইয়াছে অমনি তাহার ঔষধের বন্দোবস্ত করিতেন, কাহারও বা কন্যার পীড়া সারিয়াছে, অমনি তাহার পথ্যের বন্দোবস্ত করিতেন, কাহারও বা কন্যা প্রসব করিবে, অমনি ধাত্রীর যোগাড় করিতেন, কাহারও বা টাকার আবশ্যক, তাহাকে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিতেন, কাহারও বা ধানের আবশ্যক, তাহাকে ধান্য ধার দিতেন। বাড়ীতে সময় কি অসময়ে অতিথি আসিলে তাহাকে অন্ন দিতেন। এসকল গুণ যদুনাথ চৌধুরীর ছিল। একাধারে এত গুলি গুণ সকলের হয় না; কিন্তু তাঁহার ছিল।

সপ্তমী পূজার দিন সকালবেলা চৌধুরী মহাশয় এক খানি ঢাকাই শাড়ী হাতে করিয়া প্রতিভাদিগের বাড়ী যাইলেন। প্রতিভা তখন তাহার আদরের রাজা পুতুলকে সাজাইয়া গুজাইয়া শ্বশুর বাড়ী পাঠাইতেছিল।

চৌধুরী মহাশয় বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া ডাকিলেন, "প্রতিভা, তোমার ঢাকাই শাড়ী আনিয়াছি।"

প্রতিভা তখন পুতুল সাজাইতে নিবিষ্টচিত্ত। চৌধুরী মহাশয়ের ডাক তাহার কাণের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। সে কিছুই উত্তর দিল না।

চৌধুরী মহাশয় পুনরায় ডাকিলেন, "দেখ, তোমার জন্য কেমন ঢাকাইশাড়ী আনিয়াছি।"

প্রতিভার মাতা চৌধুরী মহাশয়ের গলার আওয়াজ শুনিয়া, প্রতিভাকে বলিলেন, "ওরে তোর জ্যেঠা মহাশয় আসিয়াছেন।"

প্রতিভা কাপড়ের কথা ভুলে নাই। সে ঐ কথা শুনিয়া জ্যেঠা মহাশয়ের কাছে ছুটিয়া গেল, এবং চৌধুরী মহাশয়ের হাতে ঢাকাই শাড়ী দেখিয়া পুলকিত হইল।

চৌধুরী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এটা কি বল দেখি, প্রতিভা ?"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল,—আমার ঢাকাই সাড়ী।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—হাঁ। ঢাকাই সাড়ী। কিন্তু তোমার কিসে জানিলে ?

প্রতিভা উত্তর করিল,—আপনি আমাকে কাল দিবেন বলিয়াছিলেন,—।

তখন চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—হাঁ, এ ঢাকাই শাড়ী তোমার জন্ত আনিয়াছি। এই বলিয়া তিনি ঢাকাই শাড়ী খানি প্রতিভার হাতে দিলেন। প্রতিভা কাপড় লইয়া তাহার মাতার নিকট ছুটিয়া যাইতে উদ্যতা হইল।

চৌধুরী মহাশয় তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—না, আমি তোমায় ঢাকাই শাড়ী পরাইয়া দিব ?

প্রতিভা বলিল,—না, আমি মার কাছে যাইয়া পরিব।

চৌধুরী মহাশয় প্রতিভার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন,—অবোধ বালিকা কিছুই বুঝে না। এমন দিন গিয়াছে যখন তোমাদের রাশি রাশি ঢাকাই শাড়ী গ্রামের কত লোকে পরিয়াছে। কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। বৃদ্ধ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

ত্র্যহস্পর্শ।

যে দিনে তিন তিথির স্পর্শ বা সংযোগ হইয়া অনেক শুভকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটায়, তাহাকে যে ত্র্যহস্পর্শ কহে, একথা সকলেই অবগত আছেন। তাহার দৃষ্টান্তে যাহাতে তিনটি বিষয়ের স্পর্শ হইয়া নানাপ্রকার অনর্থের উৎপত্তি হয়, আমরা চলিত কথায় তাহাকেও ত্র্যহস্পর্শ বলিয়া থাকি। আমাদের আলোচ্য ত্র্যহস্পর্শ সেইরূপই একটি ত্র্যহস্পর্শ, প্রকৃত ত্র্যহস্পর্শ নহে। এক্ষণে সে ত্র্যহস্পর্শটি কি তাহাই আমরা ব্যক্ত করিতেছি। আমাদের সমাজই সেই ত্র্যহস্পর্শ। তাহাতে ত্র্যহস্পর্শের যে দোষ ঘটিয়াছে, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আমাদের সমাজের যে দিন দিন অধঃপতন ঘটিতেছে তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবেনা। কত ব্যাধিতে যে সমাজশরীরকে আক্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। সেই ব্যাধি আবার দেশীয় ও বিদেশীয় দুই জাতীয়ই আছে। এক্ষণে যেমন আমরা আমাদের প্রাচীন ব্যাধিসমূহের সহিত নানা প্রকার নূতন নূতন বিদেশীয় ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেছি, আমাদের সমাজের অবস্থাও দিন দিন সেইরূপই ঘটিতেছে। আবার অনেক ভাল ব্যাপারও ব্যাধির আকার ধারণ করিয়া সমাজকে অবসন্ন করিয়া দিতেছে। তাহারা মূলে সমাজের হিতার্থে অনুষ্ঠিত হইলেও এক্ষণে এরূপ দোষের ভাব ধারণ করিয়াছে যে, সুদৃঢ় সমাজশরীর তদ্দ্বারা শিথিল হইয়া পড়িতেছে। সেইরূপ তিনটি দোষ বা ত্র্যহস্পর্শ দোষের কথাই আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি।

ইহার মধ্যে একটির নাম নামকীর্ত্তন দোষ। ভগবানের নামকীর্ত্তন দোষ একথা বলিলে সকলেই শিহরিয়া উঠিবেন। আমারাও যে উঠিতেছিনা তাহাও নহে। কিন্তু আমাদের সমাজে বর্ত্তমান আকারে তাহা যে দোষ ঘটাইতেছে, এ কথা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে। কলির জীবের পক্ষে একমাত্র নামই সম্বল, বেশ কথা। "হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব

কেবলং, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা," ভালকথা। কিন্তু সে নাম করাটী কি? দিনান্তে চক্ষু মেলিয়া বা চক্ষু মুদিয়া একবার হরিহরি বা কালী কালী বলিলে কি ঈশ্বর বা ঈশ্বরীর নাম করা হইল? যাহারা সমস্ত দিন প্রতারণা প্রবঞ্চনা বিলাস উপভোগে আপনাদের আত্মাকে ডুবাইয়া রাখিল, রাত্রিকালে পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া নরকের দ্বার উদ্ঘাটন করিল, দিনান্তে কৌতুকচ্ছলে একবার মুখে হরিনাম বা কালী নাম করিলে, সে কি নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবে? স্বীকার করি, নামের দাহিকা শক্তিতে সর্ব্বপাপ ভস্মসাৎ করিতে পারে। কিন্তু সেই শক্তির উদ্বোধন কি আমরা করিয়া থাকি? আমাদের নামকীর্ত্তন কি ঈশ্বর বা ঈশ্বরীর সহিত রহস্য নহে? সংসারের যত পাপ আমাদের প্রিয়, অথচ আমরা নামের অধিকারী. এরূপ যুক্তি আমাদের এই অধঃপতিত সমাজেই শোভা পায়। যদি আমরা ধ্যান, ধারণা, সাধনা, উপাসনা,পূজা, আহ্নিক ও যোগাভ্যাসের কথা শুনিয়া সন্ত্রাসিত হইয়া উঠি, ভাল, না হয় নামের মধুর রসাস্বাদনই করিলাম। কিন্তু আমরা কি নামরস আস্বাদন করিয়া থাকি, না অধরে তাহার স্পর্শ মাত্র করি। আমাদের নামরস ভিতরেও প্রবিষ্ট হয় না, এবং জিহ্বাগ্রও স্পর্শ করে না। তাহা অধর স্পর্শ করিয়াই অন্তর্হিত হয়। সুতরাং নামের শক্তি আমাদিগের কি করিবে? শক্তি যদি অবলম্বনই না পাইলেন, তবে সে শক্তির ক্রিয়া কিরূপে বুঝা যাইবে? আমরা যদি হৃদয়কপাট রুদ্ধ করিয়া আত্মদ্বারে অর্গল দিয়া রাখি, তবে শক্তি আকাশেই খেলা করিতে থাকিবেন। আর আমাদের আত্মা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিবে। বাস্তবিক যাহাতে চিত্তের বা আত্মার সংস্কার না হয়, তবে তাহার যে শক্তি আছে,তাহা কি করিয়া বুঝিব? তাই বর্ত্তমান নামকীর্ত্তনের কি শক্তি,তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা দেখিতেছি,আমাদের মধ্যে যাঁহারা কেবল নামেই নির্ভর করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই চারিজন ব্যতীত প্রায় সকলেই ঘোর স্বার্থপর, বিলাসী, বিষয়াসক্ত; এবং অনেকে প্রতারক,প্রবঞ্চক ও ইন্দ্রিয়াসক্ত; সুতরাং নামকীর্ত্তনের একটা আবরণ মাত্র তাঁহারা অবলম্বন করিতেছেন ব্যতীত আর কি বলিব? যে নামকীর্ত্তনে আত্মার মলিনতা দূর হইয়া যায়, চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়, লোকে তন্ময় হইয়া যায়, সে নামকীর্ত্তন কি আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে? আমরা

মুখে নামের দোহাই দেই বটে, কিন্তু কাজে আমরা তাহা লইয়া রহস্যই করিয়া থাকি। তাই আমাদের এরূপ অধঃপতন। নামকীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে আমরা আবার কখনও কখনও কামকীর্ত্তনও করিয়া থাকি। ঈশ্বরঈশ্বরীর নাম দূরে রাখিয়া আমরা সাধারণ নায়ক নায়িকার ন্যায় তাঁহাদের লীলাগান করিয়া দশজনকে শুনাইয়া থাকি। ইহাই কি মধুর ভাবের উপাসনা? উপাস্য উপাসকের মধ্যে মধুর ভাবের সম্বন্ধ থাকিতে পারে; কিন্তু নায়ক-নায়িকার ন্যায় ঈশ্বর ঈশ্বরীর লীলা দশজনকে শুনাইয়া তাহাদের চিত্তবিকার ঘটান, কি উপাসনার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? ফলতঃ আমাদের সমাজে এইরূপ নামকীর্ত্তন ও কামকীর্ত্তন প্রবেশ করিয়া ইহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। নামের দোহাই দিয়া আমরা এক্ষণে আলস্যের দাস হইয়া পড়িয়াছি, আমরা এক্ষণে ধ্যান, ধারণা, সাধনা, উপাসনা, পূজা, আহ্নিক বা যোগাভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করিতেই চাহি না। কেবল নাম করিয়াই উপাস্য দেবতার সহিত রহস্য করিতে চাই। আমরা স্বার্থে, বিলাসে, উপভোগে, ইন্দ্রিয়চরিতার্থতায় এত ব্যস্ত যে, ধ্যানধারণাদির তিলমাত্র অবকাশপ্রাপ্তি আমাদের ঘটিয়া উঠে না। তাই দিনান্তে নাম করিয়া একবার আমরা উপাস্য দেবতার বেগার শোধ করিয়া থাকি। বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ তাঁহার রাজ্যে প্রত্যেককে হরিনাম করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। লোকে দিনান্তে একবার হরিনাম করিয়া বলিত, গোপাল সিংহের বেগার সারিলাম। আমরাও সেই আসল বিষ্ণুপুরের রাজা আসল গোপাল সিংহেরই বেগার সারিতেছি। সুতরাং যাহা বেগার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমাদের নিজের কোনই উপকার হইবে না। আমাদিগকে এক্ষণে আত্মস্থ হওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। নিজের আত্মা কতদূর মলিন, তাহাই আমাদিগকে এক্ষণে লক্ষ্য করিতে হইবে। তজ্জন্য নামের বেগারে কিছুই হইবে না, কঠোর ধ্যানধারণার প্রয়োজন। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে উদ্যম অবলম্বন করিতে হইবে। কঠোর তপস্যা বা যোগাভ্যাসের অধিকারী না হইলেও ধ্যান, ধারণা, সংযম, নিরোধের কিছু কিছু অভ্যাসে আমরা রত হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আত্মার মলিনতা ও চিত্তের কালিমা অনেক পরিমাণে দূর হইবে। তাই বলিতেছি, নামের

বেগারে আর মন দিলে চলিবে না, তাহার যে দোষ ঘটিয়াছে, তাহার সংশোধনের প্রয়োজন। তবে যদি নামের মত নাম করিতে পারি, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু সে ক্ষমতা কি আমাদের আছে? আর আমাদের এই ঊষর হৃদয়ক্ষেত্রে তাহার বীজ অঙ্কুরিত হইবে কেন? চিত্তসংযম ও আত্ম-সংযমের দ্বারা যদি ক্ষেত্র উর্ব্বর করিতে পারি, তবেইত বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইবে। তজ্জন্য ধ্যানধারণাদিরই প্রয়োজন। তাই বলিতেছি, এই নাম দোষ আমাদের সমাজের অবনতিই ঘটাইতেছে। ইহাই ত্রিদোষের প্রথম দোষ।

দ্বিতীয় দোষ কৌলীন্য। সমাজের কল্যাণের জন্য মূলে ইহারও অবতারণা করা হইয়াছিল। "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠাবৃত্তি-স্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং॥" যাঁহারা উক্ত নবগুণসম্পন্ন হইতেন, তাঁহা-রাই কুলীন বলিয়া অভিহিত হইতেন। এই সমস্ত সদ্‌গুণই কৌলীন্যের পরি-চায়ক ছিল, এবং তাহা বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিত; সেই জন্য কুলীন বংশগুলি সমাজমধ্যে পবিত্রতার স্রোত প্রবাহিত করিয়া আমাদের দেশকে ধন্য করিয়া রাখিয়াছিল। আচারে, বিনয়ে, বিদ্যায়, নিষ্ঠায়, তপস্যায় যে মহাপুরুষগণ আমাদের এই সমাজকে আদর্শ সমাজ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণের এক্ষণে কি শোচনীয় পরিণতি! এক্ষণে বংশমর্য্যা-দাটি মাত্র তাঁহাদের সম্বল হইয়া উঠিয়াছে, নবগুণের একটি মাত্র গুণে হীন হইলেও যেখানে কেহই কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভে সক্ষম হইতেন না, আজ কি না সেখানে তাহার কোন গুণ না থাকিলেও, কেবলমাত্র বংশমর্য্যাদার জন্যই তিনি কুলীন নামে অভিহিত হইতেছেন! অবশ্য বংশধারাকে আমরাও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি। যাহাতে সুরক্ত প্রবাহিত, তাহাকে কদাচ অনা-দর করা যায় না। কিন্তু কেবল রক্তধারাতেই কৌলীন্য পর্য্যবসিত হইবে, এরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। সদ্বংশজাত ব্যক্তিকে যদি দুষ্কৃতির মূর্ত্তি-মান অবতাররূপে দেখা যায়, তবে তাহাকে কিরূপে আদর করিব? আমাদের সমাজে কি এক্ষণে তাহাই দৃষ্ট হইতেছে না? কুলীনসন্তানেরা আপনাদের কৌলীন্যকে অতল জলে ডুবাইয়া এক্ষণে কেবল বংশযষ্টি লইয়াই মারামারি করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কত জন যে অজ্ঞান, ও পাপের

লেখক তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। সেই বংশযষ্টি দ্বারা তাঁহারা আবার ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মাথা ফাটাইয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছেন। কুলীন-সেবার জন্য সমস্ত সমাজই ব্যস্ত, কুলীনে কন্যাদানকে আমরা পুণ্যের অখণ্ড ফলস্বরূপ মনে করিয়া থাকি, এবং তাহা করাও কর্ত্তব্য। কিন্তু সে কুলীনই বা কোথায়, সে কৌলীন্যই বা কোথায়? শুষ্ক বংশযষ্টির উপর আমরা আমাদের মল্লিকামালাগুলিকে পরাইয়া দিতেছি, এবং তজ্জন্য যে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছি, তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করিতেছি না। কুলীনগণ আপনাদের স্বেচ্ছানুরূপ অসম্ভব টাকা কড়ি অলঙ্কারপাতির দাবী করিয়া আমাদের মস্তকে কাঁঠাল ভাঙ্গিতেছেন আর তাহার আটায় আমাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া আমরা জগৎসংসারকে অন্ধকারময় দেখিতেছি। আমাদের কত স্বর্ণপ্রতিমাকে আমরা যে চিরদিনের জন্য ভাসাইয়া দিতেছি, কত কোমলপ্রাণাকে যে বলিদান দিতেছি, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। পূর্ব্বে এইরূপ বলিদান ও বিসর্জ্জন যে কত হইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। এক এক জন কুলীনসন্তান রাশি রাশি কুলীনকন্যার গলে পরিণয় পাশ বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে দুঃখ ও নৈরাশ্যের অগাধ সলিলে ডুবাইয়া দিয়াছেন। বিবাহ তাঁহাদের একটি ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য ছিল। আলস্যের ক্রীতদাস হইয়া তাঁহারা সংসারের কোনই কার্য্য করিতেন না। কেবল বিবাহ করিয়া অনেক পরিবারকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিতেন। দস্যুর ন্যায় তাঁহাদের সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া আপনাদের বিলাসিতা ও দুষ্ক্রিয়ার সেবায় নিয়োগ করিতেন। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের বা পরিবারপ্রতিপালনের জন্য তাঁহারা কোনই চেষ্টা করিতেন না। আলস্যের সেবাতেই তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। সমাজের কল্যাণ বা দেশের হিতের জন্য তাঁহারা স্বপ্নেও চিন্তা করিতেন না। ক্রমে তাঁহাদের দ্বারা ও তাঁহাদের জন্য সমাজে নানাবিধ পাপস্রোত প্রবাহিত হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ কৌলীন্যের অনেক পরিমাণে হ্রাস হইলেও, নূতন নূতন কৌলীন্যের আবার উদয় হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ তাহাদের মধ্যে একটি; এটি বংশমর্য্যাদাকে ক্রমে নিম্নে ফেলিয়া দিতেছে। যে যত

পাশ করিতে পারিবে, তাহার দর তত বাড়িবে। পাশ করা ছেলেরা নীলামের সম্পত্তির ন্যায় এক্ষণে উচ্চদরে বিক্রীত হইতেছে। ইহারা আবার উচ্চ শিক্ষিত বলিয়া দেশ মধ্যে গণ্য, ইহাদের অভিভাবকেরা তজ্জন্য বিশেষরূপ গর্ব্বিত। উচ্চশিক্ষার প্রকৃত অর্থ কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, তবে যে শিক্ষার দ্বারা ছেলেরা উচ্চদরে বিক্রীত হয়, তাহাই উচ্চশিক্ষা বলিয়া প্রতীত হইতেছে। বংশযষ্টিসম্পন্ন কুলীনদিগের অপেক্ষা উচ্চশিক্ষিত ছেলেদের অভিভাবকগণের লালসা আরও ভয়ানক। তাহা এরূপ বিশ্বগ্রাসিনী হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের সমাজটিকে অচিরকালমধ্যেই গ্রাস করিয়া ফেলিবে। সমাজসংস্কারের জন্য কত বাগাড়ম্বর হইতেছে; কিন্তু কন্যাপণের সংস্কার করা কোন সংস্কারকের শক্তিতেই কুলাইল না। যে সমাজ স্বার্থপর ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ, তাহার কোন দোষের সংস্কার হইতে পারে কি? তাই আমাদের অনেক পরিবারের ভিটামাটি উৎসন্ন হইতেছে। এই সমস্ত লোকই আবার আপনাদিগকে উচ্চশিক্ষিত বলিয়া বড়াই করিয়া থাকে। ধিক্ তোমাদের শিক্ষায়, ধিক্ তোমাদের দীক্ষায়। তোমরা কসাইয়েরও অধম! পিশাচেরও অধম! আর একপ্রকার নূতন কৌলীন্য ধীরে ধীরে আবার আমাদের সমাজে দেখা দিতেছে। সেটি ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে উপবীতগ্রহণ। আমাদের সমাজের ব্রাহ্মণেতর জাতির মূল কি তাহা অবিসম্বাদিরূপে স্থির না হইলেও উপবীতগ্রহণের স্রোতটা কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই চলিতে আরম্ভ হইয়াছে; ইহাতে সেই শুষ্ক বংশযষ্টিখানিকে কিন্তু ক্রমে গাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; কারণ কুলীন অকুলীন সমভাবে উপবীত গ্রহণ করিলে অনুপবীতিগণের অপেক্ষা যে তাঁহারা কুলীন হইয়া উঠিবেন বা উঠিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ সুনিশ্চিত। ফলতঃ এই নবকৌলীন্যও সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতেছে। আমরা দেখাইলাম যে, কৌলীন্য মূলে ভাল হইলেও তাহার বর্ত্তমান আকার যে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা তৃতীয় দোষের উল্লেখ করিতেছি।

তৃতীয় দোষটির নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন ইহার প্রবর্ত্তনা করেন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, দেশের একশ্রেণী লোক ভূ-সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী হইয়া দেশের মধ্যে সম্রান্তশ্রেণী বলিয়া গণ্য

হইবে এবং তাহারাই সমাজের আদর্শ হইবে। বঙ্গদেশে ব্যবসায়ী জাতির অভাব থাকায় জমিদারেরাই দেশের নেতা ছিলেন,এবং এক্ষণেও যে তাঁহাদের হস্তে নেতৃত্ব তাহাও আমরা অস্বীকার করি না। যদিও আমাদের দেশের ও সমাজের নেতৃত্ব লইয়া এক্ষণে অনেকে নানারূপ দাবী দাওয়া করিতেছেন, তথাপি জমিদারগণ একেবারে নেতৃত্ব পরিত্যাগ করেন নাই; কিন্তু সেই জমীদারশ্রেণীর অবস্থা কিরূপ? অবশ্য আজিও তাঁহাদের মধ্যে অনেক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ আছেন, কিন্তু অধিকাংশই যে আপনাদের স্বার্থ ও বিলাসবিভ্রম লইয়া ব্যস্ত তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে অস্থায়ী সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যে দেশে রাণী ভবানী, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও পঞ্চকোটের নৃপতিগণের ন্যায় ভূস্বামিণী ও ভূস্বামীর আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তৎকালীন প্রত্যেক জমীদার যাঁহাদের পদচিহ্নের অনুসরণ করিত, আজ সে দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইয়া দেশের লোকের সহিত জমীদারশ্রেণীর সম্বন্ধ এত শিথিল হইয়া পড়িতেছে কেন? তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে মায় সুদ খাজনা আদায় করিয়া প্রায় সমস্তই কি আপনাদের বিলাসিতার জন্য ব্যয় করিতেছেন না? জলকষ্টে অন্নকষ্টে যখন প্রজারা হাহাকার করিতে থাকে, তখন কয়জন জমীদার তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া দেখেন? অবশ্য দুই একজন যে নাই তাহা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু আমরা জমীদারসাধারণের কথাই বলিতেছি। সেকালের প্রত্যেক জমীদারের কোন না কোন কীর্ত্তি আজিও তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কাহারও ব্রহ্মোত্তর, কাহারও দেবোত্তর, কাহারও মহাত্রাণ, কাহারও সদাব্রত, কাহারও পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা আজিও আমাদের দেশে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাদিগকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এমন কি ক্ষুদ্র জমীদারের বাসগ্রাম, ব্রাহ্মণকায়স্থ-প্রভৃতির নিষ্কর বসতিতে পরিপূর্ণ থাকিয়া, অদ্যাপি গভর্ণমেণ্টের নিকট সে সমস্ত বসতির কর যোগাইতেছে। আর বর্ত্তমান জমীদারগণ আপনাদের বিলাসিতা লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা প্রজার, দেশের বা সমাজের দিকে একবার চাহিয়াও দেখেন না। সহরে ও বিলাতে আপনাদের মনপ্রাণ বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। নিজেরা আবার এরূপ আলস্যের দাস হইয়া পড়িয়া-

ছেন যে, তাঁহারা সামান্যমাত্র পরিশ্রমেই কাতর হইয়া পড়েন। আপনাদের জমীদারী পরিদর্শন করিতেও অক্ষম। তৎসমস্ত কর্ম্মচারিগণের উপরেই ন্যস্ত। এইরূপে তাঁহারা দিন দিন মনুষ্যত্ববর্জ্জিত হইয়া উঠিতেছেন, দেশের ও সমাজের আর্ত্তনাদ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করে না। এই যে দামোদর, অজয়, সুবর্ণরেখাদির ভীষণ বন্যায় অর্দ্ধবঙ্গ প্লাবিত হইয়া গেল, কতলোকে গৃহশূন্য ভূমিশূন্য হইল, কত প্রাণী প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, দুই একজন ব্যতীত কয়জন মহানুভব জমীদার তজ্জন্য আপনাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াছেন? তাঁহাদের শ্রেণীর দুই একজনের কথা ছাড়িয়া দিলে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাইত ইহাদের সাহায্যের জন্য আপনাদের অর্দ্ধগ্রাস লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেশের এই ভয়ানক দুর্দ্দিনে জমীদারদিগের অর্থস্রোত বন্যার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া প্রবাহিত হওয়া কি উচিত ছিলনা? যাঁহাদের প্রজাগণ নিরন্ন বা গৃহহীন হইয়াছে, দুই একজন ব্যতীত তাঁহাদেরওত মুক্তহস্ততা দেখিতে পাইলাম না। তাই বলিতেছি, যাঁহারা দেশের নেতা, যাঁহাদের হস্তে সমগ্র দেশের ভূসম্পত্তি ন্যস্ত, সমাজের সহিতও যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাঁহারা দেশের, সমাজের ও নিজ প্রজাবর্গের প্রতি কিরূপ উদাসীন, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য মূলে ভাল হইলেও এক্ষণে তাহার পরিণতি যে কল্যাণকর নহে, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না।

আমরা দেখাইলাম যে, উপরোক্ত ত্রিদোষের স্পর্শে আমাদের সমাজে যে ত্র্যহস্পর্শ দোষ ঘটিয়াছে, তাহাতে সমাজকে শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংসের পথে তুলিয়া দিতেছে। ইহারা মূল সদুদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হইলেও এক্ষণে যে দোষাবহ হইয়া উঠিয়াছে,তাহাও সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। এই ত্রিদোষকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজে এক্ষণে আলস্য রাজত্ব করিতেছে। আলস্য যে তমোগুণের বহির্ব্বিকাশ তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। কাজেই আমাদের সমাজ এক্ষণে ঘোর তমোভিভূত ও মোহগ্রস্ত; যতদিন এই মোহ আমাদের দূর না হইবে, ততদিন আমাদের মঙ্গল কোথায়? যতদিন না আমরা আলস্য পরিহার করিয়া উদ্যমের আশ্রয় গ্রহণ করিব, ততদিন আমরা দিন দিন রসাতলেই নিমগ্ন হইতে থাকিব। আমাদের বর্ত্তমান

শিক্ষাদীক্ষায় আমাদের মোহ কাটিবে না। আমাদিগকে নূতন করিয়া আয়োজন করিতে হইবে। সমাজ ভাঙ্গিবার নহে, কাজেই তাহাকে ভাঙ্গা কঠিন, কিন্তু তাহার সংস্কার কঠিন নহে। যদি আবার এই সমাজে উদ্যম, সংযম, স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জনের আলোক দেখা দেয়, তবেই ইহার এই প্রগাঢ় তম দূরীভূত হইবে, নতুবা ইহা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবে।

কবিকথা।

(কালিদাস)

বিক্রমোর্ব্বশী।

(১)

দেবাসুরের বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ। সৃষ্টির প্রথম হইতেই বহির্জ্জগতে ও অন্তর্জ্জগতে এই সংগ্রামের আরম্ভ হইয়াছিল। কখনও দেব আর কখনও বা দানব জয়লাভ করিয়া আপনাদের বিক্রম প্রদর্শন করিতেন। দেবপক্ষই অধিকাংশ সময়ে জয়লাভে সমর্থ হইতেন; কিন্তু অসুরেরা অবকাশ পাইলেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিত এবং নানা প্রকার উপদ্রবে দেবগণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। কেশীনামে এক দুর্জ্জয় দানব দেবভূমিতে আগমন করিয়া ত্রিদিবললামভূতা উর্ব্বশীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। এই সময়ে চন্দ্রতনয় বুধের পুত্র অবাধগতি রাজা পুরুরবা সূর্য্যমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠান পুরে যাইতেছিলেন। উর্ব্বশীর সহচরী অপ্সরাগণের আর্ত্তনাদ শুনিয়া তিনি রথের গতি ফিরাইলেন, এবং তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের ক্রন্দনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার জিজ্ঞাসায় অপ্সরাগণ উত্তর দিলেন,—"মহারাজ! কুবেরভবন হইতে প্রত্যাগমনকালে তপোভয়ভীত ইন্দ্রের কোম-

লায়ুধরূপা রূপগর্ব্বিতা শ্রীগৌরীর প্রত্যাখ্যানস্বরূপিণী স্বর্গের অলঙ্কারসমা আমাদের প্রিয়সখী উর্ব্বশীকে কোন একটি দানব চিত্রলেখার সহিত বন্দিনী করিয়া লইয়া গেল।" রাজা তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া সেই দৈত্যের পশ্চাদনুসরণের জন্য সারথিকে আদেশ দিলেন। সারথির দ্রুতবেগে রথ সঞ্চালনে মেঘরাশি চূর্ণ হইয়া ধূলির ন্যায় রথের অগ্রে নিপতিত হইতে লাগিল। চক্রের অরাবলী আপনাদিগকে অসংখ্য বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দিল! চামর সকল অশ্বশিরে চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল, এবং ধ্বজাংশুক প্রান্তভাগে হেলিয়া পড়িলেও বায়ুবেগে মধ্যস্থলে সমবস্থিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। পুরুরবা গমন করিলে মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ হেমকূট পর্ব্বতে তাঁহাদের অপেক্ষায় রহিলেন। রাজা কেশী দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখাকে উদ্ধার করিয়া স্বীয় রথে স্থাপন করিলেন এবং হেমকূটাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন অন্যান্য অপ্সরাগণ রাজার সোমদত্ত রথ দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। রাজাও উর্ব্বশী প্রভৃতিকে লইয়া ক্রমে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন।

অসুরহস্তে লাঞ্ছিত হইয়া উর্ব্বশী অচৈতন্য হইয়া পড়েন। পুরুরবার উদ্ধারের পরও তাঁহার সম্পূর্ণরূপ চৈতন্যোদয় হয় নাই। চিত্রলেখা তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদনের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; রাজাও তাহাতে যোগ দিলেন। ক্রমে উর্ব্বশীর মন্দারমালাশোভিত বক্ষঃস্থল ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল; তাহাতে রাজা ও চিত্রলেখা আশ্বস্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তিনি সম্পূর্ণ সংজ্ঞালাভ করিলে,রাজা চিত্রলেখাকে বলিতে লাগিলেন,—"চন্দ্রোদয়ে তমোমুক্তা রজনীর ন্যায়, ছিন্নধূমা নৈশ অগ্নিশিখার ন্যায় তোমার প্রিয়সখী মোহমুক্ত হইয়া তটপতনপঙ্কিলা জাহ্নবীর স্বচ্ছতালাভের মত এক্ষণে প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন।" উর্ব্বশীর চৈতন্য হইলে, তিনি মনে করিয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্রই তাঁহাকে দানবহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু চিত্রলেখা বুঝাইয়া দিলেন যে, মহারাজ পুরুরবাই তাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তা। এই সময় হইতে উর্ব্বশী ও পুরুরবার মধ্যে অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। উর্ব্বশী মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, দানবেরা আমাকে হরণ করিয়া উপকারই করিয়াছে দেখিতেছি। রাজাও তাঁহার উন্মাদক

সৌন্দর্য্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, নারায়ণ ঋষিকে প্রলোভন দেখাইতে গিয়া তাঁহারই উরুসম্ভবা এই উর্ব্বশীকে দেখিয়া অপ্সরাগণ লজ্জিত হইয়া পলায়ন করে। কিন্তু নারায়ণ ঋষি কিরূপে এই রূপরাশি সৃজন করিলেন, সেই সন্দেহে তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল। রাজা মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ইঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? সম্ভবতঃ কান্তিপ্রদ চন্দ্র, কিম্বা শৃঙ্গাররসিক মদন, অথবা কুসুমাকর বসন্ত। বেদাভ্যাসে জড়মতি ও বিষয়ভোগ হইতে বিনিবৃত্ত-কৌতূহল সেই পুরাতন ঋষি নারায়ণ কদাচ এরূপের সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন।" তাঁহাদের এইরূপ অনুরাগবেগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া রথবেগও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উর্ব্বশীও সখিগণকে দেখিবার জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তোমার জন্ত তোমার সখীরাও দুঃখ পাইতেছে, এবং তাহা পাইবারই কথা বটে; কারণ তুমি একবারমাত্র যাহার নয়নপথে নিপতিত হও, তোমার অদর্শনে সেও যখন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে, তখন তোমার চিরসঙ্গিনী প্রণয়সিক্তা সখীরা যে বিষণ্ণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?" উর্ব্বশী রাজার এই মধুর বচনকে চন্দ্র হইতে অমৃতক্ষরণের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের রথ হেমকূটশিখরে উপস্থিত হইল।

শৈলশিখর হইতে উর্ব্বশী রাজার সহিত দৃষ্টিবিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে সখীদিগের প্রতিও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চতুরা চিত্রলেখা তাহা লক্ষ্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। উভয়ের মধ্যে তাহা লইয়া ইঙ্গিতে কথাবার্ত্তাও চলিতে লাগিল। এদিকে অন্যান্য সখীরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দকোলাহল উত্থিত করিলেন। চিত্রা ও বিশাখার সহিত চন্দ্রের উদয়ের ন্যায় চিত্রলেখা ও উর্ব্বশীর সঙ্গে রাজাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ রাজাকে অক্ষতশরীর দেখিয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। রাজাদেশে সারথি শৈলশিখর হইতে রথ অবতারণ করিতে আরম্ভ করিলে উর্ব্বশীর হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। এদিকে তাঁহার সখীরাও তাঁহাদিগকে সম্ভাষণের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা তাহা দেখিয়া সারথিকে তথায় রথ স্থাপন করিতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন যে, বসন্ত-

লক্ষ্মীর সহিত লতাশ্রেণীর সম্মিলনের ন্যায় এইখানেই সুনয়নী উর্ব্বশীর সঙ্গে তাঁহার সখীদিগের মিলন ঘটিতে দেও। অপ্সরাগণ রাজাকে নানা কথায় সম্বর্দ্ধনা করিয়া উর্ব্বশীকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন। সেই সময়ে আকাশ-পথে কাহার রথশব্দ শ্রুত হইল। অব্যবহিত পরেই কনকবলয়হস্ত গন্ধর্ব্ব-রাজ চিত্ররথ তড়িজ্জড়িত জলদের ন্যায় শৈলাগ্র হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

চিত্ররথ পুরূরবাকে সংবর্দ্ধনা করিয়া কহিলেন,—"আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনি বিক্রমমহিমায় মহেন্দ্রের উপকার সাধন করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন।" রাজাও গন্ধর্ব্বরাজকে দেখিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন,এবং তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া পরস্পরের করস্পর্শ করিলেন। চিত্ররথ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন.—"কেশী কর্ত্তৃক উর্ব্বশীহরণের কথা দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিয়া দেবরাজ তাঁহার উদ্ধারের জন্য গন্ধর্ব্বসেনাকে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু চারণদিগের মুখে আপনার জয়বার্ত্তা শুনিয়া আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে উর্ব্বশীকে লইয়া আপনি আমাদের সঙ্গে দেবরাজের নিকটে চলুন। বাস্তবিক আপনি তাঁহার মহোপকারই সাধন করিয়াছেন। পূর্ব্বে নারায়ণ ঋষি ইঁহাকে ইন্দ্রহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রিয়সুহৃদ আপনি আবার দৈত্যহস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া পুনর্ব্বার দান করিলেন।" রাজা উত্তর করিলেন যে,—দেবরাজের অনুগত লোক শত্রুকে পরাভব করিলে তাঁহারই পরাক্রম প্রকাশ পায়। দেখুন, ভূধরকন্দরোত্থিত সিংহের প্রতিধ্বনি হস্তিগণকে পরাজিত করিয়া থাকে। চিত্ররথ রাজার কথা শুনিয়া বলিলেন যে,—একথা যথার্থই বটে; বিনয়ই বিক্রমের অলঙ্কার। তাহার পর রাজা সে সময়ে ইন্দ্রের সহিত দেখা ঘটিবে না বলিয়া উর্ব্বশীকে লইয়া যাইতে চিত্ররথকে অনুরোধ করিলেন। চিত্ররথ অপ্সরাদিগকে লইয়া অগ্রসর হইলেন, গমনকালে উর্ব্বশী চিত্রলেখার দ্বারা রাজাকে জানাই-লেন যে, তিনি রাজার বিজয়কীর্ত্তিকে প্রিয়সখীর ন্যায় সঙ্গে লইয়া সুরলোকে গমন করিতেছেন। রাজা পুনর্দ্দর্শনের অনুরোধ করিয়া তাঁহাদের গমনের সম্মতি দিলেন। যাইতে যাইতে উর্ব্বশীর বৈজয়ন্তিকা নামে একাবলী হার লতা-শাখে জড়াইয়া যাওয়ায়, তিনি চিত্রলেখাকে তাহা ছাড়াইতে অনুরোধ করি-লেন এবং রাজাকে অপাঙ্গদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। রাজাও তাহা লক্ষ্য

করিতে ত্রুটি করেন নাই। চিত্রলেখা অত্যন্ত আঁটিয়া লাগায় হারমোচনে অক্ষম বলিয়া প্রথমে প্রকাশ করিলেন, পরে উর্ব্বশীর বারম্বার অনুরোধে কোনরূপে মোচন করিতেছি বলিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। উর্ব্বশীও সহাস্যে চিত্রলেখাকে তাহার কথাগুলি স্মরণ রাখিতে বলিলেন। রাজাও মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, লতা ইঁহার গমনে ক্ষণমাত্র বাধা দিয়াও আমার উপকার করিয়াছে, কারণ অর্দ্ধমুখপরিবর্ত্তনে ইহার অপাঙ্গদৃষ্টি আমার আবার দর্শন গোচর হইল। সেই সময়ে সারথি রাজাকে নিবেদন করিল যে, দেবরাজের অপরাধকারী দৈত্যদিগকে লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া মহারাজের বায়ব্য অস্ত্র মহাভুজঙ্গের বিবরপ্রবেশের ন্যায় তূণমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজা রথ আনিতে আদেশ দিলেন, এবং তাহাতে আরোহণ করিলেন। উর্ব্বশীও সস্পৃহনয়নে রাজাকে দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলেন। রাজা উর্ব্বশীর পথের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন "মদন দুর্লভ বস্তুরই অভিলাষ করিয়া থাকে। অপ্সরাবালা এক্ষণে মধ্যাকাশে গমন করিল, কিন্তু ভগ্ন মৃণাল-খণ্ডের অগ্র হইতে রাজহংসীর সূত্র আকর্ষণের ন্যায় আমার মনটিকে শরীর হইতে একেবারে টানিয়া লইয়া গেল।" তাহার পর তাঁহার রথ ভূতলে অবতরণ করিতে লাগিল।

(২)

ভাগীরথীর শুভ্র সলিলে আপনার নীল সলিল ঢালিয়া দিয়া যেখানে কলনাদিনী যমুনা আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই পবিত্রসঙ্গম প্রয়াগের পূর্ব্বতীরে প্রতিষ্ঠানপুর অবস্থিত। নগরের সৌধরাজি নদীসলিলে প্রতি-ফলিত হইয়া অপূর্ব্বশোভা বিস্তার করিতেছিল। রাজভবনের নিকট ইন্দ্র-নিকেতনও পরাজিত হইতেছিল। রাজা পুরুরবা আকাশপথ হইতে রাজ-ধানীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার হৃদয় উর্ব্বশীর চিন্তায় বিভোর, প্রিয় বয়স্য মানবক নামে বিদূষকের নিকট সে কথা প্রকাশ করিয়া রাজা কিছু শান্তিলাভের অভিলাষ করিয়াছিলেন। বিদূষক কিন্তু এ রহস্য প্রকাশ না করিয়া কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার জিহ্বা নিমন্ত্রিতের পরমান্নধারণের ন্যায় কিছুতেই রাজরহস্যটিকে রাখিতে

পারিতেছিল না। এদিকে রাজ্ঞী কাশীরাজপুত্রী রাজাকে উন্মনা দেখিয়া রহস্যভেদের জন্ত সহচরী নিপুণিকাকে বিদূষকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নিপুণিকা আসিয়া দেখিল, বিদূষক একটি চিত্রিত বানরের ন্যায় বসিয়া আছেন। সে জানিত, বিদূষক অনেকক্ষণ রহস্য গোপন রাখিতে পারিবেন না। তৃণাগ্রলগ্ন শিশিরের ন্যায় তাঁহার জিহ্বাগ্রে এ রহস্য অধিক ক্ষণ থাকিতে পারিবে না। তখন সে কৌশল করিয়া মানবককে বলিল যে, যে রমণীটির জন্য মহারাজ উৎকণ্ঠিত, তাহার নাম ধরিয়া কখন কখনও তিনি মহিষীকে ডাকিয়া থাকেন। মহিষী তাই ইহার প্রতিকারের জন্ত আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বিদূষক বুঝিয়া লইলেন, রাজা নিজেই রহস্য ভঙ্গ করিয়াছেন। তখন তিনি উর্ব্বশীসংক্রান্ত সমস্ত কথা সহচরীর নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন এবং রাজাকে মৃগতৃষ্ণিকা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করার চেষ্টা করিবেন বলিয়া অভয়প্রদানও করিলেন। নিপুণিকা রহস্য ভেদ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কাশীরাজপুত্রীর নিকট গমন করিল। সেই সময়ে রাজাকে ধর্ম্মাসন হইতে উত্থিত দেখিয়া বৈতালিকেরা জয়ধ্বনি করিয়া কহিল যে, দেব! তোমার ও তপনের উদ্যম তুল্যরূপই বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্যালোকে ও সূর্য্যদর্শনে যেমন লোকান্তের অন্ধকার ও লোকসকলের পাপরাশি দূরীভূত হয়, সেইরূপ তোমার আলোকনে ও তোমার দর্শনে প্রজাগণের পাপান্ধকারও বিনষ্ট হইয়া যায়। সূর্য্য মধ্যাহ্নকালে ক্ষণ মাত্র বিশ্রাম করেন; তুমিও দিবসের ষষ্ঠভাগে বিশ্রাম করিবার জন্ত কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া থাক।

রাজকার্য্য সমাধার পর রাজা বয়স্য মানবকের সঙ্গে প্রমদ বনের দিকে অগ্রসর হইলেন। মদনের অব্যর্থসন্ধানে তাঁহার হৃদয়ে যে পথ সৃষ্টি হয়, দর্শন মাত্রেই সুরলোকসুন্দরী উর্ব্বশী সেই পথ দিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন। কাজেই এক্ষণে রাজার হৃদয় ভারাক্রান্ত। সে ভার ক্রমে গুরু ব্যতীত কিছুতেই লঘু হইতেছে না দেখিয়া প্রমদবনে বয়স্যের সহিত আলাপনে রাজা তাহার লাঘবেরই চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজার অবস্থা দেখিয়া বিদূষক মহিষীর কষ্টও স্মরণ করিতে লাগিলেন। রাজা উর্ব্বশীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিদূষক রহস্য গোপন রাখিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা

করিলেন। বিদূষক নিপুণিকা কর্ত্তৃক প্রতারিত হওয়া বুঝিতে পারিয়া সেকথা প্রকাশ না করিয়া রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি এরূপ সাবধান যে রাজার নিকটও সে সম্বন্ধের কোন তথ্য বলিতে অনিচ্ছুক। তাহার পর রাজা কিরূপে চিত্তবিনোদন করা যাইবে জিজ্ঞাসা করিলে মানবক পাকশালায় যাওয়ার প্রস্তাব করিলেন, এবং তথায় পাঁচ প্রকার আহারের আয়োজন দেখিয়া যে উৎকণ্ঠা দূর হইবে তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। রাজা কহিলেন যে, সেখানে তোমার অভিলষিত বস্তু দেখিয়া তুমি তৃপ্তি লাভ করিতে পার বটে কিন্তু দুর্লভ বস্তুর প্রার্থী আমার আত্মাটিকে কিরূপে সন্তুষ্ট করিবে? মানবক বলিয়া উঠিলেন যে, তুমি যখন একবার উর্ব্বশীর দৃষ্টিপথে পড়িয়াছ তখন তাহাকে দুর্লভ বলা যায় না। রাজা তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তাহাতে সুরূপের পক্ষপাত থাকিলেও সে পক্ষপাতটিও অলৌকিক।" বিদূষক কৌতূহল সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আচ্ছা, আমি যেমন বিরূপে অদ্বিতীয়, তিনি কি সেইরূপ সুরূপে অদ্বিতীয়া? রাজা উত্তর দিলেন, "তাহার প্রতি অবয়বের বর্ণনা করা কঠিন। তবে এক কথায় বলিতেছি যে, তাঁহার তনুখানি যেন অলঙ্কারের অলঙ্কার-স্বরূপ, বেশভূষারও বেশভূষাবিশেষ এবং উপমানেরও প্রত্যুপমান।" মানবক তাহা শুনিয়া কহিলেন, "এইজন্য বুঝি তুমি দিব্যরসাভিলাষী হইয়া চাতকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ?" রাজা 'উৎকণ্ঠিত জনের বিজন প্রদেশই আশ্রয় স্থল' বলিয়া প্রমদ বনের দিকে যাইতে ইচ্ছা করিলে, বিদূষক তাঁহাকে লইয়া চলিলেন, এবং দক্ষিণ বাতাসে তাহার সীমামধ্যে প্রবেশ করা বুঝিতে পারিয়া রাজাকেও তাহা জানাইলেন। রাজা কহিলেন, "আমিও তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কারণ দক্ষিণানিল বাসন্তী লোতাকে সিক্ত করিয়াও কুন্দলতাকে নাচাইয়া অনুরাগীর ন্যায় স্নেহ ও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে।" মানবক বলিয়া উঠিলেন যে, তোমারও সেই ভাব দেখিতেছি। তাহার পর উভয়ে প্রমদ বনে প্রবেশ করিলে রাজা একটু চকিত হইয়া বলিলেন, "বয়স্য, মনে ভাবিয়াছিলাম, প্রমদ বনে প্রবেশ করিলে আমার কষ্ট দূর হইবে; কিন্তু এক্ষণে যে তাহার বিপরীতই বোধ হইতেছে। দুঃখ শান্তির জন্য ইহাতে প্রবেশ

করিয়া এক্ষণে আমি স্রোতোবেগে চালিত ব্যক্তির ন্যায় প্রতিকূল দিকেই সাঁতার দিতেছি।" তাহার পর তিনি তাহা বিশদ ভাবেই বলিতে লাগিলেন, "দেখ, পঞ্চবাণ দুর্লভ বস্তুর আশায় দুর্নিবার চিত্তকে প্রথম হইতেই উৎকণ্ঠিত করিতেছে। এখন আবার মলয়পবনস্পর্শে স্খলিত পাণ্ডুপত্র সহকারের নবীন অঙ্কুরোদ্গম আরও বিচলিত করিয়া তুলিল।" মানবক তাঁহাকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন যে, কামদেব শীঘ্রই তোমার সহায় হইবেন। 'ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য্য' বলিয়া রাজা উত্তর দিলেন। বিদূষক রাজাকে প্রমদ বনের শোভা লক্ষ্য করিতে বলিলে রাজা বলিলেন, "সর্ব্বত্রই তাহা দেখিতে পাইতেছি। কুরুবক পুষ্পের অগ্রভাগে স্ত্রীনখের ন্যায় পাটলবর্ণ ও পার্শ্বদ্বয়ে শ্যামলবর্ণ দেখা যাইতেছে। বিকাশোন্মুখ বালাশোককুসুম চারুরক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। নবীনা চূতমঞ্জরীতে রজঃকণা ঈষদ্বদ্ধ হওয়ায় তাহার অগ্রভাগ কপিশ বর্ণ দেখাইতেছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, বসন্ত শোভা কিশোর ও যৌবনের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে।" মানবক একটী কৃষ্ণমণিশিলামণ্ডিত, ভ্রমরগুঞ্জিত, কুসুমপরিশোভিত মাধবীমণ্ডপে রাজাকে উপবেশন করিতে বলিলে, উভয়ে তথায় উপবেশন করিলেন। তখন মানবক আবার রাজাকে বলিলেন যে, এক্ষণে এই ললিত লতার শোভা দেখিয়া উর্ব্বশীর চিন্তাটি দূর করার চেষ্টা কর। রাজা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কুসুমরাশিতে বিভূষিত ও শাখারাজিতে আনমিত হইলেও আমার দুর্ললিত চক্ষুটি সেই সুরলোকসুন্দরীকে দর্শনাবধি আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছে না। সে যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে আমার প্রার্থনা সফল হয়, তাহারই উপায় চিন্তা কর।" বিদূষক উত্তর করিলেন, "বন্ধু যেমন অহল্যাসক্ত ইন্দ্রের সচিব, আমিও সেইরূপ উর্ব্বশীতে আসক্ত তোমার অমাত্য; আমরা উভয়েই উন্মাদপ্রায়। আচ্ছা, আমি একটু চিন্তা করিয়া দেখি; কিন্তু তুমি বিলাপ করিয়া যেন আমার ধ্যান ভঙ্গ করিও না।" অতঃপর মানবক সমাধিস্থ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা বলিতে লাগিলেন, "সে পূর্ণেন্দুমুখীও দুর্লভ, তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশও বৃথা। তবুও যেন ইষ্টসিদ্ধি ফলোন্মুখী ভাবিয়া মন শান্ত ভাব ধারণ করিতেছে।"

রাজা বয়স্যের সহিত যে সময়ে এইরূপ আলাপনে রত, সেই সময়ে উর্ব্বশীও অনুরাগবলে চালিত হইয়া আকাশপথ অবলম্বনে রাজসকাশে ধাবিত হইতেছিলেন। চিত্রলেখা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া 'উর্ব্বশী অনির্দ্দিষ্ট কারণে কোথায় যাইতেছেন' তাহাই জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। উর্ব্বশী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, হেমকূটশিখরে লতাশাখে যখন তাঁহার একাবলী হার জড়াইয়া যায়, চিত্রলেখা তাহা মোচন করিতে গিয়া উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা আঁটিয়া লাগিয়াছে। চিত্রলেখা তখন বুঝিতে পারিলেন যে, উর্ব্বশী রাজা পুরুরবার দর্শনেই যাইতেছেন। চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে এ বিষয়ের অগ্র পশ্চাৎ ভাবিতেও একবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, উর্ব্বশী আপনার হৃদয়কে অগ্রে পাঠাইয়া এক্ষণে মদনাজ্ঞায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন. তখন চিত্রলেখা আর কোন উক্তবাচ্য না করিয়া তাহার সহিতই প্রতিষ্ঠান পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির অপরাজিতা নামে শিখাবন্ধনী বিদ্যার উপদেশে অসুরেরা যে এক্ষণে তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতেন। এক্ষণে সখীদ্বয় তাহার প্রয়োগ স্মরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। অচিরকালমধ্যে প্রতিষ্ঠানপুর তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। তথায় তাহারা দেখিতে পাইলেন যে, রাজধানীর মুকুটস্বরূপ রাজভবনটি গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের পুণ্য সলীলে নিজ ছবি নিরীক্ষণ করিতেছে, এবং তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, যেন স্বর্গ তথায় অবতীর্ণ হইয়াছে। তৎপরে তাঁহারা নন্দনকাননসম প্রমদবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনুরাগক্ষীণ রাজাকে দেখিয়া চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে বলিয়া উঠিলেন,"দেখ, প্রথমোদিত চন্দ্রের কৌমুদীর অপেক্ষায় ন্যায় মহারাজ তোমারই আশায় বসিয়া আছেন।" উর্ব্বশীর নিকট রাজা পূর্ব্বাপেক্ষাও প্রিয়দর্শন বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে অপসরাদ্বয় তিরস্করিণী বিদ্যাপ্রভাবে প্রচ্ছন্নভাবে তথায় অবস্থিতি করিয়া রাজা ও বিদূষকের আলাপন শুনিতে লাগিলেন।

সমাবিত্তকের পর বিদূষক বলিয়া উঠিলেন যে. তোমার দুর্লভ প্রণয়িনীর সমাগমোপায় স্থির করিয়াছি। নিদ্রার সেবা করিলে স্বপ্নে তাঁহার সহিত

মিলন ঘটিতে পারে; অথবা চিত্রফলকে উর্ব্বশীর ছবিখানি অঙ্কিত করিয়া তাঁহার দর্শনে আমাকে পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা কর। রাজা উত্তর দিলেন, "ইহার কোনটিই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ মদনশরে যাহার হৃদয় শেলবিদ্ধ, তাহার নিকট কি কখনও নিদ্রা সমাগত হইয়া স্বপ্নে প্রিয়তমার মিলন ঘটাইয়া দেয়? অথবা আলেখ্যে তাহার ছবি সন্নিবেশ করিয়া আমার নয়ন কি অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে না?" মানবক 'এই পর্য্যন্ত আমার বুদ্ধির দৌড়' বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। রাজা বলিতে লাগিলেন, "সে ত আমার এই দুঃসহ মনোবেদনা বুঝিতে পারিতেছে না। অথবা দৈবী শক্তি প্রভাবে জানিয়াও আমাকে উপেক্ষা করিতেছে। যাউক সে কথা, মদন এক্ষণে আমার মিলনাশাও নিষ্ফল করিয়া কৃতার্থ হউক।" চিত্রলেখা ও উর্ব্বশী রাজা ও বিদূষকের আলাপন শুনিতেছিলেন। প্রথমে উর্ব্বশীর হৃদয় কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার পর তিনি ক্রমে তাহাকে শান্ত করিয়া তুলেন। চিত্রলেখাও তাঁহাকে আশ্বস্ত হইতে বলেন; রাজার মনোবেদনা বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া চিত্রলেখার মত লইয়া উর্ব্বশী ভূর্জ্জপত্রে নিজ মনোভাব লিখিয়া নিক্ষেপ করিলেন। রাজা ও বিদূষকের সম্মুখে তাহা পতিত হওয়ায়, বিদূষক সর্পখোলস ভ্রমে চমকিয়া উঠেন। রাজা তাহাকে ভূর্জ্জপত্রে লেখা পত্র বলিয়া বুঝাইয়া দিলে বিদূষক বলিয়া উঠিলেন যে, তবে উর্ব্বশী অলক্ষ্যে থাকিয়া তোমার বিলাপ শুনিয়া থাকিবেন, এবং নিজের অনুরাগ জানাইয়া এই পত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। রাজা মনোরথের অগতি নাই বলিয়া পত্র খানি তুলিয়া লইলেন এবং বয়স্যের অনুমান যথার্থই বলিয়া পড়িতে লাগিলেন,—"স্বামিন্! আমার প্রতি অনুরক্ত তোমার মনোব্যথা আমি জ্ঞাত নহি বলিয়া যাহা মনে করিয়াছ তাহাই প্রকৃত। এখন হইতে পারিজাত শয্যায় শয়ন করিয়া আমার শরীরে সুখকর নন্দনসমীর অগ্নিসম বলিয়াই বোধ হইবে।" ইহা শুনিয়া বিদূষক উত্তর করিলেন যে, ভাগ্যে এই ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ এটিকে স্বস্তিবাচনিকের ন্যায় পাইয়াছিল, তবেইত তুমি আশ্বস্ত হইলে। রাজা বলিলেন, "তুমি আশ্বস্ত হওয়ার কথা কি বলিতেছ? তুল্যানুরাগিনী প্রিয়তমার ললিত রচনা দেখিয়া আমি তাঁহার সহিত মিলিত বলিয়াই বোধ করিতেছি।"

তাহার পর রাজার হস্ত স্বেদসিক্ত হওয়ায় তিনি পত্রখানি বিদূষকের হস্তে প্রদান করিয়া সযত্নে রাখিতে বলিলেন। মানবক বলিয়া উঠিলেন যে, তবে কি উর্ব্বশী তোমার মনোরথতরুতে ফুল ফুটাইয়া শেষে কি ফলে বঞ্চিত করিবেন?

পত্রখানি নিক্ষেপ করিয়া উর্ব্বশী রাজাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন ও বিদূষকের আলাপনও শুনিতেছিলেন। বিদূষকের কথায় তিনি তাঁহাকে একটি রসিক পুরুষ বলিয়াই বোধ করেন। তাহার পর রাজার ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনিও ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এবং ধৈর্য্য ধারণের নিমিত্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার ইচ্ছা করিয়া অগ্রে চিত্রলেখাকেই রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। চিত্রলেখাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন যে, পূর্ব্বে গঙ্গাযমুনার মত তোমাদের দুজনকে দেখিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, একণে সখী বরহিতা তোমার দর্শনে আর সে আনন্দ ঘটিল না। চিত্রলেখা উত্তর দিলেন, "অগ্রে মেঘরাজি দেখা দেয়, পরে বিদ্যুল্লতার প্রকাশ হইয়া থাকে।" সে যাহা হউক উর্ব্বশী মহারাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি দানব হস্ত হইতে তাহার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, কিন্তু আপনার দর্শনাবধি পঞ্চবাণের পীড়নে কাতর হইয়া সে আবার আপনার দয়ারই ভিখারিণী হইয়াছে।" চিত্রলেখার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তুমি কি কেবল সেই প্রিয়দর্শনাকেই উৎকণ্ঠিত দেখিতেছ? আমার ব্যথা কি জানিতে পারিতেছনা? দুজনেরই যখন তুল্যানুরাগ বুঝিতেছ, তখন চন্দ্রবিম্বে কৌমুদীর মিলনের ন্যায় আমার নিকট তাহাকে আনিয়া দেও।" চিত্রলেখা রাজার কথায় কিছু কাতর হইলেন। এবং তাঁহার দূতীস্বরূপে উর্ব্বশীর নিকট গিয়া তাহাকে লইয়া আসিলেন। উর্ব্বশী প্রচ্ছন্নভাব পরিত্যাগ করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং মহারাজের জয় হউক বলিয়া রাজাকে সম্ভাষণ করিলেন। রাজা তাঁহার হস্ত ধরিয়া উপবেশন করাইয়া বলিলেন যে, পূর্ব্বে যে জয়শব্দে দেবরাজের নাম ধ্বনিত হইত, একণে তাহা আমাতে আগত হওয়ায় আমারই জয় লাভ হইল। উর্ব্বশী মানবককে সম্ভাষণ না করায় তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে, তোমাদের রাজ্যের এ কেমন রীতি যে, প্রিয় বয়স্য ব্রাহ্মণকে প্রণাম করা হয় না! উর্ব্বশী সস্মিতভাবে তাঁহাকে

প্রণাম করিলে, মানবক মঙ্গল হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই সময়ে দেবদূত আসিয়া চিত্রলেখাকে জানাইল যে, দেবরাজ লোকপালগণের সহিত ভরতমুনি কর্ত্তৃক তোমাদিগকে প্রদত্ত অষ্টরসাশ্রয় লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নামক নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছেন। অতএব তুমি শীঘ্র উর্ব্বশীকে লইয়া চলিয়া আইস। এই কথা শুনিয়া সকলেই যারপর নাই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। উর্ব্বশী কিছু বলিতে না পারায়, চিত্রলেখা রাজাকে বলিলেন যে, উর্ব্বশী পরাধীনা; পাছে তিনি দেবরাজের নিকট অপরাধিনী হন, সে জন্য বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন। রাজাও 'অভিকষ্টে দেবরাজের আদেশে বাধা দিতে চাহিনা, তবে আমাকে যেন স্মরণ থাকে' এই মাত্র বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাহার পর রাজা বিচলিত হইয়া উঠিলে মানবক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তোমার প্রতি উর্ব্বশীর সুদৃঢ় অনুরাগ কখনও শিথিল হইবে না। রাজাও কিছু আশ্বস্ত হইয়া উত্তর করিলেন যে, আমারও তাহাই বোধ হইতেছে। বিদায়কালে সে যেন তাহার পরবশ শরীরের স্ববশ হৃদয়টিকে বক্ষঃস্থলে কম্পিত নিঃশ্বাস দ্বারা আমাকে অর্পণ করিয়া গেল।

ভূর্জ্জপত্রে লেখা উর্ব্বশীর পত্রখানি রাজা মানবকের হস্তে দিয়াছিলেন। কিন্তু পত্রখানি তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। মানবক উর্ব্বশীকে দেখিতে দেখিতে এরূপ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন যে, কোন্ সময়ে পত্রখানি পড়িয়া যায় তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। দক্ষিণ বাতাসে আবার পত্রখানিকে উড়াইয়া লইয়া যায়। রাজা সান্ত্বনা লাভের জন্য পত্রখানি চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, মানবকের হস্ত হইতে তাহা স্খলিত হইয়া দক্ষিণ বাতাসে দূরে অপহৃত হইয়াছে। তিনি মানবককে তাহার অন্বেষণ করিতে বলিয়া দক্ষিণ বাতাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, সৌগন্ধের জন্য তুমি লতিকার সুরভিরেণু হরণ করিয়া থাক। আমার প্রিয়ার স্বহস্ত লিখিত পত্রে তোমার প্রয়োজন কি? অনুরাগী জনেরা চিত্তবিনোদনের এইরূপ শত শত উপায়ে জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু কৈ তাহারা ত তোমার দ্বারা পীড়িত হয় না। বিদূষক সেই সময়ে ভূর্জ্জপত্রভ্রমে একটি মলিন ময়ূরপুচ্ছের প্রতি ধাবিত হইতেছিলেন।

নিপুণিকা মানবকের নিকট হইতে উর্ব্বশীরহস্য জ্ঞাত হইয়া এবং তাহাকে ও রাজাকে লতামণ্ডপে উপবেশন করিতে দেখিয়া কাশীরাজপুত্রী মহিষী ঔশীনরীর নিকট উপস্থিত হয়। রাজ্ঞী সমস্ত কথা শুনিয়া নিপুণিকাকে লইয়া প্রমদ বনের দিকে ধাবিত হন। তিনি যে রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন সে কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবেনা। রাজ্ঞীরা যে সময়ে লতামণ্ডপের দিকে অগ্রসর হন, সেই সময়ে ভূর্জ্জ পত্রখানি বাতাসে উড়িতে উড়িতে তাঁহাদের নিকট আসে এবং মহিষীর নূপুরে লাগিবার উপক্রম হয়। নিপুণিকা পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া রাণীকে পড়িয়া শুনাইলে, রাজ্ঞী পত্রখানি লইয়া লতামণ্ডপে প্রবেশ করেন। পত্রখানি না পাওয়াতে রাজা বিদূষককে তিরস্কার করিতেছিলেন। সেই সময়ে মহিষী উপস্থিত হইয়া পত্রখানি দেখাইলেন। রাজা নিরুপায় হইয়া মানবককে প্রতীকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে, বমাল সহ চোর ধরা পড়িয়াছে, এক্ষণে আর উত্তর কি? রাজা তাহার পরিহাসে অসন্তুষ্ট হইয়া রাণীকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহারা ও পত্রখানি খুঁজেন নাই। একখানি মন্ত্রপত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন। মহিষী কিন্তু পূর্ব্বেই সমস্ত বুঝিয়া লইয়াছিলেন। বিদূষক রাণীকে বলিলেন যে, সত্বর বয়স্যের একটু ভাল রকমের আহারের ব্যবস্থা করুন, পিত্তোপশম হইলেই তিনি সুস্থ হইবেন। বিদূষকের কথায় রাজা অপরাধী হন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। তাহার পর মহিষী অভিমানভরে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে রাজা তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, আমার দোষ হইয়াছে আমাকে ক্ষমা কর। প্রভু কুপিত হইলে সেবক নিরপরাধ হইলেও তাহারই দোষ বলিতে হইবে। রাণী কিছুতেই অপেক্ষা না করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয় কিন্তু অভিমান ও অনুতাপ উভয়েরই দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল। বিদূষক রাজাকে উঠিতে বলিয়া কহিলেন, "দেখিতেছি, রাণী বর্ষাকালের নদীর ন্যায় অপ্রসন্ন হইয়া চলিয়া গেলেন।" রাজা উত্তর দিলেন, "সেটা অসঙ্গত নয়, কারণ অনুরাগশূন্য প্রিয় জনের অনুনয়পূর্ণ মিষ্টবচন কখনও রমণীদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না। মণি-বেত্তারা কদাচ মণির কৃত্রিম

রাগে সন্তোষ লাভ করিতে পারে না।" বিদূষক উত্তর করিলেন যে, তোমার পক্ষে ভালই হইল, চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মুখে কখনও দীপ-শিখা সহ্য হয় না। বিদূষকের কথা রাজার রুচিকর হইল না। তিনি ঊর্ব্বশীর প্রতি অনুরক্ত হইলেও মহিষীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কিন্তু রাণী তাঁহার প্রণিপাতেও উপেক্ষা করায় রাজার আর তাঁহার অভিমান ভঙ্গের ইচ্ছা হইল না। তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। রাজা ধৈর্য্যাবলম্বনের ইচ্ছা করিলেন বটে, কিন্তু মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত হওয়ায় জঠরাগ্নির দহনে মানবক কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি রাজাকে বলিলেন যে, তোমার ধৈর্য্য থাক, এক্ষণে আমার জীবনরক্ষার উপায় কি? স্নানাহারের সময় কি হয় নাই? রাজা তখন বুঝিতে পারিলেন যে, বাস্তবিকই মধ্যাহ্ন উপস্থিত; কারণ, তিনি দেখিতে লাগিলেন যে, গ্রীষ্মপীড়িত ময়ূরেরা তরুতলে শীতল আলবালে বসিয়া রহিয়াছে, ভ্রমরসকল কর্ণিকার কোরক ভেদ করিয়া তন্মধ্যে শয়ন করিতেছে, তপ্ত বারি পরিত্যাগ করিয়া কারণ্ডবগণ তীরলগ্ন নলিনীর আশ্রয় লইতেছে, এবং ক্রীড়াগৃহে পিঞ্জরস্থ শুক ক্লান্ত হইয়া জল চাহিতেছে।

অন্দোলন-সমস্যা।

কয়েকটা গুরুতর সমস্যার মীমাংসা লইয়া বাঙ্গলার বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে একটা নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। একদিকে ইংরেজীশিক্ষিত নূতন ভাবের একনিষ্ঠ সাধক সংস্কারকামী নব্য সম্প্রদায়,অন্যদিকে প্রাচীনতার পক্ষ-পাতী নবভাবদ্বেষী রক্ষণশীল সামাজিকগণ। উভয় পক্ষই প্রবল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য; উভয়েরই চেষ্টা আছে যথেষ্ট; না হউক চিন্তাশীল ও মনস্বী লোকের একান্ত অসদ্ভাব কোন পক্ষেই নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আলোচনা ক্ষেত্রে

বিষয়ের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া কোন পক্ষই অবস্থানুরূপ সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেছেন না। তাহার ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষী ও রেশারেশীর ভাবই ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, শুধু অকল্যাণকেই ডাকিয়া আনা হইতেছে। তদ্ব্যতীত ফলে আর বড় একটা বিশেষ কিছুই দাঁড়াইতেছে না।

সমাজ বা জাতির মঙ্গলামঙ্গলের কথা লইয়া আলোচনা সকলেই করিতে পারেন এবং যাঁহারা তাহা করেন, যাঁহাদের সাধনা, যাঁহাদের চেষ্টার সামান্য অংশও জাতির জন্য, সমাজের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে ব্যয়িত হয়, মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের দেশে মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদনের তাঁহাদের পক্ষে আত্মতৃপ্তির অতিরিক্ত আর বিশেষ কিছু প্রাপ্য না থাকিলেও স্বার্থপরায়ণ বাঙ্গলা দেশে তাঁহারা যে বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র, সেবিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া এ কথাটাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে, সমাজ, জাতি অথবা সাধারণসংশ্লিষ্ট যে কোনও বিষয়ে কথা কহিবার একটা বিশেষ অধিকার আছে এবং সাধনার দ্বারা মানুষের সে অধিকার লাভ করিতে হয়। মানুষ যে পর্য্যন্ত সে অধিকার লাভ না করে, সে পর্য্যন্ত এবিষয়ে সে অনধিকারী, তাহার পক্ষে এসম্বন্ধে কোনও কথা না বলাই ভাল। যাঁহারা সমাজ বা জাতি সম্পর্কে চিন্তিত, স্বীয় মতগুলিকে সাধারণে প্রচার করিয়া সমাজ বা জাতিকে তাহার অনুবর্ত্তী হইতে উপদেশ দেন, অথবা যাঁহারা বিভিন্ন মতের ঘাতপ্রতিঘাতে আন্দোলন ও আলোচনা ক্ষেত্রকে বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়া আপনারা রথী বা মহারথীর স্থান গ্রহণপূর্ব্বক পরস্পর বলপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের পক্ষে এ কথাটা বিশেষভাবে সর্ব্বদাই স্মরণযোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের মনে হয়, আমাদের মধ্যে কোনওরূপ অধিকারের বিচার না থাকাতেই আমাদের যে কোনও আলোচনা স্থায়ী বা তেমন ফলপ্রদ হয়না। পক্ষান্তরে, বিপরীত ফলই প্রদান করে। আর আমাদের এক একটী আন্দোলনক্ষেত্র যে ধীরে ধীরে এক একটী কোন্দল ক্ষেত্রেরই নামান্তর গ্রহণ করে তাহাও এ সত্যকেই অস্বীকার করা হয় বলিয়া।

মানুষের চক্ষে মানুষের নিজের সুখ সুবিধা সবচেয়ে বড়, সে যাহাই করে, যাহাই ভাবে, তাহার প্রত্যেকের মাঝেই সে আপনাকে অব্যাহত দেখিতে চায়, সকলের উপরে আপনাকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়,—ইহা মানুষের

সাধারণ ভাব ; এভাব লইয়া মানুষ সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ আপনার কথা ভাবিতে পারে, স্বীয় মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা করিয়া স্বার্থের অনুকূল ব্যবস্থা করিতে পারে, আপনার সম্পর্কে সকল প্রকার অধিকারই তাহার আছে, এবং তাহাই তাহার প্রকৃতির অনুকূল। সাধারণ ভাব লইয়া সাময়িক উত্তেজনা অথবা অন্য কোনও কারণে সে যদি কখনও সামাজিক বা জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের ব্যবস্থা বা সে সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতে যায়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে সে ততক্ষণই কথা বলিতে পারে, সামাজিক বা জাতীয় স্বার্থ যতক্ষণ তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূল, সে ক্ষেত্রে সে ততক্ষণই আপনার চেষ্টাকে সামাজিক বা জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত করিতে পারে, যতক্ষণ না তাহার স্বকীয় স্বার্থের সহিত সামাজিক বা জাতীয় স্বার্থের বিরোধ উপস্থিত হয়। সামাজিক স্বার্থ সমাজের কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সে কল্যাণের সমান অংশী, এ হিসাবে সার্ব্বজনীন স্বার্থের সহিত কাহারও বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই বটে ; কিন্তু মানুষের সাধারণ ভাব মানুষের পক্ষে সমস্ত জগৎটা যে এতই পার্থক্যময় করিয়া রাখিয়াছে যে, মানুষ আর কিছুতেই অন্য কাহারও সহিত আপনার একটা একত্ব স্বীকার করিতে চায়না, আপনার সম্বন্ধে যে তাহার একটা অসাধারণত্বের ধারণা হইয়াছে কিছুতেই আর তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই পার্থক্য বা অসাধারণত্বের ধারণার সহিত মানুষের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিও পৃথক্ হইয়া দাঁড়ায় ; এ অবস্থায় সাধারণের যাহাতে সুখ তাহাতেই তাহার সুখ নহে, সাধারণের আশাতেই আপনার আশাকে আবদ্ধ করিতে চায়না, সাধারণের অবস্থাকেই স্পৃহনীয় বলিয়া মনে করিতে পারে না, এ অবস্থায় মানুষ চায় বিশেষত্ব, সাধারণের সহিত একটু বৈচিত্র্য। এ বিশেষত্ব ও এ বৈচিত্র্যেই তাহার সুখ, ইহাই তাহার আকাঙ্ক্ষা এবং ইহার দ্বারাই তাহার সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত। সাধারণের সহিত আপনার পার্থক্যের ক্ষেত্রে সাধারণের উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সাধারণের অধিকার ও স্বার্থসংকোচের প্রয়োজন ; কাজেই সে ক্ষেত্রে সর্ব্বজনীন স্বার্থের সহিত মানুষের স্বীয় স্বার্থের বিরোধও অবশ্যম্ভাবী, এবং বিরোধের ক্ষেত্রে আপনার দিকে যোগদানও মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। কোনওরূপ বিচার না করিয়া মানুষ যখন আপ-

মার অধিকারের সীমা উল্লঙ্ঘন করে, সাধারণ ভাব লইয়া সামাজিক বা জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে যত্ন করে, বড় বড় বাক্য রচনা করিয়া আপনার লোকহিতৈষণাকে মানুষের চক্ষে বেশ স্পষ্ট ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পায়, তখন তাহার জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে স্বার্থের রাক্ষস সে শুভ চেষ্টার অন্তরালে সাম্প্রদায়িক ভেদ, আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা অন্য কোনও আকারে আত্মলাভ করিয়া সমাজের সমস্যাকে আরও গুরুতর করিয়া তুলে। সে অবসরে দলাদলির ভাবটাও বেশ জমাট বাঁধিবার সুবিধা পায়, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধ সমালোচনা তখন তাহার দৃষ্টিকে স্বীয় চেষ্টার অসম্পূর্ণতার, অনুপযোগিতার দিকেই আকৃষ্ট করেন। পক্ষান্তরে সমালোচকের বিরুদ্ধেই উত্তেজিত করিয়া দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আয়োজন ও ন্যায়ের আবরণে অন্যায়ের সমর্থনে প্রবর্ত্তিত করে। তাহা তখন আর ভদ্রতার সীমায় আবদ্ধ থাকিতে চায়না, দ্বেষ হিংসা নিন্দা-কটূক্তির মধ্যে সমাজও তখন বিচ্ছিন্নতা বিভিন্নতার দ্বারা আপনাকে বিভাগ করিয়া লইতে বাধ্য হয়।

এতদ্ব্যতীত মানুষের আর এক প্রকার ভাব আছে, সেভাবে মানুষ দশজনকে বাদ দিয়া আপনার একটা পৃথক্ স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিতে চায় না, তাহার জীবনের সমস্ত স্পন্দন সমাজ বা জাতীয় জীবনের বৃহৎ স্পন্দনের অনুগত হইয়াই ক্রিয়া করে, আপনার আমিত্বটাকে জাতি বা সমাজের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া আপনিও জাতি বা সমাজময় হইয়া যায়। ইহা মানুষের বিশেষ ভাব। এ ভাবের উপরেই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা, এ ভাবের মানুষ বিশেষ মানুষ। এ অবস্থায় মানুষের যাহা সুখ, তাহা সামাজিক সুখ বা জাতীয় সুখের প্রতি-কূল নহে, এ অবস্থায় মানুষের যাহা আশা, তাহা সমাজেরই আশা, এ অবস্থায় মানুষের যাহা আকাঙ্ক্ষা, তাহা সমাজেরই আকাঙ্ক্ষা, এ অবস্থায় মানুষ যাহা করে নিজের জন্য, এ অবস্থায় মানুষ যাহা ভাবে, নিজের ভাবনা হইলেও তাহা সমাজেরই ভাবনা, এ অবস্থায় মানুষের নিজ ও সমাজ এক; তাহার সমস্ত কাজ, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত সাধনার মূলে নিজ ও সমাজ অভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এ অবস্থায় মানুষ সাধারণ দৃষ্টিতে আপনাকেও বরং ক্ষতি-গ্রস্ত করিতে পারে, কিন্তু সমাজ বা বৃহত্তের সামান্য অকল্যাণকেও উপেক্ষা করিতে পারে না। মানুষ এ ভাবের অধিকার লাভ করিলে সমাজ অথবা
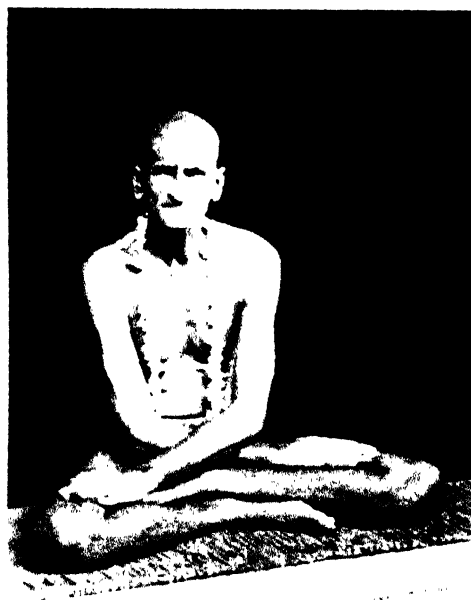
সাধারণসংশ্লিষ্ট যে কোনও বিষয়ে তাহার অধিকার জন্মে এবং তাহার ভাবনা ও সাধনা হইতে জরাজীর্ণ বিপন্নসমাজ আপনার জীবনধারণো-পযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। তাঁহার আন্দোলন ও আলোচনা কলহকেই ডাকিয়া আনে না। সহস্র প্রতিবাদ, অজস্র বিরুদ্ধ আলোচনার মধ্যে, তাঁহার স্নিগ্ধ গম্ভীর অনুদ্ধত ভাব, শান্তসংযত সুদৃঢ় বাক্য জোর করিয়া নয়, আপনার অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রকাশ করিয়া, ন্যায়ের দ্বারা, সত্যের দ্বারা মানুষকে বাধ্য করে; কিন্তু সাধনায় মানুষকে এভাব লাভ করিতে হয়। শুধু লেখা বা বক্তৃতায় নিঃস্ব প্রেম, পরার্থপরতা প্রভৃতি বড় বড় বাক্যগুলির প্রয়োগ করিলেই মানুষ এভাবের অধিকারী হইতে পারে না। তদ্ব্যতীত সামাজিক বা জাতীয় সংস্কারে জ্ঞানের প্রয়োজনও বড় স্বল্প নহে। মনুষ্য সঙ্কীর্ণ না হইতে পারে, ভাবের দ্বারা আপনার সমস্ত চেষ্টা ও যত্নকে সমাজোন্মুখী করিতে পারে, কিন্তু কোনও বিপন্ন সমাজ বা জাতির রক্ষাকল্পে তাহার প্রচলিত বিধি-নিষেধ-নিয়ম পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধনের দ্বারা তাহার গতিকে কোনও নূতন পথে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে সমাজতত্ত্বে যে অভিনিবেশ, যে বিশিষ্ট জ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিচার-শক্তির প্রয়োজন, মানুষ যদি তাহাতে একেবারেই বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহার সে শুভ চেষ্টা যতই উদার, যতই স্বার্থবিযুক্ত হউক, কিন্তু তাহার দ্বারা সমাজের ক্ষতির সম্ভাবনাও যথেষ্টই থাকে। স্বেচ্ছায় না হউক, অজ্ঞতার ফলে সে অনেক সময়েই কল্যাণের নামে অকল্যাণকে ডাকিতে পারে; সংস্কারের নামে সংহারেরই সহায়তা করিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ভাবের দ্বারা সুসংস্কৃত ও জ্ঞানের দ্বারা সুপরিশুদ্ধ না হইলে কাহারও এ বিষয়ে প্রকৃত অধিকার জন্মেনা। সাধারণের পক্ষে ইহা অনধিকার চর্চ্চা এবং তাহার ফলও সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। অবশ্য এ অকল্যাণের হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করা যেকোনওরূপ আলোচনার পক্ষেই সম্ভবপর নহে। সকল প্রকার আলোচনাকেই এভাবের অনধিকার চর্চ্চার দ্বারা অন্ততঃ আংশিক ভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়; কিন্তু এ কথা ঠিক যে, প্রকৃত অধিকারী হইতে শক্তিলাভ করিয়া সে আন্দোলন যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে ক্ষতিকে সহ্য করিতে পারে এবং তাহার উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত

করিতে পারে ততক্ষণ পর্য্যন্তই তাহার পক্ষে সে অনধিকারচর্চ্চাকে উপেক্ষা করা চলে এবং ততক্ষণ পর্য্যন্তই সে আলোচনা সমাজে প্রশ্রয় পাইবার যোগ্য ; কিন্তু আলোচনার নামে অনধিকার চর্চ্চা, অধিকারীর নামে অনধিকারীর প্রগল্ভ বাক্য যখন সমাজ বা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণে ব্যগ্র হয়, অধিকারের ক্ষীণকণ্ঠ ন্যায় ও সত্যের সবলতা সে বাগ্মিতায় ডুবিয়া যায়, তখন সে অনধিকার চর্চ্চা—সমস্ত আলোচনা সত্যসত্যই সমাজের পক্ষে—বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়ায় ; সমাজের পক্ষে তখন আর তাহাকে উপেক্ষা করা চলেনা।

বাঙ্গলা দেশের বর্ত্তমান সামাজিক আন্দোলনে যে সকল দুর্লক্ষণ দেখা দিয়াছে, মনে হয়, তাহাও কতকটা এ অনধিকারচর্চ্চার ফল। কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষকে আক্রমণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয় এবং কোনও পক্ষেই যে প্রকৃত অধিকারসম্পন্ন লোক একেবারেই নাই একথা বলার স্পর্দ্ধাও আমাদের নাই। তবে বর্ত্তমান আলোচনাক্ষেত্রে সকল সম্প্রদায়েই অনধিকারচর্চ্চার মাত্রাটা যে দিন দিনই বাড়িয়া উঠিতেছে, কোনওরূপ অধিকার বিচার না করিয়া যাঁহার যাহা খুসি, তিনি তাহাই সমাজের হিত বলিয়া প্রচার করিতেছেন ; প্রকৃত সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিতে হইলে বোধ হয় বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে একথা বলিতে হয়। ঘটনা বিশেষের উল্লেখ বা তাহার বিশ্লেষণে আমাদের প্রবৃত্তি নাই ; এবং তাহাতে আশঙ্কাও নানারূপই আছে। তবে একথাও বোধ হয় মিথ্যা নয় যে, আমরা অনধিকারীর আলোচনার ফল বলিয়া যাহার উল্লেখ করিয়াছি, বাঙ্গালীর সামাজিক আন্দোলনে সে ভাবের প্রভাবটা বেশ স্পষ্টই জাগিয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালা দেশের আন্দোলন-ক্ষেত্রে এক একটী প্রস্তাব উঠিতেছে সঙ্গে এক একটী দল লইয়া ; তাহার উদ্দেশ্য যেন সমাজের কতকটা অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মসাৎ করা, অপরদিকে তাহার প্রতিবাদের নামে ব্যর্থ করার চেষ্টাটাও হইতেছে। সম্মিলিত ভাবে তাহারও উদ্দেশ্য যেন ভালমন্দ কোনওরূপ বিচার না করিয়া প্রতিপক্ষকে বাধা প্রদান করা। এই যে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা দেখা যাইতেছে, ইহার মূলে যদি সত্যানুসন্ধান প্রবৃত্তির প্রাবল্য পরিলক্ষিত হইত

তাহা হইলে আমরা আশা করিতে পারিতাম যে, এ বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্ঘর্ষণ-জনিত আলোকের রশ্মির সুবর্ণ রেখাপাতে হয়ত বা এই অন্ধকার দেশে একটা খাঁটি পথের খোঁজ পাওয়া গেলেও যাইতে পারে; কিন্তু দেখিতেছি, ইহার অন্তরালে সাধারণ ভাব যেরূপ প্রবল, সমাজ বা জাতির আবরণে আপনাকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা যেরূপ বলবতী। যেখানে তাহা নাই, যেখানে সমাজ বা জাতির মঙ্গল কামনা কোনওরূপে আপনারে একটুকু স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে; সেখানেও জ্ঞানের অভাব, বিশেষজ্ঞতার অভাব, দেশ ও জাতির প্রকৃত পরিচয়ের অভাব, তাহার উপর আবার আগন্তুক একটা আত্মবিস্মৃতির ভাব যেরূপ জাগ্রত, তাহাতে মনে হয়, এরূপ সঙ্ঘর্ষণ স্নিগ্ধালোকের পরিবর্ত্তে বুঝি বা প্রাণান্তকর কালাগ্নির শিখারই উদ্গীরণ করিবে। অবশ্য ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার তেমন কিছুই নাই; যেখানে অধিকারের বিচার নাই, অনধিকারীর স্বৈরাচার প্রশমনের কোনওরূপ ব্যবস্থা নাই, সে আলোচনার প্রকৃতি ও পরিণাম যাহা হওয়া উচিত এক্ষেত্রেও তাহাই হইতেছে। আমরা ভাবপ্রবণতার সাহায্যে ঘটনাটাকে অতিরঞ্জিত করিয়া বা বাড়াইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছি না। যাঁহারা সত্য সত্যই সমাজতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা একটু অভিনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে পরস্পরের মধ্যে যে সহানুভূতির প্রয়োজন, একটী উদ্দেশ্যকে ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টার মধ্য দিয়া বিভিন্ন প্রকারে সফলতার দিকে লইয়া যাওয়া, যাহা এক জাতীয়ত্বের নিদর্শন, দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে তাহা দিন দিনই লোপ পাইতেছে। সামাজিক জাতীয় আন্দোলনের নামে বিচ্ছিন্ন বিভিন্নতার দ্বারা সমগ্র হিন্দু-সমাজটাকে সহস্রভাগে বিভক্ত করার আয়োজন সকলদিক হইতেই সমানভাবে চলিতেছে। অবশ্য আমরা ইহাও জানি যে, ইহার একটা বিশেষ কারণ আছে, এবং কাল ও অবস্থানুসারে সে কারণের মূলোচ্ছেদও সহজসাধ্য নহে। কিন্তু দিন দিন দেশের সামাজিক অবস্থা যেরূপ ভয়ানক ভাব ধারণ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, আত্মরক্ষা করিতে হইলে শীঘ্রই এভাবের সংশোধন আবশ্যক। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার সংস্কার বা পরিবর্ত্তন সাধন যে নিতান্তই প্রয়োজনীয়, সেই বিষয়ে দেশের চিন্তাশীল ও

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোনওরূপ মতভেদ নাই। কিন্তু সে সংস্কার করিবে কি? সে সংস্কার অনধিকারীর দ্বারা সিদ্ধ হইবার নহে। তাহার ফল যেরূপ হইতেছে চিরকাল এইরূপই হইবে।

শ্রীরেবতীরমণ ভট্টাচার্য্য।

আতিথেয়তা।

পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, যতদূরে দেখা যায় সবই পর্ব্বতশ্রেণী, নানা জাতীয় বড় বড় বৃক্ষ, খানিকটা খানিকটা সমতল ভূমি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া পাহাড়িয়ারা বাস করে, পাহাড়ের উপর হইতে ঝরণা নামিয়া আসিতেছে, স্বচ্ছ সুন্দর বারি, স্বল্প গভীর নিম্নের প্রস্তরটী পর্য্যন্ত দেখা যায়, অস্তমিত সূর্য্য শৈলশিখরের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, নিম্নে আর একটী প্রস্তরস্তরে একটী পার্ব্বতীয়া রমণী দাঁড়াইয়াছিল, মাথায় কেশরাশি মুক্ত করিয়া সম্মুখ কপালে ঝুলাইয়া দিয়াছে, কপালে লাল সিন্দূরের ফোটা, পরিধানে গোলাপী রংকরা বস্ত্র, মুখখানি তেমনি সুন্দর, তেমনি উজ্জ্বল, সুন্দরী একখানি পার্ব্বতীয় বংশদণ্ডের উপর ভরদিয়া হেলিয়া দাঁড়াইয়া অস্তমিত সূর্য্যের প্রতি চাহিয়াছিল, সম্মুখের কুঞ্চিত বসন বায়ুহিল্লোলে তর তর করিয়া কাঁপিতেছিল, পদনিম্ন উপত্যকার উর্ব্বর ক্ষেত্রের পক্ক শস্যশীর্ষ এই সঙ্গে কাঁপিতেছিল, সুন্দরী স্থির, নিশ্চল, অস্তমিত সূর্য্য-কিরণ-আভা সুন্দরীর সিন্দূররাগরঞ্জিত বদনকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিল। যেন দুই শৈলশিখরে দুইটী সূর্য্য পরস্পরকে বিদায় অভিভাষণ করিতেছিল। বংশদণ্ডবদ্ধ বাঁকাল ছুরিকাখানি থাকিয়া থাকিয়া চিক্ চিক্ করিয়া হাসিতেছিল। সুন্দরীর পৃষ্ঠদেশে একটী শিশু বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ। সে নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছিল। সেও তাহার মত সুন্দর, সবে সম্মুখের দুইটী ছোট ছোট দাঁত উঠিয়াছে, ঘুমন্ত শিশুর সুকোমল ওষ্ঠ মধ্যে মধ্যে স্বপ্নদর্শনে

ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল, সেই অবসরে শ্বেত দন্তদুটীও রক্তিম আভায় উজ্জ্বল হইয়া হাসিতেছিল। সুন্দরীর পশ্চাতে কতকগুলি পার্ব্বতীয় নানাবর্ণের গৃহ-পোষ্য ছাগল এক প্রস্তর খণ্ড হইতে অন্য প্রস্তর খণ্ডে লাফাইয়া তৃণান্বেষণ করিতেছিল। আর এক এক বার মুখ তুলিয়া সন্ধ্যার আগমন বার্ত্তা মৃদুস্বরে পালনকর্ত্রীকে জ্ঞাপন করিতেছিল। সূর্য্য শৈলশিখর অন্তরাল হইতে একবার মুখ তুলিয়া সুন্দরীর নিকট যেন শেষ বিদায় লইয়া অদৃশ্য হইলেন। সুন্দরী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সম্মুখে ফিরিয়া ছাগল-গুলিকে ডাকিল, তাহার পর ধীরে ধীরে লঘুপদা হরিণীর মত এক প্রস্তর খণ্ড হইতে অন্য প্রস্তর খণ্ডে লাফাইয়া লাফাইয়া উপত্যকার পর্দানিম্নস্থ কুটীরা-ভিমুখে চলিয়া গেল; ছাগলগুলি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

পথে ছাগশিশু ডাকিলেই রমণী ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল। জঙ্গলে হেঁাড়ারের বড় ভয়, হেঁাড়ার কতকটা হায়নার মত জানোয়ার, অত্যন্ত মাংস-লোভী, তেমনি শৃগালের মত প্রখরবুদ্ধি, এমন কি নিদ্রিতা মাতার কোল হইতে ঘুমন্ত শিশুকে লইয়া যায়, শিশু বা মাতা কিছুই টের পায় না। এমনি সন্তর্পণে শিশুকে লইয়া যায় যে, সে মনে করে, মাতৃকোলে আছে। হোঁড়ার রমণীর কয়েকটী ছাগশিশু কয়েকদিন পূর্ব্বে রাত্রে লইয়া গিয়াছিল। রমণী তাই একটা আশঙ্কায় ভীতদৃষ্টিতে আজ শিশুগুলির প্রতি বার বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতেছিল।

পর্ব্বতসমতল ভূমির উপর রমণীর ক্ষুদ্র কুটীর খানি পরিষ্কার পরি-চ্ছন্ন। রমণী ধীরে ধীরে ছাগলগুলিকে তাহাদের কুটীরে প্রবেশ করাইয়া একখানি প্রকাণ্ড পাথর মুখে চাপা দিল। প্রস্তর খানি স্থানচ্যুত করিতে রমণীর রক্তিম গণ্ড আরও রক্তবহুল হইয়া রক্তপদ্মের মত গাঢ় লাল হইয়া উঠিল।

তাহার পর সে গৃহের প্রদীপ জ্বালিয়া পৃষ্ঠস্থিত সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া দীপাধারের সম্মুখে বসিয়া শিশুর গণ্ডে চুম্বন করিতে লাগিল। দীপের ক্ষীণ আলোকরশ্মি যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কতকক্ষণ রমণী তন্ময় হইয়া পুত্রের মুখচুম্বন করিতেছিল, এমন সময় এক যুবক আসিয়া ধীরে ধীরে রমণীর পশ্চাৎ দিক হইতে দুই হস্তে তাহার চক্ষু আবৃত করিল।

যুবতী উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল, "বাবা এল না?" যুবকের সমস্ত আনন্দ অন্তর্হিত হইল। সে গম্ভীর ভাব বলিল, "না"। যুবতী উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" যুবক বলিল, "রাজার কাছ থেকে হুকুম না এলে, তাঁর নেল্ খুলবে না।" কয়েদীদের পায়ে যে বেড়ী দেওয়া হয় তাহারই নাম নেল্।

যুবকযুবতী নেপালের অধিবাসী, নেপালের প্রজা; তাহারা পাহাড়ে বাস করে, নিম্নের সহর হইতে পশুর চামড়া, ঘৃত, তেজপত্র, বড় এলাচ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে বসন ও লবণ ক্রয় করিয়া আনে। অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তাহাদের উপত্যকাতে জন্মে যুবকের পিতা সহরে, পরিবর্ত্তে জিনিস আনিতে গিয়াছিল, বৃদ্ধ তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অজানিত অবস্থায় এক মুসলমান গৃহস্থের বাড়ীতে জল পান করে। নেপালে মুসলমান ও হিন্দু সহজে চেনা যায় না। এই অপরাধে তাঁহাকে আমিনী কাছারীতে আমাদের দেশে ফৌজদারী কাছারীর মত ছয় মাসের জন্য নেল ঠুকিয়া দিবার হুকুম হয়। কারাগারও অদ্ভুত। কয়েদীদিগকে খাটিতে হয় না; মাত্র আবদ্ধ থাকিতে হয়। সরকার হইতে প্রত্যহ যাহা খোরাকী ব্যবস্থা আছে তাহাতে একটী লোকের কিছুতেই আহার সংকুলান হয় না। যাহার আত্মীয় আছে, কারাগারে তাহার খাবার দিয়া যায়। আত্মীয়বান্ধবহীন দুর্ভাগা কয়েদীর অন্নাভাবে শুকাইয়া মরিতে হয়।

পিতার প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হইয়া গেল। তথাপি বৃদ্ধ বাড়ী আসিল না দেখিয়া চিন্তিত পুত্র পিতার সন্ধানে সহরে গেল—যাইয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ। বৃদ্ধ এই একমাস অনাহারে কয়েদখানায় মৃতপ্রায়। সে যাহা কিছু ঘৃত প্রভৃতি লইয়া গিয়াছিল—তাহারই পরিবর্ত্তে যাহা কিছু অর্থ পাইল পিতাকে দিয়া পিতার মুক্তির জন্য রাজসরকারে দরখাস্ত করিল। রাজার নিকট প্রজার নিবেদন পৌছান দুর্ঘট। তাহাও বহু সময়সাপেক্ষ। বসিয়া বসিয়া দুই মাস পরে যুবক গ্রামে ফিরিয়া আসিল। পুনরায় যখন সে সহরে গেল তখন তাহার পিতার মুক্তির সময় হইয়াছে—কিন্তু সে তাহার পিতার মুক্তির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল, সে দরখাস্ত মঞ্জুর না হইয়া আসা পর্য্যন্ত তাহার পিতার মুক্তি হইবেনা, এইরূপ আদেশ হইল। দরখাস্ত না করিলে প্রথম হুকুম অনুযায়ী এই ছয় মাস পূর্ণ হইলেই যুবকের পিতার মুক্তি হইত, কিন্তু এই দরখাস্তের জন্য কবে মুক্তি হইবে কতদিনে হুকুমনামা আসিবে

তাহা কেহই বলিতে পারিল না। নিরাশক্ষুব্ধ যুবক পিতাকে যৎসামান্য যাহা পারিল, খোরাকীর জন্য দিয়া একাকী ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই যুবকপত্নী উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বাবা এল না"। যুবকের বন্দী পিতার শীর্ণ মুখখানি মনে পড়িয়া এই প্রবাসের পর পত্নীর সহিত মিলনানন্দ নষ্ট হইয়া গেল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বাহিরে গুরু গম্ভীর স্বরে শব্দ হইল, "ম্যাম্ ভুখা হুঁ"। যুবক লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যুবতী উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

যুবক বাহিরে গিয়া দেখে, এক জটাজুট বিলম্বিত সাধু প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছে। সাধু সন্ন্যাসী অতিথিদের প্রতি নেপালীদের বড় ভক্তি। সে সাধুর পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া সাধুকে ঘরের বারান্দার উপর বসিবার জন্য একখানি মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া দিয়া সাধুকে পরম বিনীতভাবে বসিতে অনুরোধ করিল। সাধু আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন, "আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত, তিন দিন আমার আহার হয় নাই।" যুবক করজোড়ে বলিল, "আহার কি আমরা প্রস্তুত করিয়া দিব?" সাধু বলিলেন, "আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।" যুবক সানন্দে বাড়ীর ভিতর অতিথির আগমন সংবাদ জানাইতে গেল। যুবকও পরিশ্রান্ত; সেও সমস্ত দিন অনাহারে বহু পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত মুখে জল দেয় নাই—সে এই অতিথি আগমনে নিজের শ্রান্তি ভুলিয়া গেল।

অতিথির কথা শুনিয়া যুবতীর মুখ শুকাইয়া গেল। ঘরে যাহা আহার্য্য আছে তাহাতে একজনের আহার হইতে পারে। যুবতী ভাবিয়াছিল, স্বামীকে আহার করাইয়া সে নিজে আজি উপবাসী থাকিবে। তাহারও পরিশ্রান্ত ক্ষুধাতুর স্বামী; যুবক তীব্র দৃষ্টিতে পত্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। যুবতীর আর কোন কথা বলিতে সাহস হইল না। অতিথি নারায়ণ, তাঁহার সেবা সর্ব্বাগ্রে, পতিপুত্র পরে, সে নিদ্রিত শিশুটীকে বারান্দায় দড়ির দোলনায় শোয়াইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া অতিথির আহার প্রস্তুত জন্য রন্ধনশালায় গেল। শিশুকে ভিতরে শোয়াইবার কথা মনে হইল না।

যুবক সন্ন্যাসীকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহার গাঁজা সংগ্রহের জন্য

প্রতিবাসীর কুটীর উদ্দেশে ছুটিল। ২।৩ স্থানে বিফলমনোরথ হইয়া সে অন্য উপত্যকার নিম্ন গ্রামে সেই অন্ধকারে পাহাড়ের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল।

যুবতী রন্ধনশালায় ক্রন্দন করিতেছিল; উনানের ফুঁ দিতে দিতে একত্র একবার আগুণ জলিয়া উঠিতেছিল, সেই রক্তিম আভায় যুবতীর মুখও মেঘের মধ্যে বিজলীর মত ধক্ ধক্ করিয়া জলিয়া উঠিয়া আবার অন্ধকারে মিশাইয়া যাইতেছিল। নিদ্রিত সন্তান বারান্দার দড়ির দোলনায় ঝুলিতেছিল। যুবতীর তাহা মনেও ছিলনা, সে অতিথিসেবার আনন্দে বাহ্যজগত ভুলিয়া গিয়াছিল।

অন্ধকারে যুবক পাহাড়ের উপর দৌড়াইতেছিল। দূরে পল্লীর ক্ষীণ আলোক মেঘাবৃত নক্ষত্রের মত থাকিয়া থাকিয়া মিট্ মিট্ করিয়া জলিতেছিল। যুবক সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছিল। পরবর্তী গ্রামে গাঁজা পাইল। যুবক আনন্দে অতিথি সেবার জন্য, আবার নিজের পল্লী অভিমুখে পাহাড়ের উপর দিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। হঠাৎ পায়ে কিসে কামড়াইল। হাত দিয়া সরাইয়া দেখে, একটা প্রকাণ্ড পাহাড়িয়া কাঁকড়া বিছা। অসহনীয় যন্ত্রণা; সর্পদংশনে অত দাহ নাই। যুবক সে যন্ত্রণা ভ্রূক্ষেপ করিল না। যুবক অতিথি সেবার জন্য তন্ময়, এ দারুণ যন্ত্রণাতেও সে বিচলিত হইল না। গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

যুবক অতিথিকে নিজহাতে সাজিয়া গাঁজা দিল; অতিথি তৃপ্ত হইলেন। যুবকের তৃপ্তি তদপেক্ষা অনেক অধিক।

যুবক ভিতরে আসিয়া সন্ধান লইয়া গেল, আহার প্রস্তুত হইয়াছে। পত্নীকে বাহিরে আহার আনিতে আদেশ করিয়া সে নিজে পানীয় জল প্রভৃতি অন্যান্য আয়োজন করিতে লাগিল।

এদিকে দাওয়ায় দড়ির দোলনায় শিশু নিদ্রা যাইতেছিল। একটা হোঁড়ার ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সেই প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া পার্শ্বের জঙ্গলের মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া তীত্র সশঙ্ক দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। হোঁড়ার দেখিল, সকলেই ব্যস্ত, সেদিকে কেহই নাই, সে অতি সন্তর্পণে গুঁড়ি মারিয়া দাওয়ার উপর উঠিল। তাহার পর সন্তান-

বাঁধা কাপড় আস্তে আস্তে দাঁত দিয়া কামড়াইয়া শিশুকে ঝুলাইতে ঝুলাইতে দাওয়া হইতে নীচে নামিল, শিশু ঝাঁকুনিতে আরও শান্তিতে নিদ্রা যাই-তেছিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই যুবতী রান্নাঘর হইতে সন্ন্যাসীর আহার লইয়া বাহির হইল, সম্মুখেই চাহিয়া দেখে হোঁড়ার তাহার শিশু সন্তান লইয়া পলাইতেছে। মুহূর্ত্তে তাহার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হইয়া গেল। সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল। মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইতেছিল—অতি কষ্টে তাহা দমন করিয়া পর মুহূর্ত্তেই সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল—কোনরূপ শব্দ করিল না। সন্ন্যাসীর খাবার লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। হোঁড়ার রমণীকে দেখিয়া ভীত হইয়াছিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের ঢালু অংশে নামিয়া গেল।

সন্ন্যাসী আহার করিতে লাগিলেন। স্থির ভাবে রমণী তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল; কোন উদ্বেগ প্রকাশ করিল না। কিন্তু মুখ ভার, রক্তশূন্য, মৃতের মত; ব্যস্ততাবশতঃ রমণীর স্বামী তাহা লক্ষ্য করিল না। সেও বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রনা ভুলিয়া কায়মনে সন্ন্যাসীর পরিচর্য্যা করিতেছিল।

সন্ন্যাসীর আহার সম্পাদন হইল। হঠাৎ প্রদীপের আলোকে যুবক রমণীর সেই রক্তশূন্য মুখ দেখিয়া চমকিয়া ভীত দৃষ্টিতে পত্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। রমণী আর সহ্য করিতে পারিল না, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হঠাৎ ক্রন্দনে যুবক ও সন্ন্যাসী উভয়ে বিস্মিত হইয়া যুবতীকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবতী করুণ কণ্ঠে উত্তর করিল, "আমার সন্তান হোঁড়ারে লইয়া গিয়াছে।" উৎকণ্ঠিত যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "কখন"? যুবতী বলিল, "অতিথির আহার আনিবার সময় দেখি, হোঁড়ার আমার সন্তান লইয়া যাইতেছে।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি চীৎকার করিলে না কেন?" যুবতী বলিল, "আপনার আহারের ব্যাঘাত আশঙ্কায় আমি সে সময় চীৎকার করি নাই পুত্র গেলে পুত্র হইবে কিন্তু আপনার আহার নষ্ট হইলে আর জীবনে আপনাকে অতিথি পাইব কি না সন্দেহ।" স্তম্ভিত, বিস্মিত সন্ন্যাসী অতিথিপরায়ণা রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে দৃষ্টিতে রমণীর মহিমা উদ্ভাসিত; সন্ন্যাসী সমস্ত জীবনে কঠোর তপস্যায় যে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই, এই অসভ্য অশিক্ষিতা পাহাড়ী রমণী তাহা অবহেলায় লাভ

করিয়াছে। সন্ন্যাসী আজ তাঁহার জীবনে নিষ্ফলতা বুঝিলেন, মহত্তের সম্মুখে আপনার ক্ষুদ্রত্ব অনুভূতি হইল। তখন গ্রামবাসীরা একত্রিত হইয়া মশাল জ্বালিয়া শিশুর অনুসন্ধানে বাহির হইল—সকলেই এক একটা বড় ঢিল—কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া, ঘুরাইতে ঘুরাইতে যাইতে লাগিল। সে দেশবাসীর ধারণা, এইরূপ ভাবে ঢিল ঘুরাইলে হোঁড়ার সহজে আক্রমণ করে না, কিন্তু সকলের চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। শিশুর সন্ধান পাওয়া গেল না।

সন্ন্যাসী গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে রমণীকে বলিলেন, "মা! এ নিস্বার্থ পরোপকার নিষ্ফল হইবে না। যদি আমার তপস্যার কোন ফল থাকে, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি শীঘ্রই সুপুত্রবতী হইবে। পুত্রের গৌরবে তোমাদের বংশ শ্রেষ্ঠ বংশরূপে পরিচিত হইবে। এ আতিথেয়তা তোমাদের বংশ চির-উজ্জল করিয়া রাখিবে।" সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরেই যুবতীর যমজ পুত্র হইল। সেই পুত্রদ্বয়ের কীর্ত্তি-প্রতিষ্ঠিত বংশ আজ শতবৎসর পরেও নেপালে হোঁড়ারের বংশ নামে উচ্চসম্মানিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

বাঙ্গালী রমণীর গৃহস্থালী।

গত আষাঢ় মাসের ভারতী-পত্রিকায় দিনাজপুরের সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ বাহির হইয়াছে। চৌধুরী মহাশয় বিলাতফেরত হইলেও তিনি দুইটী খাঁটী স্বদেশী উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথা— "নিজের মা থাকিতে পরের

গৃহিণীকে মা বলিও না। আর নিজের মাকে বিদেশী জামাজোড়া পরাইও না।" সেই আষাঢ়ের ভারতীতেই আর একজন বিলাতফেরত বাঙ্গালী, ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক "ইংরেজ রমণীর গৃহস্থালী" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি বাঙ্গালী রমণীকে বিদেশী জামাজোড়া না পরাইয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। ডাঃ মল্লিক মধ্যে মধ্যে এক একটা অদ্ভুত আবিষ্কার দ্বারা সকলকে চমকাইয়া থাকেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ মুক্তিবাদ তাঁহার ভাত খাওয়ার ফল। তিনি এবার আবিষ্কার করিয়াছেন, "সে দেশের (বিলাতের) রমণীদের "এপ্রণ"পরা, বুকে ফুল গোঁজা, একটু লাল ফিতে পিন্ দিয়া আঁটা, ছোট ছোট ফুল কাটা রুমাল,—ছোট ছোট হাতগুলি দিয়ে হাবভাব সহকারে তাহার ব্যবহার—ইহা দেখিলেই মনে হয় যে, সংসারে পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছলতা, স্বাস্থ্য ও শান্তি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে!" অতএব বাঙ্গালী রমণীকেও সংসারে পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছলতা, স্বাস্থ্য, শান্তি লাভ করিতে হইলে "এপ্রণ" পরিয়া, বুকে ফুল গুঁজিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি করা উচিত! কিন্তু নিয়ে যে বাঙ্গালী রমণীর চিত্র দেওয়া হইল. তাঁহারা কোন কালেও ডাঃ মল্লিকের ব্যবস্থা শুনিবেন না, কারণ "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি"।

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী কোন এক বড় সহরে বাস করেন। বাড়ীতে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা রোগশয্যায় পড়িয়া আছেন। স্ত্রী শৈলবালা, তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা লইয়া তাঁহার সংসার। আর একটী কন্যা সুরবালার বিবাহ হইয়াছে, সে সম্প্রতি শ্বশুরালয় হইতে পিতৃগৃহে আসিয়াছে। বড় পুত্র রাখালের বয়স ১৮।১৯ বৎসর, সে স্থানীয় কলেজে পড়ে। তিনকড়ি বাবু কোন আফিসে কাজ করিয়া মাসে পঞ্চাশটী টাকা পান। ইহা দ্বারা তাঁহাকে সংসারের যাবতীয় খরচ নির্ব্বাহ করিতে হয়। কিন্তু গৃহিণী সুরবালার সুব্যবস্থার গুণে তাঁহাকে এতগুলি পুত্র কন্যা লইয়াও কোন কষ্ট পাইতে হয় না। বাড়ীতে চাকর নাই, একটী ঝি আছে। সে বাড়ীর বাহিরের কূপ হইতে জল তুলিয়া আনে আর বাজার করে। এতদ্ভিন্ন গৃহের সমস্ত কার্য্য গৃহিণী শৈলবালাকে করিতে হয়।

পূর্ব্বাকাশে উষার কনকছটা ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই শৈলবালা গাত্রোত্থান করেন। উঠিয়াই প্রথমে শাশুড়ীর ঘরে গিয়া তাঁহার খবর লন। বৃদ্ধা দীর্ঘকাল যাবৎ বাতরোগে উত্থানশক্তিরহিত, এমন কি বাহিরে গিয়া শৌচ-ক্রিয়া করিতেও অক্ষম। শৈলবালা নিজ হস্তে তাঁহার মলমূত্রাদি পরিষ্কার করেন। তিনকড়ি বাবু প্রাতঃকালে উঠিয়াই কয়েক ছিলিম তামাক সেবন করেন, গৃহিণী তামাক সাজিয়া টিকায় আগুন ধরাইয়া রাখিয়া যান। দেখিতে দেখিতে পুত্রকন্যাগুলি জাগিয়া উঠে ও মুখ হাত ধুইয়া পড়াশুনা আরম্ভ করে। যদি কেহ বেশীক্ষণ শুইয়া থাকে তাহাকে ডাকিয়া তোলা হয়।

বেলা ৭টার মধ্যে শৈলবালা স্নান করেন। স্নানান্তে স্বামীর আহ্নিকের জোগাড় করিয়া দেন। বাটীর ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে কয়েকটী ফুল গাছ আছে, সুর-বালা সেই গাছ হইতে ফুল তুলিয়া আনে। গৃহিণী পূজার আয়োজন করিয়া দিয়া ভাঁড়ার ঘরে যান এবং রন্ধনোপযোগী জিনিষ পত্র গোছাইয়া লইয়া রন্ধন-শালায় প্রবেশ করেন। সেই রন্ধন গৃহ প্রত্যহ দুইবার পরিষ্কার করা হয়। উনানের ছাই বাহির করিয়া সেগুলি ঝাঁড়িয়া আধপোড়া কয়লাগুলি তুলিয়া লওয়া হয়। পরে ঘরের মেঝে গোময় ও মাটী দিয়া পুছিয়া ফেলা হয়। সাধারণতঃ বাঙ্গালীর রান্নাঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন (ডাঃ মল্লিকের মতে "ভীষণ!"), শৈলবালার চেষ্টায় তাঁহার রান্না ঘরে একটুও ময়লা জমিতে পারে না। রান্না ঘরের সংলগ্ন জলনির্গমের নালা তিনি স্নানের পূর্ব্বে নিজ হস্তে পরিষ্কার করেন। সেই ঘরের বাহিরে একটা হাঁড়িতে ফেন রাখা হয়, প্রতিবেশী গোকুলের মা তাহার গরুর জন্য সেই ফেন লইয়া যায়।

এবার উনান ধরান হইয়াছে। উনানে ডাইল চাপাইয়া দিয়া শৈলবালা তরকারী কুটিতেছেন। ঝি জল তুলিয়া আনিয়া একটা জালায় রাখিতেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি এক এক খানা রুটী গুড় দিয়া খাইয়া বই ও শ্লেট লইয়া বসিয়াছে। বড় ছেলে রাখাল বাহিরের ঘরে বসিয়া রঘুবংশ পড়িতেছে। বড় মেয়ে সুরবালা তাহার ঠাকুরমার কাছে একটা সেলাই হাতে করিয়া বসিয়াছে। গৃহিণী তাহাকে বিশেষ কোন কাজ করিতে দেন না, সে অনেক দিন পরে শ্বশুর ঘর হইতে আসিয়াছে, এখন তাহার ছুটি।

সে অধিকাংশ সময় তাহার ঠাকুরমার কাছে আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করে। শৈলবালা আলু কুটিতেছেন, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তুলসী নামক পাঁচ বৎসরের মেয়েটী শ্লেটে "কর", "খল" লিখিতেছে, আর হরি নামক সাত বছরের ছেলেটী অঙ্ক কসিতেছে। তিন বৎসরের একটী মেয়ে মিনি একখানা ছবির বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। তুলসী থাকিয়া থাকিয়া লেখা বন্ধ করিয়া মিনির সঙ্গে খেলা করিতেছে, কিন্তু মায়ের দৃষ্টি পড়িলে অমনি লেখায় মনোনিবেশ করিতেছে। পাঁচ মিনিটের বেশী সে মনঃসংযোগ করিতে পারে না। লিখিতে লিখিতে সে হঠাৎ উঠিয়া বলিল—"মা বাহ্যে যাব।" মা বলিলেন—"যা।"

মা তখন দেখিলেন, মিনি ছবির বই ছিঁড়িবার উপক্রম করিতেছে। অমনি তিনি বইখানা কাড়িয়া লইলেন। মিনি রাগ করিয়া হতভম্ব হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তুলসী পায়খানা হইতে আসিয়া বলিল—"মা, আমি পাতলা বাহ্যে করেছি।"

মা বলিলেন—"কেমন পাতলা?"

"জলের মতন।"

"তবে যা অষুধ খেয়ে আয়।"

তিনকড়ি বাবু বাড়ীতে একটা হোমিঃ ঔষধের বাক্স রাখেন এবং আবশ্যক মত ছেলেপুলেদিগকে বই দেখিয়া ঔষধ দেন। তিনি খবর পাইয়া আসিয়া বলিলেন,—

"তুলসী বলে, সে পাতলা বাহ্যে করেছে? এই প্রথম, না আরও দুই একবার করেছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "এই প্রথম, কোন ভয় নাই। ওর কৃমি আছে, কৃমির অষুধ দাও।"

"কৃমি বুঝিলে কিসে? কৃমি দেখেছ?"

"না দেখি নাই—কৃমি বই আর কি? পেট ব্যথা পেট ব্যথা করে, রাত্রে নাক খোঁটে। ওরে ননী, তুই পড়া ছেড়ে উঠে এলি কেন?"

তিনকড়ি বাবু উঠিয়া আসিতে তাঁহার একাদশবর্ষ বয়স মধ্যম পুত্রও তাঁহার সঙ্গে উঠিয়া আসিয়াছে। মায়ের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল,—"আমার পড়া হয়ে গেছে।"

মা বলিলেন "কেমন করে হলো? কাল সন্ধ্যাবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলি; এর মধ্যে পড়া হয়ে গেল? মিছা কথা।"

"না—মিছা কথা হবে কেন? আমার পড়া ধর।"

তিনকড়ি বাবু বলিলেন,—"আচ্ছা ধরা যাবে এখন। তুই যা'ত, আমার অষুধের বাক্সটা নিয়ে আয়। ছিনা দিয়া দেখি।"

"আমি যাচ্ছি" বলিয়া হরিও উঠিল। কিন্তু ননী "ছিন্—ছিন্—ছিনা" করিতে করিতে এক লম্ফে গিয়া অষুধের বাক্স আনিয়া হাজির করিল। তিনকড়ি বাবু অষুধ বাহির করিয়া তুলসীকে খাইতে দিলেন।

ছোট শিশুটী তখন কান্না ধরিল, "আমি ওচুদ খাব" "আমি ওচুদ খাব।" মা বলিলেন "ও কথা বলে না দুষ্টু মেয়ে, তা হলে অসুখ হবে। তুলসী, এবার লিখ্‌তে বো'স্—ও কি রকম লিখেছিস্—প-টা কেমন হয়েছে?"

হরি হাসিয়া বলিল—"যেন ঘোড়ার মুখ!"

মা বলিলেন, "তুই বড় ফাজিল! তোর কয়টা অঙ্ক হলো দেখি?"

হরি বলিল,—"তিনটা, এই দেখ।"

ননী ইত্যবসরে প্রস্থান করিয়াছে। এই সময়ে দুধওয়ালী একটা ভাঁড়ে করিয়া দুধ লইয়া আসিল। শৈলবালা বলিলেন—"তুমি একটু ব'সো, আমি রান্না চড়াইয়া দিয়াছি, একবার দেখে আসি। কড়াটা নিয়া আসি। কালকার দুধটা এমন পাত্‌লা ছিল কেন?"

দুধওয়ালী বসিয়া বলিল, "সে কি মা? আমার দুধ পাত্‌লা হবে কেন? তোমরা ভদ্র লোক, কড়ি দিয়ে দুধ খাও, সে কি কখনও হ'তে পারে?"

গৃহিণী কড়া নিয়া আসিয়া বলিলেন "না,—কা'লকের দুধটা বড় পাতলা ছিল, মোটেই সর পড়িল না। আমার রাখালত পাতলা দুধ একেবারেই খেতে পারে না।"

দুধওয়ালী মাথায় হাত দিয়া বলিল, "মা, আমার মাথার দিব্যি লাগে, আমি একটুও জল মিশাই নাই। সে কি কথা, আমারও বেটা পুত্তুর আছে, তোমরা কড়ি দেবে টাকায় ৮ সের তাও, যারা দশসের ক্যায় তাহাদের দুধে একটু আধটুকু জল মিশাই।" ইহা বলিয়া গোয়ালার মেয়ে কড়ায় দেড় সের দুধ মাপিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

রাখাল এই সময়ে একখানা নূতন বই হাতে করিয়া আসিয়া বলিল—

"কই—সুরো কই—তার বই এসেছে।" ইহা শুনিয়া সুরবালা দৌড়িয়া আসিল এবং সকলে মিলিয়া সেই বই লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। রাখাল চেঁচাইতে লাগিল, "আরে ছিঁড়ে যাবে, ছিঁড়ে যাবে। এক জনের হাতে থাকুক, আর সকলে দ্যাখ।"

"আমি ছবি দেখ্‌বো, ছবি দেখ্‌বো" বলিয়া হরি লাফাইতে লাগিল। রাখাল তখন সেই রামায়ণ বই খুলিয়া ছবি দেখাইতে লাগিল। মা বলিলেন—

"এখন এ বই রেখেদে। স্কুলের পড়া পড়। পরে বৈকালে আসিয়া দেখ্‌বি।"

এই সময়ে ঝি আসিয়া বলিল, "মা, বাজারে যাব, পয়সা দাও।"

শৈলবালা তখন আঁচল হইতে একটা সিকি খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "মাছ তিন আনার আন্‌বে, আলু ঘরে আছে, পটল এক পয়সার, বেগুন এক পয়সার, লেবু এক পয়সার আর পান এক পয়সার আন্‌বে। শীঘ্‌গির করে এস, বেলা হয়ে গেছে।" ঝি প্রস্থান করিল।

বাজার করিয়া আসিতে আসিতে ডাল ও ভাত রান্না হইয়া গেল। মাছ আসিলে আলু দিয়া তাহা পৃথক্ স্থানে রান্না করা হইল। বেলা সাড়ে ৯টার মধ্যে রান্না শেষ হইল। ডাল ও ভাত রান্না হইলে শৈলবালা সর্ব্বাগ্রে শাশুড়ীকে খাইতে দিলেন। পরে মাছ রাঁধা হইলে ছেলে পুলেদের খাইতে দিলেন। তিনকড়ি বাবু বেলা ১০টার সময় স্নান করিয়া খাইতে আসিলেন। তিনি খাইতে বসিলে বড়মেয়ে সুরবালা কাছে বসিয়া পাখা করিতে লাগিল। বৃদ্ধা মাতা যত দিন সমর্থ ছিলেন ততদিন তিনিই কাছে বসিয়া খাওয়াইতেন ও নানা কথা বলিতেন। এখন তিনি উঠিয়া আসিতে পারেন না, তবে শুইয়া শুইয়া কথা বলিতে ছাড়েন না। তিনি বলিলেন—

"বাবা, বৌমার কাপড় নাই, এবার ধোপার বাড়ী কাপড় দিতে পারিলেন না। দেখ পরণের কাপড় কেমন ময়লা হয়েছে।"

এই কথা শুনিয়া শৈলবালা বলিলেন "মা, কাপড় এখন থাক, টাকা কোথায়? আজ মাসের সবে ১৩ দিন, এখনও ১৭ দিন বাকী। হাতে পুঁজি

মাত্র ১০টী টাকা। আমার কাপড় আজ সাবান দিয়া কেঁচে নেবো এখন। মাসের এই কয়দিন পরে কাপড় কিনিলে চলিবে।”

তিনকড়ি বাবু বলিলেন, “মোটে দশটাকা আছে?”

শৈলবালা বলিলেন “তবে কি? হিসাব ত রাখনা? ছেলেদের স্কুলের মাহিনা দিয়াছি যে?”

তিনকড়ি বাবু ডাল দিয়া ভাত মাখিয়া মুখে দিতে দিতে বলিলেন—

“তা’ত বুঝিলাম। তোমার কাপড় না হ’লেই বা চ’লবে কিরূপে? দোকান থেকে ধারে আনা যাবে এখন।”

শৈল। ধারে আনিয়া শোধ দিতে পারিলে’ত হয়? কাপড়ের দোকানে এখনও ১৫৲টাকা বাকী আছে।

তিনকড়ি বাবু আর এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া বলিলেন “কই, নেবু কই? ডালটায় একটু নুন বেশী হ’য়েছে।”

সুরবালা পাখা রাখিয়া নেবু আনিয়া দিল। গৃহিণী বলিলেন—

“নুন বুঝি ভুলে দুবার করে দিয়াছি। ডাল খাওয়া না গেলে মাছের ঝোল দিয়া খাও।”

গৃহিণীর বেশ ওস্তাদি আছে। তিনি দু’চার পয়সার তরকারি, দুই তিন আনার মাছ আনিয়া তাহা দিয়া গুছিয়া গাছিয়া তিন চারি রকমের ব্যঞ্জন রাধেন। তাঁহার হাতে কোন জিনিষেরই অপচয় হয় না। তিনকড়ি বাবুর ভোজন শেষ হইল। তিনি পান ও তামাক সেবন করিয়া আফিসে গমন করিলেন। তখন গৃহিণী আর একবার মোটামুটী স্নান করিয়া পূজা করিতে বসিলেন। প্রায় একঘণ্টা কাল পূজা করিয়া তিনি আহার করিলেন এবং আহারান্তে শয়ন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন।

বেলা ৩টার সময় শৈলবালা উঠিয়া আবার গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। ঘরের জিনিষপত্রগুলি যথাস্থানে সজ্জিত করিয়া রাখিয়া, খাশুড়ীর ঘরে বসিয়া ছোট শিশুটীর জন্ম একটা জামা সেলাই করিতে লাগিলেন। সুরবালা সেখানে বসিয়া তাহার ঠাকুরমাকে রামায়ণ প’ড়িয়া শুনাইতে লাগিল। সে ইংরেজ বালিকার মত বৈকাল বেলা পাড়ার কোন যুবকের হাত ধরা ধরি করিয়া খোসগল্প করিতে করিতে মাঠে বেড়াইতে না গিয়া

বাড়ীতেই থাকে, ইহাতে হয়ত মন সংসারের পাপপ্রলোভন হইতে দূরে থাকে।

বেলা চারিটা বাজিলে ছেলেমেয়েরা স্কুল হইতে আসিল। মা তাহাদের জল খাবার—মুড়ী ও গুড় বাটীতে বাটীতে করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। কোন কোন দিন রুটীও প্রস্তত করিয়া রাখা হয়। কিন্তু বাজারের সন্দেশ রসগোল্লা নামধারী বিষবড়ী এবাড়ীতে প্রবেশ ক'রতে পারে না। কখনও কখনও গৃহিণী সখ করিয়া মোহনভোগ কিম্বা অন্য কোন রকম মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া থাকেন। কিন্তু অর্থাভাবপ্রযুক্ত তাহা প্রায়ই ঘটে না।

রাখাল জলখাবার খাইয়া বেড়াইতে গেল। আজ তাহাদের কলেজে ফুটবল ম্যাচ্ হইবে, সে একজন প্রধান খেলোয়াড়। ননীও তাহার সঙ্গে ম্যাচ দেখিতে গেল। হরি খাতা লইয়া লিখিতে বসিল। তুলসী মিনির সহিত খেলা করিতে লাগিল। তিনকড়ি বাবু পাঁচটার পরে আফিস হইতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আসিলেন। সুরবালা বারান্দায় রাখিয়া তাঁহাকে পাখা ক'রিতে লাগিল। তিনি শ্রান্তি দূর করিয়া মুখ হাত ধুইলেন। গৃহিণী তাঁহার জলখাবার সরবৎ ও পেঁপে আনিয়া দিলেন। তিনি তামাক সেবন করিয়া পান খাইতে খাইতে বেড়াইতে বাহির হইলেন।

গৃহিণী আবার তরকারী কুটিতে বসিলেন। পাড়ায় গোকুলের মা তাহার গরুর জন্য ফেন লইতে আসিল। শৈলবালা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "কই, তুমি আজ সকলে এলে না কেন ?"

গোকুলের মা তাঁহার সম্মুখে পা ছড়াইয়া বসিয়া বলিল "মা, আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি। ছেলেটার আবার জ্বর হয়েছে। বাড়ীতে বৌ নাই, আজ সাতদিন বাপের বাড়ী গিয়াছে, তার কোন খোঁজ খবর নাই।"

শৈলবালা ডাক্তার বেগুন কুটিতে কুটিতে বলিলেন, "তোমার ছেলের জন্য কাল সকালে আসিয়া অষুধ নিয়া যাবে। উনি কত লোককে অষুধ দেন। তোমার বৌ এমন কেন ?"

"সে কথা আর ব'লো না মা। আমার বৌ কাহাকেও গ্রাহ্যি করে না।" ইহা বলিয়া রাগে গরগর করিতে করিতে গোকুলের মা ফেন লইয়া প্রস্থান করিল।

এই সময়ে 'বেল নেবে গো' বলিয়া একটী স্ত্রীলোক একটা ঝুড়িতে করিয়া বেল বিক্রয় করিতে আসিল। গৃহিণী ২টা পাকা বেলের দর ঠিক করিয়া তাহাকে একটা পয়সা দিলেন। তাহাকে বলিলেন, "তুমি আর যখন যে ফল পাও আমাকে দিও। তোমার ছেলের নাম কি?"

বেলওয়ালী পয়সাটা আচলে বাঁধিয়া বলিল "মা আমার দুঃখের কথা কি বলিব, আমার ছেলে নাই। আজ সে বাঁচিয়া থাকিলে এককুড়ি বছরের যোয়ান হইত। সে থাকিলে আমার এত কষ্ট হবে কেন?" ইহা বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিল। গৃহিণীও আচল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুত্রটি বাঁচিয়া থাকিলে সেও আজ কুড়ি বছরের হইত।

গৃহিণী তরকারী কোটা শেষ করিয়া ঘরের প্রদীপ জ্বালিয়া দিলেন এবং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন। ছেলে মেয়েরা প্রদীপের কাছে বই লইয়া বসিল। তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাদের খোঁজ লইতে লাগিলেন। ননীর হাতে একটা নূতন পেন্‌সিল দেখিয়া বলিলেন,—

"ওরে এটা কার পেন্‌সিল? তোর পেন্‌সিল কোথায়?"

গৃহিণী ছেলেদের একটা পেন্‌সিল কাটিয়া দুখানা করিয়া দেন। একখানা শেষ হইলে তবে আর অর্দ্ধেকখানা পায়।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে ননী বলিল,—

"এ নরেশের পেন্‌সিল,—সে আমাকে দিয়াছে।"

"দিয়াছে? তার পেন্‌সিল তোকে দিল কেন? মিথ্যা কথা! তুই চুরি করে এনেছিস্?"

"না—চুরি করিব কেন?"

"তবে সে তোকে দেবে কেন?"

"আমি যে সে দিন তাকে একটা জল ছাপার ছবি দিয়াছিলাম?"

মা বলিলেন, "খবরদার, কারও জিনিষ চুরি করিও না। আমি রাখালকে বলিব সে নরেশের কাছে জানিয়া আসিবে।"

ইহা শুনিয়া ননীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার চোখ দিয়া কোঁটা

ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। সে তাহার নিজের পেন্‌সিল হারাইয়া ফেলিয়া ভয়ে নরেশের পেন্‌সিল আনিয়াছিল। গৃহিণী আসল কথা বুঝিতে পারিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে রান্না ঘরে গেলেন, এবং তিনকড়ি বাবু বাড়ী আসিলে তাঁহাকে এ কথা বলিয়া দিলেন। তিনকড়ি বাবু ননীকে খুব ধমকাইলেন ও প্রহার করিলেন। সে কাঁদিতে কাঁদিতে শুইয়া পড়িল ও ক্রমে তাহার ঘুম আসিল।

এদিকে গৃহিণী রন্ধন শেষ করিয়া রাত্রি ৮টার সময় ছেলে মেয়েদের ভাত খাইতে দিলেন। ননী খাইতে আসিল না। তিনি তাহাকে অনেক কষ্টে তুলিলেন এবং কোলে বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার মুখে হাসি দেখা দিল ও সে পেটভরিয়া ভাত খাইল।

তাহাদের খাওয়া হইলে তিনকড়ি বাবু আহার করিলেন। গৃহিণী সকলকে খাওয়াইয়া সর্ব্বশেষে আহার করিলেন। শুইবার আগে তিনি ছেলে মেয়েদের প্রত্যেকের গায়ে কাপড় আছে কি না ও ঘরের জানালা বন্ধ আছে কি না দেখিলেন। সে দিন সন্ধ্যার পরে বৃষ্টি হইয়াছিল, কাজেই ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। যে দিন মধ্য রাত্রে বৃষ্টি হয় সে দিন তিনি উঠিয়া ছেলে মেয়েদের গা ঢাকিয়া দেন। সকল কাজ শেষ করিয়া শুইতে তাঁহার এগারটা বাজিল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর অল্পকাল মধ্যেই তিনি সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিমগ্ন হইলেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

নারী।

তোমারে চিনেছি নারী, বিপদের দিনে.
সহিষ্ণু প্রশান্ত ধীর, সুকল্যাণময়ী,
নৈরাশ্যে জগৎ শূন্য, তব সঙ্গ বিনে,
গৃহের মঙ্গলচণ্ডী, সেবাব্রতা অয়ি।

সন্তপ্ত আঁধার রাতে, মুদে পড়ে আঁখি,
নবনীকন্দের মত আঙুল পরশে
ঘর্মোপলসম কর তপ্ত বুকে রাখি
অসহ্য বেদনারাশি মিলায় হরষে।
ললাটে বুলায়ে কর রোগীর শিয়রে,
অনাহারে অনিদ্রায় কে পোহাবে নিশি ?
হতাশে কে দিবে আশা, শূন্য হৃদি ভরে,
পথভ্রান্ত শ্রান্ত জনে কে দেখাবে দিশি ?
ওগো দেবি ! বিনা তব বসন অঞ্চল,
কে মুছাবে ব্যথিতের তপ্ত আঁখি জল ?
নিত্য মোরা রক্ষা পাই দুর্দ্দিনে বিপদে,
সে শুধু তোমার গুণে তব পুণ্যবলে।
নিত্য আরাধনা তব দেবতার পদে,
গৃহের মঙ্গল যাচো নয়নের জলে।
তুলসীতলের মাটি ভক্তপদধূলি
এনেছ চরণামৃত নির্ম্মাল্য প্রসাদী.
ভক্তিভরে পীড়িতের শিরে দেহ তুলি।
কতবার নিজ অঙ্গে নেছ কাল ব্যাধি।
ছায়া জলে শোভিয়াছ দগ্ধ মরুভূমি,
অমৃত বিতরি কণ্ঠে ধরেছ গরল।
ভিখারী হলেও পতি অন্নপূর্ণা তুমি,
চির পূর্ণা বিতরিছ সুধা অন্নজল।
কল্লোলমুখর নদীবুকে বন্যার সঙ্কটে,
তরণী ভিড়িয়া বাঁচে তব অঙ্কতটে।

শ্রীকালিদাস রায়।

শ্রীগুরবে নমঃ।

পূজার সংখ্যা।

১ম খণ্ড। } আশ্বিন ১৩২০ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শাশ্বতী

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক
শ্রীনিখিলনাথ রায়।

লেখকগণের নাম।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীসাতকড়ি অধিকারী এম, এ, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ, শ্রীগুরুদাস সান্ন্যাল, শ্রীকালিদাস রায় বি, এ, শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা শাশ্বতীর মূল্য প্রদান না করিয়াছেন, আশ্বিন সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভি পিতে পাঠান হইবে। তবে কেহ অন্য মাসে ভি, পি করিতে বলিলে আমরা তাহাও করিতে পারি। গ্রাহকগণের কোন পত্র না পাইলে আশ্বিন মাসেই ভি-পি করিব। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

নিয়মাবলী।

—:•:—

সাহিত্যে দেশীয় ভাববিকাশই শাশ্বতীর উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কোন লেখক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে পারেন। নবীন লেখক-গণের প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

শাশ্বতীর জন্য প্রবন্ধাদি ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি এবং চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এথোড়া পোঃ ভায়া সীতারামপুর ই, আই, রেলওয়ে ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

এথোড়া (Ethora) পোঃ
ভায়া সীতারামপুর,
ই, আই, রেলওয়ে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

———

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শাশ্বতী ৯ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩২০। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আগমনী।

—:*:—

[১]

এস গো জননী ফিরিয়া আবার জীর্ণ ভগ্ন কুটীরবক্ষে,
গৃহের হাস্য-কল-কোলাহলে শিশুর আস্যে, স্নেহের চক্ষে,
এস প্রবাসীর আকুলানন্দ-নয়নের নীরে, মাতার হর্ষে,
এস মা অযুত সাধক-কণ্ঠে, পুণ্যঘটের সলিল-বর্ষে,
জননী তোমার পরশে ধরার ধন ধান, প্রাণ পাক্ মা বৃদ্ধি,
আন মা পুষ্টি দীপ্তি তুষ্টি, আন মা শুদ্ধি, তৃপ্তি, ঋদ্ধি।

[২]

এস মা অভ্র-উজল গগনে, এস মা শুভ্র কাশের ক্ষেত্রে,
এস কমলের অরুণচিত্তে, অপরাজিতার করুণনেত্রে,
এস মা ইন্দ্রধনুর তোরণে, বিহগকুলের কূজনছন্দে,
এস কুমুদীর হৃদয়-তরীতে, কৌমুদী-নীরে পরমানন্দে,
জননী তোমার পরশে ধরার ধন ধান প্রাণ পাক্ মা বৃদ্ধি,
আন মা পুষ্টি দীপ্তি তুষ্টি, আন মা শুদ্ধি তৃপ্তি ঋদ্ধি।

[৩]

এস কলকল নদীর লহরে পণ্যপূরিত তরণীপুঞ্জে,
শালি ধান্যের শ্যাম সম্পদে, এস মা বাতাবী আতার কুঞ্জে,
এস মা তরুণ অরুণোজ্জ্বল, নীহার-নিচিত শষ্প-অঙ্গে,
এস মা শঙ্খবংশীস্বনে, গৃহে গৃহে আজ এস মা বঙ্গে,
জননী তোমার পরশে ধরার ধন ধান প্রাণ পাক্ মা বৃদ্ধি,
আন মা পুষ্টি দীপ্তি তুষ্টি, আন মা শুদ্ধি তৃপ্তি ঋদ্ধি।

[৪]

পত্র পুষ্পে পুণ্যপুলকে ও পাদ-পরশে পূরুক পল্লী,
কম কিশলয়ে শোভুক মৃণাল, শিহরি উঠুক বিটপীবল্লী,
তোমার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ধেনু আপীনে ছাইয়া ঢালুক দুগ্ধ,
আজি জীবলোক চরণে তোমার লুটিয়া পড়ুক মন্ত্রমুগ্ধ,
জননী তোমার পরশে ধরার ধন ধান প্রাণ পাক্ মা বৃদ্ধি,
আন মা পুষ্টি দীপ্তি তুষ্টি, আন মা শুদ্ধি তৃপ্তি ঋদ্ধি।

[৫]

শোকহত লাগি আনো সান্ত্বনা, তাপিতের লাগি পরম শান্তি,
পীড়িতের লাগি সুধার ভাণ্ড নিরাময় বাণী, মোহন কান্তি,
বন্যামগন সন্তানে রাখি অঞ্চল ছায়ে কর মা ধন্য,
ক্ষুধিতের লাগি আন মা অন্ন, তৃষিতের লাগি পীযূষ স্তন্য,
জননী তোমার পরশে ধরার ধন ধান প্রাণ পাক্ মা বৃদ্ধি,
আন মা পুষ্টি দীপ্তি তুষ্টি, আন মা শুদ্ধি তৃপ্তি ঋদ্ধি।

শ্রীকালিদাস রায়।

এস মা এস।

এস মা এস, সম্বৎসর পরে আবার বসুন্ধরা বক্ষে তোমার চরণস্পর্শ হউক। তড়াগে তড়াগে পদ্ম ফুটিয়া উঠুক, বন উপবন কুসুমরাশিতে ভরিয়া থাক, আকাশ নির্ম্মল হউক, রবিকরে, চন্দ্রকরে ধরণী প্রফুল্ল হইতে থাকুক, সমীরণ মৃদুভাব ধারণ করুক, স্রোতস্বিনী মন্দগতি হউক, বিশ্বসংসার শান্তিধারায় ভরিয়া থাক, পাপতাপ দূরে পলায়ন করুক, আধি ব্যাধির বিনাশ ঘটুক, শোকাশ্রু মুছিয়া যাক, আনন্দকোলাহলে দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠুক, গৃহে গৃহে পবিত্রতা বিরাজ করুক, প্রতিকণ্ঠে তোমার আগমনী গীত হউক, নভঃস্পর্শ করিয়া তাহা চারিদিকে ছুটিয়া যাক, সমগ্র ধরা পুণ্যসলিলে ভাসিতে থাকুক, আর দেবলোক হইতে তাহার পৃষ্ঠে পুষ্পবৃষ্টি হউক।

তুমি আসিবে বলিয়া আমরা কত আশায় বুক বাঁধিয়া আছি, কত প্রাণের কথা জানাইব বলিয়া বৎসর ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছি। গৃহে গৃহে তোমার প্রতিমা দেখিব বলিয়া শোকতাপ ভুলিয়া গিয়াছি। মা নামে অন্তরাত্মাকে শীতল করিব বলিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি; তাই বলিতেছি, এস মা এস, আবার এই শারদ-জ্যোৎস্না-প্লাবিত পৃথিবীমণ্ডলে সম্বৎসর পরে দেখা দেও। আবার যূথী, জাতি ও শেফালিকা গন্ধে আমোদিত শারদ সমীরকে আরও সুগন্ধ করিয়া অবতীর্ণ হও, আবার কমল-কুমুদ-শোভিত সরোবরের শোভা বাড়াইয়া আগমন কর, আবার শালি-শ্যামল ক্ষেত্রে প্রফুল্লতা ছড়াইয়া দেও। আবার স্বর্গ মর্ত্ত্য এক করিয়া আমাদিগকেও দেবসম করিয়া তুল, শোকদুঃখ দূর করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখে আমাদিগকে ডুবাইয়া রাখ। পাপী তাপী সন্তানকে করুণাবর্ষণে স্নিগ্ধ করিয়া তুল। নিরানন্দ ধরায় আনন্দ সলিল ঢালিতে থাক, পবিত্রতার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া সকলের হৃদয় নির্ম্মল করিয়া দেও।

আমাদের অন্তর ও বাহির যে মেঘাচ্ছন্ন ছিল, ঐ দেখ তোমার আগমনে তাহা নির্ম্মল হইয়া উঠিতেছে, শরতের নির্ম্মলতা যেমন বসুন্ধরাকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিতেছে, তেমনি আমাদের অন্তরাত্মাকেও প্রসন্ন করিতেছে।

বিশ্ব নির্ম্মল ও আত্মা পবিত্র না হইলে তোমার অধিষ্ঠান হইবে কেন? যেমন তুমি গৃহে গৃহে বিরাজ করিবে, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবে, সরোবরে সরোবরে অধিষ্ঠান করিবে, সেইরূপ আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে, আত্মায় আত্মায় বিকাশিত না হইলে আমরা তোমার আগমন বুঝিব কিরূপে? যখন অন্তর ও বাহির, বিশ্ব ও আত্মা এক হইয়া তোমার আগমন বুঝিতে পারিবে, তখনইত আমরা সেই আনন্দসাগরে ডুবিয়া যাইব। তাই বলিতেছি, শরতের নির্ম্মলতার সঙ্গে তোমার করুণাধারায় বিশ্ব ও আত্মাকে সিক্ত করিয়া দেও। সম্বৎসর পরে আবার তোমার করুণাময়ী আনন্দময়ী মূর্ত্তি অন্তরে ও বাহিরে দেখিয়া জীবন সফল করি। বাহ্য পুণ্ডরীকের ন্যায় আমাদের হৃদয় পুণ্ডরীককেও খুলিয়া দেও, তোমার চরণরাজীবস্পর্শে তাহা প্রফুল্ল হইয়া উঠুক, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাত্মা আনন্দসলিলে ডুবিয়া যাক।

এস, মা এস, আমাদের আহ্বানে কি তুমি কর্ণপাত করিবেনা? সত্য সত্যই কি সন্তানের কথা ভুলিয়া গিয়াছ? সমস্ত বিশ্বইত তোমার ক্রোড়ে, তবে কি আমরা বিশ্বের বাহিরে? তাই বটে, আমরা এক্ষণে বিশ্বছাড়া হইয়াছি বটে, নতুবা তোমাকে দেখিতে পাই না কেন? তোমাকে বুঝিতে পারি না কেন? যে তুমি বিশ্বজননী, বিশ্ব ব্যাপিনী,—সেই তোমাকে সম্বৎসর পরেও বা ভাল করিয়া দেখিতে পাই কৈ? ভাল করিয়া বুঝিতে পারি কৈ? পাপে আমাদের বহিশ্চক্ষু অন্তশ্চক্ষু মলিন হইয়াছে, কাজেই তোমাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই না, বৎসর বৎসর তোমাকে দেখিব বলিয়া ছুটা ছুটি করি বটে, কিন্তু ভাল করিয়াও দেখা ঘটে না। তুমি তিনদিন মাত্র থাক, সে কয়দিন বাহ্য আমোদ প্রমোদেই কাটাইয়া দেই, তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে চাহি কৈ? বৎসর ব্যাপিয়াত তোমার ধারই ধারি না। তিনদিনে তোমাকে দেখিব বলিয়া মনে হইলেও, কার্য্যে তাহাও ঘটিয়া উঠে না। বহিশ্চক্ষু কোনরূপে তোমাকে দেখিলেও অন্তশ্চক্ষু একেবারেই উন্মুক্ত হয় না। দুই চক্ষু মিলিয়া তোমাকে না দেখিলে কেহ কি তোমাকে দেখিতে পায়? কাজেই আমাদের পক্ষে তোমার দর্শনলাভই ঘটিয়া উঠে না।

কিন্তু তাই বলিয়া আমরা নিরাশ হইব কেন? সম্বৎসর পরে যখন তোমাকে

দেখিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া পড়ি, যখন তুমি আসিবে বলিয়া হৃদয় বিন্দুমাত্রও প্রসন্ন হইয়া উঠে, বাহ্য আমোদপ্রমোদে রত হইলেও যখন তোমারই জন্য ক্ষণিক আনন্দের বিকাশ হয়, তখন তুমি ইচ্ছা করিলে কি আমাদিগকে ভাল করিয়া দেখা দিতে পার না? আমরা ত তোমার কুপুত্র বটি, কিন্তু তুমি কি কুমাতা হইবে? আমরা শক্তিহীন হইয়াছি বটি, কিন্তু তুমিই-ত শক্তিস্বরূপিণী, তুমি ইচ্ছা করিলে কি আমরা শক্তিসম্পন্ন হইতে পারি না? "সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি" এ কথাত আমরা সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া থাকি, তুমি ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে দেবত্ব, ব্রহ্মত্ব দান করিতে পার, আবার তোমার ইচ্ছায় আমরা পশুত্বে জড়ত্বে পরিণত হইতে পারি। মা, আমাদের পরিণাম কি তাহাই স্থির করিয়াছ? তাই যদি হয়, তবে তোমার আগমনের জন্য আমাদের প্রাণ নাচিয়া উঠে কেন? আমাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠে কেন? আমাদের আত্মা জাগিয়া উঠে কেন?

তোমাকে ভাল করিয়া দেখিতে না পাইলেও, তোমাকে ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও, তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও মা বলিয়া আমরা জানি না। জানি, আমাদের শত অপরাধ আছে, সহস্র অপরাধ আছে, কিন্তু মা, মার কাছে সন্তানের আবার অপরাধ কি? সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা কর, তাহাদিগকে ভাল করিয়া দেখা দেও। তাহাদিগকে আর কত পরীক্ষা করিবে? দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, বন্যায় তাহাদিগকে গৃহহীন, প্রাণহীন, শক্তিহীন করিয়া দিতেছ, তাহাদের হাহাকারে দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছ, ইহাতে কি তোমার পরীক্ষার শেষ হয় না? তবে যদি তোমার মনে আমাদের ধ্বংসেরই ইচ্ছা থাকে, ইচ্ছাময়ি মা, তোমার সে ইচ্ছার পূরণ হউক। আমরা কিন্তু বৎসরান্তেও ক্ষীণ কণ্ঠে একবার মা বলিয়া ডাকিতে ছাড়িব না। ঐ দেখ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা-প্রপীড়িত হইয়াও আমরা আবার তোমাকে ডাকিতেছি। ঐ দেখ, তোমার পূজার জন্য আমরা আয়োজন করিতেছি। ঐ দেখ তোমার আগমনের জন্য আমাদের গৃহ ও হৃদয় পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতেছি। তবে তুমি দেখা দিবে না কেন? জানি তোমার দর্শন লাভ জন্মজন্মান্তরীন পুণ্যের ফলে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের ক্ষীণ পুণ্যে আমাদিগকে ভারতবর্ষে আনিয়াছ। যখন তোমার লীলাক্ষেত্র হিমালয়

বিন্ধ্যাচল আমাদের নেত্রসমীপে স্থাপন করিয়াছ, যখন জাহ্নবীযমুনার পবিত্র তটে আমাদিগকে বিচরণ করাইতেছ, তখন আমাদিগকে দেখা দিবে না কেন? আমরা অকৃতী হই, অধম হই, কিন্তু তোমার সাধের ভারত ত আমাদিগকে আনিয়াছে, তবে আমরা তোমার দর্শন পাইব না কেন? আমাদিগের বহিশ্চক্ষু স্থির করিয়া দেও, অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন কর, আমরা প্রাণ ভরিয়া একবার তোমাকে দেখিয়া লই। তোমার বিশ্বপাবনী মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের আত্মা পবিত্র হইয়া যাক, তোমার করুণাময়ী, আনন্দময়ী প্রতিমা সর্ব্বদা আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকুক, অন্তরে ও বাহিরে তোমার সত্তা অনুভব করিয়া আমরা তুমিময় হইয়া থাকি। মাতৃত্বের করুণা-ধারায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠি। মা মা বলিয়া ভূমিতে লুটাইতে থাকি। একবার মা এই অসুরদিগের মস্তকে তোমার পদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিয়া দেও, তাহারা ধন্য ও কৃতার্থ হউক।

এস মা এস, আমরা আবার তোমায় ডাকিতেছি। ঐ দেখ, আমরা তোমার পূজার আয়োজন করিয়াছি; ঐ দেখ, তোমার স্নানের জন্য সর্ব্বতীর্থের সলিল সংগ্রহ করিয়াছি, জবাবিল্বদলে পুষ্পপাত্র পরিপূর্ণ রাখিয়াছি, ধূপ ধুনায় মণ্ডপ আচ্ছন্ন করিয়াছি, শঙ্খঘণ্টায় দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছি, আমরা বাহ্য পূজাই জানি, তাই তাহারই আয়োজন করিয়াছি, কিন্তু মানস পূজা-ত আমরা জানিনা বা আমাদের তাহা করিবার শক্তি নাই, সেই দ্বাদশ দল বা সহস্রদল পদ্মের অমৃতে স্নান, অথবা তোমার অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব ডুবাইয়া আমরা, অমায়া, অনহঙ্কার, অরাগাদিগুণকে তোমার গুণ বলিয়া অনুভবরূপ পূজা কি করিতে পারি? কিন্তু আমাদিগকে সে শক্তি না দিলে আমরা তোমাকে অন্তরে দেখিতে পাইব কিরূপে? আমরা যদি তাহার অধিকারী নাই হই, তবে আমাদের এই বাহ্যপূজা গ্রহণ কর, আমাদের চিত্ত শুদ্ধ করিয়া দেও, ক্রমে ক্রমে মানস পূজার অধিকারী কর। আমরা তোমার অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব ডুবাইয়া দেই। মায়ে সন্তানে এক হইয়া যাক। সেই মানস পূজা কবে করিতে পারিব বলিয়া দেও।

ব্রাহ্মণ-রক্ষা।

ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজের চূড়া; হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে হইলে ব্রাহ্মণ-রক্ষা করিতেই হইবে। এই কথাটা সকলকে মাথা হেঁট করিয়া মানিতেই হইবে। ব্রাহ্মণ দুই প্রকারের,—এক সমাজশাসক কুলীন ও গোষ্ঠীপতি ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। গোষ্ঠীপতি ধনী ব্রাহ্মণ এক সময়ে সমাজের মাথা ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমাজের ব্যবস্থাদাতা ও পুরোহিত ছিলেন। ইহা ছাড়া দেবল ব্রাহ্মণ, চাষী ব্রাহ্মণ, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ, কাপালিক ব্রাহ্মণ, স্বর্ণবণিকের ব্রাহ্মণ, নট ব্রাহ্মণ, গায়ক ব্রাহ্মণ, মালাকর ও পাচক ব্রাহ্মণ, গঙ্গাপুত্র ব্রাহ্মণ, আচার্য্য ব্রাহ্মণ—প্রভৃতি নানাবিধ ব্রাহ্মণ সমাজে ছিল, এখনও আছে। শিল্প ও ব্যবসায়-গত ব্রাহ্মণ কখনই সমাজে প্রাধান্য লাভ করে নাই। সুতরাং তাহাদের ভাবনায় আমাদিগকে চিন্তিত হইবার প্রয়োজন দেখি না।

ব্রাহ্মণের যে অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ব্রাহ্মণের অধঃপতনেই সমাজের অধঃপতন ঘটিয়াছে; মাথার চূড়া ধুলায় লুটাইলে সমাজ ত ধুলায় লুটাইবেই। তাই যখন যবনবীর অলীকসন্দর ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সহিত বিষম বিরোধ করেন। দুইটি ব্রাহ্মণবন্দীকে অলীকসন্দর জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা পুরোহিত, তোমরা যুদ্ধ করিলে কেন?" উত্তরে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "হে রণধীর, তুমি যবন—ভিন্নধর্ম্মা.তুমি এ দেশ জয় করিলে সর্ব্বনাশ ত আমাদেরই অধিক হইবে। আমাদের প্রাধান্য নষ্ট হইবে, পৌরহিত্য দূর হইবে, ধর্ম্ম বজায় থাকিবে না। ব্রাহ্মণ্যের অপচয় ঘটিলেই এ দেশ পরাজিত ও পরাধীন হইবে। সে দুর্দ্দিন যাহাতে আমাদিগকে দেখিতে না হয়, সেই আশায় যুদ্ধ করিতেছি।" কথাটা সত্য। ভারতের ব্রাহ্মণের, বিশেষতঃ বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের, ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে, বিষম পাতিত্য ঘটিয়াছে। সমষ্টির পাতিত্য সমাজের পাতিত্য; সমষ্টি শক্তির অপচয় ঘটিলেই সমাজের পাতিত্য ঘটে। অর্থাৎ সমাজ-বন্ধন শিথিল হইলে সামাজিকগণ অনধিকার

চর্চ্চা করিলে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অপহ্নব হইলে, সমাজের পাতিত্য ঘটে। যে দিন হইতে ভারতের হিন্দুসমাজ পরমুখাপেক্ষী হইয়াছে, সেই দিন হইতে সামাজিক পাতিত্য ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে সামাজিকগণের নিজ নিজ কর্ম্ম দোষে যে পাতিত্য ঘটে তাহা ব্যষ্টির পাতিত্য। ব্যষ্টির বা ব্যক্তির পাতিত্যের প্রায়শ্চিত্তবিধান আছে; সামাজিক পাতিত্যের জন্য প্রায়শ্চিত্ত রাজাকে করিতে হয়। শ্রীরামচন্দ্র সে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। শূদ্রের তপস্যা—অনধিকার চর্চ্চা—বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন সামাজিক পাতিত্যের প্রায়শ্চিত্ত করিবার রাজা বা সমাজপতি কেহ নাই। কাজেই সে পাতিত্য হইতে উদ্ধার লাভের আশা আমাদের নাই। সামন্তরাজ বা ভৌমিক জমীদার থাকিলেও সামাজিক পাতিত্য উদ্ধারের কতকটা ব্যবস্থা হইতে পারিত। রাজপুতনা প্রভৃতি দেশে যে সকল সামন্তরাজ আছেন, তাঁহারাও এখন আমাদের মত মুগ্ধ ও বিহ্বল। প্রায়শ্চিত্ত করিবে কে?

কাজেই এখন ব্যষ্টির পাতিত্যের কথাটাই স্পষ্ট করিয়া কহিতে হয়। ব্রাহ্মণ নিত্য পঞ্চযজ্ঞ না করিলে, গোব্রাহ্মণের সেবা এবং অতিথির সেবা না করিলে তাঁহার পাতিত্য ঘটেই। এখনও এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা পঞ্চযজ্ঞহীন ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করেন না। গুরুদেব কেশবানন্দ সরস্বতী বাঙ্গলায় আসিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। খুঁজ-বাছা করিয়া তিনি মহামহোপাধ্যায় ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ও ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রামের বাটীতে এক এক রাত্রি বাস করিয়াছিলেন। কাজেই বলিতে হয়, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ মোটের উপর পতিত। এ পাতিত্য দূর করিবার ব্যবস্থা করা কঠিন।

কথায় আছে—"বিনাশ্রয়ং ন জীবন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ।" অর্থাৎ আশ্রয়হীন হইয়া পণ্ডিত, কুলাঙ্গনা এবং লতা বাঁচিয়া থাকে না। দক্ষিণ বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আশ্রয় ছিলেন—নবদ্বীপাধিপতি। মহারাজ গিরিশচন্দ্রের সময় হইতে সে আশ্রয় বিগড়াইয়াছে; নবদ্বীপও ধীরে ধীরে দীপশূন্য হইতেছে। উত্তর বাঙ্গালায় নাটোরের মহারাজগণ ব্রাহ্মণের আশ্রয় ছিলেন, সে আশ্রয়ও বিগড়াইয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালায় বর্দ্ধমানের মহারাজগণ ব্রাহ্মণ রক্ষা করিতেন; মহারাজ তেজশ্চাঁদ বাহাদুরের পর সে আশ্রয়ও

তেমন সজীব নহে। সুতরাং আশ্রয়হীনতার জন্য ব্রাহ্মণের যে পাতিত্য ঘটিয়াছে তাহার প্রতিবিধান করা এখন সম্ভবপর হইবে না।

ইহার উপর বিলাতী বিলাসের মোহ আছে, অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা আছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুকরণের প্রয়াস আছে—এই তিন বাহ্যশক্তির প্রভাবে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ বিষম বিষয়ী হইতেছে, জাতি-কুল-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছে। যে বাঙ্গালার প্রতিগ্রামে টোল চতুষ্পাঠী ছিল, যে বাঙ্গালায় এখনও সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় দশ বার হাজার পরীক্ষার্থী উপস্থিত হয়, সে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের আদর দিনে দিনে শরতের নদীশোষণের মত কমিয়া যাইতেছে। এই অপচয়ের বিষম বেগ রোধ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। এক এক করিয়া বড় বড় কুলীন অধ্যাপকবংশ লোপ পাইতেছে—নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান পণ্ডিতশূন্য হইয়াছে এবং হইতেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রক্ষার পক্ষে কোন চেষ্টাই সমাজ করিতেছে না, করিতে পারেও না। টাকার লোভে, বিলাসের তাড়নায় যে অধঃপতন ঘটে, তাহা সামলাইতে হইলে চাবুক হাতে করিয়া দাঁড়াইতে হয়। এমন পুরুষ ত এখন বাঙ্গালায় নাই; থাকিলেও চাবুক চালাইতে গেলেই যে আঘাত পাইবে সেই পীনাল কোডের সহায়তা গ্রহণ করিবে। এখন যে সবাই স্ব-স্ব প্রধান, কেহ কাহারও কথা শুনিতে চাহে না, সবাই নগদে মুগ্ধ সবাই ভোগায়তন দেহের তুষ্টি-পুষ্টির জন্য সদা বিব্রত। রাজশক্তি স্বেচ্ছাচারিতার সহায়তা করিতেছে; সমাজের সমষ্টিশক্তি নাই বলিলেও চলে—সমাজ-বুদ্ধিও দেশের লোকের নাই। ফলে চারিদিকেই বিষম স্বেচ্ছাচার—একাকার, নৈরেকার। অতএব বলিতে হয় যে, ব্যষ্টির পাতিত্য দূর করিবার সুব্যবস্থা করাও এখন সম্ভবপর নহে। সমাজশক্তি এতটুকুও না থাকিলে ব্যষ্টিকে শাসন করিবে কে? কাজেই স্বেচ্ছাচার প্রবল হইয়াছে। ব্রাহ্মণসভাই কর, আর যাহাই কর, কিছুতেই এ স্বেচ্ছাচার প্রশমিত হইবার নহে। কেননা, যাহারা ব্রাহ্মণসভা গড়িতেছে, তাহারাই যে এক হিসাবে না এক হিসাবে বিষম স্বেচ্ছাচারী; শাস্ত্রশাসন মানিয়াত কেহ চলে না। এমন অবস্থায় তুমি অন্যকে শাস্ত্রশাসন মানাইবে কেমন করিয়া?

পরন্তু এই সঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া রাখিব। ইংরেজী শিক্ষার ফলে

দেশাত্মবোধটা আমাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই দেশাত্মবোধ জন্যই আমরা হিন্দু হইতেছি—শাস্ত্রের ও ঋষিমুনির দোহাই দিতেছি। এই দেশাত্ম-বোধটা কেমন ভাবে পরিচালিত করিলে ব্রাহ্মণ রক্ষা হইলেও হইতে পারে, তাহার ইঙ্গিত একটু করিব। সমাজ এতদিন কেবল ভাঙ্গিয়াছে, হয়ত দেবতার কৃপায় এইবার গড়িবার সময় আসিতেছে।

এখন আমরা হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিই কেন? যে হেতু এই দেশের প্রতি এখন আমাদের মমত্ব বোধ হইয়াছে। গোটা দেশটাকে আমার বলিয়া ভাবিতে পারিলে দেশের যাহা কিছু তাহাতে মমত্ব বোধ ফুটিবেই। তাই একবার বলিয়াছিলাম, স্বদেশী হইতে পারিলে স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবেই। তাহাই এখন ধীরে ধীরে ঘটিতেছে। এই দেশাত্মবোধনিষ্পন্ন হিন্দুয়ানী যিনি না বুঝিতে পারিবেন, তিনি এখন আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণসমাজ যদি আত্মরক্ষা করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দেশাত্মবোধের বেদীর উপর বসিয়া শাস্ত্র করিতে হইবে। গুরুদেব শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি ঠাকুরই এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এখনও জীবিত আছেন, যিনি এই দেশাত্মবোধের তত্ত্ব বুঝিয়া ও জানিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে পারেন। তাঁহারই মনীষা-প্রভাবে আজ কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে নব্য হিন্দুয়ানীর প্রচলন এই ইংরেজি বিদ্যা-প্রপীড়িত বাঙ্গালা দেশে সম্ভবপর হইয়াছিল। সেই হিন্দুয়ানীকে যদি এখন পদ্ধতিবদ্ধ করিতে চাও, তাহা হইলে আবার চূড়ামণি মহাশয়ের শরণাগত হইতে হইবে। তাই বলিতে হয় যে, ব্রাহ্মণ সভা করিয়া কেবল "পলিসি বাজীতে" ব্রাহ্মণ রক্ষা হইবে না। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে খাঁটি হইতে হইবে। চরিত্র ও বিদ্যার বলে ব্রাহ্মণকে সমাজশিরোমণি হইতে হইবে। চাতুরীর প্রভাবে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ প্রধান হয় নাই, সংখ্যার আধিক্যেও বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ চূড়ামণি হয় নাই। চাই বিদ্যা, চাই মনীষা, চাই অবস্থাভিজ্ঞতা, চাই তেজস্বিতা, চাই সন্ন্যাস ও সংযম। এখন ইংরেজি লেখা পড়ার প্রভাবে ব্রাহ্মণ শূদ্র সব একাকার হইয়া বাবু সাজিয়াছে। এই বাবুয়ানীর মমতাকে নষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মে কর্ম্মে বিদ্যায় প্রতিভায় বিশিষ্টতা লাভ করিতে হইবে। তাহা যদি না পার, তাহা হইলে চুপ করিয়া

থাক ; যেমন অধঃপাতে যাইতেছ, তেমনই যাও। আর যদি সে বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার পুরুষকার থাকে ত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। ইহাই আমার কথা।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণ।

তুমি এই অধঃপতিত ধরার দেবতা, তাই তুমি ভূদেব। দেবতা আছেন ইহা শুনিয়া থাকি, কিন্তু কখনও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই না। তোমাকেই দেবতা বলিয়া দেখি, তাই তুমি প্রত্যক্ষ দেবতা। দেবতারা স্বর্গ ভাল বাসিয়া থাকেন, তাই তাঁহারা সেখানে অবস্থিতি করেন। তুমি কিন্তু এই মর্ত্ত্যই ভাল বাস, তাই এখানে তোমার অধিষ্ঠান। নিরবচ্ছিন্ন সুখসম্ভার-পূর্ণ স্বর্গই ত দেবতার বাঞ্ছিত, কিন্তু দুঃখস্রোতপ্লাবিত ধরা তোমার অভিলষিত কেন বল দেখি ? তুমি কি ইহাকে স্বর্গ করিতে চাও, তাই এখানে আসিয়াছ ? তুমি ইচ্ছা করিলে স্বর্গ কেন, ইহাকে কৈলাস বা বৈকুণ্ঠে পরিণত করিতে পার, তোমার অসাধ্য কি আছে ? তোমার ইচ্ছায় কত নূতন লোকের সৃষ্টি হইতে পারে ; কত লোকপালেরও আবির্ভাব হইতে পারে। তুমি মনে করিলে দেবতাকে অদেব করিতে পার, আবার অদেবকে দেবতা করিতে পার। তাই কি আমাদিগকে দেবতা করিতে আসিয়াছ ? যদি আমাদের মধ্যে কেহ দেবতা হয়, তাহা ত তোমারই অনুগ্রহে। তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত মানুষ মানুষই থাকিতে পারে না, দেবতা হওয়া ত দূরের কথা। এই যে আমরা দিন দিন পশুর অধম হইয়া পড়িতেছি, তোমার অনুগ্রহ পাই না বলিয়াই ত। কিন্তু তুমি কি আমাদিগকে অনুগ্রহ হইতে

একেবারে বঞ্চিত করিতে পার? কখনই না। আমরা তোমার অনুগ্রহ চাহিতেছি না, তাই পাইতেছি না। নতুবা তুমি যখন আমাদেরই জন্য এ ধরায় আসিয়াছ, তখন কি আমাদিগকে ভাসাইয়া দিতে পার? পাপতাপ-পূর্ণ মর্ত্ত্যভূমিকে তুমি যখন ভালবাসিয়াছ, তখন আমাদিগকে ভুলিবে কিরূপে? তাই বলিতেছি, আমরা কখনও তোমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইতে পারি না।

তুমি ত সেই বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে জন্মিয়াছ, তাই তুমি তাঁহার মুখ-স্বরূপ। কিজন্য তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহাও ত আমরা জানি। ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তোমার জন্ম, তাই তুমি ধর্ম্মের শাশ্বতী মূর্ত্তি বলিয়া কথিত। যে ধর্ম্ম বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা, বিনাশশীল বিশ্বরাজ্যে যে ধর্ম্ম প্রাণস্বরূপ, তাঁহারই রক্ষার জন্য তোমার জন্ম। তুমি যখন এই মানুষ-লোকে অবস্থিতি করিতেছ, তখন মানুষের ধর্ম্মই ত তুমি রক্ষা করিবে। সেই ধর্ম্মই ত মনুষ্যত্ব, সুতরাং তোমারই দ্বারা মনুষ্যত্ব রক্ষিত হইতেছে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেবত্ব অপেক্ষা ন্যূন নহে। তাই বলিতেছি, আমরা যদি প্রকৃত মানুষ হইতে পারি, তবে দেবত্বে আমাদের প্রয়োজন নাই। মনুষ্যত্বের চরম উন্নতি ব্রহ্মত্ব। তাহা কি দেবত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? তুমি ত ধর্ম্ম রক্ষা ও ব্রাহ্ম্য লাভের জন্যই জন্মিয়াছ, এবং তোমার আদর্শ অনুসরণের জন্য প্রকৃত অধিকারীদিগকে আহ্বান করিতেছ। সে যাহা হউক, আমরা দেবতা হইতে চাহি না, আমা-দিগকে প্রকৃত মানুষ করিয়া দেও। ধর্ম্ম বা মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য যখন তোমার জন্ম, তখন আমাদিগকে মানুষ করিবে না কেন? এক জন্মে আমরা প্রকৃত মানুষ হইতে না পারিলে তোমার অনুগ্রহ থাকিলে কোন না কোন জন্মে যে নিশ্চয়ই হইব, সে বিশ্বাস আমাদের আছে। তাই বলিতেছি, আমাদের প্রতি একবার কৃপা কটাক্ষপাত কর। আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যাই।

তুমি ত এই পৃথিবীর অধিপতি, আমরা ত সকলে তোমার সেবক। তোমার সেবার জন্য বিশ্বের দ্রব্যসম্ভার সৃষ্ট হইয়াছে। জগতের সর্ব্বস্ব তোমারই, আবার তুমিই তাহার সর্ব্বস্ব। তাই জগৎসর্ব্বস্ব তোমাকে জগ-তের সর্ব্বস্ব দিয়া সেবার জন্যই ত আমরা আসিয়াছি। আমাদের যাহা কিছু

সে সকলই ত তোমার, সুতরাং গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজার ন্যায়, তোমারই বস্তুতে আমরা তোমারই সেবা করিতেছি। সেবকের প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহাদের জীবন সফল হউক। তোমার সেবায় দেবগণ প্রীত হন, কারণ তাঁহারা তোমারই মুখ হইতে হব্যগ্রহণ করিয়া থাকেন। আবার তোমার সেবায় পিতৃগণও তৃপ্ত হন। কারণ তাঁহারাও তোমার ঐ মুখ হইতে কব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং যাহারা তোমার সেবা না করে তাহারা দেবদ্বেষী ও পিতৃদ্বেষী। তুমি যেমন আমাদের প্রভু, সেইরূপ আবার আমাদের গুরু। কেবল আমাদের গুরু নও, তুমি জগৎগুরু, তোমার নিকট হইতেই পৃথিবীর সকল জাতি আপনাপন চরিত্র শিক্ষা করিয়াছে। তুমিই জগতে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচার করিয়াছ, তুমিই জগতে বৈরাগ্য, তপস্যা আনিয়াছ, তুমিই বিশ্বপ্রাণ ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছ, তুমিই মনুষ্যকে ব্রহ্মত্বে পরিণত করিয়াছ, সেই তোমাকে যে চিনিতে না পারে তাহার মনুষ্যজন্মে ধিক্। মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া যে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ তোমাকে জানিতে না পারিল, তোমার সেবা করিয়া যাহার মনুষ্যজীবন সফল না হইল, সে আবার মানুষ কিসে? স্বয়ং ভগবান্ তোমার পদপ্রক্ষালন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, আর আমরা তোমার সেবা করিয়া জীবনকে কি সফল মনে করিব না? অবশ্যই করিব। আমাদিগকে তোমার পদস্পর্শের অনুমতি প্রদান কর, আমরা তোমার সেবা করিয়া মনুষ্যজীবনের সফলতা লাভ করি।

তোমারই অনুগ্রহে এই বিশ্বসংসার সঞ্জীবিত রহিয়াছে, তুমিই ইহাকে রক্ষার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তোমার কৃত যজ্ঞধূমে মেঘোদয় হয় ও তাহার বর্ষণে পৃথিবী শস্যশালিনী হইয়া উঠেন, তোমার সামগানে ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। তোমার তপঃপ্রভাবে বন্য পশুও শান্তভাবে অবস্থিতি করে, তোমার মন্ত্রোচ্চারণে দেবতা সম্মুখে আসেন। সুতরাং তোমার ক্ষমতার কথা আর কি বলব? ভারতের রাজন্যবর্গের মুকুটমণি তোমার পদরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, তোমারই অনুগ্রহে তাঁহারা দণ্ডধারণে সমর্থ হইয়াছেন, তাই তোমারই সেবার জন্য তাঁহাদের ভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল। তোমার কোপাগ্নিতে কত রাজা দগ্ধ হইয়াছে, কত রাজ্য ভস্মীভূত হইয়াছে। তুমিই অগ্নিকে সর্ব্বভক্ষ্য করিয়াছ, মহোদধিকে অপেয় করি-

য়াছ, চন্দ্রকে ক্ষয়িত করিয়া আবার পূরিত করিয়াছ, সুতরাং তোমার ক্ষমতার কথা কে বলিয়া শেষ করিতে পারে? একদিন ভারতে সকলেই তোমার ক্ষমতার পরিচয় পাইত, সকলেই তোমাকে চিনিত, সকলেই তোমার অনুগ্রহের জন্য ধাবিত হইত। ঐশ্বর্য্যশালী রাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত তোমার সেবায় অবহিত হইত। স্বয়ং ভগবান্ তোমারই মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি তোমার ক্ষমতার পরিচয় দিতেছ না কেন? একবার সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠ, দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠুক। তোমার দৃষ্টিতে জগতের পাপরাশি দগ্ধ হইয়া যাক। তাহার পর আবার তোমার করুণাবর্ষণে ধরায় পুণ্যস্রোত প্রবাহিত হউক। আবার জগতে সে কালের চিত্র আনয়ন কর। তুমি ইচ্ছা করিলে তাহা অচিরেই সম্পন্ন হইবে।

যুগযুগান্তর ধরিয়া তুমি জগতে যে শক্তিপ্রভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারা প্রবাহিত করিয়াছ, আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ, বৈরাগ্য ও তপস্যায় বিশ্বসংসার চমকিত করিয়াছ, বেদবেদান্ত রক্ষা করিয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের বিজয়পতাকা সুদৃঢ় রাখিয়াছ, সে শক্তি অবশ্যই তোমার মধ্যে লুক্কায়িত আছে। শক্তি শাশ্বতী, শক্তির বিনাশ হয় না। ইচ্ছা করিলে তুমি কি আবার সে শক্তি দেখাইতে পার না? অবশ্যই পার। কে বলে, তোমার দীপ্তি মলিন হইয়াছে, অগ্নির দীপ্তি কি কখনও মলিন হয়? তাহা ধূমাবৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু দীপ্তির কখনও মলিনতা ঘটে না। কে বলে, তোমার পবিত্রতা নাই? যিনি চিরপাবন, তাঁহার কি কখনও পবিত্রতা নষ্ট হইতে পারে? অগ্নি শ্মশানে থাকিলেও তিনি কি কখনও অপবিত্র হন? যজ্ঞকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া তিনিই আবার পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। তাই বলিতেছি, তোমার মলিনতা বা অপবিত্রতা নাই। লৌকিক দৃষ্টিতে যদি কিছু দেখায়, একবার সংস্কৃত হইলে তাহা যে চিরোজ্জ্বল ও চিরপাবন হইবে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? সৃষ্টির প্রথম হইতেই তুমি যে শক্তি দেখাইয়াছ, তাহারই ফলে ত তুমি অমর হইয়া আছ? কত জাতির অভ্যুদয় বিলয় ঘটিল, কত বংশের উত্থান পতন হইল, কত ধর্ম্মের প্রচার ও তিরোভাব ঘটিল, কিন্তু তোমার প্রভুত্ব এখনও জগতে

সমভাবে বিরাজ করিতেছে। ঐ শুন, সহৃদয় বৈদেশিক লেখকেরাও তোমার সম্বন্ধে কি বলিতেছেন,—

"One race has swept away India after another, dynasties has risen and fallen, religions have spread themselves over the land and disappeared. But since the dawn of history the Brahman has calmly ruled; swaying the minds and receiving the homage of people, and accepted by foreign nations as the highest type of Indian mankind."

বৈদেশিকেরা তোমাকে ভারতীয় মানবশ্রেষ্ঠ বলিতে পারেন, আমরা কিন্তু তোমাকে সর্ব্বমানবশ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানি। "বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা, নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ"—এ মহাবাক্য আমরা স্মরণ করিয়া থাকি। কেবল তাহা বলিয়া নহে, তুমি যে সর্ব্বভূতের ঈশ্বর,—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্" তাহাও আমরা অবিদিত নহি।

সে যাহা হউক, তোমার শক্তির যে লোপ হয় নাই, এবং তুমি যে জগৎপ্রভুরূপেই বিদ্যমান আছ, তাহা কি অস্বীকার করিতে পারা যায়? তবে তুমি তোমার শক্তির উদ্বোধন করিলে না কেন? যে মূর্ত্তিতে তুমি ভারতে বৈদিক ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, যে মূর্ত্তিতে তুমি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলে, যে মূর্ত্তিতে যজ্ঞধূমে ভারতাকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিলে, যে মূর্ত্তিতে সামগানে দিগন্ত মুখরিত করিয়াছিলে, একবার সেই মূর্ত্তি কি দেখাইতে পার না। যে মূর্ত্তিতে তপঃপ্রভাবে বিশ্বদেবগণ চমকিত হইতেন, যে মূর্ত্তিতে যোগাভ্যাস, ঈশ্বরসমাধি লাভ হইত, যে মূর্ত্তিতে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে ব্রহ্মত্ব সাধিত হইত, সে মূর্ত্তি কি আমাদের চক্ষের সমক্ষে আর আসিবে না? তুমি ইচ্ছা করিলেই আবার সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পার. তোমার শক্তি যায় নাই। তোমার দীপ্তি যায় নাই। তোমার পবিত্রতা যায় নাই, তবে কেন আমরা তোমার সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না? একবার সেই মূর্ত্তি ধারণ কর, জগত কৃতার্থ হউক, আর আমরা তোমার সেবক, তোমার সেই মূর্ত্তির সেবা করিয়া মানব জীবন সফল করি, তোমার পদস্মরণ করিয়া পবিত্র হইয়া যাই। কত দিনে সে মূর্ত্তি দেখিতে

পাইব বলিয়া দেও। ঐ দেখ, তোমার সাধের ভারত দিন দিন অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইতেছে। অধর্ম্মের নিবিড় অন্ধকার তাহাকে ছাইয়া ফেলিতেছে, ধর্ম্ম অভিভূত হইয়া পড়িতেছে, এক্ষণে তুমি ভিন্ন ধর্ম্মরক্ষার উপায় কে করিবে? ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই ত তোমার জন্ম, যদি সেই ধর্ম্ম অধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে রক্ষা পাইবেন? তিনিও তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছেন, সুতরাং তোমাকে সেই ধর্ম্মের শাশ্বতী মূর্ত্তিই ধারণ করিতে হইবে। সে মূর্ত্তি দেখিয়া অধর্ম্ম দূরে পলায়ন করুক, আবার ভারতে পবিত্রতার স্রোত প্রবাহিত হউক, পাপান্ধকার দূরীভূত হউক, পুণ্যালোকে আবার ভারতবর্ষ দীপ্তিমান হইয়া উঠুক; তাহার নবীন জীবন দেখিয়া সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হইয়া যাক।

বেদ।

(৩)

বেদ-বিকাশ।

বেদের উদ্ভব বা প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা দুই প্রকার শ্রুতি (বেদবাক্য) দেখিতে পাই। এক প্রকার বাক্য বেদ ঈশ্বর হইতে জাত হইয়াছে, এই কথা প্রকাশ করে; অপর প্রকার বাক্য হইতে বেদ নিত্য, বেদ বা বেদপ্রতিপাদ্য বস্তু স্বয়ং ঋষিগণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল, এই কথা জানিতে পারা যায়। "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত।" ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত এই পুরুষসূক্ত মন্ত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞস্বরূপ পুরুষ হইতে ঋক্, যজু, সাম, ও ছন্দসকল জাত হইয়াছিল। তরুযজু-

বেদান্তর্গত বৃহদারণ্যকে "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্, ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদো সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ" ইত্যাদি। এই মহদ্ভূত (ব্রহ্ম) হইতে ঋগ্বেদ, সাম বেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ ইত্যাদি নিশ্বাসের ন্যায় বিনা আয়াসে উদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপে বেদবিকাশ বর্ণিত হইয়াছে। "প্রজাপতির্ব্বা ইদমেক আসীৎ স তপোঽতপ্যত, তস্মাত্তেপানাৎ ত্রয়ো দেবা অসৃজ্যন্ত অগ্নির্বায়ুরাদিত্যঃ। তে তপোঽতপ্যন্ত তেভ্যস্তেপানেভ্যো ত্রয়োবেদা অসৃজ্যন্ত, অগ্নেঃ ঋগ্বেদো বায়োর্যজুর্ব্বেদ আদিত্যাৎ সামবেদ ইতি।" * সৃষ্টির আদিতে একমাত্র প্রজাপতি অবস্থিত ছিলেন। তিনি তপস্যা (সংকল্প) করিলেন, তাহা হইতে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য সৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা তপস্যা করিলেন, তাহা হইতে তিন বেদ সৃষ্ট হইল। অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ সৃষ্ট হইল। এই শ্রুতিতেও প্রজাপতি হইতে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যক্রমে বেদোদ্ভব বর্ণিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ও ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ দুইটী শ্রুতিবাক্য আছে, তাহাতে প্রজাপতি হইতে তিনলোক (পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যৌ) ও অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যক্রমে বেদবিকাশ বর্ণিত হইয়াছে, অপরপক্ষে "বাচা বিরূপনিত্যয়া" এই মন্ত্রে (১) বেদকে নিত্য বলা হইয়াছে।

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্॥" ঋগ্ ১০।৩১।৩। যাজ্ঞিকগণ পুণ্য কার্য্যের দ্বারা বেদপ্রাপ্তি-যোগ্যতা লাভ করিয়া ঋষিগণ মধ্যে বিদ্যমান বেদবাক্য লাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয়ারণ্যকে বর্ণিত আছে, "অজান হবৈ পৃশ্নীঁ-স্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষৎ তদৃষয়োঽভবন্ তদৃষীণামৃষিত্বম্॥" (২) কল্পের

* এই শ্রুতিটি কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন তৎকৃত অর্থসংগ্রহের টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(১) "বাচা বিরূপনিত্যয়া" ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে বিরূপেতি দেবতাং সম্বোধ্য নিত্যয়া বাচা স্তুতিং প্রেরয়তি। নিত্যাবাক্ বেদ এব। ইতি ন্যায়াধিকরণমালাব্যাখ্যায়াং মাধবাচার্য্যঃ।

(২) কল্পাদৌ এব ব্রহ্মণা সৃষ্টা মহর্ষয়া দিবৎ কল্পমধ্যে পুনঃ পুনঃ জায়ন্তে তস্মাৎ "অজাঃ" তে চ "পৃশ্নয়ঃ" শুভ্রাঃ স্বরূপেণ নির্ম্মলাঃ সন্তোঽপি পুনস্তপ আচরন্ তদীয়েন তপসা তুষ্টং স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম অনংকারণত্বেন স্বতঃ সিদ্ধং পরব্রহ্ম বস্তু কাঞ্চিৎ মূর্ত্তিং ধৃত্বা তানৃষীননুগ্রহীতুমভ্যানর্ষৎ

আদিতে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট ঋষিগণ স্বরূপতঃ নির্ম্মল হইয়াও পুনরায় তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম (ব্রহ্ম বা বেদ) তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। ঋষিগণ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া (ঋষ্ ধাতুর অর্থ দর্শনহেতু) ঋষি এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন যাস্ক তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থে ঋষি শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ঋষির্দর্শনাৎ স্তোমান্ দদর্শেত্যৌপমন্যব স্তদ্ যদেনান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যা নর্ষত্তদৃষীনা মৃষিত্বমিতি বিজ্ঞায়তে। *—দর্শনহেতু ঋষি। ঔপমন্যব আচার্য্যের মতে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ঋষির ঋষি সংজ্ঞা হইয়াছে। এইরূপ অর্থপ্রকাশক ব্রাহ্মণাংশ জ্ঞাত হইয়া থাকে। তপঃপরায়ণ ঋষিগণের নিকট স্বয়ম্ভু (অকৃতক, নিত্য) ব্রহ্ম (ঋকৃযজুসামাখ্য বেদ) প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ঋষি সংজ্ঞা হইয়াছে। সায়নাচার্য্য এই ব্রাহ্মণাংশান্তর্গত ব্রহ্ম শব্দের অর্থ পরম ব্রহ্ম বস্তু করিয়াছেন। কিন্তু ঔপমন্যবাচার্য্য বলিতেছেন, যে, বেদ-মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ঋষির ঋষিত্ব হইয়াছে। যাস্ক এই অর্থ প্রতি-পাদক বলিয়া ব্রাহ্মণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং যাস্ক ও ঔপমন্যবাচার্য্যের মতে ব্রাহ্মণান্তর্গত ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বেদ। নিরুক্তটীকাকার দুর্গাচার্য্যও ব্রাহ্মণান্তর্গত ব্রহ্ম শব্দেই বেদ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য বেদ-মন্ত্র ব্যাখ্যাস্থানে ঋষিশব্দের অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় "অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টার ঋষয়স্তেষাং বেদদ্রষ্টৃত্বং স্মর্য্যতে" এইরূপ লিখিয়াছেন। ব্রহ্মশব্দের পরম ব্রহ্মবস্তু বা বেদ এইরূপ

আভিমুখ্যেন প্রত্যক্ষমাগচ্ছৎ। তত্তস্মে মুনয়ঃ ঋষী-ধাত্বর্থ বিদয়ত্বাদৃষয়োঽভবন্। ইতি সায়ণভাষ্যং।

* ঋষি র্দর্শনাৎ গচ্ছতনৌ স্মান্ অর্থান্ স্তোমান্ দদর্শেত্যৌপমন্যবঃ মন্ত্রাঃ স্তোমাস্তা-নসৌ তায়কেন জ্ঞানেন গচ্ছতীতি "ঔপমন্যবঃ" আচার্য্যোমন্যতে। ব্রাহ্মণমপি চৈতস্মিন্নর্থে দর্শয়তি তদ্যদেনাং তপস্তমানান্ ব্রহ্ম ইত্যাদি। তৎ এতৎ উচ্যতে যৎ কৃতং ঋষীণাং ঋষিত্বম্। যৎ যস্মাৎ এনান্ তপস্যমানান্ তপ্যমানান্ ব্রহ্ম ঋগ্‌যজুঃসামাখ্যং স্বয়ম্ভু অকৃতকম্ অভ্যাগচ্ছৎ অনধীতমেব তত্ততো দদৃশুঃ তপোবিশেষেণ তদৃষীণাং ঋষিত্বম্ ইত্যেবং ব্রাহ্মণমপি বিচার্য্যমাণং জ্ঞায়তে। ইতি দুর্গাচার্য্যকৃতটীকা।

অর্থ করিলে অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টা অর্থের কোন ব্যাঘাত হয় না। যাহা হউক আমরা উদ্ধৃত ব্রাহ্মণাংশ হইতে ঔপমন্যব ও যাস্কের মতে বেদ স্বয়ম্ভু, অকৃতক, নিত্য এইরূপ অর্থ অবগত হইতেছি। 'যো ব্রাহ্মণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৯। ১৮)—যিনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন, যিনি তাঁহার বুদ্ধিতে বেদের আবির্ভাব করাইয়া দেন। এই শ্রুতিও বেদের অকৃতকত্ব (নিত্যত্ব) প্রকাশ করিতেছে। অন্য কতকগুলি শ্রুতিবাক্য আছে যাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রজাপতি বেদস্থিত বিষয়সকল স্মরণ বা তাহাদের আলোচনা করিয়া সৃষ্টি করিলেন। ইহা হইতে জানা যায়, প্রজাপতির সৃষ্টির পূর্ব্বেও বেদ বিদ্যমান ছিল। * "সভূরিতি ব্যাহরং সভূমিমসৃজত"। তিনি ভূ এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। "সভুব ইতি ব্যাহরৎ স অন্তরিক্ষং অসৃজত।" তিনি ভুব ইতি শব্দ উচ্চারণ করিলেন ও অন্তরীক্ষ সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদি।

বেদবিকাশ সম্বন্ধে আমরা শ্রুতিবাক্য আলোচনা করিলাম। পুরাণাদি স্মৃতি শাস্ত্রেও বেদ অকৃতক, নিত্য, ঋষিগণ কর্তৃক কল্পাবসানে দৃষ্ট, এইরূপ বর্ণিত আছে।

যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্ব মনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥

যুগান্তে ইতিহাস সহিত বেদ অন্তর্হিত হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে মহর্ষিগণ স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা) দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া তপস্যা পূর্ব্বক ইতিহাস সহিত বেদ লাভ করিয়াছিলেন।

* "এতে বৈ প্রজাপতি দেবান্ অসৃজত অসৃগ্রমিতি মনুষ্যান্ ইন্দব ইতি পিতৄন্, তিরঃ পবিত্রমিতি গ্রহান্ আশব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানি ইতি শস্ত্রং অভিসৌভগা ইতি অন্যাঃ প্রজাঃ। এতে অসৃগ্রমিন্দবস্তিরঃপবিত্রমাশবঃ। বিশ্বান্যভিসৌভগা॥ ইত্যেতন্মন্ত্রস্থৈঃ পদৈঃ স্মৃত্বা ব্রহ্মা দেবাদীন্ অসৃজত ইত্যর্থঃ। "স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ" স প্রজাপতি মনসা বাচং মনোবাক্‌রূপং মিথুনং সংভাবিতবান্। মনসা ত্রয়ীপ্রকাশিতসৃষ্টি মালোচিতবান্ ইত্যর্থঃ। ইতি মনুপ্রভা।

স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্ বেদো গীত স্বয়া পুরা।
শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকাঃ।"

স্বয়ম্ভু ভগবান্ বেদ সৃষ্টির আদিতে আপনার কর্তৃক গীত হইয়াছিল। শিব হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষি পর্য্যন্ত সকলেই বেদের স্মরণকারী, কেহই বেদকর্ত্তা নহেন।

অস্য বেদস্য সর্ব্বজ্ঞঃ কল্পাদৌ পরমেশ্বরঃ।
ব্যঞ্জকঃ কেবলং বিপ্রা নৈব কর্ত্তা ন সংশয়ঃ॥
ব্রহ্মাণং মুনয়ঃ পূর্ব্বং সৃষ্টা তস্মৈ মহেশ্বরঃ।
দত্তবানখিলান্ বেদান্ বিপ্রা আত্মনি সংস্থিতান্॥
ব্রহ্মণাচোদিতো বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী দ্বিজোত্তমাঃ।
হিতায় সর্ব্বভূতানাং বেদভেদান্ করোতি সঃ॥

ইতি মৎস্যপুরাণং।

বিপ্রগণ! কল্পের আদিতে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর বেদ প্রকাশ করেন। তিনি ইহার কর্ত্তা নহেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। মুনিগণ! মহেশ্বর সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া নিজ আত্মায় অবস্থিত সমস্ত বেদ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা দ্বারা আদিষ্ট হইয়া ব্যাসরূপী বিষ্ণু সর্ব্বভূতের হিতের জন্য বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন।

"ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তাচ বেদস্মর্ত্তা পিতামহঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥

পরাশরঃ।

বেদের কর্ত্তা কেহ নাই, পিতামহ ব্রহ্মা বেদ স্মরণ করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, এইরূপ প্রতিকল্পান্তরে মনু ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া থাকেন।

অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা * স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বপ্রবৃত্তয়ঃ॥

সৃষ্টির আদিতে আদি ও অন্তরহিত দিব্য বেদবাক্য স্বয়ম্ভু কর্তৃক উৎসৃষ্ট হইয়াছিলেন, যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে।

* উৎসর্গোঽপ্যয়ং বাচঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনাত্মকো দ্রষ্টব্যঃ।

ইতি শাঙ্করভাষ্যম্।

নামরূপঞ্চ ভূতানাম্ কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে পরমেশ্বরঃ।

মনুঃ।

পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে প্রাণিগণের নাম, রূপ ও কর্ম্মের প্রবর্ত্তন বেদ শব্দ হইতে নির্ম্মাণ (বিধান) করিয়াছেন।

যাস্ক ঋষিশব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বেদদর্শনহেতু ঋষির ঋষিত্ব হইয়াছে বলিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তিনি বেদাদির বিভাগ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণো ঋষয়ো বভূবু স্তেঽবরেভ্যো ঽসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ।" সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিগণ বর্ত্তমান ছিলেন, অর্থাৎ প্রথমে ঋষিগণ ধর্ম্ম (ধর্ম্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদ) স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী ঋষিগণ বেদাদি মন্ত্র স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন না। পূর্ব্ববর্ত্তী সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিগণ পরবর্ত্তী ঋষিগণকে উপদেশদ্বারা বেদমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। নিরুক্তটীকাকার দুর্গাচার্য্য বলেন, এই পরবর্ত্তী ঋষিগণ শ্রুতর্ষি নামে খ্যাত হন। বেদমন্ত্র শ্রবণান্তর ইঁহারা ঋষিত্ব (অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টৃত্ব) লাভ করিয়াছিলেন।*

মীমাংসা দর্শন মতে বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য। মীমাংসাচার্য্যগণ বলেন, গোত্বাদি জাতি ও তৎপ্রকাশক স্ফোটরূপ শব্দ নিত্য। উহাদের সম্বন্ধও নিত্য, অতএব বেদ শব্দ ও তৎপ্রকাশক অর্থ ও নিত্য, সুতরাং বেদও নিত্য। বেদকর্ত্তা পুরুষের অনুপলম্ভহেতু বেদ অপৌরুষেয়। এই সম্বন্ধে মীমাংসা দর্শনের বিচারপ্রণালীর প্রদর্শন জন্য নিম্নে মাধবাচার্য্যের অধিকরণমালার শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। সায়ণাচার্য্যের যজুর্ব্বেদভাষ্যে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

"পৌরুষেয়ং নবা বেদবাক্যং স্যাৎ পৌরুষেয়তা,
কাঠকাদেঃ সমাখ্যানং বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবৎ।
সমাখ্যানম্ প্রবচনাৎ বাক্যত্বন্তু পরাহতম্,
তৎকর্ত্র্যনুপলম্ভেন স্যাৎ ততোঽপৌরুষেয়তা॥"

বাল্মীকের বৈয়াসিকী এইরূপ সমাখ্যান হেতু যেরূপ বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতি

* তেষাং হি শ্রুত্বা ততঃ পশ্চাদৃষিত্বম্ উপজায়তে। ন যথা পূর্ব্বেষাং সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণাং শ্রবণমন্তরেণ। ইতি দুর্গাচার্য্যকৃতটীকা।

পুরুষগণ রামায়ণমহাভারতাদি রচনা করিয়াছেন, এইরূপ প্রতীতি হয়,সেইরূপ কৌথুম তৈত্তিরীয় ইত্যাদি সমাখ্যান হেতু বেদও পুরুষরচিত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা ব্যতীত বেদবাক্যও বাক্য, কালিদাসাদির বাক্যও বাক্য। বাক্য পক্ষে উভয়েই সমান, অতএব কালিদাস বাক্য যখন পৌরুষেয়, তখন বেদবাক্যও পৌরুষেয়,এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই দুই আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে, সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকের নামানুসারে বেদের শাখার নাম কৌথুম, তৈত্তিরীয়াদি হইয়াছে; উক্ত শাখারচয়িতার নামানুসারে বেদশাখার নাম হয় নাই। বাক্য বলিয়া বেদবাক্য কালিদাসাদির বাক্যের ন্যায় পৌরুষেয় এ অনুমানও দোষযুক্ত। ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি তাঁহাদের গ্রন্থ নির্ম্মাণ সময় অন্য কর্তৃক উপলব্ধ (জ্ঞাত) হইয়াছিলেন। সেইরূপ বেদকর্ত্তা পুরুষ বেদরচনাকালে অন্য কর্তৃক উপলব্ধ হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। গুরুশিষ্যপরম্পরায় রামায়ণাদি বাল্মীকি প্রভৃতি কর্তৃক রচিত বলিয়া পঠিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সেইরূপ গুরুশিষ্যসম্প্রদায়ক্রমে বেদ কোন পুরুষরচিত বলিয়া পঠিত হয় না। অতএব বেদকর্ত্তা পুরুষের অনুপলব্ধি হেতু বেদ অপৌরুষেয়।

বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বমীমাংসার মত আলোচিত হইল। ব্যাসরচিত উত্তরমীমাংসার "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রের শঙ্করাচার্য্য উভয় প্রকার অর্থ করিয়াছেন। এক অর্থে পরমেশ্বর হইতে নিশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে সর্ব্বজ্ঞানের আধারস্বরূপ বেদ নির্গত হইয়াছে, সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। অপর অর্থে বেদ হইতে তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। প্রথম অর্থ অনুসারে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতে অনায়াসে বেদ উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং বেদ পৌরুষেয়। উত্তরমীমাংসায় "অতএবচ নিত্যত্বম্" ১।৩।২৯ এই সূত্রে বেদকে নিত্য বলা হইয়াছে; সুতরাং উভয় সূত্রে বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে, এই বিরোধের কথা উল্লেখ করিয়া সায়ণাচার্য্য তাঁহার যজুর্ব্বেদভাষ্যে বলিয়াছেন, "তর্হি পরস্পরবিরোধ ইতি চেৎ। ন। নিত্যত্বস্য ব্যবহারিকত্বাৎ। সৃষ্টে রূর্দ্ধং সংহারাৎ পূর্ব্বং ব্যবহারকাল স্তস্মিন্নুৎপত্তিবিনাশদর্শনাৎ। কালাকাশাদয়ো যথা নিত্যাঃ এবং বেদোঽপি ব্যবহারকালে কালিদাসাদিবাক্যবৎ পুরুষবিরচিতত্বাভাবাৎ নিত্যঃ। আদি-

সৃষ্টৌতু কালাকাশাদিব দেবব্রহ্মণঃ সকাশাৎ উৎপত্তিরাম্নায়তে অতঃ বিষয়-ভেদাৎ ন বিরোধঃ। ব্রহ্মণঃ নির্দ্দোষত্বেন বেদস্য বক্তৃদোষাভাবাৎ স্বতঃ সিদ্ধং প্রামাণ্যম্।" তাহা হইলে পরস্পরবিরোধী হইল এই কথা যদি বল তাহার উত্তরে আমি বলি বিরোধ নাই। কারণ এই যে, বেদের নিত্যত্ব বলা হইয়াছে, ইহা ব্যবহারিক নিত্যতা। সৃষ্টির পর ও প্রলয়ের পূর্ব্ব ব্যাবহারিক কাল, সেই সময়ে উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যায় না বলিয়া কাল ও আকাশাদি যেরূপ নিত্যরূপে কথিত হয়, এইরূপ ব্যবহারিক কালে কালিদাসাদির বাক্যের ন্যায় পুরুষবিরচিত নয় বলিয়া বেদও নিত্য। আদি সৃষ্টিতে কাল ও আকাশাদির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে বেদের উদ্ভব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। অতএব বিষয়ভেদ হেতু উৎপত্তি ও নিত্যকথন জন্য কোন বিরোধ হয় নাই। ব্রহ্ম নির্দ্দোষ বলিয়া বক্তার দোষশূন্যত্বহেতু বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। মাধবাচার্য্য ব্যাসাধিকরণমালার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "অপ্রযত্নোৎপত্তৌ চার্থং বুদ্ধ্বা বিরচিতৈঃ কালিদাসাদিবাক্যৈঃ বৈলক্ষণ্যাৎ অপৌরুষেয়ত্বং প্রতিসর্গং পূর্ব্বসাম্যেনোৎপত্তৌ প্রবাহরূপেণ নিত্যতা।" পরমেশ্বর হইতে নিশ্বাসের ন্যায় প্রযত্নব্যতীত উৎপত্তি হেতু অর্থ বোধ করিয়া বিরচিত কালিদাসাদির বাক্যের সহিত বৈলক্ষণ্য থাকায় বেদবাক্যের অপৌরুষেয়ত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। প্রতিসৃষ্টিতে পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপ ভাবে উৎপন্ন হওয়ায় প্রবাহরূপে বেদের নিত্যতা স্বীকৃত হয়। "অতএব ভট্টপাদাঃ সত্যপি পুরুষসম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্যং নিবারয়ামাসুঃ।—যত্নতঃ, প্রতিষেধ্যা নঃ পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা। তস্মাৎ "স্বতন্ত্রকর্ত্তা" (পাণিনিসূত্রং ১।৪।৫৪ ইত্যনেন লক্ষণেন লক্ষিতঃ কর্ত্তা ন কোপি বেদস্যাস্তি।" ইতি পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্যঃ। অতএব কুমারিল ভট্ট বেদের পুরুষ সম্বন্ধ থাকিলেও, পরমেশ্বরাদি হইতে বেদের উদ্ভব বর্ণিত থাকিলেও স্বাতন্ত্র্য নিষেধ করিয়াছেন। আমাদের কর্ত্তৃক বেদরচয়িতা পুরুষগণের স্বতন্ত্রতা যত্নপূর্ব্বক নিবারণীয়। অতএব যিনি স্বতন্ত্র তিনি কর্ত্তা এই পাণিনির লক্ষণানুসারে বেদের কোন কর্ত্তা নাই। শঙ্করাচার্য্য—"অতএবচ নিত্যত্বং" এই সূত্রের ভাষ্যে মীমাংসা দর্শন মতে বেদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "স্বতন্ত্রস্য কর্ত্তুরস্মরণাদিভিঃ স্থিতে বেদস্য নিত্যত্বে" স্বতন্ত্র কর্ত্তার অস্মরণাদি হেতু দ্বারা বেদের নিত্যত্ব স্থিত

হইলে" বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ভামতী টীকায় বলিয়াছেন, "এতদুক্তং ভবতি স্বয়ম্ভুবো বেদকর্তৃত্বেঽপি ন কালিদাসাদিবৎ স্বতন্ত্রত্বং অপিতু পুনস্থষ্ট্যনুসারেণ"। এই কথা বলা হইতেছে যে, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বেদকর্তা হইলেও তাঁহার কালিদাসাদির ন্যায় স্বতন্ত্রতা নাই কিন্তু তিনি পূর্ব্ব সৃষ্টি অনুসারে বেদ বিকাশ করিয়াছেন সুতরাং বেদ নিত্য। ঋষিগণ কিরূপে সৃষ্টির আদিতে বেদাদির স্মরণ করিতে সমর্থ হন এই বিষয়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "অতীতকল্পানুষ্ঠিত প্রকৃষ্টজ্ঞানকর্ম্মণাং ঈশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং বর্তমানকল্পাদৌ প্রাদুর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানাং সুপ্তপ্রতিবুদ্ধবৎ কল্পান্তর ব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তিঃ।" ষড়ৈশ্বর্য্যশালী-হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যাঁহারা অতীতকল্পে প্রকৃষ্ট কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কল্পের আদিতে সৃষ্টিকালে পরমেশ্বরের অনুগ্রহবলে নিদ্রিত হইয়া প্রবুদ্ধের ন্যায় তাঁহাদের অতীতকালের ব্যবহারাদির স্মরণ যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। পাণিনীর ভাষ্যকার পতঞ্জলির মতেও বেদ নিত্য। তিনি "তেন প্রোক্তং" এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন "নন্বুচ উক্তং নহি ছন্দাংসি ক্রিয়ন্তে নিত্যানি ছন্দাংসি ইতি যদ্যপি অর্থো নিত্যঃ যাঽসৌ বর্ণানুপূর্ব্বী সা অনিত্যা তদ্ভেদাচ্চ এতৎভবতি কাঠকং কালাপকং মৌদকং পৈপ্পলাদকং ইত্যাদি" বলিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বেদ কৃত নহে, বেদ নিত্য। এই কথার উত্তরে বলা হইতেছে, যদ্যপি অর্থ অর্থাৎ বেদ কথিত বিষয় নিত্য কিন্তু এই যে বর্ণানুপূর্ব্বী অর্থাৎ বর্ণক্রমের সমাবেশহেতু রচনা তাহা নিত্য নহে। তাহার ভেদ অনুসারে কাঠক, কালাপক, মৌদক, পৈপ্পলাদক ইত্যাদি বেদশাখার নাম হইয়াছে। এই অংশের টীকায় কৈয়ট বলিয়াছেন "মহাপ্রলয়াদিষু বর্ণনাপূর্ব্বী বিনাশে পুনরুৎপন্ন ঋষয়ঃ সংস্কারাতিশয়াৎ বেদার্থং স্মৃত্বা শব্দরচনাং বিদধতি। ততশ্চ কঠাদয়ো বর্ণানুপূর্ব্ব্যাঃ কর্তারঃ এব নতু স্থিতায়ো এব সুশর্ম্মাদিবৎ বক্তারঃ"—মহাপ্রলয়াদিতে বর্ণক্রম সমাবেশরূপ রচনার বিনাশ হইলে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইয়া ঋষিগণ তাঁহাদের সংস্কারাতিশয়হেতু বেদার্থ স্মরণ করিয়া শব্দরচনা করিয়া থাকেন। সুতরাং কঠাদি ঋষিগণ বেদশব্দরচনার কর্তা সুশর্ম্মা প্রভৃতির ন্যায় কেবল স্থিত বেদ বাক্যের বক্তা নহেন। নাগজিভট্ট কৈয়টের টীকায় এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,"শ্রুতি মন্বন্তরং চৈষা শ্রুতিরন্যা বিধীয়তে" শ্রুতি মন্বন্তরে শ্রুতি

অন্যরূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ বেদের শব্দ রচনা বিভিন্ন হইয়া থাকে। বেদের প্রামাণ্যাদি সম্বন্ধে অন্য দার্শনিকগণের মত উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া পড়ে বলিয়া তাহা হইতে বিরত হইলাম। শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি হইতে প্রতিপাদিত হইল, বেদবাক্য নিত্য ও অপৌরুষেয়। সমস্ত আর্য্যগণ চিরদিন এই মত গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীসাতকড়ি অধিকারী।

কবিকথা।

(কালিদাস)

বিক্রমোর্ব্বশী

(৩)

স্বর্গে আজ মহানন্দ, সরস্বতীকৃত লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নামক নাটকের অভিনয়ের জন্য ভরত মুনি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দেবরাজ লোকপালগণের সঙ্গে অভিনয়দর্শনে সমুৎসুক। কাজেই মুনিপ্রবরকে তাহার জন্য বিশেষরূপই আয়োজন করিতে হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে তিনি অপ্সরা দিগকে তাহার শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। উর্ব্বশী লক্ষ্মীর ও মেনকা বারুণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। দেবসভার মনোরঞ্জনের জন্য মুনিবরের আদেশে অভিনয় আরম্ভ হইল। উর্ব্বশী তন্ময় হইয়া অভিনয় করিতে লাগিলেন। দেবতারা অভিনয় দর্শনে যারপরনাই প্রীত হইতেছিলেন। কিন্তু উর্ব্বশীর হৃদয়ে যে পুরুরবার ছবি জাগিতেছিল তিনি তাহা একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। বারুণী যখন লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সমাগত ত্রৈলোক্যের পুরুষগণ ও সকেশব লোকপালদিগের মধ্যে কাহাকে তুমি

চিত্ত সমর্পণ করিতেছ? লক্ষ্মী তখন পুরুষোত্তমকে বলিতে পুরুরবাকে বলিয়া উঠিলেন। অভিনয়ের চারুতা ভঙ্গ হইল দেখিয়া ভরতমুনি উর্ব্বশীকে শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন যে, স্বর্গে তোমার স্থান হইবে না। উর্ব্বশী তখন লজ্জায় ম্রিয়মানা হইয়া গেলেন। দেবরাজ তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, রাজর্ষি পুরুরবা যুদ্ধে আমায় যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কিছু উপকার করা কর্ত্তব্য। তুমি যখন তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী, তখন তোমাদের সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত রাজর্ষির নিকটে অবস্থান করিতে পার। ইন্দ্রের কথাগুলি শুনিয়া উর্ব্বশী শাপে বর হইল মনে করিতে লাগিলেন। পরে তিনি চিত্রলেখার সহিত প্রতিষ্ঠানপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজার অনুনয়, বিনয় ও প্রণিপাত অগ্রাহ্য করিয়া দেবী ঔশীনরী কিছু অনুতপ্তা হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে প্রিয়প্রসাদন নামে একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া রাজাকে প্রসন্ন করিবার জন্য যত্নবতী হইলেন। রাণী ব্রত আরম্ভ করিয়া কঞ্চুকীকে দিয়া রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, মহারাজের সন্ধ্যা উপাসনাদি শেষ হইলে তিনি তাঁহার সহিত মণিপ্রাসাদের ছাদে বসিয়া চন্দ্ররোহিণীর সংযোগ দর্শন করিবেন। কঞ্চুকী রাজাকে সেকথা বলিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন, এবং নিজ অবস্থার চিন্তা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন যে, সকলেই যুবা বয়সে অর্থের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে, এবং পরিশেষে পুত্রের প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া বিশ্রাম লাভে প্রবৃত্ত হয়। আমাদের কিন্তু এই সেবা দিন দিন বিশ্রামাবস্থানকে নষ্ট করিয়া কারাতুল্য হইয়া উঠিতেছে। অন্তঃপুররক্ষা যে কষ্টকর তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সময়ে সন্ধ্যা সমাগত হইল। কঞ্চুকী দেখিতে লাগিলেন যে, নিদ্রালস ময়ূরেরা বাসযষ্টিতে খোদিতের ন্যায় বসিয়া আছে। গবাক্ষনিঃসৃত ধূপধূমরাশি শিরোহর্ম্যাস্থিত পারাবত বলিয়া সন্দেহ জন্মাইতেছে। আবার পূত অন্তঃপুরবাসিনীরা পূজাপুষ্প শোভিত স্থানসকলে সন্ধ্যামঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়া স্থাপন করিতেছে। সেই সময়ে রাজা দীপহস্তা পরিচারিকাগণে বেষ্টিত হইয়া কর্ণিকারশোভিত গতিমান গিরির ন্যায় বয়স্যের সহিত সেই দিকে আসিতেছিলেন। রাজা

মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন যে, কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিয়া অতি কষ্টে দিনটি কাটিয়া গেল, এক্ষণে উৎকণ্ঠায় দীর্ঘতর রাত্রি কেমন করিয়া কাটাইব। রাজাকে সমাগত দেখিয়া কঞ্চুকী তাঁহাকে মহিষীর অভিপ্রায় জানাইলেন; রাজাও তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন দুই বয়স্যের মধ্যে রাণীর ভাব পরিবর্ত্তনের বিষয় আলোচিত হইতে লাগিল। মানবক বলিলেন যে, মহিষী এক্ষণে অনুতপ্তা হইয়া ব্রতচ্ছলে তোমাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করিতেছেন। রাজাও তাহাই যথার্থ বলিয়া উত্তর করিলেন যে, মনস্বিনী ললনাগণ স্বামীর অনুনয়বিনয় অগ্রাহ্য ও প্রণিপাত অবজ্ঞা করিয়া শেষে অনুতপ্তাই হন, এবং গোপনে লজ্জিত হইতে থাকেন। তাহার পর তাঁহারা গঙ্গাতরঙ্গশীতল স্ফটিকসোপানাবলি অতিক্রম করিয়া মণি-প্রাসাদের ছাদে আরোহণ করিলেন। সেই সময়ে চন্দ্রোদয় হইতেছিল। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, চন্দ্রকরে তমোরাশি দূরে অপসারিত হইয়া গেল। এবং বোধ হইল যেন, ইন্দ্রদেব প্রাচীদিগ্বধূর মুখমণ্ডল হইতে অলকগুচ্ছ সরাইয়া লইলেন। পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিলেন যে, চন্দ্র যেন খাঁড়ের নাড়ুটির মত উদিত হইলেন। রাজা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন যে, পেটুকেরা সর্ব্বত্রই আপনাদের আহার্য্য দেখিতে পায়। তাহার পর তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া চন্দ্রদেবকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি সাধুদিগের ক্রিয়ার জন্য রবিদেহে প্রবেশ কর। সুধাদ্বারা দেবতা ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করিয়া থাক। তোমার কর্ত্তৃক নৈশ অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়, এবং মহাদেবের শিরে তুমি অবস্থান কর। তাই তোমাকে প্রণাম করিতেছি।" তাহার পর রাজা পরিচারিকাগণকে বিদায় দিয়া বিদূষকের অনুরোধে তথায় উপবেশন করিলেন এবং মহিষীর আগমনের পূর্ব্বে মানবকের সঙ্গে উর্ব্বশীর কথা আলাপ করিতে লাগিলেন। মানবক তাঁহাকে আশা-বন্ধনে প্রাণটিকে বাঁধিতে বলিলে, রাজা বলিলেন, "তাহাতে উদ্বেগের নিবৃত্তি হয় কৈ? শিলায় প্রতিহত নদীবেগ যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ আমার অনুরাগ মিলনসুখে বাধা পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে।" বিদূষক 'শীঘ্রই তাঁহাদের মিলন ঘটিবে' বলিয়া আশা দিলে রাজা একটু আশ্বস্ত

হইলেন, এবং সহসা তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হওয়ায় তিনি উর্ব্বশীর সহিত মিলনের আশা করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে উর্ব্বশী মুক্তাভরণভূষিতা ও নীলাংশুক পরিহিতা হইয়া চিত্রলেখার সহিত সেইদিকে আসিতেছিলেন। উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে তাঁহার বেশটি কেমন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন যে, তোমার বেশের কথা আর কি বলিব? আমি কোন কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। যদি আমি পুরুরবা হইতাম, তাহা হইলে না জানি কি হইত। তাহার পর তাঁহারা যামিনীযমুনায় প্রতিবিম্বিত কৈলাসশিখরের ন্যায় রাজভবনে উপনীত হইলেন। এবং প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিয়া রাজা ও বিদূষকের আলাপন শুনিতে লাগিলেন। রাজা বলিতেছিলেন যে, রাত্রি সমাগত হওয়ায় উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মানবক অমৃতময় চাঁদের কিরণে তাহার নিবৃত্তি হইবে জানাইলে, রাজা উত্তর করিলেন, "নবকুসুমশয়ন, চন্দ্রকিরণ, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনলেপন অথবা মণিহার কিছুতেই এ সন্তাপ দূর হইবার নহে। একমাত্র সেই দিব্যাঙ্গনা অথবা গোপনে তাঁহারই কথালাপন প্রাণে শক্তিধারা চালিয়া দিতে পারে।" বিদূষক বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ, আমিও যখন শিখরিণী বা রসাল না পাই, তখন তাহাদের বিষয় চিন্তা করিয়া সুখ লাভ করিয়া থাকি।" রাজা বলিলেন যে, তোমার ভাগ্যে ত তাহা ঘটিয়া থাকে। মানবকও উত্তর দিলেন যে, তোমার ভাগ্যেও শীঘ্রই তাহা ঘটিবে। রাজা বলিতে লাগিলেন যে, আমার মনে হইতেছে, আমার যে অঙ্গটি রথ চালনার জন্য তাঁহার অঙ্গকর্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিল, সেই ধন্য শরীরের অন্য অঙ্গগুলি ধরণীর ভারস্বরূপ। তাঁহাদের এইরূপ আলাপন শুনিয়া চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া অগ্রসর হইতে বলিলেন। উর্ব্বশী অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মায়াবরণ উন্মোচিত না হওয়ায়, রাজা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। সেই সময়ে পরিচারিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, মহিষী আগমন করিতেছেন। রাজা ও বিদূষক পরস্পরে পরস্পরকে সাবধান হইতে বলিলেন। উর্ব্বশী শঙ্কিত হইয়া চিত্রলেখাকে 'এক্ষণে কি কর্ত্তব্য' জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে শান্ত ভাবেই থাকিতে উপদেশ দিলেন; কারণ তাঁহারা প্রচ্ছন্ন ভাবেই

অবস্থিতি করিতেছিলেন। চিত্রলেখা আরও বুঝাইয়া বলিলেন যে, ব্রতবেশ-ধারিণী মহিষী অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিবেন না. সুতরাং উদ্বেগের কোনই কারণ নাই।

চন্দ্ররোহিণীর সংযোগ দেখিতে দেখিতে মহিষী উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিদূষক বলিতে লাগিলেন যে, মহিষী কি সত্য সত্যই স্বস্তিবাচন দিতে আসিতেছেন, না তোমার প্রতি রোষ পরিহার করিয়া চন্দ্রব্রতচ্ছলে তোমায় প্রসন্ন করার অভিলাষিণী হইয়াছেন? সে যাহা হউক, আজ যেন দেবীকে সুদর্শনা বোধ হইতেছে। রাজা উত্তর দিলেন যে, উভয়ই বটে; তবে তোমার শেষ কথাটিই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। শুভ্রবাসপরিহিতা, মাঙ্গল্যমাত্রভূষণা, পূতদূর্ব্বালাঞ্ছিতালকা, ব্রতচ্ছলে অভিমানহীনা মহিষীকে এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্না বলিয়াই বোধ হইতেছে। মহিষী আসিয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিলে তিনিও তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া উপবেশন করাইলেন। বিদূষকও মহিষীর মঙ্গল কামনা করিলেন। মহিষী রাজাকে সম্মুখে করিয়া ব্রতানুষ্ঠানের কথা বলিলে রাজা ব্রতটির নাম জানিতে চাহিলেন। মহিষীর ইঙ্গিতে সহচরী নিপুণিকা ব্রতের নাম প্রিয়প্রসাদন বলিয়া উত্তর দিল. শুনিয়া রাজা মহিষীকে বলিলেন যে, তুমি এই ব্রত আচরণ করিয়া কেন আপনার মৃণাল-কোমল শরীরটিকে কষ্ট প্রদান করিতেছ? যে তোমার প্রসাদাকাঙ্ক্ষার জন্য সমুৎসুক, সে দাসকে কি প্রসন্ন করার চেষ্টা করিতে হয়? মহিষী উত্তর করিলেন যে, তোমার একথাগুলি দেখিতেছি আমার ব্রতের প্রভাবেই উচ্চারিত হইতেছে। তাহার পর তিনি গন্ধপুষ্প দিয়া মণিভবনে পতিত চন্দ্রকিরণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন; পরে মিষ্টান্ন উপহারগুলি মানবক ঠাকুরকে দেওয়ার জন্য সহচরীদিগকে আদেশ দিলেন। মিষ্টান্ন হস্তে লইয়া মানবক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং 'রাণীর এ ব্রতে বহু ফল লাভ হইবে' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর মহিষী রাজাকে অর্চ্চনা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আমি এই যুগল দেবতা রোহিণী-চন্দ্রদেবকে সাক্ষী করিয়া আর্য্যপুত্রকে প্রসন্ন করিতেছি। অদ্য হইতে আর্য্য-পুত্র যে রমণীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন, এবং যে রমণী তাঁহার

প্রতি অনুরাগিণী হইবেন, আমি তাঁহার সহিত প্রীতিবন্ধনে অবস্থান করিব।" মহিষীর কথা শুনিয়া বিদূষক চুপে চুপে বলিতে লাগিলেন যে, বধ্য পলাইয়া গেলে ছিন্নহস্ত ব্যক্তি বলে, যাউক, আমার ধর্ম্ম হইবে। তাহার পর তিনি মহিষীকে বলিলেন যে, মহারাজা কি সত্য সত্যই উদাসীন? মহিষী উত্তর করিলেন, "মূর্খ, আমি নিজেই সুখ বিসর্জ্জন দিয়া আর্য্যপুত্রকে সুখী করিতে চাই। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, ইহা ভাল কি না।" রাজা এতক্ষণ নীরব ছিলেন; তিনি মহিষীর ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সে যাহা হউক, মহিষীকে সন্তুষ্ট করা উচিত মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি অন্যকেই দান কর বা আমাকে তোমার দাস করিয়া রাখ, এ সমস্তই তুমি করিতে পার; কিন্তু তুমি আমাকে যাহা মনে করিতেছ, আমি তাহা নহি।" মহিষী উত্তর দিলেন যে, তুমি তাহা হও বা না হও, আমি ত আমার প্রিয়প্রসাদনব্রত সম্পন্ন করিলাম। এই বলিয়া মহিষী যাইতে উদ্যত হইলে রাজা বলিলেন যে, তুমি চলিয়া গেলে, তবে আমাকে কিরূপে প্রসন্ন করা হইল? মহিষী শুনিয়া বলিলেন যে, আমি পূর্ব্বে কখনও ব্রত লঙ্ঘন করি নাই। এখনও আমি নিয়ম প্রতিপালন করিতেছি। তাহার পর তিনি সহচরীগণ সহ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা মহিষীর ব্যাপার দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইতেছিলেন; বিশেষতঃ মহিষী যে তেজস্বিতায় শচী অপেক্ষা ন্যূন নহেন, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মহিষীর ব্রত সম্পাদনের পর চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে বলিলেন যে, মহানুভবা পতিব্রতা যখন অনুমতি দিতেছেন, তখন তোমার আর মিলনে বাধা ঘটিবে না। মহিষী চলিয়া গেলে উর্ব্বশীর হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল। চিত্রলেখা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজাও বিদূষকের সহিত আলাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা মানবককে বলিলেন যে, মহিষী বোধ হয় অধিক দূর যান নাই। শুনিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিলেন যে, যাহা বলিতে ইচ্ছা কর এইবার খুলিয়া বল। বৈদ্য যেমন রোগীকে অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করে, মহিষীও সেইরূপ তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তখন রাজা বলিলেন, "তবে এই সময়ে আমি ইচ্ছা করি, উর্ব্বশীর মধুর নূপুরশব্দ যেন প্রথমে আমার কর্ণে নিপতিত হয়। তাহার

পর তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া করপদ্ম দ্বারা আমার চক্ষু দুইটি আবৃত করেন। এই হর্ম্ম্যতলে অবতীর্ণ হইয়া যদি ভয়বশতঃ তাঁহার গতি মন্দীভূত হয়, তাহা হইলে তাঁহার চতুরা সখী তাঁহাকে প্রতিপদে যেন বলপূর্ব্বক আমার নিকট লইয়া আসেন।" রাজার কথা শুনিয়া চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে রাজার অভিলাষ পূরণের কথা বলিলে, তিনি রাজার পশ্চাতে আসিয়া চক্ষু দুইটি আবৃত করিলেন; চিত্রলেখা মানবককে তাহা জানাইয়া দিলেন। উর্ব্বশীর করস্পর্শ বুঝিতে পারিয়া রাজা বিদূষককে তাহা জ্ঞাত করাইলে, বিদূষক 'কিরূপে জানিতে পারিলে' বলিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা উত্তর দিলেন যে, আমার তাপিত শরীর আর কার করস্পর্শে পুলকিত হইতে পারে? কুমুদ কি কখনও রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে? চন্দ্রকর স্পর্শেইত তাহা ঘটিয়া থাকে। তাহার পর উর্ব্বশী হস্ত অপসরণ করিয়া রাজাকে সম্ভাষণ করিলে চিত্রলেখাও তাহাই করিলেন। রাজাও প্রতি সম্ভাষণ করিতে বিস্মৃত হন নাই। তাহার পর উর্ব্বশী বলিলেন যে, মহিষী আমায় মহারাজকে দান করায়, আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছি। নতুবা আমি স্বাধীনা হইয়া আসি নাই। রাজা উত্তর দিলেন, "যদি তুমি আমাকে মহিষীর দত্ত বলিয়া স্পর্শ করিতেছ, তবে তুমি কাহার আদেশে অগ্রে আমার মন হরণ করিয়াছিলে?" উর্ব্বশী ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তাহার পর চিত্রলেখা বিদায় লইলেন। এবং উর্ব্বশী যাহাতে স্বর্গের জন্য উৎকণ্ঠিতা না হন, সে বিষয়ে লক্ষ্য করার জন্যও রাজাকে বলিলেন। বিদূষক শুনিয়া উত্তর করিলেন যে, স্বর্গের কথা লোকে মনে করিবে কেন? সেখানে খাইতে বা পান করিতে কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল মৎস্যের ন্যায় অনিমিষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে হয়। রাজা শুনিয়া বলিলেন, "বয়স্য স্বর্গসুখ অনির্দ্দেশ্য; তাহাকে কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? এই দিব্য ললনা ব্যতীত পুরুরবার অন্য নারীতে কিছুমাত্র প্রীতি নাই।" মানবক রাজাকে বলিলেন যে, কেমন, এখন তোমার মনোরথসিদ্ধি হইয়াছে ত? রাজা উত্তর দিলেন যে, সামন্তগণের মুকুটমণিতে পাদপীঠ রঞ্জিত হইলেও এবং ধরার একচ্ছত্র প্রভুত্ব লাভ করিলেও আমি কৃতার্থ হইতে পারি নাই; কিন্তু আজ এই সুরলোকসুন্দরীর

চরণযুগলের মধুর দাসত্ব লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। তাহার পর তিনি উর্ব্বশীকে বলিতে লাগিলেন যে, চন্দ্রকর আজ শরীরে সুখধারা ঢালিয়া দিতেছে। মদনের বাণ আজ আমার প্রতি অনুকূল। পূর্ব্বে যাহা যাহা রুক্ষ বলিয়া বোধ হইত, তোমার মিলনে আজ তাহারা সান্ত্বনা দিতেছে।" উর্ব্বশী রাজাকে নিজেই অপরাধিণী বলিলে, রাজা বলিলেন, "ও কথা বলিওনা, দেখ, দুঃখের পর যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই স্বাদুতর বলিয়া বিবেচিত হয়। আতপতপ্ত ব্যক্তির নিকটই তরুচ্ছায়া সুখপ্রদ হইয়া থাকে।" তাহার পর বিদূষক 'চন্দ্রকিরণ সেবনের পর গৃহপ্রবেশ করা কর্ত্তব্য' বলিলে রাজা বিদূষককে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে বলিলেন। অতঃপর রাজা ও উর্ব্বশী বিদূষকের প্রদর্শিত পথে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। গমনকালে রাজা উর্ব্বশীকে বলিতে লাগিলেন, "মনোরথসিদ্ধির পূর্ব্বে যে রাত্রিকে শতগুণিত বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে তোমার মিলনে যদি তাহাই ঘটে তাহা হইলে যে কত সুখী হইব তাহা বলিতে পারি না।"

(৪)

সুরলোকসুন্দরী উর্ব্বশীর সমাগমে রাজা পুরূরবা আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশীও স্বর্গকে বিস্মৃতিগর্ভে ডুবাইয়া দিয়া প্রণয়সলিলে ভাসিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের অনুরাগ এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, রাজা মন্ত্রীর প্রতি রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া উর্ব্বশীকে লইয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন তরুলতাশোভিত, কুসুমসৌরভে আমোদিত, কোকিলকূজিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, স্বচ্ছসলিলা মন্দাকিনী রজততরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া যাইতেছেন, তাঁহার তীরভূমিতে উদয়বতী নামে একটি বিদ্যাধরবালিকা বালুকা-পর্ব্বত লইয়া খেলা করিতেছিল। রাজা তাহার প্রতি কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করায়, উর্ব্বশীর অভিমানানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। রাজা তাঁহাকে অনেক অনুনয়বিনয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু উর্ব্বশী তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বেগভরে কুমার কার্ত্তিকেয়ের

অকলুষ বনের দিকে অগ্রসর হইলেন। তথায় যে রমণীগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ, গুরুশাপে দেবতাদিগের সমস্ত নিয়ম বিস্মৃত হওয়ায়, তাহা উর্ব্বশীর স্মরণ-পথে উদিত হইল না। তিনি তথায় প্রবেশ করিবামাত্র একটি লতায় পরিণত হইয়া গেলেন। রাজাও তাঁহার অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। পুরুরবা ক্রমে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। উর্ব্বশীর সখীরা তৎসমস্ত অবগত হইয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন; এবং সে সময়ে সুখীজনেরও উৎকণ্ঠাবর্দ্ধক মেঘোদয় হওয়ায়, রাজা যে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু গৌরীচরণসম্ভব সঙ্গমমণি ব্যতীত যে ইহার প্রতিকারের কোন উপায় নাই, তাহাও তাঁহারা স্মরণ করিতে লাগিলেন। অগত্যা দৈবানুগ্রহের প্রতি নির্ভর করিয়া অপ্সরাবৃন্দ আপনাদের চিত্তকে শান্ত করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদের ইহাও বিশ্বাস হইয়াছিল যে, রাজা ও উর্ব্বশীর ন্যায় আকৃতিবিশেষ জনেরা অধিক কাল দুঃখভোগ করিতে পারেন না।

অকলুষ অরণ্য শ্যামল লতাবিটপীতে সমাচ্ছন্ন হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল; বিশেষতঃ সে সময়ে মেঘোদয় হওয়ায় তাহার শ্যামলতা প্রগাঢ় হইয়া উঠে। হংস, ময়ূর, চক্রবাক, কোকিল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার স্বর মিশাইয়া এক নূতন ঐক্যতানে তাহাকে মুখরিত করিতেছিল। কুসুম-গন্ধে চারি দিক আমোদিত হইয়া উঠে; পদ্মবনে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করিতে থাকে; করী, করিণী, মৃগ, মৃগী আনন্দে বিচরণ করিতেছিল; পর্ব্বতপ্রান্তে নবজলস্ফীতা স্রোতস্বিনী ফেনিল তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া যাইতেছিল। উন্মত্ত রাজা উর্ব্বশীর অন্বেষণে সেইদিকে ধাবিত হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। সম্মুখে তিনি যাহাকে দেখিতে পান, তাহাকেই উর্ব্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করেন, আবার মধ্যে মধ্যে গাথা গাহিয়া উঠেন। মেঘগাত্রে বিদ্যুদ্বিকাশ দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, যেন কোন রাক্ষস উর্ব্বশীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি তখন তাহার প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপে উদ্যত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হংসযুবার প্রিয়া-বিরহে কাতরতায় একটি গাথাও গাহিয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, উহা গর্ব্বিত রাক্ষস নহে, নবমেঘ খণ্ড মাত্র, রাক্ষসের শরাসন নহে, কিন্তু ইন্দ্রধনু, তাহার বাণবর্ষণ নহে, কিন্তু

বারিধারাপাত, আর তাঁহার প্রিয়তমা উর্ব্বশী নহে, কিন্তু বিদ্যুল্লতা। ভ্রম বুঝিতে পারিয়া রাজা হতাশহৃদয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর উঠিয়া গাথা গাহিয়া বলিতে লাগিলেন যে, যতক্ষণ তড়িচ্ছ্যামল জলদ বারিপাত করিতেছিল, ততক্ষণ আমি সেই মৃগাক্ষীকে নিশাচরে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে মনে করিতেছিলাম। পরে সত্য সত্য উর্ব্বশী কোথায় গিয়াছেন, রাজা তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, "যদি তিনি কোপবশে দৈবী শক্তিপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্রোধ অধিকক্ষণ থাকিতে পারিবে না। যদি স্বর্গেই গিয়া থাকেন, তাহা হইলে পুনর্ব্বার আমার জন্ত তাঁহার মন আর্দ্র হইয়া উঠিবে। আমার সম্মুখে দৈত্যেরাও তাঁহাকে হরণ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তিনি একেবারে কি প্রকারে নয়নের অদৃশ্য হইয়া গেলেন?" হতভাগাদিগের একটি দুঃখ আর একটির সহিত গ্রথিত জানিয়া রাজা বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার বিরহত সুদুঃসহ হইয়া উঠিতেছে। আবার নবমেঘোদয়ে আতপহীন রম্য দিবসগুলি কষ্ট বাড়াইয়া তুলিতেছে। তাহার পর আবার গাথা গাহিয়া মেঘকে শান্ত হইতে বলিলেন। পরিশেষে আবার বলিতে লাগিলেন যে, আমি কেন বৃথা মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছি। মুনিরা বলিয়া থাকেন যে, রাজা কালের কারণ; তবে কি আমি প্রাবৃট্ সময় স্থগিত করিয়া দিব? সঙ্গে সঙ্গে গন্ধোন্মাদিত, মধুকরগুঞ্জনে ও কোকিলকূজনে মুখরিত, সমীরসঞ্চালিত, পল্লববিভূষিত কল্পবৃক্ষের একটি গাথাও গীত হইল। কিছু পরে তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন যে, না প্রাবৃট্ সময় স্থগিত করা হইবে না; কারণ ইহাতে আমার রাজসম্মানই প্রকাশ পাইতেছে। কারণ, বিদ্যুদ্রেখাঙ্কিত জলদখণ্ড সুবর্ণরঞ্জিত চারুচন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতেছে, নিচুল মঞ্জরীগুলি চামরের ন্যায় সঞ্চালিত হইতেছে। উচ্চকণ্ঠে ময়ূরেরা বন্দীর ন্যায় গান করিতেছে, আর জলদবণিক ধারাহার উপহার দিতেছে; সে যাহা হউক, রাজবিভবের শ্লাঘা করিয়া আর কি করিব? এক্ষণে প্রিয়তমার অন্বেষণে রত হওয়া যাক। আবার একটি দয়িতাবিয়োগ-বিধুর গজযূথপতির গিরিকাননে ভ্রমণ সম্বন্ধে গাথা গীত হইল। তাহার পর তিনি পুনর্ব্বার উর্ব্বশীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সলিলগর্ভে রক্তবর্ণ নবকন্দলীকুসুম দেখিয়া তিনি প্রিয়তমার অশ্রু-

পরিপূর্ণ আরক্তিম নয়নযুগল স্মরণ করিতে লাগিলেন। কোন্ দিকে উর্ব্বশী গিয়াছেন তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মনে হইল, যদি উর্ব্বশী সেই বনভূমিতে বিচরণ করিতেন তাহা হইলে বর্ষাসিক্ত তাহার সৈকতভূমি তাঁহার পদভরে চিহ্নিত হইয়া অলক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিত। সেই সময়ে তাঁহার মনে হইল, যেন উর্ব্বশীর অশ্রুসিক্ত ওষ্ঠরাগরঞ্জিত শুকোদরসম শ্যামল বক্ষবসনখানি পড়িয়া আছে। রাজা গ্রহণ করার আশায় তাহার নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটি শ্যামল নবতৃণ ভূমিতে ইন্দ্রগোপকীট গুলি পড়িয়া রহিয়াছে। হতাশচিত্তে রাজা আবার উর্ব্বশীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, বারিধারায় উচ্ছলিত শৈলতটে আপনার চূড়া কম্পিত করিয়া মেঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে একটি ময়ূর উচ্চৈঃস্বরে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। রাজা তাহারই নিকট হইতে উর্ব্বশীর সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করিলেন।

ময়ূরটির নিকট অগ্রসর হইতে রাজা প্রিয়তমা-দর্শনলালস গজবর সম্বন্ধে একটি গাথা গাহিয়া উঠিলেন, এবং ময়ূরটিকেও গাথায় গাথায় তাঁহার প্রিয়তমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর সেই সিতাপাঙ্গ নীলকণ্ঠকে সুস্পষ্টরূপেই বলিতে লাগিলেন যে, সে তাঁহার দীর্ঘাপাঙ্গা প্রিয়দর্শনা বনিতাকে দেখিয়াছে কি না? ময়ূর সে কথার উত্তর না দিয়া নাচিতে লাগিল দেখিয়া রাজা বলিলেন যে, প্রিয়তমার কুসুমভূষিত আলুলায়িত কুন্তলরাশি দেখিতে না পাওয়ায় ময়ূর নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মৃদুপবনভিন্ন চারু কলাপ লইয়া নৃত্য করিতেছে। তাহারপর তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া জম্বুশাখায় উপবিষ্টা একটি কোকিলার প্রতি ধাবিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে বিরহকাতর গজেন্দ্রের গাথাও গীত হইতে লাগিল, এবং কোকিলাকেও প্রথমে গাথা দ্বারা প্রিয়তমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করা হইল; পরে তাহাকে স্পষ্ট বাক্যে দূতীস্বরূপা করিয়া উর্ব্বশীকে আনিতে অথবা তাহার নিকট আপনাকে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন, এবং উর্ব্বশী যে অকারণে রমণীসুলভ অভিমান করিয়াছেন তাহাও বুঝাইয়া বলিলেন। কোকিলা কিন্তু রাজার দুঃখ গ্রাহ্য না করিয়া জম্বুরস পানেই রত হইল। এই সময়ে রাজার মনে হইল, যেন তাঁহার কর্ণে উর্ব্বশীর নূপুর শব্দ প্রবেশ করিতেছে। তিনি আগ্রহ-

সহকারে তাহা লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অবগত হইলেন যে, মেঘোদয়ে রাজহংস মানসসরোবরে যাইতে যাইতে কূজন করিতেছে। তখন তাঁহার নূপুর শব্দের ভ্রম দূর হইল। রাজা হংসটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "পরে মানসসরোবরে যাইও, কিছু কাল মৃণাল-পাথেয় পরিত্যাগ কর, পুনর্ব্বার তাহা লইও। আমাকে প্রিয়া-বিরহ-ব্যথা হইতে উদ্ধার কর। সাধুদিগের স্বার্থ অপেক্ষা বন্ধুজনের উপকারই গুরুতর।" ইহার উত্তরে রাজার যেন মনে হইল, হংস বলিতেছিল যে, মানস ঔৎসুক্যে আমি কিছু লক্ষ্য করি নাই। তাহার পর এক একবার তিনি গাথার দ্বারা ও এক একবার স্পষ্ট বাক্যে হংসকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, তুমি যদি আমার প্রিয়তমাকে না দেখিয়া থাক, তবে তাহার মন্দগতি কিরূপে হরণ করিলে? হৃত বস্তুর একাংশ স্বীকৃত হইলে অপরাধী সম্পূর্ণ বস্তু প্রদানে বাধ্য। হংসটি কিন্তু তৎক্ষণাৎ উড়িয়াগেল। তখন একটি চক্রবাকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। সেই সময়ে কুসুমকাননচারী গজেন্দ্রের গাথাও গীত হইতেছিল। রাজা প্রথমে গাথাদ্বারা গোরচনাকুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাককে প্রিয়তমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে স্পষ্ট বাক্যে তাহার নামের সহিত উর্ব্বশীর অঙ্গ-বিশেষের সাদৃশ্য উল্লেখ করিয়া আপনার মনোরথ জানাইলেন। তাহার 'কে কে' শব্দে রাজা যেন 'তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিতেছে' বলিয়া উত্তর করিলেন যে, চন্দ্র যার পিতামহ, সূর্য্য যার মাতামহ এবং যাহাকে উর্ব্বশী ও ধরিত্রী পতিত্বে বরণ করিয়াছে, সেই আমি তোমাকে অনুনয় করিতেছি। তখন সে নীরব হইলে রাজা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তোমার সহচরী সরোবর মধ্যেই পদ্মপত্রাবৃতা হইয়া যদি অবস্থিতি করে, তুমি উৎকণ্ঠিতা হইয়া তাহাকে দূরগামিনী মনে করিয়া চীৎকার করিতে থাক, পত্নিস্নেহবশে তুমি বিচ্ছেদের ভয় কর, তবে এই বিরহবিধুরকে প্রিয়ার সংবাদ দিতেছ না কেন? বুঝিয়াছি, আমাদের ন্যায় হতভাগ্যদিগেরই এইরূপ দশা ঘটে। সেই সময়ে গুঞ্জনমত্ত অলিগর্ভস্থ পদ্ম দেখিয়া রাজার উর্ব্বশীর অক্ষুব্ধ বদন মনে পড়িতে লাগিল। তখন তিনি ভ্রমরের সহিত প্রণয়-স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হংসযুবার প্রণয়গাথাও গাহিতে লাগিলেন। তাহার পর ভ্রমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন যে, মধুকর, তুমি

সেই মদিরাক্ষীর সংবাদ শুনাও। সে বরতনুকে কি তুমি দেখ নাই? বোধ হয় তাহাই বটে, কারণ যদি তুমি তাহার মুখোচ্ছ্বাসের গন্ধ পাইতে, তাহা হইলে তোমার পদ্মবাসে প্রীতি জন্মিত না। তাহার পর করিণী সঙ্গে কদম্বতলে অবস্থিত একটি করীকে দেখিয়া রাজা তাহারই প্রতি ধাবিত হইলেন।

রাজা গাথা গাহিতে গাহিতে করীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সে করিণীর শুণ্ড কর্ত্তৃক ভগ্ন ও আনীত শল্লকীতরুর অভিনব পল্লব হইতে ক্ষরিত রস পান করিতেছে। রাজা তাহার আহার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া প্রথমে গাথায়, পরে স্পষ্ট বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি শশিকলাকান্তি, যূথিকাশোভিতকুন্তলা, স্থিরযৌবনা কোন রমণীকে কি দেখিয়াছ? হস্তীর গর্জ্জনে যেন রাজার বোধ হইল, সে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছে। তাঁহারা উভয়ে সমধর্ম্মী মনে করিয়া রাজা বলিতে লাগিলেন যে, আমি রাজাধিরাজ, তুমিও নাগগণের অধিপতি, আমার অর্থদানের ন্যায় তোমারও মদক্ষরণ আছে। স্ত্রীরত্নসারভূতা উর্ব্বশীকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমিও এই করিণীকে লাভ করিয়াছ, কেবল আমার ন্যায় প্রিয়া-বিরহ-ব্যথা তুমি অনুভব করিতেছ না। তাহার পর তাহাকে সুখে থাক বলিয়া রাজা অপ্সরাদিগের প্রিয়স্থান সুরভিকন্দর নামে রমণীয় পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং তথায় উর্ব্বশীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পর্ব্বত-কন্দর অন্ধকারময় হওয়ায় তিনি বিদ্যুতালোকে তাহার মধ্যভাগ দর্শনে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহার ভাগ্যে মেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চার হইল না। তখন তিনি সেই পর্ব্বতকে উর্ব্বশীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুর দ্বারা পৃথিবীবিদীর্ণকারী একটি বরাহেরও গাথা গীত হইল। রাজা রতিসমা উর্ব্বশী পর্ব্বতের কোন বনমধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাওয়ায়, পর্ব্বতের নিকটস্থ হইয়া প্রথমে গাথায় কহিলেন, "স্ফটিক শিলাতল নিতান্ত নির্ম্মল, নানাকুসুমভূষিত শেখর, কিন্নরমধুরোদ্গীত মনোহর মহীধর, আমার প্রিয়তমাকে দেখাও। পরে তিনি বিশদ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, পর্ব্বতনাথ, আমার বিরহে আকুলা কোন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে তোমরা কোন রম্যবনে ভ্রমণ করিতে

দেখিয়াছ কি? কন্দরোত্থিত প্রতিশব্দে প্রতারিত হইয়া রাজা আগ্রহ সহকারে কর্ণপাত করিয়া পরে নিজভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তখন একটি গিরিনদীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন; তাহার তরঙ্গভঙ্গ ভ্রুভঙ্গ, সশব্দ চঞ্চল বিহগশ্রেণী মেখলা, ফেনরাশি শিথিল বসন, বক্রগতি পদস্খলনের ন্যায় মনে করিয়া রাজার বোধ হইল, যেন উর্ব্বশী নদীরূপে পরিণত হইয়াছেন। রাজা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার ইচ্ছায় গাথা দ্বারা নদীরূপ পরিত্যাগের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এক একবার অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া নদীকে সমুদ্রজ্ঞানে গাথা গাহিতে লাগিলেন। আবার নদীকে উর্ব্বশীভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার প্রতি আমার অনুরাগ প্রগাঢ়, তাই আমি তোমাকে প্রিয় বাক্য বলিয়া থাকি; প্রণয়ভঙ্গে আমি তোমার প্রতি বিমুখ হই নাই। তবে কোন্ অপরাধে দাসকে পরিত্যাগ করিলে? কিছু জ্ঞান হইলে তিনি তাহাকে প্রকৃত নদী বলিয়াই বুঝিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন যে, উর্ব্বশী হইলে তিনি কখনও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রগামিনী হইতেন না। সে যাহা হউক, খেদে কোন লাভ নাই। এক্ষণে যেখানে সেই সুনয়না আমার চক্ষের অন্তরাল হইয়াছিলেন, সেই খানেই যাওয়া যাক। একটি হরিণ দেখিয়া তিনি তাহাকে উর্ব্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু সহসা আপনার অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া নবকুসুমস্তবকশোভিত, তরুরাজিসমন্বিত, কোকিলকূজিত ও ভ্রমরঝঙ্কারিত নন্দনকাননে করিণী-বিরহিত ঐরাবতের বিবরণের কথা বলিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণসার মৃগটি দেখিয়া রাজার বোধ হইল, যেন বনশ্রীর ছবি নবতৃণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে। রাজা গাথা গাহিয়া তাহাকে বলিলেন, যদি সেই তন্বী, মন্দগতি, মৃগাক্ষী, সুরসুন্দরীকে তুমি দেখিয়া থাক, তবে তাহার বিরহসমুদ্র হইতে আমাকে উত্তীর্ণ কর। অবশেষে তাহাকে ভাল করিয়া বলিলেন যে, তোমার সহচরীর ন্যায় আয়তাক্ষী আমার প্রিয়তমাকে দেখিয়াছ কি? হরিণ তাঁহার কথা না শুনিয়া হরিণীর অভিমুখী হইলে রাজা দশাবিপর্য্যয়ে সর্ব্বত্রই পরিভব ঘটে বলিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। উর্ব্বশীর পথ আবিষ্কার হইয়াছে মনে করিয়া তিনি একটি রক্তকদম্ব বৃক্ষ দেখিয়া বলিলেন যে, ইহারই অপ্রস্ফুটিত কুসুম লইয়া প্রিয়তমা শিখাভরণ করিয়াছেন।

সেই সময়ে বিদীর্ণপাষাণখণ্ডের মধ্যভাগে সূর্য্যকর নিপতিত হওয়ায় একটি রক্তবর্ণ বস্তু রাজার-নয়নগোচর হইল। তিনি প্রথমে তাহাকে সিংহ-হত হস্তীর মাংসখণ্ড বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, পরে তাহাকে রক্তাশোক স্তবকরাগ মণি বলিয়া বুঝিতে পারেন। তাহার উপর সূর্য্যকর পড়ায় বোধ হইতেছিল যেন তপনদেব কর দ্বারা তাহাকে উত্তোলন করার চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজা তাহাকে গ্রহণ করিয়া প্রথমে বিরহকাতর গজরাজের গাথা গাহিলেন; পরে বলিতে লাগিলেন যে মন্দারপুষ্পাধিবাসিত যাহার কেশাগ্রে ইহাকে স্থাপন করিব, সেই প্রিয়তমাত দুর্লভা। সে যাহা হউক,ইহাকে অশ্রুসিক্ত করিতে চাহি না। সেই সময়ে দূরে শব্দ হইল,"বৎস, শৈলসুতাচরণরাগজাত এই সঙ্গমনীয় মণি গ্রহণ কর। ইহা ধারণ করিলে প্রিয়জনসহ মিলন ঘটিবে।" রাজা দেখিলেন, এক মুনিপ্রবর তাঁহাকে এই কথা বলিতেছেন। তখন তিনি সঙ্গমনীয় মণিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন যে, যদি তুমি বিযুক্তা প্রিয়তমার সহিত আমার মিলন ঘটাইতে পার, তাহা হইলে তোমাকে হরচূড়াস্থিত ইন্দুকলার ন্যায় শিরোমণি করিয়া রাখিব। এই সময়ে একটি কুসুমরহিতা লতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল, এবং তাহার প্রতি রাজার চিত্তও আকৃষ্ট হইতে লাগিল। উর্ব্বশীর সহিত সাদৃশ্য থাকায় রাজা বলিলেন যে, এই কৃশ লতাটির মেঘজলার্দ্র পল্লব দেখিয়া প্রিয়তমার অশ্রুসিক্ত অধর মনে পড়িতেছে। ইহার কুসুমোদ্গম কাল অতীত হওয়ায় পুষ্পবিহীনা ইহাকে অলঙ্কারশূন্যা প্রিয়ার ন্যায়ই বোধ হইতেছে। মধুকরের ঝঙ্কার না থাকায় প্রিয়তমার মৌনভাবই স্মরণ করাইতেছে। পদপতিত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সেই কোপনা যেন অনুতপ্তার ন্যায় অবস্থিতি করিতে-ছেন। যাহা হউক, ইহার প্রতি যখন মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন এই প্রিয়াস্বরূপিণী লতাটিকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করি, এই বলিয়া একটী গাথা গাহিতে গাহিতে রাজা লতাটিকে আলিঙ্গন করিবামাত্র তাঁহার শরীরে উর্ব্বশীর গাত্র-স্পর্শের ন্যায় অনুভব হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাতে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, যাহাকে প্রিয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়া-ছিলাম, তাহারা ক্ষণমাত্রেই অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এক্ষণে যাহা হইতে প্রিয়তমার স্পর্শ অনুভূত হইতেছে, তাহার প্রতি আর চক্ষু

উন্মীলিত করিব না। এই বলিয়া রাজা কিছুক্ষণ চক্ষু নিমীলিত করিয়া রহিলেন। উর্ব্বশী যে লতাটীর রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন, রাজা তাহাকেই আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন। সঙ্গমনীয় মণি সহ রাজার স্পর্শে উর্ব্বশীর লতারূপ অন্তর্হিত হইল। রাজা ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে, তিনি সত্য সত্যই উর্ব্বশীকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন; তখন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। উর্ব্বশী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলে, রাজার সংজ্ঞালাভ হইল। তখন রাজা বলিলেন যে, মৃতের চেতনা প্রাপ্তির ন্যায় তোমার বিয়োগান্ধকারে মগ্ন আমি তোমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আজ যেন বাঁচিলাম। উর্ব্বশী তাঁহার অপরাধ ক্ষমার জন্য রাজাকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহাকে শান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে তিনি উর্ব্বশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি এতকাল আমাকে ছাড়িয়া কিরূপে ছিলে? রাজা গাথা গাহিয়া বলিলেন যে, ময়ূর, কোকিল, হংস, চক্রবাক, ভ্রমর, হস্তী, পর্ব্বত, গিরি, নদী, হরিণ সকলকেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। উর্ব্বশী অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলাম বলিলে রাজা তাহা বুঝিতে না পারায়, উর্ব্বশী তাঁহার লতাপরিণতিকাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। রাজা তখন সমস্ত অবগত হইয়া বলিলেন যে, যাহাকে শয্যার উপরে সুপ্ত দেখিয়া প্রবাসগত বলিয়া তোমার মনে হইত, সেই আমার সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ তুমি কিরূপে সহ্য করিলে? পরে রাজা উর্ব্বশীর ললাটে সঙ্গমনীয় মণি স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, ললাটের মণিরাগে উজ্জ্বল তোমার বদনখানি বালাতপে উদ্ভাসিত কমলের ন্যায় বোধ হইতেছে। তখন উর্ব্বশী দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠান-পুর হইতে অনুপস্থিত থাকার জন্য প্রজাদের মনে বিরাগ জন্মিতে পারে বলিয়া রাজাকে লইয়া তথায় যাইতে অভিলাষ করিলেন। রাজাও তাহাতে সম্মত হইয়া উর্ব্বশীকে বলিলেন যে, বিদ্যুৎপতাকা-শোভিত, চিত্রিত ইন্দ্র-ধনু-অঙ্কিত, নবমেঘরথে লীলাগতি তুমি আমাকে আমার ভবনে লইয়া চল! এই সময়ে হংসবধূর প্রণয়িনীসমাগম লাভের গাথা গীত হইল। তাহার পর রাজা উর্ব্বশীর সহিত রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পার্বতী

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা।

যাহা না করিলে আপনার দায়িত্ব যায় না, করিলে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ লাভ হয়, তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ঈদৃশ কর্ম্মের প্রতি কর্ত্তার যে আশক্তি তাহাই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। এই আশক্তি বা অনুরাগ এরূপ কর্ম্মের প্রতি অর্পিত হওয়া চাই যাহার সম্পাদনের জন্য কর্ত্তাই দায়ী, অন্যে নহে; যাহার অনুষ্ঠান কর্ত্তার ইচ্ছাধীন নহে, পরন্তু বাধ্যতামূলক। ইহাতে প্রতিনিধি চালাইলে হইবে না। প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলে কর্ম্মের প্রতি কর্ত্তার কতদূর নিষ্ঠা তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না। সেরূপ ভাবে কর্ত্তব্য পালন একটা ভান মাত্র। যেখানে অনুরাগের অভাব সেখানে কর্ম্ম অসম্পূর্ণ হইবেই। প্রতিনিধি দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, স্ত্রীপুত্রকে ভাল বাসা যায় না, পিতামাতার সেবা করা যায় না; কাজেই স্বীকার করিতে হইবে, প্রতিনিধিদ্বারা কর্ত্তব্য পালনের দায়িত্ব হইতে মুক্তি লাভ করা যায় না। তাই আমরা দেখিতে পাই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভারতের রাজগণ স্বয়ং আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অনেকে রাজ্যাধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া আসেন। উদ্দেশ্য—কর্ত্তব্য কর্ম্মে (এখানে ধর্ম্ম-যুদ্ধে) প্রতিনিধি চালাইলে ধর্ম্মের অঙ্গহানি হইবে, অর্থাৎ যেখানে মৃত্যু নিশ্চিত সেখানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার পূর্ব্বে যেন কর্ত্তব্যে ব্যভিচার না ঘটে। পক্ষান্তরে, মামুদ ও মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে ভারতের সেই ক্ষত্রিয় কেবল কর্ত্তব্যে উদাসীন; অতএব ধর্ম্মহীন হওয়ায় সব হারাইলেন।

আমরা সর্ব্বদা ভুলিয়া যাই যে, পরে আমার হইয়া দেনা শোধ করিলে যেমন আমার একটু ভার কমে বটে, তেমনি সেই পরের দত্ত নূতন দেনা ঘুরিয়া আসিয়া আমারই উপর আবার নূতন ভার চাপাইয়া দেয়। কর্ম্ম হইতে আমাদের জন্ম। জন্ম-ঋণ আর কর্ম্ম-ঋণ একই কথা। তাই দাশরথি রায় বলিতেছেন,—

চলো ভাই ভার ল'য়ে যাই, অযোধ্যার রাম রাজা হ'বে।
দিব তাঁর চরণে ভার, সে বিনে ভার আর কে ব'বে।

দিয়ে ভার ল'য়ে শরণ, (ও) তার ব'লবো ছু'টি ধ'রে চরণ,
এবার ভার বইলাম যেমন, (হরি) দিওনা ভার আসছে ভবে।
পাপে হ'য়েছি ভারি, (হরি) আর তো ভার সইতে নারি,
না ভ'জে ভূভারহারে, ভার হ'লেও ভার বইতে হবে।

ভগবান ভার লইয়া থাকেন না। ভক্তই ভজনবলে ভারের লাঘব করেন। কর্ম্ম ও ভক্তি মূলে এক; যিনি উভয়ের পার্থক্য বুঝেন, তিনি সাম্প্রদায়িক। কর্ম্ম বা ভক্তি সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা হইতে ভগবান্ আমাদের রক্ষা করুন। সাম্প্রদায়িকতা হিন্দুজাতির যতদূর সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে, অন্য জাতির ততদূর পারে নাই।

এই কর্ম্ম-ঋণের ভার এতই দুঃসহ যে, লোকে ফললাভের প্রত্যাশা না থাকিলে একমুঠা ছাই দিতেও অসম্মত। সর্ব্বত্রই এক উত্তর, আমি আপন জ্বালায় ব্যস্ত। আবার মহামায়ার প্রভাবে প্রতিশোধ করা ত দূরের কথা, লোকে অনেক স্থলে ঋণকে (অবশ্যকরণীয় কর্ম্মকে) ঋণ বলিয়া স্বীকার করিতেই অসম্মত। একালে ভাষার পরিবর্ত্তন, অবশ্যকরণীয় কর্ম্মের আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—পরোপকার ধর্ম্ম। সংসারটাকে সহজ করিয়া লইবার চেষ্টায় যুক্তি দেওয়া হয়, উপকার কর, পুণ্য লাভ, স্বর্গ লাভ হইবে, না কর হানি হইবে না। ইহা ধর্ম্মকে ফাঁকি দেওয়া। সংসারকে যত সহজ মনে করা যায় সংসার তত সহজ নহে। ইহা কোনওরূপ চুক্তি পত্রে আবদ্ধ হইবার পাত্র নহে। লোকে ইহার সহিত যে সকল রফা, চুক্তি, আপোষ, নিষ্পত্তি করে, সে সকল তদিনের মধ্যেই আসদ্ধ হইয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, সংসারে মিথ্যা ও দুর্ব্বলতার স্থান হয় না। যদিও কৃত্রিম প্রতিধ্বনি ও কৃত্রিম সমবেদনা প্রতারণার পথে সাময়িক সিদ্ধি লাভ করে বটে, কিন্তু সময় পূর্ণ হইলে প্রতারণা ধরা পড়ে, আসল হইতে খাদ টুকু আপনা হইতেই পৃথক হইয়া পড়ে। দুর্য্যোধনের প্রতারণার রাজ্য তের বৎসরের অধিক টীকে নাই। তবে, যাহাতে সত্য, তেজ ও অভয় বিদ্যমান সেরূপ চুক্তিপত্র সংসার কখনই অগ্রাহ্য করে না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, অনেকেই এই তিনটি সম্পত্তির অর্থাৎ সত্য, তেজ ও অভয় লাভের প্রার্থী নহেন, কারণ এ সম্পত্তির আয়ে তাঁহাদের সংসার খরচ

কুলায় না। তাঁহারা হাতে হাতে ফল চান, সংসারও হাতে হাতে উপযুক্ত ফল দেয়। তখন বেগতিক দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মের কারবার খুলিয়া বসেন। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। যোগী-ভক্ত-তান্ত্রিক-স্বামিজী-প্রভুপাদ-ভক্তাবতার-দেশহিতৈষী-কোম্পানিরা একালে কারবারে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। শেষে নিরুপায় হইয়া কোনও কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ময়ূরপুচ্ছগুলি ফেলিয়া দিয়া স্বদলে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, সেখানেও পূর্ব্ববৎ দিবানিশি ক্রন্দনের রোল ; সেই পুরাতন ধ্বনি,—আমি আপন জ্বালায় ব্যস্ত।

আমরা সকলেই ত্রিতাপের জ্বালায় জ্বলিতেছি, কেবল অঙ্গুলিপর্ব্ব-গণনায় কতকগুলি মানুষ আমাদের দল ছাড়া। তাদৃশ মানুষ দৈবী প্রকৃতির আদান লইয়া পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা গোড়া হইতেই সুখের প্রতি বিতৃষ্ণ, সুখকে দুঃখেরই রূপান্তর বলিয়া বুঝেন, কামনা ও মমত্বের বশীভূত নহেন, বরং যদি কোনও দেবতা আসিয়া পৃথিবীর আধিপত্য, চিরজীবন, দিব্য অপ্সরাদি তাঁহার হাতে তুলিয়া দেন তাহাতেও বিচলিত হইবেন না, বরং নচিকেতার ন্যায় বলিয়া উঠিবেন,—

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাঞ্জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বঞ্জীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ কঠ, ১। ২৬

একথা যাঁহার মুখে শোভা পায় তিনিই হইবেন মুক্তিসাধনার অধিকারী, তাঁহার আপনার বলিতে কেহই নাই। কারণ পূর্ব্ব জন্মে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধনা দ্বারা এজন্মে তিনি হৃদয়ে আপনাকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না, তাঁহার আত্মা (জীব) এখন পরমাত্মার অভিমুখী হইয়াছে। এইজন্য তিনি সকলেরই, কেহই তাঁহার নয়। যেমন খনিজ পদার্থের মধ্যে হীরক, তেমনি মানুষের মধ্যে তিনি। কিন্তু আমরা যখন তাঁহার নহি, তখন তিনি আমাদের দল ছাড়িতে বাধ্য ; সুতরাং সবই প্রায় বাকি থাকিল। আমরা এই বাকি সকলের মধ্যে ; আমাদের জন্য কেবল কর্ম্ম-যোগ। বলা বাহুল্য, ইহা নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ নহে, সকাম কর্ম্মযোগ। সকল খনিজ হীরক নহে।

"ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং" মন্ত্রের অধিকারী সকলে নহে। আমরা রাণীগঞ্জের কয়লা,—খনিজ হইলেও হীরক নহি; আমরা "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ", মন্ত্রের অধিকারী। আমাদের পরিণাম যে, অসূর্য্য লোক তাহা জানাই আছে।

একগাছি দৃঢ় সূক্ষ্ম সূত্রে আমরা ঝুলিতেছি। এই চৌদ্দপোয়া দেহটার আপাদ মস্তক পর্ব্বে পর্ব্বে গাঁটে গাঁটে জড়াইয়া পশ্চাতে সুদূর অতীত, সম্মুখে সুদূর ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া এই কর্ম্মসূত্র বিলম্বিত। তাহার এক প্রান্তে অবিদ্যা, অপর প্রান্তে প্রবোধচন্দ্র। কর্ম্মীকে কর্ম্মযোগের আশ্রয়ে মায়ার স্থূল সূক্ষ্ম ভিন্ন ভিন্ন স্তর পার হইয়া বর্ত্তমান পেচকরূপটি ছাড়িয়া ক্রমে চকোররূপ ধরিতে হইবে; চকোর হইয়া প্রবোধচন্দ্রের সুধাপান করিতে করিতে চাঁদে পরিণত হইয়া, শেষে চাঁদের চাঁদে মিলিতে হইবে। তখন, চাঁদের চাঁদে মিলিয়া পিছন ফিরিলে দেখিতে পাইবে, সূত্রগাছটী খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ইহাই হইল কর্ম্মাশ্রয়ে সগুণ ব্রহ্ম-ধ্যানে কর্ম্মক্ষয়ের ব্যবস্থা। ইহারই নামান্তর ক্রম-মুক্তি।

কিন্তু সে কতদিনে? না, বহুনাং জন্মজন্মান্তে। হিন্দু শাস্ত্র এ প্রশ্নের যে নিষ্ঠুর উত্তর দেন, তাহাতে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সে গুরুতর তত্ত্বের আলোচনায় এখন প্রয়োজন নাই। আমরা এখানে আর একদিক দিয়া কর্ম্মতত্ত্বটী বুঝিবার চেষ্টা করিব।

প্রত্যেক কর্ম্মই একপক্ষে ঋণদান বা ঋণশোধ, পক্ষান্তরে ঋণগ্রহণ বা প্রাপ্য আদায়। এই দেনা পাওনা লইয়াই মনুষ্য জীবন। ইহা অনন্ত না হইতে পারে, কিন্তু ইহা অনাদি না বলিয়া পারা যায় না। পূর্ব্বে যে সুদূর অতীত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি সেটা ভয়ে ভয়ে। অবিদ্যাই কর্ম্মের মূল। এই অবিদ্যা যতকাল; কর্ম্ম ততকাল; কর্ম্ম যতকাল, দেহধারণ ততকাল; দেহধারণ যতকাল, সুখদুঃখ ভোগ ততকাল।

এই কর্ম্ম মোটামুটী দুই জাতীয়। একটি শাস্ত্রীয় (বৈদিক), আর একটি লৌকিক বা স্বাভাবিক। নিত্য নৈমিত্তিকাদি শাস্ত্রীয়। লৌকিক বা স্বাভাবিক কর্ম্ম সেইগুলি, যেগুলি মানবকে স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রেরণায় শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য করিতে হয়; যাহা প্রকৃতির (অবিদ্যার)

বশবর্ত্তী মানব (অতএব স্ববশ নহে, অবশ) ত্রিগুণের দ্বারা বিচলিত হইয়া হয় অন্তরে অন্তরে, না হয় বাহিরে করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এই স্বাভাবিক কর্ম্ম শাস্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে অনেক সময়ে দোষের কারণ হইয়া থাকে। এখন, এই স্বাভাবিক কর্ম্মকে শাস্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া যাহাতে মানুষ অনর্থের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রের ইঙ্গিত কিরূপ দেখা যাক।

নিত্যকর্ম্ম দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিবার চেষ্টা কর, চিত্তের বলাধান কর। ইহা চিত্তশুদ্ধি নহে, সে অতি কঠিন ব্যাপার। পরে, ঈশ্বর-সাধনালব্ধ শক্তির সাহায্যে স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবাহকে বিভিন্ন অথচ গভীরতর খাতে প্রবেশিত করিতে থাক। সুগভীর খাতে প্রবিষ্ট হইলে স্রোতের বেগ আপনা হইতেই মন্দ হইয়া আসিবে। তখন সেই মন্দ অথচ গভীর স্রোতে গা ভাসাইয়া তুমি সংসারের কাজ করিতে থাক। তুমি স্বভাবতঃ জলে উপুড় হইয়া সাঁতার দিতে চাও,—ইন্দ্রিয়াদি অনাত্ম বস্তুতে আত্মাভিমান হওয়ায় আপনাকে কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়া থাক। ফলে তোমার কর্ম্ম সকাম হইয়া পড়ে। অতএব, তোমাকে চিৎ-সাঁতার শিখিতে হইবে। চিৎ-সাঁতার দিয়া কর্ম্মপ্রবাহ ধরিয়া ভাসিয়া যাইতে হইবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের নির্নিমেষ দৃষ্টিপথে পড়িয়া আছি মনে করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। চিৎ-সাঁতার শিখিলে কর্ম্মের প্রেরক ও জ্ঞানের দ্যোতক সবিতাকে দেখিতে দেখিতে গা ভাসাইয়া যাইতে পার; ইহাতে সমর্থ হইলে বুঝিতে পারিবে যে, চিত্ত শুদ্ধির ক্ষীণ দ্যুতি উঁকি ঝুঁকি মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে রাখিও, সকাম কর্ম্মপ্রবাহ স্বভাবতঃ অগভীর নদীখাত ধরিয়া প্রবাহিত, কেননা সে কর্ম্মের কর্ত্তা 'আমি', কর্ম্মফল তজ্জন্য সদোষ, অর্থাৎ বন্ধনের হেতু। পক্ষান্তরে নিষ্কাম কর্ম্ম স্বভাবতঃ সুগভীর নদীখাতে প্রবাহিত হইতে চায়, কারণ সে কর্ম্মের কর্ত্তা 'আমি' নহে, জ্ঞান তাহার সহচর, কর্ম্মফলও সে কারণে অমৃতপ্রসূ ও বহুজনের হিতসাধক। জ্ঞানসহ মিলিত হইলে কর্ম্মপ্রবাহিণীর খাত স্বতঃই সুগভীর হইয়া পড়ে; সে কারণে প্রবাহ বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া দুকূল ভাসায় না। কর্ম্মীমাত্রেই অবস্থাবিশেষে

ডুবুরী। সকাম কর্ম্মী শীঘ্রই হাঁপাইয়া পড়ে, কারণ তাহার কর্ম্মফল অন্তবান্। নিষ্কাম কর্ম্মী দমসামর্থ্যে অতলস্পর্শতলবাসিনী প্রকৃতি দেবীর নিকটবর্ত্তী হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। একজন কর্ম্মনদীর বুকের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়, অপরের বুকের উপর দিয়া (তখন কর্ম্মযোগের সিদ্ধাবস্থা) কর্ম্মনদী বহিয়া যায়। যখন চিৎ সাঁতারের শেষাবস্থা, চিত্তশুদ্ধির পূর্ণতা, তখন কর্ম্মী প্রকৃতি জননীকে ধরিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন। তখন তিনি কেবল আকাশে সূর্য্য দেখিতেছেন না, তখন আকাশে সূর্য্য, জলে সূর্য্য, অতল-বিতল-সুতল-তলাতল-মহাতল-রসাতল-পাতাল ব্যাপিয়া সবিতৃদেব কিরণ-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত। কর্ম্মী তখন প্রকৃতির কোলে শুইয়া ঈশ্বরের প্রতিমা দেখিতেছেন। প্রতিমা সৌরকরমণ্ডিতা, সৌরকর নহে। অতল-বাসিনী তখন সূর্য্যের সহিত একীভূতা। এই যুগল-মিলন দর্শন পর্য্যন্ত নিষ্কাম কর্ম্মীর অধিকার। স্বরূপ (পরমাত্মা) দর্শন জ্ঞানীর সাধ্য, কর্ম্মীর নহে; উহার সাধনপ্রণালীও স্বতন্ত্র।

কিন্তু এই চিৎ-সাঁতার দেওয়া, "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"—এজাদুবিদ্যা যাঁহারা শিখিতে ও শিখাইতে পারিতেন, সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইতে চলিল তাঁহারা পবিত্র ভারতবর্ষ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। পুরাণাদি গ্রন্থ আমাদের সম্মুখে সেই সকল "ম্যামথ-ম্যাষ্টোডন"দের কঙ্কালরাশি উত্তোলিত করিয়া অতীতের সাক্ষ্য দেয় মাত্র। গ্রন্থ-ভাষা-টীকা প্রায় সবই আছে, ব্যাখ্যাতারও অভাব নাই, অভাব কেবল প্রাণের। অতি সুকুমার দেহ, কিন্তু প্রাণশূন্য, যজ্ঞস্থলে সোণার সীতার ন্যায় ডাকিলে সাড়া দেয় না। আসল সীতা পাতালবাসিনী, লৌকিক জ্ঞানচক্ষুর অগোচরী। আত্মজ্ঞানবহ্নির শিখা প্রদীপ্ত না হইলে, অরণির উপর উত্তরারণির অবিরাম ঘর্ষণে ঘটাকাশপরিব্যাপ্ত মহামেঘের ওপার-এপার জ্বালাময়ী সৌদামিনীর প্রভায় জ্বলিয়া না উঠিলে, পাতালপুরে পথহারা হইতে হইবে, সীতার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। গ্রন্থ-লব্ধ জ্ঞান আমান্ন, অগ্নিসংযোগে পাকের প্রয়োজন। নির্ব্বাণপ্রায়, স্ফুলিঙ্গে পর্য্যবসিত আত্মাগ্নি উপায়বলে প্রজ্জ্বালিত করিয়া সোণার সীতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করিলে অমৃত মিলিবে না।

কিন্তু শিখাইবার লোক নাই। যদি কেহ থাকেন, কলুষিতদেহ

আমাদের সহিত সংস্রবে তিনি অশুচি হইবেন, তাঁহার পতনের আশঙ্কাও আছে। আর সে ভয় না করিয়া যদিই বা তিনি কৃপা করিতে আসেন, তাহা হইলে আমাদের লাভের সম্ভাবনা বড় একটা আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তাঁহার প্রয়োগপ্রণালী আমাদের ধাতুতে খাটিবে না, বরং অসহ্য হইবে। উৎকৃষ্ট বীজ ও উৎকৃষ্ট কৃষকের যত অভাব, উৎকৃষ্ট জমির অভাব তদপেক্ষা অধিক। যদি বা ভাগ্যবশতঃ সদ্‌গুরু মিলে, তথাপি শিষ্যের যোগ্যতার উপর প্রায় সমস্তই নির্ভর করিবে। কি কর্ম্মসাধন, কি জ্ঞানসাধন, উভয়ই সুদীর্ঘকালব্যাপী কঠোর অভ্যাসযোগসাপেক্ষ। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি, আর ইহজন্মের কঠোর সাধনা, এ সকল কেবল একটা অনির্দ্দেশ্য জন্মজন্মান্তরলভ্য ভাব, রূপতা, বা অবস্থাবিশেষের অভিমুখী গতিমাত্র। ইহা গতিমাত্র, ভাবী যোজনার সূত্রপাত নহে; কেননা এপথে পদে পদে পতনের ভয় আছে। এইজন্যই ইহার নাম পরাবিদ্যা। ইনি মিলাইয়া দেন অনন্ত, কিন্তু ভোগাইয়া লন চূড়ান্ত।

তাই একদিন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব প্রসঙ্গক্রমে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার ভাবার্থ এই যে, একালে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, অতএব ভক্তিই প্রশস্ত পথ। তাৎপর্য্য এই যে, নিষ্কাম কর্ম্মী হইতে হইলে কর্ত্তাকে পূর্ব্ব হইতেই বশ্যাবৃতাত্মা হওয়া আবশ্যক। ইহা আর কিছু নহে, স্বল্প পরিমাণে যোগ-শক্তি-সঞ্চয়। পরমহংসদেব ভালরূপই বুঝিয়াছিলেন যে, একালে লোকে ভক্তি যোগ বলিয়া যাহা বুঝে, তাহা গীতোক্ত জ্ঞানলক্ষণ ভক্তিযোগ নহে, পুরাণোক্ত ক্রিয়ালক্ষণ ভক্তি যোগ। ইহা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, সুতরাং ইহাকে কর্ম্ম-যোগ বলাই সঙ্গত। যাহা হউক, আজকাল কদাচিৎ কেহ স্বল্প মাত্রায় যোগ-শক্তি লাভ করিলে যেমন ছট্‌ ফট্‌ করিয়া বেড়ায়, মৌখিক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া কিম্বা দালাল লাগাইয়া শিষ্য সংগ্রহ করিতে বাহির হয়, পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই তখন সেরূপ করিলে তাদৃশ ব্যক্তিকে শাস্তি ভোগ করিতে হইত। বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ দেখিলে আচার্য্য বুঝিতেন যে, শিষ্যের সমাবর্ত্তনের কাল উপস্থিত হইয়াছে, সে এখন জীবনসংগ্রামে টিকিতে পারিবে।

তবেই এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, (১) যখন জ্ঞানসাধন এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার, (২) জ্ঞানলক্ষণ ভক্তিসাধনও তদ্রূপ, (৩) নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধনও নিতান্ত কঠিন, সহস্রের মধ্যে কেহ আংশিক সফলতা লাভে যোগ্য কি না তাহা বিবেচ্য, (৪) জাতীয় চরিত্রের দীপ্তি নিতান্ত ক্ষীণ ; অধিক কথা কি, ইংরাজদত্ত শ্লেষার্থে প্রযুক্ত Mild Hindu (গোবেচারাহিন্দু) উপাধিতে যখন আমরা সুখী, তখন সাধারণ বিশিষ্টের নির্ব্বিশেষে অবলম্বনীয় এমন কোনও উপায় আছে কি না যাহা দ্বারা আমরা আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রতীকার করিতে পারি।

ইহার স্পষ্ট উত্তর নূতন-সৃষ্টি।

কিন্তু যদিও সময় আসিয়াছে তথাপি নূতন-সৃষ্টির উপাদানগুলি এখনও কার্য্যোপযোগী হয় নাই ; অগ্নি-পরীক্ষায় টিকিবে না। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একবার স্মৃতির যুগ আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, ফল হয় নাই। অতএব যাহাতে আমাদের ধাতু বিরুদ্ধগুণের যথোচিত মিশ্রণে কঠিন হইয়া ভাবী অগ্নি-পরীক্ষা সহ্য করিতে পারে, অথবা ধ্বংসকে কিছুকালের জন্য প্রতিহত করিতে পারে, এখন হইতে সেই সাধনায় নিরত হইতে হইবে।

সে সাধনা কি ?

সেটি আর কিছু নহে, যিনি যেখানে আছেন সেইখানে দাঁড়াইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করুন। কথাটি শুনিয়া হাসিবেন না। ইহাতে শঙ্খ-ঘণ্টা-ঢাক নাই সত্য, কিন্তু এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ছোট ছোট কথাগুলি কাযে ফলাইতে গিয়া অনেক জ্ঞানী পণ্ডিত, সন্ন্যাসীকেও আছাড় খাইতে হইয়াছে। অনেক নামজাদা পালোয়াজীর আড়াঠেকার আড়িতে তাল কাটিতে দেখা গিয়াছে। পৃথিবীতে ছোট কথা নাই। কর্ত্তব্যপালনের উপর ধর্ম্ম নাই, ইহা ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের সেবা। ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে ও করাইতে জনক, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠিরাদি হিন্দুসন্তানগণ, তথা লাইকার্গাস্, সোলন, ওয়াশিংটন্ প্রভৃতি যবনসন্তানগণকে জীবনব্যাপী তপস্যা করিতে হইয়াছে। প্রারম্ভঅবস্থায় ইহা সকাম হইবেই, তাহাতে আসে যায় না। কর্ত্তার মুখ্য লক্ষ্য হইবে, কর্ত্তব্যের প্রতি, গৌণ লক্ষ্য

হইবে (যাহা না আসিয়া পারে না)—কামনার প্রতি। এই স্থানটাই কঠিন। অযোগী এই স্থানে আসিয়া পিছলাইয়া পড়িবেন। তবু ইহা গীতার কর্ম্মযোগ নহে; আধার-শক্তির উদ্দীপনা না হইলে সে যোগে অধিকারই হয়। যাহার বিষয় বলা হইতেছে সেটি ঘরোয়া মুষ্টিযোগ। ইহাতে রোগ নির্ম্মূল হয় না সত্য, কারণ কর্ত্তায় কামনা থাকিতে পারে, বা থাকিবেই; কিন্তু, রোগ প্রশমিত হইবে, কারণ ইহাতে কর্ত্তাকে পদে পদে ত্যাগ স্বীকার অভ্যাস করিতে হয়। বিনা ত্যাগে কর্ত্তব্য পালন হয় না। 'আকাশ পবন জল অনল অবনী' যেমন সকলের আশ্রয় এই কর্ত্তব্যপালন-ধর্ম্মও সেইরূপ ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেরই সেব্য।

কর্ত্তব্যপালন-ধর্ম্মে প্রথমতঃ অনর্থের মূল যে বাসনা তাহা থাকিতে পারে। অবস্থাবিশেষে থাকিবেই, কিন্তু তাই বলিয়া হতাশ হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। যেমন ফলের কামনা করিয়া আমগাছ রোপণ করিলে ফল লাভ ব্যতীত আরও কিছু, যথা মুকুলমঞ্জরীর সুগন্ধ এবং গাছের শীতল ছায়া প্রভৃতি বিনাযত্নে লাভ হইয়া থাকে; সেইরূপ মানব নিরবচ্ছিন্ন কর্ত্তব্যের পথে চালিত হইলে, অবান্তর ফলস্বরূপ তাহার আপনা হইতেই ক্রমশঃ কামনা-শূন্যতা লাভ হইবে। কামনাশূন্যতা লাভ হইলেই আত্মা (জীব) পরমাত্মার অভিমুখী হইয়া পড়িবে।

এই কর্ত্তব্যপালন ধর্ম্ম যে জাতির অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে, সে জাতি পৃথিবীর মান্য,—যেমন প্রাচীন যুগের স্পার্টান বা লাকিদেমোনীয় জাতি,বর্ত্তমান কালের ইংরাজ, জর্ম্মন্, সুইস্ প্রভৃতি। পুরাকালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শিক্ষিত ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় দেবতা-মানবের পূজ্য ছিলেন। জগতে তাঁহাদের দ্বিতীয় ছিল না, আর হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের মাটি সে আদর্শের যোগ্য নহে। তবে পুরাতন নূতনের সুকুমার সাজে সাজিয়া আসিতে পারে।

কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, কোন্‌টি কর্ত্তব্য নহে সংশয়স্থলে তাহা বাছিয়া লইবার উপায় জানা আবশ্যক। বুদ্ধিই কর্ত্তব্যনির্ণয়ে পথপ্রদর্শক। বুদ্ধি conscience নহে; তাহা অপেক্ষা গভীর অর্থবোধক শব্দ। কোনও কোনও দার্শনিক ধর্ম্মবুদ্ধি বা conscience এর মৌলিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অতএব বুদ্ধির লক্ষণ কি তাহা জানিতে হইবে।

যখন ইহা করিব কি উহা করিব, ইহা করিব কি করিব না, এরূপ সংশয় মনোমধ্যে উদিত হয়, তখন বিদ্যুৎবৎ ক্ষণস্থায়ী একটি আদেশ,—একটি নিশ্চিত উত্তর,—কি জানি কেমন একটা দিঙ্‌নির্ণায়ক অঙ্গুলি-সঙ্কেত ক্ষণ-প্রভার ন্যায় চিদাকাশে স্ফুরিত হইয়া তখনি আঁধারে লুকাইয়া পড়ে, ইহা বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ হইতে পারে। আরও একটু চিন্তা করিলে বোধ হয় ইহাও স্মরণ হইতে পারে যে, ঐ উত্তর বা অঙ্গুলি-সঙ্কেত যখন মনের অভি-রুচি-অনুরূপ না হয়, যখন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দিক ছাড়িয়া অভিলষিত দিকে মনের ঝুঁকিয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়, তখন মন শত যুক্তির অবতারণা করিয়াও ঠিক্ পূর্ব্বের মত খাঁটি উত্তরটি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। ঐ বিদ্যুৎবৎ অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ বা জ্ঞান-জ্যোতির নিমেষস্থায়ী কম্পন বুদ্ধি হইতে নিঃসৃত। এই বুদ্ধির স্মরণ লইতে হইবে।

কর্ত্তব্যপালনের সহিত চরিত্র-গঠন চাই। দুইটি একত্র সাধিতে হইবে। প্রথমটি বুদ্ধির প্রেরণা দ্বারা, আর দ্বিতীয়টি নীতির প্রেরণা দ্বারা প্রসারিত হইয়া থাকে। চরিত্রের মর্য্যাদাদানে একালের লোক বড়ই উদাসীন। এখন চাকরীতে উপরিলাভ ডাল-ভাতের মত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, নচেৎ সমাজে দাঁড়ান যায় না। কিন্তু এক দিন চরিত্রের আদর ছিল। দ্বাপর ও কলির সন্ধির স্থলে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মহানি ও শূদ্রের ধর্ম্মোন্নতি দেখিয়া ধর্ম্ম-দেবের প্রশ্নে নিখিলতত্ত্বজ্ঞ যুধিষ্ঠির যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা এই :—

"হে যক্ষ! কুল, স্বাধ্যায় বা শ্রুতি ইহার কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব জন্মে না; কেবল একমাত্র বৃত্তই ব্রাহ্মণত্বের কারণ; অতএব ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক বিশেষ-রূপে বৃত্ত রক্ষা করিবেন।" বনপর্ব্ব।

বৃত্ত অর্থে চরিত্র, character। মানব প্রকৃতি যখন নীতির শৃঙ্খলা দ্বারা নিয়-ন্ত্রিত হইতে থাকে তখনই চরিত্রের পূর্ণবিকাশ হয়।

চরিত্র পরম সম্পদ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও কর্ম্মযোগে পোড়াইয়া ইহাকে পা'ন-শক্ত করিয়া লইতে হইবে। কর্ম্মযোগের বল না পাইলে অস-হায় চরিত্র বালির বাঁধ। প্রলোভনের এক ফুৎকারে, দুঃখবিপদের এক ধাক্কায় সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। সেইজন্য গোড়ায় বলিয়াছি যে, সত্য তেজ আর অভয়—মোটামুটি এই তিনটি অপরাজেয় শক্তিকে যথাক্রমে মনে, মুখে,

মস্তিষ্কে, এবং হৃদয়ে ধারণ ও পোষণ করিয়া জগতের সহিত কারবার চালাইতে হইবে। ইহাই কর্ম্ম-যোগে মুক্তিযোগ, নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগলিপ্সুকে প্রথমে এই পথ ধরিতে হইবে। এই পথ ধরিলে যুগপৎ ব্যক্তিত্ব রক্ষা ও সমাজ রক্ষা হইবে; নচেৎ স্বীয় কর্ত্তব্যে প্রতিনিধি লাগাইয়া, সাধন-ভজনের দুন্দুভি বাজাইয়া, অভিরুচিমত কর্ত্তব্যগুলি বাছিয়া লইয়া, কোণে বসিয়া 'ক্রিয়া' করিলে ব্যক্তিত্ব রক্ষা সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কর্ম্মই বাছিয়া বাছিয়া ঠিক মানুষকে ধরে; মানুষের সাধ্য নাই যে, কর্ম্ম বাছিয়া লয়। অতএব যত দিন নূতন না আসিতেছে, ততদিন সমিধ্ সংগ্রহ করিতে করিতে নূতনকে আবাহন করিতে থাক। নূতন সৃষ্টিতে অগ্নি জ্বলিবে, এই সমিধ্ তখন কাজে লাগিবে। তাহা না করিয়া নাশবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া ভাঙ্গিতে যাও, বা রক্ষণবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া গড়িতে যাও,উপাদানের দোষে দুইটার কোনটাও সিদ্ধ হইবে না; মহাত্মা কেশবচন্দ্রসেনপ্রমুখ বাঙ্গালী ভাঙ্গিতে গিয়া কৃতকার্য্য হন নাই; আবার মহাত্মা কৃষ্ণপ্রসন্নসেনপ্রভৃতি গড়িতে গিয়া তুল্যফলই লাভ করিয়াছেন। সে সকল ধর্ম্মসভা, হরিসভা, কালীসভা প্রভৃতি তাহাদের গন্তব্য স্থানে গিয়াছে। গত ত্রিশ বৎসরের বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস ইহার প্রমাণ। কাঁচা হাঁড়িতে অন্নপাক হয় না। কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সঞ্জীবন রসে দেহ মন প্রাণ সিক্ত করিয়া নূতন সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে, এবং সমিধ্ সংগ্রহ করিয়া আগামিগণের জন্য যজ্ঞদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে।

লক্ষ্মী সাত টাকায় বিকাইতেছেন, শিক্ষিতের অন্নকষ্টজনিত আর্ত্তনাদ, বাঙ্গালী হিন্দুর দ্রুতগতিতে বংশক্ষয়; অতএব,

শ্বঃকার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্।
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ, কৃতং বাপ্যথবাকৃতম্॥ কুলার্ণব।

শ্রীগুরুদাস সান্যাল।

শঙ্করাচার্য্য ।

উত্তরে হিমাদ্রি শোভে তুষারাক্ত শিরে,
দক্ষিণে ফেনিল সিন্ধু, সেতু বক্ষমাঝে ।
পূরবে শ্রীক্ষেত্র নীল সাগরের তীরে,
পশ্চিম সমুদ্রকূলে দ্বারকা বিরাজে ।
ভারতের এই চারিদিক আলোড়িয়া,
বেদবেদান্তের তত্ত্ব কার নিষ্কাসন,
বৈদিক ধর্ম্মের জয়-পতাকা লইয়া,
করেছিলে তুমি ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপন ।
জ্ঞানের আলোক আনি ভারতে আবার,
উজ্জ্বল করিয়াছিলে ধর্ম্ম সনাতন,
সেই হ'তে দূরীভূত অজ্ঞানান্ধকার,
জগতে জ্ঞানের জ্যোতি ভাতিছে এখন ।
তুমি সে জগদ্‌গুরু জ্ঞান-অবতার,
তোমার চরণ-পদ্মে কোটি নমস্কার ।

আয় মা !

"আয় মা আয়—
আমার সতী আয় ;
নেচে নেচে, হেসে হেসে,
আনন্দ-উল্লাসে ভেসে,
আমার কোলে আয় ।"

এস মা কুলকুণ্ডলিনী, আমার হৃদয়ে আসিয়া ব'স ! ঐ দেখ মা, শরতের আকাশ নির্ম্মল নীল বিভা বিকাশ করিতেছে, তোমার নীল নয়নের দ্যুতি উহার অনন্ত নীলিমায় যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে । ঐ দেখ মা, শরতের উষা যেন নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত সর্পবিস্তারের অনুকরণ করিয়া ভাস্করের কোটি তন্তুরুচিকে অনন্ত আকাশের কোলে ছুটাইতেছে । ঐ দেখ মা, অপসারিতসলিলা, শারদা-কর্ষণশীর্ণা নদীগর্ভে, পেলবকর্দ্দমবিস্তারের উপর কাশকুসুমের শুভ্র বিকাশ ঘটিয়াছে—যেন বর্ষাদেবী বার্দ্ধক্যের পলিত কেশ ছড়াইয়া অরুণ কিরণের তাপ সহিতেছেন ! আবার ঐ দেখ মা, পল্বলতড়াগে, বাপীবক্ষে নীল জলের উপর কুমুদকহ্লারের রক্তশোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে ; যেন জলদেবী তাম্বূলরাগ-রঞ্জিত সোহাগের অধর ফুলাইয়া মেঘমুক্ত তপনদেবের সহিত ব্যঙ্গ করিতে-ছেন । ঐ দেখ মা, শরতের চন্দ্র নীলআকাশের কোলে ভাসিয়া বিগলিত রজতধারাস্রাবে মেদিনীবক্ষকে,—জলস্থলকে রৌপ্যাবরণে আবৃত করিতেছেন । আবার শরতের সূর্য্য যেন ইন্দুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উষার মুখে অলক্তক ছিটাইতেছেন, ধরাবক্ষে বিগলিতহেমদ্যুতি বিছাইয়া দিতেছেন ; যেন তাহাতেও সাধ মিটিতেছে না, তাই যাইবার সময়ে প্রদোষসুন্দরীর যুগলকপোলে সপ্তবর্ণের কোটি ইন্দ্রধনু আঁকিয়া দিয়া যাইতেছেন । এমন নির্ম্মল রূপের খেলা আর কোন ঋতুতেত ঘটে না ! এমন আলো ও ছায়ার আদান-প্রদান, এমন নানা বর্ণের সম্প্রসারণ ও সংহরণ আরত কোন কালে হয় না । এই সময়ে এস মা, রূপময়ী, লাবণ্যময়ী, শোভাময়ী আমার হৃদয়-আকাশ জোড়া করিয়া আসিয়া বস মা !

শুন শুন উমে,—বিহঙ্গকলকুজন, একবার তোমার গৃধিনীশ্রবণযুগল পাতিয়া শ্রবণ কর। তাহাদের রবে প্রভাতসমীর স্তব্ধ, গগণ কোটি ঝঙ্কারে মুখর—তুমি একবার শুন! শঙ্করি! একবার শুন, দ্বিরেফমালা পদ্মে পদ্মে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুন, শুন, গুঞ্জন রবে কি সোহাগের বার্ত্তা প্রচার করিতেছে—কোন্ রাজার অভয়বাণী ঘোষণা করিতেছে! শুন মা, অর্দ্ধোদয় কাল হইতে উষার মুদিতাহ্লাদ প্রকটক্ষণ পর্য্যন্ত সেফালীসখীসকল কেমন নিঃশব্দ গীত গাহিতে গাহিতে অধোমুখী হইয়া ধরাবক্ষকে চুম্বন করিতেছে। কাহার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার জন্য ফুল্লমুখী সেফালীর এত ব্যস্ততা? শুন মা, নীরস কেতকী কুসুমের কাছে যাইয়া ভ্রমরকুল কি মর্ম্মভেদী বিষাদের গান করিতেছে। অত সৌরভে কণামাত্র রস নাই, ইহা যেন ভ্রমরের বিশ্বাস হইতেছে না, তাই সোৎসাহে সে কেতকীপরাগে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, আর মরুবালুকাপ্রোথিত ক্রমেলকের ন্যায় শুষ্ক পরাগস্তূপে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। আসিবে না মা? এমন কাল, এমন অবসর—রূপরসের এমন খেলার সময়ে আসিবে না মা? এস মা শ্যামা! এই রূপসাগরে তোমার কালো চুলের রাশি এলাইয়া ছড়াইয়া, অরুণ কিরণের সোণার তরঙ্গে শ্যাম দেহযষ্টিকে ভাসাইয়া, দোলাইয়া, নাচাইয়া, কোটিকহ্লারের প্রোস্থিন্ন রক্তদলের উপর অলক্তক রাগরঞ্জিত ছোট-ছোট চরণ দু'খানিকে সাবধানে ফেলিতে ফেলিতে, নীল নয়নের বিলোল কটাক্ষের উপর অসংখ্য খঞ্জন নেত্রকে নাচাইয়া—ভ্রমরমালার লহরীলীলা ছড়াইয়া, কচি-কাঁচ অধরোষ্ঠে কোটি কোটি স্থলকমল ফুটাইয়া—সদা নৃত্যপরা, চপলা, চঞ্চলা বালা,—এস মা!

"নেচে নেচে আয় মা উমা,
আমার কোলে ধেয়ে আয়।"

মা তুমি আমার কন্যা—আত্মজা। আমার সাত সোহাগের সংসার-অঙ্গনে, আমার আসক্তিময় হৃদয়প্রাঙ্গনে নাচ মা শ্যামা! আমার কন্যা-রূপে আত্মজা-শৈলজা-বিরজারূপে নাচ মা! তোমার তাথেই তাথেই নাচের চোটে শত চাঁদনিঙড়ান রাঙ্গা চরণ দু'খানির কনকনূপুর বাজিয়া উঠিবে, আর সেই ঝণৎকারে-ঝণৎকারে চারিবেদের কোটি ঝঙ্কার

শুনিয়া আমার শ্রবণ-মন সার্থক হইবে। নাচ মা! মা তুমি আমার আত্মজা কন্যা বট, জননী মাতাও বট। তোমায় যখন জাগাইয়া তুলিয়া আমার ষট্‌চক্রের পদ্মে পদ্মে তোমাকে নাচাইয়া খেলাইয়া বেড়াই তখন তুমি আমার কন্যা—আত্মজা-বিরজা। যখন তোমার প্রভাবে মাতৃজঠরে আমি নরাকারে পরিণত হই, তখন তুমি জননী—জগন্ময়ী। আমার পালন-পোষণে তোমায় মাতৃত্বের বিকাশ, আমার আমিত্বের প্রসাধনে প্রহ্লাদনে তোমার কন্যারূপের বিকাশ। যখন তুমি মাথায় উঠিয়া ব'স, আপনার ঘর আপনি বাছিয়া লও, তখন মা ও মেয়ে এক হইয়া যায়। তখন মাও মা, মেয়েও মা হয়। মা ও মেয়েকে এক করিব বলিয়াই আজ শরতের দেবী-পক্ষে, প্রতিপদের প্রথম সূচনায় তোমায় জাগাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। উঠ মা! উঠ-উঠ আমার সুখময়ী, স্নেহময়ী, ভাবময়ী, জ্ঞানময়ী, প্রাণময়ী কন্যা আমার—উঠ—উঠ। আমার দেহব্রহ্মাণ্ডের সুমেরু কুমেরু ঘুরিয়া, পর্ব্বে পর্ব্বে ছুটিয়া ছুটিয়া পর্ব্বতবাসিনী শৈলসুতা শ্যামা, উঠ মা! তুমি উঠিলে, সবাই উঠিবে, তুমি জাগিলে সবাই জাগিবে। উঠ মা!

"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ বস্তু,
সদসৎ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য সা শক্তিঃ,
সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥"

এই নিখিল বিশ্বচরাচরে সৎ বা অসৎ যা কিছু আছে বা থাকিতে পারে সে সকলের তুমিই শক্তি—তুমিই সর্ব্বময়ী, সর্ব্বাণী; তোমার আবার স্তব কি করিব মা?

"বর্ণরূপেণ সা দেবী।
জগদাধাররূপিণী॥"

তুমি বর্ণময়ী—সর্ব্ববর্ণাত্মিকা, সুতরাং এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আধাররূপিণী।

"আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবীম্
শক্তিমাদ্যাস্বরূপিণীম্।"

স্বীয় আত্মাকেই দেবীরূপে জ্ঞান করিবে, কেননা তিনিই সকল শক্তির আদ্যাস্বরূপা। তুমি শক্তিমান্, কেন না তুমি সজীব; সেই শক্তি তোমার

জীবাত্মা; সেই আত্মা জগন্ময়ী মা—উমা, শ্যামা, গৌরী। তাই চণ্ডীতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং
ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি,
ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥"

অতএব আমি ছাড়া ত তুমি নও, তুমি ছাড়াও আমি নহি। তাই তুমি জাগিলে আমি জাগি, আমি জাগিলে তুমি জাগিবে। আমি জাগিলে আমার অনন্ত অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠিবে, তুমি জাগিলে তোমার নূপুরের ধ্বনিতে চারিবেদ ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে। বেদের ঝঙ্কার হইলে আমার স্মৃতির উন্মেষ ঘটিবে আমি জাগিতে পারিব—কোটি কল্পের সুখদুঃখের সম্ভার মাথায় করিয়া আমি জাগিয়া উঠিব।

তাই বলি, উঠ উঠ আত্মময়ী মা আমার, উঠিয়া বস। আর ঘুমাইওনা মা, আর সম্মূঢ়া থাকিও না। মূলাধার হইতে উঠিয়া মা আমার হৃদয়ে আসিয়া ব'স। কেমন মা তুমি?

"তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা।
প্রসুপ্তভুজগাকারা সার্দ্ধত্রিবলয়াম্বিতা॥"

এই কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া তুলিয়া নাচাইতে পারিলে মায়ের আগমনী ও বোধন সিদ্ধ হয়। ভিতরের মা জাগিলে বাহিরের মা জাগিয়া উঠেন; তখন ভিতর ও বাহির এক হইয়া যায়; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেহভাণ্ডের মধ্যে বিলীন হয়, দেহভাণ্ড বিশ্বভাণ্ডে লয় পায়। তাই আবার বলি, আয় মা আয়—আমার সতী আয়—আমার উমা আয়! কোথায় লুকাইয়া আছিস, আমি অন্ধ-জড়-পাষাণবৎ—তাহাইত দেখিতে পাই না। তুমি দেখা না দিলে আমিত দেখিতে পাইব না, তুমি ভাব জাগাইয়া না তুলিলে আমিত ভাব-সাগরের মহিমা বুঝিতে পারিব না।

"ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥"

কি বলিব মা—বলিবার কথা নহে—বলিতে পারা যায় না। তাহা

তোমার কাছে মূক, ভাব তোমার কাছে স্থবির, সর্ব্বময়ী ঈশানী, তোমার ত বর্ণনা সম্ভবে না। জানি বটে তুমি মা; তুমি আছ তাই আমি আছি। মা থাকিতে মায়ের ছেলে আমিত মরিব না। মরিব না, মরিতে পারি না বলিয়াই তোমাকে জাগাইয়া নাচাইয়া আমার জীবনসুখ আমি উপভোগ করি। সে সুখে বাদ সাধিও না। তুমিইত বলিয়া রাখিয়াছ,—

"অহমেব স্বয়মিদং বদামি,
জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি,
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥

তাই আশা হয়, তুমি জাগিবে; ভরসা হয়, তুমি আসিবে; আকাঙ্ক্ষা হয়, তুমি দেখা দিবে; সাধ হয়, তুমি কন্যারূপে ফুটিবে; বাসনা হয়, তুমি নাচিবে।

ইহাই শাশ্বতী পরমা শক্তির বোধন।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

শারদোৎসব।

উর্দ্ধে সমুজ্জ্বল সূর্য্য চন্দ্র তারাহারে,
হাসে স্বচ্ছ নীলাকাশ যেন দীপ্ত মণি;
নিম্নে শোভে বসুন্ধরা নানা ফুলভারে,
তব উদ্বোধনে আজি হে বিশ্বজননি!
এস দুর্গে দশভুজে দশ প্রহরণে
সাজিয়ে অপূর্ব্ব সাজে মহিষমর্দ্দিনী;

সঙ্গে লয়ে গণনাথে শিখণ্ডীবাহনে,
দক্ষিণে কমলা, বামে বাণী বিমোহিনী !
শারদ আশ্বিনে উমা ! পূজার মহিমা,
চিরদিন বিশ্বে, মাগো, হৃদয়-মন্দিরে !
ধ্যানে ধারণার তরে ওমহাপ্রতিমা !
ঝলে রাঙা পা দুখানি আলোকে তিমিরে
যুগে যুগে, জন্মে জন্মে, এ বঙ্গ আদরে
দিবে পূজা মহামায়া, মহাভক্তিভরে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

জগদম্বার প্রধান আহার।

শ্রীশ্রীজগন্মাতার মহাপূজা আগতপ্রায়। ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকে নানাবিধ উপহারের দ্বারা তাঁহার আরাধনার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তন্মধ্যে যাঁহারা ভক্তি-বিশ্বাস-শূন্য হৃদয়ে কেবল সামাজিকতা বা লৌকিকতা, বা নিজের বালকোচিত বা পশূচিত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য দুর্গোৎসব ব্যাজে স্বেচ্ছাচার করিবেন, তাঁহাদের জন্য আমাদের কিছুই কর্ত্তব্য নাই। যাঁহারা ভবৌষধের ভোলাদাসের ন্যায়, ভক্তিসুধালহরীর তারাপদ ও কালীচরণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ মহাভাগগণের মত মাতৃদর্শনানন্দ অনুভবের জন্য ব্যাকুল হইয়া সমতানে, সমস্বরে, 'কায়মনোবাক্য' একত্র করিয়া প্রাণপণ যত্নের সহিত মায়ের আরাধনার আয়োজন করিতেছেন, মায়ের কিরূপ অর্চনা করিলে ঠিক বেদোক্ত-বিধি-বোধিত হইবে, কিরূপ উপহারাদি সমর্পণ করিলে জগদম্বা-

তার কটাক্ষ নিপতিত হইবে, কি ভাবে আরাধনা করিলে প্রকৃত পক্ষেই তাঁহার হৃদয় কৃতার্থম্মন্য হইতে পারিবে,এরূপ জিজ্ঞাসা সতত যাঁহাদের হৃদয়ে জাগিতেছে, কেবল তাঁহাদের প্রতি যথাজ্ঞান কিছু বলা অত্যন্ত আবশ্যক বা উপযুক্ত মনে করি ; সেইজন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা এবং প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ জ্ঞানী মহাত্মাগণের সংসর্গের অভাবে ভগবদারাধনাদি অনুষ্ঠান সংপ্রতি যেরূপ কদর্য্যতাময় অন্ধ-কূপে নিমজ্জিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের সমক্ষে আরাধনার বিষয় উপ-স্থিত করিলে দেবতার তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত আরাধনা-তত্ত্বই প্রকাশ করিতে পারিলে কিছু উপকার হওয়ার আশা করা যায়, কিন্তু সে ক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ ; তাহা এই ক্ষুদ্রায়তন পত্রিকার উদরে স্থান পাইতে পারে না। আমাদের জ্ঞান অনুসারে, আমাদের দ্বারা এবং অন্যের দ্বারাও তাহার অনেক বিষয় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু মায়ের একটী মুখ্য উপহারের তত্ত্ব আমরাও কুত্রাপি বলি নাই, অন্য কোনও মহাত্মা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। অতএব এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে।

জগন্মাতার ভোগের উপহার বিষয়ে শ্রুতির পর্য্যালোচনার দ্বারা আমরা যত দূর বিদিত হইতে পারিয়াছি,তাহাতে রুধিরই যে উৎকৃষ্টতম, এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভোগ্য, ইহা বিশ্বাস করিতে হইতেছে। অন্যান্য নৈবেদ্যাদি যে সকল ভোগ্য দ্রব্য প্রদান করা হয়, তাহা তাঁহার আপেক্ষিক নিকৃষ্ট এবং পরম্পরা সম্বন্ধে ভোজনীয় পদার্থ, ইহা বুঝিতে পারা যায়। এ স্থলে জগন্মাতা কথাটী পরমেশ্বরের উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। জগন্মাতৃত্ব এবং জগৎপিতৃত্ব এই উভয়শক্তিসমন্বিত স্বপ্রকাশ চৈতন্যসমুদ্রের নাম পরমেশ্বর। তন্মধ্যে কেবল মাতৃত্বের আশ্রয় লইয়া যখন সেই চিন্ময়-সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য করা হয়, তখন তাহাকে জগন্মাতা বা পরমেশ্বরী বলা হয়, কালী দুর্গা তারা প্রভৃতিও তাঁহা-রই নাম। আর পিতৃত্ব-শক্তির মধ্যে মনোনিবেশ পূর্ব্বক যখন সেই স্বপ্রকাশ পদার্থ লক্ষিত হয়, তখন তাঁহাকে জগৎপিতা পরমেশ্বর এবং সদাশিব, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। "উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং। ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমব্যয়ং তৎপরি-

পশ্যন্তি ধীরাঃ।" ইত্যাদি শত শত শ্রুতিমুখে এ বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। এই মাতৃপিতৃশক্তি হইতেই বিশ্বের আবির্ভাব তিরোভাব হইয়া থাকে। জগতের মধ্যে যত প্রকার শক্তির লীলা-খেলা দেখিতেছ ইহাও সেই পিতৃ-মাতৃ-শক্তিদ্বয়ই সংঘর্ষণের ফলস্বরূপ, জীবগণের মধ্যে যে প্রাণশক্তি, জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তির ব্যাপার লক্ষিত হয়, ইহাও সেই মাতৃ-পিতৃ-শক্তি হইতেই সঞ্জাত। অতএব লক্ষ্য বা বিশেষ্য বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখিলে পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরীর কোন অংশেই প্রভেদ নাই, আবার চিন্তার আলম্বনীভূত মাতৃ-পিতৃত্বের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে লক্ষ্য করিলে মাতা আর পিতাকে ভিন্ন ভিন্নও বলা যায়; প্রকৃত পক্ষে জগন্মাতৃত্ব আর জগৎপিতৃত্ব এক পদার্থেরই বামাঙ্গ ও দক্ষিণাঙ্গস্বরূপ। একটী নদী যেরূপ অনেক স্থলে দুই ধারায় পরিণত হয়, সেইরূপ অনন্তমাতৃত্বপিতৃত্ববান্ এক স্বপ্রকাশ চিতিসমুদ্রই মাতৃত্ব-প্রধান আর পিতৃত্ব-প্রধান এই দুই ধারায় ব্যবচ্ছিন্নভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়া জগন্মাতা আর জগৎপিতা এই ভিন্ন ভাবের নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। আবার একত্র করিয়া দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে একবাক্যে মাতা, পিতা বা অর্দ্ধনারীশ্বর বলা হয়। ইহাও শ্রুতি বলিতেছেন,—"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ, সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ, সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ, ততোঽহং নামাভবত্তস্মাদপ্যেতর্হি আমন্ত্রিতোঽহময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বা অথান্যন্নাম প্রব্রূতে যদস্য ভবতি স যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষ ওষতি হ বৈ স তং যোঽস্মাৎ পূর্ব্বো বুভূষতি য এবং বেদ। সোঽবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি স হায়মীক্ষাঞ্চক্রে যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ধ্যভেষ্যৎ দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি। স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।" অতএব জগন্মাতা কথার মধ্যেও জগৎপিতা অন্তর্নিহিত থাকেন; আবার জগৎপিতা কথার মধ্যেও জগন্মাতা অন্তর্নিহিত থাকেন; অতএব একটীকে আর একটীর উপলক্ষণ বলা যায়। কাজেই এখন বুঝিতে হইল, পরমেশ্বরপরমেশ্বরী বা নারায়ণনারায়ণী উভয়েরই মুখ্যতম ভোগের দ্রব্য শোণিতরাশি, আর অন্যান্য দ্রব্যমাত্রই

উভয়ের নিকৃষ্ট ভোগ্য দ্রব্য, ইহাই শ্রুতিকুলের সম্রাট বা সর্ব্বশ্রুতির খনিস্বরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে আগত "ইন্ধোহবৈ নাম এষ যোহয়ং দক্ষিণে হক্ষন্ পুরুষস্তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্রইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব পরোক্ষ প্রিয়া-ইবহিদেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ। অথৈতদ্বামেহক্ষিণি পুরুষরূপ মেষস্য পত্নী বিরাট্ তয়োরেষ সংস্তাবো যত্রেষো হন্তর্হৃদয়ে আকাশো হথৈনয়ো রেতদন্নং যত্রেষো হন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ, অথৈনয়ো রেতৎ প্রাবরণং যদেতৎ অন্তর্হৃদয়ে জালকমিব" ইত্যাদি।

পাঠক! শ্রুতির সুদারুণ সিদ্ধান্ত তো শুনিতে পাইলে, লোহিত (শোণিত) নারায়ণনারায়ণীর অন্ন এ কথা শ্রুতিমুখে বিদিত হইলে, এখন কি করিবে? প্রসন্নচিত্তে ছাগাদি বলিদান করিয়া নারায়ণনারায়ণীকে কবোষ্ণ রুধির দান করিতে পারিবে কি? রুধির উপহারের অপবিত্রতা ভ্রম অপনোদিত হইবে কি? হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য বশতঃ পশুহিংসার পাপের আশঙ্কা দূর করিতে পারিবে কি? তাহা তোমাকে অবশ্য করিতে হইবে; যদি না কর তবে তুমি বেদ বিশ্বাস করিতে পারিলে না, বেদে বিশ্বাসীকে আস্তিক বলে, "আস্তিক্যং বেদবিশ্বাসঃ"; আর তাহা না হইলে তাহাকে নাস্তিক বলে। বেদে অবিশ্বাসী হইলে তুমি চার্ব্বাক বৌদ্ধাদির ন্যায় নাস্তিক মধ্যে পরিগণিত হইবে, অহিন্দু বলিয়া আখ্যাত হইবে। এরূপ তিরস্কার কখনই কোন হিন্দু-সন্তানের পক্ষে সহনীয় নহে।

কোন কোন পুরাণে "সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ" ইত্যাদি উক্তির দ্বারা মাংস-শোণিত-বর্জ্জিত উপহারকে সাত্ত্বিক উপহার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং "রাজসী মাংসশোণিতৈঃ" ইত্যাদি উক্তির দ্বারা মাংসশোণিতকে রাজস পূজার উপহার বলা হইয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু ঐ উক্তি সম্ভবতঃ জ্ঞানী উপাসকদের নিমিত্ত নহে, উহা সাধারণ লোকের সহজ জ্ঞানের অনুবাদ মাত্র। কারণ মাংস বা শোণিত ফলমূলাদির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত নহে অর্থাৎ রম্ভা পনস আম্র নারিকেল হরিতকী ভল্লাতকী আমলকী প্রভৃতি ফল বা মূলক গৃঞ্জন পলাণ্ডু হরিদ্রা আর্দ্রক শটী প্রভৃতি মূল, গজদন্তী শখালু শর্করকন্দ প্রভৃতি কন্দ যেরূপ সাত্ত্বিক রাজসাদি ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের দ্বারা নির্ম্মিত, একারণে পরস্পর ভিন্ন দ্রব্য

ও ভিন্ন ফলপ্রদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; মাংসশোণিতও সেইরূপ। ঐ সকল বস্তু হইতে কোনও বিভিন্ন বস্তুর দ্বারা নির্ম্মিত পদার্থ নহে, যদ্দ্বারা উল্লিখিত ফলমূলাদির সহিত তুলনা করিয়া মাংসশোণিতসামান্যের সাত্ত্বিকতাদির নির্ণয় করা যাইতে পারে। উপাদান পরীক্ষায় যেরূপ কদলী রেবলী প্রভৃতি সাত্ত্বিক, জম্বীর জম্বরস প্রভৃতি ফল রাজস, মূলক প্রভৃতিকে সাত্ত্বিক ও পলাণ্ডু প্রভৃতিকে সামান্যতঃ রাজস তামস পদার্থ বলা গিয়া থাকে, মাংসশোণিত সামান্য সেরূপ সাত্ত্বিক বা রাজস পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত নহে, উহা ফল মূলাদিরই অবস্থান্তর মাত্র। মনুষ্যাদি প্রাণিগণ ফলমূলাদিস্বরূপ আম বা পক্ব অন্ন ব্যঞ্জনাদি যাহা কিছু ভোজন পান করে তাহাই উদরসাৎকৃত হইয়া রসাদিক্রমে শোণিতরূপে পরিণত হয়, তৎপরে শোণিতই আবার মাংস অস্থ্যাদিরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কাজেই আতপ তণ্ডুল, সিদ্ধ তণ্ডুল বা কদলী জম্বীরাদির উপাদান আর রুধিরের উপাদান ভিন্ন পদার্থ নহে। যাহারা অন্নমাত্র ভোজী, তাহাদের রুধিরে অন্নের উপাদান ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থ থাকে না; যাহারা রম্ভাফলমাত্র ভোজী, তাহাদের রুধিরে রম্ভাফলের উপাদান ব্যতীত অন্য পদার্থ থাকে না, কাজেই আতপ অন্ন সাত্ত্বিক হইলে তদ্ভোজীর রুধিরও সাত্ত্বিক পদার্থ, আর উহা রাজস হইলে উহার রুধিরও রাজস পদার্থ বলিয়াই পরিগণিত হইবে। অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধেও এরূপ ব্যবস্থাই ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু আতপ তণ্ডুল আর গব্য ঘৃত সাত্ত্বিক পদার্থ, আর তদ্ভোজীর রুধির রাজস বা তামস পদার্থ, আর পলাণ্ডু প্রভৃতি রাজস তামস পদার্থ, তদ্ভোজীর রুধির সাত্ত্বিক পদার্থ, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে; তবে অবশ্যই খাদ্য বস্তুর মধ্যে মনুষ্যাদি শরীরের অনুপযোগী যে সকল পদার্থ থাকে তাহা মলমূত্রাদির আকারে নিঃসৃত হইয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া রুধির রাজস আর খাদ্য দ্রব্য সাত্ত্বিক ইহা কখনই হইতে পারে না। আতপ তণ্ডুল গব্য ঘৃতের মধ্যে যদি সাত্ত্বিক পদার্থ অধিক থাকে তবে তদ্ভোজী মানবগণের মলমূত্রাকারে সেই সাত্ত্বিক পদার্থ নির্গত হইয়া যাইবে; আর রুধিরের মধ্যে রাজস তামস পদার্থ থাকিবে ইহা নিতান্তই হাস্যকর বিষয়। বরং ইহাই বলা সঙ্গত যে, যে সকল পদার্থ মলমূত্রাদির আকারে নির্গত হয় তাহাই রাজস তামস, আর যাহা শরীরের উপযোগীরূপে রুধিরে

পরিণত হয় সেই টুকুই অপেক্ষাকৃত সাত্ত্বিক হইতে পারে ; অতএব রুধির রাজস আর আতপতণ্ডুল গব্যঘৃত সাত্ত্বিক, এরূপ বিবেচনা করা মনীষিতার পরিচায়ক নহে।

প্রকৃতপক্ষে রুধিরমাত্রই সাত্ত্বিক, রাজস বা তামস পদার্থ হইতে পারে না। প্রাণিগণের আভ্যন্তরিক অবস্থাভেদে উহা সাত্ত্বিকাদি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। মনুষ্যাদি প্রাণিগণ শাক মূল ফলাদি যাহা কিছু ভোজন করে তাহার সমস্তই সত্ত্বাদি ত্রিগুণবিশিষ্ট বা এক দুই গুণ বহুল হইলেও ঠিক তদনুসারেই যে সকল প্রাণীর শরীরে সেই মত ভাবে সংগৃহীত হয় তাহা নহে অর্থাৎ সত্ত্ববহুল কোন পদার্থ ভোজন পান করিলে যে সত্ত্ব বহুল পদার্থই সকল প্রাণীর শরীরে সংগৃহীত হইবে তাহা নহে। আর রজোঽধিক পদার্থ ভোজন করিলে রজোঽধিক পদার্থই সকল দেহে আত্মসাৎকৃত বা তমোগুণাধিক পদার্থ ভোগ করিলে সকল দেহেই তমোঽধিক পদার্থ গৃহীত হইবে এমত কোন নিয়ম নাই। ভোগ্য বস্তু মাত্রই সাত্ত্বিক, রাজস বা তামসান্তর্গত বহুবিধ পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত, তাহার ভাগের তারতম্যেই কেবল দ্রব্যগুলিকে সাত্ত্বিকাদি নাম দেওয়া হয়। যাহাতে সত্ত্বাধিক পদার্থ অধিক থাকে, তাহাকে সাত্ত্বিক ; আর যাহাতে রজঃ অধিক, তাহাকে রাজস ; যাহাতে তমোবাহুল্য, তাহাকে তামস খ্যাতি দেওয়া যায় ; কিন্তু কেবল সাত্ত্বিক, রাজস বা তামস বলিয়া কোন পদার্থই নাই—"ন তদস্তি পৃথিব্যাং হি দিবি দেবেষু বা পুনঃ, সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্ম্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভিগুর্ণৈঃ।" কাযেই সাত্ত্বিক পদার্থের মধ্যেও রাজস তামস পদার্থ আছে, আর রাজস তামস পদার্থের মধ্যেও সাত্ত্বিক পদার্থ আছে, ইহা শাস্ত্রের স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত। এইরূপে একাধিক বা একন্যূন বা সম ত্রিগুণসম্পন্ন কোন দ্রব্য ভোগ করিলেও প্রাণিগণ নিজ নিজ আভ্যন্তরিক শক্তি অনুসারে খাদ্য বস্তু হইতে বিবিক্ত বিবিক্ত রূপে পদার্থ সংগ্রহ করে, তাহাই রুধির ও মাংসাদির উপাদানরূপে গণ্য হয়। একারণেই এক প্রাণীর যাহা মলমূত্রাদিরূপে পরিণত হয়, অন্য প্রাণীর তাহা পরমাদরের সহিত ভুক্তপীত হইয়া শরীরে পরিগৃহীত হয়। এজন্য প্রতি-প্রাণী-শরীরেই রুধিরাদি পদার্থের সাত্ত্বিকাদিরূপে ইতর বিশেষ আছে, মাংসেরও তারতম্য আছে। কোন প্রাণীর রক্ত মাংসে সাত্ত্বিক পদার্থ অধিক

পরিমাণে সংগৃহীত হয়,কাহারও বা রাজস, কাহারও বা তামস অধিক প্রকারে গৃহীত হয়। এইরূপ রুধির ও মাংস সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ; তন্মধ্যে যে রক্তমাংসাদি ঘোরতর রজোগুণ বা তমোগুণসম্পন্ন বা মানুষের পক্ষে বিষাক্ত বলিয়া পরিগণিত যেমন শৃগাল কুক্কুর কাক শকুনাদির রুধিরাদি, তাহা মানুষের পক্ষেও বর্জ্জনীয় এবং তাহা দেবতাকেও অদেয় বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। আর যে সকল রুধিরমাংসাদি সত্ত্বগুণবহুল, তাহাই দেবতাকে দানপূর্ব্বক মনুষ্যগ্রাহ্য বলিয়া শাস্ত্রে আদেশ করিয়াছেন। স্মরণ পড়ে, আয়ুর্ব্বেদান্তর্গত সুশ্রুত হরিণমাংসাদিকে সাত্ত্বিক মাংস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব রুধির মাংস হইলেই রাজস তামস উপহার হইল এরূপ কথা অনুমোদনের যোগ্য নহে। তথাপি অজ্ঞতাপ্রযুক্ত হৃদয়দৌর্ব্বল্য বশতঃ রুধিরমাংসাদিকে দৃষ্টহিংসাপ্রসূত বলিয়া সাধারণ লোকেরা উহাদিগকে রাজস, তামস আর আতপ চাউল গব্য ঘৃতাদিকে হিংসাপূর্ব্বকতা স্থূলদৃষ্টিতে বুঝিতে না পারিয়া সাত্ত্বিক উপহার বলিয়া থাকে। এই সাধারণ দৃষ্টির অনুবাদ করিয়াই কোন কোন পুরাণ রুধিরমাংসাদিকে রাজস উপহার, আর ঘৃতান্নাদিকে সাত্ত্বিক উপহার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন। যদি তাহা না হয়, তবে ঐ সিদ্ধান্ত বেদবিরুদ্ধ এবং প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বিধায় সর্ব্বথা অগ্রাহ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; "বেদোঽখিলং ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলেচ তদ্বিদাং" বেদবিরুদ্ধ সহস্র পুরাণ তন্ত্রাদি উপস্থিত হইলেও তাহা তুচ্ছ তৃণাদির ন্যায় উপেক্ষনীয়। কাযেই বেদ যখন রুধিরকেই পরমেশ্বরপরমেশ্বরীর উত্তমান্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন বেদপথানুসারী বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিতে হইলে তাহাকে রুধির উপহার দান করিতেই হইবে।

আমরা ভারতবাসী আর্য্যসন্তান, বেদই আমাদের মূলধর্ম্মশাস্ত্র, বেদের শাসন শিরোধার্য্য করিয়াই আমাদের চলিতে হয়, তাহার কারণান্বেষণ করা বা অন্যকারণ বুঝিয়া তাহার আদর করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে, তাহা করিলে কারণেরই সম্মান করা হয়,বেদশাসনের নহে। তবে নাস্তিকগণের জন্য বৈদিক শাসনের জ্ঞান বিজ্ঞান অন্বেষণ করা অসঙ্গত নহে, আমরা সেই ক্ষেত্র হইতেই এই বিষয়ের প্রমাণের জন্য একটী সত্যজ্ঞানের চিত্র করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কেবল শ্রুতির সিদ্ধান্তে নির্ভর না করিয়া পরীক্ষিত জ্ঞানের সহিত ঈশ্বর-তত্ত্বের অন্বেষণ করিলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, জীবের মধ্যে দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান ও গমনপরিচালনাদি শক্তির স্ফুরণ বা হৃদয়স্থ প্রাণের ক্রিয়ার আবির্ভাব প্রভৃতি যে সকল বিশেষ বিশেষ পরিস্ফূর্ত্তি দেখা যাইতেছে, তাহার অন্তরালে যাবৎ শক্তির সামান্যাবস্থাস্বরূপ অসীম অনাদি অনন্ত শক্তিসমুদ্র বিরাজ করিতেছে। সামান্যাবস্থাপন্ন সমুদ্রাকার পরিব্যাপক তাড়িৎ-তরলের বক্ষে বহুবিধ কারণের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবের তাড়িৎ শক্তি পরিস্ফুরিত হইয়া অসংখ্য প্রকারের লীলা খেলা সম্পন্ন করিতেছে, সেইরূপ সামান্যাস্থাপন্ন অসীম জ্ঞানশক্তির সমুদ্রবক্ষে যথোচিত কারণের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান শক্তি পরিস্ফুরিত হইয়া দর্শন শক্তি, স্পর্শ শক্তি, ইত্যাদি নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে, সেইরূপেই অপরিসীম সামান্যাবস্থা-পন্ন, ক্রিয়াশক্তি সামান্যরূপ সমুদ্রের বক্ষে উপযুক্ত কারণের সহায়তায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ক্রিয়াশক্তি পরিস্ফুরিত হইয়া বিশেষ ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক জীবগণের গমনপরিচালনাদি ক্রিয়া সাধন করিতেছে, সেইরূপেই অপরিচ্ছিন্ন অনাদ্যনন্ত প্রাণশক্তি সামান্যরূপ সমুদ্রের বক্ষে নিয়ত কারণের সাহায্যে বিশেষ ভাবাপন্ন বিশেষ বিশেষ প্রাণশক্তির আবির্ভাব হইয়া প্রতিদেহের হৃৎপিণ্ড, ফুপ্‌ফুস, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র পাকস্থলী, যকৃৎপ্লীহাদি প্রাণযন্ত্রের ক্রিয়া সাধনদ্বারা প্রতিশরীরের নির্ম্মাণ, পুষ্টি, রক্ষা বিধান করিয়া জীবের জীবত্ব স্থির রাখিতেছে। অসীম অনন্ত চৈতন্যালোকে দেদীপ্যমান ঐ শক্তি-সামান্যের সমুদ্রই পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরীর শরীর, তাদৃশ শরীরবান্ সেই অনন্তচিৎরূপই পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী। সেই জন্য শ্রুতি তাঁহাকে নয়নের নয়ন শ্রবণের শ্রবণ, মনের মন, বাকের বাক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অন্য কোনওরূপ ঈশ্বর শাস্ত্র বা কোনরূপ প্রমাণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না। বাহ্য জগতের তাপ, তড়িৎ বা বর্ণ এবং তাপাদির সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ আছে, উল্লিখিত শক্তিসামান্যের সঙ্গে পূর্ব্বকথিত মাতৃপিতৃ-শক্তিরও ঠিক সেইরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ অনুমিত হয়। শরীরতত্ত্বাদির পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের দর্শনশ্রবণাদি প্রত্যেক জ্ঞানশক্তি যেন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিবিধ শক্তির দ্বারা অনুস্যূত বা অধীনতা-প্রাপ্তভাবে কার্য্য

করিতেছে। আমাদের দক্ষিণ নয়নে যে দর্শন শক্তি ক্রিয়া করে, তাহা যেন বামনয়নস্থিত দর্শন-শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিনী, আবার বামনয়নে যে ক্রিয়া করে, তাহা যেন দক্ষিণনয়নস্থিত দর্শনশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিনী বলিয়া বিবেচিত হয়। নয়নের যেন পরস্পর দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্ব চলিতেছে, যেন এক নয়নস্থ দর্শনশক্তিকে পরাভূত করিয়া অপর নয়নস্থ দর্শনশক্তি ক্রিয়া করিতেছে—এরূপ মনে হয়। শ্রবণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং করচরণাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এইরূপই অনুমিত হয়, ফুপ্ফুসাদি সম্বন্ধেও এইরূপ ভাবেরই যোজনা করা যাইতে পারে। মোট কথা, আমাদের শরীরকে বাম দক্ষিণার্দ্ধে সমানভাবে চিড়িয়া লইলে ইহাই বিবেচিত হয় যে, দক্ষিণ ভাগে যতগুলি শক্তি ক্রিয়া করে, তাহা যেন বাম ভাগের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, আর বামভাগে যে সকল শক্তি ক্রিয়া করে তাহা যেন দক্ষিণ ভাগের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া স্বস্বভাগের কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেছে। মনে হয়, যেন এই কারণেই শরীরের যাবৎ যন্ত্রগুলি দ্বিগুণ দ্বিগুণ ভাবে রচিত হইয়াছে। কাজেই এই সকল শক্তির মূলে দ্বিবিধ শক্তি রহিয়াছে, ইহা অনুমান করা সঙ্গত। সেই দ্বিবিধ শক্তি মাতৃ-পিতৃ-শক্তি নামে খ্যাত। কাজেই শক্তি-সামান্ত নাম না করিয়া সেই মাতৃ-পিতৃ শক্তির সমূহকেই ভগবান্ ও ভগবতীর শরীর এবং তদ্যুক্ত চৈতন্তকেই ভগবান্ ও ভগবতীর আত্মা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শরীরের মধ্যে যত প্রকার শক্তির ক্রিয়া হয় তৎসমস্তই জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তির রূপান্তর। তাহা সকলই প্রাণশক্তির অধীন, প্রাণশক্তি তাহাদের রাজা, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রাণশক্তির মুখ্য ক্রিয়াভূমি আমাদের হৃৎপিণ্ড; হৃৎপিণ্ডের মধ্যে সেই ব্যাপক মাতৃপিতৃশক্তির কোলে কোলে অবস্থিত প্রাণসামান্ত হইতে, প্রাণশক্তি পরিস্ফুরিত হইয়া জীবনব্যাপার সাধন করিয়া থাকে। এই ব্যাপারের প্রথম ক্রিয়াক্ষেত্রে আমাদের হৃৎপিণ্ডস্থ রুধির, রুধিরকেই আত্মসাৎ করিয়া প্রাণদেবতা আপ্যায়িত হইতেছেন এবং সেই ব্যাপারের দ্বারা তাহাকে ভোগ করিতে করিতে শিরাপথে, সর্ব্ব শরীরে ছড়াইয়া দিয়া প্রাণদেবতা নিজেই সর্ব্বশরীরব্যাপিনী হইয়া রুধিরের সারাংশ গ্রহণ ও ধমনীপথে অসারাংশের বিমোচন করিয়া সমাপ্যায়িত হইতেছেন; এবং সেই সমাপ্যায়নের দ্বারাই জীবগণের পোষণ এবং জ্ঞানপরিচালনাদি

সর্ব্ববিধ ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। কাযেই রুধিরই প্রাণদেবতার মুখ্য অন্ন, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র প্রাণদেবতার আশ্রয়-ভূমি মাতৃপিতৃশক্তি হইতে অভিন্ন প্রাণসামান্যরূপ ব্যাপক প্রাণদেবতারও এই রুধির মুখ্য অন্ন হইল, ইহা এখন বলা অতিরিক্ত মাত্র। ইহা লক্ষ্য করিয়াই বৃহদারণ্যক শ্রুতি মাতৃপিতৃত্ববিশিষ্ট পরমেশ্বরের মুখ্য আহার এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আর অন্নব্যঞ্জনাদি তাহার গৌণ অন্ন। কারণ অন্নই হউক আর ব্যঞ্জনই হউক আর যাহাই হউক যতক্ষণ তাহা রুধিররূপে পরিণত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণদেবতা তাহা গ্রহণ করিলেন এ কথা বলা যায় না। যাহা কিছু উদরসাৎ করা যায় তৎসমস্তই রুধিররূপে পরিণত হইলে তাহাই পান করিয়া প্রাণদেবতা আপ্যায়িত হন; অতএব রুধিরই প্রাণদেবতা বা পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরীর মুখ্য অন্ন, ইহা স্থিরীকৃত হইল। এই সঙ্গে ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, জগৎমাতা ও জগৎপিতার অন্য সহস্র প্রকারের উপহারের আয়োজন করিলেও রুধিরের আয়োজন করা নিতান্তই আবশ্যক—ইহাই রুধিরদানের সংক্ষিপ্ত রহস্য।*

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

জাতীয়তা ও বিশ্ব-মানবতা।

সংপ্রতি একটা হুযুগ উঠিয়াছে—বিশ্বমানবতা। শ্রুতিতে 'বিশ্বদেব' কথার উল্লেখ আছে। এস্থলে "বিশ্ব" অর্থে সমস্ত, যথা—"মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে" অর্থাৎ দেবতারা সকলে সেই বিশ্বরূপী ব্রহ্মের উপাসনা করেন। এই বিশ্বদেব কথার অনুকরণে বিশ্বমানব কথার সৃষ্টি, আবার

* এ বিষয় যাঁহারা বিশেষভাবে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সাধনপ্রদীপ পাঠ করা আবশ্যক।

ইহার ভাবার্থ ইংরেজী Humanity শব্দের অর্থ হইতে গৃহীত। তিন নকলে আসল খাস্তা হয়, দুই নকলেও কতকটা সেইরূপ। আমাদের বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন মনীষী এই Humanity'র নকল করিতে গিয়া আসল খাস্তা করিতে বসিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের কথা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া হাত তালি দিতেছি। তাঁহারা বলেন,ভারতের জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া বিশ্বমানবের সহিত এক হও। এসব কথা শুনিতে খুব চমৎকার, এসব idea'ও খুব liberal ; কিন্তু ইহার মানে একবার তলাইয়া দেখা উচিত। ইহার অর্থ, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত সপিণ্ডীকরণ উদ্দেশ্যে আমাদের জাতীয় জীবনের বিনাশ—হিন্দু জাতির অপমৃত্যু বা আত্মহত্যা। সকলেই জানেন, কোন মৃত ব্যক্তির পুত্র তাঁহার পিতাকে পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত মিলাইয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার সপিণ্ডীকরণ করিয়া থাকেন। আমাদের বিশ্বমানবতার ঋষিগণও সেইরূপ হিন্দুজাতিকে তাহার জাতীয় পৃথক্ অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিয়া বিশ্বমানবের সহিত এক হইতে বলিতেছেন। কিন্তু তাহা কি কখনও সম্ভব? ধরিলাম, হিন্দু জাতি এই সকল মনীষীর উপদেশে জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ইংরেজ, ফরাসী, জাপানী,আমেরিকানের সহিত আহার বিহার, আচার ব্যবহার, আদান প্রদানে এক হইয়া গেল। কিন্তু তাহার ফল কি হইবে? তখন যে মিশ্র জাতি উৎপন্ন হইবে তাহাকে হিন্দু জাতি বলিয়া কেহ চিনিবে কি? তখন হয় ত নামে সে জাতি হিন্দু থাকিতে পারে; যেমন এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতবাসীমাত্রেই হিন্দু বলিয়া পরিচিত। কিন্তু যে জাতীয় বিশেষত্ব এখন হিন্দুজাতিকে অন্য জাতি হইতে পৃথক করিতেছে, তখন তাহার কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকিবে না। তখন যে সকল উচ্চতম আদর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া হিন্দুজাতি এতদিন জীবিত রহিয়াছে, তাহা লুপ্ত হইবে। তখন হিন্দুজাতির যুগযুগান্তব্যাপী তপস্যার ফল বেদ পুরাণ শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের সঙ্গে তাহার জীবনের সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন হইবে। তখন মনু যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস বাল্মীকি, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ অষ্টাবক্র প্রভৃতি শত শত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী ঋষির যে পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিয়া হিন্দুজাতি বাঁচিয়া আছে, তাহা বিলুপ্ত হইবে। তখন রামলক্ষ্মণ কৃষ্ণার্জ্জুন ভীমযুধিষ্ঠির কর্ণদ্রোণ প্রভৃতি

পুণ্যশ্লোক, শৌর্য্য-বীর্য্য-মনুষ্যত্বের জলন্ত আদর্শনরদেবগণের চরিত্রমহিমা সকলে ভুলিয়া যাইবে। তখন সীতা সাবিত্রী দ্রৌপদী দময়ন্তী শৈব্যা শকুন্তলা প্রভৃতি পতিব্রতা আর্য্যরমণীগণের যে পুণ্য স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া হিন্দুরমণীগণ তাঁহাদের সতী-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে কেহ চিনিবে না। তখন অযোধ্যা মথুরা কাশী কাঞ্চী পুরী দ্বারাবতী প্রভৃতি ভারতের তীর্থসমূহ, গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদীসকল, যাঁহাদের নাম স্মরণ করিলে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেক হিন্দুর মনে পবিত্র পুলক সঞ্চার হয়, তাঁহাদের মাহাত্ম্য সকলে বিস্মৃত হইবে। তখন শিব বিষ্ণু কালী দুর্গা রাধাকৃষ্ণ হরি রাম প্রভৃতি সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বিপদুদ্ধারণ দেবদেবীর নাম, যাহা স্মরণ করিতে করিতে এখনও কত ভক্তের নয়নে প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়, তাহা সকলে ভুলিয়া যাইবে। তখন দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরাদি ভাব, পূজা জপ ধ্যান ধারণাদি সাধন, ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম প্রভৃতি যোগ, যাহা শত শত বৎসর হিন্দুর জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়া ঈশ্বরপ্রাপ্তির সহায় হইয়াছে, তাহা—"নৈবেদ্য" "পঞ্চপ্রদীপ" "হোমশিখা" "যজ্ঞভস্ম" "তীর্থ-সলীল" প্রভৃতি পুস্তকের নাম-করণে প্রযুক্ত অর্থহীন শব্দের ন্যায় কেবল কথার রূপকে পর্য্যবসিত হইবে। তখন শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা-হীরক-কিরীট-ভূষণা, শ্যামবিটপী-মণ্ডিত, বিন্ধ্যাচলমেখলা, সিন্ধুগঙ্গাযমুনা-স্তনা-পীযূষ-ধারা-বাহিনী, মলয়বিধূনিত, শস্যশ্যামলাঞ্চলা, দিগন্তবিসারিত-নীলাম্বুধি-চুম্বিতচরণা ভারতমাতার স্নিগ্ধ ক্রোড়ে লালিত হইয়াও তাঁহাকে কেহ চিনিবে না। তখন নিজ বাসভূমে সকলে পরবাসী হইবে। ইহা অপেক্ষা জাতির অপমৃত্যু আর কি হইতে পারে?

জাতীয় গৌরবে জলাঞ্জলি দিয়া যদি হিন্দুজাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করে, তবে সেই সকল প্রবলপরাক্রান্ত আধুনিক সভ্যতাদৃপ্ত জাতি তাহাকে তাহাদের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিবে কি? তাহা কখনই সম্ভব নহে। ইহার প্রমাণ, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় জাতিদিগের অবস্থা। যে সকল ভারতবাসী ব্যবসায় বানিজ্যের অনুরোধে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় চিরস্থায়ী ভাবে

বাস করিতেছে, তাহাদের দুরবস্থার কথা সকলেই অবগত আছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবিষ্ট সুসভ্য জাতিবৃন্দ সেই সকল ভারতবাসীকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না। তাহারা বিশ্বমানবতার অনুরোধে স্বকীয় জাতীয় স্বার্থ বিন্দুমাত্রও ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তখন কালো আদ্‌মি বলিয়া অনেক হোটেলে পর্য্যন্ত তাঁহার স্থান হয় নাই। সুসভ্য আমেরিকারও বিশ্বমানবতার পরিচয় ইহাতে সুপরিস্ফুট। পরে যখন সেই কৃষ্ণকায় ভারতবাসী সিকাগোর বিশ্বধর্ম্মসভায় তাঁহার হিন্দুত্বের পরিচয় দিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিলেন, তখন লোকে তাঁহার আদর করিতে আরম্ভ করিল। তিনি তাঁহার হিন্দু জাতীয়তার, হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীনতার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা লাভ হইল। জাতীয়তা বিনাশের দ্বারা বিশ্বমানবতার উৎপত্তি হয় না, বরং জাতীয়তার বিকাশের দ্বারা তাহা ফুটিয়া উঠে। আর আমাদের বিশ্বজনীন হিন্দুধর্ম্মের অনুশীলন দ্বারাই বিশ্বমানবতার পূর্ণ বিকাশ হয়।

বিশ্বপ্রেমিক কাহাকে বলিব? যিনি নিজের জননী, নিজের ভ্রাতা, ভগিনীকে ভাল বাসিতে পারেন না, অথচ যদি যিনি বলেন, আমি বিশ্বমানবকে ভাল বাসি। তাঁহাকে আমরা কি মনে করিব? যিনি নিজের গ্রামের কোন উন্নতির চেষ্টা করেন না, অথচ যদি তিনি বলেন, আমি একজন দেশহিতৈষী, তাঁহাকে আমরা কি বলিব? তাঁহার নাম ইংরেজি ভাষায় hypocrite, আর বাঙ্গলা ভাষায় ভণ্ড। বলা বাহুল্য, নিজ গ্রামকে অবলম্বন করিয়া অনুশীলনের দ্বারা যেরূপ দেশপ্রীতি বিকশিত হয়, সেইরূপ নিজের পরিবার, নিজের সমাজ, নিজের জাতিকে অবলম্বন করিয়া ক্রমানুশীলনের দ্বারা বিশ্বপ্রীতি বিকশিত হয়। ইহা হৃদয়ের শিক্ষা, শুধু মস্তিষ্কের শিক্ষা নহে। হৃদয়ের শিক্ষা বলিয়াই ইহা দীর্ঘকালের অভ্যাস ও অনুশীলন সাপেক্ষ। আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সেই বিশ্বপ্রীতির ক্রমবিকাশ হয়। হিন্দু গৃহস্থের বৈদিক অনুষ্ঠের সন্ধ্যা তর্পণ অতিথি সেবা প্রভৃতি সাধন দ্বারা ক্রমশঃ বিশ্বপ্রীতি বিকাশ লাভ করে। সেই তর্পণের মন্ত্রই ইহার প্রমাণ—

দেবা যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রুরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবোজিহ্মগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারা স্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে॥
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

এই শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক স্মরণে ও জলগণ্ডূষ দানে দেবতা অসুর খেচর ভূচর জলচর ধর্ম্মাত্মা পাপাত্মা কোন প্রাণীই বাদ পড়ে নাই।

যে ভক্তিযোগ অবলম্বনে আমাদের দৈনিক সন্ধ্যা পূজাদিঅনুষ্ঠিত হয়, শ্রীশ্রীদেবী গীতায় তাহার ক্রম বিকাশ এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মানুষের প্রকৃতি অনুসারে ভক্তিও তিন প্রকারের—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। যিনি তামস প্রকৃতির লোক তিনি পরের অনিষ্ট চেষ্টা করেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি দেবতার আরাধনাও করেন।

পরপীড়াং সমুদ্দিশ্য দম্ভং কৃত্বা পুরঃসরং।
মাৎসর্য্যক্রোধযুক্তো যস্তস্য ভক্তিস্তু তামসী॥

যিনি রাজসিক প্রকৃতির লোক, তিনি পরের অনিষ্ট চিন্তা করেন না, তিনি ভোগাসক্ত হইয়া নিজের কল্যাণের জন্য যশের আকাঙ্খা করিয়া দেবতার পূজা করেন।

পরপীড়াদি-রহিতঃ স্বকল্যাণার্থ মেবচ।
নিত্যং সকামো হৃদয়ে যশোঽর্থী ভোগলোলুপঃ॥

ইহাই রাজসিক ভক্তি। সাত্ত্বিক ভক্ত পরের অনিষ্ট চিন্তা করেন না, তাঁহার ভোগাসক্তিও নাই, তিনি পাপ সংক্ষালনের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্যজ্ঞানে বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং সেই কর্ম্মফল ভগবচ্চরণে সমর্পণ করেন।

পরমেশার্পণং কর্ম্ম পাপসংক্ষালনায় চ।
বেদোক্তত্বাদবশ্যন্তৎ কর্ত্তব্যন্তু ময়ানিশং॥
ইতি নিশ্চিত-বুদ্ধিস্তু, ভেদবুদ্ধিমুপাশ্রিতঃ।
করোতি প্রীতয়ে কর্ম্ম ভক্তিঃ সা নগ সাত্ত্বিকী॥

এই তিন শ্রেণীর সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভক্তির নাম অপরাভক্তি। অধিকারী অনুসারে এই সাত্ত্বিক ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে পরা-

ভক্তির বিকাশ হয়। অপরাভক্তি সাত্ত্বিক হইলেও তাহাতে ভেদজ্ঞান থাকে, পরাভক্তিতে ভেদজ্ঞান থাকে না। তখন সেব্যসেবকতা ভাব তিরোহিত হয়। তখন ভক্ত মোক্ষ বাঞ্ছাও করেন না।

পরানুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েদ্ যো হ্যতন্দ্রিতঃ।
স্বাভেদে নৈব মাং নিত্যং জানাতি ন বিভেদতঃ॥
মদ্রূপত্বেন জীবানাং চিন্তনং কুরুতে তু যঃ।
যথা স্বস্যাত্মনি প্রীতিস্তথৈব চ পরাত্মনি॥
চৈতন্যস্য সমানত্বাৎ ন ভেদং কুরুতে তু যঃ।
সর্ব্বত্র বর্ত্তমানাং মাং সর্ব্বরূপাঞ্চ সর্ব্বদা॥
নমতে যজতে চৈবাপ্যা চাণ্ডালান্তমীশ্বর।
ন কুত্রাপি দ্রোহবুদ্ধিং কুরুতে ভেদবর্জ্জনাৎ॥

ইত্যাদি—

তখন ভক্ত পরম অনুরাগের সহিত জগজ্জননীকে নিজের আত্মার সহিত সর্ব্বদা অভেদ ভাবে চিন্তা করেন। আবার জীবগণও তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলিয়া সমস্ত প্রাণীর প্রতি আত্মবোধে প্রীতি করেন। চৈতন্য বস্তু সর্ব্বত্রই সমান ভাবে বিদ্যমান জানিয়া কোন প্রকার ভেদ জ্ঞান করেন না। তিনি জগন্মাতাকে সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে বিদ্যমান দেখেন। সেই জন্য আচণ্ডাল সমস্ত মানবকে তিনি পূজা করেন এবং কাহাকেও দ্বেষ করেন না। বলা বাহুল্য, যে ভক্তের এইরূপ অভেদ জ্ঞান হইয়াছে; তিনিই প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক,তাঁহারই ভক্তি জ্ঞানের চরমসীমায় উঠিয়াছে। এইরূপ ভক্তিসাধনার যে চরম ফল, জ্ঞানসাধনারও সেই চরম ফল।

ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ও জ্ঞান যোগের চরম ফল এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

জ্ঞানিগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, গরুতে, হস্তীতে ও কুকুরে সমদর্শী, কারণ চৈতন্য বস্তু ইহাদের সকলের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান।

এই সমতাজ্ঞানই ভগবানের প্রকৃত আরাধনা। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ দৈত্য-শিশুকে উপদেশ দিতেছেন—

সর্ব্বতো দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধন মচ্যুতস্য ॥

হে দৈত্যশিশুগণ ! তোমরা সমদর্শী হও ; সমদর্শী হওয়াই বিষ্ণুর আরাধনা। এইরূপে আমরা দেখিলাম, বিশ্বমানবতা শিক্ষার জন্য আমাদের জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেওয়ার প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই আমরা সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা লাভ করিতে পারি। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের তপস্যার ফলে বিশ্বপ্রীতির বীজ এখনও আমাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। উপযুক্ত সুযোগ পাইলেই তাহা স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে। এই যে দামোদর-বন্যা-প্রপীড়িত বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া অঞ্চলের সহস্র সহস্র অধিবাসিগণের দুরবস্থা দর্শনে সমগ্র দেশব্যাপী গভীর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছে, শত শত স্বেচ্ছা-সেবকের দল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ও অসীম ক্লেশ সহ্য করিয়া আর্ত্তসেবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা দ্বারা কি বুঝা যায় ? ইহা দ্বারা বুঝিতে পারি, সমাজে জাতিভেদ উচ্চ নীচ ভেদ থাকা সত্বেও humanityর অভাব হয় নাই। সুতরাং এই humanity বা বিশ্ব-প্রীতি লাভের জন্য আমাদের জাতীয়তা বিসর্জ্জন দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই।

হিন্দুসমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতে জাতিভেদ প্রথা রহিয়াছে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ চণ্ডাল মুচি মেথর ডোম প্রভৃতি নীচ জাতির সহিত আহারাদি করেন না। কিন্তু তাহাতে ঘৃণা, দ্বেষ নাই। কেবল আত্মরক্ষাই এরূপ ভেদ-জ্ঞানের কারণ। একজন উন্নত ভক্ত বা উন্নত জ্ঞানী ব্রাহ্মণ একজন মুচী, মেথর বা ডোমকে পূজা করিতে পারেন, কারণ তাঁহার ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে। তিনি সকল জীবের মধ্যে একমাত্র নারায়ণকে দেখেন। যতদিন এইরূপ সমদর্শিতা লাভ না হইবে, ততদিন উচ্চ নীচ ভেদজ্ঞান থাকিবেই থাকিবে। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের নীচ জাতিদিগের উন্নতি চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সকলের ধন্যবাদার্হ। কারণ সমাজের এক প্রধান অঙ্গ বিকল হইয়া থাকিলে সমাজশরীর সবল থাকিতে পারে না। কিন্তু

তাঁহাদিগকে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ থাকিয়া চণ্ডালকে উন্নত করিতে হইবে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের মধ্যে যে উচ্চ আদর্শ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নীচ জাতির উন্নতি বিধান করিতে হইবে। উচ্চ জাতির মধ্যে প্রচলিত উচ্চ আদর্শ শিথিল করিয়া দিলে, নীচ জাতিরত উন্নতি হইবেই না, অধিকন্তু উচ্চজাতিসকল নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িবে। স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণকে গ্রাজুয়েট (graduate) করিতে হইলে, বি, এ শ্রেণীর Standard ঠিক রাখা আবশ্যক। নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য বি, এ শ্রেণীর পাঠ্য কমাইয়া দিলে সকলেই বি, এ হইতে পারে, কিন্তু তখন সেই B. A. শব্দের অর্থ Bachelor of arts না হইয়া ba বে হইবে। আজ কাল নমঃশূদ্রাদি জাতি ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সংযত ও মিতাচারী হইতেছে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ থাকিলে কালে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হইলে সমাজ চণ্ডালময় হইয়া যাইবে।

কেহ কেহ বলিতেছেন, হিন্দুজাতি মুমূর্ষু-দশা প্রাপ্ত ("Dying Race"), —ভারতের মুসলমানাদি অন্যান্য জাতির তুলনায় হিন্দুজাতির জনসংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে - এরূপভাবে কমিয়া গেলে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। ইহাঁদের মতে হিন্দুর কঠোর সমাজবন্ধনই এই লোকক্ষয়ের কারণ। হিন্দুর জাতি-ভেদ-প্রথার জন্য অন্য সমাজের লোক হিন্দু হইতে পারে না, কিন্তু হিন্দুসমাজের অনেক লোক মুসলমান বা খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে। মুসলমান বা খ্রীষ্টান-সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকায় তাহাদের জন-সংখ্যা বাড়িতেছে, হিন্দুর মধ্যে বিধবা-বিবাহ না থাকায় সে উপায়ে জন-সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রে অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের যুক্তিই আমরা কতক কতক শুনিয়াছি। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে মাত্র একটা কথা বলিতে চাই। কোন জাতি বাঁচিয়া থাকে কেবল জনসংখ্যা দ্বারা নহে, তাহার বিশেষ ভাবের দ্বারা, তাহার National Ideal (জাতীয় আদর্শ) দ্বারা। যে জাতির যে Idealটী তাহার জীবনের অস্থি মজ্জা, তাহার Life-blood—সেই ভাবটী যতদিন তাহার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন সেই জাতির সংখ্যা মুষ্টিমেয়

হইলেও তাহাকে জীবিত বলা যায়। আবার সেই ভাবটীর অভাব হইলে সে জাতি সংখ্যায় বিপুল হইলেও তাহাকে জীবিত বলা যায় না। বর্ত্তমান গ্রীকজাতি, ইটালিয়ান জাতি জীবিত কি মৃত? আমি বলিব, মৃত। পুরাকালে গ্রীকজাতির শিল্প, সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র জগতে অতুলনীয় হইয়া সেই জাতিকে অশেষ গৌরবান্বিত করিয়াছিল। এই গ্রীকজাতি এক সময়ে ইউরোপের শিক্ষাগুরু ছিল। রোমান জাতিও এক সময়ে তাহাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, রাজ্যবিস্তার, রাজ্যশাসনপ্রণালী, ব্যবহারবিধি (Jurisprudence), শিল্পকলা দ্বারা জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু নানাকারণে গ্রীক ও রোমান্‌দিগের এই সকল জাতীয় আদর্শ বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন উভয় জাতিই নগণ্য হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের জনসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু গ্রীক ও রোমান্ জাতি এখন মৃত তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

হিন্দুজাতির লোকসংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণতা, সংযম, মিতাচার, বিশ্বপ্রেম, হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন এ জাতির মৃত্যু নাই। এই সকল জাতির ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া হিন্দু যদি মুসলমানাদি জাতির সহিত মিশিয়া যায়, তবে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বাড়িতে পারে, কিন্তু পৃথিবী হইতে হিন্দুনাম বিলুপ্ত হইবে। সেই বিশ্বনিয়ন্তার কি অভিপ্রায় তাহা তিনিই জানেন। তিনি অর্জ্জুনের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি",—হে অর্জ্জুন, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পার, আমার ভক্তের কখনও মৃত্যু নাই। হিন্দু তাঁহার এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া অনন্যচিত্তে তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিবে যদি তাঁহার এই মহাবাক্য সত্য হয়, তবে হিন্দু কখনও মরিবে না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বাস্তুভিটা।

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ খুলনার আদালতে সেরেস্তাদারির কর্ম্ম করিতেন—পূজার বন্ধে নৌকা করিয়া বাটী আসিতেছিলেন—বাড়ীতে পূজা—পূজার অনেক জিনিসপত্র সঙ্গে ছিল,কপোতাক্ষী নদীর ধারে গ্রাম—বহু ভদ্রলোকের বাস—নিকটে একটী এণ্ট্রান্স স্কুলও আছে—গ্রামের নাম বারুইপুর। নৌকাতেই উঠিয়া প্রবোধচন্দ্র অসুস্থতা বোধ করিতে লাগিলেন। ঘরমুখো বাঙ্গালী বিশেষ খেয়ালে আনিলেন না। নৌকার মাঝিও চেনা, তাঁহাকে দুই চারিবার গ্রামে লইয়া গিয়াছিল। নৌকার ভিতরেই প্রবোধচন্দ্র অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। প্রবল জ্বর—মাঝিরা বড় ভয় পাইল। তাহারা রাত্রি জাগিয়া দাঁড় টানিয়া ভোর বেলায় বারুইপুরের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঝিদের একজন ছুটিয়া প্রবোধচন্দ্রের বাড়ীতে খবর দিতে গেল।

বাড়ীতে প্রবোধচন্দ্রের ভ্রাতা নিত্যবোধ থাকিতেন, প্রবোধচন্দ্রের কোন সন্তানাদি ছিল না,একমাত্র পত্নী মোক্ষদা। নিত্যবোধের দুইটী সন্তান; তাহারা স্কুলে পড়ে। নিত্যবোধ ভ্রাতার অসুস্থ সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া নদীতীরে গেলেন। প্রবোধচন্দ্র প্রবলজ্বরে একরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া আছেন। নিত্যবোধ গিয়া ডাকিলেন—দাদা! প্রবোধচন্দ্র একবার চাহিয়াই আবার চক্ষু বুজিলেন। নিত্যবোধ গ্রাম হইতে ডুলি আনিয়া ভ্রাতাকে বাড়ী লইয়া গেল। বাড়ীতে পূজার গোলযোগ—ভ্রাতা অসুস্থ—নিত্যবোধের মন ভাল ছিল না; সে প্রতিমার সম্মুখে মাথা খুঁড়িয়া দাদার আরোগ্য কায়মনে প্রার্থনা করিল—ফল কিছুই হইল না, পূজা একরূপে হইয়া গেল—কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের জ্বর ত্যাগ হইল না। সেই জ্বরেই ৭দিনের দিন প্রবোধচন্দ্রের মৃত্যু হইল।

গ্রামে নিত্যবোধ ও প্রবোধ ভ্রাতৃ-প্রেমের আদর্শ ছিলেন—ভ্রাতৃজায়া মোক্ষদা-সুন্দরী তেমনি নিত্যবোধকে আপনার সহোদরের ন্যায়,ভাল বাসিতেন।

সংসার যেমন তেমনি চলিতেছিল। পৈতৃক বিষয়াদি ছিল—তাহাতে একরূপ স্বচ্ছন্দে দিনপাত হয়, কিছু নগদ টাকাও তেজা-

রতিতে খাটিত, গ্রামের আদিকাল হইতে প্রায় ৩০।৩৫ পুরুষ এই গ্রামে এই ভিটায় বাস করিয়া আসিতেছেন। নিত্যবোধের বাস্তুভিটার উপর যথার্থই একটা প্রাণের টান ছিল।—কোথাও গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেন না। বাড়ী খড়ো ঘর কয়খানির উপর তাঁহার প্রাণ পড়িয়া থাকিত, খিড়কীর পুকুরের পাড়ের ক্ষীরসাপাতি আমের মত মধুর স্বাদ তিনি কোন মূল্যবান আম্রেই পাইতেন না। দাওয়ার পাশে সেফালি গাছ—শারদ জ্যোৎস্নায় ফুটিয়া প্রভাতে ঝরিয়া পড়িত,—নিত্যবোধ পুষ্পের মৃদুমন্দ গন্ধে আত্মহারা হইতেন। ঘাটের ধারে বকুলগাছ প্রভাতে পুষ্পে তলাটি ছাইয়া থাকিত—নিত্যবোধ সযত্নে তুলিয়া আনিয়া মালা গাঁথিয়া পাড়ার ছেলে মেয়ে ও নিজের ছেলেদের দিতেন।

ঘরের চালে কুমড়া, উঠানের মাচায় লাউ শশা, পুকুরের পাড়ের ক্ষেতে নানাপ্রকার তরিতরকারী প্রতিবর্ষে প্রচুর পরিমাণে জন্মাইত—সংসারে কোন অভাব হইত না।

৪।৫টা দুগ্ধবতী গাভী - নধর গঠন। গরুগুলি দেখিয়া পাড়ার লোকের ঈর্ষা হইত, তাহাদের দুধও তেমনি সুমিষ্ট ও অপর্য্যাপ্ত। নিত্যবোধ নিজহাতে তাহাদের পরিচর্য্যা করিতেন। একটা মাহিনা করা কৃষাণ ছিল, সে গরুগুলিকে চরাইত ও অবসর সময়ে বাগানের কাজ করিত।

বাহিরের বৈঠকখানা আটচালা লেপিয়া মুছিয়া ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করিতেছে, সামনে খানিকটা ফুলের বাগান; দুই চারিটা সব রকমই দেশীফুল আছে, বেড়ায় অপরাজিতা লতা,—শ্বেত, পীত, নীল নানাবর্ণের ফুল বেড়াটী ছাইয়া ফুটিয়া আছে, সম্মুখে একটা গেটের মত মাথায় বাঁশের জাফরি গোল করিয়া দেওয়া—বাঁশের জাফ্রিরই দরজা, তাহার উপর মাধবীলতা ফুলগুচ্ছে পরিপূর্ণ। বাগানের কাজ অবসর সময় নিত্যবোধ নিজেও করেন, কৃষাণের অপেক্ষা রাখেন না।

ভিতরের উঠানে একটা পাকা তুলসীমঞ্চ, কৃষ্ণতুলসী ও শ্বেত-তুলসীতে তাহার মাথাটি ছাইয়া রহিয়াছে। বড়বৌ মোক্ষদাসুন্দরী তাহাতে স্নান করিয়া জল দিয়া প্রণাম করে, সন্ধ্যায় দীপ দেয়। উঠান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দুইবোয়ে গোবর দিয়া প্রায়ই লেপা মোছা করে,

উঠান সর্ব্বদাই খট্ খট্ করিতেছে, চতুর্দ্দিকেই লক্ষ্মীশ্রীপূর্ণ। তাহার এক-পার্শ্বে একটী ধানের গোলা, গোলার বেড়া চাঁচা বাখারির উপর লাল নীল রং দেওয়া, মাথাটী উলু খড়ের ছাওয়া, গোলার মট্‌কায় একটী মাটীর গামলা বসান, তাহাও রং করা। দুই ভাইয়ে যেমন প্রণয় ছিল, দুই বধূতেই তেমনি প্রণয়, বড়বধূ ছোটবধূকে নিজের ভগ্নীর মত স্নেহ করিত।

নিত্যবোধের দুই পুত্র—নলিনী ও যামিনী। দুইজনেই এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছে। বড় যামিনী কলিকাতার মেসে থাকিয়া পড়ে—সে বৃত্তি পাইয়াছিল। বৃত্তির টাকায় কলিকাতার খরচ সংকুলান হয় না, নিত্যবোধকে আরও টাকা পাঠাইতে হয়। নলিনীও পাশ করিল, তাহাকেও কলিকাতায় রাখিয়া পড়ান প্রয়োজন; সেও বৃত্তি পাইয়াছে। পাড়ার সকলেই বলে, নিত্যবোধ পরম ভাগ্যবান্—নিত্যবোধের পত্নী রত্নগর্ভা।

নিত্যবোধ বড়বৌ মোক্ষদাকে বলিলেন, "দেখ, যামিনী এল, এ, দেবে, তার খরচা জমা দিয়েছি। মাসে মাসে ৫।২০৲ টাকার নীচে কলিকাতার খরচ চলে না; আবার নলিনীকে পাঠাতে হচ্ছে; এসব ব্যয় চ'লবে কোথেকে? আমি ভেবে পাচ্ছিনি। বিষয়ের যে আয়, তাহাতে কোনরকমে খাওয়া পড়া চ'লে, পূর্ব্বপুরুষের দুর্গোৎসব হয়, নগদ টাকা মাসে মাসে যোগাই কেমন ক'রে?" বড়বৌ বলিল, 'ভেবে আর কি কোর্ব্বে ঠাকুরপো? ছেলেদুটোকে তো মানুষ কর্ত্তে হবে। আমাকে আর বছরে বছরে মিছিমিছি টাকাকড়ি দাও কেন? সেই সব দিয়ে ছেলে পড়াও—মানুষ হোক্।"

বড়বৌ যে একথা বলিবে নিত্যবোধ তাহা জানিতেন তাই শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন না। বিষয়ের ন্যায্য অর্দ্ধাংশে যাহা আয় হইত, নিত্যবোধ বৎসর বৎসর তাহা বড় বৌকে দিতেন। বড় বৌ প্রথমে লইতে আপত্তি করিয়াছিল, নিত্যবোধ তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, ভবিষ্যৎ সকলেরই ভাবা উচিত। এই টাকাগুলি রাখ্‌লে ভবিষ্যতে যদি কোন তীর্থে গিয়া বাস কর, ইহার আয় হইতে চলিবে। বড় বৌ হাসিয়া বলিল, "আমার আবার তীর্থ কি ঠাকুরপো? এই শ্বশুরের ভিটেই আমার পরম তীর্থ। এইখানে মলেই আমার তীর্থে মৃত্যুর ফল হবে।" বড় বৌয়ের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলাগ্রে চক্ষু মুছিল।

আজ নিত্যবোধের সেই দিনের কথা মনে পড়িল। নিত্যবোধ বলিল, বড় বৌ? বড় বৌ বাধা দিয়া বলিল, আমার আর কে আছে ঠাকুর পো? ওরা মানুষ হোলে আমার সব হ'ল—আমার শ্বশুরের ভিটের আলো পড়বে, শ্বশুরের ভিটের পূজাপাব্বর্ণ বজায় থকেবে—এর বেশী আমার কি সুখ আছে ঠাকুর পো? তুমি কিছু মনে ক'রনা, ঐ টাকা খরচ ক'রে ওদের মানুষ কর।

নিত্যবোধ আর কোন কথা বলতে সাহস করিলেন না। তিনি বড় বৌয়ের স্বভাব জানিতেন, নিত্যবোধ নলিনীকে কলিকাতায় পাঠাইলেন, কিন্তু বড় বৌয়ের অংশের টাকা খরচ করিলেন না, তেজা তিতে যে টাকা খাটিতেছিল, সেই টাকা তুলিয়া পুত্রদের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বড় বৌ এ সংবাদ রাখেনা, ছোট বৌ রাঁধে বাড়ে, সংসার করে, সেও এসব তত্ত্ব রাখেনা - রাখার প্রয়োজনও বোধ করে না।

যামিনী এম, এ, পাশ করিয়া ওকালতি পড়িতেছিল। নলিনী বি, এ, পড়ে—যে কয়েকটী নগদ টাকা ছিল, পুত্রদের শিক্ষার ব্যয়ে সবই নিঃশেষ হইয়া গেল। এখন আরও অর্থের প্রয়োজন—নিত্যবোধ চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। পুত্রদের সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা নাই। অভাব —চাই—যেখানে হইতে পার পাঠাও—তাহারা ব্যয়ের অধিকারী, চিন্তার অধিকারী নয়! নিত্যবোধ অবশেষে সম্পত্তির নিজের অংশ বন্ধক দিয়া পুত্রদের শিক্ষার ব্যয় সংগ্রহ করিলেন।

পুরুষানুক্রমে পূজা, সেবৎসর ভাল শস্য হইল না—জিনিস পত্র দুর্ম্মূল্য। দুর্গোৎসব করিতেই হইবে—এ ব্যাপারেও নিত্যবোধের আরও কিছু ঋণ হইয়া পড়িল।

সদাপ্রফুল্ল নিত্যবোধ চিন্তায় দিন দিনই শুকাইয়া যাইতেছেন। স্বামীর শারীরিক অবস্থা পত্নী লক্ষ্য করিল—দুই একদিন একটু শরীরের যত্ন করিবার জন্য অনুরোধ করিল! নিত্যবোধ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। বড় বৌয়ের চক্ষেও নিত্যবোধ এড়াইতে পারিলেন না। একদিন মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বড় বৌ বলিল, তুমি অত ভাব কেন? আর কষ্টে সৃষ্টে একটা বৎসর গেলেই যামিনী উকীল হবে—আর তোমার কোন ভাবনা

থাকিবে না। নিত্যবোধেরও সে আশা ছিল, তিনিও বড় আশায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পুত্রদের উচ্চশিক্ষিত করিতেছিলেন, তাহাদের দিয়া পিতৃপুরুষের কীর্ত্তি রক্ষা পাইবে—শেষ জীবন শান্তিতে কাটিবে।

দেখিতে দেখিতে আবার পূজা আসিল। নানারূপে সংসারের অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। উপরের ঠাট কিন্তু তেমনি বজায় আছে—নগদ পয়সা হাতে কিছুই নাই, কি করিয়া কি হইবে নিত্যবোধ তাহাই কেবল দিনরাত ভাবেন—স্ত্রীকেও তেমন অলঙ্কারাদি দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই—এ অসময়ে তাহা দুই চারি খানা থাকিলে সাহায্য হইত। পুরুষানুক্রমে পূজা—করিতেই হইবে। নিত্যবোধ বাঁচিয়া থাকিতে তাহা লোপ হইয়া যাইবে, নিত্যবোধ তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না—যত পূজার দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল—নিত্যবোধের তত মুখ শুকাইয়া যাইতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোন উপায় নাই। পুত্রেরা পূজায় বাটী আসিয়াছে, তাহাদের সেদিকে কোন খেয়াল নাই; পাড়ায় পাড়ায় তাস পাশা খেলিয়া বেড়ায়—আহারের সময় আসিয়া খায়। জেঠাই মা নিরামিষ তরকারী নানারূপ পাক করেন—আদর করিয়া দেবরপুত্রদের খাওয়ান। ছোট বৌ গৃহস্থালীর কর্ম্ম করে, তাহার পুত্রদের আহারাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিবার কোন প্রয়োজন নাই—সেও জানে, তাহাদের জেঠাই মা আছে, তাহার অপেক্ষা তাহার পুত্রদের সে বেশী ভাল বাসে। এমনি সরল নির্ভরে সন্তানের মাতা হইয়াও সন্তানের যত্ন লইবার প্রয়োজন বোধ করে না।

নিত্যবোধ গালে হাত দিয়া দাওয়ায় বসিয়া আছেন—কুমার বৎসর বৎসর যেমন ঠাকুর পাঠাইয়া দেয়, তেমনি রংবিহীন ঠাকুর বেহারারা দিয়া গেল। পূজার সাত দিন বাকি—নিত্যবোধের চিন্তার কূলকিনারা ছিল না।

পাড়ার ছেলে মেয়েরা উঠানে ঠাকুর ঘিরিয়া আনন্দে কোলাহল করিতেছিল, নিত্যবোধের সজোরে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। এমন সময় বড় বৌ আসিয়া বলিল, ঠাকুর পো, মিছে ভাবছো কেন? মায়ের কাজ মাই কোর্ব্বেন। তবে কি কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে? তিনি যখন কৃপা ক'রে এসেছেন, তাঁহার পূজার ব্যয় তিনিই সংকুলান কর্ব্বেন। এই বলিয়া বড় বৌ এক তোড়া টাকা নিত্যবোধের সম্মুখে রাখিল। নিত্যবোধ বিস্মিত হইয়া বড় বধূর

মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বড় বধূ বলিল, ও তোমাদেরি টাকা, তোমাদেরি পূজায় লাগুক। নিত্যবোধ বলিলেন, বড় বৌ, এমন কোরে সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছ কেন? অনেক কষ্টে টাকা কয়েকটা পেয়েছ, অসময়ে কাজে লাগ্‌বে। সংসারের অবস্থা তো দেখ্‌ছো—আর কি, হবে? ছেলে পড়াতেই আমি সর্ব্বস্বান্ত হলুম। বড় বৌ সান্ত্বনাসূচক স্বরে বলিল, ঠাকুর পো, তুমি কি পাগল হ'লে? নলিনী যামিনী বেঁচে থাকুক, ওরাই তোমার টাকা। আর কি মানুষও তো ক'রে তুলেছ, দু একটা বছর কষ্ট, তার পর আর কোন অভাব থাক্‌বে না. তোমার কোন চিন্তা থাক্‌বে না।—ওদের ভিটের পূজো ওরাই ক'র্ব্বে। নিত্যবোধ একটু আশ্বস্ত হইলেন,—সত্যই তো ওদের পূজা ওরাই ক'র্ব্বে।

পূজা আসিল—লোকজনে বাড়ী পরিপূর্ণ, ছোট বৌ বড় বৌ কোমর বাঁধিয়া হেঁসেলঘরে ঢুকিল। সে অমৃততুল্য অন্নব্যঞ্জনে দশ গ্রামের কাঙ্গাল গরীব পরিতুষ্ট হইয়া আহার করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। আজ বড় বৌয়ের কত আনন্দ—আর দুটী খাও, অম্বল এনেদি—দই আনি ইত্যাদি বলিয়া সকলকে সমান ভাবে পরিবেশন করিতে লাগিল।

ছেলেরা কিন্তু কাঁকে কাঁকে বোরে, তেমন কোমর বাঁধিয়া পূর্ব্বের মত খালি পায়ে খালিগায়ে এবার আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া পূজার কাজ করিল না। এখন তেমন করিয়া পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোকের মত খাটিতে তাহাদের লজ্জা করে। নিত্যবোধ তাহা লক্ষ্য করিলেন। হৃদয়ে একটা আঘাত অনুভব করিলেন। ভিতরের উঠানে গিয়া ললাটের ঘর্ম্ম মোক্ষণ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে নিত্যবোধ ডাকিলেন,—বড়বৌ? বড়বৌ আসিয়া বলিল, কি ঠাকুরপো? নিত্যবোধ বলিলেন, নলে আর যামিনীকে দেখ্‌ছো? বড়বৌ উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, কি ঠাকুরপো? বড়বৌয়ের মুখের দিকে চাহিয়া নিত্যবোধ বলিলেন, ওদের জামা খুলে কাজ ক'র্ত্তে লজ্জা করে। বড়বৌ হাসিয়া বলিল, তুমি যেমন—সবাই কাজ ক'চ্ছে, ওরা আর কি ক'র্ব্বে? কাজ প'ড়লে কেমন করে না দেখিও? তুমিও সব মিছে ভেবে মন খারাপ ক'রোনা। নিত্যবোধ বলিলেন, না বড়বৌ, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না।

ওদের সবই উল্টে যাচ্ছে। বড়বৌ নানারূপে নিত্যবোধকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

পূজা হইয়া গিয়াছে। যামিনী নলিনী শুভদিন দেখিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। নলিনী সে বৎসর এম, এ, পরীক্ষা দিবে, যামিনী ছোট আদালতে বাহির হয়, ও ভিতরে ভিতরে এটর্ণীসিপ একজামিন দিবার জন্য একজন ভাল এটর্ণীর বাটী শিক্ষানবিশী করে। এটর্ণীর নাম পি, মিত্র—পূরা নাম অনেকেই জানে না—যামিনীর স্বজাতি। তাঁহার একটী অবিবাহিতা কন্যা আছে—যামিনীকে তাঁহার পছন্দ হইল। এক দিন যামিনীর অভিমত লইলেন। সে বলিল, আমার পিতা বর্ত্তমান—এ সম্বন্ধে তাঁহাকে জানান, আমার কোন আপত্তি নাই।

সম্বন্ধের চিঠি পত্র লেখা লেখি নিত্যবোধের সহিত চলিতে লাগিল। মিত্র মহাশয় এই স্থানে যাহাতে বিবাহ হয়, সেই ভাবের একখানি অনুরোধ পত্র যামিনীকে দিয়া তাঁহার জেঠাইমাকে লেখাইলেন।

শ্বশুর এটর্ণী—অনেক সাহায্য হইবে—বড় বৌ এই ভাবে নিত্যবোধকে অনেক বুঝাইলেন। নিত্যবোধের কিন্তু ইচ্ছা ছিল, সহরে মেয়ে না আনিয়া ভাল বংশের একটী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সহরে মেয়ে কি জানি যদি সংসারে বনিবনাও না হয়। নিত্যবোধের নানা আশঙ্কা, কিন্তু বড় বধূর নিতান্ত জেদ,—মিত্র মহাশয়ের কন্যার সহিত বিবাহ হয়। এ জেদের কারণ কিছুই নয়,যামিনী লিখিয়াছে, তাহার ভবিষ্যতের উন্নতি হইবে। যামিনীর ভবিষ্যত শুভ হইবে, তাই বড় বধূর এ সম্বন্ধে এত আগ্রহ। যাহা হউক, বড় বৌয়ের জিত হইল। মিত্র মহাশয়ের কন্যার সহিত শুভলগ্নে যামিনীর বিবাহ হইয়া গেল।

অষ্টমঙ্গলার আট দিন মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্বশুর বাড়ীতে থাকিয়া চলিয়া গেল। এই আট দিনেই নিত্যবোধ যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি ভবিষ্যতের সংসারের আশায় একরূপ নিরাশ হইলেন।

মিত্র মহাশয়ের কন্যা ত্রয়োদশ বৎসরের—আজন্ম সংয়ের সাহেবিয়ানা ভাবে প্রতিপালিতা। সকাল বেলা উঠিয়াই চা চাই—নিত্যবোধের বাটীতে চায়ের কোন বন্দোবস্ত নাই—বধূর সঙ্গে ঝি কয়দিন চা তৈয়ারি করাইয়া

প্রভুকন্যাকে খাওয়াইল। বধূ আসিয়া এই আট দিনে একবারও হাসিল না, মুখ ভার করিয়া রহিল। ঝি নানারূপে কন্যার পিতার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়া, এরূপ পাড়াগেঁয়ে লোকের সহিত সম্বন্ধ করিয়া মিত্র মহাশয় বড়ই ঠকিয়াছেন বলিয়া আপশোষ করিতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ে কাঁচা ঘরে মেয়ে অধিক দিন থাকিলে যে মিত্র মহাশয়ের কন্যা অধিক দিন বাঁচিবে না, এ সম্বন্ধেও সে স্থিরনিশ্চিন্ত হইল।

যামিনীর বিবাহ এক বৎসর হইয়াছে, সে এখন কলিকাতায় শ্বশুর বাড়ীতেই থাকে—পিতার সহিত তাহার বড় একটা সম্বন্ধ নাই। নিত্যবোধও পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন ;—আবার পূজা আসিল, সে বৎসর চাষবাস একরূপ মন্দ হয় নাই—দুই বৌয়ে তেমনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া খই ভাজিয়া মুড়কীর মোয়া করিল, নারিকেলের নাড়ু, সন্দেশ তৈয়ারী করিল। পাট বেচা কিছু টাকা নিত্যবোধ পাইয়াছিলেন, আর এক বৎসর বড় পুত্রের পড়িবার খরচও যোগাইতে হয় নাই—যাহা হউক, একরূপে দুর্গোৎসব হইয়া গেল।

পূজার সময় বড় বৌ মিত্র মহাশয়ের কন্যাকে আনিবার জন্য নিত্যবোধকে অনুরোধ করিল। নিত্যবোধ বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন। মিত্র মহাশয় বাড়ীর অসুখ বলিয়া কন্যা পাঠাইলেন না। যামিনীও অসুস্থ বলিয়া পূজায় বাটী আসিল না। বড় বৌ নীরবে অশ্রু মুছিলেন।

নলিনী এম, এ, পাশ করিল—তাহারও বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন—নিত্যবোধ দেখিয়া শুনিয়া এবার একটী পাঁড়াগ্রামের ভদ্রলোকের কন্যা গৃহে আনিলেন। নববধূ অনেকটা সংসারের কাজে আসিল নিত্যবোধ আশা করিলেন, এবার হয়ত সুখী হইবেন,—পিতৃ-পুরুষের ভিটা বজায় থাকিবে।

নলিনী নানারূপ সুপারিস যোগাড় করিয়া শীঘ্রই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইল। নূতন ডেপুটী এক জায়গায় অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না, এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। নলিনী নিজের ব্যয়ের টাকা রাখিয়া বাকি টাকা নিয়মিত দেশে পাঠাইতে লাগিল, সংসার অনেকটা স্বচ্ছল হইল।

নলিনী এবার যেখানে বদলী হইল, সেখানে ঝি বামুন মেলা দুর্ঘট।

হাত পোড়াইয়া খাইয়া কাজ করা চলে না—বড়বধূকে সব খুলিয়া লিখিল। বড়বধূ নিত্যবোধের সহিত পরামর্শ করিয়া ছোটবধূ ও নলিনীর স্ত্রীকে নলিনীর কর্ম্মস্থলে পাঠাইয়া দিল।

পূজার বন্ধে নলিনী সস্ত্রীক মাতাকে লইয়া বাটীতে আসিল। ছুটী ফুরাইয়া গেলে, সেবারে আর ছোটবধূ যাইতে পারিল না। ছোট বৌ গেলে, এখানকার সংসার চলে না। আমিষ ঘরের রান্নার লোক নাই। বড় বৌকে আমিষ রাঁধিয়া আবার নিজের জন্য স্নান করিয়া হবিষ্য রাঁধিতে হয়। দুইবার স্নান করিয়া বড় বৌয়ের ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হইতেছিল। এদিকে নলিনীরও স্ত্রীলোক না হইলে সংসার চলে না। নানান্ ভাবিয়া চিন্তিয়া নলিনীর স্ত্রীকেই তাহার সহিত পাঠান স্থির হইল। শুভদিনে নলিনী সস্ত্রীক কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল।

কলিকাতায় যামিনীর বেশ পসার প্রতিপত্তি হইয়াছে। সে একখানি আলাহিদা বাড়ী ভাড়া লইয়াছে—ইতিমধ্যে তাহার একটী কন্যা ও একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নিত্যবোধ, বড়বধূ এ সংবাদ পাইয়াছে; কিন্তু সন্তান দেখিবার তাহাদের সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। যামিনীও তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই।

বড় বৌ গঙ্গাস্নান ও যামিনীর ছেলে দেখিবার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। নিত্যবোধ তাহাদের আগ্রহে ছোট বৌ ও বড় বৌকে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন।

যখন যামিনীর বাসায় গিয়া পৌঁছিলেন, তখন বেলা ১০টা বাজিয়া গিয়াছে—যামিনী বাড়ী নাই—যামিনীর স্ত্রী এই মলিনবসন রমণীদ্বয়কে প্রথম চিনিতে পারিল না। তাহার পর পরিচয়ে চিনিয়া একটা প্রণাম করিল বটে, কিন্তু তাহার মুখ একেবারে ভার হইয়া উঠিল।

রান্না হইয়া গিয়াছে, বামুনও বাড়ী নাই। বড়বধূ নিজে রাঁধিয়া দেবর ও জাকে খাওয়াইল। যামিনীর সন্তানেরা জন্মিয়া তাহাদের ঠাকুরমাকে দেখে নাই। প্রথমে কোলেই আসিতে চাহিল না; কিন্তু রক্তের সম্বন্ধ, প্রাণের টান; শীঘ্রই বড়বধূ ও ছোট বধূকে ছেলেরা একেবারে পাইয়া বসিল। দেশ হইতে নারিকেল-সন্দেশাদি বড় বৌ তৈয়ারি করিয়া আনিয়াছিল, দু'একটী

সন্তানদের হাতে দিল। যামিনীর স্ত্রী মুখ ভার করিয়া বলিল, "ও ছাই পাঁশগুলো আর দিয়ে কাজ নেই, ওদের অসুখ।"

যামিনী কোর্ট হ'তে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, পিতা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন; একটু লজ্জিত হইয়া প্রণাম করিল। নিত্যবোধ পুত্রের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার মাতা ও জ্যেষ্ঠতাতবধূর আগমনবার্ত্তা দিলেন।

যামিনী ভিতরে গিয় জেঠাইমা ও মাতাকে প্রণাম করিল। কিন্তু পূর্ব্বের মত প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতে পারিল না; কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। যামিনীর স্ত্রী শাশুড়ীদের আগমন অবধি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ফুলাইয়াছিল. অবসর সময়ে নির্জ্জনে স্বামীকে ঠোঁট ফুলাইয়া চোক ঘুরাইয়া বলিল, তোমার মা'রা যে এতদিন পরে আপ্যায়িত কর্ত্তে এসেছেন। বুঝি টাকা কড়ি কিছু চাই। যামিনী কোন কথা বলিল না—বাহিরে চলিয়া গেল।

বড় বৌ বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল, দেবরপুত্রবধূর ব্যবহারে সে বড় মর্ম্মাহত হইয়া একটা লাজুক অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিল। উপরে দুইটি ঘর, একটীতে যামিনী থাকে, আর একটাতে কিছু জিনিস পত্র ও খোকার ঝি থাকে। রাত্রিতে বড় খোকা তাহার নিকট শোয়, কাজেই নীচের ঘরে বড়বধূদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হইল।

২।৩ দিন এইরূপেই কাটিয়া গেল। যামিনী জননীর আগমনে কোনরূপ আনন্দ বা আগ্রহ প্রকাশ করিল না। নিত্যবোধই কালিঘাট প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান ভ্রাতৃবধূ ও পত্নীকে দেখাইয়া আনিলেন।

সেদিন রাত্রিতে যামিনীর স্ত্রীর কোলের ছেলেটী বড় কাঁদিতেছিল, নিজের চোখে ঘুম,—সে বড়ই বিরক্ত হইয়া খোকাকে ২।৩টা চড় দিল। খোকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বড় বধূ, "ছি বৌমা, কচি ছেলেকে কি অত ক'রে মারে?" বলিয়া ঘরের ভিতরে গিয়া সন্তান কোলে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এদিকে নীচে বাবুরা খাইতে বসিয়াছিলেন, দুধের জন্য বামুন ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে; দুধ প্রত্যহ যামিনীর স্ত্রী বাঁটিয়া দেয়। যামিনীর মাতা সেখানে উপস্থিত ছিল, সে কয়েক বাটি দুধ কড়াই হইতে তুলিয়া দিল।

যামিনীর স্ত্রী যখন আসিয়া শুনিল,শাশুড়ী দুধ দিয়াছে, আর যায় কোথা! সব দুধ দিয়ে ফেলেছে—একি পাড়াগাঁ যে, দুধের দাম নেই—সহরে টাকায় চারি সের দুধ কিনতে হয়। সংসার ক'র্‌লে বুঝতেন? এখন আমার ছেলে খায় কি, আর সকলে খায় কি (আর সকলের মধ্যে তিনি স্বয়ং) ইত্যাদি খুব শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল। যামিনীর গর্ভধারিণী বড়ই লজ্জা পাইলেন। এরূপ ঘটনা তাঁহাদের পল্লীজীবনে কখন ঘটে নাই। বড়বধূও শুনিল, কিন্তু কথা বাড়িবার ভয়ে কিছুই উচ্চ বাচ্য করিল না।

পরদিনই দেবর নিত্যবোধকে ডাকিয়া বড় বৌ বলিল, ওদিককার সংসার তো দেখ্‌তে হবে? কালীদর্শন হ'ল, গঙ্গা স্নান হ'ল, যামিনীর ছেলে মেয়ে দেখলেম, আর কেন, এইবার বাড়ী চল। নিত্যবোধেরও প্রাণ বাড়ীর গাছ পাছালি ও গাভী কয়েকটীর উপর পড়িয়াছিল। তাহার উপর পুত্রের ঐশ্বর্য্যের উত্তাপ স্নিগ্ধ, সাম্য পল্লীবাসী নিত্যবোধের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। পুত্রের ব্যবহারে সে মর্ম্মাহত; সেই রাত্রেই যাওয়া স্থির হইল। পুত্র বা পুত্রবধূ তাঁহাদিগকে থাকিবার জন্য কোন অনুরোধ করিল না। বড় বধূ যামিনীর পুত্রকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গাড়ীতে উঠিল। পুত্র একটী পয়সাও সাহায্য করিল না। নিত্যবোধ নিজেই ব্যয় করিয়া আসিয়াছিলেন, নিজেই ব্যয় করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

যামিনী সংসারে কোন সাহায্যই করেনা, এমন কি কুশলবার্ত্তাও লেখেনা। নলিনী এখনও কিছু কিছু পাঠায়, তাও কোন কোন মাসে অসুখবিসুখের অছিলা করিয়া টাকা পাঠায় না। তাহারও দুইটী পুত্র হইয়াছে; পুত্রদের শিক্ষার ব্যয় হইতে নিস্তার পাইয়া নিত্যবোধ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, যাহা আয় ছিল, কষ্টে সৃষ্টে একরূপ চলিতেছিল; পূর্ব্বে নলিনী কিছু বেশী টাকা দিয়াছিল, সেই টাকা হইতে ও সংসার খরচ বাঁচাইয়া নিত্যবোধের যাহা ঋণ হইয়াছিল, তাহা পরিশোধ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বড় বৌয়ের অংশের টাকা নিত্যবোধ যেমন দিতেন, এখন বড় বৌ লয় না, কিন্তু নিত্যবোধ সে টাকা ব্যয় করে না। সে টাকা সঞ্চয় করিয়া বৎসর বৎসর রাখিয়া দেয়। এখন নিত্যবোধের ঋণের মধ্যে—বড় বৌ একবার পূজার সময় যে ২৫০৲ টাকা দিয়াছিলেন, তাহাই, নিত্যবোধ সেই

টাকা পরিশোধের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূজা প্রভৃতি যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। পূজা হয়, ছেলেরা কেহই আসেনা, ছোট বৌ লুকাইয়া লুকাইয়া চোখের জল মোছে। বড় বৌ মনের কথা লুকাইয়া বাহিরের কাজে আরও বেশী করিয়া মন দেয়; নিত্যবোধ অটল, কর্ত্তব্য কর্ম্ম দেবাদেশের মত প্রতিপালন করে।

ছোট বৌ পীড়িত হইয়া পড়িল, যথাসাধ্য কবিরাজী চিকিৎসা করান হইল, ফল কিছুই হইল না। ছোট বৌয়ের একবার ছেলেদের দেখিবার নিতান্ত ইচ্ছা; কিন্তু দুই ভাইয়ের কাহারও আসিবার সুবিধা হইল না! সতী সাধ্বী পতির কোলে মাথা রাখিয়া পুত্রদের মুখ মনে করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিল। নিত্যবোধ মুক্ত হইলেন।

তাঁহার বাগানের প্রতি আরও যত্ন বাড়িয়া গেল; অবসর পাইলেই তিনি আটচালার সম্মুখের বাগানের ফুলগাছ নিড়ান, গাছের গোড়ায় ঝারি করিয়া জল দেন।

সে বৎসর পূজার ২।৪ দিন পূর্ব্বেই নিত্যবোধ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সে অসুস্থ অবস্থাতেও পূজার চিন্তা,—বড় বৌ নানারূপে সান্ত্বনা করে; নিত্যবোধ অসুস্থ অবস্থাতেও যথাসাধ্য পূজার যোগাড় করিতে লাগিলেন। বড় বৌয়ের যত্নে ও চেষ্টায় পূজা সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

বিসর্জ্জনের সানাই করুণস্বরে গ্রামপ্রান্তে নদীসৈকতে বাজিতেছিল; ক্ষীণ সুর গ্রামবাসীদের হৃদয়ে একটা করুণার প্রস্রবণ জাগাইয়া তুলিতেছিল, নিত্যবোধ সে সুর স্থিরকর্ণে শুনিতেছিলেন। ধীরে ধীরে ডাকিলেন, বড় বৌ? 'কি ঠাকুরপো' বলিয়া বড় বৌ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। নিত্যবোধ শয্যায় শুইয়াছিলেন, সম্মুখের একটা জানালা খোলা ছিল, সেই জানালা দিয়া বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপের উঠান দেখা যাইতেছিল। বেল লণ্ঠনের তেলের আলো তখনও দুই চারিটা থাকিয়া থাকিয়া জলিয়া উঠিয়া নিভিবার মত হইতেছিল, আবার জলিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু আধারে তৈল ছিল না। নিত্যবোধ বলিলেন, বড় বৌ আমার সময় হোয়ে এসেছে, কিন্তু এই সাতপুরুষের ভিটে—ছেলেদের তো ব্যবহার দেখ্‌চো? আমাদের অভাবে আর এ ভিটেয় সন্ধ্যার প্রদীপ পড়্‌বে না। বড়বৌ বাধা দিয়া বলিলেন,

ছি! ঠাকুরপো, তুমি ভাল হবে। নিত্যবোধ ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, না বড়বৌ, আর ভাল হব না। এই ভিটের মমতা আমাকে বেঁধে রেখেছে—তুমি যদি একটা কথা স্বীকার পাও, আমি সুখে মরি। বড়বৌ নিত্যবোধের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিল। সে দৃষ্টি স্পষ্ট বলিতেছে, শ্বশুরের ভিটের জন্য তুমি যা বোল্‌বে, আমি তাই ক'র্ব্ব। নিত্যবোধ সে দৃষ্টিতে অনেকটা আশ্বস্ত হ'লেন। তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, আমার মাথার নীচে তোমার টাকা পোতা আছে—এটাকা তোমার অংশের, আমি খরচ করিনি,—সঞ্চয় কোরে রেখে-ছিলাম। ঐ টাকাগুলি নিও, তোমার বিষয়েরও আয় আছে তাতে স্বচ্ছন্দে চ'লবে দে'খ যেন আমার বাপপিতামহের ভিটে তুমি বর্ত্তমানে সন্ধ্যা পড়ে। নিত্যবোধ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলেন—সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে বিসর্জ্জনের চলিয়া ঠাকুর বিসর্জ্জন দিয়া ফিরিয়া আসিল।

যামিনী ও নলিনী শুনিতে পাইল, বাবা জেঠাইমাকে অনেক টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাহারা টাকা কয়েকটি হস্তগত করিবার ইচ্ছায় বড়-বৌকে উভয়েই নিজের নিকট যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু বড়বৌ দৃঢ়চিত্তে স্পষ্ট বলিল, আমি শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যাব না।

রাগ করিয়া দেবরপুত্রেরা যে যাহার কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল। সাধ্বী সতী বিধবা শ্বশুরের বাস্তুভিটা বুকে করিয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিলেন। দেবরপুত্রেরা অবাধ্য জেঠাইমার আর কোন সংবাদই লইল না। বা লইবার প্রয়োজনও বোধ করিল না। দেখিতে দেখিতে পূজা আসিল। পুরুষানুক্রমের পূজা—করিতেই হইবে—বিধবা ভিতরে ভিতরে সমস্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গ্রামের লোকেদের সকলেরই ধারণা ছিল—ঘোষেদের পূজা পার্ব্বণ বোধ হয় উঠিয়া গেল। অনেকেই তাহাতে দুঃখিত—হঠাৎ বোধ-নের দিন সোরগোলে পূজার সানাই আবাহন-সঙ্গীত বুকে করিয়া তেমনি উৎসবপূর্ণ সুরে বাজিয়া উঠিল। গ্রামের সকলেই বিস্মিতকর্ণে সেই স্বর শুনিতে লাগিল। বালকবালিকারা তেমনি উৎসাহে ঘোষেদের বাড়ীর উঠানে ছুটিয়া চলিল। সত্য সত্যই ঘোষেদের বাড়ী পূজা—সকলেই আনন্দ

উৎসাহে, উৎসবে আসিয়া যোগ দিতে লাগিল। তেমনি আনন্দময়ী বিধবা কোমর বাঁধিয়া দীনদুঃখীকে পরিতোষ করাইয়া পূজার কয় দিন আহার করাইলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা যেমন বাৎসরিক বিদায় পাইতেন তেমনই পাইলেন—কোন ক্রটী হইল না। বিধবা-বধূর যশো-গৌরবে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া গেল।

বংশের সন্তানেরা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য পালন করিল না; কিন্তু অন্য বংশের কন্যা সেই গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া প্রকৃত গৃহলক্ষ্মীর কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

দিল্লী ও আগরা।

(সূচনা।)

—:০:—

নীলসলিলা যমুনার বক্ষে আপনাদের বিচিত্র ছবি প্রতিবিম্বিত করিয়া যে দিল্লী ও আগরা অমরাবতীর শোভা স্মরণ করাইয়া দিতেছে, যুগযুগান্তর হইতে যাহাদের অপূর্ব্ব কাহিনী সমগ্র ভারতকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যাহাদের ঐশ্বর্য্য-গৌরব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগৎকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের বিবরণ মনে করিতে যে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? মহাশ্মশান ও মহাসমাধির ছায়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেও এখনও তাহাদের পূর্ব্ব গৌরবের নিদর্শন যে অমরাবতীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতে ইতিহাসের প্রতিপৃষ্ঠা যাহাদের গৌরব-প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, সে প্রভা

এখনও তাহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। তাই তাহাদের ভগ্নস্তূপের মধ্যে এখনও অনেক বিরাট্ গৌরব-স্তম্ভ মস্তক উত্তোলন করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং তাহাদের প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের কত স্মৃতি যে তাহাদের সহিত বিজড়িত আছে, তাহা কেমন করিয়া বলিব! কত মধুর, কত মর্ম্মস্পর্শী, কত উত্তেজনাময় ঘটনা-রাশি যে তাহাদের পুরাতন স্মৃতির সহিত গ্রথিত, তাহাও বলা সুকঠিন। যুগ যুগ ধরিয়া যে যমুনা সেই সমস্ত ঘটনা দেখিয়া আসিয়াছেন, তিনি এখনও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহাদের ভগ্নস্তূপরাজির সহিত প্রবাহিণী ক্রমে ক্ষীণসলিলা হইলেও তাহাদেরই পদ বিধৌত করিয়া আজিও বহিয়া যাইতেছেন। আর তাহাদের বিচিত্র ছবি তাঁহার নির্ম্মল সলিলে পড়িয়া তরঙ্গভঙ্গের সহিত খেলা করিতেছে। এ দৃশ্য স্বর্গেরই, তাই বলিতেছিলাম যে, এখনও ইহারা স্বর্গশোভায় সমৃদ্ধ। আমরা সে শোভা দেখিয়া নয়নের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া থাকি, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুরাতনী কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের ঐশ্বর্য্য-গৌরবে পুলকিত হইয়া উঠি,—তাই একবার তাহার ক্ষীণ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

হিন্দুর সাধের ইন্দ্রপ্রস্থ যেখানে ধর্ম্মে ও ঐশ্বর্য্যে ত্রিলোক চমকিত করিয়াছিল, যেখানে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেখানে ধর্ম্মাবতার শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালন করিয়া ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য জাগাইয়াছিলেন, সেই দিল্লীর সহিত হিন্দুর যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। মহাভারতের বহু লীলা যেখানে সংঘটিত হইয়াছিল, পাণ্ডবের অক্ষয়কীর্ত্তি যাহাকে গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছিল, ভগবানের চরণ-স্পর্শে যাহা পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, তাহা যে হিন্দুর পক্ষে তীর্থস্বরূপ,—তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? আবার যেখানে হিন্দু-রাজত্বের শেষ নিদর্শন চৌহানাদি বংশ গৌরব-প্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া গিয়াছে, যেখানে পৃথ্বীরাজের গৌরব-সূর্য্য মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া অবশেষে অস্তমিত হইয়া যায়, তাহার সহিত হিন্দুর যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহাও বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আবার যেখানে অম্বরলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নানা লীলার অবতারণা করিয়াছিলেন, যাহার নিকটস্থ যমুনাদ্বীপে ভগবান্ বেদ-

ব্যাস জন্ম গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, সে আগরাও যে হিন্দুর আদরের সম্পত্তি, তাহাও অস্বীকার করার উপায় নাই। আবার যে দিল্লীতে পাঠানগৌরবস্তম্ভ কুতুবমিনার ও মোগল-বিজয়-চিহ্ন দুর্ভেদ্য দুর্গ অবস্থিতি করিয়া পাঠান ও মোগলের বিচিত্র ইতিহাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে, এবং যাহার ভগ্নস্তূপ ও সমাধিক্ষেত্র কত কত রাজবংশের উত্থান-পতনের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহা যে মুসলমানের পক্ষে বিস্ময়ের বস্তু তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার যে আগরার তাজমহল যমুনার নীল সলিলে আপনার ধবলচ্ছবি প্রতিবিম্বিত করিয়া মোগলের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার সাক্ষ্য দিতেছে, যাহার অজেয় দুর্গ মোগলসম্রাটগণের গৌরব ঘোষণা করিতেছে, তাহাও যে মুসলমানগণের নিকট কত প্রীতিপ্রদ,—তাহা বোধ হয় বিশদরূপে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তাই বলিতেছিলাম, দিল্লী ও আগরার সহিত হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ প্রগাঢ়ভাবেই বিজড়িত আছে।

যেখানে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মাসন ও মোগলের ময়ূরাসন, সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, যেখান হইতে "যতঃ কৃষ্ণ স্ততো ধর্ম্মো,যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ" ও "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনি উদিত হইয়াছিল, যেখানে পাণ্ডবের, চৌহানের, পাঠান-গণের ও মোগলের অসংখ্য কীর্ত্তি আজও ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, আবার যেখানে সৌন্দর্য্য শরীর পরিগ্রহ করিয়া আজিও প্রীতি প্রদান করিতেছে, যেখানে বিরাট্ কীর্ত্তিস্তম্ভসকল অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে ভূষিত হইয়া "The Mogals commenced like Titants and finished like jewellers" কথার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে, সেই দিল্লী ও আগরার আর কত পরিচয় প্রদান করিব? ঐতিহাসিক তথ্যে ও শিল্পসৌন্দর্য্যে দিল্লী-আগরার ন্যায় আর কোন নগর নগরী ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। সুতরাং কে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়া লোকের কৌতূহল-নিবৃত্তি করিতে পারে? যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অনঙ্গপাল, পৃথ্বীরাজ, কুতব উদ্দীন, আলাউদ্দীন, মহম্মদ, ফিরোজ সেকেন্দর, ইব্রাহিম, বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান, আরঙ্গজেব কত অপূর্ব্ব ঘটনার অবতারণা করিয়াছিলেন; যেখানে দ্রৌপদী,সংযুক্তা, যোধবাই, যোধাবাই, নুরজাহান, মমতাজ কত নব নব লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন;

যেখানে কুতুবমিনার, দেওয়ানী খাস, মোতি মসজিদ, রঙ্গ মহাল, সেকেন্দরা, সেলিমবিস্তি, তাজমহাল ও ইতিমাদ উদ্দৌলা শিল্প-সৌন্দর্য্য ও ঐতিহাসিক তথ্যের স্তম্ভস্বরূপ বিদ্যমান আছে, তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতে কে সমর্থ হইবে? যাহাদের বিবরণের জন্য মহাভারতের সৃষ্টি, শত শত ভারতেতিহাস যাহাদের বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ, অসংখ্য প্রবাদবাক্য যাহাদের কাহিনীতে পরিপুষ্ট, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থের অবতারণা না করিলে তাহা কদাচ সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ব্যতীত সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। আমরা ক্রমে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানেরই চেষ্টা করিব।

ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দিল্লী আগরার ঐতিহাসিক ঘটনার পরিচয় দিয়া আমরা তাহাদের শেষ নিদর্শনের চিত্র প্রদর্শনের অভিলাষ করিতেছি। হিন্দু ও মুসলমান রাজবংশসমূহের উত্থান-পতনের সহিত দিল্লী ও আগরার যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, আমরা সংক্ষেপে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। সমগ্র ভারতের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ প্রদর্শন আমাদের অভিপ্রেত নহে, তবে প্রয়োজনবোধে ভারতের কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনাও উল্লিখিত হইবে। দিল্লী ও আগরার বিবরণই আমাদের আলোচ্য বিষয়, ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সেই জন্য দিল্লী ও আগরার সহিত যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধ আছে, আমরা সাধারণতঃ তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। দিল্লীসাম্রাজ্য বা আগরাসাম্রাজ্যের ইতিহাসের সহিত ইহার বিশেষ কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, তবে প্রসঙ্গক্রমে সাম্রাজ্যের দুই চারিটি কাহিনী আলোচিত হইতেও পারে। আমরা দেখাইব,— কিরূপে ইন্দ্রপ্রস্থের স্থাপনা হইয়াছিল, কিরূপে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এক্ষণে ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ নিদর্শন কিরূপভাবে বিদ্যমান আছে, অশোকস্তম্ভ ও লৌহস্তম্ভ পুরাতত্ত্বের কিরূপ সাক্ষ্য দিতেছে, অনঙ্গপাল, পৃথ্বীরাজ কিরূপে আপনাদের গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং কিরূপে পৃথ্বীরাজের সহিত সমগ্র হিন্দুজাতির আশাভরসা ভারত-পৃষ্ঠ হইতে একেবারে মুছিয়া যায়,—আমরা দেখাইব, অস্ত্রবলে ভগবান্
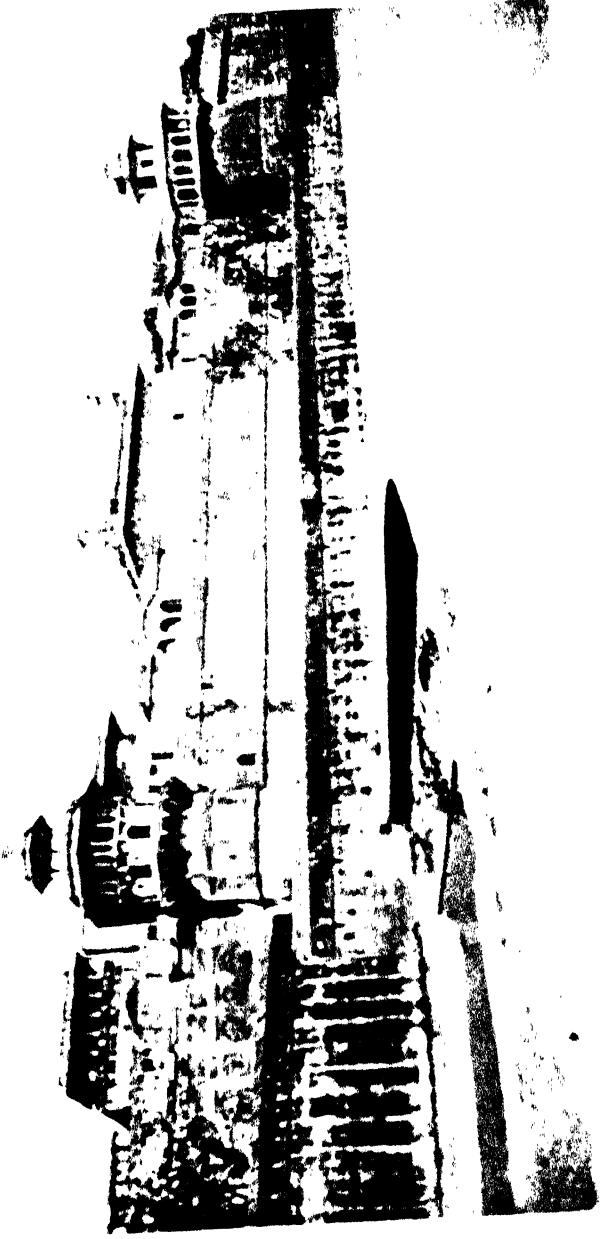
শ্রীকৃষ্ণ কিরূপভাবে লীলা করিয়াছিলেন, তাহার নিকটস্থ যমুনাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কিরূপে বেদবিভাগ, মহাভারত ও পুরাণাদির প্রণয়ন করেন, এবং সনাতন বৈদিকধর্ম্মের প্রচার করিয়া কিরূপে সমগ্র জগৎকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমরা দেখাইব—কিরূপে কুতুব-উদ্দীন পাঠান-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া কুতুবমিনারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিরূপে আলতামাস, রিজিয়া বেগম দিল্লী ও দিল্লীসিংহাসনকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কিরূপে আলাউদ্দীন কুতুবমিনারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বিরাট্ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিরূপে তোগলকাবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, মহম্মদ ও ফিরোজ কিরূপে আপনাদের গৌরব বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিরূপে সেকেন্দার লোদী আপনাকে স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, এবং কিরূপেই বা ইব্রাহিম পানিপথক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। আমরা দেখাইব—কিরূপে বাবর মোগলসাম্রাজ্য স্থাপন করেন, এবং হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান ও আরঙ্গজেব সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী ও আগরাকে দুর্ভেদ্য দুর্গে সুদৃঢ় করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন। অবশেষে আমরা দেখাইব—কিরূপে দিল্লী মহানগরীতে দরবারের অধিবেশন হইয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ও ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জ্জের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছিল এবং এক্ষণে তাহা কিরূপে আবার ভারতসম্রাজ্যের রাজধানী হইয়া উঠিতেছে। ব্রিটিশ রাজত্বের সহিত আগরারও কিরূপ সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে, আমরা তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই সমস্ত বিবরণ অবশ্য আমরা সংক্ষিপ্তভাবেই প্রদান করার অভিলাষ করিতেছি, কিন্তু যে সমস্ত সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-স্তম্ভ আজিও বিদ্যমান থাকিয়া হিন্দু ও মুসলমান-রাজত্বের গৌরব ঘোষণা করিতেছে, যে সকল ভগ্নস্তূপ প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয় দিতেছে, সে সমস্ত সমাধি-ক্ষেত্রের সহিত অনেক রাজবংশের সম্বন্ধ বিজড়িত আছে,—আমরা প্রধানতঃ তাহাদের চিত্র প্রদানের চেষ্টা করিব। তাই নীলীছত্রী, নিগমবোধঘাট, ইন্দ্রপ্রস্থ, পিপোরা বেড়, কুতুব মিনার, আল্লাই দরজা, তোগলকাবাদ, ফিরোজাবাদ, সাজাহানাবাদ, দিল্লী দুর্গ, ফতেপুর শিকরি ও সেকেন্দরা,

তাজমহল ও আগরা দুর্গ, দিল্লী ও আগরার প্রধান প্রধান ধ্বংশাবশেষও সৌন্দর্য্য-নিদর্শনের সহিত চিত্রিত হইয়া নানা ঐতিহাসিনী স্মৃতিও আনয়ন করিবে। ফলতঃ আমরা দিল্লীর ও আগরার ঐতিহাসিক বিবরণের সহিত তাহাদের বর্ত্তমান চিত্র প্রদান করিয়া তাহাদের পুরাণ কথা স্মরণ করাইয়া দিব। হিন্দুমুসলমানের কত অপূর্ব্ব স্মৃতি আজিও যাহাদের ভগ্ন স্তূপ ও সৌন্দর্য্যস্তম্ভের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের পুরাণ কথা যে সকলেরই নিকট প্রীতিপ্রদ হইবে, সে আশা বোধ হয় আমরা অনায়াসেই করিতে পারি। তাই একবার আমরা পাণ্ডবচৌহান, পাঠানমোগলের লীলাক্ষেত্র দিল্লী ও আগরার সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদান করিয়া ইতিহাসালোচনা ও শিল্পানুরাগের সার্থকতা লাভের ইচ্ছা করিয়াছি। আমাদের ক্ষীণ তুলিকায় সে চিত্র কত দূর পরিস্ফুট হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব এই টুকুমাত্র বলা যাইতে পারে।

এস মা!

মধুর মুরতি, শারদ প্রকৃতি,
আগমনী গীতি গাহিয়া।
অপরূপ সাজে, এল ধরা-মাঝে,
যোগী-মন মজে হেরিয়া॥
সুনীল গগন, মৃদু সমীরণ,
মুকুর জীবন পাইয়া।
হয় সমাকুল, যত প্রাণীকুল,
তব চরণ রাতুল ভাবিয়া॥
বিমল সরসে, শতদল ভাসে,
শারদ আকাশে চাহিয়া।

তব পথ-পানে, নিরখে সঘনে,
নিমেষ নয়নে ত্যজিয়া ॥
হ'য়ে ঊর্দ্ধমুখী, কুজনীয়া পাখী,
শাখি প'রে থাকি ডাকিছে।
শুনি সে সুতানে, বিদগ্ধ পরাণে,
প্রেমের তুফানে ঢাকিছে ॥
যথাসাধ্য যার, নিজ গৃহ-দ্বার,
করে পরিষ্কার যতনে।
ল'য়ে হিমগিরি, অবধি কুমারি *
হিন্দু নরনারী যেখানে ॥
ডাকিতেছে সবে, সকরুণ রবে,
এস মা গো ভবে ভবানি ॥
সারাটি বরষ, বদন বিরস,
না হেরি নীরস পরাণী ॥
ত্রিলোক-পালিকে এস মা অম্বিকে,
কোটি কণ্ঠে ডাকে তোমারে।
ত্যজি নিদ্রাহার, পূজা উপচার,
করিছে যোগাড় সাদরে ॥
এ হেন দুর্দ্দিনে, তোমার সন্তানে,
করুণা-নয়নে চাহিয়া,—
এস মা মঙ্গলে, উদ্ধার সকলে,
যত অমঙ্গলে নাশিয়া ॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

---

* কুমারিকা অন্তরীপ।

আদি কবি।

মাধবী মধ্যাহ্নে সেই বনচ্ছায়া-তলে,
বাণাহত ক্রৌঞ্চে হেরি', তব অন্তস্তলে
ক্রোধ-করুণায় মিশ্র যে প্রথম তান
উ'ঠেছিল অভ্র ভেদি' ; সে উদাত্ত গান
আজিও ফিরিছে শত সান্ত্বনার ছলে,
মোর এ পরাণ-পক্ষী নির্জ্জনে বিরলে
সংসারের শতশর-জর্জ্জরিত দেহে,—
যথায় র'য়েছে পড়ি'। মাতৃসম স্নেহে
"মা নিষাদ"-গীতি তব, প্রতি আর্ত্ত সাথে
ঘুরিছে অক্লান্ত শ্রমে, প্রতি ভক্তসাথে
বরষি' নির্ম্মাল্যরাশি প্রেমাপ্লুত করে
লইতেছে জীবনের মহাব্রত ব'রে
প্রীত স্ফীত মনে হায়! হে কবি, সে সুর,
আজিও শুনিছে ভয়ে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর!

শ্রীকামিনীকান্ত নিয়োগী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা শাশ্বতীর মূল্য প্রদান না করিয়াছেন, কার্ত্তিক সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভি পিতে পাঠান হইবে। তবে কেহ অন্য মাসে ভি, পি করিতে বলিলে আমরা তাহাও করিতে পারি। গ্রাহকগণের কোন পত্র না পাইলে আশ্বিন মাসেই ভি পি করিব। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

নিয়মাবলী।

—:•:—

সাহিত্যে দেশীয় ভাববিকাশই শাশ্বতীর উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কোন লেখক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে পারেন। নবীন লেখকগণের প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

শাশ্বতীর জন্য প্রবন্ধাদি ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি এবং চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এথোড়া পোঃ ভায়া সীতারামপুর ই, আই, রেলওয়ে ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

এথোড়া (Ethora) পোঃ
ভায়া সীতারামপুর,
ই, আই, রেলওয়ে। } শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

———

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

প্রভাতে কালীদর্শন।

—— :০: ——

নিশান্তে ত্যজিয়া শয্যা প্রভাতে জননি!
হেরি কি মাধুর্য্য শ্যামা জড়িত ত্রিগুণে;
আরক্ত কপোল আঁখি স্নিগ্ধ মদারুণে,
খেলে যেন সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যকান্তমণি;
কোটী সৌরকররূপে দ্যুতি হেমাঙ্গিনী,
আছে চিরদিন মাগো, বরাঙ্গ বেড়িয়া;
প্রফুল্ল-কদম্ববন-কানন-চারিণী,
সহস্র কমলদলে রহেছে ফুটিয়া!
উজ্জ্বলবালার্কজ্যোতির ফুল্লজবারূপে,
রয়েছে রক্তিমরাগে রাঙা পদতল;
ব্রহ্মাণ্ডের শঙ্খশুভ্র মহাশবস্তূপে,
রক্তকোকনদ দুটি করে ঢল ঢল!
এ বিশ্বে প্রভাত তব হাসি ও অধরে,
ও হাসিতে চির হাসি বিশ্বতাপ হরে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

———

যশোবন্ত সিংহ।

(৩)

নর্ম্মদার যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া যশোবন্ত সিংহ আপনার হতাবশিষ্ট সহচরগণ সহ মাড়বাড়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজধানী যোধপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলে, সে সংবাদ প্রধানা মহিষীর কর্ণগোচর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ দুর্গদ্বার রুদ্ধ করার জন্ত আদেশ প্রদান করিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যশোবন্ত প্রত্যাগমন করিতেছেন, ইহা শুনিয়া তিনি লজ্জায় ও ঘৃণায় ম্রিয়মাণা হইয়া পড়েন। তিনি কাপুরুষ স্বামীর মুখদর্শনে অসম্মত হন, এবং যাহাতে তিনি দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারেন, তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক যশোবন্ত সিংহ নর্ম্মদা যুদ্ধে কাপুরুষতা প্রদর্শন করেন নাই; তিনি সম্পূর্ণরূপেই রাজপুতগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করায় তাঁহার মহিষী তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। মহিষী প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, রাজা হয় জয়লাভ করিতেন, নতুবা যুদ্ধস্থলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেন। যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া আসাই তাঁহার পক্ষে কাপুরুষতা। তিনি রণ-প্রত্যাগত যশোবন্তকে তাঁহার স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হন নাই। 'রাঠোরকুলগৌরব প্রকৃত যশোবন্ত স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, অতএব আমিও তাঁহার অনুসরণ করিব' এই বলিয়া তিনি চিতা-সজ্জারও আদেশ প্রদান করেন। যশোবন্ত অনেকরূপে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নর্ম্মদা যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক ব্যাপার মহিষীকে বলিয়া পাঠান। কিরূপে তিনি ও তাঁহার সহায় রাজপুতগণ অসীম পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া বিপক্ষবর্গকে শাসিত করিয়াছিলেন, পরে রাত্রি সমাগত হওয়ায়, এবং তাঁহার অধিকাংশ সহচর ধরাশায়ী হওয়ায় যে তিনি রণস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তৎসমস্ত তাঁহাকে বুঝাইতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু সেই তেজস্বিনী মহিলা কিছুতেই শান্ত ভাব ধারণ করিলেন না। যশোবন্ত তাঁহার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলে কলঙ্ক প্রদান করিয়াছেন বলিয়া তিনি স্বয়ংই চিতারোহণে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যত হইলেন, এই সংবাদ মহিষীর মাতার কর্ণগোচর হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হন

এবং কন্যাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলায়, মহিষী কিঞ্চিৎ শান্তভাব অবলম্বন করেন। কিন্তু যশোবন্তকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে, তিনি অল্প দিন বিশ্রাম লাভের পর আবার নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এই কালিমা প্রক্ষালনে যত্নবান হইবেন, এবং পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের গৌরব রক্ষা করিয়া মহিষীর মনস্তুষ্টি সাধন করিবেন। দুঃখের বিষয়, তিনি সম্পূর্ণরূপে সে গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

যশোবন্ত নর্ম্মদাযুদ্ধে অসীম পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন সত্য, রাত্রি সমাগত হওয়ায় তিনি যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন তাহাও সত্য, কিন্তু তাঁহার তেজস্বিনী মহিষী তাহাকেই কাপুরুষতা মনে করিয়াছিলেন। রাজপুত কখনও সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। হয় তিনি জয়লাভ করিবেন, নতুবা প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন, ইহাই রাজপুত ও রাজপুতমহিলার ধারণা। "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্," এই মহামন্ত্রই তাঁহারা সর্ব্বদা উচ্চারণ করিয়া থাকেন সেই জন্য যশোবন্তের প্রধানা মহিষী তাঁহার রণস্থল পরিত্যাগে মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন। নর্ম্মদা-যুদ্ধে যশোবন্তের যে পরাক্রমের কথা লোকমুখে ধ্বনিত হইয়াছিল, ঐতিহাসিকেরা যাহার চিত্রণে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন, রাজপুতমহিলার নিকট সে পরাক্রম, সে গৌরব যে তুচ্ছ বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। হিন্দু জাতি অক্ষয় গৌরবেরই পক্ষপাতী। তাই তাহাদের নরনারীগণ ক্ষণিক গৌরবের প্রতি দৃক্‌পাতও করে না। রণস্থল পরিত্যাগ না করিয়া যদি যশোবন্ত শেষ পর্য্যন্ত পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহাই তাঁহার অক্ষয় গৌরব বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং তাঁহার মহীয়সী মহিষী তাহারই ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, যশোবন্তের পরাক্রমের ন্যায় তাঁহার মহিষীর তেজস্বিতাও ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে ;—ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে তাঁহার এই অপূর্ব্ব তেজস্বিতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। *

* I may here relate the ungracious reception experienced by the valiant Jesswint-Sing from his wife, the daughter

of Rana. When it was announced that he was approaching with his gallant band of about five hundred Rajaputs, the melancholy remnant of nearly eight thousand, at the head of whom he had fought with noble intrepidity, quitting the field from necessity but not with dishonour, instead of sending to congratulate him in his misfortune, she sternly commanded that the gates of the castle should be closed against him. "The man is covered with infamy" she said, "and he shall not enter within these walls. I disown him for my husband, and these eyes can never again behold Jesswint-Singh. No son-in-law of Rana can possess a soul so abject. He who is allied to his illustrious house must imitate the virtues of that great man; if he cannot vanquish, he should die". The next moment the temper of her mind took another turn. "Prepare the funeral pile," she exclamied, "the fire shall consume my body. I am deceived; my husband is certainly dead; it cannot possibly be otherwise:" and then again, transported with rage, she broke into the bitterest reproaches. In this humour she continued eight or nine days, refusing the whole of that time to see her husband. The arrival of her mother was attended, however, with a beneficial effect: she in some measure, appeased and comforted her daughter, by solemnly promising, in the rajah's name, that as soon as he should be some what recovered from his fatigue, he would collect a second army, attack Aurengzebe, and fully retrieve his reputation. (Bernier)

The bad success of the Maraja proceeded not more from the address of Aurangzebe. That prince had his emissaries in the Imperial Camp, who insinuated to the rigid Mahommedans, that should the Maraja prevail, their religion would be at an end in India. The Moguls accordingly made but a faint resistance; and the whole weight of the action fell upon the Rajaputs. The Maraja, afte his defeat, was ashamed to appear at Court. He retreated to his own

country, but his wife, a woman of a masculine spirit, disdained to receive a husband not covered with victory. She shut the gates of her castle against him. He in vain remonstrated, that, though unsuccessful, he had fought with the bravery of his ancestors, as appeared from the number of the slain. "The slain," said she, "have left Jesswint without an excuse. To be defeated is no new thing among the Marajas, but to survive a defeat is new. Descended from their blood, adopted by marriage into their house, they left their glory in the hands of Jesswint, and he has farnished it with flight. To be the messenger of the ruin of his armies, to show to the world that he fears death more than disgrace, is now become the employment of my husband. But I have no husband. It is an imposter that knocks at our gates. Jesswint is no more. The blood of kings could not survive his loss of fame. Prepare the funeral pile. I will join in death my departed lord." To such a pitch of enthusiasm had this woman carried her ideas of valour. She herself was the daughter of the late Rana, and Jesswint was of the same family. He, however, prevailed upon her to open the gate of the castle, by promising that he would levy a new army, and recover from Aurangzebe the glory which he had lost to that prince.

Raja Jaswant, when he fled from the encounter with Aurangzeb, betook himself to his own country. Women, especially Rajput women, have often a higher sense of honour than men ; and for this reason will rather bear the torture of fire than suffer disgrace. Raja Jaswant's chief wife was a daughter of Raja Chattar sal. She strongly condemned her husband's conduct, and refused to sleep with him. In conversation she would express her censure both by words and hints. The Raja was stung to the quick by her reproaches. So he sent a letter by his vakils to Aurangzeb, asking forgiveness of his offences. After his apology was accepted,

দুঃখের বিষয়, এই তেজস্বিনী মহিলা কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। কেহ তাঁহাকে রাণা-কুলোদ্ভবা, এবং কেহ বা রাজা ছত্রসালের কন্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই ছত্রসাল সম্ভবতঃ বুন্দীরাজ হইবেন। *

he proceeded to court, where he was graciously received, presented with many gifts and confirmed in his mansab. (Khafi khan Elliot vol. vii.)

It is found in the conduct of Jeswant's queen, who, as related shut the gates of his capital on her fugitive lord, though he "brought back his shield" and his honour (Tod)

* আমাদের পূর্ব্বোক্ত টিপ্পনীতে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, যশোবন্তের প্রধানা মহিষীর পিতৃকুল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিনি রাণা-কুলোদ্ভবা হইলে মেবারের রাজকন্যা হওয়াই সম্ভব। আবার রাজা ছত্রসালের কন্যা হইলে, তাঁহাকে বুন্দী-রাজকন্যা বলিয়াই বোধ হয়। যে সময়ে নর্ম্মদা-যুদ্ধ ঘটে, সে সময়ে বার্ণিয়ার ভারতবর্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিই ইঁহাকে রাণা-কুলোদ্ভবা বলিতেছেন। আবার আরঙ্গজেবের সমসাময়িক খাফি খাঁ তাঁহাকে রাজা ছত্রসালের কন্যা বলিয়া লিখিয়াছেন। খাফি খাঁর পিতা মোরাদ ও আরঙ্গজেবের কর্ম্মচারী ছিলেন, খাফি খাঁ স্বয়ংও আরঙ্গজেবের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এক্ষণে কাহার উক্তি প্রকৃত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। মহিষী তেজস্বিতায় যেরূপ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহাতে তিনি রাণাবংশীয় হইতে পারেন, কিন্তু বুন্দীর হারগণও তেজস্বিতায় বড় কম ছিলেন না। রাজপুতদিগের মধ্যে তেজস্বিতায় ছোট বড় স্থির করা সুকঠিন। মহিষীর মাতার যোধপুরে আগমনে তাঁহাকে রাণাবংশীয় বলিয়া সন্দেহ হয়। কারণ রাণা-মহিষীর কদাচ কন্যালয়ে যাওয়া সম্ভব নহে। দুঃখের বিষয়, টডগ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ নাই। সেই জন্য টডও স্পষ্টরূপে কিছুই লিখিতে পারেন নাই। খাফি যে রাজা ছত্রসালের কথা লিখিয়াছেন, তিনি বুন্দীরাজই বলিয়া বোধ হয়। এই বুন্দীরাজ ছত্রসাল বাদসাহ সাজাহান কর্ত্তৃক মোগল রাজধানীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং তিনি আরঙ্গজেবের সহিত দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে গমন করেন; পরে সাজাহানের আদেশে পুনরায় তাঁহার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হন। আরঙ্গজেব তাঁহার আগমনে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। চম্বলতীরের যুদ্ধে যাহাকে বার্ণিয়ার সামগড় বা ফতেয়াবাদ ও টড ঢোলপুরের যুদ্ধ বলিয়া লিখিয়াছেন, ছত্রসাল দারার সহিত আরঙ্গজেব ও মোরাদের বিপক্ষে উপস্থিত হইয়া অসীম পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেন, তাঁহার পরাক্রমের কথা বার্ণিয়ার, খাফি খাঁ, ডাউ ও টড প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

নর্ম্মদার যুদ্ধের পর আরঙ্গজেব ও মোরাদ আগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে না হইতে, দারা প্রধান প্রধান সেনাপতির সহিত তাঁহাদিগকে চম্বলতীরে বাধা প্রদান করেন। তথায়ও আরঙ্গজেব ও মোরাদ জয়ী হইয়া আগরার নিকটে উপস্থিত হন। এবং তথাকার বাধা অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করেন ও বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া রাখেন। ক্রমে আরঙ্গজেবই সাম্রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমে মোরাদকে বন্দী করিয়া ফেলেন, পরে অপর দুই ভ্রাতারও সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হন। যশোবন্ত সিংহ তাঁহার মহিষীকে সান্ত্বনা করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, আরঙ্গজেবই সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, তখন তিনি অন্যান্য অমাত্যের ন্যায় আরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। যাঁহারা আরঙ্গজেবের বিপক্ষাচরণ করিয়াছিলেন, আরঙ্গজেব তাঁহাদিগকে জীবনভিক্ষা মাত্র প্রদান করেন; তিনি তাঁহাদের প্রতি বিশেষ কোন সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। আরঙ্গ-জেবের এরূপ ব্যবহারে মহারাজ যশোবন্ত অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন, কিন্তু তিনি তখন অনন্যোপায় হওয়ায় সে ভাব গোপন রাখিয়া আরঙ্গজেবকে বলিলেন, "যে ধর্ম্মে উপদেশ দেয় যে, ঈশ্বরই মানবকর্ম্মের নিয়ন্তা, সেই ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যখন আমি দেখিতেছি যে, দেবতারাই আপনার হস্তে মোগল সাম্রা-জ্যের দণ্ড প্রদান করিতেছেন, তখন তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া আমি অধর্ম্ম বলিয়াই মনে করি।" আরঙ্গজেবও পরিহাস করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন যে, যশোবন্ত সিংহের সৌহার্দ্দ লাভের জন্য আমিও সে ধর্ম্মের নিকট ঋণী রহিলাম। * সে যাহা হউক যশোবন্ত আরঙ্গজেবের সহিত মিলিত হইয়া

* He told Aurangzebe, that being of a religion which inculcated the beleif of a Providence as superintending over human affairs, he was now under no doubts concerning the side on which the gods had declared themselves. It were therefore, continued he, a kind of impiety to oppose him when Heaven has placed on the throne. Aurangzeb pleasantly replied, "I am glad to owe to the religion what I hoped not from the love of Jesswint Singh."

অবশেষে তাঁহার আদেশানুসারে চালিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন উপায়ই না পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছিলেন।

মোরাদকে বন্দী ও দারাকে বিতাড়িত করিয়া আরঙ্গজেব এক্ষণে সুজার প্রতি ধাবিত হইলেন। সুজাও তৎপূর্ব্বে আপনার সৈন্য সামন্ত লইয়া আগরাভিমুখে আসিতেছিলেন। তিনি এলাহাবাদের কিছু দূরে কোড়া নামক স্থানে * উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট খাজওয়া নামক পুষ্করিণীর সমীপে শিবির সন্নিবেশ করেন। আরঙ্গজেব মীরজুম্লা, যশোবন্তসিংহ ও স্বীয় পুত্র মহম্মদের সহিত তথায় উপস্থিত হন। যশোবন্তসিংহ যুদ্ধে কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি যদিও নানা কারণে আরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু নর্ম্মদা যুদ্ধের ব্যাপার তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহার মহিষীর তিরস্কারে তিনি তাঁহার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার প্রতিপালনের কোনই উপায় স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। আরঙ্গজেবের সহিত সংঘর্ষে তিনি স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিলাষ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সুযোগ ঘটিয়া উঠিল কৈ? কাজেই তিনি সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়াও আরঙ্গজেবকেই আক্রমণ করিয়া প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায় করিলেন। যে সময়ে সুজা ও আরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যশোবন্ত তৎক্ষণাৎই যুদ্ধ হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, মোগল সৈন্যেরাও তাঁহারই অনুসরণ করিবে। তাহার পর সম্ভবতঃ তিনি আরঙ্গজেবের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে আপনার পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু মোগল সৈন্যেরা যখন আরঙ্গজেবের আদেশে সুজারই দিকে ধাবিত হইল, তখন যশোবন্ত কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া আরঙ্গজেবের পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈনাদিগকে আক্রমণ করিলেন। রাজপুতগণ মোগলদিগের সমস্ত রসদাদি লুণ্ঠন করিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্থাপিত করিতে লাগিল এবং তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ধরাশায়ী করিতে আরম্ভ

* আলমগীরনামাতে যুদ্ধস্থলের নাম কোড়া লিখিত আছে। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে খাজওয়া লেখা আছে। মাআসির আলম গ্রন্থে খাজওয়া পুষ্করিণীর নিকট লেখা আছে। খাফি-খাঁও যুদ্ধস্থলের নাম খাজওয়া লিখিয়া তাহার নিকট পুষ্করিণী থাকার কথা লিখিয়াছেন।

Mohila Press, Cal.

করিল। শিবিরস্থ স্ত্রীলোক ও বালকগণের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। * যাহারা সুজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকে স্ত্রীপুত্রদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু রাজপুতদিগের তরবারি চালনায় তাহারা অগ্রসর হইতে পারিল না। রাজপুতগণ শিবির সকল লুণ্ঠন করিতে করিতে যুবরাজ মহম্মদের শিবিরে উপস্থিত হইলেন, তথাকার সমস্ত দ্রব্যাদি অধিকার করিয়া আরঙ্গজেবের শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া লই-লেন। আরঙ্গজেব একদল সৈন্যকে রাজার বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুই করিতে পারিল না। সমস্ত রাত্রি রাজপুতেরা মোগলদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। এদিকে সুজা যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। তখন আরঙ্গজেবের সৈন্যেরা আসিয়া রাজপুতগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষের শোনিত পাতে বসুন্ধরা রঞ্জিত হইয়া উঠিল।" রাজপুতেরা অদম্য উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যশোবন্তসিংহ নিজ পরাক্রম প্রদর্শনের কিঞ্চিৎ মাত্র সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু অসংখ্য মোগল সৈন্যের সম্মুখে তাঁহার অল্পসংখ্যক সৈন্য স্থির থাকিতে পারিল না। ক্রমে তাহারা রণস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

যশোবন্তের এরূপ ব্যাপার যে বিস্ময়কর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং ইহাতে যে তাঁহারও রাজপুত-গৌরবের হানি হইয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, আরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিয়া তিনি নর্ম্মদাযুদ্ধের প্রতিশোধ লইলেন, এবং তাঁহার সহিত সম্মুখযুদ্ধে স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন করিবেন। সুজার সহিত আরঙ্গজেবের যুদ্ধশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অপেক্ষা করায় তাহাই বলিয়া বোধ হয়। রাজপুতেরা যে কেবল মোগলের শিবির লুণ্ঠনের জন্যই ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহারা মোগলদিগের নিকটে আর একবার আপনাদের জাতীয় পরাক্রম প্রদর্শন করিবেন বলিয়াই সমস্ত রাত্রি সেই ভীষণ রণক্ষেত্রে অবস্থিতি করিয়া-

* ভাউ বলিতেছেন যে, রাজপুতেরা স্ত্রীলোকদিগের প্রতিও অসি চালনা করিয়াছিল; কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। এমন কি খাফি খাঁও তাহা লেখেন নাই।

ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এরূপ উপায় অবলম্বন নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক, তদ্ভিন্ন এরূপ কৌশল যে রাজপুত জাতির উপযোগী নহে, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। যশোবন্ত মহিষীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার পালনের উপায় সুচারুরূপে স্থির করিতে পারেন নাই। তিনি আরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধস্থলে অপেক্ষা না করায় রাঠোর-গৌরব রক্ষিত হয় নাই। ইহাতে তাঁহার নর্ম্মদা-যুদ্ধের গৌরবকে যে হ্রাস করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক সুজার সহিত তাঁহার গুপ্ত পরামর্শের কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাহা স্বীকার করি না। তাঁহার আনুপূর্ব্বিক ব্যাপার আলোচনা করিলে তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। * বিশেষতঃ তিনি সে সময়ে মোগল-রাজত্বেরই পক্ষপাতী ছিলেন না। সাজাহানের বন্দী হওয়ার পর হইতেই তাঁহার মনে স্বাধীনতার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছিল। কাজেই তিনি কদাচ সুজার পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন না। তবে এই ব্যাপারে তিনি যে রাজপুত-গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহা আমরা অস্বীকার করি না।

রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া যশোবন্তসিংহ আগরাভিমুখে ধাবিত হন। আগরায় রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, আরঙ্গজেবের পরাজয় হইয়াছে ; তাহার পর যশো-

* Raja Jaswant Singh, the treacherous wretch who marched with the army, had through one of his confidants, opened communications which Shuja in the early part of the night, undertaking to make a sudden assault upon the army just before day-break, and to desert, doing as much mischief as he could. "When I do this," said he, "the king (Aurangzeb) will come in pursuit of me; you must then charge sharply upon his forces." (Elliot VII. Khafikhan).

কিন্তু ইয়ার্ট বলিয়াছেন—

Khafi khan, author of the Muntekhub all Lebal, says, the Raja did inform Shuja of his intention; but the result of the contest is a strong evidence of the contrary.

বন্তসিংহকে তাঁহার রাজপুত-সৈন্যসহ আগমন করিতে দেখিয়া অনেকের তাহাতে বিশ্বাস জন্মিল। আরঙ্গজেবের মাতুল সায়েস্তা খাঁর প্রতি আগরা রক্ষার ভার ছিল. তিনি এই সংবাদ শ্রবণে বিষপানে প্রাণত্যাগ করার সংকল্প করেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনীরা তাঁহার সে সংকল্প পূর্ণ করিতে দেন নাই। সায়েস্তা দুর্গদ্বার বন্ধ করার অন্য কোনই চেষ্টা করেন নাই। যশোবন্তসিংহ যদি সেই সময়ে আগরা দুর্গে প্রবেশ করিয়া সাজাহানকে মুক্ত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আরঙ্গজেবের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া আপনার লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ মাড়বারাভিমুখে অগ্রসর হন। যশোবন্ত প্রথমে গুজরাটে যাওয়ার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। কারণ দারা সে সময়ে উক্ত প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। দারাও যশোবন্তের সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যশোবন্ত মোগলের অধীনতা স্বীকার আর প্রিয় বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি স্বাধীন ভাবেই অবস্থিতি করিতে অভিলাষ করিয়া স্বীয় রাজ্যাভিমুখেই অগ্রসর হইলেন। আরঙ্গজেব দারার সহিত যশোবন্তের মিলনে আশঙ্কা করিয়া যশোবন্তকে এক পত্র লিখিয়া পাঠান, তাহাতে তিনি যশোবন্তের প্রতি প্রতিহিংসা দেখাইতে অনিচ্ছুক অথবা তাঁহাকে যে আর বিশ্বাস করিতেও চাহেন না তাহা ও উল্লেখ করেন। তবে যদি যশোবন্ত কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া উদাসীন ভাবে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে গুজরাটের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিবেন বলিয়া আশা দেওয়া হয়। সেই সময়ে অম্বররাজ জয়সিংহও যশোবন্তকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া দারার পক্ষ অবলম্বন না করিতে নিষেধ করিয়া পাঠান। দারা যে কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না জয়সিংহ যশোবন্তকে তাহা উত্তমরূপেই বুঝাইয়া দেন, এবং বৃথা রাজপুত-রক্তপাতের জন্য নিষেধ করেন। যশোবন্ত অন্য রাজাদিগকে তাঁহার সহিত যোগ দিতে আহ্বান করিলে, জয়সিংহ তাহাতেও বাধা দিবেন বলিয়া ব্যক্ত করেন। যাহাতে দেশ মধ্যে অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত না হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক হিন্দুরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বলিয়া জয়সিংহ যশোবন্তকে জ্ঞাপন করেন। যশোবন্ত পূর্ব্ব হইতেই দারার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এক্ষণে আরঙ্গজেবের সহিত মিলিত হওয়ারই অভিপ্রায় করিতে লাগিলেন।

দারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে করিতে ধৃত হন, এবং বন্দী হইয়া কারাগারে নির্দ্দয় ঘাতকের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দেন। সুজাও বিতাড়িত হইতে হইতে আরাকানে গিয়া আত্মবিসর্জ্জন করেন। তাহার পর আরঙ্গজেব নিষ্কণ্টক হইয়া ময়ূরাসনে উপবিষ্ট হন।

পতিব্রতা।

অতীতের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে লোকে বলে "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ"। কথাটা ঠিক, কারণ যাহা অতীত তাহা ভাবিয়া ফল কি, তাহাত আর ফিরিয়া আসিবে না? যাহা গিয়াছে তাহা যদি আসিত তবে দুঃখ বলিয়া কিছু থাকিত না। যদি আসিবার সম্ভাবনাও থাকিত, তবে অনুতাপের মর্ম্মভেদ সন্তাপে কাহাকেও ব্যথিত বা সন্তপ্ত হইতে হইত না। কিছুদিনের নিমিত্ত অথবা সামান্য ক্ষণের নিমিত্ত বিচ্ছেদ বা বিচ্যুতি—সুতরাং তাহার নিমিত্ত আর পরিতাপ কেন? যাঁহারা এই প্রকার অতীত ভাবনায় ক্লিষ্ট হন, তাঁহাদিগকেই লোকে বলিয়া থাকে, তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া থাকে,—কেন হে, ও বিষয় লইয়া আবার মাথা ঘামান কেন? যাহা গিয়াছে তাহা লইয়া বিড়ম্বিত হইবার প্রয়োজন নাই; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উক্তিটী পক্ষান্তরে একটি আশ্বাসবাণী বা সন্তপ্তের স্তোত্র বাক্য,—তদ্ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? যদি অতীত ঘটনার পর্য্যালোচনা করিলে বিড়ম্বিত হইতে হয়, যদি লাঞ্ছিত হইতে হয়, লোকে যদি ইহা ভাবে তবে অতীতের বিষয় কেহই ভাবিত না। তুমি, আমি, ভাবিয়া দেখ সকলেই কিছু না কিছু অতীত লইয়াই তোলা পাড়া করি, ভবিষ্যতের দিকে ক জন তাকায়, কয় জনের দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষিত হয়? খুঁজিয়া দেখ, তাহাদের সংখ্যা অতি কম, বেশী ভাগই অতীতের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে, সন্তপ্ত হৃদয়ে সে দিকে তাকাইয়া

আছে, অন্ধকার রজনীতে পাপাচারীর সন্দিগ্ধ অন্তঃকরণের ন্যায় সেই দিকে তাকাইয়া আছে, সামান্য একটু শব্দ হইলেই যেমন সে মনে করে ঐ কে যেন আসিতেছে, ঐ যেন কাহারও পদশব্দ শ্রুত হইতেছে, সেইরূপ ভাবে চকিতনেত্রে চাহিয়া থাকে। এই সুষমাময়ী ধরণী এই বহুজনসমাকীর্ণ নদ, নদী, গিরি, অরণ্যসঙ্কুল পৃথিবী—যে দিকে দৃষ্টিপাত কর সেই দিকেই অতীতের বিষয় দেখিতে পাইবে। প্রবলজলপ্রবাহে উচ্ছ্বসিত হইয়া নগর জনপদ বিধ্বস্ত করিয়া বিপুল বেগে কোথাও নদ প্রবাহিত হইতেছে, ক্ষুদ্র বীচিমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া কল্লোলিনী আপন মনে উদাস প্রাণে কুলু কুলু করিয়া কি যেন অতীতের স্মৃতি গাহিয়া যাইতেছে, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ উন্নত শরীরে দাঁড়াইয়া রহিয়া অতীতের যেন কি কথা বলিতেছে, কলকণ্ঠ বিবিধ বিহঙ্গমগণের মধুর ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া সুদূরব্যাপী অরণ্যানী অতীতের গান গাহিতেছে, বাসন্তী রজনীর আধ ঘুমঘোরে দূরাগত বংশীধ্বনি ভাবিয়া দেখ, অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া তোলে, চাহিয়া দেখ শারদ কৌমুদী-স্নাতা উদ্‌ভ্রান্ত বনবিহঙ্গীর সুমধুরস্বরবিপ্লুতা রজনী তোমার অতীতের বিষয়ই জাগাইয়া তোলে, সকলেই অতীতের ঘটনাই কহিয়া থাকে। এই অতীতের জন্যই কবিকুলপিক কালিদাস একদিন গাহিয়াছিলেন,

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাৎ দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা॥

এখন দেখিতে হইবে,—সেই অতীতের কি ছিল, এখন এই বর্ত্তমানে তাহার কি নাই এবং এই বর্ত্তমানে এমন কি মধুরতম রস আছে যাহা তখন ছিলনা। একটু বিবেচনা করিলেই উপলব্ধি হইবে, এখন নাই আমাদের সেই সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা, সেই অভ্যাস, সেই তিতিক্ষা, সেই তেজ, আর নাই সেই সংযম। যে হিন্দুজাতি এক দিন সংযমবলে, শিক্ষাবলে, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা বলে, জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন, আজ সেই হিন্দু, আজ অধঃপাতিত হইয়া নিজ শিক্ষাদীক্ষার দোষে শান্তি হারাইয়া অশেষ দুঃখে জর্জ্জরিত হইতেছেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষাভিমানী হইয়া আপনাদের

অতুলনীয় অকলঙ্কিত শিক্ষাকে কদর্য্য শিক্ষা বলিয়া গালি দিতেছেন, তাঁহাদের গৃহে যে অনন্যসাধারণ রত্ন ছিল তাহা হারাইয়া আজ মণিহারা ফণীর ন্যায় দুঃখে কাল যাপন করিতেছেন, বর্ত্তমানের সহিত তুলনা করিয়া অতীতের এই প্রভেদ এখন প্রতীত হইতেছে। সে কালের শিক্ষা শান্তির নিকেতন, একালের শিক্ষা অশান্তির কারণ, ইহাই তাঁহারা বুঝিতেছেন না। নব্যগণ কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, তখনকার লোকগণ মূর্খ ছিল, তাহারা কিছুই জানিত না। তখন স্ত্রীশিক্ষা স্বাধীনতা ছিলনা বলিয়া তাঁহাদিগকে অশেষ কদর্য্য ভাষায় গালি দিতেও কুণ্ঠিত হন না ; কিন্তু তখনকার স্ত্রী-শিক্ষা আর এখনকার প্রলয়ঙ্করা স্ত্রী-শিক্ষা—এতদুভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য তাহা কি তাঁহারা বুঝেন ? যদি বুঝিতেন, তবে তাঁহারা প্রাচীনের এত হতাদর করিতেন না। মহাকবি কালিদাস কণ্বমুখে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কি গভীর গবেষণাপূর্ণ কথা বলিয়াছেন।—তাহার কি তুলনা আছে ? তিনি বলিয়াছেন,

> শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
> ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
> ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
> যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ঃ বামা কুলস্যাধয়ঃ॥

কি কঠোর উক্তি, কি কর্ত্তব্যবুদ্ধিবিকাশের পরাকাষ্ঠা! এরূপ শিক্ষা এখন কি আর আছে ? এখন আমরা এই শিক্ষা হারাইয়াছি বলিয়াই আজ এত দুর্গতি। যাঁহারা ঐ শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেন তাঁহারা জগতের আদর্শ বলিয়া উক্ত হইতেন, তাঁহারাই সাধ্বী এবং জগৎপূজ্যা। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা নাই। রমণী বিবাহিত হইলেই তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে স্বামীর পরতন্ত্রা হইবেন, তাঁহাদের আর কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই।—তাই মনু বলিয়াছেন,

> বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা
> ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষপি।
> বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে
> পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্।

পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহ মাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেন স্ত্রী গর্হ্যৌ কুর্য্যাদুভে কুলে।

রমণী বালিকা হউন, যুবতীই হউন, আর বৃদ্ধাই বা হউন তাঁহাদের স্বাধীন ভাব অবলম্বন করা বিধেয় নহে। বাল্যকালে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রাদির অধীনে থাকাই শ্রেয়স্কর। স্ত্রী কখনও পুত্র, পিতা বা স্বামী হইতে স্বতন্ত্র ভাবে থাকিবেন না। ইহাই স্ত্রী-শিক্ষা এবং ইহাই পরিণাম-সুখপ্রদ। মনু আরও বলিয়াছেন,

যস্মৈ দদ্যাৎ পিতাত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতো পিতুঃ
তং শুশ্রূষেত জীবন্তঃ সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥

পিতা অথবা পিত্রাণুমত ভ্রাতা যাঁহার হস্তে কন্যা দান করেন, জীবনে ও মরণে তাঁহারই অধীনা হওয়া স্ত্রীজাতির একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ পতি-সেবাই স্ত্রীজাতির একমাত্র ধর্ম্ম, তাহাদের আর অন্য ধর্ম্ম, বা পুণ্যোপাসন নাই।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং না প্যুপোষিতম্
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

প্রাচীন কালে স্ত্রীজাতির প্রতি এই শিক্ষা ও সংযমের উপায় কীর্ত্তিত হইত এবং সাধ্বী রমণী কখনও পতির বিপরীতাচরণ করেন না বা করিবার ইচ্ছাও অন্তঃকরণে পোষণ করেন না। এই নিমিত্ত সাধ্বীর লক্ষণে মনু বলিয়াছেন—

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া মনীষিভিঃ॥

আমরা অতীত শিক্ষা হারাইয়া আজ আমাদের ঐ সকল শান্তিময় বিমল আনন্দ হারাইয়াছি, তাই এত দুঃখ, এত অশান্তি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ।

কবিকথা।

(কালিদাস)

বিক্রমোর্ব্বশী।

(৫)

রাজা রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রাজাও প্রজারঞ্জনে মনোনিবেশ করিলেন। রাজ্যে সুখের স্রোত বহিতে লাগিল, কিন্তু রাজার সন্তান না থাকায়, সেই সুখ-স্রোতের মধ্যে একটু দুঃখবাধা অনুভূত হইতেছিল একদিন পুণ্যতিথিতে রাজা মহিষী সহ গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে, পরিচারিকার হস্ত হইতে একটি শকুনি আমিষ-খণ্ড-ভ্রমে সঙ্গমনীয় মণিটি মুখে করিয়া লইয়া যায়। রাজা তাহা অবগত হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। তিনি সেই রক্ষকের ধনাপহারী বিহগ-তস্করের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, মণিটির স্বর্ণসূত্র মুখে করিয়া শকুনি অলাতচক্রের মত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার দ্রুত সঞ্চরণে মণিটির রাগ-রেখা বলয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই সময়ে বিদূষক প্রভৃতিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা কি করিবেন স্থির করিতে না পারায়, বিদূষক শকুনির প্রতি দয়া প্রকাশে ক্ষান্ত হইয়া রাজাকে তাহার বধের জন্য অনুরোধ করেন। রাজা ধনু আনিতে আদেশ দিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, পক্ষীটি রক্তাভ মণির দ্বারা অশোকস্তবকের ন্যায় দিগ্বধূর মুখখানি অলঙ্কৃত করিতেছে। তাহার পর রাজা ধনু গ্রহণ করিতে করিতে শকুনি বাণপথের অতীত হইয়া গেল। দূরে তাহার মুখস্থিত মণিটি মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে মঙ্গলগ্রহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাজা তখন কোন্ বৃক্ষে আশ্রয় লয় অনুসন্ধান করার জন্য কঞ্চুকীর দ্বারা নাগরিকদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন। বিদূষক রাজাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া কহিলেন যে, সে রত্নচোর তোমার শাসন অতিক্রম করিয়া

কোথায় যাইবে? রাজা বলিলেন,—"বয়স্য, সে মণিটি উৎকৃষ্ট বলিয়া আমি শকুনির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই নাই। তুমি জান যে, তাহার দ্বারা প্রিয়তমার সমাগম লাভ হইয়াছিল।" এই সময়ে কঞ্চুকী প্রত্যাগত হইয়া রাজাকে নিবেদন করিল যে, মহারাজের কোপপ্রভাবে বাণাকারে সেই বধ্যকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে তাহার শরীর বিদীর্ণ করিয়া শিরোমণিটির সহিত ভূতলে পাতিত করিয়াছে। কঞ্চুকীর হস্তে সঙ্গমণীয় মণিটি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। কঞ্চুকী তাহাকে প্রক্ষালিত করিয়া আনিয়াছিলেন। রাজা তাহাকে সযত্নে রাখিতে আদেশ দিলেন।

কাহার বাণে শকুনি ভূমিতল আশ্রয় করিল, এক্ষণে তাহারই বিচার আরম্ভ হইল। রাজা বাণটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাহাতে লিখিত আছে—"উর্ব্বশী হইতে সম্ভূত ধনুর্দ্ধর ইলায়ুজের কুমার রিপুকুলের আয়ুর্হর্ত্তা আয়ুর বাণ।" রাজা ও বিদূষক ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন; কারণ তাঁহারা কেহই উর্ব্বশীর সন্তান প্রসবের সংবাদ অবগত ছিলেন না। উর্ব্বশী দৈবীশক্তিসম্পন্না হওয়ায় মানবীর ন্যায় তাঁহার গর্ভলক্ষণ সম্ভবপর নহে; কাজেই তাঁহার সন্তান প্রসব অজ্ঞাত থাকিতে পারে ইহাই তাঁহারা স্থির করিলেন। এই সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, চ্যবনঋষির আশ্রম হইতে একটি কুমারকে লইয়া এক তাপসী আগমন করিয়াছেন। রাজা তাঁহাদিগকে আসিতে বলিলে, কঞ্চুকী তাপসী ও কুমারটীকে লইয়া আসিলেন। কুমারটিকে দেখিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিলেন, ইঁহারই নামাঙ্কিত বাণে শকুনিটি বিদ্ধ হইয়া থাকিবে। শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তাহাই যথার্থ; কারণ ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি নিপতিত হইয়া চক্ষু দুটিকে অশ্রুপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, হৃদয় বাৎসল্যবন্ধনে বদ্ধ হইতেছে, মন অপূর্ব্ব প্রসন্নতা লাভ করিতেছে, শরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, ধৈর্য্য লোপ পাইতেছে, আমার ইচ্ছা হইতেছে ইহাকে প্রগাঢ় ভাবে আলিঙ্গন করি।" তাপসীকে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিলেন, তাপসীও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনি সোমবংশ বিস্তার করুন"। তাহার পর,

তিনি রাজাকে প্রণাম করিবার জন্য কুমারকে বলিলে কুমার অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎস, আয়ুষ্মান হও।" কুমার মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "ইনি আমার পিতা, আমি ইঁহার পুত্র, এই কথা শুনিয়া যদি এইরূপ আনন্দ হয়, না জানি যাহারা পিতামাতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হয়, সেই পিতামাতার প্রতি তাহাদের ভালবাসা কত মধুর।" তাহার পর রাজা তাপসীকে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাপসী বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, জাতমাত্রেই এই কুমারটিকে উর্ব্বশী কোন কারণে আমার হস্তে অর্পণ করিয়া আসেন। মহর্ষি চ্যবন ক্ষত্রিয়াচারানুসারে ইঁহার জাতকর্ম্মাদি সমাধান করিয়া শাস্ত্র ও শস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আজ বালকটি ঋষি-কুমারদের সহিত পুষ্প, সমিধ্ ও কুশ আহরণের জন্য গমন করিয়া একটি আশ্রমবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে। একটি শকুনি আমিষখণ্ড লইয়া উড়িয়া যাইতে যাইতে কুমারের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় কুমার তাহাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করে। ভগবান চ্যবন তাহা অবগত হইয়া উহাকে উর্ব্বশীর হস্তে পুনঃ সমর্পণের জন্য আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেই জন্য আমি উর্ব্বশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।" রাজা তাপসীকে উপবেশন করিতে বলিয়া কঞ্চুকীর দ্বারা উর্ব্বশীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। তাহার পর কুমারকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "পুত্র, স্বর্গসুখ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হইয়া থাকে; তাই বৎস, চন্দ্রকান্ত মণিকে চন্দ্রকরস্পর্শের ন্যায়, আমাকে একবার স্পর্শ কর।" তাপসী কুমারকে পিতার চরণ বন্দনা করিতে বলিলে, কুমার অগ্রসর হইতে হইতে রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"বৎস তোমার পিতার প্রিয় সখা এই ব্রাহ্মণঠাকুরকে নির্ভয়ে প্রণাম কর।" শুনিয়া বিদূষক কহিলেন, "আমাকে আবার ভয় কিসের? আশ্রমে এরূপ অনেক বানর দেখিয়া থাকিবে।" কুমার হাসিতে হাসিতে বিদূষককে প্রণাম করিলেন, বিদূষকও আশীর্ব্বাদ করিতে বিস্মৃত হইলেন না।

এই সময়ে উর্ব্বশী কঞ্চুকীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কুমার আয়ুকে রাজার নিকট কণকপীঠে উপবিষ্ট ও রাজা কর্ত্তৃক তাঁহার চূড়া-বন্ধন দেখিয়া প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই;

তাহার পর তাপসীকে দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারই গর্ভজাত আয়ু একণে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা কুমারকে কহিলেন, 'বৎস, এই তোমার জননী আগমন করিয়াছেন। ঐ দেখ, তোমাকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার স্তনাংশুক স্নেহরসে সিক্ত হইয়া উঠিতেছে।" তাপসী কুমারকে তাঁহার মাতাকে প্রণাম করিতে বলিলে, কুমার মাতার নিকট অগ্রসর হইলেন। উর্ব্বশী তাপসীকে প্রণাম করিলে, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "স্বামীর আদরিণী হও।" তাহার পর কুমার মাতার চরণ বন্দনা করিলে উর্ব্বশী 'পিতার আরাধনায় তৎপর হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; রাজা উর্ব্বশীকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন। সকলে উপবেশন করিলে তাপসী বলিতে লাগিলেন যে, কুমার আয়ু এক্ষণে কৃতবিদ্য ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন। যাহাকে তুমি আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহাকে আবার তোমার পতির সমক্ষে তোমাকেই প্রত্যর্পণ করিলাম; এখন বিদায় লইতে ইচ্ছা করিতেছি, কারণ আশ্রমধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। উর্ব্বশী উত্তর করিলেন যে, অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ হওয়ায় দর্শন-স্পৃহা বাড়িয়া উঠিতেছে, আবার এদিকে আশ্রম-ধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটারও সম্ভাবনা। তবে আসুন, আবার যেন দর্শন পাই। রাজা তাপসীকে কহিলেন যে, মহর্ষি চ্যবনকে আমার প্রণাম জানাইবেন। তাপসী যাইতেছেন দেখিয়া কুমার আয়ু তাঁহার সহিত ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। রাজা বলিলেন যে, তোমার প্রথম আশ্রম বাস শেষ হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিতীয় আশ্রম-বাসের সময়। তাপসীও কুমারকে গুরুজনের বচনে মনোযোগ দিবার জন্য উপদেশ দিলেন। তখন কুমার কহিলেন, "যাহার শিখা কণ্ডূয়ন করিতে করিতে আমার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িত সেই শিতিকণ্ঠ ময়ূরটির কলাপ নির্গত হইলে এখানে পাঠাইয়া দিও।" তাপসী তাহাই হইবে বলিয়া রাজা ও উর্ব্বশীর প্রণাম গ্রহণ ও তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তাপসী গমন করিলে রাজা উর্ব্বশীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি, পৌলমীসম্ভব জয়ন্তকে পাইয়া পুরন্দর যেমন ধন্য হইয়াছিলেন, সেই রূপ তোমার এই সুপুত্র লাভ করিয়া আমি অদ্য পুত্রবান্‌দিগের অগ্রণী

হইলাম।” এই কথা শুনিয়া উর্ব্বশীর নয়ন হইতে অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। রাজাও বিদূষক তাহা লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। পরে রাজা বলিতে লাগিলেন যে, উর্ব্বশি, বংশধরের সমাগমে আমার আনন্দ-স্ফুরণের সময় তুমি রোদন করিয়া অশ্রুধারায় বক্ষোপরি পুনর্ব্বার মুক্তাহার রচনা করিতেছ কেন? উর্ব্বশী তখন রাজার নিকট জ্ঞাপন করিলেন যে, আপনার নিকট আগমনের সময় দেবরাজ বলিয়াছিলেন, “রাজা যখন তোমার পুত্রমুখ দর্শন করিবেন, তখন তুমি আবার স্বর্গে ফিরিয়া আসিবে;” তাই আমি জাতমাত্রেই কুমার আয়ুকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে ভগবতী সত্যবতীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সে পিতৃসেবায় সমর্থ হইয়া আগত হইয়াছে, আমারও স্বর্গ-গমন সময় উপস্থিত। এই কথা শুনিয়া রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। উর্ব্বশী, কঞ্চুকী, বিদূষক প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন যে, সুখভোগে দৈবের কি প্রতিকূলতা! পুত্রলাভে যেমন আমি আশ্বস্ত হইয়া উঠিলাম, অমনি কৃশোদরি, তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটিল। আতপক্লিষ্ট তরু নবমেঘবর্ষণে প্রথমে যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, পরে তাহার মস্তকে অশনিসম্পাত হইলে তাহার যেরূপ দশা ঘটে, আমারও অবস্থা ঠিক তাহাই হইয়াছে। অর্থ হইতে অনর্থ উপস্থিত দেখিয়া বিদূষক রাজাকে বল্কল ধারণ করিয়া তপোবনে যাইতে উপদেশ দিলেন। উর্ব্বশী আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজা উর্ব্বশীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন যে, বিয়োগসুলভা পরাধীনতা আপনার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে পারে না; তুমি স্বপ্রভুর শাসনানুবর্ত্তিনী হও, আমিও তোমার পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া মৃগযূথ-বিচরিত তপোবন আশ্রয় করি। শুনিয়া কুমার আয়ু উত্তর করিলেন যে, তাত, নৃপপুঙ্গবের ভার বৎসতরের প্রতি নিয়োগ করিবেন না। রাজা বলিতে লাগিলেন, “বৎস, ওকথা ঠিক নহে; গন্ধ-গজ শিশু হইলেও অন্যগজদিগকে শাসনে রাখিতে পারে। ভুজঙ্গশিশুর বিষও তীক্ষ্ণবেগ হয়। বালনৃপতিও ভূভার বহন করিতে পারেন। জাতিদ্বারাই কার্য্য সাধিত হয়, বয়সের অপেক্ষার কোনই প্রয়োজন নাই।”

তাহার পর রাজা কঞ্চুকীর দ্বারা অমাত্যদিগকে কুমারের রাজ্যা-

ভিষেকের আয়োজন করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। এই সময়ে আকাশতলে কাহার দেহজ্যোতির বিকাশ হওয়ায় রাজা বিদ্যুৎভ্রমে চমকিত হইয়া উঠেন। পরে বুঝিতে পারেন যে, দেবর্ষি নারদ অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার নিকষপাষাণে অঙ্কিত গোরোচনা-রেখাতুল্য পিঙ্গল জটাকলাপ ও শশিকলার ন্যায় শুভ্র উপবীতসূত্র দেখিয়া রাজার মনে হইল যেন, মুক্তাসরশোভিত হেমজটাসমন্বিত সঞ্চরণশীল কল্পবৃক্ষ অবতীর্ণ হইতেছে। তখন সকলে অর্ঘ্য আহরণে ব্যস্ত হইলেন। মহর্ষি নারদ অবতরণ করিলে, রাজা, উর্ব্বশী, কুমার প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনিও আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলে সকলে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা দেবর্ষির আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে, দেবরাজ আপনাকে বনগমনে কৃতনিশ্চয় জানিয়া এই সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ত্রিকালদর্শীরা অবগত করাইয়াছেন যে, দেবাসুর-সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী, সেই সংগ্রামে আপনি দেবরাজের সহায় হইবেন; সুতরাং এক্ষণে আপনার শস্ত্রত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। আর উর্ব্বশীও যাবজ্জীবন আপনার সহধর্ম্মচারিণী হইয়া থাকিবেন। ইহা শুনিয়া উর্ব্বশীর ভারাক্রান্ত হৃদয় লঘু হইয়া উঠিল। 'রাজাও অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া প্রকাশ করিলেন। দেবর্ষি উত্তর করিলেন যে, ইহা যথার্থ বটে; কারণ ইন্দ্র তোমার কার্য্য সাধন করুন, তুমিও তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন কর। সূর্য্য অগ্নির তেজ বাড়াইয়া থাকে, আবার অগ্নিও নিজ তেজে তাঁহাকে প্রচণ্ড করিয়া তুলেন। তাহার পর তিনি রম্ভা প্রভৃতিকে অভিষেক-দ্রব্যাদি আনয়নের আদেশ দিলে তাঁহারা সে সমস্ত লইয়া উপস্থিত হইলেন। রম্ভা কুমার আয়ুকে ভদ্রপীঠে উপবেশন করাইলে মহর্ষি স্বয়ং তাঁহার মস্তকে অভিষেক-বারি নিক্ষেপ করিলেন। অপ্সরারাও অন্যান্য কার্য্য শেষ করিয়া লইলেন। তাহার পর কুমার দেবর্ষি ও পিতামাতাকে প্রণাম করিলে তাঁহারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই সময়ে বৈতালিকেরা গাহিয়া উঠিলেন, "সুরমুনি অত্রি যেমন ব্রহ্মার সমান, চন্দ্র যেমন অত্রির সমান, বুধ যেমন চন্দ্রের সমান, আমাদের মহারাজ যেমন বুধের সমান, তুমিও সেইরূপ পিতার অনুরূপ হও। কমনীয় গুণভূষিত তোমাদের উৎকৃষ্ট বংশেই

সমস্ত আশীর্ব্বাদ বিদ্যমান রহিয়াছে।" তাহারা আবার গাহিতে লাগিল, গঙ্গা যেমন হিমালয় ও জলধিকে আপনার সলিল বিভাগ করিয়া দিয়া শোভাশালিনী হইয়া উঠেন, সেই রূপ উন্নতদিগের অগ্রণী তোমার পিতা ও ঐশ্বর্য্যশালী তোমার মধ্যে বিভক্ত হইয়া রাজলক্ষ্মীও শোভা বিস্তার করিতেছেন। অনেক দিন পরে রম্ভা ও উর্ব্বশীর সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। উর্ব্বশী রম্ভাকে প্রণাম করার জন্য আয়ুকে উপদেশ দিলেন। দেবর্ষি রাজাকে বলিতে লাগিলেন যে, তোমার পুত্র আয়ুর যৌবরাজ্যে অভিষেক দেখিয়া দেবরাজ কর্ত্তৃক কার্ত্তিকেয়ের সেনাপতিপদে বরণের কথা স্মরণ হইতেছে। রাজাও দেবর্ষিকে তাঁহার প্রতি দেবরাজের অনুগ্রহের কথা বারম্বার জানাইতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহাদের স্বর্গ-গমনের আয়োজন হইতে লাগিল।

সৃষ্টির আদিতে পুরূরবা ও উর্ব্বশীর মিলন সংঘটিত হয়। এই মিলনের উদ্দেশ্য সোমবংশ-বিস্তার। তাপসী সত্যবতীর বচন হইতে তাহা আমরা অবগত হইয়াছি। যে চন্দ্রবংশ ভারতে অনেক পুণ্য কার্য্যের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল, যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভগবান্ বসুন্ধরাকে পবিত্রীকৃত করিয়াছিলেন, সেই বংশ-ধারা প্রবাহিত করার জনাই স্বর্গের উর্ব্বশী ও মর্ত্ত্যের পুরূরবার মিলন ঘটিয়াছিল। এই মিলন আবার গৌরীচরণ-রাগ-জাত সঙ্গমনীয় মণির দ্বারা প্রগাঢ় হইয়া উঠে। যে চরণে সমস্ত বিশ্ব মিলিয়া যাইতেছে এবং যাহা হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি হইতেছে, সেই চরণ-রাগ-জাত মণিই ত মিলন ঘটাইয়া থাকে। তাই সৃষ্টির মূল কারণ ঘনীভূত হইয়া মণির আকারে পুরূরবা ও উর্ব্বশীর মিলন ঘটাইয়া চন্দ্রবংশ বিস্তার করিয়াছিল। আমরা সেই লোকপাবন বংশের কীর্ত্তি-কাহিনী পাঠ করিতে করিতে তাহার মধ্যে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সম্বন্ধ দেখিতে পাই।

জড়ভরত।

আমরা কোন ব্যক্তিকে নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিতে দেখিলে তাহাকে 'জড়ভরত' সংজ্ঞায় বিশেষিত করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা একবার চিন্তা করি না, যে তাহাকে আমরা কোন্ মহাপুরুষের সহিত তুলিত করিলাম। শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকমাত্রেই এই মহাপুরুষের ভক্তিতত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু সাধারণ পাঠকের তাহা অবিদিত বলিয়াই মনে হয়। তজ্জন্য এই পুণ্য কথার অবতারণা।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রও বহু, এবং তাহার মত ও বহু। এক বিষয় এক পুরাণে এক রূপ লিখিত হইয়াছে, এবং সেই বিষয়ই অন্য পুরাণে অন্য রূপ লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নামকরণ কোন্ মহাপুরুষ হইতে হইয়াছে, ইহা স্থির করা দুর্ঘট। মহাভারত বলিতেছেন, " * * ইজে চ বহুভির্যজ্ঞৈ র্যথা শক্রো মরুৎপতিঃ॥ যাজয়ামাস তং কণ্বো বিধিবদ্ভূরিদক্ষিণম্। শ্রীমান্ গোবিততং নাম বাজিমেধমবাপ সঃ॥ অস্মিন্ সহস্রং পদ্মানাং কণ্বায় ভরতো দদৌ। ভরতাদ্ভারতী কীর্ত্তির্যেনেদং ভারতং কুলম্॥ অপরে যে চ পূর্ব্বে বৈ ভারতাঃ ইতি বিশ্রুতাঃ। ভরতস্যান্বয়ে হি দেবকল্পা মহৌজসঃ॥" অর্থাৎ তিনি (দুষ্মন্তপুত্র ভরত) "দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কণ্ব তাঁহাকে ভূরিদক্ষিণাবিশিষ্ট যাগ করাইয়াছিলেন। সেই শ্রীমান্ ভরত গোবিতত-নামক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তাহাতে ভগবান্ কণ্বঋষিকে সহস্র পদ্মসংখ্যক ধন প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভারতী কীর্ত্তি সেই ভরত হইতেই হইয়াছে এবং তাহা হইতেই এই ভারতকুল বিস্তীর্ণ হইয়াছে। ভরতের বংশে যে সকল দেবতুল্য মহৌজসাঃ ব্রহ্মকল্প বহুসংখ্যক রাজসত্তম জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারত নামে বিশ্রুত হইয়াছেন" (স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)। এস্থলে যদিও ভারতবর্ষ নামের কোন উল্লেখ নাই তথাপি চন্দ্রবংশীয় দুষ্মন্তপুত্র ভরত হইতেই যে এই দেশের ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। আবার দেখুন,—শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, ১০

অধ্যায়—"* * অজনাভং নামৈতদ্বর্ষং ভারতমিতি যস্মাৎ আরভ্য ব্যপদিশন্তি॥" "অর্থাৎ এই বর্ষের (জম্বুদ্বীপের অংশের) নাম পূর্ব্বে 'অজনাভ' ছিল। ভরত রাজা হইলে পর তদবধি ইহা ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।" (বঙ্গবাসী প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ)।

এই উভয় ভরতই নানাগুণলঙ্কৃত শৌর্য্যবীর্যশালী জনকের বংশধর। একজন লোকবিশ্রুত রাজচক্রবর্ত্তী দুষ্মন্ততনয়। অপর জন লোকপালগণের ভূষণস্বরূপ ভগবান্ ঋষভদেবের পুত্র। ইহাদের মধ্যে কাহার নামানুসারে ভারতবর্ষের প্রকৃত নামকরণ হইয়াছে, তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা দেখিব যে, যে মহাত্মার পবিত্র নামের সহিত আমাদের পুণ্যভূমির নাম বিজড়িত, সেই মহানুভব যোগিপুরুষ কিরূপে 'জড়' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পূত অদ্ভুত জীবনকাহিনী অবলম্বনে তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবতে নাভিপুত্র ঋষভদেব ভগবানের একতম অবতার। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত। ঋষভদেব যোগ্যপুত্র ভরতের উপর রাজ্যভার প্রদান করিয়া তনুত্যাগ করিলে পর, নৃপতি ভরত রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজাবৎসল, রাজর্ষি জনকের ন্যায় তত্ত্বদর্শী হৃদয় লইয়া বহুকাল রাজ্যভোগান্তে রাজ্যধনাদি সন্তানগণের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিয়া ভগবদর্চ্চনা-মানসে হরিক্ষেত্রে গমন করিলেন। তিনি তথায় সর্ব্বদা পরম পুরুষের ধ্যানেই নিমগ্ন থাকিতেন। একদিন তাপসশ্রেষ্ঠ ভরত মহানদী গণ্ডকীতীরে বসিয়া প্রণব জপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক পূর্ণগর্ভা হরিণী নদীতে জলপান করিতে আসিয়া অদূরে ভীষণ সিংহগর্জ্জন শ্রবণ করত ভীতচকিতা হইয়া নদীজলে ঝম্প প্রদান করিল। ভয়ে সন্তরণ-ক্লেশে মৃগীর গর্ভ স্থানচ্যুত হইয়া নদীজলে বহির্গত হইয়া পড়িল। মৃগীও প্রসবযাতনায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; কিন্তু মৃগশিশুকে জীবিত দেখিয়া মহাপুরুষের করুণাসঞ্চার হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া মৃগশাবকের প্রাণরক্ষা করিলেন ও স্বীয় আশ্রমে লইয়া আসিয়া তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বজীবে দয়া ভগবল্লাভের অন্যতম সোপান। অতএব পরম ভাগবত ভরতে তাহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইবে কেন? কিন্তু মায়া প্রলয়ঙ্করী। তাহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী

শক্তির কার্য্য আরম্ভ হইল। এখন আর মহাযোগী তত নিবিষ্টচিত্তে ধ্যানধারণা করিতে পারেন না, পাছে বনে আশ্রিত হরিণ-শিশুর কোনরূপ বিপদ ঘটে। যে সময়ে তিনি তুলসী, কুসুম, সমিধ্, কুশ, ফল, মূল প্রভৃতি আহরণ করিতেন, এখন তাহার অধিকাংশ সময় মৃগশাবকের সেবায় অতিবাহিত হইতে লাগিল। পরম পুরুষের ধ্যান ক্রমে ক্রমে হরিণশিশুর চিন্তায় পরিণত হইল। সুরেপ্সিত সাম্রাজ্যলক্ষ্মী ও স্বীয় আত্মজগণের প্রতি মমতা যে যোগী পুরুষকে বন্ধন করিতে পারগ হয় নাই, অদ্য এক মৃগীকুমারের প্রতি আসক্তিই তাঁহাকে বিশ্বনিয়ন্তার রাতুল চরণ হইতে স্খলিত করিল। ধন্য মায়া! ধন্য তাহার বিশ্ববিজয়িনী ক্ষমতা! এরূপ না হইলে কি লৌহকারের স্বহস্তে প্রস্তুত অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা-কালে স্বীয় অঙ্গুলি কর্ত্তনের ন্যায়, স্বয়ং ভগবান্‌কেই লীলাকালে এই মায়াবিনী শক্তির দ্বারা বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়? সে যাহা হউক, যখন যোগিবর ভরত এইরূপে সেই মহামহিম মায়ের চরণযুগল হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছিলেন, তখন একদিন মূষিকবিবরসেবী সর্পের ন্যায়, দুরতিক্রম কাল তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেই আসন্ন কালেও তিনি দেখিলেন, সেই মৃগশিশু সন্তানের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছে। অতএব কুরঙ্গশিশুর বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই তিনি দেহত্যাগ করিলেন। ভগবান্ গীতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ফলিল—"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করে সে সর্ব্বদা সেই ভাব ভাবনার জন্য সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। ভরতের তাহাই হইল। তিনি মৃগরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

মৃগশরীর ধারণ করিলেও মহাপুরুষের পূর্ব্বজন্মস্মৃতি বর্ত্তমান থাকায়, এবার তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় একাকী শুষ্কপত্রাদি ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন ও উরুক্রমশীল মুনিগণের পবিত্র সহবাস সংঘটিত হইলেও সঙ্গভয়ে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিয়া তাঁহার মৃগত্বের অবসানকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কালে তিনি মৃগশরীর ত্যাগ করিলেন।

মৃগত্ব ত্যাগ করিয়া ভরত দ্বিজত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি এক নিষ্ঠাবান্

ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিলেন। বাল্যকালেই তাঁহার অসামান্য ভগবদ্ভক্তি দর্শন করিয়া লোকে বলিত, "সেই রাজর্ষি ভরত মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া এই বিপ্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।" লোকের একথা বলিবার কারণও ছিল। পাছে পুনরায় সঙ্গহেতু অধঃপতন হয়, এই আশঙ্কায় তিনি দ্বিজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপ না করিয়া আপনাকে জড়, বধির বা অন্ধের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঈদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে অধিকতর স্নেহ ও যত্নের সহিত বিপ্রোচিত শিক্ষা দিতে সচেষ্ট থাকিতেন, কিন্তু ভরতে তাহা ফলপ্রদ হয় নাই। ভরত বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড পরিত্যাগ করিলেও অন্তরে সর্ব্বদা আত্মপুরুষের চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া নিশ্চেষ্টবৎ থাকিতেন। অনন্তর তাঁহার পিতা পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে শিক্ষাবিমুখ, জড়মতি, নিশ্চেষ্ট মনে করিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এমন কি প্রতিবাসীরাও যে কোন নীচ বা আয়াসসাধ্য কার্য্য তাঁহার দ্বারা করাইয়া লইতেন ও তদ্বিনিময়ে কদর্য্য অন্ন ভোজন করিতে দিতেন। তাহাতেও সেই আত্মারাম পুরুষের আনন্দ হইত। তিনি ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য ভোজন বা অন্য দৈহিক অনুষ্ঠান করিতেন না, সমীপানীত দেহধারণযোগ্য ভোজ্যই গ্রহণ করিতেন; তাঁহার মান অপমান, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, বাতবর্ষায় সমজ্ঞান হইয়াছিল। একদিন তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে অন্ধকারময় রাত্রিতে শস্যক্ষেত্র রক্ষণ কার্য্যে নিয়োজিত করিল। তিনিও যোগাবলম্বনে স্বদেহ ঊর্দ্ধে রাখিয়া ক্ষেত্রে প্রহরা দিতে লাগিলেন।

প্রগাঢ় অন্ধকার। নিশীথিনীর মলিনত্ব যেন অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে। এরূপ গাঢ় তমসাবৃত রজনীতে এক চৌরবাজ পুত্রকামী হইয়া ভদ্রকালীর আরাধনায় নিযুক্ত। তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ নরপশু বধার্থ আনীত হইয়া দৈবের বিড়ম্বনায় বন্ধনমুক্ত হইয়া পলায়ন করিল। তাহার অনুচরেরা সেই পশুর অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে লাগিল কিন্তু কুত্রাপি তাহার সন্ধান পাইল না। অবশেষে তাহারা ভ্রমণ করিতে করিতে যথায় সেই জড়রূপী বিপ্রতনয় অদ্ভুত উপায়ে শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকেই সুলক্ষণযুক্ত নরপশুজ্ঞানে ধৃত করিয়া রজ্জুবদ্ধ

করিল। তাহাতে যোগিবরের ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনাঃ, রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় বন্ধনকারীদিগের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। তস্কররাজ তাঁহাকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে দেবীর পূজায় পুনঃ প্রবৃত্ত হইল। ভরতকে স্নাত, উত্তমবস্ত্রপরিহিত, ও মাল্যবিভূষিত করা হইল। বিবিধ বাদ্যযন্ত্র নিনাদিত হইতে লাগিল। দস্যুপতি শানিত খড়্গহস্তে দেবী চণ্ডিকার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। মহাযোগী ভরত অধোবদনে করযোড়ে দেবীসম্মুখে উপবিষ্ট। জগন্মাতা কখন ভক্তের অবমাননা সহ্য করিতে পারেন না। তিনি তাঁহার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিকে অধিকতর ভীষণ করিয়া উপস্থিত সকলের ভয়াবহা হইয়া উঠিলেন এবং স্বহস্তস্থিত খড়্গের দ্বারা সকল দস্যুরই প্রাণবধ করিলেন। এইরূপে ভক্তের ভগবান্ ভদ্রকালীরূপে ভক্তবরকে রক্ষা করিলেন।

আর একদিন সিন্ধুসৌবীরপতি রাজা রহূগণ শিবিকারোহণে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার একজন শিবিকাবাহকের অভাব হয়। ইক্ষুমতী নদীতীরে ব্রহ্মজ্ঞ ভরত উপবিষ্ট ছিলেন। নৃপতির এক অনুচর বাহকের অনুসন্ধান করিতে করিতে জড়রূপী ভরতকে উপযুক্ত বাহক মনে করিয়া ধৃত করিয়া রাজশিবিকায় সংযোজিত করিল। ইহাতে মহাপুরুষের কোন আপত্তি বা দ্বিধা বোধ হইল না। তিনি শিবিকা বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। কিন্তু পাছে, অসাবধানতাক্রমে পাদক্ষেপে কোন জীবহিংসা হয়, এই আশঙ্কায় অন্যবাহকগণের সহিত সমানভাবে দ্রুত পাদবিক্ষেপ করিতে না পারায় ও তজ্জন্য শিবিকা বিষম হইয়া পড়ায় রাজা রহূগণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নূতন আগন্তুকের অক্ষমতাই শিবিকার বিষমগতির কারণ অবগত হইয়া, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ প্রচ্ছন্নব্রহ্মতেজাঃ মহানুভব ভরতকে সরোষে অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না, মৌনী হইয়াই শিবিকাবহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু শিবিকা পূর্ব্ববৎ বিষম হইয়াই চলিল। ইহাতে রাজা রহূগণ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন; "আরে, তুমি কি জীবন্মৃত? আমি, তোর প্রভু, আমাকে অনাদর করিতেছিস্; দেখিতেছি, তোর এই প্রমত্ততার শাস্তি না দিলে তুই প্রকৃতিস্থ হইবি না।" রাজা রহূগণ যোগেশ্বরদিগের আচার ব্যবহার পরিজ্ঞাত ছিলেন না; তজ্জন্য তাঁহাকে প্রকৃত মানব-

জ্ঞানে তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তত্ত্বদর্শী ভরত উত্তর করিলেন, "হে বীর, তুমি যে আমাকে জীবন্মৃত বলিয়া উপহাস করিলে, তা শুধু আমাকে কেন, পরিণামশীল বিকারী পদার্থমাত্রকেই জীবন্মৃত বলা যায়, কারণ তাহাদের আদি ও অন্ত আছে। অতএব শুধু কেবল আমি নহি,—তুমি, আমি, প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থনিচয় জীবন্মৃত। আর তুমি যে নিজেকে 'প্রভু' জ্ঞান করিয়া তোমাকে অবজ্ঞা করার কথা বলিলে, উহার কোন চিরন্তন অর্থ নাই। অদ্য তোমার রাজ্য আছে বলিয়া তুমি প্রভু সাজিয়াছ, কল্য যদি উহা আমার হয়, তবে আমাদের সম্বন্ধ বিপরীত হইয়া যাইবে। যদি বল 'যতক্ষণ রাজ্য আছে, ততক্ষণ ত বটে' ইহার উত্তর এই যে—একবার ভাবিয়া দেখ, "প্রভু কে? প্রভুত্বই বা কি?" সে কথা থাক্, যদি তোমার প্রভুত্বের অভিমান অধিক হইয়া থাকে, তবে বল, আমি তোমার আদেশ প্রতিপালন করিতেছি। তোমার কর্তৃত্বাভিমান খণ্ডন করিতে চাহি না। আর এক কথা "তুমি যে আমাকে শাস্তি দিয়া প্রকৃতিস্থ করিবে", বলিলে, তাহার উত্তরে এই বলি, যদিও আমি জড় বা মত্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ আমি ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করিয়াছি, তুমি যে কোন শাস্তি প্রদান কর না কেন, আমার কিছুই ইষ্টানিষ্ট নাই। আর আমাকে যদি প্রাকৃত জনের ন্যায় জড় বা শুদ্ধ মনে কর, তাহা হইলেও আমাকে শাস্তি দেওয়া বৃথা, কারণ জড়-স্বভাব কখন শিক্ষা বা শাস্তির দ্বারা উন্নতিলাভ করে না উহা পিষ্ট-পেষণবৎ নিষ্ফল।"

আমরা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে এইরূপ এক অদ্ভুত শিবিকা-বাহকের পরিচয় পাইয়াছিলাম। একদা এক রাজা শিবিকারোহণে যাইতে যাইতে তাঁহার এক শিবিকা-বাহক অসুস্থ হইয়া পড়ায় শিবিকাবাহকের অভাবে ছদ্মবেশী মহাকবি কালিদাস ধৃত হইয়া শিবিকাবাহন কার্য্যে নিয়োজিত হ'ন। অন্য শিবিকাবাহকগণের সহিত সমান ভাবে গমন করিতে পারগ না হওয়ায় কালিদাসও এইরূপে সম্বোধিত হইয়াছিলেন।

"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।" অর্থাৎ অরে মূঢ়, যদি স্কন্ধে কষ্টবোধ কর, কিছুকাল বিশ্রাম কর। বাহকরূপী কালিদাস উত্তর দ্বারা শ্লোকের অপর চরণ পূরণ করিলেন,—"ন বাধতে তথা স্কন্ধো যথা বাধতি

বাধতে ॥” অর্থাৎ আমার স্কন্ধে তত লাগিতেছে না, যত ‘বাধতি’ পদটীতে লাগিতেছে, অর্থাৎ বাধ ধাতু আত্মনেপদী, সুতরাং রাজা পরস্মৈপদে প্রয়োগ করায় উহা অশুদ্ধ প্রয়োগ হইয়াছে। পরে রাজা কবি কালিদাস বলিয়া জানিতে পারায় তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

এক্ষণেও শিবিকাবাহকের মুখে এইরূপ সারগর্ভ তত্ত্ব-কথা শ্রবণ করিয়া রাজা রহূগণ বাহককে জানিবার জন্য শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং বিপ্ররূপী ভরতকে দেখিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া আত্মকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরে জড়রূপী ভরত রাজাকে বিবিধ নির্ম্মল জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার অজ্ঞানাভিমান দূর করিলেন। রাজা ক্ষণ কালের মধ্যেই সাধুসঙ্গের অদ্ভুত ফল প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। পরম ভাগবত সাধু ভরতের ইহা সংক্ষিপ্ত কাহিনী। হায়, ইনিই জড়ভরত নামে পরিচিত হইয়া এক্ষণে নিশ্চেষ্ট নিষ্কর্ম্মা অলস ব্যক্তির উপমাস্থল হইয়াছেন! অহো কাল-মাহাত্ম্য!

শ্রীহরিপদ সরকার।

উদাস পরাণ।

[১]

নিদাঘ-দুপুরে যবে প্রাণ ছট্ ফট্
শত চিন্তা ছুটোছুটি মস্তিষ্ক-কোটরে;
করে কত অভিনয় অদ্ভুত বিকট
ল’য়ে যায় হৃদিখানি মরুভূ-প্রান্তরে।
প্রাচীরের উচ্চ শিরে ঘু-ঘু থাকি থাকি

তোলে যবে ঘু ঘু ঘু ঘু বৈরাগ্যের তান,
সহসা হৃদয়খানা ফেলে যেন চিঁড়ি,
ব্যাকুল চকিত মোর উদাসী পরাণ।
মনে হয় সংসারের শত পাশ ছিঁড়ি,
কাননে ছুটিয়া যাই কাননের পাখী
মনে হয় বৃথা বৃথা, বিশ্বমাঝে ফিরি.
জীবনের সব কাজ রয়ে গেল বাকী।
রোমাঞ্চিত প্রাণ মম করে দাপাদাপি
কোথা শান্তি! কোথা শান্তি! থরথর কাঁপি।

[২]

বরিষা-বাসরে যবে গৃহদ্বারে বসি,
শুনি ঝর ঝর ধ্বনি স্তিমিতহৃদয়,
আকাশে চাহিয়া দেখি নাহি রবিশশী
চাহি যবে, অনিমিষে, স্তম্ভিত, সভয়।
মনে হয় 'কেন হেথা' কোথাকার আমি,
কি করিতে এ সংসারে জনম আমার?
উদাসী পরাণ মম শুধু দিবা যামী
ছুটে ছুটে যেতে চায় জগতের পার।
সৌদামিনী থাকি থাকি উজলে ধরণী
গেহ হতে পলাইতে পথ সে দেখায়
বারিদের গুরু গুরু সুকরুণ ধ্বনি
পঞ্জরে পঞ্জরে শুধু কেবল কাঁপায়।
বর্ষণের সেই এক ঝর ঝর তান
কোন্ বিশে লয়ে যায় উদাসী পরাণ।

[৩]

শরৎ-প্রভাতে যবে দেখি দিবাকরে
শান্ত বিশ্বে রশ্মি-করে যেতে আলিঙ্গিয়া,

চুম্বিতে গো বারে বারে সোহাগে আদরে
বরিষার নেত্র-জল ধীরে মুছাইয়া ;
মনে হয় জগতের ঘৃণ্য নিম্নতলে
রহিব না যাই চলে' উপরের দিকে !
টল মল নদী ডাকে ধীরে কল কলে
এস গো পিঞ্জরে কেন দাঁড়ে আর শিকে ?
উদাস পরাণ মম চারি দিকে চায়
মনে হয়, রহিব না বন্দীজন-বেশে,
ইন্দ্রধনু জনে যথা আকাশের গায়,
ইচ্ছা সেই দ্বার দিয়ে যাই অন্য দেশে ।
পাপীয়া শ্যামল তরু-শিরে ঢালে তান
আবেশে গলিয়া পড়ে অবসন্ন প্রাণ ।

[৪]

হেমন্ত-নিশীথে যবে শুভ্র জোছনায়
হৃদয়ের গুরু ভার সব যায় দূরে,
অতৃপ্ত আশায় লঘু মন মম চায়
সমস্ত জোছনারাশি বুকে নিতে পুরে ।
আঁকাবি অনন্ত জ্যোৎস্না ধরিতে ধরিতে
চলে যাই চাঁদের সে চাঁদপারা দেশে
উদাস পরাণ মম থাকে না চাহিতে
যে দেশে আঁধার রাজা, তপ্ত রৌদ্র আসে ।
শেফালিকা যূথিকার বাসভরা প্রাণ
আধশীতলিত বায়ু কহে কাণে কাণে
"সংসারের অন্ধ কূপে কেন অবস্থান
ধরো হাত, নিয়ে যাবো অন্য দেশ পানে ।"
আমি বলি ওগো তোরা নিয়ে যা আমায়
থাকিব না গৃহকোণে চির কালিমায় ।

[৫]

শীতের দুর্দ্দিনে পুনঃ বিজড়িত বাসে
সুবেষ্টিত গৃহকোণে বসিয়া শয্যায়
প্রকৃতির সব সুত দেখি যবে হাসে
নগ্ন গাত্রে নিরাপদে জগতে বেড়ায়
মনে হয় ফেলে দেই বস্ত্রগ্রন্থিরাশি
বসনের জালবন্ধে লাগে প্রাণে বাধা
অসন্তাপে চলে গিয়ে হই বনবাসী
যেখানে সকল ভ্রাতা যাই আমি তথা।
শিশিরের বিন্দুগুলি ডেকে ডেকে বলে
"ভুলিয়া পড়েছি আসি শুষ্ক ধরা পরে
প্রথমেতে সুখ হেথা শেষে দুখ ফলে
থেকো না এখানে নর ফিরে যাও ঘরে।'
উদাস পরাণ মম ছোটে চারি ধার
পথপার্শ্বে ফেলে দিয়ে সংসারের ভার।

[৬]

বসন্ত-বিকালে পুনঃ মুক্ত মাঠে মন,
অলস, আবেশপূর্ণ ছোটে বহু দূর
বহিয়া বেলার ঘ্রাণ মলয় পবন
কাছে এসে করে প্রাণ আকুল বিধুর।
"পলা পলা যেই দিকে দুই চোখ যায়"
উদাসী গোধূলি বলে গ্রামপথে নামি,
শূন্যে হাতবিয়ে আমি শূন্য পাই হায়,
'নিয়ে যাও সঙ্গে করি ওগো যাব আমি'
শ্যামল পাতার পাশে একটা কোকিল
হেন কালে কুহুতানে বিদরে জগৎ।

আমি দুখে কেঁদে ফেলি। সমস্ত নিখিল
মনে হয় মোর কাছে মহাশূন্যবৎ।
আমিও হারাই মম উধাও পরাণ
জগতের পরপারে খোঁজে কোন স্থান॥

শ্রীকালিদাস রায়।

দেববংশম্। *

(১)

বন্দ্যঘট্যা দেবকুলং দেবানাং কুলমুত্তমম্।
শৃণ্বন্তু হি লোকাঃ সর্ব্বে ভট্টেন বিবৃতং যথা॥ ১
কর্ণসেন্য এতে দেবা খ্যাতিবন্তো মহীতলে।
শাণ্ডিল্যগোত্র মেতেষাং জগতি পরিবিদিতম্॥ ২
হরিদ্বারা দাগতাস্তে স্থিতবন্তো মগধেষু।
ক্ষত্রপকায়স্থা দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভবাঃ॥ ৩
প্রসাদঃ শ্রূয়তে তেষু ব্রহ্মাবর্ত্তে দেবভূমৌ।
পবিত্রহ্রদকূলেষু সর্ব্বে তে নিবসন্তি স্ম॥ ৪
দেববংশ-গুণাবলী যা ময়া পরিকীর্ত্তিতা।
শ্রোতব্যা কৌতূহলেন সর্ব্বৈর্হি মানবৈস্তথা॥ ৫
আসীদ্রাজা দাতাকর্ণঃ খ্যাতিবাংশ্চ মহীতলে।
কর্ণসেননামধেয়ঃ কর্ণপুরস্য ভূপালঃ॥ ৬

* বৈশাখ সংখ্যায় আমরা এই কুলগ্রন্থখানিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে ঐতিহাসিক টিপ্পনী সহ ইহাকে সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা যাইতেছে। ইহার শ্লোকাদি যথাযথ রক্ষিত হইল।

করণকায়স্থো রাজা মহাশূরো মহাবলী।
কর্ণবর্ণস্থাপয়িতা উক্তশ্চ ভারতে যথা॥ ৭
কর্ণভাগীরথী সন্থিঃ নয়নরঞ্জন শ্চহি।
যত্র কর্ণপুরং রাজা নির্মমে বহুকৌশলৈঃ॥ ৮
বিচিত্রং হি কর্ণপুরং স্বর্ণেন নির্ম্মিতং যথা।
অজ্ঞোহ্যহং ভাষায়াঞ্চ বর্ণনায়াং পরাঙ্মুখঃ॥ ৯
সৌধমালাসমাকীর্ণং ধনজনপরিপূর্ণম্।
যত্নেন রক্ষিতং সৈন্যৈ দুর্ভেদ্যং তৎ পুরং সদা॥ ১০
তৎপুরবাসীনঃ সর্ব্বে আনন্দে চ সদা মগ্নাঃ।
কর্ণসেনপ্রস্তাবেন রাজাঞ্চ নির্ম্মিরং তথা॥ ১১
দেবাংশেন কর্ণপতেঃ কুমারো জাতবানসৌ।
বৃষকেতু রিতি নাম প্রসিদ্ধশ্চ হি ভারতে॥ ১২
শুভান্ন-প্রাশন-দিনে মাগতশ্চাতঃ পরম্।
বিভীষণো লঙ্কেশ্বরো যত্রাগতো মহাকৃতিঃ॥ ১৩
যস্মাদ্ভবত্তত্র হেমবৃষ্টিঃ সুরলোকাৎ।
ততঃ কর্ণস্বর্ণো নাম রাজস্য বভূব চেতি॥ ১৪

অনুবাদ—বন্দ্যঘটীয় দেব-কুল দেব-বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভট্ট কর্তৃক তাহা যেরূপে বিবৃত হইয়াছে, সকলে তাহা শ্রবণ করুন। এই দেবগণ কর্ণসেনী নামে মহীতলে খ্যাত, ইঁহাদের গোত্র শাণ্ডিল্য নামে জগতে পরিবিদিত আছে। ইঁহারা হরিদ্বার হইতে মগধে আসিয়া অবস্থিতি করেন, ইঁহারা করণ কায়স্থ, দ্বিজ ও ক্ষত্রিয়-কুল-সম্ভব। এইরূপ প্রবাদ শ্রুত হয় যে, তাঁহারা দেবভূমি ব্রহ্মাবর্ত্তের পবিত্র হৃদকূলে বাস করিতেন। দেববংশের যে গুণাবলী আমি পরিকীর্ত্তিত করিতেছি, সকলের তাহা কৌতূহল সহকারে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। মহীতলে সুবিখ্যাত দাতাকর্ণ নামে রাজা ছিলেন, তিনি কর্ণসেন নামে অভিহিত ও কর্ণপুরের ভূপাল, উক্ত রাজা করণ কায়স্থ মহাশূর ও মহাবল, ইনি কর্ণস্বর্ণের স্থাপয়িতা। তাহা ভারতে উক্ত আছে, নয়ন-রঞ্জন কর্ণভাগীরথীর সন্ধিতে রাজা বহুকৌশলে কর্ণপুর স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই বিচিত্র কর্ণপুর যেন স্বর্ণনির্ম্মিত হইয়াছিল, অজ্ঞ আমি তাহা

তাহার বর্ণনা করিতে পরাঙ্মুখ। সেই পুরটি সৌধমালা-সমাকীর্ণ ও ধনজনে পরিপূর্ণ ছিল, এবং সর্ব্বদা যত্ন সহকারে সৈন্য দ্বারা রক্ষিত হইয়া দুর্ভেদ্য হইয়া উঠে। তাহার অধিবাসিগণ সর্ব্বদা আনন্দে মগ্ন ছিল, কর্ণ সেনের প্রতাপে তাঁহার রাজ্য ও নির্ব্বৈর ভাবে অবস্থিতি করিত কর্ণপতির পুত্র দেবাংশে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বৃষকেতু নামে ভারতে প্রসিদ্ধ। অতঃপর তাঁহার শুভান্নপ্রাশন দিন আগত হইলে মহাকৃতি লঙ্কেশ্বর বিভীষণ তথায় আগমন করেন। তাঁহার আগমনে দেবলোক হইতে স্বর্ণবৃষ্টি হয়, তজ্জন্য উক্ত রাজ্যের নাম কর্ণস্বর্ণ হইয়া উঠে।

টিপ্পনী—বন্দ্যঘটী রাঢ়ের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম, এই কুলগ্রন্থের মতে ইহা কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কায়স্থ দেব-বংশীয়েরা এখানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই দেববংশীয়েরা হরিদ্বার হইতে মগধে আগমন করেন বলিয়া কুলগ্রন্থে দেখা যাইতেছে। প্রথমে তাঁহারা ব্রহ্মাবর্ত্তের হ্রদ-কূলে বাস করিতেন, দেবনদী সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী স্থানই ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া খ্যাত।

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যো দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥" মনু

দেবগণ ক্ষত্রপ কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত হইতেছেন, কোন কোন কুল গ্রন্থে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রণীত বঙ্গজকায়স্থকারিকা ও কুলাচার্য্য পঞ্চাননদেবশর্ম্মা রচিত উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে আমরা কোন বিচার করিতে চাহি না, সে সম্বন্ধে অনেক বিচার হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে। এক্ষণে আমরা ক্ষত্রপ সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ক্ষত্রপ শব্দ মুসলমান সময়ে পশ্চিম ভারতে ছত্রপতি ও ইংরেজী ইতিহাসে Satrap নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই শব্দ পারস্যের সুপ্রাচীন কিলকপাশিলালিপি বর্ণিত ক্ষত্রপ বন্ শব্দ হইতে আসিয়াছে, ইহার অর্থ মণ্ডল বা বিষয়ের রক্ষক। এই ক্ষত্রপের অধিকার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে।

"Cyries the Great divided his empire into provinces; a

definitive organization was given by Darius, who established twenty great satrapies and fixed their tribute. (Herodotus 11189 & 99) The satrap was the head of the administration of his province : he collected the taxes, controlled the local officials and the subject tribes and cities, and was the supreme judge of the province to whose "chair" (Neham iii 7) every civil and criminal case could be brought. He was responsible for the safety of the roads (cf. Heusphon Auale i-9-13) and had to put down brigands and rebels. He was assisted by a Council of Persians, to which also provincials were admitted, and was controlled by a royal secretary and by emmissaries of the king. Eueyclo. Britannica 11th ed. vol. xxv. P. 230.

পারস্যে ক্ষত্রপদিগের যেরূপ অধিকার ভারতেও ক্ষত্রপদিগের ঐরূপ অধিকার ছিল। ভারতবর্ষে যে সমস্ত আদি ক্ষত্রপদিগের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারা প্রধানতঃ সৈনিক বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তাঁহাদিগের কতকগুলি মুদ্রার ও তক্ষশিলার শিলালিপিতে তাঁহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে তাঁহারা পার্থিয়া প্রদেশ হইতে সমাগত হন। ইঁহারা উত্তর ক্ষত্রপ ও পশ্চিম ক্ষত্রপ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। উত্তর ক্ষত্রপেরা হিমালয়ের উপত্যকা হইতে অঙ্গগাঙ্গ প্রদেশ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পশ্চিম ক্ষত্রপেরা মালব, সিন্ধু, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ইঁহারা প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভারতীয় ক্ষত্রপগণের মধ্যে অধিকাংশেরই অগ্রে মহাশব্দ ব্যবহৃত হইত। এই মহাক্ষত্রপগণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাঁহারা সম্ভবতঃ পিতার অগ্রে মৃত হইয়াছিলেন, অথবা অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারা মহাক্ষত্রপ উপাধি

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস —রাজন্যকাণ্ড' এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রহণ করেন নাই; সুলতানগঞ্জের নিকট একটি বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষ অনুসন্ধান কালে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও মহাক্ষত্রপস্বামী রুদ্র সেনের দুইটি মুদ্রা পাওয়া যায়। রুদ্রসেনের পিতার নাম স্বর্গ বা সত্য সেন। ইঁহারা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। আবার রুদ্রদাস পুত্র রুদ্র সেনও চতুর্থ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আদি ক্ষত্রপেরা যে জাতি বা যে বংশ-সম্ভূত হউন না কেন, ক্রমে ক্ষত্রপ শব্দ যে রাজকর্ম্মচারী বিশেষের উপাধি হইয়া উঠে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং কায়স্থগণ প্রাচীন কাল হইতে রাজ কর্ম্মচারী থাকায় তাঁহাদের ক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

কর্ণ সেনের প্রবাদ সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে তাঁহাকে মহাভারতের দাতাকর্ণ বলিয়াই বোধ হয়, অথবা কুলগ্রন্থকার তাঁহাকে ক্ষত্রপ কায়স্থও বলিতেছেন। আমরা মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে রাঙ্গামাটী প্রসঙ্গে উক্ত স্থানের সহিত যে কর্ণ-সেন বা দাতা কর্ণের সম্বন্ধ আছে তাহার উল্লেখ করিয়াছি, এবং এই কুলগ্রন্থের প্রবাদের ন্যায় তাঁহার পুত্র বৃষসেন বা বৃষকেতুর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যে লঙ্কেশ্বর বিভীষণের আগমনে তথায় স্বর্ণ-বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার পর হইতে উক্ত স্থান ও উক্ত রাজ্যের নাম যে কর্ণ-সুবর্ণ বা কর্ণস্বর্ণ হয় তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। রাঙ্গামাটির প্রবাদের সহিত কুলগ্রন্থের প্রবাদের ঐক্য হওয়ায় প্রবাদটি প্রাচীন বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। রাঙ্গামাটীতে কর্ণসেনের আবাস ছিল, এ প্রবাদ মুর্শিদাবাদে চিরপ্রচলিত। Captain Layard Asiatic society's Journal No. 3 1853 তে বলেন :—"Rangamati anciently named the city cf Kansanapuri, is said to have been built many hundred of years ago by a famous maharaja of Bengal named, Kurun Sen, who resided chiefly at Gaur." বিভীষণের স্বর্ণবৃষ্টিরও প্রবাদ ঐরূপ প্রচলিত। কর্ণ সেনের রাজ্যের নাম কর্ণ-স্বর্ণ বা কর্ণসুবর্ণ। চীন পরিব্রাজক যে কী-লো-না-সু-ফা-লা-না বা কর্ণ-সুবর্ণ রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা যে উক্ত রাজ্য ইহা আমরা মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে প্রমাণ করিয়াছি। তাঁহার রাজধানী যে রাঙ্গামাটী

এবং তাহা কর্ণস্বর্ণ নামে অভিহিত হইত, ইহাও আমরা দেখাইয়াছি। কাপ্তেন লেয়ার্ডের উক্তিতে ইহাকে কাণসোনাপুরী বলিয়া জানা যায়। শব্দকল্পদ্রুমে ইহাকে কর্ণস্বর্ণ বলা হইয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলজীতে ইহাকে দেববংশের সমাজ কান-সোনা বলিয়া দৃষ্ট হয়। হিউএন সিয়ঙ্গের কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর নিকটস্থ লো-টো-বী-চী বা রক্তভিত্তি কিম্বা কী-টো-মো-টী বা রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারামের নামে যে রাঙ্গামাটী হইয়াছে তাহাও বুঝা যায়। আমাদের আলোচ্য কুলগ্রন্থে কর্ণসেনের রাজ্যটি কর্ণস্বর্ণ ও রাজধানীকে কর্ণপুর বলা হইয়াছে, ইহাতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। এই কর্ণপুরের অবস্থান সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহা অবিসম্বাদিরূপে রাঙ্গামাটীকেই বুঝাইতেছে। ইহাতে লিখিত আছে, রাজাকর্ণসেন কর্ণ ও ভাগীরথীর সঙ্গিস্থলে কর্ণপুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কর্ণ যে ময়ুরাক্ষীর নামান্তর তাহাই আমরা দেখাইতেছি। ময়ুরাক্ষী সাধারণতঃ মোর বা কাণা নামেই অভিহিত হয়। কাণা যে কর্ণের অপভ্রংশ তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। ময়ুরাক্ষী সম্বন্ধে হণ্টার বলিতেছেন, "Among minor rivers may be mentioned the Brahmini, the Mor or Maurakhi or Kana and the Kuiya, which all flow from the west into the Dwarka, and are partially navigable at the height of the rainy season". (Statistical Account of Mursidabead) ময়ুরাক্ষী দ্বারকার সহিত মিশিলেও ইহা রাঙ্গামাটীর নিকটে বাজপুরের নীচে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সুতরাং কর্ণ বা ময়ুরাক্ষী ও ভাগীরথীর সঙ্গিস্থলে যে কর্ণপুর নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং তাহা যে রাঙ্গামাটী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে রাজা কর্ণসেন কে এ বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। আমরা মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে কর্ণসেনকে দাতা কর্ণের সহিত অভিন্ন প্রতিপাদনে চেষ্টা করিয়াছি। আলোচ্য কুলগ্রন্থেও তাহাই দেখা যাইতেছে,—যথা উক্ত গ্রন্থে কর্ণসেনকে ক্ষত্রপ কায়স্থ বলা হইতেছে ; মহাভারতের দাতা কর্ণের ক্ষত্রপ কায়স্থ হওয়া অসম্ভব। কুলগ্রন্থকার দাতাকর্ণের সহিত কর্ণসেনের অভিন্নতা স্থাপনের

চেষ্টা করিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছেন। যদিও আমরা মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে উভয়কে অভিন্ন প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, এক্ষণে কর্ণসেনকে ক্ষত্রপ কায়স্থ বলিয়া উল্লিখিত দেখায়, আমরা উভয়কে বিভিন্ন ব্যক্তিই বলিয়া অনুমান করিতেছি। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাঙ্গলার পুরাতত্ত্বে কর্ণসুবর্ণের অধিপতি কর্ণসেনকে ক্ষত্রপবংশীয় বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। এই কুলগ্রন্থের উক্তির দ্বারা তাঁহার অনুমান সমর্থিত হইতেছে। তিনি লঙ্কেশ্বর বিভীষণের কথা এইরূপ বলেন যে, কাশ্মীররাজ মেঘবাহনের সময় একজন লঙ্কেশ্বর বিভীষণ ছিলেন। তিনি মেঘবাহন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। মেঘবাহন অনুমান ৪৪০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া তিনি অনুমান করেন, এবং কর্ণসেনও সেই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া তাঁহার অনুমান। Captain Wilford কোন লঙ্কারাজ কর্ত্তৃক বাঙ্গলা আক্রমণ ও রাঙ্গামাটী পর্যন্ত তাঁহার রণতরী উপস্থিতির এক প্রবাদও উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে রাঙ্গামাটিতে কোন লঙ্কেশ্বরের আগমন বুঝা যাইতেছে। তিনি রাজতরঙ্গিণীর উল্লিখিত বিভীষণও হইতে পারেন। হিউএন সিয়াঙ্গ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণ-সুবর্ণ রাজ্যে উপস্থিত হন বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন। সে সময়ে শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন। শশাঙ্কের সহিত নরেন্দ্রগুপ্তের অভিন্নতা স্থির হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার সে মতেরও পরিবর্তন হইতেছে। হিউএন সিয়াঙ্গের আগমন সময় সম্বন্ধে আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত একমত নহি। হিউএন সিয়াঙ্গ যখন কর্ণসুবর্ণের নামোল্লেখ করিয়াছেন, অবশ্য তৎপূর্ব্বে কর্ণসেনের সময় স্থির হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় আমরা যে কারণে হিউএন সিয়াঙ্গের আগমন সময় আরও পূর্ব্বে অনুমান করিয়া থাকি, সেই কারণে মেঘবাহনের সময়ও পরেশ বাবুর নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে অনুমিত হয়। ফলতঃ যেরূপে হউক, হিউএন সিয়াঙ্গের আগমনের পূর্ব্বে যে কর্ণসেন বিদ্যমান ছিলেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কর্ণসেন ক্ষত্রপ হওয়ায় তিনি গুপ্তসম্রাট-গণের প্রতিনিধি ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতেও পারে। তবে তিনি কায়স্থ কিনা তাহা আমরা কুলগ্রন্থের উক্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা স্থির করিতে পারিতেছি না। কুলগ্রন্থের উক্তি অনুসারে দেববংশকে

কর্ণপুরে আনয়ন করায় তাঁহার কায়স্থপ্রীতিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তজ্জন্ত তিনি কায়স্থ হইতেও পারেন; কিন্তু সে সম্বন্ধে আর কোন প্রমাণ আপাততঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

কাম।

কাম সাধনার মূর্ত্তিমান বিঘ্ন এবং সিদ্ধির প্রধান অন্তরায়, ইহা সহজেই মানবের হৃদয় বশীভূত করিয়া তাহাকে বিবেকশূন্য ও হিতাহিত-জ্ঞান-রহিত করিয়া ফেলে। কর্ম্মের ফলাভিলাষকে কাম বলে,—কোনও কর্ম্ম করিয়া তাহার ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা, সর্ব্বদাই ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকার নামই কাম। হৃদয়ে একবার কাম বা কামনা প্রবেশ করিলে মনুষ্যের উচ্চ প্রবৃত্তিগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে; কার্য্যকারিতা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার বুদ্ধি ও বিবেক নিষ্প্রভ হইয়া যায়। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারেরা নিষ্কামভাবে অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

সকাম অর্থাৎ কর্ম্মফললাভেচ্ছু হইয়া কার্য্য করিলে মোক্ষপ্রাপ্তির অন্তরায় ঘটে; কারণ তত্তৎকর্ম্মজনিত স্বর্গাদি ফলভোগের নিমিত্ত পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। ফলাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং নিত্যকর্ম্মের সহায় হইয়া উহা আত্মজ্ঞানলাভের ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া কল্পিত হয়। ফলাকাঙ্ক্ষা করিলেই ক্রমে ভোগাসক্ত হইতে হয় এবং তুচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখের কুহকে আত্মজ্ঞান হারাইয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে হয়।

কিন্তু আধুনিক সময়ে অনেকেরই ধারণা এই যে, নিষ্কামভাবে কোনও কর্ম্ম করা যায় না; মনুষ্য কেবল ফলাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়াই কর্ম্ম করে, ভোগৈশ্বর্য্যের লোভে আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় বাসনা সিদ্ধির জন্যই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান
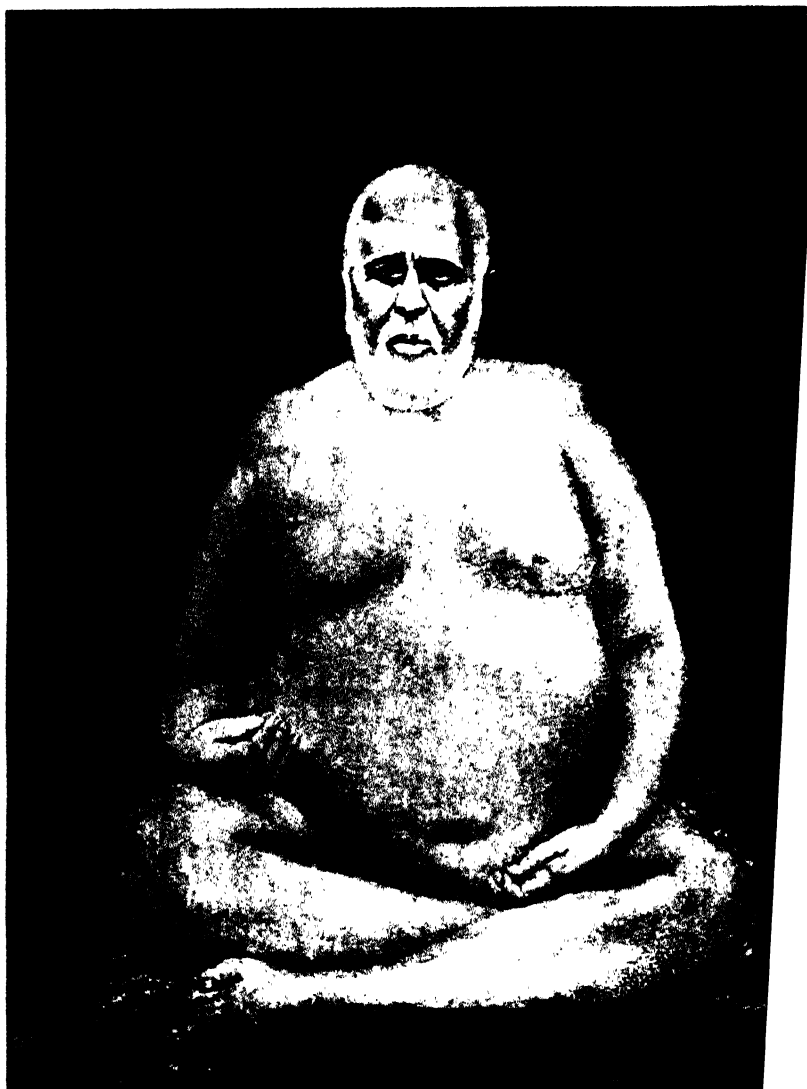
৺ ত্রৈলঙ্গ স্বামী

Mohila Press, Cal.

করিয়া থাকে। তাহারা বলে, শাস্ত্রেও স্বর্গাদিফলের কথা উক্ত হইয়াছে এবং প্রলোভন দর্শাইয়াই শাস্ত্রকারেরা লোকদিগকে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে আকর্ষণ করিতেছে। এ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ বুদ্ধিমান এবং বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই স্বার্থপরতাকে ঘৃণা করেন এবং কামনার বিরোধী হইয়া থাকেন। অলোভ এবং নিঃস্বার্থতাই মহত্তের লক্ষণ। প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তিকে কখন সুখের প্রলোভন দেখাইয়া কার্য্য করাইতে পারা যায় না, কর্ত্তব্য জ্ঞানে ভিন্ন তিনি কোনও কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না।

আর আমাদের শাস্ত্রে কুত্রাপি ফলাভিলাষ করিবার উপদেশ নাই, বরং নিষেধই আছে। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"। শাস্ত্রগ্রন্থাদির বেদই মূল এবং উহাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রধান প্রমাণ। বেদেও কামান্ধ হইয়া কর্ম্ম করিবার আদেশ নাই। বেদের স্থান বিশেষে কর্ম্মের ফলাফলের বিষয় উল্লিখিত আছে সত্য,—যথা "য অশ্বমেধেন যজেত সঃ স্বর্গং গচ্ছেত"। কিন্তু এ সকল উক্তি কেবল অর্থবাদ মাত্র। সমগ্র বেদ তিন ভাগে বিভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন তিনটি অংশে বিধি, অর্থবাদ এবং মন্ত্র এই তিন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিধিতেই আমাদের কর্ম্মের বিধান কথিত হইয়াছে এবং আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—যেমন অশ্বমেধেন যজেত, অহরহ সন্ধ্যামুপাসীত ইত্যাদি। আমাদের বিধি অনুসারেই কর্ম্ম করা উচিত, ইহারই অনুশাসন পালন করা বিধেয়। কিন্তু বিধিতে ফলের উল্লেখও নাই শুধু কর্ম্ম করিবারই আদেশ আছে। অর্থবাদেই প্রশংসার্থে ঐ সকল কর্ম্মের ফলের বিষয় উক্ত হইয়াছে। অর্থবাদে কথিত হইয়াছে যে, স্বর্গাদিকামনা করিয়া যাগযজ্ঞ করিলে স্বর্গাদি লাভ হয় কিন্তু কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া ঐ সকল কর্ম্ম করিলে তাহাদ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা সাধিত হয় এবং আত্মজ্ঞান লাভের অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত হয়। স্বর্গকামনা করিয়াই যাগাদি করিতে হইবে এরূপ কথা কোথায়ও নাই, যদি কেহ স্বর্গগমনের অভিলাষী হন, তাহা হইলে তিনি অশ্বমেধাদি করিতে পারেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া স্বর্গফল প্রার্থনা করিলে তাহার স্বর্গলাভ হইবে সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া স্বর্গকামী হওয়া উচিত নয়; কারণ তাহাতে আবার পুনর্জ্জন্মনিমিত্ত বন্ধন উপস্থিত হয় এবং ভোগাসক্ত হওয়াতে ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিঘ্ন ঘটে। অতএব যাগ-

যজ্ঞ প্রভৃতি বেদবিহিত কর্ম্ম ফললাভেচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কামভাবে বাসনাবিহীন চিত্তেই অনুষ্ঠান করা উচিত।

অন্ধের ন্যায় সদসৎ বিবেচনা না করিয়া, কর্ম্মের ফলাফল চিন্তা না করিয়া এবং পরিণাম অবধারণ না করিয়া কোন কার্য্যই করা উচিত নহে। অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের কি ফল হইবে তাহা বিশেষরূপে জানা আবশ্যক, কারণ তাহা বুঝিতে পারিলেই ঐ কর্ম্ম কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তাহা নিরূপণ করা যায় এবং উহা করা সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা স্থির করা যায়। ফল সাধু হইবে জানিতে পারিলেই সেই কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা জন্মে এবং চিত্ত সেই কার্য্যের প্রতি ধাবমান হয়। এবম্বিধ কর্ম্ম করিলে এবম্বিধ ফল হইবে, অতএব আমি এই কার্য্য করিব ইত্যাকার ইচ্ছাকে সঙ্কল্প বলে। এইরূপ ইচ্ছামাত্রই কাম নহে এবং ইহা নিষিদ্ধ বা অবিধেয় নহে। ইহাই প্রত্যেক কর্ম্মের মূল, এতদ্ব্যতীত কোনও সৎকার্য্য সাধিত হইতে পারে না। ক্রিয়া দুই প্রকার মানসিক এবং শারীরিক। মানসিক ক্রিয়া না হইলে শারীরিক ক্রিয়া সম্ভব হয় না। প্রথমেই অন্তঃকরণ মধ্যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয়, তৎপরে বাহ্যিক শরীর দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এমন কি প্রাত্যহিক সামান্য কার্য্য গমনাগমন কিংবা কথাবার্ত্তা প্রভৃতিতেও ইহাই দৃষ্ট হয়। কোন কথা বলিবার সময়ে এই কথাটি বলিব মনোমধ্যে অগ্রে এইরূপ ইচ্ছা হয় এবং পরে তাহা মুখে প্রকাশ পায়। এই প্রকারে গমনের সময়েও অগ্রে মনে ক্রিয়া হয়, চলিতে ইচ্ছা হয় এবং পরে আমরা অগ্রসর হই। ইচ্ছা না হইলে কোন ক্রিয়াই হয় না, সঙ্কল্প ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা যায় না।

ফলের বিষয় চিন্তাকেই কাম বলা যায়না, কোনও কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহার ফলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, কিন্তু একবার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে আর ফলের প্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য নহে। ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করাই কাম, ইহাই সাধনার প্রধান শত্রু এবং সকল প্রকার মহৎ কার্য্যের বিঘ্নস্বরূপ। কর্ম্ম করিতেই ইচ্ছা করা উচিত, ফল পাইতে ইচ্ছা করা উচিত নহে; তাহাতে কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়না, অতএব মনোমত ফলও লাভ হয়না। কামের বশীভূত হইলে ফললাভের প্রতিই কেবল লক্ষ্য থাকে, প্রাণ সর্ব্বদাই

কামনা সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে, কর্ম্মের প্রতি আর বিশেষ মনোযোগ থাকে না, চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায়, কার্য্য করিবার আগ্রহ কমিয়া যায় এবং হৃদয় সদাই ফললাভের চিন্তায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। কাম-কলুষিত-চিত্ত ব্যক্তির বিবেকের ক্রিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং বিচারশক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, কামান্ধ ব্যক্তি বাসনা সিদ্ধির জন্য অনুক্ষণ সচেষ্ট থাকে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিবার আর অবসর পায়না, ফলপ্রাপ্তির জন্য অন্যায় কার্য্য করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেনা।

ফলকাম ব্যক্তি যদি দৈববশাৎ কর্ম্মে সুফল লাভ করিতে না পারে তবে সে একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে; তাহার আর তখন ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য কিম্বা হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা, সর্ব্বদা সে বিমর্ষ হৃদয়ে এবং অসন্তুষ্ট চিত্তে বিকলের ন্যায় কালযাপন করে। কিন্তু এ তাহার আত্ম-কৃত দুঃখ; ফলাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই এবম্বিধ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। আমাদের শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কোনও কর্ম্ম করিলে পুণ্য হয় না। পুণ্য হউক বা না হউক মনের যে আনন্দ লাভ হয় না ইহা সত্য। কাহারও কোন উপকার করিলে কিম্বা কাহাকেও কিছু দান করিলে মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় বিমল স্বর্গীয় আনন্দের উপলব্ধি হয়, পৃথিবীর সর্ব্ব প্রকার সুখই তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু প্রতিদান কিম্বা ভবিষ্যৎ লাভের আশায় কাহারও কোনও হিত সাধন করিলে আর সেরূপ মানসিক সুখ পাওয়া যায় না এবং হৃদয়ের তৃপ্তিও হয় না। নিষ্কামভাবে যিনি কার্য্য করেন তিনি সর্ব্বদা সদানন্দ রূপে বিরাজ করেন, তাঁহার হৃদয় সদাই শান্তিরসে পরিপূর্ণ থাকে, আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য এবং ফল লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে উদ্বিগ্ন থাকিতে হয় না, বাসনার তীব্র বেদনা তাঁহার হৃদয়ে অনুভূত হয় না এবং আশঙ্কা ও নৈরাশ্যের ভয়ে তাঁহাকে অভিভূত হইতে হয় না। এই জন্য শাস্ত্রাদিতে নিষ্কাম কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কামপরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করাই প্রশস্ত, ইহাই আত্মোন্নতির উপায়, কর্ত্তব্য পালনের প্রকৃষ্ট পন্থা এবং স্বর্গীয় শান্তি ও সুখের একমাত্র নিদান।

কর্ম্মের প্রতিই আমাদের আসক্তি হওয়া আবশ্যক, ফলের প্রতি অনুরক্ত হওয়া আমাদের উচিত নহে। আমাদের প্রথমত বিবেকের সাহায্যে ন্যায় অন্যায় বিচার পূর্ব্বক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা বিধেয় ও পরে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কর্ত্তব্য পালন করিয়া আমাদিগের সুখই হউক বা দুঃখই হউক লাভই হউক আর ক্ষতিই হউক, সে বিষয় আদৌ দৃক্‌পাত করা উচিত নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"সুখে দুঃখে সমেকৃত্বা লাভালাভৌ জয়া জয়ৌ" অর্থাৎ সুখ দুঃখ, লাভালাভ জয় পরাজয় সমান বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবে, অর্থাৎ সুখ দুঃখ প্রভৃতিতে যেন কখনও অন্তঃকরণ বিকৃত না হয়। কিন্তু কাম অর্থাৎ ফললাভাকাঙ্খা পরিত্যাগ করিলে কভু এবম্বিধ মানসিক বিকৃতি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। কার্য্য করিয়া কি ফল লাভ করিলাম সে বিষয় চিন্তা করাই উচিত নয়; পরন্তু কর্ম্মটি কর্ত্তব্য কি না তাহাই বিবেচনা করা বিধেয়। পরিণাম যাহাই হউক না কেন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই আমাদের সঙ্গত। কর্ম্ম করিয়া কোনরূপ ফলের আশা করাই অন্যায় এবং ভ্রান্তিমূলক আশাই সকল দুঃখের মূল; সুখ দুঃখ বলিয়া কোন বস্তু বিদ্যমান নাই, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনো নিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥"

সুখদুঃখ আমাদিগের ইচ্ছাকৃত ব্যাধি মাত্র—কাম বা ফলাকাঙ্খা হইতেই সুখদুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে, আমরা যেরূপ কামনা করিব, আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয় তদনুরূপ ফলভোগোন্মুখ হইয়া থাকিবে এবং পরিণামে আমাদের কামনা সিদ্ধই হউক বা অসিদ্ধই হউক, ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য দ্বারা আমাদের মনের এক প্রকার বিকৃতাবস্থা উৎপন্ন হইবে, এইরূপে কাম হইতেই সুখ অথবা দুঃখ আসিয়া লাভ করিতে সমর্থ হয়।" অতএব হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রকৃত অবস্থা রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে কাম পরিত্যাগ করিতে হইবে। আশা না থাকিলে হৃদয়ের কোন প্রকার উৎকণ্ঠা থাকে না এবং কুণ্ঠা রাহিত্যই প্রকৃত আনন্দ ও স্বর্গীয় সুখের নিদান, প্রশ্নোত্তরমালায় শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"কামামৃতা স্যাৎ সুখদা

নিরাশা" (প্রশ্ন অমৃতা বা কা স্যাৎ, উত্তর সুখদা নিরাশা।) নিরাশা অপেক্ষা সুখ কিছুতেই নাই, নিষ্কাম ভাব ব্যতীত কিছুতেই আনন্দ লাভ হয় না। কাম পরিত্যাগ না করিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না ; যেমন কোন বৃক্ষ ভিতরে ভিতরে কীট দ্বারা কর্ত্তিত হইলে সুফল প্রসব করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ কোন ব্যক্তি অন্তঃকরণ মধ্যে কাম বা কামনা দ্বারা আক্রান্ত হইলে কখনও সাধু এবং হিতজনক ফল উৎপন্ন করিতে পারে না।

শ্রীবামদেব ভট্টাচার্য্য বি. এ.।

প্রতিভা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কিসে জমিদারী গেল ?

প্রতিভার পিতার নাম বসন্তকুমার ঘোষ। বসন্তকুমার ঘোষের বিপুল জমিদারী ছিল। তিনি নীলামে তাঁহার জমিদারী খরিদ করিয়াছিলেন। তাঁহার জমিদারীর আয় প্রায় লক্ষ টাকা। বসন্তকুমার ঘোষ উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি একালের ন্যায় স্বার্থপর, ও অন্যান্য দোষযুক্ত ছিলেন না। তিনি একালের ন্যায় ব্যক্তি হইলে আজ তাঁহার বিপুল জমিদারী নষ্ট হয়, না আজ তাঁহার পরিবার ও কন্যার এই প্রকার দুর্দ্দশা হয় ? সকলি অদৃষ্টের ফল !

কিসে জমিদারী গেল—এ কথার সহজ উত্তর আছে। বিষয় সম্পত্তি যেরূপে নষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহার জমিদারী সেরূপে নষ্ট হয় নাই। তাঁহার জমিদারী দেনার দায়ে বিক্রয় হয় নাই, শৌণ্ডিকালয়ের অর্থ সংস্থানের জন্য

বিষয় নিলাম হয় নাই ; লাটের খাজনা দাখিল না করিবার জন্য বিষয় নিলাম হয় নাই। তবে বিষয় গেল কিসে? প্রবঞ্চনা ;—প্রবঞ্চনায় বিষয় গেল !

মনুষ্য পিশাচ। পিশাচ বলি কেন?—পিশাচের অপেক্ষা যদি কোন ভয়ঙ্কর প্রাণী পৃথিবীতে থাকে—মনুষ্য তাহাই! মনুষ্যে কি না করিতেছে? মনুষ্যের দ্বারায় কোন্ ভীষণ কার্য্য সম্পাদন না হইয়া থাকে? কার্য্যবিশেষে মনুষ্য উত্তম এবং অধম হইয়া থাকে। মনুষ্য গোহত্যা, ব্রাহ্মণ হত্যা, স্ত্রী হত্যা, ধর্ম্মনাশ, চুরি, ডাকাতি, শঠতা, দেব-প্রতিমা ধ্বংস ইত্যাদি বিষয় সহজেই সম্পাদন করিয়া থাকে। যে প্রাণী এই সকল ভয়ানক কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না, যাহাদের একগাছি কেশও নড়ে না, যাহারা ধর্ম্মের দিকে না চাহিয়া এই সকল কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করে—তাহারা মানব না দানব?

বসন্তকুমার ঘোষ যাহাকে অনুদান করিতেন, যাহাকে সতত বিশ্বাস করিতেন, যাহার পরামর্শ ভিন্ন তিনি কোন কার্য্য করিতেন না, যাহাকে জমিদারীর সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়াছিলেন, যাহার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে প্রজারা শাস্তি পাইত এরূপ বন্দোবস্ত যিনি করিয়াছিলেন, যাহাকে তিনি নিকট আত্মীয়ের ন্যায় ভাল বাসিতেন,—সেই লোক অবশেষে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, সেই লোক অবশেষে বিশ্বগ্রাসী হইয়াছিল, সেই লোক বসন্তকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রীকন্যার অশেষ লাঞ্ছনা করিয়াছিল! এই নিষ্ঠুর এবং মহাপাতকের নাম পঞ্চানন বসু। এই মহাপাতকী-বসন্ত কুমার ঘোষের জমিদারীর দেওয়ান ছিল। এই পিশাচকে বসন্তকুমার ঘোষ জমিদারীর যাবতীয় স্বত্ব-স্বত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন, এই নারকীকে বসন্ত কুমার সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। সেই মহাপাতকীর এই কাণ্ড! তাহার এইরূপ নিমকহারামী!

বজ্র! তুমি কোথায়? ডাকিলে তুমি থাক কোথা? না ডাকিলে তুমি লোকের মাথায় পড়! ডাকিলে তোমায় পাই না কেন? তুমি এসকল মহাপাতকীর মাথায় পড় না কেন? না ডাকিলে তুমিও কি যাহার তাহার মাথায় পড়? তোমার পড়ারও বিশেষত্ব আছে! কই, তুমিত পঞ্চানন

বন্থর ন্যায় লোকের মাথায় পড়না! যাহারা দিবারাত্র পাপে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহাদের নাম কি তোমার মনে পড়ে না? যে বিধবার যষ্টি, তুমি তাহার মাথায় পড়; যে দীন দরিদ্র, তুমি তাহার ঘরে পড়িয়া তাহাদের পুড়াইয়া মার; যে সাতগুষ্টি পরিবারের ভরণ-পোষণের কর্ত্তা তুমি তাহার মাথায় পড়িয়া, সেই সাতগুষ্টিকে কাঁদাও। ধন্যবাদ তোমার পতনকে!

বসন্তকুমার ঘোষের জমিদারীর অন্তর্গত একটা রেশমের কুঠি ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে বাঙ্গলায় কিছু কিছু রেশমের চাষ হইত। সেই দুর্দান্ত প্রজা, রেশমের কুঠির অধ্যক্ষের সহিত বসন্ত-কুমারের একটা ফৌজদারী মামলা বাধিয়া উঠে। বিষয়টা গুরুতর। সেই কুঠির অধ্যক্ষ বসন্তকুমারের একজন প্রজার জাতি নষ্ট করিতে যাইতেছিল। প্রজাবৎসল বসন্তকুমার, সেই প্রজাকে রক্ষা করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া-ছিলেন।

একটী সুন্দরী-স্ত্রীলোককে দেখিয়া, তাহার উপর কুঠিওয়ালার নজর পড়ে। স্ত্রীলোকটী নীচ-জাতীয়া এবং বসন্তকুমার ঘোষের একজন প্রজার পত্নী। একদা কুঠিওয়ালার আজ্ঞায় রজনীযোগে লাঠি সটা লইয়া তাহার লোকজন ঐ স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিতে যায়। কুঠিওয়ালাদিগের হাতে বহু লোক খাটিত। অধ্যক্ষের আদেশে কুড়ি পঁচিশ জন গুণ্ডা চড়োয়া হইয়া সেই স্ত্রীলোককে ধরিতে যায়। স্ত্রীলোকটীর স্বামী তাহা দেখিয়া আর কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বসন্তকুমারের আশ্রয় লয়। কুঠিওয়ালার লোক জন দেখিল যে, লোকটা পরিবার সহ জমিদারের আশ্রয় লইল, তখন তাহারা কুঠিওয়ালাকে গিয়া এ সংবাদ দিল। কুঠিওয়ালার শিকারকে জমিদার আশ্রয় দিয়াছেন দেখিয়া, অধ্যক্ষ রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। জমিদারের আচরণ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। অধ্যক্ষ জমিদারকে শাস্তি দিবার জন্য আরও অধিক লোকজন লইয়া বসন্তকুমারের বাড়ীতে মার মার করিয়া গিয়া পড়িলেন। তিনি নিজে বন্দুক লইলেন এবং তাঁহার সহকারীও কর্ত্তার সহগামী হইলেন।

অতর্কিতে কুঠিওয়ালা লোকজন লইয়া বসন্তকুমার ঘোষের বাড়ী আক্র-মণ করিল। কুঠিওয়ালাদিগের এবংবিধ ব্যবহারে অধিকাংশ লোকেই ভয়

পাইল। যুবাপুরুষেরা কুপিত হইল। আজকালকার সময়ের ন্যায় পূর্ব্বে জমিদারদিগের অবস্থা এতাদৃশ ছিলনা। তখনকার জমিদারদিগের লাঠির চোটে থরহরি কম্পিত হইত। ক্রমে ক্রমে সেই সকল কীর্ত্তি লোপ পাইয়াছে।

কুঠিওয়ালা আক্রমণ করিলে পর, জমিদার পক্ষ কেহ নিরস্ত রহিল না। বিখ্যাত বিখ্যাত লাঠিওয়ালারা সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিল। জমিদারের দল পুরু। কাজে কাজেই কুঠিওয়ালারা তাহাদের বেগ অধিক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না। সকলেই একে একে হাত পা ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল। কুঠিওয়ালাদিগের গুলিতে জমিদার পক্ষের দুই জন লোক সাংঘাতিকরূপে জখম হইল। তাহার পর তাহাদের হাতে আর বন্দুক রহিল না। বিপক্ষদিগের লাঠির চোটে তাহাদিগের হাত ভাঙ্গিয়া গেল; বন্দুক হস্তচ্যুত হইল। কুঠিওয়ালারা রণে ভঙ্গ দিল।

কুঠিওয়ালারা আর কোন উপায় না দেখিয়া প্রতিশোধ লইবার মানসে যশোহর জিলায় যাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া নিজেদের হাত পা ভাঙ্গা দেখাইয়া, জমিদারের অত্যাচারের কথা বলিল। বলা বাহুল্য, তাহারা নিজেদের দোষ চাপা দিল এবং ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার শাখা প্রশাখা দিতে ভুলিল না। তাহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া বসন্ত কুমারের নামে মামলা জুড়িয়া দিল।

বিচার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আরম্ভ হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট নিজের ঘাড়ে বোঝা না রাখিয়া সেসন্ জজের নিকট মকোদ্দামা দর্দল করিলেন। বিচার শেষ হইল। বসন্তকুমার হারিলেন। যথাসময়ে মামলার রায় বাহির হইল। জমিদার বসন্তকুমার ঘোষকে যশোহর জিলার সকলেই চিনিত। বিচারের ফল শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিল। সেসন্ জজ রায় দিলেন যথা;—"বসন্ত কুমার অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। তিনি কুঠিওয়ালা দিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার ২ বৎসর সশ্রম কারাবাস এবং ৫০০০ টাকা জরিমানা হইল। উক্ত টাকায় আহত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।"

বসন্তকুমার বিচারে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি কেন, এরূপ বিচারে কে

সন্তুষ্ট হইয়া থাকে? তিনি হাইকোর্টে আপীল করিলেন। প্রধান বিচারালয়ে শাস্তির কিছু হ্রাস হইল বটে; কিন্তু জরিমানার টাকা বাড়িয়া গেল। যথা;— "ছয় মাস সশ্রম কারাবাস এবং ১০০০০ টাকা জরিমানা হইল। ঐ টাকা আহত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইবে।"

বসন্তকুমার বিলাতে আপীল করিলেন।

এদিকে দুই মোকদ্দামায় হারিয়া বসন্তকুমার ভীত হইলেন। তিনি আত্মীয় বন্ধুর পরামর্শে, তাঁহার যাবতীয় স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি তাঁহার অতি পুরাতন এবং বিশ্বাসী দেওয়ানের নামে লিখিয়া দিলেন। কি জানি, বিলাতে হারিলে সর্ব্বস্বান্ত হইবেন, এই ভয়ে তিনি এই প্রকার বন্দোবস্ত করিলেন। মোকদ্দামা শেষ হইলে আবার নিজ নামে বিষয় লিখাইয়া লইবেন এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সকলেই জানিত, পঞ্চানন বসু অতি বিশ্বাসী লোক। সুতরাং কেহই আর তাঁহার কার্য্যে বাধা দেয় নাই।

যথাসময়ে বিলাত হইতে বিচারের ফল আসিল। সকলেই ভাবিয়াছিল, বসন্তকুমারের শাস্তি এবার অল্প হইবে কিন্তু তাহা হইল না। লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইল। এবার বসন্তকুমারের কেবল মাত্র ৩০০০০ টাকা জরিমানা হইল। তিনি জানাইলেন যে, "আমি টাকা দিতে অসমর্থ। আমার যাহা ছিল সমস্তই মোকদ্দামায় ব্যয় করিয়াছি।"

ফরিয়াদীরা ভাবিয়াছিল যে, এবার বসন্তকুমারের খুবশাস্তি হইল। তাহাদের আশা ছিল যে, কিছু পাইবে; কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে তাহা হইল না। অবশেষে তাহারা হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। জমিদারী অপর লোকের নামে, ডিক্রী কিরূপে হইবে? বসন্তকুমার নিষ্কৃতি পাইলেন।

বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া বসন্তকুমার বিষয় সম্পত্তি আজকাল করিয়া ছয় মাসের মধ্যেও নিজ নামে আনিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "বিষয় আমার কাছে থাকিলেও যাহা, পঞ্চাননের কাছে থাকিলেও তাহাই।" সুতরাং একথা আর কেহ তাঁহাকে বলিত না। কেবল মাত্র যদুনাথ চৌধুরী সময়ে সময়ে তাঁহাকে বিষয় সম্পত্তি তাঁহার নামে আনিবার জন্য পীড়াপিড়ী করিতেন।

ইহার অল্প কয়েকদিন পরে বসন্তকুমার জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইলেন।

পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই জ্বরবিকার তাঁহার কাল হইল। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া, বসন্তকুমার বিপুল জমিদারী পরের হস্তে রাখিয়া অকালে ইহধাম ত্যাগ করিলেন। প্রজাবৎসল জমিদারের মৃত্যুতে প্রজারা হাহাকার করিতে লাগিল।

দেওয়ান পঞ্চানন বসু বসন্তকুমারের মৃত্যুর পর পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। যদুনাথ চৌধুরী পঞ্চানন বসুকে তাঁহার প্রভুর বিষয় সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিলেন। পঞ্চানন বসু সে দিকে কর্ণপাত করিতেন না। বিষয় ফেরত দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি উহা আরও আঁটিয়া ধরিতে লাগিলেন। এ বিষয় লইয়া যদুনাথ চৌধুরীর সহিত দেওয়ানের প্রায় বচসা হইতে লাগিল। উপরিতন কর্ম্মচারীর সহিত নিম্নতর কর্ম্মচারীর বিবাদ সম্ভবে না; পরিশেষে যদুনাথ চৌধুরী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। অবসর বুঝিয়া পঞ্চানন বসু বিধবা প্রভু-পত্নী এবং কন্যাকে ফাঁকি দিয়া নিজে জমিদারী অধিকার করিয়া বসিলেন। ভয়ানক! মনুষ্যের সকল কার্য্যই ভয়ানক!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাছারীর পেয়াদা।

মহাপূজা শেষ হইল। মহামায়া তিন দিন পিত্রালয়ে থাকিয়া, কাহাকেও হাসাইয়া ও কাহাকেও কাঁদাইয়া শ্বশুর-বাড়ী চলিলেন। মায়ের আগমনে এক অপরূপ আনন্দ সকলেরই মন প্রাণ ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। শোকে মায়ের আগমনে যাহার চক্ষে শতধারা বহিতেছিল, সেও চক্ষু মুদিয়া মায়ের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আবার তুমি কবে আসিবে"? মায়ের আগমনে সকলেই মাতোয়ারা ছিল। যে ধনী, সেও মায়ের পানে চাহিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি আমার আলয়ে এরূপ সমারোহে প্রতিবৎসর আসিও।" যে দাতা অথবা বিত্তহীন, সেও মায়ের পানে তাকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি বার মাস এখানে থাক। তোমার আগমনে দীন, দুঃখী সকলেই এক এক মুষ্টি অন্ন পায়।" ধন্য মা চণ্ডিকে, ধন্য তোমার লীলা!

প্রতিভার মাতার নাম কাত্যায়নী। কাত্যায়নী তাঁহার নাম বটে কিন্তু পাড়ার লোকেরা তাঁহাকে সকলেই বড় বউ বলিয়া ডাকে। কাত্যায়নীর এ তিন দিন এক প্রকার আহার নিদ্রা বন্ধ ছিল। তাঁহার শোক মহা শোক। প্রথমতঃ স্বামীর শোক। সে শোকের উপর স্ত্রীলোকের আর শোক নাই; দ্বিতীয়তঃ দারিদ্র্য, তৃতীয়তঃ মায়ের আগমন বন্ধ হইয়াছে, তাহাই। মায়ের পদরজ যে একবার খাইয়াছে, মাকে যে একবার চিনিয়াছে, তাহার পক্ষে মায়ের শোকও অতীব ভয়ানক।

কাত্যায়নী তিন দিবস আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, অনিমেষ নয়নে অর্দ্ধভগ্ন মণ্ডপের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। ঘোষেদের বাড়ী যখন ঢাকের বাজনা বাজিত তখন কাত্যায়নীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিত। কাত্যায়নী ভাবিতেন, "হায়! কেন আমার এমন দিন হইয়াছে? এক সময়ে ঐ মণ্ডপে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল যখন আরতি হইত, তখন চণ্ডীমণ্ডপে লোক ধরিত না। বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইত। কত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা দলে দলে আসিত, কত দীন অনাথ দলে দলে আসিত, কত লোক প্রতিমা দর্শন করিতে দলে দলে আসিত। হায়, সে দিন! কাত্যায়নী যতই এই সকল ভাবিতেন ততই তাঁহার চক্ষে ধারা বহিত।

দশমীর দিন প্রাতঃকালে কাত্যায়নী গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া, মণ্ডপের দিকে অনিমেষনয়নে তাকাইয়া ছিলেন। তাঁহার বাহ্য জ্ঞান ছিল না। তিনি কেবলই ঐ বিষয় ভাবিতেছিলেন, কন্যা প্রতিভা তখনও বিছানায় শুইয়া ছিল। এমন সময়ে বাড়ীর মধ্যে একটা লোক প্রবেশ করিল। কাত্যায়নী লোকটাকে দেখিলেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। লোকটা একজন বৃদ্ধ, বয়স পঞ্চাশের উপর। বৃদ্ধের বগলে কতকগুলি কাগজের তাড়া। বৃদ্ধ বাটীর মধ্যে ঢুকিয়া, এদিক ওদিক তাকাইয়া কাহাকে দেখিতে না পাইয়া—ডাকিল, "বাড়ীতে কে আছ গা?"

কাত্যায়নী শুনিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। তিনি প্রতিভাকে ডাকিলেন। প্রতিভা তখনও ঘুমাইতেছিল। মায়ের ডাক শুনিয়া সে উঠিয়া বসিল।

কাত্যায়নী বলিলেন,"প্রতিভা,বাহিরে একজন লোক আসিয়াছে দেখত"।

প্রতিভা বলিল, "আমায় খাবার দাও।"

কাত্যায়নী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বাহির কে ডাকিতেছে আগে তাহা দেখিয়া আইস তাহার পর খাইও। এতক্ষণ যে ঘুমাইতেছিলে, ডাকিলাম বলিয়া বুঝি ক্ষুধা পাইল ?"

প্রতিভা বুঝিল তাহার মাতা কুপিত হইয়াছেন ? সে আর কোন কথা না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল এবং বৃদ্ধের সন্নিধানে দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ বালিকাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ী তোমাদের—বাড়ীতে আর কে আছে ?"

প্রতিভা উত্তর করিল, "হ্যাঁ, এ বাড়ী আমাদের।"

বৃদ্ধ পুনরায় বলিল, "বাড়ীতে আর কে আছে ?"

প্রতিভা উত্তর করিল, "বাড়ীতে আমার মা আছেন।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "আর কেহ নাই ?"

প্রতিভা উত্তর করিল, "না।"

বৃদ্ধ আবার বলিল, "তোমার মাকে গিয়া বল যে আমি কাছারীর পেয়াদা। আমি বিশেষ দরকারে আসিয়াছি। আমার সঙ্গে কে কথা বলিবে ?"

প্রতিভা এই কথা শুনিয়া মার কাছে গেল। কাত্যায়নী জানালার পার্শ্বে বসিয়া বৃদ্ধের এ সকল কথা শুনিতেছিলেন। বৃদ্ধ কাছারীর পেয়াদা একথা শুনিয়া তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন। প্রতিভা গৃহে প্রবেশ করিলেই, কাত্যায়নী বলিলেন, "প্রতিভা, তোমার জ্যাঠা মহাশয়কে ডাকিয়া লইয়া আইস। বলিও যে বাড়ীতে একজন লোক আসিয়াছেন।"

মাতার আদেশে প্রতিভা তাহার জ্যাঠা মহাশয়কে ডাকিতে গেল। সে যখন বৃদ্ধের নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তখন সেই বৃদ্ধ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা কি বলিলেন ? আমার বড় দেরি হইতেছে।"

প্রতিভা বলিল, "আপনি একটু বসুন, আমি আমার জ্যাঠা মহাশয়কে ডাকিয়া আনি।"

প্রতিভা এই বলিয়া তাহার জ্যাঠা মহাশয়কে ডাকিতে গেল। বৃদ্ধ সেই খানে বসিয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরে প্রতিভা তাহার জ্যাঠা মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া সেই খানে আসিল।

যদুনাথ চৌধুরী সেখানে আসিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় আপনার নাম কি?

বৃদ্ধ উত্তর করিল, আমার নাম শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

যদু। আপনি এখানে কি চান?

সাত। আমি কাছারীর পেয়াদা। নোটিস জারী করিতে আসিয়াছি।

যদু। কিসের নোটিস্ আপনি জারী করিতে আসিয়াছেন? কাহার নামের নোটিস?

সাত। নোটিস শ্রীমতী কাত্যায়নী দাসীর নামে।

যদু। তাঁহার নামে জারির নোটিস,—!

সাত। কাত্যায়নী দাসী যে বাড়ীতে বাস করেন, সে বাড়ী উজ্জ্বলপুরের জমীদার পঞ্চানন বোসের। তিনি আজ ৫ বৎসর কাত্যায়নী দাসীর নিকট এক পয়সা খাজনা পান নাই। তাহাই পঞ্চানন বসু আদালতে তাঁহার নামে নালিস রুজু করিয়াছেন?

যদু। আমি আপনার কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি।

সাত। কিসে;—?

যদু। এ বাড়ী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষের, কাত্যায়নী দাসী তাঁহার পত্নী।

সাত। তাহা মহাশয় আমি জানিনা। পঞ্চানন বসু নালিস রুজু করার পর কাত্যায়নী দাসীর নামে সমন জারী হইয়াছিল। কাত্যায়নী দাসী মামলা চালান নাই অথবা কোন উকিল ধরেন নাই এবং কোন লোক তাঁহার হইয়া আদালতে কোন দরখাস্ত পেশ করে নাই। এই সকল না করাতে মোকদ্দামা ডিক্রী হইয়া গিয়াছে।

যদু। ডিক্রী হইয়া গিয়াছে! মহাশয় আমরা ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিনা। এ সকল জুয়াচুরি। এ বাড়ী কস্মিন্‌কালেও পঞ্চানন বোসের নহে। সে প্রবঞ্চক, চোর।

সাত। তাহা হইতে পারেন। কিন্তু আমি কি করিব?

যদু। কত টাকার ডিক্রী?

সাত। ২৫৲ টাকা মাসিক হিসাবে ১২৫৲ টাকার ডিক্রী এবং মকোদ্দমার খরচ ২৫৲ টাকা মোট ১৫০৲ টাকার দাবী। ইহা না দিলে বাড়ী নীলাম হইবে।

যদু। মহাশয় ইহারা অত্যন্ত দরিদ্র। ইহাঁদের আর কেহ নাই। এত টাকা কে দিবে? আমি ইহাঁদের সমস্ত খবর রাখি। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, এ বাড়ী ইহাঁদের। পঞ্চানন বসু এ বাড়ীর মালিক নহে?

সাত। আমি এখন আর কি করিব?

যদু। আপনি সব করিতে পারেন। এই অনাথাদিগের ইতিহাস শুনিলে আপনি চমকিয়া উঠিবেন, আপনার দয়াও হইবে। আপনি ভদ্র লোক, আপনাকে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

ব্রাহ্মণ সেরূপ অসৎপ্রকৃতির লোক নহে। সে ভদ্র লোকের সন্তান এবং তাহার শরীরে দয়া মায়া আছে। গরীবের ছেলে, পেটের দায়ে পড়িয়া পেয়াদাগিরি চাকুরী করিতেছে। ব্রাহ্মণ বলিল, "আপনি আমাকে এখন কি করিতে বলেন?"

যদুনাথ চৌধুরী বলিলেন, আপনাকে আর কি শিখাইব। আপনি একজন প্রবীন লোক এবং আদালতে চাকুরী করিতেছেন, আপান সব জানেন।

সাত। আচ্ছা, আপনি ইহাঁদের ইতিহাসটা আমাকে বলিতে পারেন? আর আপনার সহিত ইহাঁদের কিরূপ সম্বন্ধ?

তখন যদুনাথ চৌধুরী বসন্তকুমারের আদ্যোপান্ত ইতিহাস বলিলেন। ইতিহাস শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধের দুই বিন্দু অশ্রু পড়িল। বৃদ্ধ ভগ্ন আওয়াজে বলিল, "আর বলিতে হইবে না। আমি সমস্তই বুঝিয়াছি। কে চোর কে সাধু তাহা আমাকে আর বলিতে হইবে না। আমি যথার্থ বুঝিয়াছি যে এবাড়ী কার। আমিও এক সময়ে এরূপ প্রতারিত হইয়াছিলাম। তাহা না হইলে আমি আজ বুড়াবয়সে কাছারীর পেয়াদা কেন হইব?"

যদুনাথ চৌধুরী বলিলেন, "এখন কি উপায় করিতে চান ?"

সাত। আমার চাকরী যাউক আর থাকুক আমি কখনই নোটীস জারী করিব না। আমি জানিয়া শুনিয়া অনাথাদের আশ্রয়শূন্য করিব না।

যদু। নোটিস জারী না করিলে কি হইবে ?

সাত। পঞ্চানন বসু বাড়ী অধিকার করিতে পারিবে না।

যদু। তাহা হইলে আপনার বিপদ।

সাত। সে বিষয়ের জন্য আমি ভাবি না। আমার কপালে যাহা আছে হইবে। আমি ব্রাহ্মণ আর বয়সে বৃদ্ধ। আমি পাপের বোঝা মাথায় করিব কেন ? আর আমি একজন ভুক্তভোগী। সংসারের সুখ দুঃখ আমি জানি।

যদু। অপনার মহান্ অন্তঃকরণকে আমি ধন্যবাদ দিই। আপনি আজ যে কার্য্য করিলেন, তাহার জন্য ভগবান্ অবশ্য আপনার ভাল করিবেন।

সাত। আমি পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য এ কার্য্য করিতেছি না; আমি কর্ত্তব্য করিতেছি।

যদু। আমি আপনার জন্য ভাবিতেছি। আপনি বিপদে পড়িবেন দেখিতেছি।

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিল, "যদুনাথ বাবু, আমি এখন তবে যাই। আপনি জানিয়া রাখুন, আপনাকে আজ আমি যাহা বলিলাম তাহার আর পরিবর্ত্তন হইবে না। পরের উপকার করিতে যদি আমার বিপদ ঘটে, ঘটুক। আমি তাহাতে ভীত নহি।"

যদুনাথ চৌধুরী বলিলেন, "বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি আহার করিয়া যান। বেলা অধিক হইয়াছে। আপনি অনাহারে চলিয়া যাইবেন, এটা কি সঙ্গত ?"

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিল, "আমার আহারাদি সারিয়া যাইলে বিলম্ব হইবে। আমাকে আজই কাছারী বন্ধ হইবার আগে সেখানে যাইতে হইবে।"

যদুনাথ চৌধুরী বলিলেন, "আপনি আহারাদি না করিয়া যাইতে পারিবেন না। আপনি একজন ভদ্রলোক, আপনাকে অনাহারে আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি না।"

সাতকড়ি বন্দোপাধ্যায় চলিয়া যাইবার জন্য বিশেষ পিড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু পারিলেন না। অগত্যা বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যদুনাথ চৌধুরীর বাড়ী আতিথ্য স্বীকার করিলেন। যদুনাথ চৌধুরী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাড়ী গমন করিলেন।

কাত্যায়নী গবাক্ষ সন্নিধানে নিবিষ্টচিত্তে এতক্ষণ দুইজনের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি ভগবানকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভগবান, তুমিই অনাথার বল।"

—•—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চানন বোস।

টাকার লোভ বড় লোভ। নানারূপ প্রবঞ্চনা করিয়া, অনাথা বিধবা এবং তাঁহার কন্যাকে পথে বসাইয়া পঞ্চানন বোস বিপুল জমিদারী হস্তগত করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছিলেন। প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদারের যাহা যাহা আবশ্যক তাহা তাহা পঞ্চানন বোস করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাণ্ড বাড়ী, পুষ্করিণী, পুষ্পোদ্যান, নাটমন্দির, দেউড়ি, নহবৎখানা, কাছারিবাড়ী, দরওয়ানদিগের আবাসগৃহ, আস্তাবল সকলি করিয়াছিলেন। ধনশালীর যাহা যাহা গৃহসজ্জা তাহা তাহা করিয়াছিলেন। তাঁহার কিছুরই অভাব ছিলনা। পূর্ব্বে তাঁহার মদ্যপান এবং পরদারগমন ছিলনা; কিন্তু বিপুল জমিদারী হাতে পাওয়াতে তাঁহার যথেষ্ট মোসাহেব জুটিয়াছিল। তাহারা অহোরাত্র তাঁহাকে মদে এবং কুৎসিৎ আমোদে ডুবাইয়া রাখিত।

তাঁহার যখন মদের নেশা থাকিত, তখন তিনি তাহাতে বিভোর থাকিতেন। নেশা থাকিতে কাহারও কোন চিন্তা থাকেনা। পঞ্চানন বোসেরও তাহা ছিলনা। কিন্তু, যখন তাঁহার নেশা ছুটিত তখন তিনি এত সুখে ডুবিয়া থাকিয়াও এবিশ্ব সংসারে শান্তি পাইতেন না। এরূপ প্রকৃতির লোক জীবনে শান্তি পায় না। পঞ্চানন বোস কিরূপে শান্তি পাইবেন? তাঁহাকে কালরূপ দুশ্চিন্তায় সদাই ঘিরিয়া রাখিত। এ যাতনা বড়ই অসহ্য। মোসাহেবেরা তাহা বুঝিত। তাহারা অভীষ্টসিদ্ধির মানসে যখন তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিত, তখনই তাঁহাকে মদ খাওয়াইত। হায় সুরা দেবি, যত তোমার

মহিমা! তুমি দুর্ব্বলের বল। কিন্তু কতক্ষণ? যতক্ষণ তোমার শক্তি থাকে ততক্ষণ।

যে মহাপাপী তাহার কি নিস্তার আছে? আজই হউক কালই হউক সে নিশ্চয় কৃত অপরাধের ফলভোগ করিবে। পঞ্চানন বসু মহাপাতকী। তাঁহার পাপের অবধি নাই। সে কি ভগবানের নিকট ক্ষমা পাইবে? কখনই না।

পয়সা না হইলে লোকের চলেনা। আবার পয়সা হইলে মানুষকে পাপের স্রোতে ভাসাইয়া দেয়। কয়জন তাহা বুঝে? পঞ্চানন বোস যখন বসন্ত-কুমারের অধীনে চাকুরী করিতেন তখন তাঁহার চরিত্র একরূপ ছিল। পরের ধন হাতে পাইয়া তাঁহার আর সে চরিত্র এখন নাই। তিনি এখন ঘোর দুশ্চরিত্র। তাঁহার কাম প্রবৃত্তি ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল। নিরীহ ভদ্র লোকরা আর নিকটস্থ গ্রামে নিশ্চিন্ত হইয়া স্ত্রী কন্যা লইয়া বাস করিতে পারিতনা। তাহারা কোথায় যাইবে? মুল্লুক জুড়িয়া পঞ্চানন বোসের জমিদারী। পলাইবার কি উপায় আছে? টাকার জোরে কিনা হইয়া থাকে? পঞ্চানন বসু এখন টাকার জোরে অসাধ্য সাধন করিতে লাগি-লেন। বারাঙ্গনারা লোকের পাপকার্য্যের তুষ্টি করিতে পারে। গৃহস্থের কুলবধূ অথবা কন্যারা কি তাহা পারে? যে দেশের সতীত্ব-মহিমা কত যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, সে দেশের ললনারা কি স্বেচ্ছায় তাহা-দের অমূল্য রত্ন বিলাইতে পারে? টাকার লোভে কেহ কেহ পারে; কিন্তু কয়জনে?

পঞ্চানন বোসের মোসাহেবেরা প্রথম প্রথম নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকদিগকে অর্থের দ্বারায় বশীভূতা করিয়া, বাবুর ভোগের জন্য আনয়ন করিত, প্রসাদ তাঁহারাও পাইত। এখন বাবুর টাকার লোভে কেহ আর আসিতে লাগিল না। জাতের ভয়তো আছে? বাবু চিরকাল তাহাদের ভরণ পোষণের বোঝা মাথায় করিবেন না;—কেবল একদিনের জন্য। এরূপ প্রলোভনে লোকে মজিবে কেন? এখন বাবু নিরুপায়! আসর সরগরম নিত্য দরকার। শেষে মোসাহেবদিগের উত্তেজনায় বাবুর আদেশে দ্বারবানেরা যেখানে সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিতে লাগিল তাহাই ধরিয়া আনিতে লাগিল। সকলের

মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। জমিদার দেশের ও দশের মা বাপ, তাঁহারই এমন কাণ্ড! কেহ মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারেনা। সকলেই সাবধান হইল;—সকলেই জমিদারের সর্ব্বনাশ যাহাতে হয় এরূপ মতলব আঁটিতে লাগিল।

পঞ্চানন বসু ঘোর পাপী। তাঁহার বয়স ৪৫এর উপর। তাঁহার সাবালক পুত্রও বর্ত্তমান। যাহার মতিচ্ছন্ন ঘটে তাহার আবার লজ্জা কি? পুত্রের সমক্ষে, স্ত্রীর সমক্ষে ও আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে যে পৈশাচিক কাণ্ড করে সে নরাধম। যে একবার পাপে ডুব দিয়াছে, যে পাপে অহোরাত্র মজিয়া আছে, তাহার আবার মান অপমান জ্ঞান আছে? পঞ্চানন বসু ধনবান ব্যক্তি। তিনি লোককে ভয় করেন না, সমাজকেও ভয় করেন না। তিনি বলেন, আমি নিজেই সমাজ, আমি যাহা ইচ্ছা করিব। সমাজের লোকে আমার আদেশ মাথায় করিয়া লইবে।

পঞ্চানন বোসের চিন্তা বড় ভয়ানক। পাপ কার্য্য করিয়া কোন জিনিষ লাভ করিলে মনোমধ্যে সদাই সেই চিন্তা আসিয়া দেখা দেয়। কত ভয় দেখায়, আবার কত বীভৎস চিন্তা তাহাকে মুহুর্মুহু আলিঙ্গন করে। পঞ্চানন বোসের এখন সেইরূপ অবস্থা। পঞ্চানন বোসের আবার ভয় কি? কেবল বসন্তকুমারের পত্নী এবং কন্যাকে ভয়। তাহারা এ পৃথিবীতে থাকিতে পঞ্চানন বোস অগাধ টাকার ঘরে শুইয়া থাকিলেও সুখী হইতে পারিবেন না। তিনিত জানেন যে বিষয় সম্পত্তি একজনের, ফাঁকি দিয়া তিনি তাহা করতলগত করিয়াছেন। যদি বিধবার কেহ সহায় হয়, যদি বিধবার হইয়া কেহ মামলা খাড়া করে, তাহা হইলে তাঁহার উপায় কি হইবে? তিনিত হারিবেনই, এমনকি তাঁহার তাহাতে সর্ব্বনাশ হইতে পারে। এই দুইটি নিরীহ প্রাণীদিগকে পঞ্চানন বোস যমের ন্যায় ভয় করিতেন। বসন্ত কুমার গিয়াছেন, কিন্তু বসন্তকুমারের নাম পর্য্যন্ত তিনি লোপ করিতে চান। সেই জন্য পঞ্চানন বোস অদ্যাবধি তাহাদিগকে নিপাত করিবার জন্য অনেক ফিকিরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই।

শ্রীনিরঞ্জন সান্যাল।

শোভনার প্রাচীন ইতিহাস। *

"শাশ্বতী"র গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় কৃতী লেখক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয় "ধামশ্রেণী" শীর্ষক প্রবন্ধের আরম্ভে লিখিয়াছেনঃ—

"স্বদেশভক্ত বাঙ্গালী আমরা সোণার বাঙ্গলা জন্মভূমি বলিয়া কতই গর্ব্ব করি! কিন্তু এই বাঙ্গলা দেশের কোন্ প্রান্তে কি অমূল্য রত্ন লুক্কায়িত আছে তাহার সংবাদ রাখেন কে? অধিক কি নিজের জেলায় ঘরের কোণে কোথায় কি রহিয়াছে তাহাই বা জানেন কয়জনে? অতীতের কত কীর্ত্তিকাহিনী লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া কালের কোলে মিশিয়া যাইতেছে। এসব দেখিবার বা শুনিবার সুযোগ আমাদের হয় না! খুঁজিলে গৌরবের জিনিস অনেক মিলে, কিন্তু সে বিষয়ে আমরা নিরুৎসাহ।

নবীন লেখকগণের অনেকেই অপরের চর্ব্বিত বিষয় চর্ব্বণ করিয়া অথবা পরের উপর মুনসিয়ানা ফলাইয়া বাহাদুরী লইতে তাঁহাদের মূল্যবান সময় নিয়োগে বিব্রত। গৃহে বসিয়া পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান চলে না। যদি তাঁহারা বিলাসহর্ম্ম্য ভুলিয়া প্রকৃতির কোলে ঝাঁপ দিবার অবসর পান তবে কত লুপ্ত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে, কত ভ্রান্ত তথ্যের সংস্কার হইতে পারে, অতীতের তিমির বিবর হইতে কত রহস্যের উদ্ধার হইতে পারে।"

বাস্তবিক বাঙ্গলার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে অনুসন্ধান করিলে এখনও অনেক পুরাতত্ত্ব লাভ করা যাইতে পারে। আজ আমরা যে ক্ষুদ্র পল্লীর প্রাচীন কাহিনী বিবৃত করিতে অগ্রসর হইয়াছি অবশ্য ইহার যে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাইয়াছি তাহা নহে। কেবলমাত্র জনশ্রুতি ও জনপ্রবাদ হইতে এই কাহিনী সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলাম।

শোভনা খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার এলেকাধীন একটী অনতিবৃহৎ পল্লী। ইহা খুলনা টাউন হইতে অন্যূন ২০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ভদ্রা নদের তীরে অবস্থিত। ইহার অবস্থান ও স্বাভাবিক দৃশ্য বড়ই চিত্তাকর্ষক। সাহস ও মলই পরগণা পূর্ব্বে শোভনার অধীন ছিল। 'আইন-ই-আকবর' গ্রন্থে

* সেনহাটী "পীতাম্বর লাইব্রেরী"র দ্বাদশ বার্ষিক শ্রাবণমাসের ৪র্থ অধিবেশনে পঠিত।
লেখক।

এই মহল 'শোভনাথ' বা 'শোয়নাথ' পরগণা বলিয়া লিখিত আছে। তখন ইহার রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫১৬৬২ দাম *। এই শোভনাথ এখন শোভনা নামে পরিচিত। তবে কেহ কেহ বলেন যে, এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা মনোরম ও নয়নাভিরাম ছিল বলিয়াই এস্থানকে শোভনা আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। তবে 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের লিখিত শোভনাথই বোধ হয় শোভনা নামে পরিচিত হইয়াছে। এই শোভনা যে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী সুদূরবিস্তৃত 'সুন্দরবন' নামক মহারণ্যের অন্তর্ভুক্ত তাহার আর প্রমাণ না দিলেও চলিতে পারে। কারণ খুলনা জেলার 'ডাকাতের বিল', 'মাথাভাঙ্গার বিল' প্রভৃতি সুবৃহৎ বিল যে সুন্দরবনের অংশবিশেষ তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এসকল বিল যখন শোভনার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত তখন শোভনা যে সুন্দরবনের অন্তর্গত তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতেই পারে না।

যে সময় মহারাষ্ট্রী দস্যু বা বর্গীদিগের অমানুষিক অত্যাচারে সমগ্র বঙ্গদেশ বিধ্বস্ত হইতে আরম্ভ হয় তখন বিভিন্ন স্থানের উৎপীড়িত পল্লীবাসীগণ স্ব স্ব ধনপ্রাণসহ সপরিবারে এই সমস্ত অঞ্চলে আসিয়া জঙ্গলাদি পরিষ্কার করতঃ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। লোকে বলে এবং ইহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এতদঞ্চলে সেই সময় হইতে এই সকল পল্লীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এসময় ধরিতে গেলেও মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্ত্তী সময় বলিয়াই স্থির করা যায়। কিন্তু আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে যখন এ মহলের উল্লেখ আছে, এমন কি এ মহলের রাজস্বের পরিমাণ পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে, তখন ইহা সম্রাট্ আকবরের সময় বলিয়া অনুমিত হয়। কোন্‌টী ঠিক তাহা মীমাংসা করিবার ভার ঐতিহাসিকগণের হস্তে রহিল।

লোকে বলে—যে সময় মুসলমান শাসনদণ্ড শিথিল হইয়াছিল এবং ইংরাজ আধিপত্যের সূত্রপাত হইতে আরম্ভ হয় সেই সময় মাইনগরের সর্দ্দারেন্দ বসু নামক একজন পরাক্রান্ত লোক সুবিধা পাইয়া এই অঞ্চলে জমীদারী প্রতিষ্ঠা মানসে আগমন করেন। তখন বাঙ্গলার নবাব কে ছিলেন তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে এমহলের রাজস্ব আদায়ের জন্য নবাবের কর্ম্মচারী ছিল। সর্দ্দারেন্দকে সেই নবাব কর্ম্মচারীর সহিত অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে হইয়া

* ৪০ দামে ১৲ এক টাকা হয়।

ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত লড়াপেটার পর নবাব কর্ম্মচারী সূর্য্যবেদের এক পাঠান লাঠিয়াল কর্ত্তৃক নিহত হন। এ সংবাদ অনেক দিন পর্য্যন্ত নবাবকর্ণে পৌঁছায় নাই। এদিকে সূর্য্যবেদ আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসিলেন। কিস্তি-মত এ মহলের রাজস্ব নবাবকোষে যাইতে বিলম্ব দেখিয়া নবাব অনুসন্ধান লইতে লোক প্রেরণ করেন। নবাব প্রেরিত লোক প্রত্যাগমন করিয়া যথাযথ সংবাদ প্রেরণ করিলে নবাব ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া সূর্য্যবেদকে ধৃত করিবার মানসে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সূর্য্যবেদ বশ্যতা স্বীকার করিয়া নবাব সমীপে আগমন করিলেন। নবাব সূর্য্যবেদের প্রাণ লইয়া স্বীয় কর্ম্মচারীর প্রতিশোধ দিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া সূর্য্যবেদকে শোভনা পরগণার জমীদার স্বীকার করিয়া তাঁহাকে করপ্রদানে এবং আবশ্যক হইলে যুদ্ধাদির সময় লোকজনও রসদাদি দিয়া সাহায্য প্রদানে সম্মত করাইলেন।

সূর্য্যবেদ ফিরিয়া আসিয়া প্রবল প্রতাপে বিশাল জমীদারীর মালিক হইয়া বসিলেন। কিছু দিন পরে ইষ্টকনির্ম্মিত বাসভবন ও কাছারী বাড়ী প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিষ্কণ্টকে 'জমীদার সূর্য্যবেদ' আখ্যায় এতদ্দেশে পরিচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি পূর্ব্ব বাসস্থান মাইনগর হইতে স্বীয় পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজন শোভনায় আনয়ন করিলেন।

মানুষের আশা কখনও মিটে না—লক্ষপতি হইলে ক্রোরপতি হইতে ইচ্ছা করে। তিনি 'জমীদার সূর্য্যবেদ' আখ্যায় সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া 'রাজা' উপাধি লাভ করিবার জন্য নবাব সমীপে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজা উপাধি প্রদান করা এক দিল্লীর সম্রাট ব্যতীত আর কাহারও ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তখন দিল্লীর সম্রাট নামমাত্র, তাঁহার ক্ষমতা একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। নবাব তখন আর সম্রাটের তাবেদারী অনেক সময় না মানিয়া স্বীয় ক্ষমতার স্বেচ্ছা ব্যবহার করিতে আর ইতস্ততঃ করিতেন না। তাই বশীকৃত ও বিনীত জমীদারের ব্যবহারে তাহাকে 'রাজা' ফরমাণ প্রদান করিলেন। ফরমাণ প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যবেদ শোভনায় আসিয়া 'রাজা সূর্য্যবেদ' বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। এখনও শোভনার অধিবাসীগণ শোভনাকে 'সূর্য্যবেদী শোভনা' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে শোভনায় যে স্থানে ভদ্রপল্লী অবস্থিত এ অংশ তখন ভুদ্দর নদের

প্রকাণ্ড চর ছিল। বর্ত্তমান ভদ্রপল্লীর দক্ষিণ দিকে রাজার বাড়ী ছিল; রাজার বাড়ীর চিহ্ন এখনও আছে। অনেক প্রকাণ্ড২ উচু ঢিবির নিম্নপ্রদেশে স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি এখনও বর্ত্তমান। সেই সকল উচু ঢিবির উপরে স্থানে স্থানে লোকে বাস করিতেছে। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে যে পরিখা বা গড়খাই ছিল তাহার চিহ্ন এখনও পর্য্যন্ত লোপ পায় নাই। রাজবাড়ী হইতে তাঁহার কাছারী বা দরবার গৃহ একটু দূরে পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। তাহার চিহ্নাদি এখনও বর্ত্তমান। আমরা স্থানে স্থানে খুঁড়িয়া দেখিয়াছি কিন্তু কোনও ইষ্টকখণ্ড পাই নাই।

রাজার প্রতিষ্ঠিত একটী দেবমন্দির ছিল। কালের পরিবর্ত্তনে সেই মন্দির মৃত্তিকানিম্নে বসিয়া গিয়াছিল। শুনিয়াছি যে প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে লোকে মন্দিরের কারুকার্য্যাদি দেখিতে পাইয়াছে। লোকে বলে যে, এই মন্দিরে প্রকাণ্ড একটী শিবলিঙ্গ ছিল। আমরা বহুক্লেশে খনন করাইয়া গুপ্ত তথ্যের উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু কিছুই পাই নাই। তবে একখণ্ড ইষ্টকের অর্দ্ধেক পাইয়াছিলাম। তাহাতে অস্পষ্টভাবে কি লেখা আছে। পাঠোদ্ধার করিতে অক্ষম হইয়া সেই ইষ্টকখণ্ড দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর সুযোগ্য ইতিহাসাধ্যাপক সাহিত্যসেবী শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে দিয়াছিলাম কিন্তু এযাবৎ তিনি তাহার কোনও নিরাকরণ করেন নাই।

শোভনায় পুরাতন পুষ্করিণী ২১৮টি আছে। তবে তাহার মধ্যে অনেকগুলি বোধ হয় সূর্য্যাবেদের পরবর্ত্তী সময়ে খনন করান হইয়াছিল। তিনি লোকহিতকর কার্য্য করিতে ভালবাসিতেন। শোভনার যে কোনও অংশে পানীয় জলের অভাব হইলে রাজা জলাশয় খনন করাইয়া দিতেন। রাজার অন্দর মহালে যে দীর্ঘিকা ছিল তাহা এখন 'এঁদোর পুকুর' নামে পরিচিত। এই জলাশয়ের উপরিভাগ এরূপ কঠিন ধাপে আবৃত যে শীতকালে গবাদি পশু অনায়াসে তাহার উপর দিয়া চরিয়া বেড়ায়। ইহার তীরে প্রকাণ্ড একটি পুরাতন বটগাছ আছে। ইহাকে 'এঁদোর তলা' বলে। এখানে বহুকাল হইতে প্রতিবৎসর 'গামটি' বা 'বারোয়ারি' পূজা হয়। এই গাছতলা ও জলাশয় সম্বন্ধে নানাপ্রকার গল্প প্রচলিত আছে; এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সদর পুকুরকে বর্ত্তমানে 'ধাপো' বলে। তাহাও কঠিন

ধাপে আবৃত। রামরতন বিদ্যাভূষণ নামক একজন তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজা তাঁহার নামে একটী জলাশয় খনন করেন, তাহাকে 'বিদ্যাভূষণ পুকুর' কহে।

রাণীর দুই দাসী ছিল। তাহাদের নাম সরী ও পারী। তাহারা আজীবন পরিচারিকার কার্য্য করিয়া মরিয়া গেলে পর রাজা তাহাদের নামানুসারে দুই পুষ্করিণীর নাম রাখেন। দুইটির নাম যথাক্রমে 'সরীকাণী' ও 'পারীর পুকুর'। কথিত আছে সরী দাসীর এক চক্ষু কাণা ছিল বলিয়া পুকুরের নাম সরকাণী হয়।

রাজা সূর্য্যবেদ শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রামরতন বিদ্যাভূষণ তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি একটী টোল স্থাপিত করেন। অনিন্দরাম-বিদ্যালঙ্কার টোলের অধ্যাপনা করিতেন। সূর্য্যবেদ প্রতিষ্ঠিত টোল অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। সেই টোলের শেষ অধ্যাপক ছিলেন শ্যামাচরণ শিরোমণি। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত তখন এতদ্দেশে অতি বিরল ছিল। তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এখনও লোকে শিরোমণির টোলের কথা বলিয়া কত আক্ষেপ করিয়া থাকেন। শিরোমণি মহাশয় আজ প্রায় ১৫।১৬ বৎসর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমরা সেই অশীতিপর বৃদ্ধের নিকট হইতে শোভনার ঐতিহাসিক কিম্বদন্তীর অনেক গল্প শুনিয়াছিলাম।

রমাবল্লভ চক্রবর্ত্তী ও রামহরি চক্রবর্ত্তী রাজার কুলপুরোহিত ছিলেন। শোভনার বর্ত্তমান মুখোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় বংশীয়গণ রামহরির কন্যা-দিগকে বিবাহ করিয়া শোভনায় সেই অবধি বাস করিতেছেন। রাজপ্রদত্ত অনেক ব্রহ্মোত্তর রামহরির বংশধরগণ এবং তাঁহার জামাতাদিগের বংশ-ধরগণ এখনও ভোগদখল করিতেছেন। সেই সকল ব্রহ্মোত্তরকে বর্ত্তমানে 'হরিঠাকুরের বৃত্তি' বলে। শোভনার মুখোপাধ্যায় বংশে কনেকরাম এবং চট্টোপাধ্যায় বংশে প্রাণনাথ নামে দুই স্বনামধন্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। সমাজের নেতৃত্বে তাঁহারা প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। কনেকরামের প্রদত্ত রাস্তা এখনও তাঁহার নাম জাগাইয়া রাখিয়াছে।

অযোধ্যাধাম মিত্র রাজার দেওয়ান ছিলেন। বর্ত্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বড়্‌সে গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। অযোধ্যাধামের পুত্রের নাম ভবমিত্র। তিনি বিদ্বান ও সুপুরুষ ছিলেন। রাজা এই ভবমিত্রের সহিত তাঁহার একমাত্র কন্যা আনন্দময়ীকে বিবাহ দেন। রাজা ভবমিত্রকে কিছু সম্পত্তি দিয়া শোভনায় বাস করিতে বাধ্য করেন। শোভনায় বর্ত্তমান মিত্রবংশীয়গণ এই ভবমিত্রের বংশধর। রাজপ্রদত্ত জমাজমীর কাগজ পত্র এখনও আছে। এই মিত্রদিগের জমীদারীর কাগজ পত্রে তাৎকালিক

অনেক ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। শোভনার বর্ত্তমান বসুবংশ এই মিত্রবংশে বিবাহ করিয়া এখানে বাস করিতে থাকেন। শোভনার ক্ষুদ্র জমীদার ৺বংশীলাল ঘোষ পরবর্ত্তী কালে শোভনায় আগমন করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ অতিথিশালার কথা লোকে মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া থাকে।

সূর্য্যবেদেরা দুই ভাই ছিলেন। অপর ভ্রাতার নাম চন্দ্রবেদ। চন্দ্রবেদ কোনও সাংসারিক কারণে পৃথক হইয়া শোভনার পশ্চিমে প্রায় ৪ মাইল পূর্ব্বে বরাতিয়া গ্রামে সম্পত্তি লাভ করেন। চন্দ্রবেদের দেওয়ান ছিলেন ভূধর গড়গড়ি। ভূধরের স্থাপিত মঠের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। তাহাকে লোকে 'মঠবাড়ী' বলে। *

হায়! কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! বিধির কি অখণ্ডনীয় বিধান! যে শোভনা এককালে একজন রাজার রাজধানী ছিল আজ কিনা তাহা শ্মশান ভূমির তুল্য হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় বা শোভনার রাজপ্রসাদ আর কোথায় বা তাহার ঐশ্বর্য্য! কোথায় বা শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশক দেবমন্দির! সবই গিয়াছে—অবশ্য চিরদিন সমান যায় না। তবে কীর্ত্তি অবিনশ্বর। শোভনার সে চিরগৌরবকাহিনী চিরদিনই লোকমুখে আখ্যাত হইবে।

রাজা সূর্য্যবেদ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইল উহা ইতিহাস, এবং জনপ্রবাদ হইতে সংগৃহীত হইল। 'অনুসন্ধান' নামক পুস্তকের 'জনশ্রুতি' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য এখন অনেকেই নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রা, তাম্রশাসন, সাহিত্য প্রভৃতি আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইতেছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা পল্লীজীবনেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। সেই জন্য ভারতের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে পল্লীসমাজের প্রবাদ-কাহিনী ও জনশ্রুতির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু জনশ্রুতি অনেক সময় ঐতিহাসিককে ভুল পথে লইয়া যায়।"

আমরা রাজা সূর্য্যবেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারিলাম না। কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ অথবা সুযোগ্য ঐতিহাসিক যদি এই রাজার অস্তিত্ব ও সময় বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নির্ণয় করিতে পারেন তাহা হইলে ইহা খুলনা জেলার ইতিহাসে—শুধু খুলনা কেন সমগ্র বাঙ্গলার ইতিহাসে যে একটা প্রধান অধ্যায় অধিকার করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীবিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়।

---

* এ বিষয়ে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। লেখক।

শ্রীগুরবে নমঃ।

১ম খণ্ড।	অগ্রহায়ণ ১৩২০	অষ্টম সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক
শ্রীনিখিলনাথ রায়।

লেখকগণের নাম।

শ্রীসাতকড়ি অধিকারী এম.এ.; শ্রীকালিদাস রায় বি.এ.; শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্তী ;
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস ; শ্রীজীতেন্দ্রনাথ বসু ; শ্রীরেবতীকান্ত তর্কপঞ্চানন ;
শ্রীচন্দ্রকুমার সেন ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা শাশ্বতীর মূল্য প্রদান না করিয়াছেন, অগ্রহায়ণ সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভি পিতে পাঠান হইবে। তবে কেহ অন্য মাসে ভি, পি করিতে বলিলে আমরা তাহাও করিতে পারি। গ্রাহকগণের কোন পত্র না পাইলে অগ্রহায়ণ মাসেই ভি পি করিব। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

নিয়মাবলী।

—:•:—

সাহিত্যে দেশীয় ভাববিকাশই শাশ্বতীর উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কোন লেখক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে পারেন। নবীন লেখকগণের প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

শাশ্বতীর জন্য প্রবন্ধাদি ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি এবং চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এথোড়া পোঃ ভায়া সীতারামপুর ই, আই, রেলওয়ে ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য

এথোড়া (Ethora) পোঃ
ভায়া সীতারামপুর,
ই, আই, রেলওয়ে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীগুরবে নমঃ।

শাশ্বতী ১ম খণ্ড। অগ্রহায়ণ, ১৩২০। অষ্টম সংখ্যা।

শ্রীযুক্তপণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের

দার্শনিক আবিষ্কার।

——:০:——

হিন্দুর দর্শন শাস্ত্র বা তাহার মূল উপনিষদাদির তত্ত্ব জাজ্বল্যমান সত্য বলিয়া হিন্দুর ধারণা, তাহা কদাচ কল্পনাপ্রসূত নহে। দার্শনিক তত্ত্বগুলি কেবল অধ্যয়নের বিষয় নহে, তাহারা অনুষ্ঠান সাপেক্ষও বটে। অধ্যয়নে দার্শনিক তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না, কিন্তু অনুষ্ঠানই উপলব্ধির প্রধান সহায়। যাঁহারা অধ্যয়ন ও অনুষ্ঠান উভয়েরই দ্বারা দার্শনিক তত্ত্বের অনুশীলন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। হিন্দুর ব্রহ্ম, হিন্দুর আত্মা, হিন্দুর ঈশ্বর, হিন্দুর দেবতা, হিন্দুর যোগ, হিন্দুর সমাধি, হিন্দুর মোক্ষ, এ সমস্ত কেবল অধ্যয়নে বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু অনুষ্ঠানের দ্বারাই তাহাদের সত্যতা প্রমানিত হয়। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এক্ষণে দর্শন উপনিষদাদি অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনাদিতেই বদ্ধ আছে। ইহাদের তত্ত্ব সমুদায়ের অনুষ্ঠান না থাকায়, এই সকল শাস্ত্রের প্রতি অনেকেরই আস্থা শিথিল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলের প্রকৃত অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন। এমন কি তাঁহারা ঐ সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বের অনুষ্ঠান কালে নব নব বিষয়ের আবিষ্কারেও সমর্থ হন।

বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পরিচয় বঙ্গবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। ২৬ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় হিন্দুধর্ম্মের বিরাট আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তিনি কিরূপে সমগ্র বাঙ্গালায় সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ও উচ্ছৃঙ্খল হিন্দু সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। চূড়ামণি মহাশয় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বহুতর উপনিষৎ ও দর্শনাদি অধ্যাত্মবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা পর্য্যালোচনা দ্বারা ত্রিশ একত্রিশ বৎসর যাবৎ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের অধ্যাত্মবিদ্যা বা আত্ম-বিদ্যা কোনরূপ কল্পনামূলক ধারণা বিশেষ নহে, প্রকৃত পদার্থ বা শরীর তত্ত্বের পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুমানগঠিত ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান নহে, বা প্রাকৃত বিদ্যাদির ন্যায় দিন দিন পরিবর্ত্তনীয় নহে। উহা দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় সত্যভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর্য্যঅধ্যাত্মবিদ্যার প্রত্যেক সিদ্ধান্ত বিশিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জাজ্বল্যমান সত্যতা প্রকাশ করে। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে উহার ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা আছে, এবং পৃথক পৃথক ভাবে উহার প্রত্যেক তত্ত্বের বিনিয়োগ আছে। সেই সকল কার্য্যক্ষেত্রে অধ্যাত্ম সিদ্ধান্তগুলির উপযুক্ততা বিনিয়োগ করিলেই তাহার অব্যর্থ ফল দেখিতে পাইয়া উহার সত্যতার পরীক্ষা হইয়া যায়। এই বিষয়ের প্রতিপাদনের জন্য তিনি বহুবিধ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন, এবং মৌখিক উপদেশ দ্বারা শিষ্যগণকেও শিক্ষাদান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা এতদনুরূপ যে, শারীর বিদ্যা ও প্রাকৃত বিদ্যার অধিকারী হইয়া অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রকৃত অধিকারী না হইলে তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারা যায় না। আমরা অবকাশ বা সম্ভব হইলে তাহার কিছু কিছু পরে প্রকাশের চেষ্টা করিব। আপাততঃ সাধারণে যাহার ফল দেখিতে পারেন, অধ্যাত্ম বিদ্যার সেইরূপ একটী ফল লইয়া আমরা সকলের নিকট উপস্থিত হইতেছি। সেই ফলটি মানসিক অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্যাধির প্রতিকার।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলেন, মানসিক চিকিৎসার দ্বারা সকল প্রকার ব্যাধির শান্তি হইতে পারে। কেবল তাহাই নহে, মানসিক চিকিৎসার দ্বারা ব্যাধির যেরূপ নিঃশেষে প্রতিকার হয়, ঔষধাদির দ্বারা তাহার সেইরূপ

প্রতিকার হইতে পারে কিনা সন্দেহ; এবং যে সকল ব্যাধি ঔষধের অধিকারের বহির্ভূত, তাহাও মানসিক চিকিৎসার গভীর সম্পূর্ণ অধীন। এ চিকিৎসার দ্বারা শান্তি হইতে পারে না এমন কোন ব্যাধি মানুষের হইতে পারে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না। আর এ অনুষ্ঠান যে অত্যন্ত দুরূহ তাহাও নহে। তবে এই অনুষ্ঠান রোগীর নিজের করিতে হয় এবং তাহাতে দেড় ঘণ্টা পর্য্যন্ত আপেক্ষিক স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে হয়। অতএব যাঁহারা তাহাতে অসমর্থ অথবা অসামর্থ্যজনক রোগের দ্বারা আক্রান্ত, যেমন অত্যন্ত শীতকম্পাদি হইয়া দারুণ জরাক্রান্ত হয়, বা মিনিটে মিনিটে ভেদ বমি করিতে হয়, অথবা কোন ব্যাধির দ্বারা সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পতিত হয়, এরূপ ক্ষেত্রে এ চিকিৎসা সম্ভবপর নহে। জ্বর বা ভেদ বমির সূচনাবস্থায় অনুষ্ঠানের জন্য বসিতে পারিলে জ্বরাদি আসিবার আশঙ্কা থাকেনা।

এই অনুষ্ঠান বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা করিতে পারেন, মূর্খেরাও করিতে পারেন, স্ত্রীলোকেরাও করিতে পারেন। ১৫। ১৬ বৎসরের যুবক যুবতী হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আপামর সাধারণ সকল অবস্থার সকল লোকই করিতে পারেন। বলাবাহুল্য বিশ্বাস অবিশ্বাস, আস্তিক্য নাস্তিক্য বা ধার্ম্মিকতা অধার্ম্মিকতার সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। চূড়ামণি মহাশয় এই অদ্ভুত তত্ত্বটি সাধারণের সমক্ষে এখনও উপস্থিত করেন নাই। আজিও ইহা তাঁহার পরীক্ষা ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইতেছে। তিনি এ পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক সহস্রলোকের মধ্যে এই চিকিৎসা প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে শতকরা ৬। ৭ টি মাত্র বিফল হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে তাঁহারা কোন মতে উক্ত অনুষ্ঠান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তদ্ব্যতীত সকলেই আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। যে সকল লোক যে সকল ব্যাধি হইতে এই চিকিৎসার দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ধাম আদির তালিকা চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট লিখিত আছে। আমরা কেবল তদ্দ্বারাই ইহার সত্যতা বিদিত হই নাই, আমাদের স্বগণের মধ্যেও ইহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সময়ান্তরে আমরা সেই সমস্ত লোকের ব্যাধি শান্তির তালিকা প্রদান করিয়া এই নব আবিষ্কৃত চিকিৎসা প্রণালীর সম্যগ্‌রূপ

আলোচনা করিব। নিম্নে ইহার দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।* সাধারণে তাহা হইতে উক্ত চিকিৎসা প্রণালীর অদ্ভুত ফল অবগত হইতে পারিবেন এবং হিন্দুর অধ্যাত্ম শাস্ত্রের প্রতি তাঁহাদের মস্তক যে অবনত হইবে তাহাও আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

* (১) জেলা সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড় রাজবাটীর কুমার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র পাঁড়ের জামাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শর্ম্মা শিরঃশূলে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন। সূর্য্যোদয়ের পর বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিরোবেদনা বৃদ্ধি পাইত। তিনি বহুবিধ চিকিৎসা করিয়া কোন ফল পান নাই। ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে চূড়ামণি মহাশয়ের উপদেশক্রমে মানসিক চিকিৎসার অনুষ্ঠানে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

(২) উক্ত যতীন্দ্রনাথ দারুণ পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। পিত্তথলী হইতে পাকস্থলীতে পিত্ত নিঃসরণের প্রণালী মধ্যে প্রস্তর কণা উপচিত হইয়া তাঁহাকে কষ্ট প্রদান করিতেছিল, গত কার্ত্তিক মাসে চূড়ামণি মহাশয়ের উপদেশ ক্রমে তিনি মানসিক চিকিৎসার দ্বারা ব্যাধিমুক্ত হইয়াছেন। প্রথম অনুষ্ঠান কালে তাঁহার বেদনা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি তজ্জন্য অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইতে ইচ্ছা করিলে, চূড়ামণি মহাশয় তাঁহাকে অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করেন। যতীন্দ্রনাথ আগ্রহ সহকারে অনুষ্ঠান করিয়া শেষে ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন।

(৩) পাকুড়ের কুমার শ্রীযুক্ত প্রতাপেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ের কর্ম্মচারী শ্রীরাধানারায়ণ ভট্টাচার্য্য এক অদ্ভুত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। নিদ্রাকালে এবং নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে তিনি ব্যাঘ্র, ভল্লুক, উল্লুক, ডাকাত প্রভৃতি হইয়া উঠিতেন, ও ভয়ানক চীৎকার করিতেন। গত শ্রাবণ মাসে চূড়ামণি মহাশয়ের উপদেশক্রমে মানসিক চিকিৎসার অনুষ্ঠান করিয়া তিনি সেই অদ্ভুত ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন। অনুষ্ঠানের প্রথম ও দ্বিতীয় দিবসে ব্যাধির নিঃশেষে শান্তিসম্বন্ধে কিছু সন্দেহ ছিল, কিন্তু তৃতীয় দিবসে সে সন্দেহ একেবারে দূরীভূত হয়।

এতদ্ভিন্ন কাশরোগ জ্বররোগ প্রভৃতি কঠিন কঠিন পীড়ার শান্তি সম্বন্ধে দৃষ্টান্তও আছে। স্থানা ভাবের জন্য সে সমস্ত উল্লিখিত হইল না।

বেদ।

(দেবতা)

(৪)

বেদে যজ্ঞকার্য্য ধর্ম্মরূপে বিহিত হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশে নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যাদির অগ্নিতে আহুতিরূপে প্রক্ষেপাদি যজ্ঞক্রিয়া নামে কথিত হইয়া থাকে। যজ্ঞাদি কার্য্যেই মন্ত্রের প্রধানতঃ বিনিয়োগ। প্রত্যেক মন্ত্রই কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ায় কোন নির্দ্দিষ্ট দেবতার স্তুতি, বর্ণনা বা আহ্বানাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এক একটী যজ্ঞে অনেক দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে ও তাঁহাদের স্তুতিবাচক সূক্তাদি পঠিত ও গীত হইয়া থাকে। আমরা এই প্রবন্ধে ঐ সকল দেবতার সংখ্যা ও স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করিব।

আমরা বাল্যকাল হইতে তেত্রিশ কোটি দেবতা এই কথা শুনিয়া আসিতেছি। দেবতার সংখ্যা অনেক, দেবতা বহু এই অর্থেই "তেত্রিশ কোটি দেবতা" এইরূপ কথা প্রচলিত হইয়াছে। বেদেও দেবতার বহু সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে—

ত্রীণি শতা ত্রীসহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চদেবা নবচ সপর্য্যন্॥

ঋ, স, ৩।৯।৯, ঋ, অ, ৩৩।৭

তিন শত তিন সহস্র ত্রিশ ও নয় অর্থাৎ তিন সহস্র তিন শত উনচল্লিশ জন দেবতা অগ্নির পূজা করিয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কতি দেবতা যাজ্ঞবল্ক্যেতি" ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতা ত্রয়শ্চ ত্রীচ সহস্রেতি" অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা তিন সহস্র তিন শত ছয়।

আমরা সাধারণতঃ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মাদিকেই দেবতা বলিয়া জানি। নিরুক্তলক্ষণানুসারে বেদে বৃক্ষের শাখা উদূখল, মুষল, প্রস্তর, ধনু, জ্যা, দুন্দুভি, শকুনি, মণ্ডূক, রথ, অশ্ব, কাষ্ঠ মুদ্গর (দ্রুঘণ) দেবতারূপে স্তুত বা পূজিত হইয়া থাকে। এইরূপ অগ্নি,

সূর্য্য, বিদ্যুৎ, বায়ু প্রভৃতির বেদে স্তব দেখিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেন যে, বেদমন্ত্ররচয়িতা প্রাচীন আর্য্যগণ অতি সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহারা প্রাকৃতিক পদার্থের আশ্চর্য্য রূপ আশ্চর্য্য শক্তি ও আশ্চর্য্য কার্য্যকলাপ দেখিয়া কখন বিস্ময়ে কখন ভয়ে কখন আনন্দে বিভোর হইয়া বৈদিক মন্ত্র রচনাপূর্ব্বক উক্ত পদার্থ নিচয়ের স্তব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে অনেক অসভ্য জাতি যেমন সরলভাবে গাছের গুঁড়ি, প্রস্তর খণ্ড, বৃক্ষের শাখা প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে, প্রাচীন আর্য্যগণও সেইরূপ প্রস্তর খণ্ড, ধনু, বৃক্ষশাখাদির পূজা করিতেন। পরে ক্রমশঃ সভ্য ও সভ্যতর হইয়া একাত্মবাদ প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন কোন সুসভ্য জাতির মধ্যেও অসভ্যাবস্থার প্রচলিত কোন কোন আচার বর্ত্তমান অবস্থায় যেরূপ পরিত্যক্ত হয় নাই, সেইরূপ আর্য্যগণও সুসভ্য হইয়াও পূর্ব্বপ্রচলিত মৃৎ পাষাণাদির পূজা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদানুসরণ করিয়া আমাদের দেশেরও অনেক কৃতবিদ্য মনীষিগণ বেদোক্ত দেবতাগণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রচারিত সিদ্ধান্তই অভিমত বলিয়া গ্রহণ করেন ও সমাজের হিতের জন্য সকলকেই তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় বেদ, ব্রাহ্মণ নিরুক্ত, মীমাংসাদি গ্রন্থে দেবতা সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্ত আছে তাহা দেখিয়া প্রাচীন আর্য্যগণের দেবতাতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করাই যুক্তিসঙ্গত। পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, তপস্যাপূত শুদ্ধচিত্ত ঋষিগণ বেদমন্ত্র ও ব্রাহ্মণাদি প্রকাশ করিয়াছেন। নিরুক্তকার যাস্কের মতে এই ঋষিগণ ইষ্টপ্রাপ্তিকামনায় যে মন্ত্রের দ্বারায় যে দেবতার স্তব করিয়াছিলেন তিনিই সেই মন্ত্রসম্বন্ধে দেবতা।

> "যৎ কাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্
>
> স্তুতিং প্রযুঙ্‌ক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি।"* নি ৩৷১

* "যদর্থবস্তু কাময়মানঃ ঋষিঃ যস্যাং দেবতায়ামভিষ্টুতায়াং আর্থপত্যমর্থপতিত্বমাব-মাত্মন ইচ্ছন্ অমুষ্যা দেবতায়াঃ প্রসাদেনাহমমুষ্যার্থস্য পতিঃ স্যামিত্যভীপ্সন্ তাং স্তুতিং পুরোধায় স্তুতিং প্রযুঙ্‌ক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি" ইতি দুর্গাচার্য্য।

"যা তেনোচ্যতে সা দেবতা" ইতি সায়ণঃ।

অর্থাৎ কোন বিষয় কামনা করিয়া, এই দেবতার প্রসাদে আমি অভিলষিত বিষয় লাভে সমর্থ হইব মনে করিয়া, কোন ঋষি যে দেবতার স্তব করেন সেই স্তবরূপ মন্ত্রের তিনিই দেবতা। সায়ণাচার্য্য বলেন, যাঁহার উদ্দেশে মন্ত্র কথিত বা প্রযুক্ত হয় তিনিই ঐ মন্ত্রের দেবতা। সুতরাং সায়ণ ও যাস্কের লক্ষণানুসারে যাঁহাদের উদ্দেশে মন্ত্র রচিত হইয়াছিল, তাঁহারাই মন্ত্রের দেবতা; ও দেবতারা স্তোতার অভীষ্ট প্রদানে সমর্থ। কিন্তু বেদে দেখা যায় যাহারা অচেতন পদার্থ পাষাণাদি বা ঐশ্বর্য্যহীন চেতন ইতর প্রাণী অশ্ব, মণ্ডুক প্রভৃতি, তাহাদের উদ্দেশেও স্তুতি প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের দ্বারা কামনা সিদ্ধিই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। ঋষিগণ যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী ও নির্ম্মলসত্ত্ব বলিয়া বর্ণিত আছেন তাঁহারাই বা কিরূপে এই সকল অচেতন বা সচেতন ইতর প্রাণীর স্তব করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। এই সন্দেহ সকলেরই মনে উদিত হইতে পারে। সেজন্য নিরুক্তকার যাস্ক শিষ্যের সন্দেহ উপলক্ষ করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে এই বিষয়ের সমাধান করিয়াছেন।

দেবতার যেরূপ লক্ষণ করা হইল, তাহা দেখিয়া, অচেতন রথাদি ও অনীশ্বর ইতর প্রাণী মণ্ডুক প্রভৃতির স্তুতি দেখিয়া, ও মনুষ্যের বাহনাদি অশ্বাদির ন্যায় দেবতাদিগের বাহনায়ুধাদির বর্ণনা ও স্তুতি দেখিয়া যদি কোন শিষ্যের মনে এইরূপ সন্দেহের উদয় হয় যে, অচেতন রথপাষাণাদি অশ্বাদি প্রাণী ও দেবতাদির বাহনায়ুধাদি ইহারা সকলেই জন্মমরণশীল, সুতরাং বিধ্বংসী, ইহাদের নিত্য অমর দেবগণের ন্যায় স্তুতি কিরূপে সম্ভব হয়; ইহারাই বা কিরূপে স্তোতৃগণের অভীষ্টফলদানে সমর্থ হইতে পারে। তাহার সন্দেহ অপনোদনহেতু আমি বলি যে, যিনি প্রকৃত দেবতা মহান্ আত্মা তাঁহার অণিমাদি অচিন্তনীয় ও অপরিমিত ঐশ্বর্য্যহেতু তিনি এক হইলেও বহুরূপ ধারণ করেন বলিয়া বহুরূপে স্তুত হইয়া থাকেন। তিনি ঐশ্বর্য্য হেতু নানারূপে পরিণত। দেবতাদের মধ্যে কেহ তাঁহার অঙ্গ, কেহ বা তাঁহার প্রত্যঙ্গরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি তাঁহার অঙ্গস্বরূপ, আবার জাতবেদা, বায়ু, ভগ প্রভৃতি ও শকুনি, অশ্ব প্রভৃতি তাঁহার প্রত্যঙ্গস্বরূপ। যেমন ঘট, শরাবাদি একভাবে ভিন্ন, আবার মৃত্তিকা

ভাবে এক, সেইরূপ সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি একভাবে পৃথক্, আবার এক ভাবে মহান্ আত্মার সহিত অভিন্ন। আর এক কথা, ঋষিগণ সত্তালক্ষণ মহান্ আত্মা হিরণ্যগর্ভের স্থাবর জঙ্গমভাবে বহু পরিণাম অনুভব করিয়া স্থাবর জঙ্গমাদিও প্রকৃত সত্তাস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে অনুধাবন করিয়া কারণস্বরূপ আত্মার মহিমাখ্যাপনে উঁহাদের স্তব করিয়াছেন। তিনিই যখন সর্ব্বরূপে পরিণত হইয়া বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছেন, তখন পাষাণাদি অদেবতা কেন স্তুত হইল একথা বলা কিছুতেই সঙ্গত নহে। আবার তিনি যখন অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি অঙ্গস্বরূপ হন তখন তাঁহাদের মহৎ ঐশ্বর্য্যহেতু তাঁহাদের অন্যতম অন্যতম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এরূপ ভাবে বর্ণিত আছে। জীবগণের কর্ম্মফল সিদ্ধির জন্য এক মহান্ আত্মাই অগ্নি বায়ু সূর্য্য-রূপে পরিণত হইয়া জন্মলাভ করিয়া থাকেন। দেবতাদের যে রথাদির বর্ণনা আছে, তাহার অর্থ তাঁহারা ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়া সংকল্পানুসারে রথাদিরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারাই অশ্ব, তাঁহারাই আয়ুধ, তাঁহারাই রথ। অতএব অশ্বাদিভাবে স্তুত হইয়া তাঁহারাই অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। *

* "স যদি মন্ত্রেভাগস্তু বিবার্ধান্ দেবাত্তানাং প্রত্যক্ষদৃষ্টমেতদ্ ভবতি মাহাভাগ্যাদ্ দেবতায়া একঃ আত্মা বহুধা স্তূয়তে, একস্যাত্মন অন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। (১) অপিচ সত্ত্বানাং প্রকৃতি (২) ভূমিভিঃ ঋষয়ঃ স্তুবন্তীত্যাহুঃ প্রকৃতি সার্ব্বনাম্ন্যাচ্চ (৩) ইতরেতরঃ জন্মানো ভবন্তীতরেতরপ্রকৃতয়ঃ কর্ম্মজন্মানঃ আত্মজন্মান আত্মৈব এষাং রথো ভবত্যাত্মাশ্ব আত্মায়ুধমাত্মেষব আত্মা সর্ব্বং দেবস্য দেবস্য।" নিরুক্ত ৭। ৪

"স এষ মহানাত্মা সত্তা লক্ষণঃ তৎপরং।
তৎ ব্রহ্ম স ভূতাত্মা স ভূতপ্রকৃতিঃ।" নি ১১। ২। ৩

(১) "স এষ মহান্ আত্মা অগ্নীন্দ্রসূর্য্যাদ্যঙ্গপ্রত্যঙ্গভাবেন ব্যূহমনুভবন্ একোঽপি সন্ বহুধা স্তূয়তে।" ইতি টীকায়াম্ দুর্গাচার্য্যঃ।

(২) "প্রক্রিয়ন্তে অস্যাং সর্ব্বে বিকারা ইতি প্রকৃতিঃ স সত্তালক্ষণঃ মহানাত্মা হিরণ্য-গর্ভ ইতি, তস্যা ভূমা বহুত্বং অনেকধা বিপরিণামঃ স্থাবরজঙ্গমভাবেন।" ইতি দুর্গাচার্য্যঃ।

(৩) "যস্মাৎ সর্ব্বত্রৈব সত্তা (প্রকৃতিঃ) তস্মাৎ।"

আমরা প্রথমেই শতপথ ব্রাহ্মণান্তর্গত দেবতাস্বরূপ বিষয়ে শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ হইতে দেবতার সংখ্যা তিন সহস্র তিনশত ছয় এইরূপ অর্থপ্রকাশক "ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতা ত্রয়শ্চ ত্রীচ সহস্রেতি" এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার পরই "কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্য ইতি ত্রয়স্ত্রিংশদিতি" যাজ্ঞবল্ক্য দেবতার সংখ্যা কত ? এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ। এইরূপ তেত্রিশের পর ছয় তাহার পর তিন তাহার পর দুই তাহার পর প্রকৃত দেবতা এক এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন। দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্নে বলিলেন, পূর্ব্বে যে তিন সহস্র তিন শত ছয়জন দেবতার কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশাদিত্য ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই ত্রেত্রিশ জন দেবতা হবির্ভোক্তা। ইঁহারাই ঐশ্বর্য্যবশতঃ ইচ্ছানুসারে তিন সহস্র তিন শত ছয় জন দেবতার আকার গ্রহণ করেন।* "কতম একঃ দেব ইতি" তুমি যে একজন প্রকৃত দেবতার কথা বলিয়াছ তিনি কে, ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ইত্যাচ্যতে" তিনি প্রাণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলে। এই শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ হইতেও আমরা অবগত হই যে, প্রাণ শব্দবাচ্য পরমাত্মাই একমাত্র মুখ্য দেবতা। তিনিই প্রধানতঃ তেত্রিশ জন দেবতার আকার ধারণ করিয়া হবির্ভোক্তারূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। তাঁহারাই আবার বহু আকারে পূজিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত নিরুক্ত হইতেও আমরা মহান্ আত্মাই মুখ্য দেবতা একথা জানিয়াছি।

নিরুক্তবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন দেবতা প্রধানতঃ তিন। অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র এবং আদিত্য ইঁহারা যথাক্রমে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মহৎ ঐশ্বর্য্য হেতু প্রত্যেকেই বহুনাম ধারণ করিয়া থাকেন।† আবার "হংসঃ শুচিষৎ বসুরন্তরিক্ষসৎ হোতা বেদিষৎ" এই ঋঙ্মন্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে আদিত্যমণ্ডলান্তর্গত পরমপুরুষই

* "কতম তে ত্রয়শ্চ ত্রীচশতা ত্রয়শ্চত্রী চ সহস্রেতি স হোবাচ মহিমান, এবামেতে ত্রয়শ্চ ত্রিংশত্ত্বেব দেবাঃ।কতম তে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয় স্ত্রিংশদিতি।"

† "তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানোবায়ুর্ব্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানস্তাসাং মাহাভাগ্যাদেকৈকস্যাপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি।" নিরুক্তম্ ২।১

আদিত্য, বায়ু ও অগ্নি দেবতা রূপে যথাক্রমে দ্যুলোকে অন্তরীক্ষলোকে ও পৃথিবীলোকে অবস্থান করিতেছেন। এক মহান আত্মাই যে বহু দেবতা-রূপে কীর্ত্তিত হন, একথা অপর একটী ঋঙ্মন্ত্র স্পষ্টভাবে প্রচার করিতেছে।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।

ঋ, স, ২। ৩। ২২। ৬

এই অগ্নিকে অর্থাৎ এক মহান্ আত্মাকে মেধাবী (অর্থাৎ তত্ত্ববিৎ) পণ্ডিতগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, দ্যুলোকস্থ সুপতন, সূর্য্য, অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা এইরূপ বহু নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রের নিরুক্তকার যাস্ক-কৃত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।* এইরূপ মন্ত্র অবলম্বন করিয়াই মনুসংহিতা-কার—

"আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতম্।"
"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতম॥" মনু ১২।২—২৩

আত্মাই সর্ব্বদেবতাস্বরূপ এবং সমস্ত জগৎই আত্মায় অবস্থিত। এই পরমাত্মাকে কেহ অগ্নি বলিয়া কেহ মনাখ্য প্রজাপতি বলিয়া, কেহ বা তাঁহার অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য্য হেতু ইন্দ্র বলিয়া, কেহ প্রাণ (সূত্রাত্মা) বলিয়া, কেহ বা পরমাত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

"সুবর্ণং বিপ্রা কবয়ো বচোভিঃ
রেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি॥"

মেধাবী সর্ব্বজ্ঞ তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বহুভাবে কল্পনা করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রেও পূর্ব্বোক্ত অর্থ প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপ আরও অনেক শ্রুতিবাক্য আছে।†

* "ইম মেবাগ্নিং মহান্তমাত্মানমেকমাত্মানং বহুধা মেধাবিনো বদন্তীন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিং দিব্যঞ্চ গরুত্মন্তং দিব্যো দিবিজো গরণবান্ গুর্ব্বাত্মা মহত্মেতি বা॥" নি, ৭। ৫

† "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"
"এষইন্দ্র এষ প্রজাপতিঃ"
"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ"
"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি।"

শতপথ ব্রাহ্মণের ইষ্টিপ্রকরণেও ভিন্ন দেবতার কথা উল্লেখ করিয়া দেবতার একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"তদ্যদিদমাহুরমুং যজেতামুং যজেতেত্যেকং দেবং এতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উহ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ॥"

এই দেবতার অর্চ্চনা কর, এই দেবতার অর্চ্চনা কর এইরূপে যে বিভিন্ন দেবতার অর্চ্চনার কথা কথিত হইয়া থাকে, তাহা সেই এক পরম দেবতাকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেবগণ তাঁহারই বিশেষ আকার, তিনিই সর্ব্ব দেবতাস্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, যখন আর্য্যগণ কোন জড় পদার্থকে দেবতা বলিয়া উপাসনা করেন, তখন তাঁহারা তাহার জড় অংশকে শরীরের ন্যায় লক্ষ্য করিয়া তাহার অভিমানী (যেমন আমাদের জড় শরীরের অভিমানী জীব) বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বেদান্ত দর্শনে—"অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্" ২।১।৫ এই সূত্রদ্বারা এই বিষয় সমর্থিত হইয়াছে। উব্বট, সায়ণ মহীধর প্রভৃতি বেদভাষ্যকারগণ এইরূপ ভাবে বৃক্ষশাখা পাষাণাদির দেবতাত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত হইল।* এইরূপ ইন্দ্রিয়াদিরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আর্য্যগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

পরাশর সংহিতা ভাষ্যে মাধবাচার্য্য "দেবতাস্বরূপঞ্চ বাজসনেয়িব্রাহ্মণে শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে বিচার্য্য নির্ণীতম্" এই বলিয়া "কতি দেবতা যাজ্ঞবল্ক্য" এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া "প্রাণশব্দবাচ্যঃ পরমাত্মৈব মুখ্যঃ দেবতা" এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য তাঁহার ঋগ্বেদ ভাষ্যোপক্রমণিকায়—

* অধিষ্ঠাত্র্যো দেবতা বিদ্যন্তে প্রতিমাভূতাস্তুশাখাদয়ঃ তাংকলং সাধয়ন্তীত্যদোষঃ ইতি শুক্লযজুর্ব্বেদভাষ্যে উব্বটঃ।

শাখাদীনামচেতনত্বেঽপি তদভিমানিনীনাং দেবতানাং সত্ত্বাৎ দেবতাত্বম অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যামিতি ব্যাসসূত্রোক্তেঃ, মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্ ইতি শ্রুতেশ্চ। তস্মাচ্ছাখোষাপয়ঃ স্রুক্ স্রুবাদীনামপি দেবতাত্বম্। ইতি শুক্লযজুর্ব্বেদভাষ্যে মহীধরঃ।

ওষধ্যাদিমন্ত্রেষপি চেতনা এব তত্তদভিমানিদেবতাস্তেনতেন নাম্নাসম্বোধ্যন্তে। তচ্চ দেবতাভগবতা বাদরায়ণেনাভিমানিব্যপদেশস্ত্বিতিসূত্রে সূত্রিতাঃ। ইতি ঋগ্বেদভাষ্যেসায়ণঃ।

"তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে"

এই ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া "সর্ব্বহুতঃ" শব্দের ব্যাখ্যা স্থলে "সর্ব্বৈঃ হূয়মানাৎ, যদ্যপি ইন্দ্রাদয়স্তত্র তত্র হূয়ন্তে তথাপি পরমেশ্বরস্যৈবেন্দ্রাদিরূপেণাবস্থানাদ-বিরোধঃ" যদিও ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বিভিন্ন যজ্ঞে ভিন্নভাবে পূজিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও পরমেশ্বরই ইন্দ্রাদি রূপে অবস্থিত হইয়া পূজিত হন বলিয়া তিনি সর্ব্বহুৎ, অতএব কোন বিরোধ হইল না এইরূপ সিদ্ধান্ত-করিয়াছেন।

আমরা দেখিলাম যে, বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, নিরুক্ত, মীমাংসা ও * বেদাচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে স্পষ্টভাবে প্রচার করিতেছেন যে, বেদোক্ত মুখ্য দেবতা এক, তিনি মহান্ বিভু আত্মা, ব্রহ্ম পরমেশ্বর, তিনিই বিভিন্ন দেবতাস্বরূপ হইয়া ঘটে, পটে, কাষ্ঠে, পাষাণে, জলে, স্থলে, পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও দ্যুলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন।

প্রাচীন আর্য্যগণ এই রূপ ভাবেই দেবতাত্ত্ব বুঝিতেন। মন্ত্রপ্রকাশক ঋষিগণ মহান্ আত্মাকে সর্ব্বত্র নিরীক্ষণ করিতেন। একই তিনি বিভিন্ন উপাধি সম্বন্ধে বিভিন্ন দেবতা স্বরূপ হইয়া থাকেন, এই তত্ত্ব অনুভব করিয়া কখন একভাবে কখন বহু ভাবে তাঁহার স্তব করিয়াছেন, তাঁহারা জগতের সর্ব্বত্র সেই অনন্তশক্তি ও অচিন্তনীয় পুরুষের বিকাশ অনুভব করিতেন ও যেখানে যে ভাবে তাঁহার মহৎ ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিতেন, সেখানে সেই ভাবে তাঁহার স্তব করিতেন, ও তাঁহার প্রসাদে নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

শ্রীসাতকড়ি অধিকারী।

* সমস্ত উত্তরমীমাংসাই ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন, সুতরাং পৃথক তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

যশোবন্ত সিংহ।

(৪)

মোগল সাম্রাজ্যের দণ্ডগ্রহণ করিয়া আরঙ্গজেব শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বে ঘোরতর অশান্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, হিন্দুদিগের প্রতি কঠোরতা প্রকাশই তাহার প্রধান কারণ। সেই জন্য মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুতের অসি ঝঙ্কনায় মোগলসাম্রাজ্য বিচলিত হইয়া উঠে। সাজাহানের সময় হইতে দাক্ষিনাত্যে নানারূপ গোলযোগ চলিতেছিল। আরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়েও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। বিশেষতঃ সেই সময়ে মহারাষ্ট্রে শিবাজির অভ্যুদয় হওয়ায়, মোগল সেনাপতিগণ সন্ত্রাসিত হইয়া উঠেন। যখন আরঙ্গজেব হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হন। দেবমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার দাম্ভিকতার পরিচয় দেন, সেই সময়ে হিন্দুধর্ম্মরক্ষা ও হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য ধর্ম্মপ্রাণ শিবাজী মহারাষ্ট্রীয় জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আরঙ্গজেবের মাতুল সায়েস্তা খাঁ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া তথাকার অন্যান্য গোলযোগের নিবৃত্তি করিতে না করিতে শিবাজীর সহিত তাঁহার ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। শিবাজী প্রকাশ্যে ও গোপনে মোগল সৈন্যদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। সায়েস্তা খাঁ কিছুতেই তাঁহাকে দমন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ সে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণের নব জীবনের সংস্কার হওয়ায় তাহারা অদম্য হইয়াছিল। আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে আবার নূতন গোলযোগের আরম্ভ দেখিয়া মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে সায়েস্তা খাঁর সাহায্যের জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করিলেন।

যশোবন্ত সিংহ এই সময়ে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। দারার পক্ষ পরিত্যাগের জন্য আরঙ্গজেব তাঁহাকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। তিনি বাদসাহের আদেশ পাইবামাত্র বিংশ সহস্র অশ্বারোহীর সহিত দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন। সায়েস্তা খাঁ

যশোবন্তের আগমনে প্রথমে অনেক পরিমাণে সাহসী হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহার বিপরীত ভাব ধারণ করিতেই বাধ্য হন। যশোবন্ত সায়েস্তা খাঁর সাহায্যের জন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত সায়েস্তা খাঁর যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ের ঐক্য হইলনা। সায়েস্তা খাঁ যেরূপভাবে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছিলেন যশোবন্তের তাহা অভিমত হয় নাই, বিশেষতঃ তিনি নিজে কাহারও আদেশে চালিত হইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি সায়েস্তা খাঁকে স্পষ্টরূপেই বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার উপদেশ ও সৈন্ত উভয়ের দ্বারাই সাহায্য করিতে আসিয়াছেন। সায়েস্তা খাঁ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, স্বীয় অভিমতেরই পোষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তিনি প্রধান সেনাপতি হওয়ায়, যশোবন্তকে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনের জন্ত বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যশোবন্ত কিন্তু তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া নিজেই দাক্ষিণাত্য বিজয় করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। এইরূপে উভয়ের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটায়, দাক্ষিণাত্যের গোলযোগ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যদিও তাঁহারা সে গোলযোগ নিবারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, তাহা হইলেও উভয়ে একমত না হওয়ায় তাহা সুচারুরূপে ঘটিয়া উঠে নাই। সায়েস্তা খাঁ বাদশাহের মাতুল কাজেই রাজ পরিবার ভুক্ত, যশোবন্তও রাজপুতগণের মধ্যে প্রাধান্যে ন্যূন ছিলেন না। সুতরাং তাঁহারা যে স্ব স্ব অভিপ্রায় রক্ষায় জন্য যত্নবান হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু ইহার পরিণাম যে ভাল হয় নাই, আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

যশোবন্তের সহিত সায়েস্তা খাঁর মনোমালিন্য ঘটায় চতুর শিবাজী যশোবন্তকে হস্তগত করায় চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দুদিগের প্রতি আরঙ্গজেবের অত্যাচারে শিবাজী যে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাহা যশোবন্তের অবিদিত ছিল না, এবং শিবাজী কর্ত্তৃক হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে মোগল সাম্রাজ্যের যে ধ্বংস হইবে তাহাও তিনি অনুমান করিতেছিলেন। সাজাহানের রাজ্যচ্যুতি অবধি যশোবন্ত মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। নিজেই স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন আরঙ্গজেব নবীন উদ্যমে মোগল সাম্রাজ্য রক্ষায় সচেষ্ট হওয়ায়, সে উদ্যম ব্যর্থ

করা দুঃসাধ্য মনে করিয়া, যশোবন্ত আরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এক্ষণে দাক্ষিণাত্যে যদি শিবাজী হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, কালে উত্তর ভারতবর্ষে রাজপুতগণও স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল। শিবাজীর সাহায্য লাভ করিলে তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাসও করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত মিলিত হইলে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস যে অনিবার্য্য তাহাও তিনি মনে করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক সে সময়ে যদি মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুতগণ মিলিত হইয়া মোগলগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের অবস্থা যে পরিবর্ত্তন হইত, তাহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কারণ, মহারাষ্ট্রীয়েরা ও রাজপুতেরা যেরূপ স্বতন্ত্র ভাবে আপনাদের অসিচালনার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যদি মিলিত হইতে পারিত, তাহা হইলে মোগলের ময়ূরাসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিত কি না সন্দেহ। শিবাজী বা যশোবন্তের সে আশার পূরণ হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত মিলিত হয় নাই, বিশেষতঃ অম্বররাজ জয়সিংহ মোগলের বিরুদ্ধাচরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। অথচ আরঙ্গজেবের অত্যাচারে তিনি মধ্যে মধ্যে যে অনুতাপ করিতেন তাহারাও প্রমাণ পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, হিন্দু সাম্রাজ্যের পক্ষপাতী হওয়ার জন্য অথবা সায়েস্তা খাঁর সহিত মনোমালিন্যের নিমিত্ত অথবা আরঙ্গজেবের ব্যবহারের প্রতিশোধের জন্যই হউক যশোবন্ত শিবাজীর সহিত গোপনে সন্ধি করিয়া নীরবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

যশোবন্ত নীরব থাকিবেন জানিয়া শিবাজী সায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ করিতে অভিপ্রায় করিলেন। সেই সময়ে সায়েস্তা খাঁ পুনা অধিকার করিয়া শিবাজীর ভবনেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। যশোবন্তও পুনাতে উপস্থিত থাকেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা রাত্রিযোগে বরযাত্রীর বেশে পুনায় প্রবেশ করিয়া কিরূপে সায়েস্তা খাঁকে আহত ও তাঁহার পুত্রকে নিহত করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এই দুর্ঘটনার পর যশোবন্ত সায়েস্তা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি কিছু করিতে না পারায় ত্রুটি স্বীকার করেন। কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, যশোবন্ত সিংহ কতকগুলি বাদ্যকারকে পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়া সায়েস্তা

খাঁর শিবিরের নিকট সমস্ত রাত্রি বাদ্য করিতে বলেন, এবং গোপনে শিবাজীর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া একদল মহারাষ্ট্রীয়কে যোগল শিবিরে প্রবেশ করাইয়া সায়েস্তা খাঁর হত্যার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই মহারাষ্ট্রীয় দল সায়েস্তা খাঁকে আহত করে। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা বরযাত্রীর অনুমতি লইয়া যে পুনা নগরে প্রবেশ করিয়া সায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাই যথার্থ বলিয়া অনুমিত হয়। যশোবন্তের সহিত এ ঘটনার কোনরূপ সম্পর্ক ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিকেরাও ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই।* তবে যশোবন্ত যে শিবাজীর বিরুদ্ধাচরণে ক্ষান্ত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সায়েস্তা খাঁ আহত হওয়ার পর যশোবন্তের প্রতিই প্রধান সেনাপতির ভার প্রদত্ত হয়।

এই সময়ে আরঙ্গজেব অসুস্থ হইয়া পড়ায় দিল্লীর সিংহাসন লইয়া অনেকে নানারূপ অভিপ্রায় করিতেছিলেন। আরঙ্গজেবের পুত্রেরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কেহ কেহ সাহাজানকে মুক্ত করিয়া আবার ময়ূরাসনে উপবেশন করাইতে ইচ্ছা করেন, এবং যশোবন্ত ও মহাবত খাঁর সাহায্যের আশা করিতে থাকেন। কিন্তু আরঙ্গজেব সুস্থ হইয়া উঠিলে, সে সমস্ত কল্পনা দূরীকৃত হয়। বাদশাহ দাক্ষিণাত্যের নানারূপ গোলযোগ দেখিয়া সাজাদা মোয়াজিমকে তথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। উত্তরোত্তর শিবাজীর প্রাধান্য বর্দ্ধিত হওয়ায় অবশেষে রাজা জয়সিংহ, দীলার খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। জয়সিংহ শিবাজীকে লইয়া দিল্লী উপস্থিত হইয়াছিলেন, আরঙ্গজেব

* ডাফ এইরূপ বলিতেছেন যে, যশোবন্তই মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ঐরূপ বাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু খাফিখাঁর উক্তি হইতে তাহা বুঝা যায় না।

"In the morning Raja Jaswant, who w s Commander of Amirulumara's supports, came in to see the Amir, and make his apology ; but that high-born noble spoke not a word beyond saying,—"I thought the Maharaja was in His Majesty's service when such an evil befell me."

Elliot Vol VII P. 271)

শিবাজি।

শিবাজীকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলে জয়সিংহ তাঁহার পলায়নের সাহায্য করেন। শিবাজী দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে উপস্থিত হন ও আরংজেবের বিরুদ্ধাচরণের অনুষ্ঠান করেন। সায়েস্তা খাঁ দাক্ষিণাত্য হইতে আহূত হইয়া বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত হন। যশোবন্ত মোয়াজিমের অধীন কিছুকাল দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; এই সময়ে মোয়াজিম তাঁহার সাহায্যে স্বাধীনতার অভিলাষ করায়, আরঙ্গজেব তাহা বুঝিতে পারিয়া দীলার খাঁর প্রতিই দাক্ষিণাত্যের ভার প্রদান করেন। মোয়াজিম ও যশোবন্তের মিলনে দীলারের জীবন নাশেরও সম্ভাবনা ছিল। আরঙ্গজেব তাহা অবগত হইয়া যশোবন্তকে গুজরাটে যাইতে অনুমতি দেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে মহবত খাঁকে গুজরাটের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। যশোবন্ত ক্ষুণ্ণমনে মাড়বার অভিমুখে যাত্রা করেন।

আরঙ্গজেব বরাবরই যশোবন্তকে প্রতারিত করিতেছিলেন, তিনি যশোবন্তের কল্যাণের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। যশোবন্তের ক্ষমতাকে তিনি মনে মনে ভয় করিতেন। সেই জন্য তাঁহাকে কোনরূপে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যশোবন্তও আরঙ্গজেবের ব্যাপারে প্রীত ছিলেন না। সেই জন্য তিনিও অনেক সময়ে প্রতিশোধের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কৌশলে তিনি আরঙ্গজেবের অপেক্ষা পটু না থাকায় অবশেষে আরঙ্গজেবই কৃতকার্য্য হন। যশোবন্ত মাড়বারে অবস্থিতি করিলে, পাছে রাজপুতনায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় আরঙ্গজেব আবার তাঁহাকে কপট মিত্রতায় বশীভূত করিয়া আটকনদী পারে প্রেরণ করেন, এবং তথায় যশোবন্তের প্রাণবায়ুর অবসান হয়। * কাবুলের আফগানগণ বিদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের দমনের প্রয়োজন ঘটিয়া উঠে। আরঙ্গজেব সেই অশান্ত আফগানদিগের সহিত অশান্ত রাজপুতদিগের সংঘর্ষ

* In the words of the bardie chronicler, "The Aswapati Arung" finding treachury in vain, but the collar of simulated friendship round his neck, and sent him beyond the Attok to die. (Tod)

ঘটাইয়া উভয়েরই ধ্বংশের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি যশোবন্ত সিংহকে নানা প্রলোভনে বশীভূত করিয়া আফগান বিদ্রোহ দমনে তাঁহাকেই প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন, এবং কাবুলে পাঠাইয়া দেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র পৃথ্বী সিংহের প্রতি মাড়বারের ভার প্রদান করিয়া যশোবন্ত কাবুলে গমন করেন। প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আরঙ্গজেব পৃথ্বী সিংহকে দরবারে আহ্বান করিয়া পাঠান। পৃথ্বী সিংহের সহিত কথোপকথনে তাঁহার তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া আরঙ্গজেব তাঁহাকে পুরস্কার প্রদানকালে এক বিষমিশ্রিত পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসানের ব্যবস্থা করেন। * পৃথ্বীসিংহের শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া যশোবন্ত অত্যন্ত

* It is related, in the chronicles of Morad that Aurangzebe having commanded the attendance at court of Jeswunt's heir, he obeyed, and was received not only with the distinctions which were his due, but with the most specious courtesy : that one day with unusual familiarity, the king desired him to advance, and grasping firmly his folded hands (the usual attitude of deference) in one of his own, said, "Well, Rahtore, it is told me you posses as nervous an arm as your father : what can you do now?" "God preserve your Majesty", replied the Rajpoot prince, "when the Sovereign of mankind lays the hand of protection on the meanest of his subjects, all his hopes realised ; but when he condescends to take both of mine, I feel as if I could conquer the world." His vehement and animated gesture gave full force to his words, and Arungzebe quickly exclaimed, "Ah ! here is another khootun", (the term he always applied to Jeswunt) yet affecting to be pleased with the frank boldness of his speech, he ordered him a splendid dress which as customary, he put on, and having made his obeisance, left the presence in the certain assurance of exaltation. That day was his last ! He was taken ill soon after reaching his quarters and expired in great torture,

শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি আরঙ্গজেবের প্রতিহিংসা পরিতৃপ্তির পরিচয় পাইয়া মর্ম্মাহত হন। ক্রমে কাবুলের অস্বাস্থ্যে তাঁহার অপর পুত্রদ্বয় জগৎসিংহ ও দুর্দ্দমন প্রাণত্যাগ করায়, যশোবন্তের দেহও মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। অবশেষে তিনিও তথায় জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। আরঙ্গজেবও দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। কারণ ভট্টগণ বলিয়া থাকেন যে যশোবন্ত জীবিত থাকিতে আরঙ্গজেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগে বিরত হইতে পারেন নাই। * যশোবন্তের গর্ভবতী কোন মহিষী সহমরণে যাইতে অভিলাষ করিলে, তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা হয়। অপর অপর মহিষী স্বামীর সহিত চিতারোহণ করেন। তৃতীয়া মহিষী মাড়বারে পতিদেবের উষ্ণীষ লইয়া চিতা মধ্যে প্রবিষ্ট হন। যশোবন্তের গর্ভবতী মহিষীই অজিতকে প্রসব করেন। এই অজিত ও সর্দ্দার দুর্গাদাস রাণা রাজসিংহের সহিত মিলিত হইয়া যেরূপে আরঙ্গজেবকে সন্ত্রাসিত করিয়াছিলেন, তাহা ভারতেতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরেই লিখিত আছে।

and to this hour his death is attributed to the poisoned robe of honour presented by the king. (Tod)

* Of the Rahtore, we may use the words of the biographer of his contemporary. Rana Raj Sing of Mewar: 'Sighs never ceased flowing from Arung's heart while Jeswunt lived." (Tod)

যশোদার প্রতি নন্দ।

যশোমতী, কাঁদিও না ত্যজ ত্যজ ধূলি শয্যা

কেন দীর্ঘ শ্বাস ?

আনো চিত্তে বল আনো কেন ভালে কর হানো ?

করগো উল্লাস।

সাঙ্গ এ ভবের মেলা সাঙ্গ হ'লো ধূলি খেলা

চল দূর বনে,

আবার তপস্যা কর চিরতরে পেতে হবে

সেই মহাধনে।

রাণী, রাণী, ভেবে দেখ একি গো সহজ কথা,

ভেঙ্গে ফেল ভুল,

এক পল দরশন এক কণা কৃপা লভি'

দেবতা আকুল ;

যা'র লাগি ঋষিগণ মহাতপে নিমগন

শত বর্ষ ধরি'

তা'রে স্তন্য পিয়ায়েছ তা'রে তুমি বক্ষ'পরে

ধরেছ আঁকড়ি!

মোরা ধন্য—এত দয়া ? —ভেবে দেখ মাধবের

করুণা অপার।

বনে চলো, তপ করো লভ তা'র চির দয়া,

কাঁদিও না আর।

রাণী গো, উল্লাস করো ছেড়ে চলো সংসারের

সব কলরোল ;

ধন্য ধন্য বৃন্দাবন, —আনন্দেতে বলো রাণী

বলো হরি বোল !

শ্রীকালিদাস রায়

কালীনাথের কন্যাদায়।

(১)

বিমলার স্বামী কালীনাথ কিছু অতিরিক্ত স্ত্রীপরায়ণ—অন্ততঃ তাহার পাড়ার বন্ধুবান্ধবদের মুখে এ কথা রাষ্ট্র ; কিন্তু কালীনাথ তাহাতে কর্ণপাত করিত না। সে আপন মনে সংসারের কাজ কর্ম্ম করিত। কালীনাথ পিতৃ-হীন। তাহার অবস্থাও মোটা মুটি ছিল ভাল। যে কিছু জমী জমা ছিল তাহার আয়ের দ্বারা তাহার ক্ষুদ্র পরিবারের ভরণ পোষণ ভাল রূপই চলিত। তাহাতে আবার কালীনাথ বাগান বাগিচা করিয়া ফল মূল, শাক শবজী জন্মাইত; খালে বিলে খ্যাপ্‌লা দিয়া মাছ ধরিত। গোহালে 'সুখী' গাই ছিল—দৈনিক দুই তিন সের করিয়া দুধ দিত। এইরূপে দুধে ভাতে কালীনাথের দিন বেশ কাটিত।

কালীনাথের পরিবারের মধ্যে মা, স্ত্রী, একটী বৃদ্ধা ঝি ও মিনী। মিনী কালীনাথের কন্যা—আসল নাম মৃণালিনী।

পাড়ার দশজনের সঙ্গে কালীনাথ আগে বেশ মিশিত, তাস পাশা খেলিত, গান বাজনা করিত, কিন্তু ইদানীং আর মিশে না। তাহার কারণ—যুবকের দলের প্রায় সকলেই তাহাকে স্ত্রৈণ বলিয়া মর্ম্মভেদী শ্লেষ করিত। তাহাদের কথার ভঙ্গীতে কালীনাথের বড় রাগ হইত বটে ; কিন্তু কি কারণে যে সে স্ত্রৈণ তাহা বুঝিতে পারিত না। স্ত্রীকেও অনেকেই ভালবাসে এবং সাধ্বী স্ত্রীত ভালবাসারই পাত্রী। সেও বিমলাকে ভালবাসে,—বিমলা সুশীলা, সুন্দরী এবং তাহার বাল্যসহচরী। একের তের এবং অন্যের আট বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছে। বিমলা শাশুড়ীর এক মৃতা কন্যার স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া সেই বালিকা বয়স হইতেই তাঁহার কাছে থাকিত—এক মা পাইয়া আর এক মাকে ভুলিয়াছিল। কালীনাথ যেখানে যে ভাল জিনিসটা পাইত, বিমলাকে আনিয়া দিত ; কেহ কিছু খাইতে দিলে বিমলাকে আনিয়া খাওয়াইত।

কালীনাথ বিমলাকে লেখা পড়া শিখাইত, তাহার খেলার ঘরের আস-বাব পত্রের যোগাড় করিত, তাহাকে পাখীর ছানা পাড়িয়া দিত ; এক

কথার একটী পরিপাটি স্নেহবন্ধনে এই বাল-দম্পতী আবদ্ধ হইয়াছিল। বিমলা স্বামীকে ভয় করিতে কিম্বা তাহার সাক্ষাতে সঙ্কুচিতা হইতে পারিত না। ক্রমে কিশোর কিশোরী যৌবনে পদার্পন করিল। কালধর্ম্মে অবশ্য তাহাদের বাল্যজীবনের কতকগুলি অভ্যাস লুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু আবার কতকগুলি নূতনও সৃষ্ট হইয়াছিল।

কালীনাথ বিমলাকেত ভালবাসিতই, পাড়ায় তাহার অনেক বউদিদি ছিলেন, সে তাঁহাদিগকেও ভক্তি শ্রদ্ধা করিত এবং সুযোগ মত তাঁহাদের ফরমাস যোগাইত। তাঁহাদের স্বামীরা কালীনাথকে ঠাট্টা তামাসা যা-ই করুক, তাঁহারা কিন্তু কোন দিনই কালীঠাকুরপোর বিরুদ্ধবাদিনী হন নাই; বরং স্বামীদের সঙ্গে মতান্তর হইলে তাঁহারা কালীনাথের দৃষ্টান্ত দেখাইতেন এবং সে যে এক জন আদর্শ স্বামী তাহাও প্রমাণ করিতে ছাড়িতেন না।

"বিনীর মার খুব কপালজোর—তাই স্বামীও পেয়েছে মনের মত। আর আমাদের যেমন কপাল, জুটেছেও তেমনি দিগ্‌গজ"—এই বলিয়া রন্ধন-নিরতা একটী এক বৎসরের কন্যা কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা পাড়ার বসন্ত মুখুয্যের স্ত্রী প্রতিবেশিনী জনৈকা রমণীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। মুখুয্যে মহাশয় রন্ধনশালার নিকটবর্ত্তী শয়ন-গৃহের বারান্দায় তক্তপোষের উপর অর্দ্ধশয়িত ভাবে থাকিয়া ধূম পান করিতেছিলেন ও স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল এই ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য ভোগের কল্পনা করিতেছিলেন। গৃহিণীর দুঃখ-কাহিনীর শেষ বঙ্কারটা তাঁহার কানে পৌঁছিল। "তুমি কি আমাকে সেই কেলেটার মতন 'গোলাম' বলিতে বল নাকি?" বলিয়া তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। মুখোপাধ্যায়-পত্নী জানিতেন, এই গর্জ্জনের বর্ষণ অতি অল্প; সুতরাং প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "ছেলেটা মেয়েটা রাখ্‌লে কিম্বা সংসারের কোন কাজ করলেই গোলাম হ'তে হয় না; এ-তো পরের কাজ নয়। কুঁড়ের বাদসা,—বসে বসে রাজা উজীর মারবেন—এক গাছা শাকও ঘরে আনতে পারবেন না, আর যাঁরা আনবেন তাঁরা হলেন গোলাম! ধন্যি বিচার।"

"আচ্ছা, তুমি থাম—আমি ওসব কিছু পারব না।"

"তবে খেতেও পাবে না বলছি।"

"ও বউদি ঝগড়া কেন ?" রান্না ঘরের জানালা দিয়া কালীনাথ কয়েকটা বেগুন ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ঘরে ঘরে ঝগড়া কেন ?"

"আর ভাই হাড় জ্বালাতন ! কোন কাজের নামটি নেই—কিছু বল্‌লেই ফোঁস ফোঁসাবেন। খুব কপাল ছোট বউয়ের ছুটীতে বেশ আছ ; আশীর্ব্বাদ করি সুখে থে'ক।"

কালীনাথ হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। বসন্ত কথাগুলি শুনিয়াছিল কিন্তু আর প্রতিবাদ করিতে তার ভরসা হইল না—কি জানি পাছে ভাত বন্ধ হয় ! এই প্রকার বীরপুরুষে বঙ্গের অনেক পল্লী আজ কাল পরিপূর্ণ।

বিমলা প্রায় দুই বৎসর বাপের বাড়ী যায় নাই : মিনী জন্মিবার পরে বিমলাকে লইতে তাহার পিতা লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কালীনাথের মা বলিয়া দিলেন যে, মেয়েটীর বয়স আঠার মাস উত্তীর্ণ না হইলে সে এ বাড়ীর বাহির হইতে পারিবে না ; সুতরাং লোক ফিরিয়া যায়। তার পর দুই তিন মাস পূর্ব্বেও আর একবার লোক আসিয়াছিল, তখনও দিন ভাল নয়—মিনীর অসুখ ইত্যাদি অছিলায় বিমলা পিতৃভবনে যাইতে পারে নাই। আসল কথা, গিন্নীও কালীনাথ বিমলা কিম্বা মিনীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। আজ তিন দিন হইল আবার লোক আসিয়াছে,—এবার ফেরান যায় না। বিমলা অগত্যা ১৫ দিনের ছুটী পাইয়া বাপের বাড়ী গেল। কালীনাথের দিন আর কাটে না। বিরহ-বেদনা কবিবাক্য, উহা সে বড় বুঝেনা ; কিন্তু তার বোধ হইতে লাগিল যেন তাহার অস্তিত্বের কোনখানে একটা 'ভাঙ্গন' লাগিয়াছে। দশ দিন পরে সে মাকে না বলিয়া শ্বশুরবাড়ী রওনা হইল ! বৃদ্ধা কি জানিল—বাবু সহরে বেড়াইতে গিয়াছেন।

কালীনাথের বাড়ী হইতে তাহার শ্বশুরবাড়ী প্রায় দশ ক্রোশ ব্যবধান ; তাহাতে আবার বর্ষাকাল। কালীনাথ বাজারের ঘাটে যাইয়া নৌকার খোঁজ করিল কিন্তু সেদিনটা তত ভাল না থাকায় মাঝিরা অনেকেই সেই এক দিনের রাস্তা,—বিশেষতঃ উজানে বাহিয়া, যাইতে রাজী হইল না। কালীনাথ দেড় টাকা ভাড়ার স্থলে ৫৲ টাকা দিতে প্রস্তুত ছিল।

(২)

কালীনাথের শ্বশুর বাতের ব্যারামের জন্য আফিং খান, রাত্রিতে বিশেষতঃ প্রথম রাত্রিতে তাঁহার ঘুম হয় না। তিনি ভিতর বাড়ীর বড় ঘরের বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন আর ঝিমাইতেছেন। এক পশলা বৃষ্টিও চাপিয়া আসিয়াছে। রাত্রি তখন প্রহরাতীত। এমন সময় কালীনাথ দরজায় ঘা দিল। তাহার কাপড় জামা সম্পূর্ণ ভিজিয়া গিয়াছে, এক পাটী জুতা হাত হইতে কোথায় পড়িয়া গিয়াছে সন্ধান পায় নাই। রাস্তা পিছল—প্রকৃতি মসীময়ী।

"কে-ও" কালীনাথের শ্বশুরের তন্দ্রা টুটিল। কালীনাথ ক্লান্তি-জনিত ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "আমি কালীনাথ"। বিমলার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল! সে সজাগ—মায়ের কাছে বড় ঘরে শুইয়াছিল।

বৃদ্ধ জামাতার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলেন না, পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি—বাড়ী কোথায়?"

"কালীনাথ বুঝি" বলিয়া গৃহিণী আলো লইয়া বারান্দায় আসিলেন—"ও-মা এযে রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে!" কালীনাথের ডান পায়ের গোড়ালীর এক স্থানে কাটিয়া গিয়া রক্তপাত হইতেছিল।

কালীনাথের এক ভায়রাভাইও শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছিলেন। ইনি কাজ করেন রেলে—মাহিনাও কিছু মোটা—থাকেন পশ্চিমে, পাড়াগাঁয়ে ইনি সুতরাং দশজনের একজন। এ হেন আত্মীয়ের সঙ্গে কালীনাথের এতাতে পরিচয় হইল। পূর্ব্বে এই বাবুটির সঙ্গে কালীনাথের আলাপ ছিল না—নাম ও সম্বন্ধ জানা ছিল মাত্র। রেলের বাবুটি প্রথম সম্ভাষণেই বলিলেন, "কিহে ভায়া, একেবারে বিষমঙ্গল ব'নে গিয়াছ যে।" ইনি সম্বন্ধে ও বয়সে কালীনাথের বড়। বলা বাহুল্য, এই মহাপুরুষের মহা প্রকৃতিটিও কণ্ঠলগ্ন অক্ষমালার মত সঙ্গে সঙ্গে বিরাজ করেন। কালীনাথ কোন জবাব করিল না। সে জানিত তাহার পাড়ায় দাদাদের মত অনেক 'দাদা' আছেন। কিন্তু কালীনাথের বৃদ্ধ শ্বশুর বিষয়টা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, "তোমার একটা চাকুরী বাকুরী করা উচিৎ। যে রকম দিন কাল পড়েছে তাতে ব'সে ব'সে পৈত্রিক সম্পত্তি খুয়ে খেলে ক'দিন চ'লবে? পিতা যেমন

কিছু বিষয় রেখে গিয়াছেন, তেমন তার সঙ্গে সঙ্গে দশবিশ কৰ্ম্মও জুড়ে রেখেছেন। তার পর উপস্থিত একটী মেয়ে, তার বিয়ে দিতে হবে ; কন্যাদায় বড় দায়। পরে আরও হ'তে পারে সেজন্য প্রস্তুত থাকৃতে হবে, নইলে চল্‌বে কেন ?"

কালীনাথ নিরুত্তর। রেল-বাবুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এণ্ট্রান্স পাশ করেছ নাকি ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আশ্চর্য্য কথা—এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে ঘরে বসে আছ !"

"আমাকে কেন জানাওনি—কত ভাল ভাল চাকুরী আমার হাতে ছিল।"

আরও অনেক কথা হইল। পরিশেষে শ্যালিপতি-ভ্রাতার সুপারিসিতে চাকুরী হইবে—কালীনাথ এমন আশ্বাস পাইল। রেলকৰ্ম্মচারীটি থাকেন গয়া ষ্টেশনে।

ইহার পর পনর দিন পরে কালীনাথ গয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তেইশ বৎসর বয়সে এই তাহার প্রথম বিদেশ গমন এবং কন্যাকলত্রের সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের নিদারুণ অবসর।

(৩)

যাত্রার পূর্ব্বদিন প্রবল উৎকণ্ঠায় কালীনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মিনীকে আর চক্ষের আড়াল করিতে পারে না। মুকুল-জীবনে পত্নীপ্রেমে যে বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, পূর্ণ যৌবনে সন্তানবাৎসল্যে তাহা পরিপ্লাবিত হইয়া পড়িল। সে সহস্র চুম্বনে বালিকার গোলাপী গণ্ড পাণ্ডুর করিয়া তুলিল।

মিনী এখন বেশ দুই চারিটা কথা বলিতে শিখিয়াছে। সে বাবার সঙ্গে যাইবে বলিয়া মধ্যে মধ্যে আব্দার করিতেছে। বাবা বুঝাইতেছেন, তাহার জন্য ৺পূজার সময় ভাল কাপড়, খেলনা ও খাবার আনিবেন। কালীনাথের চক্ষে জল।

বিমলার প্রাণে কয়েক দিন হইল একটা কালো মেঘ দেখা দিয়াছে। তাহার যেন কিছু হারাইতে বসিয়াছে,—সে যেন কোন অজানা দেশে যাইবার সাড়া পাইয়াছে। কালীনাথের পশ্চাতে যে অন্ধকার আসিবে, সে যেন

তাহাতে চিরকালের জন্য নিমজ্জিত৷ হইয়া যাইবে—কালীনাথের ব্যর্থ চেষ্টা আর তাকে খুঁজিয়া পাইবে না।

দুপুর বেলা আহারের পর বিদেশগমনোপযোগী কিছু জিনিস কিনিবার জন্য কালীনাথ বাজারে গিয়াছে। বিমলা মিনীকে ঘুম পাড়াইতে গিয়া তাহার পার্শে নিজেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কালীনাথ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার ঘরে একটী ফুল্ল কমলের পার্শে কে একটী কমলকোরক রাখিয়া দিয়াছে! মরি মরি কি সুন্দর, পূর্ণিমার ক্রোড়ে শুকতারা, সুষুপ্তির সঙ্গে সুখস্বপ্ন, বাসনার বুকে তৃপ্তি!—আলোর সঙ্গে উজ্জ্বলতা—ঐশ্বর্য্যের কোণে শান্তি—প্রীতির বুকে পবিত্রতা!!!

অন্তর্নিহিত প্রবল উচ্ছ্বাসে কালীনাথের দেহ কাঁপিতে লাগিল। অকিঞ্চিৎকর অর্থের জন্য এই অমূল্য রত্ন পরিত্যাগ! কালীনাথ কাঁদিতে লাগিল। না, না, সম্মুখে কঠোর কর্ত্তব্য—মৃনালিনীর বিবাহ; অবস্থা সচ্ছল নহে--মিনী অপাত্রে পড়িবে। কন্যা-স্নেহবৎসল পিতার প্রাণে তাহা সহিবে না। কিন্তু এক দিকে কন্যার দূর জীবনের অজ্ঞাত পরিণাম, অন্য দিকে আসন্ন বিচ্ছেদের মর্ম্মভেদী তীব্রতা।

কালীনাথের মাথা ঘুরিতে লাগিল।

"না—আমি যাব"—মৃণালিনী স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিমলার ঘুম ভাঙ্গিল—দেখিল স্বামী কাঁদিতেছেন। কারণ বুঝিয়া সাধ্বী স্ত্রীর যাহা কর্ত্তব্য—প্রবাসপ্রস্থানোন্মুখ ভগ্নহৃদয় স্বামীকে প্রবোধ দিলেন; জীবনের উদ্দেশ্য স্মরণ করাইয়া সংসার-পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিলেন। এইরূপ স্ত্রী কন্যা ছাড়িয়া কত লোকে বিদেশে চাকুরী করে তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। কালীনাথ বুঝিয়াও বুঝিল না। তৃষিত নেত্রে চির-বাঞ্ছিত রত্ন দুটী দেখিতে লাগিল। মিনীর চক্ষে জল, মুখে হাসি,—শিশিরবিন্দুতে প্রভাতের আলো, বিজলিচমকে মেঘের জল। বিমলার চক্ষুদুটি জলপূর্ণ, মুখখানি বিশুষ্কদল গোলাপের মত বিবর্ণ। করুণা যেন চতুর্দ্দিক হইতে একটা তাড়া পাইয়া সেই গোলাপদলে আশ্রয় লইয়াছে।

কালীনাথের যেন ইচ্ছা হইল স্ত্রীকন্যা বুকে লইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, সে

ঘুম যেন আর ভাঙ্গেনা। সে অনন্ত শয্যা হইতে তুলিয়া কন্যাদায়ের জন্য যেন সমাজ তাহাকে জুলুম করে না।

পরদিন প্রত্যুষে কালীনাথ জননীকে প্রণাম করিয়া বৃদ্ধা ঝিকে সম্ভাষণ করিয়া গয়াধামে রওনা হইল। মৃণালিনী তখন নিদ্রিতা। তাহাকে দেখিলে আর কন্যাসর্ব্বস্ব পিতার বিদেশ গমনের বল থাকিবে না, সুতরাং তাহাকে জাগাইতে বারণ করিল। একমাত্র সন্তান এই প্রথম কাছছাড়া হয়,—কালীনাথের মা কাঁদিতে লাগিলেন। কালীনাথেরও চক্ষু ভিজিয়া আসিল। অন্তরালে বিমলা কাঁদিতে চাহিতেছিল কিন্তু কান্না আসিল না। বহ্নি-বিক্ষিপ্ত কুসুমমালার মত শুকাইয়া উঠিল।

(৪)

আজ শারদীয়া সপ্তমী পূজা। মা আসিয়াছেন। ভক্ত সন্তান তাঁহার আগমনে এক বৎসরের দুঃখদারিদ্র্যের কথা ভুলিয়াছে,রোগীর শীর্ণ মুখে হাসি ফুটিয়াছে, শোকাতুর শোক বিস্মৃত হইয়াছে, প্রবাসী গৃহে ফিরিয়াছে। আজ চারিদিকে আনন্দ, প্রকৃতিও আনন্দময়ী।

কালীনাথ দশ দিনের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিতেছে। আজ বাড়ী পৌঁছিবার কথা। কালীনাথের বাড়ীতেও জগদম্বার আবির্ভাব হইয়াছে। আত্মীয় কুটুম্বও আসিয়াছেন। বিমলার বুকটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এই আনন্দবাজারে সে যেন নিতান্ত নিঃসম্বল, একান্ত নিরুপায়। অনেক দিনের পর স্বামী বাড়ী আসিতেছেন কিন্তু তাঁহাকে সম্ভাষণ করার বল যেন তাহার হৃদয়ে আর নাই। কালীনাথ যেন তাহার নিকট হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্রা ক্ষীণা লতা যেন সে চিরাশ্রিত পাদপে আর জড়াইতে পারিবে না।

মিনী যেন একটা জীবন্ত ক্রীড়া-গোলক—অনবরত ঘুরিতেছে। একবার কোন আত্মীয়ার কোলে বসিতেছে, আবার ঠাকুরমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।

ঠাকুর মা বলিতেছেন, "আমার বাবা বাড়ী আস্‌বে"।

মিনি বলিতেছে, "আমাল্ বাবা আছ্‌বে"।

"বাবা কাপড় দেবে কাকে ?"

"আমাকে"।

"খেল্‌না"?

"আমাকে।"

বুড়া ঝি বলিল, "আমাকে। সেত আমার বাবা।" পাড়ার আরও দুই চারিজন প্রৌঢ়া বলিলেন, "না—কালীনাথ আমাদের বাবা"।

মিনির জন্মসংস্কার,—বাবার উপর তার একছত্র অধিকার; কিন্তু এক্ষণে এতগুলি অংশী দেখিয়া তাহার ঠোঁট ফুলিতেছিল—নীলোৎপল দুটী সিক্ত হইয়া আসিল। ছুটিয়া গিন্নী সোনার পুতুলটী বুকে চাপিয়া লইলেন।

কালীনাথ বহির্ব্বাটীতে আসিয়া পৌছিয়াছে। তাহার বাম প্রকোষ্ঠে মিনীর জন্য জামা ও কাপড়, হস্তে খেলানার বাক্স। গ্রামে পৌছিয়া কালীনাথ পরিচিত ছোট বড় যাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাহাকেই বাড়ীর কথা—বিশেষতঃ মিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। কর্ম্মস্থলে থাকিয়া সপ্তাহে দুই খানা করিয়া চিঠি পাইত, তথাপি কেমন যেন একটা নিরুদ্দিষ্ট আশঙ্কায় সে পিড়ীত হইতেছিল।

বরদার পদতলে প্রণত হইয়া কালীনাথ তাহার জীবনসর্ব্বস্বের মঙ্গলের জন্য মনে মনে বর প্রার্থনা করিল। মাথা তুলিয়া বিশ্বজননীর চিরমধুরহাসি মুখ দেখিতে লাগিল। অতঃপর চরণতলে সে যেন আপনাকে কতকটা নির্ভয় মনে করিল। কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত যুবক বুঝিতেছিলনা যে, নিয়তির নীতি কি কঠোর এবং এই দেবানন্দা জগদ্ধাত্রীই আবার ধ্বংসমুখে রণরঙ্গিনী মহাকালী!

কালীনাথ দেবী-মন্দির পরিত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীস্থ আত্মীয় স্বজন গণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিল। তাঁহারাও তাহার কাছে অনেক প্রশ্ন করিলেন। পাড়ার মুরুব্বি গোছের লোকেরা বলিলেন, "তোমার স্ত্রীকন্যাও ভাল আছে—"।

হঠাৎ অন্দর বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল এবং সকলে সেই দিকে ছুটিল। কালীনাথ জ্ঞান হারাইল—বিকারগ্রস্ত রোগীর মত স্খলিতপদে দৌড়িল। কিন্তু ও কি? খিড়কীর পুকুরধারে শেফালীতলায় বিমলা ও মিনী—মা ও মেয়ে পাশা পাশি ভাবে ভূশয্যায় শয়িতা!!

বিমলার কেশরাশি মুক্ত—সলিলসেকনিবন্ধন ঋজুতা-প্রাপ্ত, কিয়দংশ অংসে ও উরসে বিশৃঙ্খল ভাবে আপতিত। নেত্র নিমিলিত, ওষ্ঠে ও গণ্ডে নীলিমা ব্যাপ্ত, উদর স্ফীত, পরিহিত বস্ত্র অসংযত ও বারিকর্দ্দমপূক্ত,—জীবনদীপ নির্ব্বাপিত।

মিনী—ভগ্নবৃন্ত কুসুম-কোরক মৃত্যুর করাল ছায়ায় বিবর্ণীকৃত। তাহারও কুঞ্চিত কেশ সলিলসিক্ত ও ঋজু, উদর স্ফীত এবং উলঙ্গগাত্র স্থানে স্থানে কর্দ্দমকলঙ্কিত।

কালীনাথের জননী মূর্চ্ছিতা, বৃদ্ধা ঝি বিহ্বলা, কুটুম্বিনীগণ অশ্রুমুখী; কিন্তু কালীনাথ নিশ্চল। তাহার নেত্রসমীপে যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রচণ্ড বেগে ঘুরিতেছিল এবং সেই আলোড়নে পুঞ্জীকৃত অন্ধকার যেন দিগন্তে বিকীর্ণ হইতেছিল—মধ্যাহ্ন সূর্য্য নিবিয়া গিয়াছে।

উপস্থিত অন্যান্য লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, আহা এ সর্ব্বনাশ কি করিয়া, কখন হইল?

কালীনাথের এক আত্মীয় বলিলেন, "বউ সকাল থেকে মাথা ধরার কথা বল্‌ছিল; তার পর মেয়ে নিয়ে শোবার ঘরে যেতে দেখিলাম। মেয়েটীও যেন কি জন্য বড় আব্দার কর্‌ছিল। মনে করলেম, বুঝি শুতে গেল; আমরা আর খোঁজ করি নাই।"

প্রতিবেশিনী একজন বলিল, "বুঝি মেয়ে নিয়ে স্নান কর্‌তে এসেছিল; দৈবগতিকে মেয়েটি জলে পড়ে, আর তাকে তুল্‌তে গিয়ে মাও ডুবে গেছে। বউ সাঁতার জান্‌ত না।"

আর একজন বলিল, "চেঁচাতেও পার্লে না—বাড়ীতে ঢের লোক ছিল, কেউ না কেউ শুন্‌তে পেত।"

"চেঁচাবে কখন? জলে পড়্‌তেই ডুবে গেছে—পুকুরে যে অ-থৈ জল!"

"এপুকুরেত হর হামেসা লোক আসে, তাতে আবার বাড়ীতে দুর্গোৎসব—কারুর চোখেও পড়্‌লনা?"

"মরণ এদের এখানে টেনে এনেছিল—লোকে দেখ্‌বে যদি তবে আর এ সর্ব্বনাশ হবে কেন বল! আহা কি সোণার প্রতিমাই বিসর্জ্জন হল! কালীর আজ বিজয়া!!"

"কালীনাথের কপাল—বড় আশা করে মেয়ে বউ দেখতে বাড়ী পানে ছুটেছিল,—তা বেশ দেখ্‌ল।"

কথাগুলি কালীনাথের কাণে নিতান্ত অস্পষ্টভাবে পৌঁছিতেছিল—তার অর্থবোধ হইতেছিল না। তাহার যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

রুদ্ধকণ্ঠে একবার বলিল, "বিমলা, সেই বিদায় কি চির বিদায় হ'ল? মিনী—তুইও গেলি—তবে আর কেন"—আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মৃতা পত্নী-কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া কালীনাথ ভূতলশায়ী হইল, আর উঠিল না। সেফালীবিকীর্ণ আস্তরণে প্রাণপ্রতিমা দুটীকে বুকে চাপিয়া অনন্তের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল।

লোকে দেখিল, কালীনাথের মুখ দিয়া অনর্গল রক্ত বাহির হইতেছিল। প্রবল শোকে বুঝি হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়াছিল।

কালীনাথ কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী।

কবিকথা।

(কালিদাস)

মালবিকাগ্নিমিত্র।

(১)

চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের প্রতিষ্ঠিত মৌর্য্যবংশ অনন্ত কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদের রাজ্য শুঙ্গ বংশের অধিকারে। মৌর্য্য বংশের সেনাপতি পুষ্পমিত্র শেষ রাজা বৃহদ্রথকে এ জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত করিয়া স্বীয় পুত্র অগ্নিমিত্রের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন; নিজে কিন্তু সৈন্য পরিচালনাতেই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। বিদিশার তীরে কোকিলকূজনে মুখরিত উদ্যানাবলীর স্নাম শোভায় যথা

হইতে নগরীর শুভ্র কান্তি স্বর্গের অস্ফুট ছায়ার ন্যায় দেখাইতেছিল; রাজা অগ্নিমিত্র সেই খানেই রাজলক্ষ্মীর আসন স্থাপন করিলেন। ক্রমে তিনি ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতিরূপে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। বিদর্ভরাজের অবসানের পর তাঁহার পুত্র মাধবসেনকে বন্দীভূত করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র যজ্ঞসেন রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। মাধবসেন ভগিনী মালবিকাকে বিদিশাধিপতির হস্তে সমর্পণ করার ইচ্ছায় আসিতে আসিতে যজ্ঞসেনের সীমান্তরক্ষক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাহার পর অমাত্য সুমতি ও তাঁহার ভগিনী কৌশিকী মালবিকাকে লইয়া অগ্নিমিত্রের নিকট আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সুমতি নিহত হন। অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীরসেন কোনরূপে মালবিকাকে উদ্ধার করিয়া পরিচারিকাভাবে বিদিশামহিষী ধারিণীর নিকট পাঠাইয়া দেন। কৌশিকীও পরিব্রাজিকার বেশ ধারণ করিয়া বিদিশায় উপস্থিত হইলেন। মালবিকা কৌশিকী অপরিচিতভাবে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

যৌবনের বিকাশে মালবিকার সুকোমল শরীরে লাবণ্যের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। তাঁহার রূপজ্যোতি জ্যোৎস্না-লহরীর ন্যায় সকলের নয়নে অমৃত ঢালিয়া দিতেছিল। চিত্রপটে দেবী ধারিণী ও তাঁহার পরিচারিকাদের প্রতিকৃতির সহিত তাঁহার ছবিটি অঙ্কিত হইয়া পটখানিকে রমণীয় করিয়া তুলে। একদিন সেই চিত্রপট দেখিতে দেখিতে রাজা অগ্নিমিত্রের চক্ষু মালবিকার ছবির প্রতি আকৃষ্ট হইল। রাজা রাণীকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে রাণী কোন উত্তর দিলেন না। কারণ তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, রাজা মালবিকার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারেন। রাজা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় শিশুকুমারী বসুলক্ষ্মী বালিকাসুলভ বাক্যে উত্তর করিলেন, "উহার নাম মালবিকা।" রাজা তাঁহাকে রাণীর পরিচারিকা ও তাঁহার নাম মালবিকা ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, এবং রাণীও তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবগত ছিলেন না। কারণ রাণীর বর্ণনিকৃষ্ট ভ্রাতা সেনাপতি বীরসেন মালবিকাকে পরিচারিকারূপেই তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

গণদাস নামে নাট্যাচার্য্যের নিকট মালবিকা কলাবিদ্যার শিক্ষা আরম্ভ

করেন। রাণী ধারিণী বকুলাবলিকা নামক পরিচারিকাকে মালবিকার শিক্ষার বিষয় জানিবার জন্য গণদাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গণদাস সে সময়ে নাট্যকলার গৌরবের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, "নাট্য দেবতাদিগের শান্ত ও নেত্র-তৃপ্তিকর যজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রুদ্র-দেহে ইহা তাণ্ডব ও লাস্যের বিকাশস্বরূপ হরগৌরীরূপে বিরাজ করে। সত্ব, রজঃ, তম, ত্রিগুণ হইতে সমুদ্ভূত নানারস-সমন্বিত লোকচরিত্র ইহাতে দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন ইহা এক হইয়াও শৃঙ্গারহাস্যাদি বহু প্রকারে ভিন্নরুচি লোকদিগের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া থাকে।" এই সময়ে বকুলাবলিকা তথায় উপস্থিত হইল, এবং গণদাসকে অভিবাদন করিয়া মালবিকার শিক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করিল। গণদাস মালবিকার কলাশিক্ষার প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে, আমি তাহাকে যে সকল শিক্ষা প্রদান করি, তাহা সে সুচারুরূপে শিক্ষা করিয়া আমাকেই প্রতিশিক্ষা দিয়া থাকে। শুনিয়া বকুলাবলিকা মালবিকাকে ধন্য মনে করিতে লাগিল, এবং তিনি যে রাজার অন্যতমা রাণী ইরাবতী অপেক্ষা কলানিপুণা তাহাও তাহার মনে হইতেছিল। গণদাস মালবিকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বকুলাবলিকা তাঁহাকে রাণী ধারিণীর নিকট বীরসেন কর্তৃক পরিচারিকা-রূপে প্রেরিত ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারিল না। গণদাসের কিন্তু মালবিকার রূপগুণ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে উচ্চবংশীয়া বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। গণদাস বকুলাবলিকাকে বলিতেছিলেন, "ইহার শিক্ষাদানে আমি যশস্বী হইব বলিয়া মনে করিতেছি। কারণ, সমুদ্রশুক্তিতে মেঘবারি যেমন মুক্তারূপে পরিণত হয়, সেইরূপ সুপাত্রে ন্যস্ত শিক্ষকের কলাশিক্ষাও বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন হইয়া উঠে।" মালবিকা শিক্ষা গ্রহণের পর সেই সময়ে বিশ্রাম লাভের জন্য দীর্ঘিকাবলোকন-গবাক্ষে বসিয়া বায়ু সেবন করিতে-ছিলেন। বকুলাবলিকা গণদাসের নিকট হইতে তাহা জ্ঞাত হইয়া মালবিকাকে উৎসাহ প্রদানের জন্য তাঁহার নিকট অগ্রসর হইল।

বিদর্ভের বর্ত্তমান রাজা যজ্ঞসেন এখনও মহারাজ অগ্নিমিত্রের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। অগ্নিমিত্র তাঁহাকে মাধবসেনের মুক্তির জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। তদুত্তরে যজ্ঞসেন এইরূপ জ্ঞাপন করেন যে, মহারাজ

অগ্নিমিত্রের উদাসীন ভাবে অবস্থিতি করাই কর্ত্তব্য। তবে যদি তিনি মাধবসেন ও তাঁহার পরিবারবর্গের মুক্তির ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অগ্নিমিত্রকে ও যজ্ঞসেনের শ্যালক মৌর্য্য-মন্ত্রীকেও মুক্ত করিতে হইবে। অগ্নিমিত্র অমাত্যমুখে এই কার্য্যবিনিময়ের কথা শুনিয়া বিদর্ভরাজকে উন্মূলন করার জন্য বীরসেন প্রভৃতি সেনাপতিকে আদেশ জানাইতে বলিলেন। মন্ত্রীও রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন, "শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে অরাতি স্বল্পকাল রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, ও প্রজামধ্যে বদ্ধমূল নহে, তাহাকে সদ্যরোপিত শিথিলমূল বৃক্ষের ন্যায় অনায়াসেই উৎপাটিত করা যাইতে পারে।" তাহার পর বিদর্ভ-আক্রমণেরই ব্যবস্থা হইল।

চিত্রে নিবেশিত মালবিকার মূর্ত্তি দেখিয়া অবধি রাজা অগ্নিমিত্রের মন তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। কিন্তু সেই চিত্রপটে দর্শন ব্যতীত মহিষী ধারিণীর কৌশলে তিনি কোনরূপে মালবিকার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। প্রিয় বয়স্য গৌতমকে তাহার উপায় স্থির করার জন্য অনুরোধ করিলে বিদূষক গৌতম তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। গণদাসের ন্যায় হরদত্ত নামে রাজার আর একজন প্রধান নাট্যাচার্য্য ছিলেন। বিদূষক এই উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ বাধাইয়া তাঁহাদের শিষ্যের রাজ-সকাশে পরীক্ষাদ্বারা তাহা স্থির করার কৌশল অবলম্বন করেন। রাজা হরদত্তের পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষণে কিন্তু তাঁহার সে পক্ষপাত শিথিল হইতে আরম্ভ হয়; কারণ, মালবিকা গণদাসের শিষ্যা। লোকে কিন্তু হরদত্তকেই রাজার প্রিয় বলিয়া জানিত। রাণী ধারিণী গণদাসকেই বরাবর সমাদরের চক্ষে দেখিতেন। গৌতম স্বীয় কৌশলের কথা রাজাকে জানাইলে, রাজা যারপরনাই আনন্দিত হইয়া উঠিলেন; এবং এই দুরধিগম্য বিষয়ে কার্য্যসিদ্ধির বিশেষরূপ সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "যদি কোন বিষয়ে প্রতিবন্ধক থাকে উপযুক্ত সহায় থাকিলে তাহাতে ফললাভই হয়। চক্ষু থাকিলেও অন্ধকারে দীপশিখা ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।"

অনতিকাল মধ্যে গণদাস ও হরদত্ত আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতে করিতে রাজার নিকট বিচার প্রার্থনায় মূর্ত্তিমান ভাবের ন্যায়

অগ্রসর হইলেন। রাজা তাঁহাদের তর্কবিতর্ক শুনিয়া বিদূষককে কহিলেন, "সখে, তোমার সুনীতি বৃক্ষের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখিতেছি।" বিদূষক উত্তর দিলেন, "ফলও শীঘ্র দেখিতে পাইবে।" কঞ্চুকী নাট্যাচার্য্য-দ্বয়ের আগমন সংবাদ রাজাকে জ্ঞাপন করিলে রাজা তাঁহাদিগকে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। উভয়ে রাজসকাশে উপস্থিত হইলে গণদাস চুপে চুপে বলিতে লাগিলেন, "রাজমহিমা কি দুর্বিসহ! আমার নিকট রাজা অপরিচিত অথবা অপ্রিয়দর্শন নহেন। তথাপি চকিত ভাবেই ইহার পার্শ্বে গমন করিতে হইতেছে। মহারাজ সাগরের ন্যায় আমার নিকট প্রতিক্ষণ নূতন বলিয়াই প্রতীত হইতেছেন।" হরদত্ত বলিয়া উঠিলেন, "পুরুষাকারে আবির্ভূত এই জ্যোতি হইতে প্রবেশানুমতি পাইয়া কঞ্চুকীর সহিত অগ্রসর হইতে হইতেও যেন আমার দৃষ্টি রাজতেজ দ্বারা নিবারিত হইতেছে, এবং তাঁহার নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত না হইলেও আমি অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতেছি না।" তাহার পর কঞ্চুকীর কথায় তাঁহারা রাজার নিকট অগ্রসর হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে আসনে উপবেশন করিতে বলিলে আচার্য্যদ্বয় যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। তখন গণদাস বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, মহারাজ আমি সম্যক্ গুরুর নিকট হইতে অভিনয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া উপযুক্ত পাত্রেই তাহা প্রয়োগ করিতেছি। আপনি ও মহিষী আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই হরদত্ত আমাকে প্রধান পুরুষগণের সমক্ষে বলিতেছেন, 'আমি তাঁহার পদরজেরও তুল্য নহি।' সেকথা শুনিয়া হরদত্ত কহিলেন যে, দেব, গণদাসই প্রথমে আমার নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাঁহাতে আমাতে সমুদ্রপল্বলের প্রভেদ। এক্ষণে আপনি আমাদের পরীক্ষা গ্রহণ করুন। বিদূষক তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রকাশ করেন; গণদাসও তাহাতে সম্মত হন। রাজা কিন্তু মহিষী ধারিণীর উপস্থিতি ব্যতীত আচার্য্যদ্বয়ের পরীক্ষা লইতে সাহসী না হইয়া রাণীর ও পরিব্রাজিকা-বেশধারিণী কৌশিকীর আগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাজার কথায় তখন সকলেই সম্মতি দিলেন। তাহার পর কঞ্চুকী তাঁহাদিগকে লইয়া আসিলেন। ধারিণী হরদত্তকে রাজার প্রিয় জানিয়া আচার্য্যদ্বয়ের জয়পরাজয় সম্বন্ধে কৌশিকীকে জিজ্ঞাসা

করিলে, তিনি গণদাসের পরাজয়ের কোন আশঙ্কা করেন নাই। মহিষী কিন্তু রাজাকে হরদত্তের পক্ষপাতী বলিলে কৌশিকী উত্তর দিলেন, আপনিওত রাজ্ঞী বটেন। দেখুন, ভানুর কৃপায় অগ্নি যেমন সমুজ্জ্বল হন, তেমনি নিশার সাহায্যে চন্দ্রেরও মহিমা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পরিব্রাজিকা কৌশিকীর সহিত মহিষী ধারিণীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রাজা বলিতে লাগিলেন, "যতিবেশধারিণী কৌশিকীর সহিত শোভনালঙ্কৃতা মহিষী মূর্ত্তিমতি অধ্যাত্মবিদ্যার সহিত ত্রিবেদসংহিতার ন্যায় আগমন করিতেছেন।" অবশেষে তাঁহারা রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন। পরিব্রাজিকা কৌশিকী জয় উচ্চারণ করিলে রাজাও তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরিব্রাজিকা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "মহাসারপ্রসবা, তুল্যক্ষমাবতী ধারিণী ও ধরণী উভয়ের পতিরূপে শতায়ু হইয়া থাকুন।" মহিষীও রাজার জয় উচ্চারণ করিলে রাজাও তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। তাহার পর রাজা তাঁহাদিগকে আসন পরিগ্রহ করিতে বলিয়া গণদাস ও হরদত্তের বিবাদের কথা জানাইলেন, এবং কৌশিকীকে তাহার মীমাংসার জন্য অনুরোধ করিলেন। কৌশিকী উত্তর দিলেন, "নগর থাকিতে গ্রামে রত্নপরীক্ষা সঙ্গত নহে।"

কৌশিকী মালবিকার প্রধান সহায়। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, যাহাতে মালবিকার প্রতি রাজার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। সেই জন্য তিনি রাজা ও মালবিকার পরস্পরের দর্শনের অভিলাষিণী ছিলেন। এক্ষণে সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি বলিলেন যে, নাট্য শাস্ত্র অভিনয়প্রধান; ইহাতে বাগ্ব্যবহারের কোন ফল নাই। কৌশিকী সে বিষয়ে মহিষীরও মত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহিষী কিন্তু যাহাতে রাজা মালবিকার দর্শন না পান তাহারই জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন যে, ইঁহাদের বিবাদটাই আমার ভাল লাগিতেছে না। বিদূষক কহিলেন, "ম্যাড়ার লড়াইটা দেখা যাক্ না; ইহাদের বৃথা বেতন দিয়া ফল কি?" রাণী বিদূষকের কলহপ্রিয়তার জন্য তিরস্কার করিলে, গৌতম উত্তর দিলেন, "আমার তাহা অভিপ্রায় নহে, তবে বিবাদপ্রিয় মত্ত হস্তিদ্বয়ের মধ্যে একটি নির্জ্জিত না হইলে শান্তির সম্ভাবনা নাই।" রাজা পরিব্রাজিকাকে আচার্য্যদ্বয়ের

অভিনয়োপযোগী অঙ্গসৌষ্ঠব লক্ষ্য করিতে বলিলেন, এবং কিরূপে তাঁহাদের নিপুণতার পরীক্ষা হইবে তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। কৌশিকী উত্তর দিলেন, "কোন শিক্ষকের ক্রিয়া আপনাতেই বদ্ধ থাকে, কাহারও বা উপযুক্ত শিষ্যে প্রযুক্ত হয়। যাঁহার এই দুইটিই থাকে, তিনিই শিক্ষকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য।" বিদূষক মালবিকার উপস্থিতিরই অভিপ্রায় করিতেছিলেন। কাজেই কৌশিকীর কথা শুনিয়া আচার্য্যদ্বয়কে তাঁহাদের উপদেশের পরীক্ষা জানাইতে বলিলেন। মহিষী দেখিলেন যে, ব্যাপার ক্রমে জটিল হইয়া উঠিতেছে। তখন তিনি কহিলেন যে, "স্বল্পমেধা শিষ্যের দ্বারা যদি উপদেশ মলিন হয়, তাহা হইলে তাহাতে উপদেষ্টার দোষ কি?" রাজা দেখিলেন, মহিষী কিছুতেই মালবিকার উপস্থিতির পক্ষপাতিনী নহেন, অথচ তাঁহাকে না দেখিলেও তিনি অধীর হইয়া উঠিতেছেন। তখন মহিষীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেবীর কথা যথার্থ বটে; তবে উপদেষ্টা অযোগ্য পাত্রে উপদেশ দিলে তাঁহারই বুদ্ধিহীনতা প্রকাশ পায়।" দেবী বুঝিতে পারিলেন যে, রাজার আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে; তখন তিনি এই বিবাদ নিবৃত্তির জন্যই অনুরোধ করিতে লাগিলেন। চতুর বিদূষক রাণীকে সন্তুষ্ট করার জন্য অথচ গণদাসকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "সঙ্গীতসেবায় সরস্বতী-প্রদত্ত সরস মোদক আস্বাদনের পর এ শুষ্ক বিবাদে আপনার প্রয়োজন কি?" গণদাস উত্তর দিলেন, "দেবীবাক্য সত্য বটে; তবে নিজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি বলিয়া যে ব্যক্তি পরের নিন্দা সহ্য করিয়া কেবল জীবিকার জন্যই শাস্ত্র-চর্চ্চা করে, তাহাকে জ্ঞান ও পণ্যবিক্রেতা বণিক বলিয়াই লোকে অভিহিত করিয়া থাকে।" গণদাসের কথা শুনিয়া রাণী বলিতে লাগিলেন যে, আপনার অল্পদিনের শিক্ষিতা শিষ্যার উপদেশ প্রকাশ কি যুক্তিযুক্ত? গণদাস কহিলেন, "সেই জন্যই আমার এত আগ্রহ।" তখন রাণী উভয়কে পরিব্রাজিকার নিকট উপদেশের পরিচয় প্রদানের জন্য বলিলেন। শুনিয়া কৌশিকী কহিলেন যে, ইহা সমীচীন নহে। সর্ব্বজ্ঞ হইলেও একাকী এ বিষয়ের মীমাংসা করা দোষাবহ। কৌশিকীর কথায় দেবীর অত্যন্ত বিরক্তি জন্মিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "মূঢ়ে পরিব্রাজিকে, জাগরিতা আমাকে তুমি কি সুপ্তার মত করিতে চাও?" তাহার পর মহিষী মুখ

ফিরাইলেন। রাজা কৌশিকীকে তাহা লক্ষ্য করিতে কহিলেন। পরিব্রাজিকা তাহা বুঝিতে পারিয়া রাণীকে বলিলেন, "অকারণে মহারাজের প্রতি চন্দ্রাননার পরাঙ্মুখী হওয়া উচিত নহে। কুটুম্বিনীগণের স্বামীর উপর প্রভুত্ব থাকিলেও তাঁহারা অকারণে কুপিত হন না।" বিদূষক গণদাসকে উত্তেজিত করার জন্য বলিলেন, "আত্মপক্ষ সকলেই রক্ষা করিয়া থাকে। ভাগ্যে রাণী কুপিতা হইয়াছেন তাই তুমি পরিত্রাণ পাইলে। সুশিক্ষিত হইলেও উপদেশ দেখিয়াই গুণাগুণ স্থির হইয়া থাকে।" গণদাস তখন দেবীকে কহিলেন যে, আমার উপদেশের পরিচয় প্রদর্শনে আপনি যদি আদেশ প্রদান না করেন, তাহা হইলে আমাকে পরিত্যাগ করা হইবে জানিবেন। এই বলিয়া তিনি গমনে উদ্যত হইলে, মহিষী অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। তাহার পর গণদাস কোন্ বিষয়ের অভিনয় প্রদর্শিত হইবে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলে রাজা পরিব্রাজিকাকে তাহার আদেশ দিতে বলিলেন। কৌশিকী কহিলেন, "শর্ম্মিষ্ঠার কৃত চতুষ্পদযুক্ত ছলিক নামক নাট্যের প্রয়োগই পরীক্ষিত হইবে।" আচার্য্যদ্বয় তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে সঙ্গীতশালায় অভিনয় আরম্ভ করিয়া মৃদঙ্গ শব্দের দ্বারা সকলকে জ্ঞাপন করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। পরিব্রাজিকা আরও বলিয়া দিলেন যে, পাত্রদিগের সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবের অভিব্যক্তিই লক্ষ্য করিতে হইবে; সুতরাং তাহাদিগকে বেশভূষায় বিভূষিত করা না হয়।

আচার্য্যদ্বয় প্রস্থান করিলে মহিষী রাজাকে বলিলেন, "যদি রাজকার্য্যে মহারাজের এরূপ নিপুণতা থাকিত, তাহা হইলে মঙ্গলের কারণ হইত।" রাণীর বিরক্তি বুঝিতে পারিয়া রাজা কহিলেন যে, মনস্বিনী তোমার বুঝা উচিত এ সকল আমার কৌশল নহে। সমবিদ্য আচার্য্যদ্বয় যশোলাভের জন্যই এইরূপ ঘটাইয়াছে। তাহার পর সঙ্গীতশালা হইতে মৃদঙ্গধ্বনি উত্থিত হইলে পরিব্রাজিকা বলিতে লাগিলেন, "মেঘমন্দ্রভ্রান্ত ময়ূরের ধ্বনি সহ মৃদঙ্গের মধ্যস্বরোত্থিত মায়ূরী-মার্জ্জনা নামে বাদ্য সকলের আনন্দ উৎপাদন করিতেছে।" তখন তাঁহারা সঙ্গীতশালার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজার দ্রুতপাদবিক্ষেপের প্রতি রাণী বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বিদূষক তাহা বুঝিতে পারিয়া রাজাকে ধীরভাবে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিলেন।

রাজা বলিতে লাগিলেন, "আমি ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেও সিদ্ধিপথ প্রাপ্ত নিজ মনোরথ শব্দের ন্যায় মৃদঙ্গধ্বনি আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে।"

(২)

সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করিয়া রাজা পরিব্রাজিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রথমে কাহার উপদেশ দর্শন করা কর্তব্য। কৌশিকী উত্তর দিলেন যে, গণদাস বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় তাঁহারই উপদেশ প্রথমে দেখিতে হয়। তাহার পর গণদাসের উপদেশ দর্শনের ব্যবস্থা হইল। গণদাস শর্ম্মিষ্ঠার প্রণীত মধ্যলয় ও চতুষ্পদীবিশিষ্ট ছলিক নামক নাট্য দর্শনের আয়োজন করিয়াছিলেন। উহা রাজারও অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মালবিকা তখনও পর্দার অন্তরালে অবস্থিত থাকায় রাজা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বিদূষককে গোপনে বলিতে লাগিলেন, "যবনিকান্তরালে অবস্থিতা সুন্দরীকে দেখিবার জন্য চক্ষু সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। আমি এরূপ অধীর হইয়াছি যে, আমার মনে হইতেছে যবনিকাটি ছিন্ন করিয়া দেখি।" বিদূষক উত্তর দিলেন, "নয়নমধু সম্মুখে উপস্থিত, মক্ষিকাও সন্নিকটে; এক্ষণে স্থির ভাবে সমস্ত দর্শন কর।" সেই সময়ে অঙ্গসৌষ্ঠবা মালবিকাকে লইয়া গণদাস পুনরাগমন করিলেন। বিদূষক রাজাকে মালবিকার বর্তমান অবস্থা ও মধুর বিকাশের প্রতি লক্ষ্য করিতে বলিলেন। রাজা বলিতে লাগিলেন, "চিত্রে ইঁহাকে দেখিয়া ইঁহার কান্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার মনে হইতেছে যে, চিত্রকর ইঁহার প্রতিকৃতি অঙ্কনে মনোযোগ প্রদর্শন করেন নাই।" মালবিকা লজ্জিতা ও সঙ্কুচিতা হইতেছিলেন দেখিয়া গণদাস তাঁহাকে নিঃশঙ্কভাবে অবস্থিতি করিতে উপদেশ দিলেন। রাজা তাঁহার রূপমাধুর্য্য দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ইঁহার সর্বাবয়বের রূপই অনিন্দনীয়। চক্ষু দুইটি আয়ত, মুখখানি শরদিন্দুতুল্য, বাহু দুইটি অবনতস্কন্ধ, বক্ষস্থল সংক্ষিপ্ত, পার্শ্ব দুইটি মার্জ্জিত, কটিদেশ ক্ষীণ, জঘন স্থূল, কুঞ্চিতাঙ্গুলি পদ—এই সমস্ত দেখিয়া বোধ হয় নৃত্যাচার্য্যের মনে যাহা ছিল, ইহার অঙ্গে তাহাই সন্নিবেশ করিয়াছেন।" এই সময়ে মালবিকা রাগালাপ করিয়া চতুষ্পদযুক্ত এই গীতটি গাহিয়া উঠিলেন।

"হৃদয়, আমার সেই দুর্লভ প্রিয়তমের আশা পরিত্যাগ কর। একি! আবার বাম অপাঙ্গ নাচিয়া উঠে কেন? যাঁহাকে ত বহু পূর্ব্ব হইতে দেখিতেছি, তবে পুনর্ব্বার দেখিতে ইচ্ছা কেন? নাথ, আমি পরাধীনা হইলেও তোমারই তৃষিতা বলিয়া জানিবে।" তারপর তিনি রসানুরূপ অভিনয় আরম্ভ করিলেন।

গীত শুনিয়া ও অভিনয় দেখিয়া রাজা ও বিদূষক পুলকিত হইয়া উঠিলেন। গৌতম চুপ চুপি রাজাকে বলিলেন যে, দেখ, এই গীতটী অবলম্বন করিয়া মালবিকা তোমাকেই আত্মসমর্পণ করিতেছেন। রাজা উত্তর দিলেন,"সখে,আমারও তাহাই মনে হইতেছে 'তোমারই তৃষিত', নাথ' এই কথাটী অঙ্গভঙ্গির সহিত গাহিয়া ধারিণীর নিকটে থাকায় আমার অনুরাগ জানিতে না পারিয়া মালবিকা বর্ণিত প্রার্থনাচ্ছলে আমাকেই লক্ষ্য করিতেছেন।" গীতশেষে মালবিকা যাইতে উদ্যত হইলে বিদূষক বলিয়া উঠিলেন যে, একটু অপেক্ষা কর, একটা কাজের ভুল হইয়া গিয়াছে। গণদাস তাহা শুনিয়া মালবিকাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। রাজা মালবিকার মনোহর রূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "সকল অবস্থাতেই ইহার রূপটী কি সুন্দর! কটীর অধোভাগে নিশ্চল বলয়ভূষিত বাম হস্ত স্থাপন ও শ্যামালতার ন্যায় দক্ষিণ বাহুটী প্রসারিত করিয়া মণি-খচিত ভূতলে পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কুসুমরাশি দলিত ও তাহায় দৃষ্টি নিপাতিত করিতে করিতে, সরল ও আয়ত ঊর্দ্ধাঙ্গটির সহিত নৃত্যভঙ্গিমায় অবস্থিত এই অনিন্দ্য সুন্দরীকে বাস্তবিকই অত্যন্ত রমণীয় বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

বিদূষকের কথায় মালবিকার অপেক্ষা দেখিয়া মহিষী ধারিণীর কিছু বিরক্তি জন্মিল। তিনি মনে মনে বলিলেন যে, গৌতমের কথাই মহারাজের মনে ধরিয়া থাকে। গণদাস কহিলেন, "তাহা নহে, মহারাজের জ্ঞান-প্রভাবেই গৌতমের সূক্ষ্মদর্শিতা জন্মিয়াছে। পণ্ডিতের সংসর্গেই মন্দমতির বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। নির্ম্মলী ফলের কষেই পঙ্কিল সলিলের আবিলতা নষ্ট হয়।" তাহার পর গণদাস বিদূষকের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে, তিনি প্রথমে কৌশিকীকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। কৌশিকী 'অভিনয়ের কোন দোষ ঘটে নাই' বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিতে লাগ-

লেন, "অভিনয়টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরই দৃষ্ট হইল। অঙ্গ বিক্ষেপে অন্তর্নিহিত বচন দ্বারা অভিপ্রায় সম্যগ্‌রূপেই সূচিত হইয়াছে। পদন্যাস লয়যুক্ত এবং রসে তন্ময়তাও অনুভূত হইল। নৃত্যভঙ্গির অভিনয়টিও মৃদু বলিয়া জ্ঞাত হওয়া গেল। অভিনয়ে ভেদ থাকিলেও পরবর্ত্তী ভাবটি পূর্ব্ব ভাবের ন্যায়ই পরিস্ফুট হইয়া সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছে।" রাজাও বলিলেন যে, আমার স্বপক্ষের অভিমান অদ্য শিথিল হইল। শুনিয়া গণদাস আপনাকে প্রকৃত নাট্যাচার্য্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন. "শিক্ষকের যে উপদেশ পণ্ডিতসমাজে অগ্নিপরিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় মলিন না হয়, তাহাই সাধুগণে শুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন।" মহিষীও পরীক্ষায় গণদাসের যশোবৃদ্ধির কামনা করিতে লাগিলেন। গণদাসও তাহাতে ধন্য মনে করিলেন। তাহার পর গণদাস গৌতমকে তাঁহার অভিপ্রায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদূষক উত্তর দিলেন, কার্য্যারম্ভে আপনাদের প্রথমে ব্রাহ্মণ পূজা করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু সকলেই তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। পরিব্রাজিকা বলিয়া উঠিলেন যে, ইহা অভিনয়ের অন্তর্গত প্রশ্ন বটে। শুনিয়া সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন। মালবিকার বদনেও ঈষৎ হাস্য পরিলক্ষিত হইল। রাজা তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিতেছিলেন, "চক্ষু আমার অভিলষিত বিষয়টি দেখিয়া লইল। আয়তাক্ষীর মৃদু মন্দ হাস্যে তাঁহার ঈষদ্ব্যক্ত দশনাবলীশোভিত বদনটিকে স্বল্পপ্রস্ফুটিতকেসর পঙ্কজের ন্যায় বোধ হইতেছে।" গণদাস বিদূষককে বলিলেন যে, এই আমার প্রথম অভিনয় প্রদর্শন নহে; তাহা যদি হইত তাহা হইলে অবশ্যই আপনার পূজা করা যাইত। বিদূষক উত্তর দিলেন, "আমার ন্যায় মূঢ় চাতকের শুষ্ক ঘনগর্জ্জিত আকাশেই জলপানের ইচ্ছা হয়। সে যাহা হউক, মূর্খেরা পণ্ডিতদিগের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া থাকে। যখন পণ্ডিতা কৌশিকী অভিনয়টিকে ভাল বলিয়াছেন, তখন আমিও পারিতোষিক দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি রাজার হস্ত হইতে বলয় আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহিষী বলিলেন যে, অন্যের গুণপনা না জানিয়া তুমি পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিতেছ কেন? বিদূষক উত্তর দিলেন, "জিনিসটি পরের কিনা,

সেই জন্য আমার এরূপ আগ্রহ।" মালবিকাকে অন্তর্হিতা করার অভিপ্রায়ে মহিষী গণদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, আপনার শিষ্যার অভিনয় দেখা হইয়াছে। তখন গণদাস মালবিকাকে লইয়া সেস্থান হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

মালবিকা চলিয়া গেলে বিদূষক চুপি চুপি রাজাকে কহিলেন, "তোমার জন্য এই পর্য্যন্তই আমার বুদ্ধিপ্রভাবে দেখান হইল।" রাজা বলিলেন, "তোমাকে নিরস্ত হইলে চলিবে না। তাহার প্রস্থানে আমার নয়নের ভাগ্য অস্তমিত, হৃদয়ের মহোৎসব অন্তর্হিত ও ধৈর্য্যদ্বার চিরাবৃত হইল, মনে হইতেছে।" বিদূষক উত্তর দিলেন, "তোমার দেখিতেছি দরিদ্র রোগীর ন্যায় বৈদ্যের নিকট হইতে ঔষধ লাভের ইচ্ছা হইতেছে।"

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথনের সময় হরদত্ত উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিনয় দর্শনের প্রার্থনা করিলেন। রাজা মনে মনে তাহা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিলেও প্রকাশ্যে তাহার দর্শনে অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু সে সময়ে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত বলিয়া বৈতালিকেরা জ্ঞাপন করিল। তাহারা গাহিতে লাগিল, "দীর্ঘিকা-পদ্মিনীর পত্রচ্ছায়ে হংসসকল নয়ন মুদিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। পারাবতগণের পরিচিত সৌধশির আতপতপ্ত হওয়ায় এক্ষণে তাহাদের বিদ্বেষ জন্মাইতেছে। ঘূর্ণ্যমান বারিযন্ত্রের বিন্দুক্ষেপে পিপাসু হইয়া ময়ূরগণ অগ্রসর হইতেছে। সর্ব্ব-রাজগুণে বিভূষিত তোমার ন্যায় সূর্য্যদেব কিরণপরিপূর্ণ হইয়া এক্ষণে দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিতেছেন।" বেলা হইয়াছে দেখিয়া বিদূষক অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি হরদত্তকে বলিলেন যে, এক্ষণে ভোজনবেলা উপস্থিত ; সময় অতিক্রান্ত হইল, চিকিৎসকেরা দোষ দিবেন। হরদত্ত তাহার উত্তর করিতে পারিলেন না। রাজা বলিলেন যে, কল্য আপনার অভিনয় দর্শন করা যাইবে। হরদত্ত তাহাতেই সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলেন। মহিষী রাজাকে স্নানের জন্য গমন করিতে বলিলে বিদূষকও রাজাকে পানভোজনের ব্যবস্থা করিতে কহিলেন। তাহার পর মহিষী পরিব্রাজিকার সহিত নিক্রান্ত হইলেন।

মহিষী গমন করিলে বিদূষক রাজাকে বলিলেন যে, সখে, মালবিকা

কেবল রূপে নহেন, শিল্পশিক্ষায়ও অদ্বিতীয়া।" রাজা উত্তর করিলেন, "সেই অনিন্দ্য সুন্দরীতে ললিত বিজ্ঞান যোগ করিয়া বিধাতা তাহাকে মদনের বিষদিগ্ধ বাণস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। যাহা, আমার বিষয় একটু চিন্তা করিয়া দেখিও।" বিদূষক কহিলেন, "আমার বিষয়টাও তোমার ভাবা উচিত। দোকানের কটাহের ন্যায় আমার উদরটিও অত্যন্ত তাতিয়া উঠিয়াছে।" রাজা উত্তর দিলেন যে, তাহা সত্য বটে, তবে বন্ধুর জন্য তোমার একটু তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। বিদূষক বলিলেন, "আমি যখন কথা দিয়াছি তখন তাহা পালনের জন্য অবশ্যই চেষ্টা করিব। কিন্তু মালবিকা মেঘাবৃত জ্যোৎস্নার ন্যায় পরাধীনা। তুমিও দেখিতেছি, বধ্যভূমিচর মাংসলোভী চিলপক্ষীর ন্যায় ভীত ভাবে অথচ নিতান্ত নাছোড় হইয়া কার্য্য সিদ্ধিরই চেষ্টা করিতেছ।" রাজা উত্তর দিলেন, "আমি কেন যে এরূপ হইতেছি শোন। আমার হৃদয় সমস্ত অন্তঃপুরবাসিনীকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে সেই বামলোচনাকেই একমাত্র স্নেহের আস্পদ করিয়া তুলিয়াছে।"

——:•:——

দিল্লী।

প্রাচীন ইতিহাস।

(হিন্দুরাজত্বকাল)

(১)

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন নগরী বারাণসী বা মথুরা প্রভৃতির ন্যায় দিল্লীর পুরাতন ইতিহাস পাওয়া সুকঠিন। যে সময়ে ইন্দ্রপ্রস্থের পত্তন হয়, সেই সময় হইতেই ইহার প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভ। কিন্তু প্রবাদমুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাজা দিলীপ কর্ত্তৃক দিল্লীনগরী স্থাপিত হইয়াছিল। সূর্য্যবংশে

দুইজন এবং চন্দ্রবংশেও একজন দিলীপের নাম পুরাণাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু কোন্ দিলীপ কর্ত্তৃক দিল্লী গঠিত হয় তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ অনুমান করেন, চন্দ্রবংশীয় দিলীপ কর্ত্তৃকই দিল্লীর নামকরণ হইয়াছিল। * আবার কাহারও কাহারও মতে বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক দিলু বা দিলীপ কর্ত্তৃক দিল্লীনগরী গঠিত হয়।† কোন্ সময়ে দিল্লী গঠিত হইয়াছিল তাহা স্থিরীকৃত না হইলেও, বহু প্রাচীন কাল হইতে দিল্লীর নাম শ্রুত হওয়া যায়। টলেমী তাঁহার গ্রন্থে দিল্লীর উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং দিল্লী যে নিতান্ত আধুনিক নহে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সে যাহা হউক, দিল্লীর প্রাচীনত্বের বিশেষ কোন প্রমাণ দৃষ্ট না হইলেও ইন্দ্রপ্রস্থের বিবরণ হইতে দিল্লী প্রদেশের ইতিহাস যে অবগত হওয়া যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এক্ষণে ইন্দ্রপ্রস্থ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

যমুনার তীরবর্ত্তী খাণ্ডববন আর্য্যাবর্ত্তের একটি বিশাল অরণ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার নিকটবর্ত্তী খাণ্ডবপ্রস্থ বা ইন্দ্রপ্রস্থ কুরুবংশীয়দিগের একটি প্রধান নগররূপে বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছিল। পুরাকালে ইহা ইন্দ্রপ্রস্থক্ষেত্র নামে অভিহিত হইত; এবং দেবগণ কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রপ্রস্থক্ষেত্র পূর্ব্ব পশ্চিমে এক যোজন ও যমুনার দক্ষিণ অবধি চারি যোজন বিস্তৃত।‡ এই স্থানে ইন্দ্র বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া সম্ভবতঃ ইহার ইন্দ্রপ্রস্থ নাম হইয়া থাকিবে। প্রাচীন কাল হইতে ইন্দ্রপ্রস্থ একটি পবিত্র তীর্থরূপে কথিত হইয়া আসিতেছিল। এই তীর্থে দেহত্যাগ করিলে বিষ্ণুতুল্য হয়

* Archæological Survey of India vol., IV. P. 5.

† Murray's Handbook of Bengal Presidency. P. 303.

‡ "ইন্দ্রপ্রস্থমিদং ক্ষেত্রং স্থাপিতং দৈবতৈঃ পুরা।
পূর্ব্বপশ্চিময়োস্তাত একযোজনবিস্তৃতম্॥
কালিন্দ্যা দক্ষিণে যাবদ্যোজনানাং চতুষ্টয়ম্।
ইন্দ্রপ্রস্থস্য মর্য্যাদা কথিতৈষা মহর্ষিভিঃ॥"

গৌতমীসংহিতা (বিশ্বকোষ—ইন্দ্রপ্রস্থ শব্দ)।

বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।* পুরাকাল হইতে ইহা তীর্থক্ষেত্র থাকিলেও পরবর্ত্তী কালে ইন্দ্রপ্রস্থ কুরুসাম্রাজ্যের একটি প্রধান নগর স্বরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। কৌরবরাজ পাণ্ডুর দেহত্যাগ হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির কুরুবংশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হওয়ায়, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। কিন্তু পাণ্ডুর জন্মান্ধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ ইহাতে অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠেন। তৎকালে গঙ্গাতীরবর্ত্তী হস্তিনাপুর কুরু-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। যুধিষ্ঠির তথা হইতে মাতা ও ভ্রাতৃগণ সহ বারণাবত নামক রমণীয় স্থানে গমন করিলে তথায় ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশে এক জতুগৃহ নির্ম্মিত হয়। ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পুত্রগণের অনুরোধে পাণ্ডব-দিগকে দগ্ধ করার আয়োজন করিয়াছিলেন। জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ হইলেও পাণ্ডবেরা পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া পলায়ন করেন, এবং আত্ম-রক্ষায় সমর্থ হন। তাহার পর তাঁহারা গুপ্তভাবে নানা স্থানে পরিভ্রমণের পর হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া রাজ্য প্রার্থনা করেন। ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে তাঁহাদিগকে অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণে সম্মতি দান করিতে হয়। সেই সময়ে পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করেন। মহাভারতে তৎকালীন ইন্দ্রপ্রস্থের এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ঐ নগর সমুদ্রসদৃশ পরিখাদ্বারা অলঙ্কৃত, পাণ্ডুবর্ণ মেঘমালা ও হিমরশ্মির ন্যায় গগনস্পর্শী প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত, শ্বেতনাগসমাবৃত পাতালগঙ্গা ভোগবতীর ন্যায় সুশোভিত, গরুড়ের ন্যায় বিপক্ষদ্বারসমূহ ও পরম রমণীয় সৌধসমূহে সমাকীর্ণ, মন্দর ভূধরের ন্যায় অভ্যুন্নত, অস্ত্র-শস্ত্র-সুরক্ষিত গোপুরসমুদায়ে সুশোভিত, ভীষণ ভুজঙ্গমাকার শক্তি, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ, শতঘ্নী, লৌহ চক্র প্রভৃতি অস্ত্র-

* "ইন্দ্রপ্রস্থাপদেশেতৈব ক্ষেত্রমিন্দ্রস্য পাবনম্।
তেনাত্র পূজিতো বিষ্ণু র্ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥
তুষ্টেন বিষ্ণুনা তস্মৈ দত্তো দত্তো নিজবরাত্তয়া।
তো শক্র ভাবকে ক্ষেত্রে সর্ব্বতীর্থবরে জনাঃ।
অচ্যুতং ভাবয়ন্তি যে তে বৈ মত্তুল্যা ভবিষ্যন্তি॥"
সৌভরিসংহিতা (বিশ্বকোষ,—ইন্দ্রপ্রস্থ শব্দ)

কলাপ, যন্ত্রসমুদায় ও তল্প* সমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত এবং যোধগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। ঐ নগর মধ্যে সুবিস্তৃত রাজপথসকল সুবিভক্ত রহিয়াছে; কোন প্রকার দৈবী পীড়া নাই; সুধাবিগলিত বিবিধ পরমোৎকৃষ্ট ভবন সমুদায় চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। ফলতঃ ইন্দ্রপ্রস্থনগর তৎকালে নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুৎসমাবৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। উহার মধ্যে পরমরমণীয় প্রদেশে কুবেরগৃহতুল্য ধনসম্পন্ন কৌরব গৃহ বিরাজিত রহিয়াছে। নগরের চতুর্দ্দিকে আম্র, আম্রাতক, নীপ, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ নাগপুষ্প, লকুচ, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, কেতক, প্রাচীনামলক, লোধ্র, অঙ্কোল, জম্বু, পাটল, কুব্জক, অতিমুক্ত, করবীর, পারিজাত প্রভৃতি ফল-পুষ্পভার-নমিত সুমনোহর বৃক্ষসমুদায়ে পরিপূর্ণ উদ্যানসকল শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত উদ্যানে মত্ত ময়ূর কোকিল প্রভৃতি বিবিধ সুকণ্ঠ পক্ষিগণ সর্ব্বদা মধুর স্বরে গান করিতেছে। আদর্শের ন্যায় স্বচ্ছ বহুবিধ গৃহ, মনোহর লতাগৃহ ও বিচিত্র চিত্রগৃহ সকল উহার মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। হংস, বক, চক্রবাক, কারণ্ডব প্রভৃতি নানা জাতীয় জলচর পক্ষিগণে শোভিত, স্বচ্ছ জলপরিপূর্ণ, পদ্মরেণু-সুবাসিত, বৃহৎ বৃহৎ বাপী, সরোবর, পুষ্করিণী ও তড়াগ সমুদায় উহাতে শোভা পাইতেছে। ঐ নগর মধ্যে ক্রমে ক্রমে সর্ব্ববেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ, সর্ব্বভাষা-বিশারদ ব্যক্তিগণ, ধনাকাঙ্খী বণিকগণ এবং শিল্পোপজীবী সুনিপুণ জনগণ আসিয়া বাস করিতে লাগিল।†

* তল্প অর্থে রক্ষী।—'তল্প ও যোধগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত' লিখিত হইলে ভাল হইত।

† কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। মূল মহাভারতেও এইরূপ লিখিত আছে,—

"প্রতিগৃহ্য তু তদ্বাক্যং নৃপাং সর্ব্বে প্রণম্য চ।
প্রতস্থিরে ততো ঘোরং বনং তন্মনুজর্ষভাঃ।
অর্দ্ধং রাজ্যস্ত সম্প্রাপ্য খাণ্ডবপ্রস্থমাবিশন্॥
ততস্তে পাণ্ডবাস্তত্র গত্বা কৃষ্ণপুরোগমাঃ।
মণ্ডয়াঞ্চক্রিরে তদ্ বৈ পুরং স্বর্গবদচ্যুতাঃ॥
ততঃ পুণ্যে শিবে দেশে শান্তিং কৃত্বা মহারথাঃ।
নগরং মাপয়ামাসু র্দ্বৈপায়নপুরোগমাঃ॥

সাগরপ্রতিমরূপাভিঃ পরিখাভিরলঙ্কৃতম্ ।
প্রাকারেণ চ সম্পন্নং দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতা ॥
পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশেন হিমরশ্মিনিভেন চ ।
শুশুভে তৎ পুরং শ্রেষ্ঠং নাগৈর্ভোগবতীমিব ॥
দ্বিপক্ষগরুড়প্রখ্যৈর্দ্বারৈঃ সৌধৈশ্চ শোভিতম্ ।
গুপ্তমভ্রচয়প্রখ্যৈর্গোপুরৈর্মন্দরোপমৈঃ ॥
বিবিধৈরপি নির্ব্বিদ্ধৈঃ শস্ত্রোপেতৈঃ সুসংবৃতৈঃ ।
শক্তিভিশ্চাবৃতং তদ্ধি দ্বিজিহ্বৈরিব পন্নগৈঃ ॥
তল্পৈশ্চাভ্যাসিকৈর্যুক্তং শুশুভে যোধরক্ষিতম্ ।
তীক্ষ্ণাঙ্কুশশতঘ্নীভির্যন্ত্রজালৈশ্চ শোভিতম্ ॥
আয়সৈশ্চ মহাচক্রৈঃ শুশুভে তৎ পুরোত্তমম্ ।
সুবিভক্তমহারথ্যং দেবতাবাধবর্জ্জিতম্ ॥
বিরোচমানং বিবিধৈঃ পাণ্ডুরৈর্ভবনোত্তমৈঃ ।
তৎ ত্রিবিষ্টপসঙ্কাশমিন্দ্রপ্রস্থং ব্যরোচত ॥
মেঘবৃন্দমিবাকাশে বিদ্ধং বিদ্যুৎসমাবৃতম্ ।
তত্র রম্যে শিবে দেশে কৌরব্যস্য নিবেশনম্ ॥
শুশুভে ধনসম্পূর্ণং ধনাধ্যক্ষক্ষয়োপমম্ ।
তত্রাগচ্ছন্ দ্বিজা রাজন্ সর্ব্ববেদবিদাং বরাঃ ॥
নিবাসং রোচয়ন্তি স্ম সর্ব্বভাষাবিদস্তথা ।
বণিজশ্চাভ্যযুস্তত্র নানাদিগ্‌ভ্যো ধনার্থিনঃ ॥
সর্ব্বশিল্পবিদস্তত্র বাসায়াভ্যাগমং তদা ।
উদ্যানানি চ রম্যাণি নগরস্য সমন্ততঃ ॥
আম্রৈরাম্রাতকৈর্নীপৈরশোকৈশ্চম্পকৈস্তথা ।
পুন্নাগৈর্নাগপুষ্পৈশ্চ লকুচৈঃ পনসৈস্তথা ॥
শালতালতমালৈশ্চ বকুলৈশ্চ সকেতকৈঃ ।
মনোহরৈঃ সুপুষ্পৈশ্চ ফলভারাবনামিতৈঃ ॥
প্রাচীনামলকৈর্লোধ্রৈরঙ্কোলৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ ।
জম্বুভিঃ পাটলাভিশ্চ কুব্জকৈরতিমুক্তকৈঃ ॥
করবীরপারিজাতৈরন্যৈশ্চ বিবিধৈর্দ্রুমৈঃ ।
নিত্যপুষ্পফলোপেতৈর্নানাদ্বিজগণায়ুতৈঃ ॥
মত্তবর্হিণসংঘুষ্টকোকিলৈশ্চ সদামদৈঃ ।

পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করার পর কৃষ্ণার্জ্জুন অগ্নির অনুরোধে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করেন। ময় দানব নামে বিখ্যাত অসুর-শিল্পী তক্ষক-ভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি অর্জ্জুনের শরণাগত হওয়ায় অর্জ্জুন তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। অসুর-শিল্পী প্রত্যুপকার-স্বরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে এক মণিময়ী সভা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত যাদবসভা, দেবসভা, ব্রহ্মসভা প্রভৃতি তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে। তাহার প্রভা-প্রভাবে প্রভাকরেরও প্রভা প্রতিহত হইয়াছিল। সভাস্থানে স্ফটিক-সোপানাবলীযুক্ত এক সরোবর নির্ম্মিত হইয়া অনেক রাজার ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছিল। নানাদিগ্দেশ হইতে ভূপালগণ এবং মহর্ষিগণও তাহার দর্শনে সমাগত হইয়াছিলেন। এই সময়ে দেবর্ষি নারদও ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হন। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে পরামর্শ প্রদান করিলে যুধিষ্ঠির তাহারই আয়োজনে প্রবৃত্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের চিরসহায় ছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে পাণ্ডবেরা

গৃহৈরাদর্শবিমলৈ বিবিধৈশ্চ লতাগৃহৈঃ॥
মনোহরৈশ্চিত্রগৃহৈস্তথা জগতি পর্ব্বতৈঃ।
বাপীভি বিবিধাভিশ্চ পূর্ণাভিঃ পরমাম্ভসা॥
সরোভিরতিরম্যৈশ্চ পদ্মোৎপলসুগন্ধিভিঃ।
হংসকারণ্ডবযুতৈশ্চক্রবাকোপশোভিতৈঃ॥
রম্যাশ্চ বিবিধাস্তত্র পুষ্করিণ্যো বনাবৃতাঃ।
তড়াগানি চ রম্যানি বৃহন্তি সুবহূনি চ॥
তেষাং পুণ্যজনোপেতং রাষ্ট্রমাবিসতাং মহৎ।
পাণ্ডবানাং মহারাজ শশ্বৎ প্রীতিরবর্দ্ধত॥
তত্র ভীষ্মেণ রাজ্ঞা চ ধর্ম্মপ্রনয়নে কৃতে।
পাণ্ডবাঃ সমপদ্যন্ত খাণ্ডবপ্রস্থবাসিনঃ॥
পঞ্চভিস্তৈর্মহেষ্বাসৈরিন্দ্রকল্পৈঃ সমন্বিতম্।
শুশুভে তৎ পুরশ্রেষ্ঠং নাগৈর্ভোগবতী যথা॥
তন্নিবেশ্য ততো বীরো রামেণ সহ কেশবঃ।
যযৌ দ্বারবতীং রাজন্ পাণ্ডবানুমতে তদা॥

আদিপর্ব্ব, ২০৭ অধ্যায়।

দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমস্ত রাজাদিগকে বশে আনয়ন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনের জন্য মূর্ত্তিমান বেদস্বরূপ ঋত্বিক্‌গণকে লইয়া আসেন, এবং তিনি স্বয়ং এই যজ্ঞের ব্রহ্মকার্য্যে দীক্ষিত হন। শিল্পিকারেরা দেবগৃহতুল্য উত্তমোত্তম গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। সমস্ত ব্রাহ্মণ ও রাজগণ নিমন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করেন। হস্তিনাপুর হইতে কৌরবেরা সকলেই সমাগত হন, ব্রাহ্মণগণের ও রাজগণের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন করা হয়। দুর্য্যোধন উপহার প্রতিগ্রহণের এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।* তাহার পর পিতামহ ভীষ্মের উপদেশক্রমে মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অর্ঘ্যপ্রদান করেন। চেদিরাজ শিশুপালের তাহা অসহ্য হওয়ায় তিনি ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণকে যারপরনাই নিন্দা করিয়াছিলেন। অবশেষে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন। তাহার পর নির্ব্বিঘ্নে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রপ্রস্থ পুরাকালে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ ছিল। পরে কৌরবদিগের একটি প্রধান নগর হইয়া উঠে। যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ও মণিময়ী সভাস্থলীতে বিভূষিত হইয়া ইহা যারপর নাই প্রসিদ্ধি লাভ করে। তৎপরে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ইহার গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। যাহা পুরাকালে পবিত্র তীর্থস্বরূপ ছিল, যেখানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেখানে ব্রাহ্মণের পদ প্রক্ষালন করিয়া ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং যেখানে শ্রীকৃষ্ণকেই অর্ঘ্য প্রদান করিয়া তাঁহার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হইয়াছিল, তাহা যে গৌরবে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ফলতঃ তৎকালে ইন্দ্রপ্রস্থের গৌরব সমগ্র ভারতবর্ষেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানের পর হইতেই পাণ্ডবগণের প্রতি কৌরবদিগের ঈর্ষা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। তাহার পর দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বনবাসে ও অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া কৌরবদিগের নিকট পুনর্ব্বার রাজ্য প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

* দুর্য্যোধনস্ত্বর্হণানি প্রতিজগ্রাহ সর্ব্বশঃ। চরণক্ষালনে কৃষ্ণো ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং হ্যভূৎ॥
সভাপর্ব্ব, ৩৫ অধ্যায়।

ইন্দ্রপ্রস্থ।

Mohila Press, Calcutta.

তাহারই ফলে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর অভিনীত হয়। এই সময়ে ভারতের রাজন্যকুল একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যান, এবং তদবধি যে হিন্দুজাতির অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কৌরবেরা কুরুক্ষেত্র-সমরে পরাজিত ও নিহত হইলে সমগ্র কৌরব সাম্রাজ্য পাণ্ডবদিগের অধিকারে আসে, এবং যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরেই রাজধানী স্থাপন করেন।* তাহার পর তথায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়।† কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইন্দ্রপ্রস্থেই অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং দিল্লীর নিগমবোধ ঘাটকে তাহারই স্থানস্বরূপে নির্দ্দেশ করা হয়।‡ কিন্তু মহাভারত পাঠে

* "ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য বিবেশ গজসাহ্বয়ম্।
সমাশ্বাস্য পিতরং প্রজ্ঞাচক্ষুষমীশ্বরম্।
অন্বশাদ্বৈ স ধর্ম্মাত্মা পৃথিবীং ভ্রাতৃভিঃ সহ॥"

আশ্বমেধিক পর্ব্ব, ১৪শ অধ্যায়।

"ততঃ কতিপয়াহস্য ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
আজগাম মহাতেজা নগরং নাগসাহ্বয়ম্॥

* * * *

যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মসুতো ব্যাসং বচনমব্রবীৎ।
ভবৎপ্রসাদাদ্ ভগবন্ যদিদং রত্নমাহৃতম্।
উপযোক্তুং তদিচ্ছামি বাজিমেধে মহাক্রতৌ॥

* * * *

ইত্যুক্তঃ স তু ধর্ম্মাত্মা কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
অশ্বমেধস্য কৌরব্য চকারাহরণে মতিম্॥"

আশ্বমেধিক পর্ব্ব, ৭১ অধ্যায়।

তাহার পর মহাভারতে হস্তিনাপুরেই যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

‡ "The only spot that has any claim to be of the time of Yudhishthira, is the Negambhod Ghat, where Yudhishthira performed the *Hom* after his horse sacrifice."

Hand-book of Bengal Presidency. P. 303.

অবগত হওয়া যায় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তথায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। যুধিষ্ঠির-বংশীয়েরা অনেকদিন পর্য্যন্ত হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করেন। উক্ত বংশীয় রাজা নিচক্ষুর সময় হস্তিনাপুর গঙ্গাগর্ভস্থ হইলে কৌশাম্বীনগরী তাঁহাদের রাজধানী হইয়া উঠে।* ক্ষেমক রাজা হইতে বিশাল কুরু-বংশের অবসান হয়;† যুধিষ্ঠিরের পর হইতে ইন্দ্রপ্রস্থের সহিত কুরুবংশীয়গণের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু সেই মহানগর চিরদিনই যে কৌরব সাম্রাজ্যের একটি প্রধান স্থান বলিয়া কথিত হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"It was here that Yudhisthira is said to have performed horse sacrifice."

Keene's Hand-book for Visitors to Delhi. P. 22.

"অধিসীমকৃষ্ণাৎ নিচক্ষুঃ। যো গঙ্গয়াপহৃতে হস্তিনাপুরে কৌশাম্ব্যাং নিবৎস্যতি।"

বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ২১ অধ্যায়।

"ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো রাজর্ষিসৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ॥"

বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ১২ অধ্যায়।

রোরুদ্যমানা রমণী।

মা'র আগমনে ভা'সে, মধুর আনন্দোচ্ছ্বাসে,
প্রতি গৃহ গ্রাম।
কাঁসী, বাঁশী, ঢাক, ঢোল, বিবিধ বাদ্যের রোল,
হয় অবিরাম॥
এ আনন্দ করি দৃষ্টি, হৃদয়ে পাবক-বৃষ্টি,
ওই বিধবার।
অতীতের কথা স্মরি, নয়নে অশ্রুর বারি,
ঝরে অনিবার॥
প্লাবন-পীড়নে সতী, হারিয়েছে নিজপতি,
প্রবাসে রাখিয়া।
চিতে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে, তাইতো বিরলে কাঁদে,
বিরহে মজিয়া॥
"গত বর্ষ এই দিনে, পতি আসি নিকেতনে,
কতই আদরে।
নূতন ভূষণে, বাসে, আর সুমধুর ভাষে,
তুষিলা আমারে॥
হায়! সে মধুরানন, সুমধুর সম্ভাষণ,
এ বর্ষ কোথায়!
অকালে বন্যার কোলে, সকলি লইল কালে,
হায়! হায়!! হায়!!!"
এ সকল কথা স্মরি, রমণী-নয়ন-বারি,
ঝরে ঝর্ ঝর্।

এলায়িত কেশদাম, নাহিক লাবণ্য-ঠাম,
ধূলিতে ধূসর ॥
মায়েরে কাঁদিতে দেখি, হয় অশ্রু-পূর্ণ আঁখি,
শিশু দুইটির।
মা! মা! রবে কাঁদে তা'রা, "একি শোক দিলে তারা!
অদম্য, গভীর ॥"
এইরূপ কত শত, কাঁদে মাগো অবিরত,
বঙ্গের সন্তান।
স্বামী, পুত্র, ভার্য্যা জন্যে, কেহ না পাইয়ে অন্নে,
ভাসায় বয়ান ॥
আনন্দদায়িনী তারা, আনন্দ-পীযূষ-ধারা,
ঢাল ঘরে ঘরে।
হউক আনন্দময়,— শোক, দুঃখ, তাপ, ভয়,
সব যা'ক্ দূরে ॥
চির শান্তি আনি সঙ্গে, প্রদানি বঙ্গের অঙ্গে,
প্রসীদ জননি!
কৃতী, কর্ম্মী পুত্রগণে, নিয়োজ আর্ত্তের ত্রাণে,
বিপদ-বারিণি ॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

বঙ্গ-ভাষার সম্মান।

—:•:—

আমরা বাঙ্গালী, বঙ্গমাতার ক্রোড়ে আমরা লালিত পালিত, আর বঙ্গভাষাই আমাদের মাতৃ-ভাষা। যে ভাষায় আমরা প্রথমে কথা কহিয়াছি, যে ভাষা শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে আমাদের মর্ম্মস্থল হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে, যে ভাষা ঘরে ও বাহিরে অবিরত ধ্বনিত হইতেছে, তাহা যে আমাদের নিকট কত মধুর ও কত প্রিয়,—সে কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাল্যে যাহার ছড়া ও রূপকথা আমাদিগকে অনেক সময়ে আহার নিদ্রায় বঞ্চিত করিয়াছিল, যৌবনে যাহার কবিতা ও উপন্যাস আমাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রাখিয়াছিল, আর বার্দ্ধক্যে যাহার ভক্তিময়ী গীতমালা ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধনিকর আমাদের হৃদয়ে নানা তুফানের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা যে আমাদের নিকট যারপরনাই আদরের সামগ্রী, সে কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। আমরা চির দিন সেই অমৃতময়ী বঙ্গভাষার পূজা ও সেবা করিতেছি এবং যে সমস্ত প্রতিভাবান পুরুষ তাহাকে উচ্চাসনে বসাইবার জন্য বাণীপূজায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদিকেও যে আমরা সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকি তাহাও মুক্তকণ্ঠে বলিব। বর্ত্তমান সময়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বাণীপূজায় আত্মোৎসর্গ করিয়া বঙ্গ-ভাষায় যে শ্রেষ্ঠাসন রচনা করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বঙ্গবাসীমাত্রেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছে, এবং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনেও ত্রুটি করে নাই। আমরা আমাদের রবীন্দ্রনাথকে এতদিন সম্মানের চক্ষে দেখিয়াছি; কিন্তু তাঁহার প্রতিভা-জলধি অতিক্রম করিয়া দিগ্দিগন্তে ধাবিত হওয়ায় বৈদেশিকগণও তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষারও গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সম্মান যে বঙ্গভাষারই সম্মান, একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ভক্তি-আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ গীতগুলি সম্প্রতি গীতাঞ্জলি নামে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার ইংরাজী অনুবাদ পাশ্চাত্য জগতে এক মহা-তুফানের সৃষ্টি করিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার নরনারী তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। সেই জন্য সুইডেনের ষ্টকহল্‌মস্থ কৃতী পুরুষ নোবেল ভাবপ্রবণ সাহিত্যের জন্য যে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এ বৎসর রবীন্দ্রনাথ সেই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ইউরোপের প্রধান প্রধান বিদ্বান্ পুরুষই উক্ত পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষের ও বঙ্গভাষার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গীত, কবিতা ও রচনা বঙ্গসাহিত্যের নব যুগে অনেকের হৃদয়ে যে তরঙ্গ তুলিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার ব্যক্তিগত মতের সহিত সকলের মতের ঐক্য না থাকিলেও তিনি যে বঙ্গসাহিত্যকে নানাভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি নাই। সেই জন্য তিনি সাধারণের নিকট আদর ও সম্মান পাইয়া আসিতেছেন। আজ তাঁহার সেই গৌরব যে পাশ্চাত্য নরনারীগণের মুখে বিঘোষিত হইতেছে, ইহা যে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের এই সম্মানে বঙ্গভাষা ও ভারতীয় ভাবের যে গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাও বলিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জড়বিজ্ঞানের গৌরবে স্ফীত ইউরোপ ও আমেরিকা ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার রসাস্বাদে যে বঞ্চিত ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির অনুবাদ-পাঠে পাশ্চাত্য জগতে যে নূতন আলোক প্রতিভাত হইতেছে, সেই আলোক যে ভারতবর্ষে চিরপ্রচলিত আছে, ইহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষের এক্ষণে কিছুই নাই;—কিন্তু ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার আলোক এখনও তাহার অন্ধকারের আকাশে বিকাশ পাইতেছে,—তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা হীন হইলেও এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। তাহারই দুই একটি রশ্মি রবীন্দ্রনাথের সহিত পাশ্চাত্য জগতে বিকীর্ণ হইয়া তথাকার বৈদ্যুতিক আলোককে নিষ্প্রভ করিয়া তুলিয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথের এত সম্মান এবং তিনি প্রথমে যাহাতে এই আলোককে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন সেই বঙ্গভাষারও সম্মান

বর্দ্ধিত হইয়াছে। নানা ভাবপূর্ণ পাশ্চাত্য ভাষার নিকট প্রাচ্য ভাষা এতদিন অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। এই প্রাচ্য দেশে বিশেষত নগণ্য বঙ্গদেশে যে একটা ভাষা বা সাহিত্য দিনদিন বর্দ্ধিত হইতেছিল, ইহাও সম্ভবত পাশ্চাত্য নরনারীগণ অবগত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের গীতগুলির অনুবাদে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গভাষা এক্ষণে উপেক্ষার সামাগ্রী নহে। আমরা ত চিরদিনই তাহার পূজা ও সেবা করিয়া আসিয়াছি; এক্ষণে তাহার প্রতি পাশ্চাত্য জগতের স্নেহ-দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে দেখিয়া আমরা যারপরনাই আনন্দিত। রবীন্দ্রনাথের জন্য আমাদের মাতৃভাষার সম্মান বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞ। আর যে পাশ্চাত্য জাতি আজকাল জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের উদারতার প্রশংসা না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া অকৃতজ্ঞতারই পরিচায়ক। যে জাতি জাতিনির্ব্বিশেষে, বর্ণনির্ব্বিশেষে জ্ঞানের আদর করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যে প্রকৃত বিবেকসম্পন্ন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। রবীন্দ্রনাথকে এইরূপ পুরস্কার-প্রদানে তাঁহারা যে নিরপেক্ষতা ও উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়া প্রকৃত জ্ঞানের আদর করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। জ্ঞানের রাজ্যে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ নাই, জাতি ও বর্ণ ব্যক্তিতে আবদ্ধ, —কিন্তু জ্ঞানে নহে, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে সেই সনাতন ধর্ম্ম অনুসরণ করিতে দেখিয়া আমরা যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি।

স্বর্ণ-মৃগ।

—০—

এ দৈন্যের মাঝে মোর এ ক্ষুদ্র কুটীরে
শান্তি-সীতা সমাদরে লভেছিল স্থান;
লক্ষ্মণের মত মোর দিন রাত্রি ধ'রে,
বিবেক প্রহরা দিত প্রহরী-সমান।

অকস্মাৎ বৈভবের স্বর্ণমৃগ এসে'
ভুলাইয়া ল'য়ে গেল দূর বনে কোথা;
মৃগ বিনাশিয়া যবে ফিরিলাম শেষে
জানিলাম হারায়েছি সাধনার সীতা।

শ্রীজীতেন্দ্রনাথ বসু।

ব্রাহ্মণ।

আশা ও জাগরণ।

দুঃখের নিশীথে সুখ-স্বপ্ন-সন্দর্শনে, যেরূপ আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়, হিন্দু-সমাজের এই প্রত্যাসন্ন প্রলয়কালে ব্রাহ্মণ-সমাজের অভ্যুদয়, ততোধিক আশা ও আনন্দের কারণ হইয়াছে। বঙ্গের সমাজে বরেণ্য যে সকল মহাত্মগণ এই কার্য্যের উদ্‌যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক, তাঁহারা অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র।

বড়ই আহ্লাদের বিষয়, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের নিয়ামক নবদ্বীপ-বিদ্বৎ-সমাজের সুধীমণ্ডলীপ্রমুখ বঙ্গীয় অধ্যাপকমণ্ডলী এই ব্রতের উদ্‌যাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ধর্ম্মাচার্য্য পণ্ডিত শশধর, শাস্ত্রপ্রচারক পণ্ডিত পঞ্চানন, সুসঙ্গের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজ কুমুদচন্দ্র, পুণ্যকর্ম্মা রাজা শশিশেখরেশ্বর, পুণ্যশ্লোক ব্রজেন্দ্রকিশোর, মহামনা শৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মগণ ইহাতে মনঃ প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন; তাহাতে কাহার না আশার, আনন্দের সঞ্চার হয়?

পূর্ব্বে এই সভার কার্য্যক্ষেত্র একমাত্র কলিকাতা মহানগরীতেই সীমাবদ্ধ ছিল; এবং তৎসমীপবর্ত্তী কতিপয় ব্রাহ্মণ-সন্তান ইহার অঙ্গীভূত থাকিয়া আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন কিন্তু এই ক্ষণে সমস্ত বঙ্গদেশকেই ইহার কার্য্যক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। বঙ্গের নানাস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ এই শুভানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। বঙ্গের নগরে নগরে শাখা-সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। মাসিক, দৈনিক প্রভৃতি নানাবিধ সংবাদ-পত্রসমূহে ইহার

কার্য্যের বিষয় আলোচিত হইতেছে। ব্রাহ্মণসভার মুখপত্রস্বরূপ 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' নামক মাসিক পত্র নগরে নগরে ঐ সভার উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিতেছে; দেশে দেশে প্রচারক প্রেরিত হইয়া সমাজকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই ভাবে ব্রাহ্মণ-সভার উদ্দেশ্য বিশাল ভারত-বর্ষের হিন্দু-সমাজে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।

বলিতে গেলে এই আমাদের কার্য্যই করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ভাবিতে গেলে এই আমাদের মহাব্রতের শুভ সঙ্কল্পের শুভ লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে। হে ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ! হে সদাশয়সম্পন্ন শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ! এস ভাই, কায়মনঃপ্রাণে এই মহাব্রতে ব্রতী হই। এস ভাই! সমিৎ, পুষ্প, কুশ প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণসংগ্রহের জন্য প্রস্তুত হই। আর ভয় নাই। ঐ দেখ, সমাজ-বরেণ্য মহাত্মগণের দৃষ্টি ফুটিয়াছে; ঐ দেখ, সমাজের বক্ষপ্লাবিত নানাবিধ পাপপ্রবাহের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। আর তোমাদিগকে দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য প্রভৃতি মহাসুরগণ কর্তৃক পীড়িত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য অযাজ্য-যাজন, অব্যবস্থা-দান প্রভৃতি পাপপুরুষের আশ্রয় লইতে হইবে না; আর প্রাণতুল্য পুত্রের বক্ষ হইতে বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে বিদ্যালয়বিশেষে পাঠাইতে হইবে না; আর কন্যা-বিবাহের জন্য পিতাকে জগৎ অন্ধকার দেখিতে হইবে না; আর বৈবাহিকগণের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে না; আর কুল-কুমারীগণকে নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে হইবে না; আর তাহাদিগকে চির কৌমার্য্যের বহ্নিদাহে দগ্ধ হইয়া নৈরাশ্যের সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে না;—সর্ব্বদেশ-বহির্ভূত এবম্বিধ পাপঝটিকা আর সমাজকে আচ্ছন্ন করিবে না।

ঐ দেখ, সমাজের সুসন্তানগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে; সমাজের অকল্যাণকর নানাবিধ অনুষ্ঠানের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বোধ হয়, তাহারা জাগিয়াছে; বোধ হয়, তাহাদের চো'খের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; মুখ, নাসিকা, বক্ষ প্রভৃতি শরীর-প্রদেশের নিদ্রাও ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। নিদ্রা ভাঙ্গিলেই তাহারা উঠিয়া বসিবে, উঠিয়া বসিলেই তাহাদের দুর্দ্দশা তাহারা দেখিতে পাইবে; নিজ নিজ অবস্থা দেখিতে পাইলেই প্রাণপণে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা পাইবে; তাহা হইলেই সমাজের এই মহাব্যাধির প্রতি-কার হইবে। এই পাপ-ব্যাধির প্রতিকার হইলেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবে।

আবার সে দিন আসিবে। আবার সেই মত যজ্ঞানুষ্ঠান হইবে; যজ্ঞীয় ধূম বন-বনভূমি অতিক্রম করিয়া নগরপ্রান্ত পর্য্যন্ত পবিত্র করিবে। আবার সেই মত বেদধ্বনি উত্থিত হইয়া হৃদয়ের স্তরে স্তরে ধর্ম্মের ভাব জাগাইয়া

দিবে। যজ্ঞানুষ্ঠান হইলে সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইবে, সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইলেই পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে। তাহা হইলেই ধরিত্রী আবার স্বীয় স্তন্য দ্বারা স্বীয় সন্তান প্রতিপালন করিতে সমর্থা হইবে।

তাই বলি সকলে আশ্বস্ত হও। এই আমাদের শুভ সময় আসিয়াছে। এই শুভ ক্ষণ ত্যাগ করিও না। আর মোহনিদ্রায় অচেতন থাকিও না; একবার জাগ। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণসন্তানগণ! এক বার জাগ। আমি আজ নবদ্বীপসমাজ-সম্মিলিত ব্রাহ্মণসভার পক্ষ হইতে আহ্বান করিতেছি। ভারতের সমস্ত গ্রাম, নগর, উপনগর হইতে রাজধানীর উচ্চপ্রাসাদবাসি ব্রাহ্মণগণ! (যারা একবাক্যে ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া অভিমান রাখে) সকলে একবার ভাল করিয়া জাগ, একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ, একবার উঠিয়া বস। আত্মধর্ম্মরক্ষার জন্য, জাতিধর্ম্মরক্ষার জন্য, কুলধর্ম্মরক্ষার জন্য, বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষার জন্য একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখ। আত্ম-গৌরবরক্ষার জন্য, আত্মসম্মানরক্ষার জন্য, আত্মসম্ভ্রমরক্ষার জনা, স্বীয় ব্রাহ্মণত্বরক্ষার জনা ভোগবিলাসের মাত্রা একটু হ্রাস করিয়া দাও। অবশ্যই প্রতিকার হইবে, অবশ্যই সুদিন আসিব,—আবার বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবে।

হে ব্রহ্মণ্যদেব! হে ত্রিমূর্ত্তে! তুমি জাগ। তুমি জাগিলেই ব্রাহ্মণ জাগিবে। হে দেব! আর অন্তরের অন্তরালে কত কাল নিদ্রিত থাকিবে, আর ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ কত কাল লুক্কায়িত থাকিবে?

হে ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি প্রাণায়ামের অঙ্গভূত পূরক বায়ুদ্বারা আহৃত হইয়া, নাভিচক্রোপলক্ষিত যন্ত্রসমূহে জাগ, তুমি হৃদয়গহ্বরে সম্পূরিত বায়ুরাশিদ্বারা আহত হইয়া অনাহতচক্রোপলক্ষিত যন্ত্রসমূহে জাগ। হে দেব! তুমি রেচক বায়ুদ্বারা সমাশ্লিষ্ট হইয়া সহস্রারোপলক্ষিত যন্ত্রসমূহে জাগ।

হে ব্রাহ্মণ! তুমি রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ বিভুরূপে নাভিচক্রোপলক্ষিত পাকস্থলী, যকৃৎ, অন্ত্র প্রভৃতি তামস যন্ত্রসমূহে জাগরিত হইয়া তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর; এবং পাকস্থলীতে অন্নপানীয়সমষ্টিকে দেহের কল্যাণকর রস, রুধিররূপে পরিণত করিয়া দেও। হে দেব! তুমি নীলোৎপলদলে শ্যামলরূপে অনাহতচক্রোপলক্ষিত হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি রাজস যন্ত্রসমূহে জাগরিত হইয়া প্রাণন ক্রিয়া দ্বারা শিরায় শিরায় রুধিররাশিকে প্রবাহিত করিয়া দেও এবং তাহার বিশুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা যাবতীয় শারীর ব্যাধি হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। আর এই সকল যন্ত্রের পরিপুষ্টি সাধন দ্বারা আমাদের আয়ু এবং বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি করিয়া দেও। তুমি আমাদের মস্তকস্থলস্থিত যন্ত্রসমূহে জাগরিত হইয়া রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ প্রভৃতি পাপপুরুষদিগকে সংহার কর। তুমি আমাদের সহস্রারের সহস্র সহস্র শিরাপথে ধাবিত হইয়া আমাদের বাঙ্মনশ্চক্ষুশ্রোত্রাদিকে সুপথে

পরিচালিত করিয়া দেও। তুমি সেই ব্রহ্মরন্ধ্রে পথটি দেখাইয়া দেও। আমরা ঐ পথে যাইতে চাহি না, প্রকৃত ব্রহ্মভাব পাইতে চাহি না, প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে চাহি না, আমরা ঐ পথের পথিকহইতে চাহি না, কেবল পথটি দেখিয়া রাখিতে চাই, পথের আবর্জ্জনা দূর করিতে চাই, সেই অত্যুচ্চ পথের সোপানে উঠিবার ক্ষমতা আমরা চাই, আমরা মনুষ্য-পদবাচ্য হইতে চাই, নিজ নিজ প্রেতপৈশাচত্ব দূর করিতে চাই, আমরা প্রকৃত মানুষ হইতে চাই।

তাই প্রার্থনা,— তুমি জাগ। আমাদের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, প্রত্যেক মাংসপেশীতে,প্রত্যেক রুধিরকণায়, প্রত্যেক স্বগস্থিমজ্জাসমূহে জাগ। তুমি আমাদের প্রাণে প্রাণে,আমাদের মনে মনে,প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয়ে,প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয়ে জাগ। আমাদের শরীর-সন্নিবিষ্ট স্থূল সূক্ষ্ম ভূতসমূহে জাগ; তুমি সর্ব্ব ভূতে সর্ব্ব স্থাবর জঙ্গমে জাগ; আর কত কাল নিদ্রিত থাকিবে? এ অনন্ত জীব-শয্যায় আর কত কাল শয়ান থাকিবে? এক বার জাগ! তুমি জাগিলেই ব্রাহ্মণ জাগিবে, ব্রাহ্মণ জাগিলেই ধর্ম্ম জাগিবে, ধর্ম্ম জাগিলেই জাতিধর্ম্ম জাগিবে, জাতিধর্ম্ম জাগিলেই আশ্রমধর্ম্ম জাগিবে, আশ্রমধর্ম্ম জাগিলেই কর্ম্মানুষ্ঠান হইবে; ব্রাহ্মণগণ আবার ব্রাহ্মণ হইবে। আবার যজ্ঞানুষ্ঠান হইবে; শান্তিময় তপোবন হইতে যজ্ঞীয় ধূমরাশি উত্থিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী শান্তিময় এবং পবিত্র করিবে। ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি।

শ্রীরেবতীকান্ত তর্কপঞ্চানন।

প্রচারক, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ।

বঙ্গে কৃষি।

স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে বঙ্গভূমিই অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা কৃষিসম্পদে সমধিক পরিপুষ্ট। ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী কমলা বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীতে অচলা হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া প্রায় সকলেরই ধারণা;—ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "বঙ্গভূমি প্রকৃতি দেবীর অভিনব লীলা-নিকেতন।" যখন নদীতীরস্থ নানাবিধ শস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্ররাশি নয়নপথের পথিক হয়, তখন মনে হয় প্রকৃতিমাতা যেন তাঁহার নিজের সমস্ত ধন-ভাণ্ডার বঙ্গ-সন্তানসন্ততির জন্যই উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্র নদী-মাতৃগণের স্নেহসম্ভারে পরিপুষ্ট ও পলিমৃত্তিকাপাতে অত্যধিক উর্ব্বরতা

শক্তি ধারণ করিয়া নিয়ত সুফল প্রসব করিতেছে। অন্যান্য প্রদেশের অনুপাতে বঙ্গভূমি সমধিক শস্যপ্রসূ বলিয়া বঙ্গবাসীরা সহস্র দীনতা সত্ত্বেও এই গর্ব্বটুকু অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত বঙ্গসন্তানগণের উপেক্ষায় এই সামান্য গর্ব্বটুকুরও ক্রমশঃ অবসান হইতে চলিল;—ইহা বাস্তবিকই বঙ্গমাতার শিক্ষিত সুসন্তানগণের পক্ষে দুঃখের ও ক্ষোভের কারণ হইবে, সন্দেহ নাই।

কৃষিই বঙ্গবাসীর একমাত্র সম্বল ও প্রধান উপজীবিকা এবং কৃষিক্ষেত্রই একমাত্র মূলধন। আদমসুমারির ফলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গবাসীর প্রাণ কৃষিগত এবং অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃষক। ৩ কোটী ৫২ লক্ষ লোক অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গদেশের লোক কৃষির উপর নির্ভর করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ লোক সাধারণ কৃষিজীবী এবং প্রায় ৩৩ লক্ষ লোক ক্ষেত্রে কার্য্য করে। তাহারা "চাষা" নামে অভিহিত; যাঁহারা জমীর উপস্বত্ব ভোগ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের সংখ্যা শতকরা ৮ জনমাত্র। প্রচুর জায়গা জমী থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা নিজে চাষ করিয়া থাকেন তাঁহাদের সংখ্যাও শতকরা ১০ জনের কম নহে।

দীন জীবনের চরম সম্বল এই গর্ব্বটুকুর উপর নির্ভর করিয়াই বঙ্গমাতা সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তথাপি তদীয় উচ্চশিক্ষিত সন্তানগণের মধ্যে অনেকেই উন্নতির পরিচায়ক এই কৃষিকার্য্যের নাম শুনিলে মুখ ফিরাইয়া থাকেন, এবং মনে করেন, যদি তাঁহারা কৃষিকার্য্যে সংশ্লিষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হইবে ও শস্যোৎপাদনকারী অক্লান্তকর্ম্মা হলচালক কৃষিদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকেও নগণ্য কৃষক সাজিতে হইবে! প্রখরমার্ত্তণ্ডতাপে মলিন হইয়া, বরিষার মুষলধারা সহ্য করিয়া, অনশনে, বস্ত্রাভাবে ও নানাপ্রকার রোগে শোকে প্রপীড়িত হইয়া বঙ্গীয় দুর্ব্বল কৃষীবল স্ত্রীপুত্রপরিজন সমভিব্যাহারে সংসারে গ্রাসাচ্ছাদননির্ব্বাহার্থ সমস্ত দিবস ব্যাপিয়া ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করিতেছে; আর শিক্ষিত যুবকবৃন্দ তাহাদিগকে দেখিয়া অট্টহাস্য করিতেছেন ও তাহাদিগের সেই অক্লান্ত পরিশ্রমকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিতেছেন! কিন্তু তাঁহারা ইহা ভ্রমেও ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহাদের সেই উচ্চশিক্ষা, সম্মান, প্রতিপত্তি সমস্তই বঙ্গীয় দুর্ব্বল হলচালক কৃষকদিগের অজস্র শোণিতপাতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

সম্প্রতি দেশহিতৈষী কতিপয় সুধীবৃন্দের সমবেত চেষ্টা ও যত্নে, বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভদ্র-পরিবার কৃষির প্রতি একটু আধটু আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। কৃষিবিষয়ক নূতন নূতন পুস্তক-প্রচারে, বঙ্গসাহিত্যে কৃষিসম্বন্ধীয়

বহুসংখ্যক মাসিক পত্রিকার আবির্ভাবে, ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কৃষি-সম্বন্ধীয় কার্য্য-প্রণালী পর্য্যালোচনায় পূর্ব্বাপেক্ষা বঙ্গবাসীর মধ্যে অনেকেই কৃষিকার্য্যের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। অশিক্ষিত কৃষকদিগের হৃদয়ে শিক্ষার বীজবপন করিয়া পাশ্চাত্য কৃষিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী-প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহাদিগকে কৃষি-কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য বঙ্গমাতার মুখোজ্জলকারী কৃতবিদ্য সুসন্তানগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য বঙ্গের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, শিক্ষার দ্বারা নিত্য নূতন নূতন নিয়ম অনুসরণ করিবার জন্য বঙ্গীয় কৃষকদিগকে উপদেশ দেওয়া তাঁহাদের চিরপ্রচলিত ভদ্রতা ও সম্মান-বিনাশের আশঙ্কার কারণ বই আর কিছুই নহে! প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের এই দুর্দ্দমনীয় ঈর্ষা অতীব লজ্জাজনক ও ঘৃণার বিষয়। তাঁহারা ভাবেন, যদি অশিক্ষিত কৃষকদিগের হৃদয় শিক্ষার বিমল আলোকে উদ্ভাসিত হয়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী যুবকবৃন্দের পিতামাতার শোণিতকল্প, অর্থব্যয়লব্ধ ও বহুকষ্টোপার্জ্জিত সনন্দলাভের সম্মান আর থাকিবে না। সকলেরই সমান আদর প্রতিপত্তি হইবে, উচ্চ নীচের প্রভেদ ঘুচিয়া যাইবে। উচ্চ ও নীচ-বংশ-সম্ভূত সকলেই বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উপাধি লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িবে ও সমান প্রতিযোগিতা করিতে অগ্রসর হইবে;—সরকারী, বেসরকারী সমস্ত চাকরীরই অভাব হইবে। এরূপ অবস্থা দাঁড়াইলে শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে ও তাহাদের এক বেলা অন্ন জুটাও ভার হইয়া পড়িবে। পরিণতবয়স্ক শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণের এরূপ অপরিপক্ক ধারণা যে কি পর্য্যন্ত লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় তাহা সকলেই একবার ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। যৌবনের আরম্ভাবস্থা হইতেই যাঁহারা সরকারী চাকরীর প্রসাদে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিবেন ও সম্মানযোগ্য হইবেন,—এই আশা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি ধারণ করিয়াছেন, প্রায়শই কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রেই অশ্রুসংবরণ করিতে পারি-তেছেন না। ফলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই কষ্টোপার্জ্জিত উপাধিলাভ অবশেষে তাঁহাদের চিরব্যাধিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মহামান্য গবর্ণমেণ্ট এখন চাকরী সম্বন্ধে যেরূপ কঠোর বিধি বদ্ধ করিতে-ছেন, তাহাতে যে বাঙ্গালীরা সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যে পূর্ব্বের ন্যায় প্রবেশা-ধিকার লাভ করিতে পারিবে, ইহা কোন প্রকারেই আশা করা যায় না। চাকরীর অনুপাতে চাকরীজীবীর সংখ্যা প্রায় চতুর্গুণ। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় সকলেই চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া

আছেন। হয়ত পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতির ফলে কেহ কেহ প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া নিজকে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতেছেন, আর কেহ কেহ বিধাতা বিমুখ হইলেন বলিয়া নৈরাশ্য-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন। আবার যাঁহারা চাকরী করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যেও আশানুরূপ সুখশান্তি কুত্রাপি দেখা যাইতেছে না। মাসান্তে বেতনরূপে যাহা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহাতে সংসারের সমস্ত ব্যয়সঙ্কুলন সম্পূর্ণরূপে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ আবার নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী বেতনের সংখ্যা নিতান্ত কম বলিয়া দিবানিশি ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন,—এই ত গেল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা!

এখন পল্লীগ্রামে পর্ণকুটীরবাসী কৃষকগণ বা শ্রমজীবিগণের অবস্থা এক বার ভাবিয়া দেখুন। তাহাদের অবস্থাও দিন দিন মন্দ হইতে মন্দতর হইতে চলিয়াছে। প্রথমতঃ তাহারা উদর পূরিয়া দুই বেলা খাইতে পাইতেছে না; প্রায়ই তাহাদিগকে অনশনে কালযাপন করিতে হয়; তাহার উপর ম্যালেরিয়া ও মহামারীর পূর্ণ প্রকোপ, নির্ম্মল পানীয় জলের অভাব ও নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়া তাহারা একেবারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। শরীরে পূর্ব্বের ন্যায় শক্তি সামর্থ্য নাই,—সেই অদম্য উৎসাহও নাই: অন্নাভাবে উৎসাহ উদ্যম সমস্তই ক্রমে ক্রমে লয় পাইতেছে। অন্য পক্ষে গো-মহিষাদি গৃহপালিত জন্তুর উপযুক্ত খাদ্য যোগাইতে পারিতেছে না বলিয়া উহারা লাঙ্গল টানিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। কৃষির উপযোগী ক্ষেত্রসমূহ উপযুক্ত কর্ষণাভাবে দিন দিন উৎপাদিকা শক্তি হারাইতেছে। ৩।৪ অঙ্গুলিমাত্র কর্ষণে ক্ষেত্রসমূহ বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ উপযুক্ত পরিমাণ সুফল প্রসব করিতে কিছুতেই সমর্থ হইতেছে না। পরন্তু এই দুরূহ ব্যাপারের সমাধান করা অন্নবস্ত্রাভাবে জীর্ণ শীর্ণ দুর্ব্বল কৃষকসমূহেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। এখনও বঙ্গের অনেক স্থানে দেখা যায় লক্ষ লক্ষ বিঘা আবাদোপযোগী ক্ষেত্র পতিত রহিয়াছে এবং অনাবাদীও কত লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি পড়িয়া রহিয়াছে! খাদ্য দ্রব্য দিন দিন দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ার ইহাও একটী মূল কারণ। যে সমস্ত ক্ষেত্র কর্ষিত হয় তাহাও আবার মধ্যে মধ্যে বন্যার করাল কবলে পড়িয়া ভাসিয়া যায়। তখন পল্লীগ্রামের চিত্র বড়ই ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়। চতুর্দ্দিকে হাহাকার ও আর্ত্তনাদ উঠে; দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর তাণ্ডবনৃত্য সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়;—পল্লীগ্রামের এই সমস্ত শোচনীয় দৃশ্যের কথা স্মরণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

পূর্ব্বকালের অবস্থার তুলনায় বঙ্গদেশের আধুনিক অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রবলপ্রতাপান্বিত মোগল সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকালে বঙ্গের সর্ব্বত্র টাকায় ৮।১০ মন করিয়া চাউল পাওয়া যাইত; কোন প্রকার খাদ্য

দ্রব্যের অভাব ছিল না। মূল্যও সুলভ ছিল। প্রত্যেক নরনারী উদর পূরিয়া দুই বেলা খাইতে পাইত। আর এখন চাউলের মন ৭৷৮ টাকায়ও সর্ব্বত্র মিলিতেছে না; খাদ্যদ্রব্য ও দুর্ম্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য। তখন প্রত্যেক পল্লীবাসীর গৃহ ধন-ধান্যে পূর্ণ থাকিত, পুষ্করিণী ভরা মৎস্য থাকিত, বাগানে আম, কাঁটাল, কলা, লিচু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে থাকিত, দুগ্ধবতী গাভী থাকিত, ঘরের দ্বারে লাউ, কুমড়া, সিম প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলিত, কাহাকেও জীবিকা-নির্ব্বাহার্থে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। আবার বাঙ্গালাদেশকে পূর্ব্বের ন্যায় সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ দেখিতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে কৃষিকার্য্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ব্যয়বাহুল্যবশতঃ ও নানাবিধ কারণে সকলেরই ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু সকলেরই ইহা মনে করা উচিত যে, ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে নাই। পরন্তু কি ধনী, কি নির্ধন সকলেরই দুই বেলা পেট পূরিয়া খাইতে হইবে। সুতরাং বিঘাপ্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন করা আবশ্যক। কাজেই কৃষি-সাহিত্যের যাহাতে পুষ্টিসাধন হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এখনকার শিক্ষিত যুবক-বৃন্দ মাতৃভূমির উপকার করিতে অগ্রসর হইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যাহাতে সুযশ অর্জ্জন করিতে পারা যায় তাহারই চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। অনর্থক নামের বোঝা বহিয়া চলিলে কিছুই হইবে না; কাজে স্বদেশী সাজিতে হইবে; পূর্ব্বের ন্যায় দেশে ধান, পাট, আহার্য্যোপযোগী ও ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য উৎপন্ন করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখুন অন্যান্য সভ্য দেশের কৃষকদিগের ন্যায় বঙ্গীয় কৃষীবল পানাসক্ত বা অমিতব্যয়ী নহে, তবুও তাহাদের অন্নকষ্ট ঘুচিতেছে না,—ইহার মূলে কেবল দেশীয় শিক্ষিত ও ধনকুবেরদিগের সাহায্য-সহানুভূতির অভাবই বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব সকলেরই তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে, এবং দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই চাষ আবাদ করিবার জন্য উন্নত প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে। সকলের হৃদয়ে শিক্ষার বীজ বপন করা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে পরিণতবয়স্ক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নাসিকা-কুঞ্চন বাস্তবিকই ঘৃণার বিষয়। বিনা পরিশ্রমে কাহারও অন্ন জুটিবে না ইহা ধ্রুব সত্য; পরন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় ও শ্রমজীবির মধ্যে গণ্য, ইহা বিজ্ঞমাত্রেই স্বীকার করিবেন। ভদ্রসন্তানগণ লেখা পড়া শিক্ষা করিবার একমাত্র অধিকারী, আর দরিদ্র শ্রমজীবিগণ ইহা হইতে বঞ্চিত হইবে, এরূপ ধারণা কিছুতেই মঙ্গলকর নহে। যাঁহারা এরূপ ধারণাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্যপদবাচ্য নহেন। যাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে

[illegible]

[illegible] কালযাপন করিতে হয়, সূর্য্যের প্রখরতা ও বৃষ্টির মুষলধারা সহ্য করিতে হয়, তাহাদিগের অবস্থা-পরিবর্ত্তন করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষার [illegible] নানাবিধ কণ্টক-রোপণ করা, অযথা হিংসা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা সভ্য সমাজের অভিপ্রেত নহে এবং দেশের ও দশের অবনতির প্রধানতম কারণ।

বাঙ্গালার ভবিষ্য ভরসাস্থল হে যুবকবৃন্দ! যদি আপনারা দেশের ও দশের দুঃখ দৈন্য ঘুচাইতে ইচ্ছা করেন, তবে এই দুর্দ্দশার অপনোদন-মানসে অগ্রসর হউন; দেশের শত শত দীন দুঃখী কৃষকমণ্ডলীর সহায় ও পৃষ্ঠপোষক হউন। অন্নবস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া তাহাদের দুর্ব্বল শরীর সবল করিতে সচেষ্ট হউন। ক্ষেত্রে গিয়া তাহাদিগকে কৃষিসম্বন্ধীয় যথাসম্ভব উপদেশ দিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আশার সঞ্চার করুন। “চাষার সঙ্গে গেলে চাষা হইতে হইবে”—এই মিথ্যা অভিমান ও ভুল বিশ্বাস ত্যাগ করিতে শিখুন। স্থানে স্থানে অনাবাদী যে সকল পতিত জমি দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহা আবাদ করিয়া প্রচুর শস্য উৎপাদন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন; সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহের পথ পরিষ্কার করিয়া লউন। যদি আপনারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে অভিলাষ করেন তাহা হইলে এই শুভ কার্য্যে সত্বরই অগ্রসর হউন। আপনাদিগের সমবেত চেষ্টা ও যত্নের বলে দেশহিতে অক্লান্তকর্ম্মা বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ ও করুণানিদান ভগবান আপনাদিগের এই শুভ কার্য্যে নিশ্চয়ই সহায় হইবেন।

শ্রীচন্দ্রকুমার সেন।

শ্রীগুরবে নমঃ।

১ম খণ্ড। } [illegible] ১৩২০ { [illegible] সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

লেখকগণের নাম।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীরেবতীরমণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগুরুদাস সান্ন্যাল, শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য।০ চারি [illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা শাশ্বতীর মূল্য প্রদান না করিয়াছেন, অগ্রহায়ণ সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভি পিতে পাঠান হইবে। তবে কেহ অন্য মাসে ভি, পি করিতে বলিলে আমরা তাহাও করিতে পারি। গ্রাহকগণের কোন পত্র না পাইলে অগ্রহায়ণ মাসেই ভি পি করিব। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

নিয়মাবলী।

—:০:—

সাহিত্যে দেশীয় ভাববিকাশই শাশ্বতীর উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কোন লেখক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে পারেন। নবীন লেখকগণের প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

শাশ্বতীর জন্য প্রবন্ধাদি ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি এবং চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এথোড়া পোঃ ভায়া সীতারামপুর ই, আই, রেলওয়ে ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য

এথোড়া (Ethora) পোঃ ভায়া সীতারামপুর, ই, আই, রেলওয়ে।	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কার্য্যাধ্যক্ষ।

———

শ্রীগুরবে নমঃ।

শাশ্বতী, ১ম খণ্ড। পৌষ, ১৩২০। ৯ম সংখ্যা।

মধ্যাহ্নে কালীদর্শন।

কোটি গ্রহোজ্জ্বল বিশ্বে, মধ্যাহ্নে জননি!
কনক-কমল-সৃষ্টি ঝলসে কিরণে;
সবিতা-সেবিতা যেন সুর-চন্দ্রাননী,
কুসুম-কুন্তলা পৃথ্বী সুচারু যৌবনে।
উড়িয়া হিরণ্য ঘটে তুমি হিরণ্ময়ি!
বিরাজ সহস্র দলে রাজ-রাজেশ্বরী!
রম্য হেমকান্তি রূপ রক্তরাগময়ী,
রহেছে ফুটিয়া হরনাভি-পদ্মোপরি।
সূর্য্যবিম্ব মাখি রঙ্গে হেমাঙ্গ-সৌরভে,
হসিত অতসী, চাঁপা ও বর বরণে;
মহালক্ষ্মী ত্রিদিবের ঐশ্বর্য্য-গৌরবে,
তৃপ্ত কর জীবতৃষা অমৃত-বর্ষণে।
উর্দ্ধে স্বর্ণরশ্মি-শিরে ছটা বিমোহিনী,
মধ্যাহ্নে কালিকা-মূর্ত্তি আলোকরূপিণী।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

কালিকাতত্ত্ব।

আর্য্যজাতির পরমারাধ্য মহামহাবিদ্যা কালিকাদেবীর তত্ত্বসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক হইয়াছে। সর্ব্ববেদপ্রসিদ্ধ, আগম নিগমাদি সর্ব্বতন্ত্রে প্রকাশিত, মার্কণ্ডেয় পুরাণাদি দ্বারা প্রতিধ্বনিত, এবং যাবৎ আর্য্য-দেশের শ্রুতিদর্শনাদির তত্ত্বাভিজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় জ্ঞানিকুলচূড়ামণি পরমধর্ম্ম-পরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক চিরারাধিত কালিকাদেবী, আজকাল নানা প্রকারে বিড়ম্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। যাঁহারা কস্মিন্ কালেও কালিকাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্বচক্ষে অবলোকন করেন নাই, বা তাঁহার কোন কথাবার্ত্তা শুনেন নাই, তাঁহাদের ত কথাই নাই, আর্য্যাবর্ত্তের রুধির হইতে উৎপন্ন, আর্য্যনামে পরিচিত এক শ্রেণীর মানবগণের মধ্যেও কালিকাদেবীর বিড়ম্বনার ইয়ত্তা নাই। কেবল কালিকা নহেন, তারা প্রভৃতি অন্যান্য মহামহাবিদ্যা, মহাবিদ্যা ও তদন্তর্গত মাতৃকাগণও তাঁহাদের নিকট নিতান্ত ঘৃণাস্পদ বিষয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ করেন, কালী তারা প্রভৃতির সহিত ঈশ্বরতত্ত্বের কোনরূপ সম্পর্কই নাই। উহা ভূত প্রেত জাতীয় কতকগুলি প্রাণী বিশেষ (evil spirit) এবং তাদৃশ প্রকৃতিসম্পন্ন মানবগণেরই উহারা আরাধ্য দেবতা। আবার অনেকে বলেন যে, তাদৃশ ভূত প্রেত কেহ দেখেনও নাই এবং তাহা নাইও। উহা অনার্য্য-প্রকৃতি-সম্পন্ন মানবদিগের মনঃপরিকল্পিত ঈশ্বর। প্রকৃতপক্ষে ঐমত ঈশ্বরও নাই, ভূত প্রেতও নাই। রবক্রান্ত আফ্রিকা, নাগাপর্ব্বত এবং ত্রিপুরা পর্ব্বতের কোন কোন অংশে লজ্জাদি বিবর্জ্জিত কৃষ্ণবর্ণ অতি ভীষণ আকার বিশিষ্ট আমমাংসভোজী রুধিরপায়ী অনেক প্রকার রাক্ষসগণ বাস করে। তাহাদের মধ্যে যে সকল স্ত্রী পুরুষ অত্যন্ত বলীয়সী বা বলবান, তাঁহারাই প্রভু প্রভ্বী পদে অভিষিক্ত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক এক সমাজ তাহাদের অধীন থাকে, তাহাদের অনুগত থাকে, এবং তাহাদের পরিচর্য্যা ও সেবা শুশ্রূষাদিও করে। এই দৃষ্ট প্রভু প্রভ্বী ব্যতীত সে সকল জঙ্গল মধ্যে এক একটা অদৃষ্ট প্রভ্বী প্রভুও তাহারা বিশ্বাস করে এবং তাহাদের দৃষ্ট প্রভু বা প্রভ্বীর দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহারা অদৃষ্ট প্রভু প্রভ্বীর

আকার কল্পনা করিয়া শূকর কুক্কুট মানুষ গরু প্রভৃতির রুধির মাংসাদি দ্বারা কোন এক বৃক্ষমূলাদির আগমনে সেই কল্পিত দেবতার আরাধনাদি করে। কালে সেই কল্পনাই অজ্ঞতাদির সাহায্যে এই উচ্চ সমাজে আসিয়া আস্পদ করিয়াছে। সেই সকল দেবতাই কালী তারা মহাকালাদি নামে খ্যাত হইয়াছে। আবার কতকগুলি লোকে অন্যরূপ মনে করেন। উঁহারা ঐরূপ দৃশ্যানুসারে পরিকল্পিত অদৃশ্য কোন কিছু নহে। সেই প্রভু প্রভ্বী-ভাবাপন্ন দৃশ্য রাক্ষস রাক্ষসীগণেরই প্রতিমূর্ত্তির আরাধনা করা হয় মাত্র। ঐরূপ কল্পয়িতৃগণও এই ভারতবর্ষের ভদ্রলোক বা শিক্ষিত নামধারী ভারতবর্ষেরই প্রাণবায়ু (usbh us) ধ্বংসকারী প্রাণীবিশেষ। আবার যাঁহারা একটু অধিকতর দয়ালু তাঁহারা কালী তারা প্রভৃতিকে তাদৃশ অসভ্য মানুষ রাক্ষস বা ভূত-প্রেত বলিয়া তিরস্কার করিতে কুণ্ঠিত। তাঁহাদের মতে উহারা দেবতারই অন্তর্গত ; কিন্তু অত্যন্ত তমোগুণপ্রধান বলিয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর দেবতা। তদপেক্ষাও যাঁহাদের কৃপালুহৃদয়, তাঁহারা বলেন কালী তারা ও কাল প্রভৃতি দেবতার আকার প্রকারাদি তমোগুণভাবের প্রকাশ হইলেও ইহাঁরা পরম বৈষ্ণব বৈষ্ণবী। বিষ্ণুর আজ্ঞাকারিণী মহামায়া, কালী তারা প্রভৃতিরই নামান্তর। যখন বৈষ্ণব বৈষ্ণবী তখন ইহাদিগকে নিতান্ত তামস তামসী বলা যায় না।—ইত্যাদি আরও অনেক প্রকার কালী তারাদি সম্বন্ধে প্রলাপ বিলাপ চলিতেছে ; অথচ ভারতবর্ষের দশ দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বেদাদি-শাস্ত্রপারদর্শী মূর্ত্তিমান জ্ঞানবৈরাগ্যস্বরূপ মহাযশাঃ মহাতপা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অধিকাংশেরই এই কালিকা প্রভৃতি মহামহাবিদ্যা মহাবিদ্যা হৃদয়-সর্ব্বস্ব উপাস্য দেবতা। ইহা চিরকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং এখনও চলিতেছে। প্রথমে এই বঙ্গবিভাগের প্রতি দৃষ্টি করুন দেখিবেন, পশ্চিমে বাঁকুরা বীরভূম মালদহ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত, আর দক্ষিণে নোয়াখালি, বরিশাল, খুলনা, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর হইতে, উত্তরে দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর পর্য্যন্ত, এখনও যত ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে মহাবিদ্যার উপাসকের সংখ্যা এত অধিক যে, কোন কোন জেলাতে মহাবিদ্যার উপাসক ভিন্ন ব্রাহ্মণের সংখ্যা অঙ্গুলীর দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়। যে বংশে মধুসূদন সরস্বতী, কৃষ্ণচৈতন্য, পুরন্দরাচার্য্য,

রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি ভূরি ভূরি মহামহোপাধ্যায়, মহাতপা, মহাপুরুষগণের আবির্ভাব, সেই পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর মধ্যে আজও মহাবিদ্যার উপাসক ব্যতীত দশ পাঁচটী লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকার শীর্ষস্থান বিক্রমপুর, প্রভৃতি স্থানে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে, যে সকল অসংখ্য কুলশিরোমণি ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহাবিদ্যার উপাসক ব্যতীত কেহ আছেন কিনা তাহা বলিতে পারি না। নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ প্রভৃতির কথা বলাই বাহুল্য। এ সকল স্থলে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতীব অল্প, কিন্তু মহাবিদ্যা-আরাধকের সংখ্যা তত অল্প নহে।

নদীয়া, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর ও হুগলীজেলায় মধ্যে মধ্যে মহাবিদ্যার উপাসক ভিন্ন, দেখিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান বাঁকুড়া মানভূম বীরভূম মুর্শিদাবাদ এ সকল জেলাও প্রায় তদ্রূপই। উত্তরবঙ্গের চার পাঁচটী জেলাতে ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিতান্তই ন্যূন। এমন কি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ একত্র করিয়া গণনা করিলে যশোহরের লক্ষ্মীপাশা প্রভৃতি, ফরিদপুরের আমগ্রাম প্রভৃতি, বিক্রমপুরের ইছাপুরা প্রভৃতি দুই একখানি গ্রামের সমসংখ্য হইবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য তাহার মধ্যে মহাবিদ্যার উপাসক বোধ হয় অর্দ্ধাংশের অধিক হইবে না। এইত হইল বঙ্গের অবস্থা।

বেহারের মধ্যেও তাহার মুকুটমণি মিথিলাখণ্ডে, যত পণ্ডিতকুলধুরন্ধর আছেন তাহার প্রায় অংশই মহাবিদ্যার সেবক। অন্যান্য জেলাতে দীক্ষা শিক্ষার বিষয় তত প্রচলিত নাই। সন্ধ্যাবন্দনাদিও এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। কাজেই শাক্তশৈবাদির কোন লক্ষণও প্রায় নাই বলিলেই হয়। তথাপি তাহার মধ্যে মহাবিদ্যার উপাসকের সংখ্যাই অধিক দেখা যায়। উড়িষ্যারও প্রায় সেইরূপ দশাই। ভারতের অন্যান্য বিভাগের ব্রাহ্মণগণের তত্ত্বান্বেষণ করিলেও যে যে স্থানে দীক্ষা প্রচলিত আছে, সেই স্থানে, মহা-বিদ্যার উপাসকের সংখ্যাই মোটের উপর অধিক বলিয়া অনুমিত হয়। অতএব এক কথায় বলিলে মহাবিদ্যাকে ব্রাহ্মণগণের দেবতা বা তাহাদের হৃদয়সর্ব্বস্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গলাতে ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী ভদ্রজাতির মধ্যে কায়স্থ এবং বৈদ্য; তাহাদের মধ্যেও ব্রাহ্মণের অনুপাতেই প্রায় পৃথক পৃথক উপাসক সংখ্যা ধরা যাইতে পারে। কিন্তু মহামহাবিদ্যা বা ষোড়শী প্রভৃতি মহাবিদ্যার উপাসক তাঁহাদের মধ্যে একেবারেই বিরল। উহা কেবল ব্রাহ্মণগণেরই নিজস্ব বস্তু। বৈদ্যকায়স্থের মধ্যে যে দুই একজন মহাবিদ্যার সেবক আছেন তাহা নিয়মভঙ্গের আদর্শমাত্র। কারণ শাস্ত্রেও মহামহাবিদ্যা, বা মহাবিদ্যা অব্রাহ্মণ বা শূদ্রধর্ম্মী কোনও ব্যক্তিকে দিতে নিষেধ আছে। তৎপর কৃপণ শঠ বঞ্চক খল অজ্ঞান লোক এবং তাদৃশ স্বভাববিশিষ্ট কোন জাতিকেও মহাবিদ্যা প্রদান করা অত্যন্ত নিষিদ্ধ। এ কারণে মহাবিদ্যা বা মহামহাবিদ্যা অন্য জাতির উপাসনাধিকারের দূরবর্ত্তী। কাযেই মহাবিদ্যা বা মহামহাবিদ্যা ব্রাহ্মণ জাতিরই নিজস্ব। সেই মহাবিদ্যা গণনার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই কালী নামটী উল্লিখিত আছে, "কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা, বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা, এতাদশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ মুণ্ডমালা তন্ত্র।" এস্থলে পরে আবার মহাবিদ্যা উল্লেখ থাকায় দ্বিরুক্তি দোষ নিবারণের জন্য কালী তারা কথাটীর পরবর্ত্তী মহাশব্দটী শেষোক্ত মহাশব্দের সঙ্গে যোগ করিয়া অর্থাৎ শেষোক্ত মহাশব্দ পূর্ব্বোক্ত মহাশব্দের বিশেষণরূপে যোগ করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে। এ কারণে কালিকা আর তারা মহামহাবিদ্যা নামে কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন; আর ষোড়শীপ্রমুখ বিদ্যা কেবল মহাবিদ্যা নামেই উল্লিখিত হন। অতএব পৃথিবীর অন্ততঃ ভারতবর্ষের সমস্ত মানবজাতির সর্ব্বধর্ম্মের বিধানকর্ত্তা, সর্ব্বকর্ম্মের ব্যবস্থাপক, সর্ব্বাচারের শিক্ষক, সর্ব্বজ্ঞানের গুরু, যাবৎ পুরাণ, যাবৎ ধর্ম্মসংহিতা, যাবৎ প্রকার শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি যাবৎ প্রকার অঙ্গোপাঙ্গসম্বলিত, ভূতবিদ্যা, প্রেতবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, মনোবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ঈশ্বর-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্বে ও সৃষ্টিস্থিতি লয়াদিতত্ত্বে পরিপূর্ণ সেই অলৌকিক ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ববেদের ঋষি যাবৎ জ্ঞানের মাধ্যন্দিন ভাস্কর, অন্ততঃ ভারতীয় মানবগণের চূড়ামণি, ব্রাহ্মণজাতির নিজস্ব উপাস্য দেবতা সেই মহামহাবিদ্যা কালী তারাদি দেবতার সহিত ঈশ্বর-তত্ত্বের

কোনও সম্বন্ধ নাই, কিংবা তাহা ভূত প্রেত বা অসভ্য মানব কিংবা কাহারও সেবিকা স্থানীয় হইবেন, এইরূপ বিশ্বাস যাহাদের মনে স্থান পাইতে পারে, তাহারাই যে কোন্ শ্রেণীর প্রাণী বা কোন্ শ্রেণীর মানব, কালিকাতত্বা-বধারণের পূর্ব্বে তাহাই অগ্রে বিচার্য্য হওয়া উচিত। কারণ কালিকাদেবী যে তাদৃশ সর্ব্ব ধর্ম্ম সর্ব্ব জ্ঞানের খনীভূত, ব্রাহ্মণ জাতির সর্ব্বস্ব দেবতা, তাঁহার নাম যে মহামহাবিদ্যা—সামান্য একথা টুকু যাঁহাদের অবিদিত, বা বিদিত হওয়া সত্বেও সেই দেবতাকে যাঁহারা ভূত প্রেতাদি বলিয়া বিশ্বাস বা কীর্ত্তন করিতে পারেন, এইরূপ ভারতবাসী বা ভারতজাত মানবকে প্রকৃত মানবত্বের অধিকার দিলে মানবত্বেরই অবজ্ঞা করা হয়। কাযেই তাহারা কোন্ শ্রেণীর মানব তাহা আদৌ চিন্তনীয়। কিন্তু সে বিচার করা আমাদের লক্ষিত বিষয় নহে। ব্রাহ্মণ জাতির সর্ব্বস্বধন কালিকাদেবী কে, তাঁহার প্রকৃত তত্ব কি, সেই বিষয়ে কিছু বলাই আমাদের সঙ্কল্পিত বিষয়। অতএব দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে বিষয় কিছু বলা হইবে। প্রথম অধ্যায় এখানেই সমাপ্ত করা হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

নব্য হিন্দুর অভ্যুদয়।

আমাদের ধর্ম্ম ও আমাদের সমাজ দিন দিনই আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিতেছে। রাজনীতিক আন্দোলনের বন্যায় ভাটা পড়ার পর, আন্দোলন-স্রোত আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজকে আশ্রয় করিয়া আবার ধীরে ধীরে দেশের জনবহুল সমস্ত নগর ও উপনগরগুলিকে আপ্লাবিত করিয়া সুদূর পল্লীপ্রান্ত পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। দেশে ব্রাহ্মণ সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কায়স্থ-সভা, বৈশ্য-সভা, বৈদ্য-সম্মিলনী, তিলিজাতি-

সম্মিলনী, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনী প্রভৃতি সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক সভা সমিতিগুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও এখন আর আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ উপেক্ষার বস্তু নহে। মধ্যে মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনায় পলিতকেশ, দেশের খ্যাতিমান পুরুষদিগের মুখেও জাতির বড়াই, ধর্ম্মের বড়াই, স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপের বড়াই যে না শুনা যাইতেছে এমন নহে। কংগ্রেস কন্‌ফারেন্‌স্‌ প্রভৃতি রাজনৈতিক সভা সমিতিগুলির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিপালক ও পরিপোষকগণের দ্বারা এক একটী সামাজিক বৈঠক যথানিয়মেই অনুষ্ঠিত হইতেছে; এমন কি মূল রাজনৈতিক সভা সমিতিগুলির আলোচ্য বিষয়ের নির্ঘণ্টপত্রে পর্য্যন্তও ধর্ম্ম ও সমাজসংক্রান্ত দুই একটী প্রস্তাব এখন আর তেমন দুর্লভ দর্শন নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ বিশেষভাবে বাঙ্গলার প্রাচীন লুপ্ত সাহিত্যের উদ্ধার ও ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানে ব্রতী থাকিলেও বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রেও ধর্ম্মও সমাজকে নিতান্ত নিষ্প্রভ বলিয়া বিবেচিত হয় না। দেখিতে পাইতেছি, প্রধানতঃ কেবল ধর্ম্ম ও সমাজসংক্রান্ত বিষয়গুলির আলোচনা করিবার জন্যই কয়েকখানা মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাপন্ন প্রাচীন মাসিক ও সাপ্তাহিক সাহিত্যগুলি ও ধর্ম্ম ও সমাজসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনায় কৃপণতা করিতেছে না। দেশের কোনও কোনও কৃতবিদ্য ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োগ করিয়া এ দেশের সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেহ বা ব্যবহার শাস্ত্রের আলোচনায়, কেহ বা বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রাদির গবেষণায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া, পরিণত বয়সে, অন্যান্য কথার সঙ্গে আমাদের দেশের কথা, আমাদের ধর্ম্মের কথা, আমাদের সমাজের কথা, আমাদের জাতির কথা, আমাদের জ্ঞানের কথা, আমাদের বিশেষত্বের কথা, আমাদের গৌরবের কথা আবার আমাদেরই অগৌরবের কথা লইয়া বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেশের যে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আজ ভিন্ন দেশ হইতে তাহার উচ্চতম সাহিত্য-সাধনার পুরস্কার স্বরূপ বর্ত্তমান সাহিত্যিক-পুরন্দরগণের লোভনীয় সম্মানের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য লাভ করিয়া, বাঙ্গলা সাহিত্যকে অতুলনীয় গৌরবের সঙ্গে বিশ্বের সভ্য সাহিত্যসভায় উচ্চপদবী দান করিয়া এদেশ ও সে দেশবাসীর ধন্য-

বাদভাজন হইয়াছেন, তাঁহার সেই সমুচ্চসাহিত্য-সাধনাও তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাসানুগত ধর্ম্মভাবের দ্বারাই সমধিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও প্রতিভান্বিত। বঙ্গবাসীর সাধকবৃন্দের দৈন্যের অলীক অখ্যাতি ঘুচাইয়া দিয়া সেই অক্লান্ত সাধক আজ যে সুরচিত শ্লাঘ্য সাহিত্য-অঞ্জলি লইয়া ভারতীর পবিত্র পূজা-মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন, যে অঞ্জলির মনোমাদক সুরভিসম্ভার ভিন্নদেশবাসী, ভিন্নভাষাভাষী বিবুধমণ্ডলীর অন্তরে অননুভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় রসের সঞ্চার করিয়া এক অবনত দেশের অবনত জাতির এক অনাদৃত সাহিত্যের জয়শব্দে সৌভাগ্যের উচ্চ সোপানারূঢ় সর্ব্বোন্নত দেশের সমস্ত আকাশ সমস্ত বাতাসকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছে; সে অঞ্জলিও প্রধানতঃ ধর্ম্ম-ভাবের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। স্পষ্টই হউক আর অস্পষ্টই হউক, পূর্ণ ই হউক আর অপূর্ণই হউক, অবিকৃতই হউক আর কিঞ্চিৎ বিকৃতই হউক, তাহার প্রতিপত্র, প্রতিছত্র, যদি এদেশের ধর্ম্মভাব, এদেশের প্রেম, এদেশের ভক্তি, বিশ্ব-বিধাতার চরণপ্রান্তে, এদেশেরই প্রকৃত সুলভ আত্ম-সমর্পণের স্নিগ্ধ বর্ণে রঞ্জিত না হইত, তাহা হইলে কেবল কবি-প্রতিভা আজ বিস্ময়বিহ্বল সভ্য ইয়োরূপের এরূপ পলকবিহীন সাগ্রহ দৃষ্টি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইত কি না তাহা খুবই সন্দেহের বিষয়। এইরূপে কি সাহিত্য-ক্ষেত্র, কি রাজনীতি-ক্ষেত্র, কি শিক্ষিত সনাথ নগর ও উপনগর, কি অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত ভূয়িষ্ঠ আড়ম্বরহীন পল্লীনিবাস,—দেশের প্রায় সকল ক্ষেত্রে, সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই আমাদের ধর্ম্মের কথা, আমাদের সমাজের কথা, আমাদের উন্নতি ও অবনতির কথা ধীরে ধীরে স্থানলাভ করিতেছে।

ন্যূনাধিক অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যখন নূতন বিদেশীয় শিক্ষা এদেশের কতকগুলি উৎকৃষ্ট মস্তিষ্কে আশ্রয়লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে আপনার সার্থক্য সম্পাদনের চেষ্টায় নিরত ছিল, কেবল চেষ্টাই নয় কৃতকার্য্যও যে না হইতেছিল এমন নহে, সে সময়েও আমাদের শিক্ষিত সমাজে আমাদের জাতি ও ধর্ম্মের কথা লইয়া একটা প্রবল আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই স্রোতের গতি বড়ই একমুখী ছিল; তাহা একদিক দিয়া সমাজকে ভাঙ্গিয়া দিয়াই যাইত, আমাদের দেশের লোকের আমাদের জাতির দাঁড়াইবার জন্য যে একটা স্বতন্ত্র স্থানের প্রয়োজন, বিশ্বের আর কাহারও সঙ্গে

যে এদিক দিয়া আমাদের মিলা মিশা হইতে পারে না, সে তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিত না। আমাদের এই আশ্রয়, এই পৈতামহ আবাস ভাঙ্গিয়া গেলে যে আমরা একেবারে আশ্রয়হীন হইয়া পড়িব, এই ভাঙ্গন কূলের কোনও নূতন চড়ায় যে আমাদের স্থান হইবে না, কোন নূতন চড়াই যে আমাদের ভারবহনের যোগ্য নহে, এ কথাটা ভাবিয়া দেখিবার উপযুক্ত অবসরটুকু তাহার ছিল না। তাই সে স্রোত কেবল সমাজকে ভাঙ্গিয়াই গিয়াছে। সে ভাঙ্গাতেই ছিল তাহার সার্থক্য।

বাহির হইতে কোনও বিরুদ্ধ শক্তির প্রচণ্ড অভিঘাত আসিয়া শরীরে পীড়া উৎপাদন করিলে আপনার শক্তিতে তাহাতে সাধ্যমত বাধা প্রদান প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এবং এস্থানেই তাহার প্রাণের পরিচয়। সে ক্ষেত্রেও সেই চিরন্তন নিয়মের কোনও রূপ অন্যথা ঘটে নাই ; এক দিক দিয়া সেই নবীন স্রোত পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে করিতে সমাজের প্রাচীন সংস্থা-নকে বিপর্য্যস্ত করিয়া, যখন সমাজের মর্ম্মে মুহুর্ম্মুহুঃ বেদনার সঞ্চার করিতে-ছিল, অপর দিকে তখন সেই আঘাতেরই ফলস্বরূপ, তাহারই প্রতিকূল, সমা-জের আত্মসংরক্ষণী শক্তি কিঞ্চিৎ বিকাশলাভ করিয়া সেই আঘাত, স্রোতের সেই প্রচণ্ড আবর্ত্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য যথোচিত প্রয়াস পাইতে লাগিল ; তাহার ফলে সমাজের মধ্যে আবার একটা নূতন চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হইল, বেদনোত্থিত একটা সকরুণ আর্ত্তনাদের মধ্য দিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে সে কথা সমগ্র সমাজময় হইয়া পড়িল, সমাজের কয়েক জন শক্তিমান পুরুষ, সমাজের সেই ভাঙ্গন মুখে কতকগুলি পুরাতন ইট পাটকেল ফেলিয়া সাধ্যমত তাহাতে বাধাপ্রদান, স্রোতের সেই গতিকে ভিন্ন পথে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। সেই চেষ্টার মধ্য দিয়া মৃতপ্রায় হিন্দুসমাজের আবার নূতন করিয়া প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইতে লাগিল। তাহার প্রতিস্পন্দন সমস্ত বিশ্বের সম্মুখে সেই দিন এই এক মহা-সত্যের প্রচার করিয়া দিল যে, মৃতপ্রায় হিন্দুসমাজের জীবনান্ত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে, তাহার স্বাভাবিক জীবনী-শক্তি তাহার এই আধিব্যাধিগ্রস্ত জীর্ণায়মান দেহযষ্টিকে এখনও একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। তাঁহাদের সেই চেষ্টা সংপূর্ণরূপে সফলতা লাভ করিতে না পারিলেও

একেবারে ব্যর্থ হইল না। ভাঙ্গনের বেগ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হইল না বটে, কিন্তু তাহা অনেকটা মন্দীভূত হইয়া পড়িল; যে সকল স্থানে সেই পুরাতন ইট ও পাটকেল গুলি জমাট বাঁধিয়া এক একটা সুদৃঢ় বাঁধের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল, স্রোতোজল সে সকল স্থলে প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল বটে, কিন্তু এ দিকে সে দিকে তাহার ভাঙ্গন-ক্রিয়া অবাধেই চলিতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহাদের সেই চেষ্টাকে এক প্রকার সাময়িক উত্তেজনা-সম্ভূত অসাধ্য সাধনের অস্বাভাবিক নিষ্ফল প্রয়াস বলিয়া উপেক্ষা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু যাঁহারা দ্রষ্টা, তাঁহারা দেখিলেন ইহার মধ্যে কোনও রূপ অস্বাভাবিকতার সম্পর্ক নাই, ইহা কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের দুরভিসন্ধানসৃষ্ট আকস্মিক ঘটনা নহে। শীত ও গ্রীষ্মের আতিশয্যে প্রাণবিঘাতক নানারূপ ব্যাধিও বিষের সংক্রমণে, যে কারণে, যে নিয়মে প্রতিপ্রাণীগত আত্মসংরক্ষণী শক্তি উত্তেজিত হইয়া, শরীরের অভ্যন্তরে এক এক রূপ ক্রিয়ার সৃষ্টির দ্বারা তাপাদির অপসারণ ও বিমোচন এবং বিষাদির সংস্করণের মধ্য দিয়া, আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, তাহা যেমন কৃত্রিম প্রযত্নমূলক একটা অস্বাভাবিক ঘটনা নহে, ইহাও সেইরূপ সে নিয়ম এবং সে কারণসঞ্জাত সমাজের আত্মরক্ষণী শক্তির একটা বিশেষ স্ফুরণমাত্র, ইহার মধ্যেও কোন রূপ কৃত্রিমতা নাই, ইহা সম্পূর্ণ স্বভাবানুগত। এইরূপে এক দিক দিয়া সেই নবীন স্রোত সমাজের প্রাচীন সংস্থানকে ভাঙ্গিয়া দিয়া যেরূপ আপনার অমোঘ মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা করিতে লাগিল, অপর দিকে ঠিক সেইরূপ সমাজের আত্মসংরক্ষণী শক্তি বিকাশলাভ করিয়া তাহার সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইল; এইরূপে এই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষণ অনেক দিন হইতেই নব্য হিন্দুসমাজে চলিয়া আসিতেছে এবং এ যুদ্ধে কখনও ইহার জয় উহার পরাজয় আবার কখনও বা উহার পরাজয় ইহার জয় সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। এই জয় পরাজয়, এই দ্বন্দ্বসংঘাত হইতেই বাঙ্গলার বর্ত্তমান নব্য হিন্দুয়ানীর উৎপত্তি, এবং ইহাই নব্য হিন্দুয়ানীর যথার্থ ইতিহাস। পূর্ব্বোল্লিখিত আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর সকল সমাজের লোকের মধ্যে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ-বিষয়ক সমালোচনার দিন দিন প্রসারলাভও এ সংঘর্ষণেরই ফল। ক্রমশঃ—

শ্রীরেবতীরমণ ভট্টাচার্য্য।

দেববংশম্ ।

(২)

অনুজ্ঞয়া দেবা সর্ব্বে কর্ণপুরে সমবেতাঃ ।
পর্য্যায়ক্রমেণ রাজা দেবাংশ্চ বিভক্তবান্ ॥ ১৫
শাণ্ডিল্যো মৌদ্গল্যশ্চেতি বাৎস্যঃ পরাশরস্তথা ।
ভরদ্বাজো ঘৃতকৌশিক আলিম্যাঞ্চ গোত্রাণ্যেব ॥ ১৬
কর্ণস্বর্ণ-সমাজেষু গোত্রৈর্হি কুলপদ্ধতিঃ ।
শাণ্ডিল্যদেবাশ্চ সর্ব্বেষু ভবঞ্চ কুলনায়কাঃ ॥ ১৭
কর্ণস্বর্ণ-সমাজোহতো জনৈস্তু পরিবর্দ্ধিতঃ ।
দীর্ঘকালং পরিব্যাপ্য সর্ব্বে তে ন্যবসন্ তত্র ॥ ১৮
রণপরায়ণা দেবা গোত্রৈশ্চ বহুবিভক্তাঃ ।
স্থাপয়ামাহুঃ যত্নেন রাজ্যাকান্তঙ্গবঙ্গয়োঃ ॥ ১৯
অদস্তু কণ্টকদ্বীপে শাণ্ডিল্যেন প্রতিষ্ঠিতম্ ।
রাজ্যং গঙ্গাজয়যুক্তং স্বভাবতঃ সুরক্ষিতম্ ॥ ২০
অজয়স্য দক্ষিণতো ভাগীরথ্যাঃ চ পশ্চিমে ।
বড়খালস্যোত্তরে ভাগে দ্বীপোহয়ং দেবশাসিতঃ ॥ ২১
গ্রহমধ্যে যথা ভানুঃ সুরাণাং সুরেন্দ্রো যথা ।
তথৈব দেববংশেতু সুরদেবো মহামতিঃ ॥ ২২
বাহুবলং সমাশ্রিত্য সসৈন্যো হয়মারুহ্য ।
কণ্টকাৎ কণ্টকদ্বীপং যত্নেনাসৌ বিমুক্তবান্ ॥ ২৩
স হি রাজা সুরদেব আসীন্নানাগুণযুক্তঃ ।
ব্রাহ্মণ্য রক্ষকশ্চেতি দুর্জ্জনানাং ভীতিপ্রদঃ ॥ ২৪
অমুষ্য ক্ষাত্রতেজসা বৌদ্ধঞ্চ দূরং গতম্ ।
সনাতনধর্ম্মোহমুনা সুব্রাহ্মণৈরনুষ্ঠিতঃ ॥ ২৫

অনুবাদ—রাজাদেশে দেবগণ কর্ণপুরে সমবেত হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে বিভক্ত করেন। শাণ্ডিল্য, মৌদ্গল্য, বাৎস্য, পরাশর,

ভরদ্বাজ, ঘৃতকৌশিক ও আলিম্যান গোত্রে দেবগণ বিভক্ত হন। কর্ণ স্বর্ণ সমাজে গোত্রের দ্বারা কুলপদ্ধতি স্থির হইয়াছিল। দেবগণের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয়েরা কুলনায়ক হন। কর্ণ স্বর্ণ সমাজ জন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে, দেবগণ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। গোত্রে বহু বিভক্ত হইয়া রণ-পরায়ণ দেবগণ অঙ্গবঙ্গে অনেক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কণ্টকদ্বীপে গঙ্গাজয়সংযুক্ত স্বভাবতঃ সুরক্ষিত যে রাজ্য স্থাপিত হয়, তাহা শাণ্ডিল্য দেবগণ কর্ত্তৃকই হইয়াছিল। অজয়ের দক্ষিণে, ভাগীরথীর পশ্চিমে ও বড়খালের উত্তরে যে দ্বীপ অবস্থিত, তাহা দেবগণ কর্ত্তৃক শাসিত হয়। গ্রহমধ্যে যেমন সূর্য্য ও দেবগণের মধ্যে যেমন ইন্দ্র, সেইরূপ দেববংশে সুরদেব মহামতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অশ্বারোহী সুরদেব বাহুবল আশ্রয় করিয়া প্রযত্ন সহকারে কণ্টক হইতে কণ্টকদ্বীপ বিমুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা সুরদেব নানা গুণযুক্ত, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রক্ষক, ও দুর্জ্জনগণের ভীতি-প্রদ ছিলেন। ইঁহার ক্ষত্রতেজে বৌদ্ধধর্ম্ম দূরীকৃত হইয়াছিল এবং সুব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সনাতন ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়।

টিপ্পনী—কুলগ্রন্থ দেববংশানুসারে জানা যায় যে, দেবগণ ব্রহ্মাবর্ত্ত, হরিদ্বার হইতে মগধে আগমন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা রাজা কর্ণসেনের আদেশে কর্ণপুরে সমাগত হইয়া নানা গোত্রে বিভক্ত হন। ইঁহারা অঙ্গ বঙ্গের নানা স্থানে নানা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দেবগণ কণ্টকদ্বীপ বা কাটোয়ায় আপনাদের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ভাগীরথী, অজয় ও বড়খালের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ ইঁহাদের কর্ত্তৃক শাসিত হইত। এই বংশে সুরদেব নামে এক সুপ্রসিদ্ধ রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি কণ্টকদ্বীপকে কণ্টকমুক্ত করেন। সুরদেবের পরিচয় আমরা অপর কোন গ্রন্থ হইতে এ পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারি নাই। শাণ্ডিল্য দেবগণ যে ভূভাগে প্রথমে রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহা আরও বিস্তৃত হইয়া উঠে। তাঁহাদের রাজ্যের দক্ষিণ সীমা বড়খালকে যদি নাদনঘাটার নিকটস্থ খালকে বুঝায়, তাহা হইলে প্রায় নবদ্বীপ পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া জানা যাইতেছে, এবং পরে নবদ্বীপের সহিতও তাঁহাদের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল বলিয়াও অবগত হওয়া যায়। ফলতঃ তাঁহাদের রাজ্য যে ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছিল,

তাহা কুলগ্রন্থ আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ে বর্দ্ধমান জেলার খণ্ডেশ্বর থানার অধীন শূরো বা শূউরো গ্রামকে শূরনগর আখ্যাদিয়া আদিশূরের রাজধানী নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ও আলোচনা চলিতেছে। * ইহার সহিত আমাদের উল্লিখিত সুরদেবের কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহাও একবার বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এই কুলগ্রন্থানুসারে সুরদেবকে যেরূপ একটি সুপ্রসিদ্ধ রাজা বলিয়া জানা যাইতেছে, এবং তাঁহার বংশধরগণেরও যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সুরদেবের নামানুসারে সুরনগর হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব নহে। ফলতঃ এ বিষয়ে আমরা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণকে বিশেষরূপে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। বর্ত্তমান সময়ে আমরা এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারি না।

ক্রমশঃ

সমাজ-চিন্তা।

(১)

সমাজ গড়া যায় না। আমরা বিদ্যালয়ে যেসকল ঐতিহাসিক তত্ত্বশিক্ষা করিয়া থাকি তাহাদের প্রায় সকলগুলির মধ্যেই একটা ধ্বংস-বুদ্ধিপ্রণোদিত যুক্তির (Destructive reasoning) গন্ধ পাওয়া যায়। হিন্দুকুশ উপত্যকাপথে কৃষিমাত্রোপজীবী, হলস্কন্ধধৃতগোপুচ্ছ আর্য্যজাতির ভারতপ্রবেশের কাল নির্ণয়, ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদির সূতিকাষষ্ঠীপূজার কাল নির্ণয়, বেদরচনার কাল নির্ণয়, বর্ণ সৃষ্টির কাল নির্ণয় ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য অমূল্য তথ্যগুলি বাল্যকাল হইতেই

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১১ ভাগ ১ম সংখ্যা) শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী লিখিত শূর নগর নামে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

স্মৃতিপটে মুদ্রিত করিয়া রাখিতে হয়। এই বিজ্ঞানের যুগে বিশ্বাসের আদর নাই, আদর কেবল সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, চুলচেরা বিচারের। কাযেই এখন গোড়ার বিশ্বাসকে বলিদান দিতে হয়, কামক্রোধাদির বলিদান সম্বন্ধে গ্রন্থ, বক্তৃতা,বা প্রবন্ধ রচনাই যথেষ্ট। যত আয়োজন বিশ্বাসের মূলোৎপাটন ব্যাপার লইয়া। ইহার এত অধিক প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে যে, সে জন্য নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, যেমন বেদরচনা, মূর্তিপূজার প্রচার, বর্ণসৃষ্টি, সমাজগঠন প্রভৃতি।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, বামনাকারকে দানবাকারে আনয়ন, ধনঞ্জয়ের প্রয়োগে গর্দ্দভকে ঘোটকে পরিণত করা,অথবা জাতিগঠন, সমাজগঠন প্রভৃতি ব্যাপারের একই প্রকার ফল হইবার সম্ভাবনা। তবে চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই ; কেবল এইজন্যই এ সকলের যথাসাধ্য সংস্কার সাধন মানবের সাধ্যাধীন বটে। আসল কথা এই যে, নূতন পুরাতনের মসলা মিশাইয়া সমাজনামে যদি বা একটা কিছু খাড়া করা যায়, তাহা হইলেও সে ঘর টিকিবে না, পরীক্ষার ঝঞ্ঝাবাতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কারণ তাহা কৃত্রিম। এজন্য গড়া সমাজে বড় একটা লোক যোটে না। ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ, প্রার্থনাসমাজ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। যাহা গড়িতে দেখা গিয়াছে, তাহার চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে মানুষ সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহে না। মানুষ বড় দুষ্ট। মানুষ জানে যে, যাহারা কোনও অভিসন্ধি লক্ষ্য করিয়া আপনার প্রকৃত ভাব বা রূপতা পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া মনে করে, এবং হৃদয়ের তথাকথিত শূন্যস্থান পূরণের জন্য নূতন বিজাতীয় ভাব, রূপতা বা চরিত্র গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অনেক স্থলে আত্ম-বঞ্চিত হইতে হয়। ইহার কারণ এই যে, ঐ নূতন বিজাতীয় ভাব তাহাদের পুরুষপরম্পরাগত ধাতুতে হজম হয় না,—বংশানুক্রমের প্রভাবে তাদৃশ হৃদয়ে সেই সেই নব ভাব বা রূপতা সংগৃহীত ও পোষণের কারণ না হইয়া বরং বিক্ষোভ বা বিপ্লবের কারণ হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে ইহা ভাব-বিনিময় নহে।

লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আমাদিগকে আপন আপন ব্যষ্টিশক্তির সমবায়ে উদ্ভূত একটা বিরাট্ সমষ্টিশক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া জগতের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হয়। এই সমষ্টি শক্তির বাহিরে গেলে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি। এই সমষ্টি

শক্তির উদ্ভব মানুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন নহে। প্রকৃতির আঘাতে অবশ হইয়া—দায়ে ঠেকিয়া আমরা একটা পরিখা বা দুর্গের আশ্রয় লইয়া থাকি, সমষ্টিশক্তির (cohesiveness) অন্তরালে থাকিয়া আমাদিগকে আত্মরক্ষা এবং প্রয়োজন হইলে পরপীড়ন করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কালের সন্তান, কালের আশ্রিত, কালের অধীন ; অতএব কালই সমাজের স্রষ্টা। আর জাগতিক ঘটনা, মানুষের শক্তি ও প্রকৃতি সমাজসৃষ্টির উপাদান মাত্র। তাই গোড়ায় বলিয়াছি সমাজ গড়া যায় না।

কিন্তু যেমন আমার দেহ আমার সৃষ্ট না হইলেও দেহের ভাল মন্দ ঘটান আমার সাধ্যাধীন, সেইরূপ সমাজ-দেহের ভাল মন্দ ঘটানও আমার সাধ্যাধীন হইতে পারে। অতএব সমাজে থাকিয়া বিপ্লবকে ভয় করিলে চলিবে না। আমরা যাহাকে বিপ্লব বলিয়া ভয় করিয়া থাকি, তাহা কালের বশে আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। আমরা দেখিতে পাই, প্রতি মুহূর্ত্তে বিপ্লবের মধ্য দিয়া একটার পর একটা বস্তু আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। একটাকে উপমর্দ্দিত বা আলোড়িত করিতে না পারিলে আর একটা প্রকটিত বা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না ; কাযেই বস্তুর আত্মপ্রকাশ বলিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইবে। আমরা সংসারের তিলপ্রমাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্লবের অর্থাৎ আলোড়নের মধ্য দিয়া অজ্ঞাত গন্তব্য পথে চলিয়াছি, এবং সহজেই উহাতে অভ্যস্ত হইয়া আছি, বিপ্লবকে বিপ্লব বলিয়া মনে করিয়া থাকি না ; কিন্তু এই তিলপ্রমাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি যখন কোনও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণে সহসা ঘনীভূত হইয়া তালপ্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়,—আমাদের পাতান সংসার-তরুর গোড়া ধরিয়া নাড়া দেয়, তখনই চীৎকার করিয়া চক্ষু মেলিয়া দেখি বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

তবেই হইল, সংসারে থাকিতে হইলে অল্প বিস্তর বিপ্লবের মধ্যে বাস করিতে হইবেই ; কারণ, মানব ব্যষ্টি ভাবেই হউক আর সমষ্টি ভাবেই হউক আপন আপন স্বার্থসাধন জন্য একে অপরের প্রতি, এক পরিবার অপর পরিবারের প্রতি, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের প্রতি, এক জাতি অপর জাতির প্রতি আপন আপন বলবুদ্ধি (শক্তি) প্রয়োগ করিবেই। অতএব সংসার

বিপ্লবময়, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বিপ্লবময়, প্রত্যেক কর্ম্মটি যেন বিরুদ্ধ শক্তিতে শক্তিতে ধাক্কাধাক্কি।

বিপ্লবের ফল শুভ অশুভ দুই হইতে পারে। তবে অতর্কিত ও আকস্মিক বিপ্লব প্রায়ই অশুভকর, আর যাহা অবশ্যম্ভাবী হইলেও মৃদু গতিতে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার ফল অন্যরূপ হইবার সম্ভাবনা; কারণ সে অবস্থায় সমাজের লোক পূর্ব্ব হইতেই বিপ্লবের সহিত সম্বন্ধস্থাপনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। বাঁধ ভাঙ্গিলে দামোদরের বন্যায় দেশ উৎসন্ন হয়, কিন্তু পদ্মার বন্যায় শস্য ভাল জন্মে, এবং ম্যালেরিয়া বাড়িতে পারে না। এক্ষণে বলিতে চাই যে, ইংরাজ-রাজত্বে হিন্দুসমাজের মধ্যে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহা পদ্মার জলপ্লাবনের ন্যায়; এজন্য ইহার ফল শুভ হইবার সম্ভাবনা। সম্প্রদায়বিশেষের শ্রুতিসুখকর হইবে না জানিয়াও একথা বলিবার কারণ এই যে, আমাদিগকে এই নবযুগে সোণার-পাথর বাটি গড়িতে হইবে। একমাত্র সোণার বাটি অথবা পাথর বাটি গড়িতে গেলে ধ্বংস অনিবার্য্য। যদি আমরা সোণার বাটি গড়াই সাব্যস্ত করি, তাহা হইলে পরিণামে আমাদের ক্রিয়োল (creole) দিগের দশা ঘটিতে পারে। এখনই ত্রিনেভেল্লী জেলায় সেই দশা দেখা দিয়াছে। আর যদি নির্ব্বন্ধসহকারে পাথরবাটি গড়াই সার বিবেচনা করি তাহা হইলে শেষে ইহুদীদিগের দশা হইবার সম্ভাবনা; কেননা দেশাত্মবোধবর্জ্জিত সমাজপ্রীতি বুকে ধরিয়া ভারতের ব্রাহ্মণ আর কত শতাব্দী জগতের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে? ব্রাহ্মণের বড় কঠিন প্রাণ তাই পৃথিবীর কোনও জাতি যাহা পারে নাই তাহাই তাহাকে সাধন করিতে হইয়াছে ও হইতেছে।

বলিতে কি, যে রাত্রে বেণ্টিঙ্ক-মেকলে-প্রমুখ রাজপুরুষগণ প্রতিপক্ষ উইলসন্ ডফ্ প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া ভারতবাসীর জন্য ইংরাজী সাহিত্য-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন, সে রাত্রি ভারতের নবযুগাদ্যা রাত্রি। সে রাত্রে ব্রাহ্মণ্য শক্তির চিরপূজ্যা অমলধবলরূপা শ্বেতাজদলবাসিনী নির্নিমেষ-নয়না মুক্তিরূপা বিদ্যাদেবীর বিসর্জ্জন-মন্ত্র পঠিত হয়, এবং রক্তকোকনদারূঢ়া লীলান্দোলিতলোচনা পাটলাম্বরবী ভুক্তিরূপা বিদ্যাদেবীর আবাহন-মন্ত্র পঠিত হয়,—পুরোহিত স্বয়ং মেকলে। যে নীরব-জ্যোতি বিশ্বজননী, তথা জীবন্ময়ের 'রাত্রি', সেই দেবী সেই মুহূর্ত্তে হিন্দুর চিরসেবা আলস্য, ভীরুতা ও

উদ্যমহীনতার উপর অভিশাপ প্রদান করেন। যে দেশাত্মবোধ সমাজের হৃদয়, সেই বোধবর্জ্জিত সমাজপ্রীতির সাধক হিন্দুকে বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া প্রবল রাষ্ট্রবিপ্লবের তরঙ্গাঘাতে সংসারসাগরে বিঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া, দয়াময়ী দেবী বিশ্বজননী ইংরাজ বেণ্টিঙ্ক-মেকলে প্রভৃতি দ্বারা এই নব যুগ আনিয়া দিয়াছেন। ইহা বিধাত্রীর নির্ব্বন্ধ।

এখন এই নির্ব্বন্ধের নিকট নতশির হইয়া আমাদিগকে জীর্ণ বিদীর্ণ সমাজের সংস্কার সাধন করিতে হইবে; ইহা বিধাত্রীর ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশ একই পদার্থ, এতদুভয়ের পার্থক্য জ্ঞান করিলে তাঁহার প্রতি দাসোচিত ব্যবহার করা হয় না। অতএব সমাজপদার্থটিকে কি ভাবে বুঝিতে হইবে গোড়া হইতে সেটা স্থির করিয়া লইতে হইবে।

আমাদের ধারণা এই যে, (১) আর্য্যপথ সমাজদেহের প্রাণ, (২) দেশাত্মবোধ উহার হৃদয় এবং (৩) ধর্ম্ম উহার আত্মা। দেশাত্মবোধ শব্দের মধ্যে স্বদেশানুরাগ শব্দের অর্থ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে বুঝিয়া লইতে হইবে। অনুরাগ আজ আছে কাল না থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মবোধ সহজে যাইবার নয়। মনে কর মাতার সহিত কলহ উপস্থিত হইল, মুহূর্ত্তকালের জন্য হয়ত তৎপ্রতি সন্তানের স্বাভাবিক অনুরাগ বিচলিত হইল, কিন্তু আত্মবোধ বিচলিত হইবার নহে, ইহা অত্যাজ্য। সেই জন্য, করিওলেনস্ রোমের প্রতি অল্প কালের জন্য বীতানুরাগ হইতে পারিয়াছিলেন, ভলসীয়নায়ক অফিডিয়সের সহিত যোগ দিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জননী ভলম্‌নিয়া এবং পত্নী ভার্জ্জিলিয়ার অশ্রুপূর্ণবদন নিরীক্ষণ ও তাঁহাদের প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগ-প্রণোদিত মর্ম্মস্পর্শী বাক্যগুলি উপলব্ধি করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার অত্যাজ্য দেশাত্মবোধের উপর যে বিরাগের মেঘখান এতদিন রোমের অনর্থসাধন ঘটাইতেছিল, সে মেঘ কাটিয়া গেল,—শরতের রবির ন্যায় অনুরাগ ফুটিয়া উঠিল।

হৃদয়ের বল প্রাণশক্তির আশ্রয়ে ক্রিয়া করিয়া থাকে, প্রাণশক্তি দুর্ব্বল হইলে হৃদয়ের বলও সেই সঙ্গে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই জনাই কঙ্গ্রেসের এত শীঘ্র অধঃপতন ঘটিয়াছে। যাহাদের দাঁড়াইবার পথ নাই, তাহাদের চলিবার পথ কোথায়? তাই বলিয়াছি, আর্য্যপথ সমাজের প্রাণ।

কিন্তু সেই আর্য্যপথ কি? বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম? না, কারণ কলিযুগে বিশেষতঃ

বর্ত্তমান সময়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে থাকিতে পারে না। যদি কোনও সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে কদাচিৎ ইহা দেখা যায়, তবে সেটা নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। তবে কি পূর্ব্বপুরুষাচরিত শিষ্টপরম্পরাগত আচারকেই আর্য্য-পথ বলিব ? না, তাহা বলিতে পারি না কারণ, সে সব আর্য্যপথের পার্শ্বগত তরুচ্ছায়া-বাপী-কূপ-তড়াগাদিতুল্য, পথিকের অনুকূল, কিন্তু পথ নহে। তবে ইহা কি, তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। আর্য্য-পথ মহাজন-নির্দ্দিষ্ট ও ব্যবহৃত পথ। মহাজন অর্থে এখানে বহুজন বলিয়া বুঝিতে হইবে না, প্রত্যুত শ্রেষ্ঠ জন—প্রধানভূত রাজাদি বুঝিতে হইবে। 'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ' ইত্যাদি গীতাবাক্যও যাহা, ধর্ম্মের প্রশ্নে যুধিষ্ঠিরের উত্তরও তাহা, উভয়েই এক অর্থকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। ফলকথা, সমাজে তিনিই মহাজন যিনি একাধারে সাধু ও শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ প্রধানভূত ব্যক্তি,—এরূপ নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। যদি তাহা হয়, তবে বলিতে হইবে যে, এই প্রধানভূত মানব বা তৎসহধর্ম্মী মানবগণের নির্দ্দিষ্ট ও আচরিত পথই সামাজিকগণের পক্ষে আর্য্য-পথ, এবং এ হিসাবে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সমাজের মধ্যেও আর্য্য-পথ আছে এবং থাকিবে।

যদি প্রধানভূত রাজাদি শ্রেষ্ঠ বা মহাজন-পদবাচ্য হইলেন, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, একদিক দিয়া দেখিলে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে মহাজন-পদবাচ্য কেহ নাই ও বটে, আবার অন্যদিক্ দিয়া দেখিলে হয় ত কেহ আছেনও বটে ;—কেহ নাই কারণ রাজা ভিন্নধর্ম্মী, এবং সে জন্য সমাজের ও দেশাচারের ভালমন্দে তাঁহার বড় একটা ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ; আবার, মহাজনপদবাচ্য কেহ আছেনও বটে, কেন না দণ্ডধর রাজাই যথাসাধ্য দুর্নীতির প্রশমন, সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প-বাণিজ্যের প্রচার ও বিস্তারসাধন করিতেছেন, এবং এ কার্য্যে রাজ-শক্তির যতদূর যোগ্যতা ও অধিকার আছে, অন্যের ততদূর নাই এবং থাকিতে পারে না। যদি তাহা হয়, তবে ব্রিটিশ ভারতে হিন্দুসমাজের দুর্দ্দশার প্রতি-বিধানকল্পে সামাজিকদিগের চেষ্টা, হাম্‌লেটের ভূমিকাবর্জ্জিত হাম্‌লেট নাটকের অভিনয়ের ন্যায় একটা কিম্ভূত ব্যাপার হইয়া পড়ে কি না ইহাও বিবেচ্য। ইহার কারণ নির্ণয় কঠিন নহে। "সর্ব্বে রাজাশ্রিতা ধর্ম্মা, রাজা ধর্ম্মস্য ধারকঃ" ইত্যাদি অব্যর্থ শাস্ত্রবাক্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে না ফলিয়া যায় না। আমাদের

রাজা যিনি ইংলণ্ডের ধর্ম্ম-গোপ্তা Defender of faith তিনি যে ইহা বুঝেন না, তাহা নহে, কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ দুইটি কারণে আমাদের সামাজিক শোচনীয় অবস্থার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতে অশক্ত এবং অবস্থাবিশেষে অসম্মত। প্রথমতঃ, তিনি ভারত-শাসন-ব্যাপার সহজসাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৫৮ খৃঃ অঃ ১লা নবেম্বরের বিখ্যাত ঘোষণাপত্রে প্রজার জাতিধর্ম্ম-আচার-ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ, তিনি আমাদের সমাজ-মধ্যে নিন্দনীয় আচার বা অমার্জ্জনীয় জড়তা, স্থিতিশীলতা, কর্ত্তব্যবিমুখতা প্রভৃতি চক্ষে দেখিয়াও না দেখার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, কারণ তিনি বিলক্ষণ জানেন যে, আমরা স্বীয় দোষে বা পাপে পচিয়া মরিলেও সরল অন্তঃকরণে তাঁহার নিকট আনুকূল্য-প্রার্থী হইতে চাই না; বরং সদুদ্দেশ্যে আমাদের সামাজিক দোষ ও দুর্নীতির প্রশমনকল্পে একটু অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিবামাত্র অথবা ব্যবস্থাপক সভায় একটা বিল পঠিত হইবামাত্র আমরা সহসা হিন্দুত্বের ময়ূরপুচ্ছাবরণে আবৃত হইয়া সমাজ-হিতৈষী হইয়া পড়ি এবং রাজার কার্য্য ও উদ্দেশ্যের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার অত্যধিক সদ্ব্যবহার করিয়া থাকি। তবে যে পেনাল কোডে ও অন্যত্র আমাদের কোনও কোনও প্রাচীন রীতি নীতির পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, সেটা, ফরাসী-দেশোত্থিত কালের ভীষণ বিষাণধ্বনি সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা সমস্ত ইউরোপে অল্পবিস্তর ঘোষিত হওয়ায় তাহারই ফলে বলিতে হইবে। বলিতে কি সম্রাট্ নেপোলিয়নের আইনই রূপান্তরিত হইয়া ইউরোপ, আমেরিকা, উপনিবেশ, ভারত প্রভৃতি দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, এবং নেপোলিয়নের চরিত-লেখক নেপোলিয়ন বিদ্বেষী লকহার্টও (Lockhart) প্রকারান্তরে ইহা স্বীকার করিয়াছেন, যথা;—

It at this day forms the code, not only of Francc, but of a great portion of Europe besides. Justice, as between man and man, was administered on sound and fixed principles, and by unimpeaced tribunals.

উদার-নৈতিক লর্ড মেকলে ফরাসী-বিদ্বেষী হইয়াও ফরাসী-প্রতিষ্ঠিত সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাতত্ত্বের বিদ্বেষী ছিলেন না, এবং সেই জন্যই আমাদের পেনাল-

কোডে ব্রাহ্মণ-চামারের পার্থক্য না মানিয়া বিধি-প্রণয়নের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন, যাহা উত্তরকালে সার বার্ণেস পিককের হাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমানকালে প্রজাদিগের ভয়ভঞ্জন করিতেছে। কালের ভীষণ বিষাণ একবার বাজিলে নিস্তার নাই, এবং সেই কারণেই আমাদের রাজা মধ্যে মধ্যে বিদ্যাসাগর, মালবারি, ভূপেন্দ্রনাথ, দাদাভাই প্রভৃতির কথা শুনিয়া আসিতেছেন, এবং ভবিষ্যতেও শুনিবেন।

সে যাহা হউক, আমাদের রাজা যখন প্রজার ধর্ম্মাধর্ম্ম-ব্যাপারে একপ্রকার উদাসীন, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের গন্তব্য প্রকৃষ্ট, নিরাপদ্ ও অভ্যুদয়-সাধক আর্য্য-পথ নাই, আর যাহা আছে বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, তাহা শতধা ছিন্ন ভিন্ন বিদীর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সে পথের সংস্কার কতদূর সাধিত হইয়াছে, আদৌ সাধিত হইয়াছে কি না, অথবা কখনও সাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা বলা সহজ নহে; কারণ হামলেট্‌কে বাদ দিয়া হামলেটের অভিনয়, অশ্বোল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তৃণভক্ষণ, অথবা প্রথম হইতেই দাবা খোয়াইয়া দাবা খেলায় কখনও কেহ সুবিধা করিয়া উঠিয়াছেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। দুইটি ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ধর্ম্ম ও আচারের সহিত রাজার সম্বন্ধ কতদূর বাঞ্ছনীয়।

চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত ঈশ্বর-সাধনার নূতন পদ্ধতি যখন নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহ হইতে ক্রমে অন্যত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা রাজদণ্ড প্রয়োগ দ্বারা অভিনব বৈষ্ণবমত প্রচারে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে কাজী সাহেবের (রাজশক্তির) শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে রাজা (রাজ-শক্তির প্রতিনিধি কাজী সাহেব) ভিন্নধর্ম্মী হওয়ায় ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন, ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি পূর্ব্ববৎ জ্বলিতে লাগিল। যদি সেই সময়ে বঙ্গে হিন্দু রাজা থাকিতেন, তাহা হইলে সেই তুমুল আন্দোলনের ফল অবশ্যই অন্য রূপ হইত। রাজা সম্ভবতঃ উভয় পক্ষকে বাধ্য করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিতেন, কারণ দণ্ড তাঁহার হস্তে, দণ্ড-ভয় বড় ভয়,—বিশেষতঃ রাজদণ্ড।

"স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ॥" মনু ৭। ১৭

তাই মনে হয়, সর্ব্বৌষধের সার দণ্ডৌষধের ব্যবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গোস্বামিগণ একটা রফা করিয়া ফেলিতেন ; হয় চৈতন্যদেবকে পরাজয় স্বীকার করিয়া নব বিধান প্রচার-ব্যাপারে নিরস্ত হইতে হইত, অথবা বাঙ্গলার শাক্ত শৈব ব্রাহ্মণকে বিষ্ণুমন্ত্রী হইতে হইত, স্বেচ্ছাচার নিশ্চয়ই বাধা প্রাপ্ত হইত, কেননা প্রজার পক্ষে কোন্ পন্থা অবলম্বনীয় রাজাকে স্বয়ং তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হয়। আর্য্যপথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার ক্ষমতা রাজার, অন্যের নহে। এ ক্ষেত্রে আর্য্যপথ নির্ণীত হইল না, হইবার কথাও নহে।

পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বিষম ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লব ঘটে, তাহার অবশ্যম্ভাবী ও আনুষঙ্গিক বিবিধ রোমহর্ষণ ব্যাপারে এক-মাত্র রাজশক্তি প্রবল থাকায় সমাজ-তরণী ডুবিতে পারে নাই। লুথার-দত্ত ধর্ম্মমদিরা-পানোন্মত্ত নব্য প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় প্রাচীনপন্থী ক্যাথলিকদিগের উচ্ছেদ-সাধনে বাড়াবাড়ির একশেষ করিলে, স্বয়ং পোপ-বিদ্বেষী হইয়াও অষ্টম হেনরি বিধি-ষট্‌ক (the statute of six articles) প্রণয়ন করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। অশ্বোল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তৃণভক্ষণ ইংরাজ-জাতির কোষ্ঠিতে লিখে না। ভারতেও এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কুমারিল, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি এক বা একাধিক রাজাকে আশ্রয় করিয়াই ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার ব্যাপারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাজা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক শূদ্র-তপস্বীর মস্তক-চ্ছেদন ঘটনাটির ভিতরে যাহাই থাকুক, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের একাধি-পত্যকালে প্রজার মধ্যে ধর্ম্মহানি-নিবারণ উদ্দেশ্যেই যে ইহা আচরিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তবেই বলিতে হয় যে, আমাদের এখন প্রকৃষ্ট, নিরাপদ্ ও অভ্যুদয়সাধক আর্য্যপথ নাই, এবং যাহা আছে বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা ছিন্ন ভিন্ন, দুর্ভেদ্য ও দুরধিগম্য ; আবার দুরধিগম্য বলিয়াই কর্ডলাইন, অপিচ গ্রাণ্ডকর্ডলাইনের এত ছড়াছড়ি। যে সমাজে আর্য্যপথের এমন দুরবস্থা, সে সমাজের প্রাণ অতীব দুর্ব্বল, এবং সমাজের প্রাণ অতীব দুর্ব্বল বলিয়াই সমাজ-নাশ-চিকীর্ষু বিপক্ষ-বর্গের আঘাত সহ্য করিতে পারে না। ঘটিয়াছেও তাহাই। যখন আর্য্য-পথ ছিল, তখন মনু, পরাশর, অশোক, বিক্রমাদিত্য, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি আসিয়াছিলেন ; আবার আর্য্য-পথের বিলোপ বা ভগ্ন দশার সঙ্গে সঙ্গে

রামানন্দ, বল্লভ, কবির, নানক, চৈতন্যদেব, আউলচাঁদ, রামমোহন, কৃষ্ণঘোষ, কৃষ্ণমোহন, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির আত্মা যাতায়াত করিতেছেন ও করিবেন।

সাতাশটি জেলায় গঠিত বর্ত্তমান বঙ্গের চাটগাঁ বিভাগে শতকরা পঁচাত্তর এবং ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগে শতকরা পঁয়ষট্টি জন বাঙ্গালী ইসলামধর্ম্মী; কাজেই বলিতে হয়, বেহার প্রভৃতি প্রদেশের হিন্দুসমাজ অপেক্ষা বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ অত্যধিক ভঙ্গপ্রবণ, অপিচ ভারতবর্ষের 'হিন্দুস্থান' নামটি সর্ব্বত্র অস্বর্থ হইতে পারে কিন্তু এই গোটা বাঙ্গলাদেশেই অস্বর্থ হইতে পারে না; কেন না, বাঙ্গলা এখন খৃষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি ব্যতীত ১৯১১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ২০৩১১১৯৩ হিন্দু ও ২৩৯৮৯১১৯ মুসলমানের বাসভূমি, সুতরাং খাঁটি বাঙ্গলাকে এখন ইসলামস্থান বলাই সঙ্গত! জানি না, বিজ্ঞ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবেন কি না, তবে যদি তাঁহাদের প্রকৃতই দেশাত্মবোধ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ শিহরিয়া উঠিবার কাল আসিয়াছে বলিতে হইবে।

ইহার উপর বৈদেশিক ভাবের প্রভাব আছে; নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার আছে; ভদ্রলোক আখ্যায় আখ্যাত লোকের দ্রুত গতিতে বংশক্ষয় আছে, তাহাদের শোচনীয় আর্থিক অভাব আছে, অনাবশ্যক বিলাসিতা আছে, আয়ুঃক্ষয়কর ইন্দ্রিয়-পরতা আছে; সর্ব্বসাধারণের জন্য ম্যালেরিয়া আছে; সর্ব্বোপরি হিন্দু-বৌদ্ধ-ইহুদী-গ্রীক-রোমক-খৃষ্টীয়-মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র সমাজ ও ইতিহাসের অজ্ঞাত ও অপরিচিত নব্য-প্রাচীন উভয়পন্থী বাঙ্গালীর হিন্দুর কন্যাদায়-চিন্তাব্যাধি আছে। অতএব এতগুলি বা ততোধিক সমস্যা মাথায় লইয়া যদি সমাজ-সংস্কার ও জাতীয় অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে সাহসী হও; তবে আইস, অগ্রে আর্য্য-পথ নির্ণয় করিয়া পায়ে ভর দিয়া জোড় করিয়া দাঁড়াও, নচেৎ যাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই, তাহার চলিবার স্থান কোথায়? এখন, কোথায় গেলে পথ মিলিবে, তাহার উত্তর দিতে হইবে, এবং উত্তর যদি ঠিক হয়, তবে পূর্ব্বে যে বলিয়াছি,—ধর্ম্ম সমাজ-দেহের আত্মা,—সে কথারও প্রামাণ্য স্থাপিত হইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীগুরুদাস সান্যাল।

উদ্বোধন।

আজি—বিধাতার পরসাদে জাগো মঙ্গলক্ষণে।
ঐ—শুভ শঙ্খের নাদে পুণ্যের আবাহনে॥
আজি—বিষ্ণুপদ-ছায়াতলে পূত অভিষেক-জলে
ধীরে—নত কর দুটী শিরে আশীষের পরশনে॥
ওগো—আজি বৈদিক মন্ত্রে লহ লহ মহানীতি,
দুটী—হৃদয়ের বীণাযন্ত্রে গাহ নিতি সেই গীতি,
আজি—দূর করি মোহজালে সব সংশয় ভীতি,
নব—গৃহীর সাধনতন্ত্রে ব্রতী হও দুই জনে॥
ওগো—লহ আজি প্রেমদীক্ষা হোমানল পাশে জাগি
লহ—কর্ম্মযোগের শিক্ষা গৃহ-ধর্ম্মের লাগি'
দোঁহে—জানু পাতি জুড়ি পাণি হৃদয়ের বল মাগি
আজি—কর তাঁর কৃপা-ভিক্ষা প্রেমারুণ দু'নয়নে।

শ্রীকালিদাস রায়।

কবিকথা

(কালিদাস)

মালবিকাগ্নিমিত্র।

(৩)

নববসন্তসমাগমে তরুলতা সমুদায় কুসুমরাশিতে বিভূষিত হইয়া উঠিল, প্রমদবন বিচিত্র শোভায় চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিল, দক্ষিণ বাতাস কুসুমরেণু অপহরণ করিয়া দিগ্বধূদিগকে উপহার দিতে আরম্ভ করিল, পক্ষীর

কুজনে ও ভ্রমর গুঞ্জনে উপবনের চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু মহিষীর প্রিয় স্বর্ণাশোক তরুতে আজিও কুসুম-বিকাশ হইল না। মানিনী মধুকরিকা তজ্জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িল, এবং মহিষী ধারিণীকে সে কথা জানাইবার জন্য ইচ্ছা করিতে লাগিল। এই সময়ে পরিব্রাজিকার আদেশে তাঁহার পরিচারিকা সমাহিতিকা, মহিষীর উপহারের জন্য একটি দাড়িম্ব ফলের আশায় তথায় উপস্থিত হইল। সে দেখিল যে, মধুকরিকা স্বর্ণাশোক তরুটিকে সস্পৃহনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে। মধুকরিকার সহিত সমাহিতিকার পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। এক্ষণে দুই সখীতে মিলিয়া কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দুই একটি রসালাপের পর তাহারা রাজা ও মালবিকার সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে গণদাস ও হরদত্তের বিবাদ, তাহার পর মালবিকার প্রতি রাজার অনুরাগ, মহিষীর জন্য তাঁহার ভীতভাবে অপেক্ষা, মালবিকারও ম্লান মালতীমালার ন্যায় পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় তাহারা বেশ জমাট বাঁধাইয়া তুলিল। তাহার পর সমাহিতিকা মধুকরিকার নিকট হইতে একটি শাখাসমেত দাড়িম্ব গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজিকার নিকট অগ্রসর হইল। মানিনীও স্বর্ণাশোকের কুসুমবিকাশের জন্য দোহদের প্রয়োজন জানাইতে মহিষীর নিকট গমন করিল।

রাজা মালবিকার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিদূষক তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। উভয় বয়স্যের মিলন ঘটিলে, রাজা আপনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রিয়ার স্পর্শ সুখে বঞ্চিত হইয়া শরীর দিন দিন কৃশ হইয়া উঠিতেছে বটে, তাঁহার ক্ষণমাত্র অদর্শনে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতেছে বটে, কিন্তু হৃদয় সেই হরিণাক্ষী হইতে কখনও বিযুক্ত হয় নাই। তবে কেন সুখলগ্ন হইয়াও সে পরিতপ্ত হইয়া উঠিতেছে।" বিদূষক বকুলাবলিকার দ্বারা মালবিকার মিলন ঘটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া রাজাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। তবে মহিষী ধারিণী যে তাঁহাকে নাগরক্ষিত নিধির ন্যায় সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, বকুলাবলিকার সে কথাটিও রাজাকে জানাইলেন। শুনিয়া রাজা বলিতে লাগিলেন যে, বিঘ্নসঙ্কুল বিষয়ে অভিনিবিষ্ট করিয়া কামদেব এরূপ পীড়ন করিতেছে যে, আমি তিলার্দ্ধ কালও বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছি না। কোথায় আমার

হৃদয়প্রমাথিনী পীড়া, আর কোথায় তাঁহার বিশ্বস্ত আয়ুধ! তবে যে তাঁহাকে মৃদু ও তীক্ষ্ণতর বলে, তাহা লক্ষিত হইতেছে বটে। বিদূষক তাঁহাকে আশ্বাস-বাক্য প্রদান করিয়া ধৈর্য্যধারণে উপদেশ দিলেন। দিবাবসানে রাজার কোন কার্য্যে চিত্ত আকৃষ্ট না হওয়ায়, তিনি সময়যাপনের জন্য কোথায় যাই-বেন চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিদূষক বলিলেন যে, নববিকসিত রক্তকুরু-বক কুসুম উপহার পাঠাইয়া রাণী ইরাবতী অদ্য তোমার সহিত দোলা-রোহনের ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন, তুমি তাহাতে স্বীকৃতও হইয়াছিলে। অতএব প্রমদবনের দিকেই অগ্রসর হই, চল। রাজা বলিলেন যে, প্রমদবনে যাইতে পারিব না। কারণ স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ চতুর। তোমার সখী কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিবেন না যে, আমি অন্যের প্রতি আসক্ত? বরঞ্চ তাঁহার অনুরোধ খণ্ডন করা যাইতে পারে, কারণ খণ্ডনের নানা কারণ আছে, কিন্তু মনস্বিনী রমণীর প্রতি ভাবশূন্য অনুকূলাচরণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রদর্শিত হইলেও, তাহা প্রতিকূলাচরণই হইয়া থাকে। বিদূষক কিন্তু অন্তঃপুর-কামিনী-গণের প্রতি একবারে দাক্ষিণ্য পরিত্যাগ উচিত নহে বলিলে, রাজা প্রমদ-বনের দিকে গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন উভয় বয়স্যে মিলিয়া প্রমদ-বনের দিকে যাইতে লাগিলেন।

উদ্যানের নিকট উপস্থিত হইলে বসন্তাগমে তরুলতাগুলির পত্র সকল দক্ষিণা নিলভরে সঞ্চালিত হইতেছে দেখিয়া বিদূষক রাজাকে কহিলেন যে, প্রমদ-বন পল্লবাঙ্গুলি দ্বারা তোমাকে প্রবেশের জন্য আহ্বান করিতেছে। রাজা সমীর-স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বসন্ত অভিজাত পুরুষেরই ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। দেখ মধু ঋতু আমত্ত কোকিলকুলের শ্রুতি-সুখকর কূজন দ্বারা অনুকম্পাভরে মদন-পীড়া সহ্য হইতেছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া চূত-কুসুম-সুরভিত দক্ষিণানিল দ্বারা যেন অঙ্গে গাঢ়স্পর্শ করতল ব্যাপৃত করিতেছেন।" বিদূষক রাজাকে শান্তিলাভের জন্য প্রমদবনে প্রবেশ করিতে বলিলে, উভয়ে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহার পর বিদূষক বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, বয়স্য বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখ, বনলক্ষ্মী তোমাকে প্রলোভিত করার জন্য বসন্ত-কুসুম-বেশ ধারণ করিয়া যুবতীজনের বেশকেও লজ্জা প্রদান করি-তেছেন। রাজা বলিয়া উঠিলেন, "আমিও তাহা সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতেছি।

রক্তাশোক-শোভায় বিম্বাধরের অলক্ত রাগ তিরস্কৃত, শ্যামরক্ত কুরুবকে পত্রলেখা প্রত্যাখ্যাত, ভ্রমরাঞ্জন তিলফুলে তিলকক্রিয়া পরাজিত হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং বসন্ত-শোভা রমণীগণের সুখপ্রসাধন যে অবজ্ঞা করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহাদের এইরূপ বসন্ত-শোভা সন্দর্শনের সময় মালবিকা প্রমদবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিদূষকের কৌশলে মহিষী ধারিণী দোলা হইতে পড়িয়া যাওয়ায়, তিনি পাদব্যাধায় কাতরা হইয়া পড়েন। সুতরাং মহিষী স্বয়ং তাঁহার সাধের স্বর্ণাশোকের দোহদ প্রদানে অশক্তা হন। রাজ্ঞী মালবিকাকে দোহদ প্রদানের জন্য আদেশ দেন, এবং পাঁচ রাত্রি মধ্যে অশোকের কুসুম বিকাশ ঘটিলে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া পুরস্কার প্রদান করারও আশ্বাস প্রদান করেন। সহচরী বকুলাবলিকা মালবিকার চরণ অলক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া তাহাতে মহিষীর নূপুর বিন্যাস করার জন্য আদিষ্ট হন। এবং মালবিকা কুসুমোদ্গমের জন্য অশোকের অঙ্গে চরণাঘাত দ্বারা দোহদ প্রদানে উপদিষ্টা হন। অগ্রেই মালবিকা প্রমদবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া উৎকণ্ঠিতার ন্যায় বলিতে লাগিলেন যে, মহারাজের হৃদয় না জানিয়া যে তাঁহার অভিলাষিণী হইয়াছি, তজ্জন্য আমি নিজেই লজ্জিতা, স্নেহময়ী সখীগণের নিকট একথা বলিতে আমার শক্তিই বা কোথায়? না জানি কতকাল এই অসহ্য মদন-ব্যাথা ভোগ করিতে হইবে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি আপনার বনপ্রবেশের উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া পড়েন। পরে তাহা স্মরণ করিয়া স্বর্ণাশোক-তলে যাইতে না যাইতে নূপুর হস্তে বকুলাবলিকা যে তাঁহার অনুসরণ করিবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া, মালবিকা তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে মুহূর্ত্তকাল নির্জ্জনে বিলাপ করিবার অভিলাষ করিতে লাগিলেন। বিদূষক মালবিকাকে দেখিতে পাইয়া রাজাকে বলিলেন যে, বয়স্য, সীধুপানে উদ্বেজিত তোমার শর্করাখণ্ড উপস্থিত। রাজা প্রথমে বুঝিতে না পারায়, বিদূষক মালবিকার আগমনের কথা জানাইলেন। শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন, "এক্ষণে আমি জীবন ধারণে সমর্থ হইব। সারসের কলনাদে তরু-সমাচ্ছন্ন নদী সন্নিকটে জানিয়া পিপাসার্ত্ত পথিকের হৃদয় যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ তোমার মুখে সমীপগতা প্রিয়ার কথা শুনিয়া আমারও তাহাই ঘটি-

তেছে।" বিদূষক তরুরাজিমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্তা ও তাঁহাদের অভিমুখিনী মালবিকাকে দেখাইলে, রাজা সেই সর্ব্বাবয়বসম্পন্না আয়তাক্ষীকে দেখিয়া নিজ জীবনের ন্যায়ই মনে করিতে লাগিলেন। মালবিকাকে একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া রাজা বলিতে আরম্ভ করিলেন."সখে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে ইঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মনোরমা বলিয়াই বোধ হইতেছে। শরকাণ্ডের ন্যায় পাণ্ডু গণ্ডস্থলে ও পরিমিত আভরণে ইহাকে বসন্তে পাণ্ডুপত্রা কতিপয়কুসুমভূষনা কুন্দলতার ন্যায় অনুভব হইতেছে।" শুনিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিলেন যে, ইনিও দেখিতেছি তোমারই ন্যায় মদন-ব্যাধিতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। রাজা উত্তর দিলেন, "সুহৃদের চক্ষে এইরূপই বোধ হয় বটে।"

এই সময়ে মালবিকা স্বর্ণাশোকের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সে সুললিত দোহদের অপেক্ষায় কুলবেশ ত্যাগ করিয়া উৎকণ্ঠিতা তাঁহারই অনুকরণ করিতেছে। তখন তিনি তাহার প্রচ্ছায়-শীতল শিলাপট্টকে উপবিষ্ট হইয়া আত্মবিনোদনে প্রবৃত্ত হইলেন। অশোক যে উৎকণ্ঠিতা তাঁহার অনুকরণ করিতেছে একথা মালবিকা ব্যক্তও করিয়াছিলেন। বিদূষক তাহা শুনিয়া রাজাকে বলিলেন যে. মালবিকার উৎকণ্ঠার কথাত শুনিলে? রাজা কহিলেন, "তুমি যাহা অনুমান করিতেছ. আমার মনে তাহা লইতেছে না। কারণ যখন মলয়ানিল কুরুবক-রেণু বহন করিতে ও কিসলয়পুট ভেদ দ্বারা শীকরসিক্ত হইতে থাকে, তখনই ত অনিমিত্ত উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দেয়।" মালবিকা অশোকতলে উপবিষ্ট হইলে রাজা ও বিদূষক লতান্তরাল হইতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে অদূরে ইরাবতীর ন্যায় যেন কাহাকে দেখা যাইতে লাগিল। বিদূষক রাজাকে তাহা জানাইলে রাজা উত্তর দিলেন যে, কমলিনীকে পাইলে হস্তী কখনও হাঙ্গরকে গ্রাহ্য করে না। মালবিকা তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাওয়ায় আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "যে. মনোরথ অবলম্বনহীন হইয়া সীমা পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছে, হৃদয় তাহা হইতে নিবৃত্ত হও; কেন আমায় আর বৃথা ক্লেশ দিতেছ?" রাজা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রিয়ে. প্রেমের প্রতিকূলাচরণটি দেখিয়া লও। তুমি ঔৎসুক্যের কারণ ব্যক্ত করিতেছ বটে, কিন্তু অনুমানের দ্বারা তাহার তত্ত্ব স্থির হইতেছে না; তথাপি তুমি যে ক্লেশ পাইতেছ তাহাও লক্ষ্য করি-

তেছি।" সেই সময়ে বকুলাবলিকাকে আসিতে দেখিয়া বিদূষক বলিলেন যে, এইবার তোমার সংশয় দূর হইবে। যাহার নিকট তোমার প্রণয়-প্রস্তাব করিয়াছিলাম, সেই বকুলাবলিকা নির্জ্জনে ইহার নিকট উপস্থিত হইতেছে। রাজা উত্তর দিলেন যে, আমাদের কথা কি তাহার মনে আছে? বিদূষক কহিলেন, "সেই দাসী-দুহিতা কি ইহার মধ্যেই এই গুরুতর বিষয়টি ভুলিয়া যাইবে? কই আমিত বিস্মৃত হই নাই।"

বকুলাবলিকা চরণালঙ্কারহস্তে উপস্থিত হইয়া মালবিকাকে সুখপ্রশ্ন করিলে, মালবিকাও তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। তাহার পর বকুলাবলিকা অলক্ত ও নূপুর পরাইবার জন্য মালবিকাকে তাঁহার পা বাড়াইতে বলিলে, মালবিকা মনে মনে সুখের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতেছিলেন এবং এই ভূষণ-বিন্যাসকে মরণালঙ্কার বলিয়াই অভিহিত করিতে লাগিলেন। বকুলাবলিকা তাঁহাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া স্বর্ণাশোকের কুসুমোদ্গমের জন্য রাণীর ঔৎসুক্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। তখন মালবিকা 'আমায় ক্ষমা করিও' বলিয়া আপনার পা বাড়াইয়া দিলে, বকুলাবলিকা 'তোমায় আমায় এক শরীরই ত' বলিয়া চরণ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। রাজা প্রথমে মালবিকার বন-প্রবেশের কারণ বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে বুঝিলেন যে, স্বর্ণাশোকের দোহদের জন্যই তিনি আগমন করিয়াছেন। মালবিকার চরণে অলক্তক-বিন্যাস দেখিয়া রাজা বিদূষককে বলিতে লাগিলেন, "বয়স্য, প্রিয়ার পদ-প্রান্তে নিবেশিত তরল রাগরেখাকে হরদগ্ধ মদনদ্রুমের প্রথম পল্লববিকাশ বলিয়াই মনে হইতেছে।" বিদূষক কহিলেন যে, ইহার চরণের উপযোগী প্রসাধনই হইতেছে। রাজা উত্তর দিলেন, "তুমি যথার্থই বলিয়াছ, নবকিসলয়-রক্তিম ও প্রস্ফুরিত নখরুচি পদাগ্রদ্বারা এই ষোড়শীর দোহদাভিলাষী অকুসুমিত অশোককে ও নবাপরাধী কাওকে প্রহার করাই উচিত।" বিদূষক কহিলেন যে, ইনি শীঘ্রই অপরাধী তোমাকে প্রহার করিবেন। 'সিদ্ধিদর্শী ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য্য' বলিয়া রাজা উত্তর দিলেন। এই সময়ে ইরাবতী প্রমত্ত-অবস্থায় সহচরী নিপুণিকার সহিত আলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ইরাবতী প্রমদবনে দোলারোহণে রাজার সহিত আমোদ করিতে অভিলাষ করিয়া গৌতমের দ্বারা সে কথা বলিয়া পাঠান। বিদূষকও রাজাকে লইয়া

যাইবেন বলিয়া সংবাদ দেন। এক্ষণে ইরাবতী নিপুণিকার সহিত প্রমদবনে প্রবেশ করিয়া দোলাঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা মনে করিলেন, রাজা বুঝি রহস্য করিয়া কোন স্থানে লুক্কায়িত আছেন। উভয়ে রাজার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া অশোকতলে যাইতে যাইতে দেখিলেন, বকুলাবলিকা মালবিকার চরণ অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত করিতেছে ও তাঁহার নিকট মহিষী ধারিণীর নূপুরযুগলও রহিয়াছে। ইরাবতীর মনে মালবিকার প্রমদবনে আগমন যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। নিপুণিকা মহিষীর নূপুর দেখাইয়া তাঁহারই আদেশে অশোক-দোহদের জন্য মালবিকার আগমন বুঝাইয়া দিলেও ইরাবতীর মন শান্ত হইতে পারিল না। রাজাকে অন্বেষণ করিতে আর যেন তাঁহার চরণ অগ্রসর হইতেছিল না। তাঁহারা উভয়ে সেই স্থান হইতে মালবিকা ও বকুলাবলিকার আলাপন শুনিতে লাগিলেন। বকুলাবলিকা মালবিকাকে অলক্তক-রাগ-বিন্যাস কেমন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতেছিল। মালবিকা বলিতেছিলেন যে, আমার নিজের পা বলিয়া প্রশংসা করিতে লজ্জা পাইতেছি ; তুমি প্রসাধন-কার্য্যে সুনিপুণা বট। বকুলাবলিকা উত্তর করিল "এ বিষয়ে আমি মহারাজের শিষ্য।" বিদূষক অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তবে গুরুদক্ষিণার জন্য উহাকে সত্বর লইয়া আইস।" মালবিকা 'বকুলাবলিকার এ বিষয়ে কোন গর্ব্ব নাই' বলিলে, বকুলাবলিকা উত্তর দিল, "গুরূপদেশের অনুরূপ চরণ দুটি পাইয়া আজ আপনাকে গর্ব্বিতা মনে করিতেছি।" পরে সে মনে মনে কহিতে লাগিল যে, যাহা হউক, আমার দুতিগিরি সফল হইল। সে পুনর্ব্বার মালবিকাকে বলিল যে, চরণে রাগ নিক্ষেপ শেষ হইয়াছে. এক্ষণে মুখমারুতে তাহা শুকাইতে বাকি ; তবে এখানে বেশ বাতাস আছে। রাজা শুনিয়া বিদূষককে কহিলেন, "সখে, এই সময়েই ইহার চরণের অলক্ত-রাগ মুখমারুতের দ্বারা শুশ্রূষা-রূপ সেবার মুখ্যতর অবকাশ উপস্থিত।" বিদূষক উত্তর দিলেন, "তার জন্য দুঃখ কেন ? তোমাকে চিরদিনই উহাই করিতে হইবে।" বকুলাবলিকা মালবিকাকে বলিতেছিল, "তোমার পাখানি রক্তপদ্মের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই বার মহারাজের অঙ্কগতা হও।" শুনিয়া রাজা কহিলেন, "ইহাই আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ।" মালবিকা বলিলেন যে, তুমি যাহা তাহা বলিও না। বকুলা-

বলিকা 'আমি যাহা বলিবার তাহাই বলিয়াছি' বলিয়া উত্তর দিল। মালবিকা কহিলেন যে, তুমি আমায় ভালবাস বলিয়াই এরূপ বলিতেছ। সঙ্গে সঙ্গে বকুলাবলিকা বলিল, "কেবল আমিই তোমাকে ভালবাসি না, গুণগ্রাহী মহারাজাও তোমাকে ভালবাসেন।" মালবিকা উত্তর দিলেন, "তুমি মিথ্যা বলিতেছ, কৈ আমাতে ত কোনই গুণ নাই।" বকুলাবলিকা বলিতে লাগিল, "তোমাতে গুণ নাই সত্য, তাই মহারাজ দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছেন। এক্ষণে ভালবাসার দ্বারাই ভালবাসার পরীক্ষা হয়, এই সুজন-বাক্যটি প্রমাণ করিয়া দেও দেখি?" মালবিকা কহিল, "তুমি আপন মনে ও কি বলিয়া যাইতেছ?" বকুলাবলিকা উত্তর দিল, "ইহার এক বর্ণও আমার নিজ মুখের নহে। প্রণয়ের এই মৃদু মধুর কথাগুলি মুখান্তরিত বলিয়াই জানিবে।" মালবিকা মহিষীর ভয়ে ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায়, বকুলাবলিকা কহিল যে, ভ্রমর-পতনের ভয়ে বসন্ত-সর্ব্বস্ব চূতাঙ্কুর কি কেহ ভূষণ করিতে ইচ্ছা করে না? তখন মালবিকা বলিয়া উঠিলেন যে, তবে আমার এই বিপদে তুমি সহায়া হও। শুনিয়া বকুলাবলিকা উত্তর করিল, "আমি বকুলাবলিকা, বিমর্দ্দ সুরভি; আমাকে যতই মর্দ্দন করিবে ততই সৌরভ বাহির হইবে"। রাজা বকুলাবলিকার কথা শুনিয়া তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কারণ বকুলাবলিকা মালবিকার মনোভাব অবগত হওয়ার পর প্রস্তাব করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইলেও, চতুর বচনবিন্যাসে নিজ নির্দেশ জ্ঞাপিত করিয়া, প্রণয়ীজনের প্রাণ যে দূতীর অধীন ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছিল। বকুলাবলিকা মালবিকার দ্বিতীয় চরণটিও লইয়া তাহা অলক্তক-রঞ্জিত করিল। তাহার পর চরণে মহিষীর নূপুর পরাইয়া বলিল যে, এইবার অশোকের কুসুমবিকাশের জন্য দোহদের ব্যবস্থা কর। তখন মালবিকা ও বকুলাবলিকা উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাদের সম্মুখে নব-পল্লব-ভূষিত শাখাবিস্তার করিয়া অশোক তরুটি শোভা পাইতেছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বকুলাবলিকা মালবিকাকে বলিল যে, দেখ দেখি, অনুরাগ-স্তবে কে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। মালবিকার মনে তখন রাজার মূর্ত্তিই জাগিতে ছিল, তিনি সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "কে মহারাজ?" বকুলাবলিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর দিল যে, মহারাজ নহেন। আমি অশোকের কথাই বলিতেছি। ইহার পল্লবগুলি লইয়া কর্ণভূষণ কর। বিদূষক রাজাকে

মালবিকার কথায় লক্ষ্য করিতে বলিলে, রাজা বলিতে লাগিলেন, অনুরক্ত লোকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এক পক্ষে উদাসীন আর অপর পক্ষে উৎকণ্ঠিত, এই উভয়ের মিলন ঘটিলেও তাহা আমার নিকট সুখকর বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু সমানুরক্ত দুজনার পরস্পর প্রাপ্তির পক্ষে নিরাশা থাকিলেও, তাঁহাদের অবসানও বরঞ্চ ভাল বলিয়াই মনে করিয়া থাকি।" এই সময়ে মালবিকা অশোক-পল্লবে কর্ণভূষণ করিয়া কুসুমবিকাশের জন্য তরু-গাত্রে পদাঘাত করিলেন। তাহা দেখিয়া রাজা বিদূষককে বলিয়া উঠিলেন, "সখে, অশোকের কিসলয় লইয়া সুন্দরী কর্ণভূষণ করিলেন, এবং অশোকও ইহার চরণ-কিসলয়ের স্পর্শ অনুভব করিল।—এইরূপ সদৃশবিনিময়ে দুজনেই বঞ্চিত হইল বলিয়া মনে করিতেছি।" বকুলাবলিকা মালবিকাকে কহিল, "সখি, এই অশোকটি তোমার চরণ-সংস্কার লাভ করিয়া যদি কুসুম-বিকাশে বিলম্ব করে, তাহা হইলে উহাকেই নির্গুণ বলিতে হইবে, তোমার কোন দোষ নাই।" রাজাও বলিতে লাগিলেন, "অশোক, এই ক্ষীণমধ্যার মুখর-নূপুরযুক্ত পদ্ম-কোমল চরণস্পর্শে সংকৃত হইয়া যদি সত্ত্ব তোমার কুসুমোদ্গম না হয়, তাহা হইলে প্রণয়ি-সাধারণের ন্যায় ললিত দোহদটি তোমার বৃথাই বহন করা হইবে।" তাহার পর তিনি ইহাদের বাক্যানুসরণ করিয়া তথায় গমন করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, বিদূষকও মালবিকার সহিত একটু পরিহাস করার ইচ্ছায় রাজাকে লইয়া তাঁহাদের সমীপস্থ হইলেন। উপস্থিত হইয়াই গৌতম মালবিকাকে পরিহাস করিয়া কহিলেন, "মহারাজের প্রিয়বয়স্য অশোকটিকে আপনার বামপাদে তাড়না করা কি উচিত হইয়াছে?" রাজা ও বিদূষককে সহসা উপস্থিত দেখিয়া মালবিকা ও বকুলাবলিকা একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর বিদূষক বকুলাবলিকাকে বলিতে লাগিলেন যে, বকুলাবলিকে, তুমি এ সমস্ত জানিয়াও কেন ইঁহার অবিনয়ে বাধা দেও নাই? বিদূষকের কথায় মালবিকা কিছু ভীতা হইতেছিলেন, কিন্তু বকুলাবলিকা উত্তর দিল যে, ইনি মহিষীরই আদেশ পালন করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ইঁহার সাধ্য নহে। সুতরাং 'মহারাজ যেন ইঁহার প্রতি অপ্রসন্ন না হন' এই বলিয়া বকুলাবলিকা মালবিকাকে লইয়া রাজাকে প্রণাম করাইল, এবং নিজেও করিল। রাজা 'তাহা হইলে কোন দোষ নাই'

বলিয়া মালবিকার হাত ধরিয়া উঠাইলেন। বিদূষকও বলিলেন যে, দেবীর সম্মান রক্ষা করাই কর্ত্তব্য বটে। রাজা মালবিকাকে কহিলেন, "সুন্দরি তোমার কিসলয়-মৃদু বামচরণ কঠিন তরুস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া ব্যথিত হয় নাই ত?" শুনিয়া মালবিকা লজ্জিতা হইয়া উঠিলেন, এবং তিনি বকুলাবলিকাকে বলিলেন যে চল যাই মহিষীকে তাঁহার আদেশপালনের কথা নিবেদন করি। বকুলাবলিকা উত্তর দিল যে, তবে মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লও। রাজা কহিলেন,"ভদ্রে, যাইবার সময় তবে আমার অনুরোধটি শুনিয়া যাও।" বকুলাবলিকা মালবিকাকে রাজানুরোধটি মনোযোগ সহকারে শুনিতে বলিলে, রাজা বলিতে আরম্ভ করিলেন, —"সুন্দরি, অশোকের মত এ জনারও অনেক দিন হইতে সুখপুষ্পের বিকাশ ঘটে নাই; তাই বলিতেছি, তোমার স্পর্শামৃত-দানে তোমাতেই অনুরক্ত ভক্তের সাধটি পূরণ কর।" সেই সময়ে ইরাবতী সহসা উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,"ইহারে সাধটি পূরণ কর গো। অশোকের ফুল দেখা যাইতেছে না, ইঁহাতে ফুল ও ফল দুইই দেখা দিবে।"

মালবিকাকে প্রমদবনে দেখিয়াই ইরাবতীর মনে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। তাহার পর বকুলাবলিকার ও মালবিকার আলাপন শুনিয়া তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। নিপুণিকা বকুলাবলিকার কথনভঙ্গিটি তাঁহাকে ভাল করিয়াই লক্ষ্য করিতে বলিতেছিল। তাহার পর রাজা ও বিদূষককে মালবিকার নিকটে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ইরাবতী সমস্তই বুঝিয়া লইয়াছিলেন। তবে মহিষী ধারিণীর আদেশে অশোক-দোহদের জন্য যে মালবিকার আগমন ইহাতে তাঁহার অবিশ্বাস হয় নাই। সে যাহা হউক, মালবিকার প্রতি রাজার অনুরাগ অসহ্য বোধ করিয়া, ইরাবতী নীরব থাকিতে না পারিয়াই সহসা তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া পড়িলেন। অবশ্য নিপুণিকাও তাঁহার অনুসরণ করিল। ইরাবতীকে উপস্থিত দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। রাজা গোপনে বিদূষককে উপায় স্থির করার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বিদূষক তাঁহাকে জঙ্ঘাবল আশ্রয় করিতে উপদেশ দিলেন। ইরাবতী বকুলাবলিকাকে বলিতে লাগিলেন, "বকুলাবলিকে, আরম্ভটি ত সুন্দর করিয়াই তুলিয়াছ। এক্ষণে আর্য্যপুত্রের প্রার্থনাটি সফল করিয়া দেও।" 'দেবী প্রসন্না হউন, মহারাজের ভালবাসা পাইবার যোগ্যতা আমাদের

কোথায়? বকুলাবলিকা ও মালবিকা উভয়ে এই কথা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন ইরাবতী বলিতে লাগিলেন, "পুরুষেরা কি অবিশ্বাসী, ব্যাধগানে মুগ্ধ হরিণীর ন্যায় আমিও যে প্রতারিত হইব, ইহা জানিতে পারি নাই।" বিদূষক চুপে চুপে রাজাকে বলিলেন, "এইক্ষণ কিছু উত্তর দেওয়া উচিত, চৌর্য্যকার্য্যে ধরা পড়িলে, চোরকে বলিতে হয় যে, আমি চুরী করিতে আসি নাই, সিঁধ কাটা অভ্যাস করিতে আসিয়াছি।" তখন রাজা ইরাবতীকে কহিলেন যে, মালবিকার নিকট আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তোমার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া কোনরূপে সময় অতিবাহিত করিতে-ছিলাম। রাজার এ কথায় ইরাবতী সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি রাজাকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না, এবং রাজার সময় যাপনের বস্তুটির কথা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, তিনি রাজাকে কষ্ট দিতে আসিতেন না বলিয়াও প্রকাশ করিলেন। প্রমাদ উপস্থিত দেখিয়া বিদূষক কহিলেন যে, মহারাজের সরলতায় আপনার অবিশ্বাস করা উচিত নহে, ইনি দেবীর পরিচারিকাটিকে সহসা দেখিতে পাইয়া তাহার সহিত আলাপনাপরাধ মাত্র করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি। ভালই, সেই আলাপনই চলিতে থাকুক, আমি বৃথা কষ্ট পাই কেন? এই বলিয়া ইরাবতী সেস্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইরাবতী তাহাতে লক্ষ্য করিলেন না, এই সময়ে কটিদেশ হইতে তাঁহার মেখলা স্খলিত হইয়া চরণে নিপতিত হইল, ইরাবতী সেইভাবেই গমনে প্রবৃত্ত হইলেন, রাজা রাণীকে তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। ইরাবতী শঠ, তোমার হৃদয়কে আর বিশ্বাস করা যায় না বলিয়া উত্তর দিলেন। রাজা তখন বলিতে লাগিলেন, "এই চির-পরিচিতকে শঠ বলিয়া তিরস্কার করিতে পার, কিন্তু চরণ-পতিতা মেখলার প্রার্থনায় তুমি কোপ পরিহার করিতেছ না কেন?" এ দুষ্টাও তোমার অনু-সরণ করুক বলিয়া ইরাবতী মেখলা হস্তে লইয়া রাজাকে আঘাত করিতে উদ্যতা হইলেন। রাজা তখন বিদূষককে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ কটিদেশ হইতে অলক্ষিত ভাবে চ্যুত স্বর্ণ-মেখলা হস্তে লইয়া বাষ্পাকুলা ক্রুদ্ধা ইরাবতী বিদ্যু-দ্দামে মেঘরাজির বিন্ধ্যকে তাড়নার ন্যায় আমাকে প্রহার করিতে উদ্যতা

হইয়াছেন।" এই সব কথায় আমাকে আবার অপরাধিনী করিতেছ কেন বলিয়া ইরাবতী উত্তর দিলেন। তখন রাজা তাঁহার মেখলা-ধৃত হস্ত নামাইয়া বলিলেন, "অপরাধী আমার প্রতি উদ্যত দণ্ড সংহার করিয়া কুটিলকেশী তুমি দাসজনের বিলাস বাড়াইতেছ, আবার তাহার প্রতি কোপও করিতেছ? তাহার পর নিশ্চয়ই ইহা তোমার অভিমত বলিয়া, রাজা ইরাবতীর চরণে নিপতিত হইলেন। 'ইহাত মালবিকার চরণ নয়, যে তোমার সাধ পূর্ণ করিবে,' এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া ইরাবতী নিপুণিকাকে লইয়া সেস্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। বিদূষক রাজাকে উঠিতে বলিয়া কহিলেন যে, রাণী তোমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন। রাজা উঠিয়া আর ইরাবতীকে দেখিতে পাইলেন না। বিদূষক আবার বলিয়া উঠিলেন, "সখে, ভাগ্যে ইরাবতী এই অবিনয়ের জন্য অপ্রসন্না হইয়া গমন করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা পলায়ন করি চল, পাছে আবার তিনি মঙ্গলগ্রহের বক্রগতিতে রাশিতে প্রত্যাগমনের ন্যায় আমাদের অভিমুখিনী না হন। রাজা বলিতে লাগিলেন, "মদনের কি বৈষম্য! প্রিয়াপহৃত-চিত্ত আমার প্রণিপাত লঙ্ঘন করা ইরাবতীর অনুকূলা-চরণ বলিয়াই মনে হইতেছে, সেই কুপিতা প্রণয়িনী এইরূপ আচরণে উদাসীন ভাবেই অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবেন।"

(৪)

প্রমদবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া রাণী ইরাবতী মহিষী ধারিণী কেমন আছেন, জানিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করেন। মহিষী মহারাজের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ইরাবতী উত্তর দেন যে, মহারাজ এক্ষণে তোমার পূজায় বিরত আছেন, তিনি তোমার পরিচারিকার প্রাণবল্লভ হইয়া দাঁড়াইয়া-ছেন। মহিষী পরে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নাগকন্যার ন্যায় পাতালবাসের অনুমতি প্রদান করেন। বলা বাহুল্য মহিষীর আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইয়াছিল। মাধবিকা নামে সহচরী পাতালগৃহের দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হয়, মহিষীর অঙ্গুরীমুদ্রা প্রদর্শন ব্যতীত তাহাদের মুক্তির আর কোন উপায় ছিল না। রাজা একথা কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি বিদূষককে মালবিকার সংবাদ আনিতে পাঠাইয়া মনে মনে বলিতেছিলেন "তাঁর সম্বন্ধের কথা শুনিয়া আশায় বদ্ধমূল, তাঁহাকে দর্শন

করিয়া জাতানুরাগ পল্লব, তাঁহার হস্তস্পর্শে রোমোদ্গমচ্ছলে মুকুলিত মদনতরু বাঞ্ছনীয় ফলের রসাস্বাদন করাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।” সেই সময়ে বিদুষক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, রাজা তাঁহাকে মালবিকার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিদুষক উত্তর দিলেন যে, তাহার এক্ষণে বিড়াল-গৃহীত কোকিলার ন্যায় অবস্থা ঘটিয়াছে। রাজা তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে না পারায়, বিদুষক বুঝাইয়া বলিলেন যে, মহিষী ধারিণী তাঁহার ও বকুলাবলিকার পাতালবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার পর তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে অবগত করাইলেন, এবং পরিব্রাজিকার নিকট হইতে সে সমস্ত শুনিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন। রাজা তাঁহাদের কষ্ট স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন “বিকসিত-চূতসঙ্গিনীদ্বয় মধুরস্বরা কোকিলা ও ভ্রমরী শেষে কি প্রবল-বাত-সহিতা অকালবৃষ্টির দ্বারা কোটরগতা হইল?” তাহার পর তিনি বিদুষককে তাঁহাদের মুক্তির কোন উপায় আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, গৌতম রাজার কাণে কাণে তাহার স্থিরীকৃত উপায়ের কথা কহিলেন।

বিদুষক স্থির করিয়াছিলেন যে, যখন মহিষীর অঙ্গুরীমুদ্রা ব্যতীত তাঁহাদের মুক্তির আর কোন উপায় নাই, তখন কোনরূপে তাহার সংগ্রহের চেষ্টা করিতেই হইবে। সে বিষয়ে তিনি একটি কৌশলেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহিষী একটি নাগমুদ্রা-যুক্ত নূতন অঙ্গুরী প্রস্তুত করাইয়া অঙ্গুলিতে ধারণ করিয়াছিলেন। বিদুষক আপনাকে সর্পদষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিয়া চিকিৎসার সময় বিষ-বৈদ্যদ্বারা নাগমুদ্রা-যুক্ত অঙ্গুরীর প্রয়োজন জানাইয়া, মহিষীর সেই অঙ্গুরীটি সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি রাজাকে মহিষীর নিকট অগ্রে গমন করিতে বলিয়া, পশ্চাৎ সর্পদষ্টের ভাণ করিয়া উপস্থিত হইবেন বলিয়া গোপনে জ্ঞাত করেন, এবং এই কৌশলের সহায়তার জন্য প্রতিহারী জয়সেনাকেও চুপে চুপে অবগত করান হয়।

রাজা গিয়া দেখিলেন, মহিষী প্রবাত শয়নগৃহে স্বর্ণপীঠিকার উপর পদ স্থাপন করিয়া উপবিষ্টা আছেন। সহচরীরা ব্যথিতস্থানে রক্তচন্দন লেপন করিতেছে, এবং পরিব্রাজিকা তাঁহার নিকট বসিয়া গল্প শুনাইতেছেন। রাজা উপস্থিত হইলে মহিষী তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উঠিতে উদ্যতা হইলেন, রাজা তখন কহিলেন যে, তোমার ব্যথিত চরণ ও আমাকে কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন

নাই, মহিষী ও পরিব্রাজিকা রাজার জয় উচ্চারণ করিলে, রাজা মহিষীর বেদনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহিষী 'আজ কিছু বিশেষ' বলিয়া উত্তর দিলেন। সেই সময়ে বিদূষক 'রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমায় সর্পে দংশন করিয়াছে' বলিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত জড়াইয়া উপস্থিত হইলেন। গৌতম কেতকীকণ্টক দ্বারা দুই স্থানে ক্ষত চিহ্ন করিয়াছিলেন। রাজার জিজ্ঞাসায় বিদূষক উত্তর দিলেন যে, দেবীর দর্শনের জন্য পুষ্পসংগ্রহ করিতে যাওয়ায়, অশোক বৃক্ষের কোটর হইতে সর্পরূপ কাল বহির্গত হইয়া আমার দক্ষিণ হস্তে দংশন করিয়াছে। এই তাহার দন্তদ্বয়ের চিহ্ন বলিয়া তিনি কেতকী-কণ্টক-ক্ষত স্থান দেখাইলেন। মহিষীর জন্ম ব্রাহ্মণের এরূপ দশা ঘটিয়াছে জানিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উঠিলেন। পরিব্রাজিকা দষ্ট স্থানের ছেদন, দহন ও তথা হইতে রক্ত-মোক্ষণের উপদেশ দিলেন। রাজা ধ্রুবসিদ্ধি নামে বিষবৈদ্যের নিকট সংবাদ দিবার জন্ম প্রতিহারী জয়সেনাকে আদেশ দিলেন। জয়সেনা রাজাদেশ পালনে গমন করিলে, বিদূষক বিষ-কাতরতার ভাণ করিতে লাগিলেন এবং জীবনের আশা নাই ব্যক্ত করিয়া তাঁহার আশৈশব-বয়স্য রাজাকে তাঁহার মাতার ভার লওয়ার জন্ম অনুরোধ করিতেছিলেন। প্রতিহারী পুনরাগত হইয়া ধ্রুবসিদ্ধির উপদেশানুসারে গৌতমকে লইয়া গেল। যাইবার সময় বিদূষক মহিষীকে বলিতে লাগিলেন যে, বাঁচি কি মরি স্থির নাই, মহারাজের সেবা করিতে গিয়া আপনার নিকট যে অপরাধ করিয়াছি তাহা ক্ষমা করিবেন। মহিষী তাঁহার দীর্ঘায়ুর কামনা করিলেন, কিন্তু পরে জয়সেনা আবার আসিয়া কহিল যে, উদকুম্ভ-বিধানানুসারে ধ্রুবসিদ্ধি একটি সর্পমুদ্রার প্রয়োজন বলিয়া তাহার অন্বেষণে আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। তখন মহিষী নিজহস্ত হইতে আপনার অঙ্গুরীমুদ্রা খুলিয়া দিলেন। প্রতিহারী তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। কিছু পরে আসিয়া সে সংবাদ দিল যে, বিদূষক বিষমুক্ত হইয়াছেন এবং অমাত্য রাজকার্য্যের জন্ম রাজার সহিত সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা করিতেছেন। কার্য্যসিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হইল দেখিয়া রাজা মহিষীকে আতপাক্রান্ত স্থান হইতে শীতল স্থানে যাওয়ার উপদেশ দিয়া নিক্রান্ত হইলেন।

প্রতিহারীর নিকট হইতে মহিষীর অঙ্গুরীমুদ্রা লইয়া বিদূষক যে মাধবিকা

ও বকুলাবলিকার কারা-মোচনের জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কারারক্ষিকা মাধবিকা সহসা তাঁহাদের মোচনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রত্যুৎপন্নমতি বিদূষক উত্তর দিয়াছিলেন যে, রাজার নক্ষত্রদোষের শান্তির জন্য দৈবজ্ঞেরা বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়ার কথা জানাইলে, রাজা তাহারই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, এবং মহিষীও তাহাতে সম্মত হন। মহিষী ইরাবতীর মানরক্ষার জন্যই তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া মাধবিকার মনে আর কোন সন্দেহ হয় নাই, মালবিকা ও বকুলাবলিকার উদ্ধার সাধন করিয়া বিদূষক তাঁহাদিগকে প্রমদবনের সমুদ্রগৃহে রাখিয়া রাজাকে সংবাদ দিতে আসেন। রাজাও প্রমদবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিদূষকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর তাঁহার নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া তাহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করেন, এবং তিনি যে প্রকৃতই তাঁহার প্রিয়বয়স্য তাহাও অবগত করাইয়াছিলেন। রাজা বিদূষককে আরও বলিয়াছিলেন যে, সুহৃদের বুদ্ধিগুণেই প্রয়োজন সাধিত হয় না। কিন্তু স্নেহের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির সূক্ষ্ম পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পর উভয়ে সমুদ্রগৃহের দিকে অগ্রসর হইলে, রাজা দেখিতে পাইলেন যে, ইরাবতীর সহচরী চন্দ্রিকা পুষ্পচয়ন করিতে করিতে তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। রাজা বিদূষককে তাহা জানাইয়া ভিত্তির অন্তরালে উভয়ে লুক্কায়িত হওয়ার চেষ্টা করিলেন। বিদূষকও বলিলেন যে, চোর ও প্রেমিক উভয়েরই চন্দ্রিকাপরিহার করা কর্ত্তব্য বটে। তাহার পর রাজা মালবিকা তাঁহার জন্য কিরূপভাবে অপেক্ষা করিতেছেন দেখিবার ইচ্ছায় বিদূষককে লইয়া গবাক্ষপথ আশ্রয় করিলেন।

রাজা দেখিলেন, সমুদ্রগৃহস্থিত চিত্রপটে অঙ্কিত তাঁহার প্রতিকৃতিকে প্রণাম করিবার জন্য বকুলাবলিকা মালবিকাকে বলিতেছে। মালবিকা ব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া পরে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে স্বয়ং মহারাজ নহেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিকৃতিই অবস্থিত। তিনি তখন বকুলাবলিকাকে বলিলেন যে, আমাকে প্রতারণা করিতেছ? সেই সময়ে তাঁহার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া আবার বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। রাজা তাহা দেখিয়া বিদূষককে বলিলেন যে, দেখ সূর্য্যোদয়ে ও সূর্য্যাস্ত সময়ে পদ্মের যেরূপ অবস্থা হয়, এই সুবদনীর বদনে ক্ষণমাত্রেই সেই

দুই ভাবই দৃষ্ট হইল। মালবিকার কথা শুনিয়া বকুলাবলিকা বলিল,"তাইত,ইহা মহারাজের প্রতিকৃতিই বটে।" তখন আবার দুই জনে মিলিয়া সেই প্রতিকৃতি-কেই প্রণাম করা হইল। পরে মালবিকা বলিতে লাগিলেন যে, সে দিবস ভয়ে ভয়ে মহারাজকে দেখিয়া যেমন আমার তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই, আজিও তাহাই ঘটিতেছে। আমি ভাবিতেছি মহারাজকে দেখিয়া বুঝি তৃষ্ণা নিবারিতই হয় না। বিদূষক রাজাকে মালবিকার কথাগুলি শুনিতে বলিয়া কহিলেন যে, মালবিকা চিত্রে তোমাকে যেরূপ দেখিতেছেন, স্বয়ং তোমাকে তাহাই দেখিয়া-ছেন। তবে তুমি বৃথা সিন্দুকের রত্নভাণ্ডবহনের ন্যায় যৌবনগর্ব্ব বহন করিতেছ কেন? রাজা উত্তর দিলেন, "সখে, স্ত্রীজাতি কৌতূহলপরায়ণা হইলেও স্বভাবত লজ্জাশীলা হইয়া থাকে। দেখ, আয়তলোচনা রমণীগণ সম্মুখস্থিত প্রিয়তমের পূর্ণরূপ দেখিবার ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদের চক্ষু প্রিয়জনের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিপতিত হয় না।" চিত্রে অঙ্কিত ইরাবতীর প্রতি রাজার গ্রীবা পরিবর্ত্তন করিয়া স্নিগ্ধদৃষ্টিনিক্ষেপ, অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনীগণের প্রতি উপেক্ষা, তথায় গৌতমেরও অবস্থিতি এই সমস্ত দেখিয়া মালবিকার মনে ঈর্ষার উদয় হইতে-ছিল। বকুলাবলিকা তাহা অবগত হইয়া মালবিকাকে রাগান্বিত করার জন্য বলিতে লাগিল যে, ইরাবতীই রাজার প্রিয়তমা। সে কথায় রুষ্ট হইয়া মালবিকা 'তবে আমি কেন বৃথা কষ্ট পাইতেছি' বলিয়া অসূয়াসহকারে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। রাজা বিদূষককে তাহা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "সখে দেখ, ভ্রূভঙ্গের দ্বারা তিলক-রেখা ভিন্ন ভিন্ন, ও ওষ্ঠাধর কম্পিত করিয়া সুন্দরী অভিমানভরে মুখখানি এরূপভাবে ফিরাইয়া লইলেন যে, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, প্রণয়ীর অপরাধে কুপিত হইয়া কিরূপ ললিত অভিনয় করিতে হয়। তাহারই শিক্ষা প্রদর্শন করিলেন।" বিদূষক রাজাকে মানভঙ্গের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। অভিমানভরে মালবিকা সেস্থান পরিত্যাগে উদ্যতা হইলে বকুলাবলিকা পথাবরোধ করিয়া কহিল যে, তুমি কি সত্য সত্যই রাগ করি-য়াছ? মালবিকা উত্তর দিলেন যে, আমাকে যদি নিতান্তই ক্রুদ্ধা মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে আবার ক্রোধ ফিরাইয়া আনিতেছি। এই সময়ে বিদূষকের সহিত রাজা উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "চিত্রার্পিত কার্য্যে কুবলয়-নয়নে কেন আমার প্রতি কোপ করিতেছ? এই দেখ, তোমারই দাস তোমার

সম্মুখে উপস্থিত।' বকুলাবলিকা রাজার জয় উচ্চারণ করিল। মালবিকা চিত্রাঙ্কিত রাজার প্রতি অভিমান করার জন্য মনে মনে লজ্জিতা হইতে লাগিলেন। পরে তিনি রাজার নিকট প্রণয় সহকারে অঙ্গুলিবদ্ধ করিলে, রাজারও অনুরাগ কাতরতা প্রকাশ পাইল। রাজাকে কিছু স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া বিদূষক কহিলেন, "এক্ষণে উদাসীন কেন?" রাজা উত্তর দিলেন, "তোমার প্রিয়সখীকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, কারণ তোমার সখী নেত্রপথে থাকিতে থাকিতে আবার মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় চলিয়া যান। বাহুমধ্যে আসিয়াও সহসা সরিয়া পড়েন। এইরূপ সমাগম-মায়ার জন্য মদনব্যাধি-পীড়িত আমার হৃদয় কিরূপে তোমার সখীকে বিশ্বাস করিতে পারে?" তখন বকুলাবলিকা মালবিকাকে কহিল, "সখি, মহারাজ অনেকবার প্রতারিত হইয়াছেন। এক্ষণে যাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয়, তাহারই ব্যবস্থা কর।" শুনিয়া মালবিকা উত্তর দিলেন যে, 'মন্দভাগিনী আমার পক্ষে স্বপ্ন-সমাগমও সুদুর্লভ।' বকুলাবলিকা রাজাকে তাহার উত্তর দিতে বলিলে রাজা কহিলেন, "ইহার আর কি উত্তর দিব, তবে মদনানল সাক্ষী করিয়া তোমার সখীকে আত্মদান করিতেছি। আমি তাঁহার সেবা চাহি না, কিন্তু গোপনে তাঁহারই সেবা করিতে ইচ্ছা করি।" বকুলাবলিকা বলিল যে, ইহাতেই আমরা অনুগৃহীত হইলাম। এই সময়ে বিদূষক বকুলাবলিকাকে লইয়া স্থানান্তরে যাওয়ার ইচ্ছায় কহিলেন, "বকুলাবলিকে হরিণে বালাশোকের পল্লবগুলি নষ্ট করিতেছে, চল গিয়া তাহাকে নিবারণ করি।" বকুলাবলিকাও তাহাতে সম্মত হইয়া বিদূষকের সহিত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিল। রাজাও বিদূষককে কহিলেন যে,"রক্ষা-বিষয়ে তুমি একটু সাবধান থাকিও।" গৌতমকে একথা বলিতে হইবে না বলিয়া বিদূষক উত্তর দিলেন। বকুলাবলিকা বিদূষককে দ্বাররক্ষার জন্য অবস্থিত থাকিতে বলিয়া নিজে অপ্রকাশভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বিদূষক স্ফটিকস্তম্ভ আশ্রয় করায় তাহার শীতলস্পর্শে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

মালবিকাকে ভীতভাবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া রাজা তখন বলিতে লাগিলেন, "সুন্দরি, এক্ষণে মিলনের আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। আমি বহুদিন হইতে তোমার প্রণয়ে উন্মুখ হইয়া আছি; এই সহকাররূপ আমাকে তুমি

মাধবীর ন্যায় আশ্রয় কর।" মালবিকা বলিলেন যে, 'দেবীর ভয়ে আমি নিজের প্রিয়কার্য্য কিছুই করিতে পারিতেছি না।' রাজা তখন কহিলেন যে, 'ভয় করিও না।' শুনিয়া মালবিকা উত্তর দিলেন যে 'দেবীর সাক্ষাতে সাহসী পুরুষের সামর্থ্য দেখা গিয়াছে।' রাজা তখন বলিতে বাধ্য হইলেন, "নায়কগণের সরলতা প্রদর্শনই কুলব্রত। সে যাহা হউক আয়তাক্ষি, আমার প্রাণ তোমার আশাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে এই চিরভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।" এই বলিয়া রাজা মালবিকাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে, মালবিকা তাহা পরিহারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা তখন মনে মনে বলিতেছিলেন, "নব বধূদিগের প্রণয়-ব্যাপার বড়ই রমণীয়, তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে গেলে তাহাদের সলজ্জ-নিবারণ চেষ্টাতেই অনুরাগ-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।" এই সময়ে ইরাবতী ও নিপুণিকা প্রমদবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমুদ্র-গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইরাবতী রাজার প্রতি অভিমান করায় মনে মনে কিছু অনুতপ্তা হইয়াছিলেন, এবং রাজাকে প্রসন্ন করারও ইচ্ছা করিতেছিলেন। তাঁহার সহচরী চন্দ্রিকা বিদূষককে সমুদ্রগৃহ-দ্বারে অবস্থিত থাকিতে দেখিয়া নিপুণিকাকে সে সংবাদ অবগত করাইলে, রাজা তথায় আছেন মনে করিয়া নিপুণিকা ইরাবতীকে লইয়া প্রমদবনে প্রবেশ করে, ও সমুদ্রগৃহের দিকে অগ্রসর হয়। ইরাবতী প্রথমে চিত্রাঙ্কিত মহারাজকেই প্রসন্ন করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কারণ, রাজার হৃদয় অন্যের প্রতি আসক্ত থাকায় শিষ্টাচার লঙ্ঘনের জন্য ইরাবতী কোনরূপে ক্ষমা প্রার্থনার অভিলাষ করেন। সেই সময়ে মহিষী ধারিণীর কোন পরিচারিকা আসিয়া রাণী ইরাবতীকে কহিল যে, মহিষী বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি আপনার সম্মানরক্ষা করিয়া সহচরীর সহিত মালবিকাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, এক্ষণে মহারাজের মনস্তুষ্টির জন্য যাহা করিতে বলেন, তিনি তাহাই করিবেন। ইরাবতী উত্তর দিলেন যে, তুমি মহিষীকে গিয়া বল, আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাহার পর পরিচারিকা তথা হইতে চলিয়া গেল। সমুদ্রগৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, বিদূষক বিপণিগত বলীবর্দ্দের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহারা তাঁহার মুখে দিব-বিকারের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। সেই সময়ে বিদূষক স্বপ্নে বলিতেছিলেন, "মালবিকা

তুমি ইরাবতীকে অতিক্রম করিয়া উঠ।" ইরাবতী ও নিপুণিকা বিদুষকের এইরূপ কৃতঘ্নতাতে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন নিপুণিকা বিদুষককে সর্পভয় দেখাইবার জন্য একখানি আকাবাঁকা যষ্টি তাহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। বিদুষক সহসা জাগরিত হইয়া তাহাকে সর্প-ভ্রমে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রাজা তখন তাঁহাকে অভয় দেওয়ার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। মালবিকা রাজাকে সেস্থানে যাইতে নিষেধ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বকুলাবলিকাও দৌড়িয়া আসিয়া রাজাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। যষ্টি বুঝিতে পারিয়া বিদুষকও আশ্বস্ত হইলেন। তিনি যষ্টিসম্পাতকে কেতকীকণ্টক-ক্ষত চিহ্নের প্রতিফল মনে করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে ইরাবতী অগ্রসর হইয়া রাজাকে কহিলেন যে, দিবা সঙ্কেতস্থানে দুজনের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে ত? ইরাবতীকে দেখিয়া তখন সকলে ভীত ও চকিত হইয়া উঠিলেন। রাজা বলিলেন যে, প্রিয়ে এ যে তোমার অপূর্ব্ব অভিবাদন দেখিতেছি! ইরাবতী বকুলাবলিকাকে বলিতে লাগিলেন, বকুলাবলিকে, তোমার দুতিগিরি সফল হইয়াছে ত? বকুলাবলিকা উত্তর দিয়া বলিল যে, দেবী ক্রুদ্ধা হইবেন না, ভেকরবে কি দেবরাজ পৃথিবীতে বারিবর্ষণে বিরত হন? বিদুষক ইরাবতীকে বলিলেন, "আপনাকে দর্শনমাত্রেই মহারাজ প্রণিপাত-লঙ্ঘন বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনিত এখনও প্রসন্না হইতেছেন না।" ইরাবতী উত্তর দিলেন যে, আমি কোপ করিয়া কি করিব? রাজা তখন বলিতে লাগিলেন "অস্থানে কোপ করা তোমার উচিত নহে; সুন্দরি, অকারণে তোমার বদন কখনওত ক্রোধযুক্ত হয় নাই; পূর্ণিমা ব্যতীত বিভাবরী কি কখনও রাহুগ্রস্ত-চন্দ্রান্বিত হয়?" ইরাবতী কহিলেন, "মহারাজের 'অস্থানে' কথাটি বলাই ঠিক হইয়াছে।" কারণ, আমাদের ভাগ্য পরায়ত্ত হওয়ায় এক্ষণে কোপ করিলে হাস্যাস্পদ হইতেই হইবে।" রাজা বলিলেন যে, "পরিজনেরা অপরাধী হইলেও উৎসব দিবসে তাহাদের দণ্ডবিধান উচিত নহে। সেজন্য ইহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করায় দুজনে প্রণাম করিতে আসিয়াছে।" ইরাবতী নিপুণিকাকে কহিলেন যে, মহিষীকে বলিয়া আইস যে তাঁহার পক্ষপাত বুঝা গিয়াছে। নিপুণিকা তথা হইতে প্রস্থান করিলে বিদুষক মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, এ যে দেখিতেছি বিষম অনর্থ উপস্থিত, বন্ধনমুক্ত কপোতী শেষে কি বিড়ালীর

সম্মুখে পড়িল? নিপুণিকা সহসা উপস্থিত হইয়া ইরাবতীকে গোপনে জানাইল যে, বিদূষকের কৌশলেই এইরূপ ঘটিয়াছে। সে সেকথা মাধবিকার নিকট হইতে শুনিয়া আসিল। ইরাবতী তখন বিদূষককে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বুঝিয়াছি, ইহা কামতন্ত্র সচিবেরই নীতিকৌশল।" বিদূষক উত্তর দিলেন যে, যদি নীতিশাস্ত্রের একাক্ষরও আলোচনা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মহারাজকে চালিত করিতে পারি। সেই সময়ে প্রতিহারী জয়সেনা আসিয়া রাজাকে জানাইল যে, কুমারী বসুলক্ষ্মী কন্দুক-ক্রীড়াকালে এক পিঙ্গল বানর কর্ত্তৃক ভয় পাইয়া এরূপ কাঁপিতেছেন যে, মহিষী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়াও কিছুতেই সান্ত্বনা করিতে পারিতেছেন না। ইরাবতী তাহা শুনিয়া রাজাকে কুমারীর সান্ত্বনার জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং সহ-চরীসহ নিজেও তাহার অনুসরণ করিলেন। বিদূষকও যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন "সাধুরে পিঙ্গল বানর, তোর দলের লোকটিকে বেশ বাঁচাইয়া দিলি।" মালবিকা তখন বকুলাবলিকাকে বলিলেন যে, মহিষীকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে, না জানি পরেই বা কি ঘটে। সেই সময়ে অদূরে মালিনী মধুকরিকা বলিয়া উঠিল, "আশ্চর্য্য, স্বর্ণাশোক দোহদ লাভ করিয়া পাঁচ রাত্রি মধ্যেই মুকুলিত হইয়াছে! যাই এ সংবাদ মহিষীকে জানাইয়া আসি।" তাহা শুনিয়া মালবিকা ও বকুলা-বলিকা উভয়েরই আনন্দ সঞ্চার হইল, এবং বকুলাবলিকা মালবিকাকে কহিল যে, সখী আশ্বস্ত হও, দেবীকে সত্যপ্রতিজ্ঞা বলিয়াই জানিবে। তখন মালবিকা উত্তর করিলেন, "তবে চল আমরাও মালিনীর অনুসরণ করি" এই বলিয়া দুই সখীতে মিলিয়া সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আশার অধিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(পরিচয়।)

দৌলতপুর একটি নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ গ্রাম। অদূরেই একটী রেলওয়ে ষ্টেশন। উক্ত অঞ্চলের জমিদার শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ মহাশয় বংশ পরম্পরায় উক্ত গ্রামেই অবস্থান করিয়া আসিতেছেন। ঢাকা নিবাসী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার জমিদারমহলে বহুদিন হইতে গোমস্তার কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। গোমস্তাকার্য্যের পারিশ্রমিক ব্যতীত জমিদার মহাশয় সতীশচন্দ্রকে কিছু ভূসম্পত্তিও দিয়াছেন। তজ্জন্য বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া, সতীশচন্দ্রকে পুত্র-কলত্রাদি সমভিব্যাহারে তথায় বাস করিতে হইয়াছে। জমিদার মহাশয় মফঃস্বলের যাবতীয় কর্ম্মের ভার গোমস্তার হস্তেই দিয়াছেন; সেইজন্য দৌলতপুর অঞ্চলে গোমস্তা মহাশয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তত্রত্য অধিবাসী প্রজানিচয় গোমস্তা সতীশচন্দ্রকে যথাসাধ্য সম্মান করে—ভক্তি করে,—সময় সময় দশ পাঁচ টাকা সাহায্যও করে; তবে স্ব ইচ্ছায় নয়, কেবল গোমস্তা মহাশয়ের শাসনের আঁচে। যে হতভাগ্যের প্রতি গোমস্তা মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি পড়ে,—তার লক্ষ্মীঠাকুরাণীকেও চঞ্চলা হইতে হয়। এমন কি অদৃষ্টদোষে কাহাকেও হালের গরু, কাহাকেও শুঁদা গাভীটী, কাহাকেও খশ্‌রা খাশীটী গোমস্তার হস্তে সমর্পণ করিতে হয়। গৃহের চালে চিল বসিলে যেমন খড় কুটা না লইয়া যায় না, তদ্রূপ কোন প্রজার আবাসে গোমস্তাবাবুর শুভাগমন হইলে কিছু সজীব, নির্জ্জীব না লইয়া প্রত্যাগমন করেন না। গোমস্তার বিপুল অর্থ,—নিজের জাঁকজমক খুব,—সেই জন্য তদঞ্চলের প্রজাবর্গ তাঁহাকে জমিদারের মত মনে করে। গোমস্তার এত অর্থ, তথাপি অর্থ-পিপাসার পরিতৃপ্তি কই? বরং অর্থ প্রাচুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রবল আকাঙ্ক্ষাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। হায় অর্থলিপ্সু সতীশ! এত অর্থেও তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হয় নাই? অর্থের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তুমি নিরীহ প্রজাকুলকে নিপীড়িত করিয়া অর্থ অর্থ করিয়া বেড়াইতেছ? ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, তুমি প্রজাকুলে যে কঠোর দণ্ড পরিচালিত করিতেছ, তাহাতে তোমার পাষাণ-হৃদয় কোমল হয় না কি? সতীশ! এখন তুমি প্রজা-সাধারণকে যেরূপ অপমানিত,—প্রপীড়িত এবং পদদলিত করিতেছ, স্মরণ রাখিও—নিয়তি ন্যায়ধর্ম্মের মর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য এমন দিন তোমার নিকট আনিবে যে, তোমাকেও তখন ঐরূপ যাবতীয় নিগ্রহ উপভোগ করিতে হইবে। এখন তুমি প্রজার ক্রন্দন যেরূপ প্রফুল্লচিত্তে শ্রবণ করিতেছ, সেদিন তাহারাও তোমার ক্রন্দন প্রফুল্লচিত্তে শ্রবণ করিবে।

একদিন অপরাহ্ণকালে গোমস্তা মহাশয় নিজের বহির্ব্বাটীর বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন, একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা গোমস্তার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। এইরূপ কিছুক্ষণ পরিক্রম করিবার পর গোমস্তা, বালিকাকে কোলে লইয়া একটী চেয়ারের উপর বসিলেন। সেই সময় তাঁহার দৃষ্টি রেলওয়ে ষ্টেশনের উপর পতিত হইল। তিনি দেখিলেন,—সাড়ে তিন ঘটিকার সময় যে আপ্ ট্রেণ আসে, তাহা পাশ হইয়া গেল। গোমস্তা মহাশয়ের বহির্ব্বাটীর বারান্দা হইতে ষ্টেশনটী বেশ সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। গোমস্তা দেখিলেন, জনৈক ভদ্রযুবক ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার বাটীর দিকেই আগমন করিতেছেন। সতীশ-বাবু আগত যুবকের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমশঃ যুবক সতীশবাবুর দৃষ্টির নিকটবর্ত্তী হইতে হইতে বারান্দায় আসিয়া পদার্পণ করিলেন। গোমস্তা গাত্রোত্থান করিয়া যুবককে মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন "কে গো প্রতুল! এস, এস, বাড়ী থেকে কি?"

আগন্তুক প্রত্যুত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ, বাড়ী থেকেই আস্‌ছি।" গোমস্তা যুবককে আর একটি চেয়ার বসিতে দিলেন এবং বালিকার দ্বারা ভিতর বাড়ী হইতে জল সন্দেশ আনাইয়া আগন্তুকের যথাযোগ্য সম্মাননা করিলেন।

আগন্তুকের নাম প্রতুলচন্দ্র রায়, বাড়ী মুর্শিদাবাদ। বহরমপুর কলেজে প্রতুল ও গোমস্তাবাবুর পুত্র রামরঞ্জন উভয়ে এক শ্রেণীতেই অধ্যয়ন করিতেন। এমন কি প্রতুল বহরমপুর হইতে রামরঞ্জনের সহিত ২।৩বার তাঁহাদের বাড়ীতেও আসিয়াছিলেন। সেই জন্য প্রতুলের সহিত গোমস্তা-বাবুর পরিচয়ের আবশ্যক হইল না। বহরমপুরে রামরঞ্জনের জল বায়ু সহ্য না হওয়ায় গোমস্তাবাবু তাহাকে কলিকাতায়—কলেজে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাই কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে প্রতুল গোমস্তাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"ইহার মধ্যে রামরঞ্জনবাবু বাড়ী আসেন নাই?"

গোমস্তা। "গত পরশ্ব রামরঞ্জনের পত্র পাইয়াছি, কিন্তু তাহাতে বাড়ী আসিবার কোন কথা উল্লেখ নাই। বোধ হয় রামরঞ্জন এখন কিছু-দিন বাড়ী আসিবে না"।

এইরূপে গল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা আসিয়া সমাগত হইল। ভগবান

অংশুমালী জগৎপানে চাহিতে চাহিতে পশ্চিমাকাশে লুক্কায়িত হইলেন। ধেনু-বৎসগুলি তৃণাবৃত সুবিস্তৃত ময়দান পরিত্যাগ করতঃ হাম্বা হাম্বা রবে রাখাল সহিত স্ব স্ব ভবনে প্রবেশ করিল। জমিদার মহাশয়ের আম্রবাগানে নানাজাতীয় বিহঙ্গম সমবেত হইয়া স্ব স্ব কলতানে সন্ধ্যাদেবীর আগমন ঘোষণা করিল। দুই চারিটী গ্রাম্য শিশু একত্রিত হইয়া পিক-বিনিন্দিত স্বরে গাহিতে লাগিল :—

"সন্ধ্যা হইল, ধেনু আইল,
গোপাল আইল ঘরে"। ...

দেখিতে দেখিতে রজনীদেবী তিমিরাম্বরে পরিবেষ্টিত হইয়া সমস্ত ধরাপৃষ্ঠ আবৃত করিয়া ফেলিলেন। গোমস্তাবাবুর সদর বাড়ীটী উজ্জ্বল শুভ্রালোকে আলোকিত হইল। সে সময় গোমস্তা ও প্রতুল ব্যতীত অন্য কেহ সেস্থানে ছিল না। প্রতুল নিজের পকেট হইতে কতকগুলি নোট ও কতকগুলি স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা সর্ব্বসমেত এক হাজার টাকা গোমস্তা মহাশয়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, "আপনি আমার এই টাকাগুলি রাখিয়া দিন, আগামী কল্য যাইবার সময় আমি আপনার নিকট টাকাগুলি লইব"।

গোমস্তা। "তুমি এতগুলি টাকা লইয়া কোথায় যাইবে?"

প্রতুল। "আমি বিদেশ ভ্রমণের জন্য টাকাগুলি লইয়া বাড়ী ত্যাগ করিয়াছি"।

গোমস্তা। "তুমি বাড়ীতে জানাইয়া আসিয়াছ কি?"

প্রতুল। "না, বাড়ীর কেহ জানেন না। তবে কল্য ডাকযোগে পিতা মহাশয়কে আমার আগমনের সংবাদ দিব"।

গোমস্তা। "এতগুলি টাকা লইয়া বিদেশে বাহির হইয়াছ, কিন্তু দেখিও সকল সময়ে সাবধানে থাকিবে"।

এই কথাগুলি বলিয়া গোমস্তাবাবু ভিতর বাড়ীতে গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই প্রতুলের জন্য জল খাবার লইয়া সদর বাটীতে আগমন করিলেন। উক্ত বাটীতেই প্রতুলের শয়নের বন্দোবস্ত হইল। জলযোগ শেষ হওয়ার পর প্রতুল নিজের শয্যায় আশ্রয় লইলেন। ঝিকে ডাকাইয়া গোমস্তাবাবু প্রতুলের জলযোগের স্থানটী পরিষ্কার করাইলেন, এবং প্রতুলের সঙ্গে কিছুক্ষণ মিষ্টালাপ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(দুরভিসন্ধি।)

——:০:——

গোমস্তাবাবুর বহির্ব্বাটীতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি দশটা বাজিল। সুবিমলা-কাশে অগণিত তারকারাজি নিশাদেবীর তিমিরজাল ভেদ করিয়া মিটি মিটি করিয়া চাহিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী শৃগাল কুকুর বিকটনাদে চীৎকার করিয়া রজনীদেবীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। এইরূপ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর নৈশান্ধকারে গোমস্তা মহাশয়ের বাটীর পশ্চাৎস্থিত উদ্যানে তিন জন পুরুষ দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কি পরামর্শ করিতেছে। কল্পনাদেবী সেই পরামর্শের আভাষ লইয়া আমার ক্ষুদ্রান্তঃকরণে যাহা অঙ্কিত করিয়াছেন,—সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার সকাশে তাহারই অবতারণা করিতেছি।

তিন জন পুরুষের মধ্যে একজন ভদ্রবেশধারী প্রৌঢ় ব্যক্তি। অপর দুই জন যমদূততুল্য ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিবিশিষ্ট যুবাপুরুষ। ভদ্রলোকটী উক্ত দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের এখানে আসিবার কথা কেহ কি জানে ?"

উত্তর। "হুজুরের প্রেরিত লোকটী ব্যতীত অন্য কেহ আমাদের আসিবার কথা জানে না, বা আমাদিগকে আসিতে দেখে নাই।"

ভদ্র। "আজ তোমাদিগকে একটী গুরুতর কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য এখানে আহ্বান করিয়াছি। আদেশানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিলে তোমাদিগকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিব। এক্ষণে বল,—তোমরা কার্য্যসাধনের জন্য প্রস্তুত কি না ?"

উত্তর। "হুজুরই আমাদের পিতা মাতা। আপনার আদেশ মত কাজ করিতে আমরা কখনও পরাঙ্মুখ হই নাই। হুজুরের যে আজ্ঞা,—স্বচ্ছন্দে বলুন,—আমরা অম্লান বদনে আপনার আদেশ পালন করিব"।

ভদ্র। "আমার আদিষ্ট কার্য্য ভয়ানক গুরুতর। তবে তোমরা এরূপ কার্য্যে সিদ্ধহস্ত জানিয়াই তোমাদিগকে এখানে আনাইয়াছি। আমার যাহা আদেশ, তাহা শুন,—আমার বহির্ব্বাটীর মধ্যে জনৈক ভদ্রলোক নিদ্রা যাইতেছে। তোমরা রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তথায় যাইয়া যে কোন প্রকারে

লোকটীকে হত্যা কর ; এবং তাহার মৃতদেহ রেলরাস্তার উপর ফেলিয়া দিয়া আইস। কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিলে সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদিগকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিব"।

ভদ্রলোকটির আদেশ শুনিয়া লোক দুইটীর আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল, তাহারা কোন প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া পরস্পর পরস্পরকে তাকাইতে লাগিল। যদিও তাহারা এরূপ কার্য্যে সিদ্ধহস্ত,—এরূপ কাজ অনেকবার করিয়াছে, তথাপি তাহাদের অন্তঃকরণে ভয়ানক আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। তাহারা কোন কথাই বলিতে পারিল না।

লোক দুইটীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া ভদ্রলোকটী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা চুপ করিয়া রহিলে কেন ? তোমাদের কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই অনায়াসে কাজ হাঁসিল করিতে পারিবে। তাহাতে আবার পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার। তোমাদের অভিপ্রায় কিরূপ, আমার নিকট খুলিয়া বল ?"

উত্তর। "হুজুরের যখন আদেশ, তখন কার্য্যসমাধা করিতেই হইবে। কিন্তু লোকটীকে হত্যা করিয়া কোনরূপ বিপদে বা গোলযোগে পড়িব না ত ?"

ভদ্র। "তোমাদের কোন ভয় নাই, নিঃশঙ্কচিত্তে কার্য্য সমাধা কর। এই লও এখন পঁচিশ টাকা ধর, কার্য্য সমাধান্তে বাকী টাকা পাইবে।" এই বলিয়া ভদ্রলোকটী একজনের হস্তে পঁচিশটী টাকা দিলেন, এবং বলিলেন,—"আমার উদ্যানের দরজা খোলা থাকিবে,—তোমরা দুই প্রহর রাত্রে কার্য্যশেষ করিয়া এই রাস্তা দিয়া আমার নিকট আসিবে। কিন্তু দেখিও সাবধান !—অন্যে যেন টের না পায়।"

উত্তর। "আমরা এরূপভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিব যে, আপনি ব্যতীত অন্য কেহ ইহার বিন্দুমাত্রও টের পাইবে না। আমরা এক্ষণে এস্থান হইতে বিদায় হই, নিরূপিত সময়ে আপনার কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনরায় এখানে আসিব।" এই কথা বলিয়া লোক দুইটী ভদ্রলোকটীকে সুদীর্ঘ সেলাম বাজাইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। ভদ্রলোকটীও উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া গোমস্তাবাবুর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এক্ষণে ভদ্রলোকটী সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয়ের আবশ্যক হইবে না। কারণ

ভদ্রলোকটী স্বয়ং গোমস্তা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার। আর অপর দুইজন নরপিশাচ—ঘাতক। একমুষ্টে হাজার টাকা পাইয়া গোমস্তাবাবু তাহার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন কি? তাই এত ষড়যন্ত্র,—তাই হতভাগ্য প্রতুলের জীবননাশে এত চেষ্টা। "অর্থ তুমিই ধন্য!—তোমার মহিমা অপরিসীম। তোমার আকার গোল বলিয়া তোমার কাজেও গোল,—তোমার ভাবেও গোল, তোমার অভাবেও গোল, আবার সময় পাইলে তুমিও প্রলয়কালীন গণ্ডগোল বাধাও। তোমার জন্য কত হতভাগ্য অকালে কালের করাল-কবলে আশ্রয় লইতেছে। কত লোক ধন-কুবের হইয়া তোমার অলৌকিক ক্ষমতা জগৎমধ্যে প্রচারিত করিতেছে। আবার কত শত পাশ্চাত্য বিদ্যান্ধবাবুরা তোমার সাহায্য পাইয়া ধর্ম্ম, সমাজ এবং ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতেছে। তুমি নিজের প্রভাবে কত লোককে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাও,—আবার কত লোককে ফাঁসি হইতে রক্ষা কর। তাই আজ প্রতুলের প্রাণ তোমার জন্যই বিপজ্জালে জড়িত।" "হায় দুর্ভাগ্য প্রতুল! তোমাকে হত্যার জন্য কত ষড়-যন্ত্র হইতেছে, অথচ তুমি ইহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নও। হতভাগ্য! তোমার অর্থই অনর্থের মূল হইয়াছে। তুমি বান্ধব ভাবিয়া নরপিশাচকে আলিঙ্গন করিয়াছ। সহায়-সম্বল-বিহীন প্রতুল! যেরূপ ষড়যন্ত্র, তাহাতে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মনে হয়। এই বিপজ্জাল হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র বিপদ্‌বারণ নারায়ণ ব্যতীত তোমার কেহ নাই। অতএব তুমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া পরমসুখে নিদ্রাদেবীর অঙ্কে অবস্থিতি কর।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(কার্য্য-সাধন।)

রাত্রি দেড়টা বাজিয়া দুই কোয়াটার অতিরিক্ত হইয়াছে, তবুও গোমস্তা-বাবুর চক্ষে নিদ্রা নাই। কখন শয্যার উপর শুইতেছেন,—কখন বসিতে-ছেন,—কখন বা শয়নগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্যান-পানে চাহিতেছেন। আবার মনে মনে ভাবিতেছেন,—"রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কার্য্য শেষ করিবার কথা, কিন্তু দুইটা বাজিতে যায় তথাপি এখনও আসিল না কেন? বুঝি

লোক দুইটী কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে, কিম্বা রেলরাস্তার উপর কেহ তাহাদিগকে ধরিয়াছে।" এইরূপ কিছুক্ষণ মানসিক তর্কবিতর্কের পর তিনি মনুষ্যের পদ-শব্দ শুনিতে পাইলেন। অমনি তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলে, লোক দুইটী তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। গোমস্তা দেখিলেন,—তখনও একজনের হস্তে শোণিত-সিক্ত তরবারি বিদ্যমান।

গোমস্তা ঘাতুকদ্বয়কে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে! কার্য্য শেষ হইয়াছে?"

ঘাতুক। "হুজুরের আদেশানুযায়ী সমস্ত কার্য্যই শেষ হইয়াছে।"

গোমস্তা। "লোকটীকে কিরূপে হত্যা করিলে?"

ঘাতুক। "লোকটী নিদ্রিত ছিল, আমি এই তরবারি দ্বারা তাহার গলদেশ দ্বিখণ্ডিত করিয়াছি।"

গোমস্তা। "তাহা হইলে ত সে স্থানটী রক্তময় হইয়াছে?"

ঘাতুক। "হুজুরের বাড়ীর মধ্যে বিন্দুমাত্রও রক্ত পড়ে নাই, তবে শয্যাখানি একেবারে নষ্ট হইয়াছে। আমরা শয্যাটীতে শবদেহ বেড়াইয়া উহা রেলরাস্তার উপর লইয়া গিয়াছিলাম। পরে শয্যাখানি আনিয়া হুজুরের উদ্যানমধ্যে রাখিয়াছি। অনুমতি পাইলে উহা এখনই দগ্ধ করিয়া দিব।"

গোমস্তা। "আচ্ছা যাও শয্যাখানি দগ্ধ করিয়া আইস; পরে পুরস্কারের টাকা লইয়া তোমরা বাড়ী যাইবে।"

ঘাতুকদ্বয় তৎক্ষণাৎ উদ্যানের দিকে চলিয়া গেল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া গোমস্তার নিকট পূর্ব্বকথিত পুরস্কারের টাকা গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টমনে বাড়ী চলিয়া গেল।

একরাত্রির মধ্যে হাজার টাকা করায়ত্ত হইল ভাবিয়া গোমস্তা মহাশয়ের আনন্দের পরিসীমা নাই। অসৎকর্ম্মে বা নরহত্যায় তাঁহার বিন্দুমাত্র ভয় নাই, কারণ অর্থলোভে গোমস্তাবাবু কত যে বীভৎস কাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অথচ সকল কার্য্যই সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গোমস্তাবাবুকে কেহ মনোমধ্যেও কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারে নাই। সন্দেহ হইলেও গোমস্তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কোন ব্যক্তি সাহসী হয়? তবে পুলিশের হাঙ্গামাটা ঘটিলেও ঘটিতে পারে, কিন্তু পুলিশকে বুঝাইয়া দেওয়াও চলে। ঘট-

নাটা এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে—হয় রাত্রের ট্রেণের কোন যাত্রী ট্রেণ হইতে পড়িয়া কর্ত্তিত হইয়াছে, না হয় কোন পাগল রেলরাস্তার উপর আসিয়া আত্ম-হত্যা করিয়াছে। এই দুইএর মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত হইবেই হইবে। তাহাতে গোমস্তাবাবুর আসে যায় কি? তাঁহার ত এক হাজার টাকা হস্তগত হইল। যাহা হউক, এই ঘটনার পর গোমস্তাবাবুর কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। তিনি যে কতবার উঠিলেন—কতবার বসিলেন,—কতবার ধূমপান করিলেন। অর্থ-প্রাপ্তি-হেতু আনন্দিত হইলেও নরহত্যার জন্য গোমস্তাবাবুর হৃদয়ে যে ভয়ের উদ্রেক হয় নাই, এমন কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। কারণ যেমন আনন্দহেতু গোমস্তাবাবুর বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে, তেমনই ভয়েও তাহা এক একবার কালিমা-মণ্ডিত হইতেছে। কতক্ষণে রাত্রি শেষ হইয়া প্রভাত হয়—কতক্ষণে রেলরাস্তার ব্যাপার গ্রামমধ্যে রাষ্ট্র হয়, গোমস্তাবাবু তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(তুমুল সন্দেহ)

পূর্ব্বাকাশ নীলাম্বর পরিত্যাগ করিয়া নবীন সন্ন্যাসীর মত ঈষৎ লোহিতাম্বরে বিভূষিত হইল। সুনির্ম্মল গগনে যে দুই চারিটি তারা মিটি মিটি করিয়া চাহিতে-ছিল, তাহাও চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য হইয়া গেল। সঙ্গী-পরিজনবিহীন প্রভাতীয় তারাটী বিষণ্ণচিত্তে ক্ষীণনয়নে জগৎপানে চাহিয়া, কোথায় যে লুকাইল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। জমিদার মহাশয়ের আম্রবাগানে সমবেত পক্ষীগুলি প্রভাতীয় সুরে বিভূগুণ গাইয়া দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইল। সকলেই জানিল, রাত্রি শেষ হইয়া প্রভাত হইয়াছে। আমাদের গোমস্তাবাবু কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর সমস্ত নিশা অর্থদেবীর মহিমা-কীর্ত্তনে যাপন করিয়াছেন, এক্ষণে প্রভাত উপস্থিত দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিলেন; এবং একটী জলপূর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া দ্রুত পাদবিক্ষেপে বহির্ব্বাটী অভিমুখে চলিলেন। বহির্ব্বাটীর বারান্দায় উপস্থিত হইয়া গোমস্তাবাবু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। জলপূর্ণ ভৃঙ্গারটি হস্তচ্যুত হইয়া সমস্ত জল বারান্দার উপর ঢালিয়া দিল। গোমস্তা দেখিলেন,—বিভূগুণ-

গানে নিমগ্ন প্রতুল শয্যাবিহীন তক্তার উপর বসিয়া রহিয়াছেন। প্রতুল তখন গাহিতেছেন :—

ভজ ওরে মন, শ্রীমধুসূদন,
গাও তাঁর নাম অবিরাম।
যাঁহার প্রসাদে, আজি নিরাপদে,
পরবাসে নিশি যাপিলাম ॥

গোমস্তা মহাশয় নিস্পন্দ—নিশ্চলভাবে একস্থানে দাঁড়াইয়া, প্রতুলকে কি কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতে লাগিলেন।

গোমস্তাবাবুকে সমাগত দেখিয়া প্রতুল আসুন বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু গোমস্তা নিরুত্তর।

পরিশেষে প্রতুল বলিলেন,—"রাত্রে এখান হইতে কে শয্যাখানি লইয়া গিয়াছে ?"

গোমস্তাবাবুর কথা বলিবার পথ এতক্ষণে পরিষ্কৃত হইল। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি রাত্রে কোথায় গিয়াছিলে ?"

প্রতুল। "আমি রাত্রে রমেশবাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। আমার আগমন সংবাদ পাইয়া রমেশবাবু রাত্রি সাড়ে দশটার সময় এখানে আসিয়া অনুরোধ পূর্ব্বক আমাকে দাবা খেলিতে লইয়া যান। আমি দাবা খেলিয়া রাত্রি আড়াইটার সময় পুনরায় এখানে আসি। তক্তার উপর শয্যাখানি না দেখিয়া আমার বিস্ময় ও ভয়ের উদ্রেক হইল, কাজেই অবশিষ্ট রাত্রিটুকু তক্তার উপর বসিয়া জাগ্রতাবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছি।"

রমেশবাবু প্রতুলের সমবয়স্ক এবং দৌলতপুর গ্রামের জনৈক প্রতিপত্তিশালী লোকের পুত্র। প্রতুল বহরমপুর হইতে রামরঞ্জনের সহিত যখন তাঁহাদের বাড়ী প্রথম আসেন, তখন হইতে রমেশবাবুর সহিত প্রতুলের সৌহার্দ্যভাব জন্মিয়াছিল, তাই এবারে লোকমুখে প্রতুলের আগমন সংবাদ পাইয়া রমেশবাবু রাত্রিকালে আসিয়া প্রতুলকে তাঁহাদের বাড়ী লইয়া যান।

গোমস্তাবাবু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"ঘাতুকদ্বয় কি আমাকে ফাঁকি দিল ; ফাঁকিই বা কেমন করিয়া বলি ; তাহাদের হস্তে শোণিত-রঞ্জিত ছোরা দেখিয়াছি,—তাহারা রক্তাক্ত শয্যা দগ্ধ করিয়াছে। তবে কি তাহারা

অন্য কাহাকেও হত্যা করিল ; হয়ত সে ব্যক্তি শূন্য শয্যা দেখিয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছিল, ঘাতুকদ্বয় ভ্রমক্রমে তাহাকেই হত্যা করিয়া থাকিবে। কিন্তু অপর কোন্ ব্যক্তি আমার বহির্ব্বাটীর শয্যার মধ্যে আশ্রয় লইতে সাহসী হইবে? হায়! হায়! আমার ষড়যন্ত্রের উদ্যোগ সমস্তই পণ্ড হইল।" গোমস্তা মহাশয় এইরূপে মানস-সমুদ্রের চিন্তাতরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তুমুল সন্দেহের আবির্ভাব হইল। নানারূপ চিন্তার পর গোমস্তা মহাশয় স্থির করিলেন, —"আজ প্রতুলের যাইবার কথা, কিন্তু প্রতুলকে আজ কোন প্রকারে যাইতে দিব না। আজ যে প্রকারে পারি কার্য্যসিদ্ধি করিতেই হইবে ;—ইহাতে যদি নিজহস্তে অস্ত্রধারণ করিতে হয়—আমি তাহাতেও কুণ্ঠিত হইব না।" অবশেষে প্রতুলকে বলিলেন,—"বোধ হয় শূন্য শয্যা দেখিয়া উহা কোন দুষ্ট ব্যক্তি লইয়া গিয়াছে।"

তারপর গোমস্তাবাবুর দৃষ্টি হস্তের দিকে পড়িল। তিনি দেখিলেন, হস্তস্থিত জলপূর্ণ ভৃঙ্গারটি জলশূন্য হইয়া বারান্দার উপর পড়িয়া আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে ডাকিলেন। তাঁহার আদেশে ভৃত্যটি গোমস্তা ও প্রতুলের জন্য দুইটি ভৃঙ্গারে জল আনিয়া দিল। গোমস্তা ও প্রতুল হস্ত মুখ প্রক্ষালনের পর উভয়েই একত্র করিয়া জলযোগ করিলেন।

জলযোগের পর প্রতুল গোমস্তাকে বলিলেন,—"এখানে বেলা সাতটার সময় যে ট্রেণখানি আসে, আমি সেই ট্রেণেই রওনা হইব। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার টাকাগুলি দেন, আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হই।"

গোমস্তা। "সে কি কথা! তুমি আজ যাইবে কেন? একেত গত কল্য সন্ধ্যার সময় এখানে আসিয়াছ, তারপর সমস্ত রাত্রি জাগ্রতাবস্থায় অতিবাহিত করিলে ; সুতরাং আজ তুমি এখানে বিশ্রাম কর। আজ এরূপভাবে চলিয়া গেলে, আমরা তোমার উপর সন্তুষ্ট হইব না। রামরঞ্জন বাড়ী আসিয়া এ সকল কথা শুনিলে আমাদিগকে কি বলিবে? আশা করি, তুমি আমার কথার উপর কোনরূপ প্রতিবাদ করিবে না।" প্রতুল আর কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন, "আপনার অনুরোধে আজিকার দিন থাকিলাম। এখন একটু ষ্টেশন হইতে

বেড়াইয়া আসি।" এই বলিয়া প্রতুল গোমস্তাবাবুর বহির্ব্বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। গোমস্তা মহাশয় একখানি চেয়ার টানিয়া, জড় পদার্থের মত বারান্দার উপর বসিয়া রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(কর্ম্মের ফল।)

——:০:——

বিকারী রোগী যেমন তন্দ্রা দেখে,—প্রলাপ বাক্য বলে,—ছট্ ফট্ করে, অর্থ-বিকারে প্রপীড়িত আমাদের গোমস্তাবাবুও বারান্দার মধ্যে চেয়ারে উপবেশন করিয়া, কখন তন্দ্রা দেখিতেছেন,—কখন প্রলাপবাক্য বলিতেছেন,—কখন বা হাত পা ছড়াইতেছেন। "কি করিলে অর্থগুলি আত্মসাৎ করিতে পারিব—কি করিলে কার্য্য সম্পাদন হইবে,—কোন্ হতভাগ্য ঘাতকের হস্তে প্রাণসমর্পণ করিল"—ইত্যাদি নানারূপ চিন্তা বাত্যালোড়িত উত্তাল-তরঙ্গের ন্যায় গোমস্তার হৃদয়-তরঙ্গকে ও তুফান-সঙ্কুল করিয়াছে। বহুক্ষণ চিন্তার পর গোমস্তাবাবুর দৃষ্টি দেওয়ালের ঘড়ীটির উপর পড়িল। ঘড়ীটি সঙ্কেতে বলিয়া দিল,—"সাড়ে আট টা।"

ইতিমধ্যে এক জন চৌকিদার আসিয়া গোমস্তাবাবুকে সেলাম বাজাইল, এবং বলিল,—"বাবু! রেলরাস্তার উপর এক জন মানুষ কাটা গিয়াছে; সেই মানুষটী সনাক্ত করিবার জন্য রেলওয়ে ও সরকারী পুলিশ-দারোগা আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

গোমস্তা। "আমি তার কি সনাক্ত করিব?"

চৌকিদার। "কি জানি বাবু, আমি তার কি বলিব, কর্ত্তাদের আদেশ পেয়েই আমি আপনাকে ডাকিতে আসিয়াছি। অতএব আপনি শীঘ্র করিয়া আমার সঙ্গে চলুন।"

"আচ্ছা যাচ্ছি", এই কথা বলিয়া গোমস্তা মহাশয় চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া চৌকিদারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া গোমস্তাবাবু দেখিলেন,—সেখানে ১০।১২ জন রেলওয়ে ও গবর্ণমেণ্ট পুলিশ সমবেত হইয়াছে; এবং ষ্টেশন মাষ্টার ও ঐখানে আছেন। ষ্টেশন মাষ্টা-

রের নিকট গোমস্তাবাবু প্রতুলকেও দেখিতে পাইলেন। ইত্যবসরে গবর্ণমেন্ট পুলিশদারোগা একখানি পকেট বুক গোমস্তাবাবুর সম্মুখে খুলিয়া বলিলেন,—"আপনি এই লেখাগুলি চিনিতে পারেন কি?" সবিস্ময়ে গোমস্তাবাবু বলিলেন,—"এ লেখা আমার পুত্র রামরঞ্জনের।"

দারোগা। "তিনি কোথায় থাকেন?"

গোমস্তা। "কলিকাতায়—কলেজে অধ্যয়ন করে।"

দারোগা। "তিনি কি ইদানীং বাড়ী আসিয়াছিলেন?"

গোমস্তা। "না, রামরঞ্জন ইতিমধ্যে বাড়ী আসে নাই।"

অতঃপর দারোগা গোমস্তাবাবুকে বস্ত্রাচ্ছাদিত শবদেহের নিকট লইয়া গেলেন এবং বস্ত্র উন্মোচন করিয়া শবদেহ ও মুণ্ড দেখাইয়া গোমস্তাকে বলিলেন,—"আপনি এই শবটা সনাক্ত করিতে পারেন?" "এ যে আমারই রামরঞ্জন" এই কথা বলিয়া গোমস্তাবাবু শবের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বহু আয়াসে গোমস্তাবাবুর চৈতন্য সম্পাদন করা হইল। গোমস্তা বক্ষে মুণ্ডে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

দারোগা বলিলেন, "এ সময় আপনার কান্নার সময় নয়। আমি আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার যথাযথ প্রত্যুত্তর করিয়া যান। আপনার পুত্র ট্রেণ হইতে পড়িয়া বা ট্রেণের চক্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন নাই। অবশ্য কোন দুষ্ট ব্যক্তি আপনার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে। তাহার প্রমাণ ষ্টেশন মাষ্টার আপনার পুত্রকে রাত্রি পোণে এগারটার ট্রেণে নামিতে দেখিয়াছেন এবং তাহার নিকট হইতে টিকিটও লইয়াছেন। কয়েকজন ষ্টেশনের কর্ম্মচারী আপনার পুত্রকে গৃহাভিমুখে যাইতে দেখিয়াছে; সুতরাং আপনার যদি কাহাকেও কোনরূপ সন্দেহ হয়, প্রকাশ্যভাবে বলুন, আমরা তাহার প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইব।"

"হা ভগবন্! বহুপরিশ্রমে পরিপুষ্ট আমার স্বরোপিত তরুটিকে আমার দ্বারাই ছেদন করাইলে? ইহাতে আর আমি কাহাকে সন্দেহ করিব।" এই বলিয়া গোমস্তাবাবু পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন। গোমস্তাবাবুর কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্ এবং কারণ জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন।

দারোগা বলিলেন, "আপনি কি প্রলাপ-বাক্য বলিতেছেন?"

কাঁদিতে কাঁদিতে গোমস্তা বলিলেন, "না মশায় সত্যকথা। আমি প্রলাপ বাক্য বলি নাই। আজ আমি পাপের উপযুক্ত ফল হাতে হাতে পাইলাম।"

দারোগা। "তবে আপনি সকল কথাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।" পাপের মাত্রা পূর্ণ হইলে পাপীর হৃদয়ে পাপকার্য্য গোপন থাকে না। তখন পাপী নিজেই নিজের পাপের বক্তা হয়। এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায়। দারোগার প্রশ্ন শুনিয়া সেইরূপ গোমস্তাবাবু আদ্যোপান্ত সকল কথাই প্রকাশ করিয়া বলিলেন। গোমস্তাবাবুর কথা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। প্রতুল যদিও রামরঞ্জনের শোচনীয় মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তথাপি গোমস্তার কথা শুনিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ভুলিলেন না এবং তাঁহার অদ্ভুত বিচার স্মরণ করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিলেন। কয়েকজন পুলিশ-কর্ম্মচারী যাইয়া ঘাতুকদ্বয়কে বন্ধন করিয়া আনিল। তাহারাও সকল কথাই অকপটে স্বীকার করিল। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট পুলিশ-দারোগা গোমস্তা ও ঘাতুকদ্বয়কে বন্ধনাবস্থায় কয়েকজন পুলিশ প্রহরীর সহিত থানায় পাঠাইয়া দিলেন।

এখানে দারোগা প্রতুলের সহিত ষ্টেশনে আসিয়া প্রতুলের পিতাকে টেলিগ্রাম করিলেন। রাত্রি পৌণে এগারটার ট্রেণে প্রতুলের পিতা দৌলতপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আপনার হারানিধি কোলে পাইয়া প্রতুলের পিতা পরমেশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বেই গোমস্তাবাবু প্রতুলের টাকা লওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং গোমস্তাবাবুর আদেশে তাঁহার পত্নী প্রতুলকে এক হাজার টাকা দিলেন। করুণাময়ের নাম স্মরণ করিয়া পিতা-পুত্র প্রফুল্ল বদনে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

মোকদ্দমা নিম্ন আদালত হইতে দায়রা সোপরদ্দ হইল। বাদী স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট। প্রমাণের কোন আবশ্যক হইল না। কারণ আসামীগণ পূর্ব্ব হইতেই দোষ স্বীকার করিয়া আসিতেছিল। জজের জুরীগণ এক বাক্যে তাহাদিগকে দোষী বলিয়া শাব্যস্ত করিলেন। বিচারে রায় প্রকাশিত হইল। ঘাতুকদ্বয়ের প্রাণদণ্ড এবং গোমস্তাবাবুর যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডের আদেশ হইল।

জজ কহিলেন, "গোমস্তাবাবু! আপনি আপনার কর্ম্মের কিরূপ ফললাভ করিলেন?"

সঙ্গে সঙ্গে গোমস্তার মুখে বাহির হইল,--"আশার অধিক"।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

যশোবন্ত সিংহ।

(৫)

আমরা যশোবন্ত সিংহের যে বিবরণ প্রদান করিলাম, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তিনি উত্তর ভারতবর্ষে ও দাক্ষিণাত্যে কিরূপ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া, মোগলের ময়ূরাসনকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে বাদশাহ আরঙ্গজেব তাহার পৃষ্ঠে উপবিষ্ট থাকায় তাহা বিপর্য্যস্ত হইতে পারে নাই। আরঙ্গজেবের কৌশল ও ক্ষমতায় যশোবন্তের প্রত্যেক চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি নিজের ইচ্ছা ফলবতী করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহার সৃষ্ট তুফানে মোগল-সাম্রাজ্য যে আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত বিশেষতঃ রাঠোরের পরাক্রম যে কাবুল হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত রাজপুতগণ নিজ অস্তিত্ব সমভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা মোগলের সহিত মিলিত হইলেও আপনাদের বিশিষ্টতা বিসর্জ্জন দেন নাই। মোগল-সৈন্য ও সেনাপতি হইতে রাজপুতকে চিরদিনই পৃথকরূপে অবগত হওয়া যাইত। যশোবন্ত ও তাঁহার অনুচরগণ রাজপুতের জাতিগত এবং রাঠোরের কুলগত পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াই তৎকালে সকলকেই চমকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তবে কাল-ধর্ম্মানুসারে রাজপুতের সরলতা যে অন্যান্য

বামাচরণ (বামা ক্ষেপা)।

Mohila Press, Calcutta.

জাতির কৌশল মিশ্রিত হইয়া অল্পবিস্তর মলিন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও যশোবন্তচরিত্রে লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে ইহার একটু আলোচনা করিতেছি।

পাঠানমোগলের সহিত রাজপুতের সংঘর্ষ চিরদিনই চলিয়াছিল। আকবর বাদশাহ মোগল রাজপুতের মিলনের চেষ্টা করিলেও সকল রাজপুতই যে মোগলদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এরূপ নহে, এবং মিলিত রাজপুতগণ চিরদিনই যে, মোগলদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাও স্বীকার করা যায় না। ইহার কারণ, মোগলের একাধিপত্যের চেষ্টা ও রাজপুতের স্বাধীনতার প্রয়াস, এই দুই কারণেই আমরা মোগলরাজপুতের মিলন স্থায়ীরূপে দেখিতে পাই নাই। অনিন্দ্যসুন্দরী যোধবাইএর সহিত আকবর বাদশাহের পরিণয় সংঘটিত হওয়ায় মোগল-রাঠোরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। অবশ্য তৎপূর্ব্বে মিলনের সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই আত্মীয়তার পর হইতেই তাহা সুদৃঢ় হইয়া উঠে। রাঠোরগণ মোগল সম্রাটদিগের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপে মোগলসাম্রাজ্য বিস্তারের যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহাদের কুলগত স্বাতন্ত্র্য কত দিন পর্য্যন্ত লুক্কায়িত থাকিতে পারে? কাজেই যখন হইতে আত্মীয়তার শৈথিল্য ঘটিল, এবং মোগলের একাধিপত্যের লালসা ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিল, তখন রাঠোরের স্বাধীনতাস্পৃহা ধীরে ধীরে জাগরিত হইতে লাগিল। সেই জন্য আমরা যশোবন্ত-চরিত্রে দেখিতে পাই যে, তিনি প্রথমে মোগল বাদশাহের নিকট অনুগ্রহ লাভ করিলেও শাজাহান ও আরঙ্গজেবের দিগন্তপ্রসারিণী প্রভুতার জন্য আপনার স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জাগরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগলের অপরিসীম ক্ষমতা-কৌশল তাঁহার সে ইচ্ছাকে যে বলবতী হইতে দেয় নাই, তাহা পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে সকলেই অবগত হইতে পারিবেন। সেই জন্য যশোবন্ত সময়ে সময়ে হৃদয়ের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আবার তাহা নির্ব্বাপিত করিয়াই রাখিতেন। তিনি স্বীয় জীবনে সাধনার সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই।

জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহকে নির্ব্বাসিত করিয়া গজসিংহ কনিষ্ঠ যশোবন্তের মস্তকে রাজমুকুট পরাইবার ব্যবস্থা করেন, এবং তজ্জন্য বাদশাহ সাজাহানেরও অনুমতি লইয়াছিলেন। যশোবন্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মোগল সম্রাটের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিলেও মনে মনে স্বাধীনতার ইচ্ছাকে জাগাইয়া তুলিতেছিলেন। তাই আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, শাজাহানের রাজত্বকালে যশোবন্তের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের চেষ্টায় বাধা দেওয়ার জন্য শাজাহান বাদশাহকে আয়োজন করিতে হইয়াছিল। তাহার পর যশোবন্ত মোগলসাম্রাজ্যের গৌরব-রক্ষার জন্য ব্যাপৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু স্বীয় হৃদয় হইতে একেবারে স্বাধীনতাস্পৃহা বিসর্জ্জন দেন নাই। সাজাহান ও দারার কল্যাণ-কামনায় তিনি নর্ম্মদার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রাজপুতপরাক্রম প্রদর্শন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এখনও পর্য্যন্ত যশোবন্তের হৃদয়ে রাজপুতের সরলতা ও ধর্ম্মযুদ্ধের স্বর্গীয় ভাব ক্রীড়া করিতেছিল। তাই তিনি আরঙ্গজেবের ক্লান্ত সৈন্যগণকে আক্রমণ করার ইচ্ছা করেন নাই। এই রাজপুতপরাক্রম প্রদর্শনের জন্য আরঙ্গজেব ও মোরাদ উভয়ের সৈন্যকে একসঙ্গে আক্রমণের অভিলাষ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার গর্ব্ব বা দাম্ভিকতা প্রকাশ পাইতে পারে বটে, কিন্তু রাজপুত-গৌরবের রৌদ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়াই যে তাঁহার হৃদয় ধাবিত হইয়াছিল সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। রণনীতি-অনুসারে ইহা সুকৌশল বলিয়া বিবেচিত না হইলেও যশোবন্ত তাহাকে রাঠোরপরাক্রম প্রদর্শনের উপযুক্ত উপায় মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অনুমান যে মিথ্যা হয় নাই, তাহা ঐতিহাসিকগণের উক্তি হইতে জানিতে পারা যায়। নর্ম্মদাযুদ্ধে যশোবন্ত জয়লাভ না করিলেও তাঁহার ও তাঁহার সহচরগণের পরাক্রমে তাহা যে রাজপুতগৌরব ঘোষণা করিয়াছিল, এ কথা ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ নর্ম্মদাযুদ্ধে যশোবন্ত জয়ী না হইলেও তাহাতে তাঁহার সুকীর্ত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে রাঠোর-পরাক্রম ও রাজপুত-গৌরবই প্রকাশ পাইয়াছিল।

খাজওয়ার যুদ্ধে যশোবন্তের আচরণ কিছু বিস্ময়কর বটে। এখানে তিনি রাজপুতের সরলতা বা রাঠোর-পরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

নর্ম্মদাযুদ্ধের পর হইতে তিনি আর মোগলের পক্ষপাতী ছিলেন না। যে স্থলে পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পুত্রেরা শাসনদণ্ড গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, তথায় যাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও তেজস্বিতা আছে, তিনি কিরূপে সেরূপ শাসনপ্রথার পক্ষপাতী হইতে পারেন? কাজেই মোগলের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া যশোবন্ত স্বাধীনতা অবলম্বনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। নর্ম্মদাযুদ্ধে জয় লাভ অথবা প্রাণত্যাগ না করায়, তাঁহার মহিষী তাঁহাকে যারপরনাই তিরস্কার করিয়াছিলেন সত্য, এবং তজ্জন্য উত্তেজিত হইয়া যশোবন্ত আরঙ্গজেবের প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে সময়ে দেবতারা মোগলের রাজছত্র অক্ষুণ্ণ রাখার ইচ্ছা করায়, যশোবন্ত কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই এবং তিনি মনে মনে তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মহিষীর তিরস্কারবাক্যে উত্তেজিত এবং প্রতি-হিংসা ও স্বাধীনতার উগ্র মদিরা পানে বিহ্বল হইয়া যশোবন্ত নর্ম্মদা যুদ্ধের পর হইতে যেরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হন, তাহাতে তিনি রাজপুতগৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই সময় হইতে তিনি রাজপুতের সরলতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য জাতির কপটতা অবলম্বন করিতেও বাধ্য হইয়া-ছিলেন। এবং সে সময়ে বিনা কৌশলে কার্য্যোদ্ধারের সম্ভাবনা না থাকায়, যশোবন্ত সময়োচিত আচরণের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। বাস্তবিক সে সময়ে সকলেই কোন না কোনরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন। মহাপ্রাণ শিবাজী প্রভৃতির জীবনেও তাহা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যশোবন্ত স্বাধীনতার ইচ্ছার ও প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যই সময়োচিত কৌশল অবলম্বনে খাজওয়ার নিকটে সুজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত আরঙ্গজেবের সৈনাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কৌশল তাঁহার হৃদয় হইতে একেবারে রাজপুতসরলতাকে নির্ব্বাসিত করিতে পারে নাই। সেই জন্য তিনি যুদ্ধশেষ পর্য্যন্ত রণক্ষেত্রে অবস্থিতি করিয়া আরঙ্গজেবের সমস্ত সৈন্যের সহিত সংঘর্ষে রাঠোরপরাক্রম প্রদর্শ-নের ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু রণপরিশ্রান্ত সৈন্যের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করা যে প্রকৃত রাজপুতসরলতা নহে, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। নর্ম্মদাযুদ্ধে আরঙ্গজেবের পথশ্রান্ত সৈন্যদিগকে আক্রমণ

না করিয়া যশোবন্ত যেরূপ রাজপুতগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, খাজওয়ার নিকট তাঁহার রণশ্রান্ত সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে, সে গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ নর্ম্মদাযুদ্ধের পর হইতে প্রতিহিংসা বৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়াও স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছায় যশোবন্ত যে কৌশল ও কপটতা অবলম্বন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে উপস্থিত হইয়া শিবাজীর সহিত গুপ্তসন্ধি স্থাপনও ঐ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বলিয়াই স্থির হইয়া থাকে। এই সময়ে যশোবন্তের স্বাধীনতা-স্পৃহা কিছু বলবতী হইয়া উঠে। মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত মিলিত হইলে মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংস যে অনায়াসেই হইতে পারে, ইহা যশোবন্তের মনে সুস্পষ্টরূপেই উদয় হইয়াছিল। বাস্তবিক যদি যশোবন্ত, জয়সিংহ, রাজসিংহ ও শিবাজী মিলিত হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া মহাতুফানের সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে মোগলের ময়ূরাসন যে যমুনার মহাগর্ভে নিমজ্জিত হইত তাহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কিন্তু মোগলের গৌরব-তপন তখনও তাহার ভাগ্যাকাশ পরিত্যাগ না করায়, শিবাজী বা যশোবন্তের মনস্কামনার পূরণ হয় নাই। শিবাজী কর্ত্তৃক সায়েস্তা খাঁর গুপ্ত আক্রমণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যশোবন্তের যোগ ছিল বলিয়া বুঝা যায় না। কিন্তু দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে তিনি যে উদাসীন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তদ্ভিন্ন সাজাদা মোয়াজিমকে পিতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তিনি প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থেরই চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলতঃ যশোবন্তের জীবনের শেষ ঘটনাবলি স্বাধীনতাস্পৃহা ও প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। আরঙ্গজেবের কপট ব্যবহারের জন্য যশোবন্তের প্রতিহিংসাবৃত্তি যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, ইহাও আনুপূর্ব্বিক আলোচনার দ্বারা স্থির হইয়া থাকে। আরঙ্গজেব যশোবন্তকে যে অত্যন্ত ভয় করিতেন, তাহাও বেশ বুঝা যায়; এবং তিনিও যে যশোবন্তের প্রতিহিংসা করিতেন তাহা যশোবন্তের মৃত্যুর পর তাঁহার অন্যান্য পরিবারবর্গের প্রতি আরঙ্গজেবের পৈশাচিক আচরণ হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সে যাহা হউক, আরঙ্গজেবের কপট ব্যবহারের জন্যই যে যশো-

বন্তের প্রতিহিংসার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল তাহা বলিয়া নহে, আরঙ্গজেব হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী থাকায় যশোবন্ত তজ্জন্যও তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন, এবং সেই কারণেই তাঁহার প্রতিহিংসা প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হইত; সুতরাং আরঙ্গজেবের প্রতি যশোবন্তের প্রতিহিংসা যে কেবল ব্যক্তিগত কারণের জন্য তাহা নহে। কিন্তু ধর্ম্মের, দেশের ও তাঁহার নিজের প্রতি অসদাচরণের জন্যই যশোবন্ত প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থতার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোগলের সামন্তরূপে তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিলে তাঁহাকে কৃতঘ্নতা-দোষে দূষিত বলা যাইতে পারে বটে; কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ও রাজপুতজাতির রক্ষিতাস্বরূপে দেখিলে তাঁহাকে যে একজনমহাপ্রাণ পুরুষসিংহ বলিতে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলতঃ তৎকালে যশোবন্ত রাজপুতজাতির যে গৌরবস্বরূপ ছিলেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। * মাড়বারের উন্নতি-কল্পে তিনি যে অনেক মহদনুষ্ঠানও করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

* টড যশোবন্ত-চরিত্র সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"The life of Jeswunt Sing is one of the most extraordinary in the annals of Rajpootana, and a full narrative of it would afford a perfect and deeply impressing picture of the history and manners of the period. Had his abilities, which were far above mediocrity, been commensurate with his power, credit, and courage, he might, with the concurrent aid of the many powerful enemies of Arungzebe have overturned the Moghull throne. Throughout the long period of two and forty years, events of magnitude crowded upon each other, from the period of his first contest with Arungzebe, in the battle of the Nerbudda is his conflicts with the Afghans amidst the Snows of Caucasus. Although Rahtore had a preference amongst the sons of Shah Jehan, esteeming the frank Dara above the crafty Arungzebe, yet he detested the whole race as

inimical to the religion and the independence of his own; and he only fed the hopes of any of the brothers, in their struggles for empire, expecting that they would end in the ruin of all. His blind arrogance lost him the battle of the Nerbudda, and the supineness of Dara prevented his reaping the fruit of his treachery of Kujwa. The former event, as it reduced the means and lessened the fame of Jeswunt, redoubled his hatred to the conqueror. Jeswunt neglected no opportunity which gave a chance of revenge. Impelled by his motive, more than by ambition, he never declined situations of trust, and in each he disclosed the ruling passion of his mind. His overture to Sevaji (like himself the implacable foe of the Moghul), against whom he was sent to act; his daring attempt to remove the imperial lieutenants, one by assassination, the other by open force; his inciting Moazzim, whose inexperi ence he was sent to guide, to revolt against his father, are some among the many signal instances of Jeswant's thirst for revengeance. The Emperor, fully aware of this hatred, yet compelled from the force of circumstances to dissemble, was always on the watch to counteract it, and the artifices this mighty king had recourse to in order to conciliate Jeswunt, perhaps to throw him off his guard, best attest the dread in which he held him. Alternately he held the viceroyalty of Guzerat, of the Dekhan, of Malwa, Ajmeer, and Kabul (where he died), either directly of the king, or as the king's lieutenant, and second in command under one of the princes. But he used all these favours merely as stepping stones to the sole object of his life. Accordingly, if Jeswunt's character had been drawn by a biographer of the court viewed merely in the light of a great vassal of the empire, it would have reached us marked with the stigma of treachery in every trust reposed in him; but on the other hand, when we reflect on the character of the king, the avowed enemy of the Hindu faith, we only see in Jeswunt a prince putting all to hazard in its support. 'He had to deal with one who placed him in these offices, not from personal regard, but because he deemed a hollow submission better then avowed hostility, and the Raja, therefore, only opposed fraud to hypocrisy, and treachery to superior strength. Doubtless the Rahtore was sometimes dazzled by the baits which the politic king administered to his vanity; and when all his brother princes eagerly contended for royal favours, it was something to be singled out

রাজপুতগৌরব ও রাঠোরপরাক্রম প্রদর্শনের জন্য যশোবন্ত যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার সহচরগণের সাহায্যেই সাধিত হইত, এ কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার অন্যতম প্রধান সহচর রতনরাও যে নর্ম্মদাযুদ্ধে অসীম পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে কথারও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু যিনি সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্রই যশোবন্তের অনুসরণ করিতেন, তাঁহার কিছু পরিচয় প্রদান না করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাই এক্ষণে সেই "বিশ্বস্তের বিশ্বস্ত" নাহুর খাঁ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথার উল্লেখ করিতেছি। রাঠোর জাতির কম্পাবত শ্রেণীর সর্দ্দার মুকুন্দদাসই নাহুর খাঁ নামে অভিহিত হন। মুকুন্দ দাস সর্ব্বত্রই যশোবন্তের দক্ষিণহস্ত স্বরূপে অবস্থিতি করিতেন। এমন কি তিনি যশোবন্তের সহিত অটক পারেও গমন করিয়াছিলেন। মুকুন্দদাসের জন্যই যশোবন্তের বিরুদ্ধে আরঙ্গজেবের অনেক কৌশল ব্যর্থ হইয়াছিল। আরঙ্গজেব তাঁহাকে ব্যাঘ্রমুখে নিক্ষেপ করার

as the first amongst his peer in Rajpootana. By such conflicting impulses were both parties actuated in ther mutual conduct throughout a period in duration nearly equal to the life of man, and it is no slight testimony to Arungzebe's skill in managing such a subject, that he was able to neutralise the hatred and the power of Jeswunt throughout this lengthened period. But it was this vanity, and the immense power weilded by the kings who could reward service by the addition of a vice-royalty to their hereditary domains, that made the Rajpoot princes slaves; for, had all the princely contemporaries of Jeswunt, Jey Sing of Amber, the Rana Raj of Marwar, and Sevaji,—coalesced against their national foe, the Moghul power must have been extinct. Could Jeswunt, however, been satisfied with the mental wounds he inflicted upon the tyrant, he would have had ample revenge; for the image of the Rahtore crossed all his visions of aggrandisement. The cruel sacrifice of his pier, and the still more barbarous and unrelenting ferocity with which he pursued Jeswunt's innocent family are the surest proofs of the dread which the Rahtore prince inspired while alive.

ইহার বীর ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে বলায়, মুকুন্দদাস ব্যাঘ্রপিঞ্জরে প্রবেশ করিয়া "বিরার ব্যাঘ্র যশোবন্তের ব্যাঘ্রের প্রতি লক্ষ্য কর" বলিয়া প্রদীপ্ত নয়নে সেই ভীষণ শত্রুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, ব্যাঘ্র একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া অধোবদন হয়। তখন মুকুন্দদাস "ভীত শত্রুর সহিত রাজপুত যুদ্ধ করে না" বলিয়া পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া আসেন। বাদসাহ আরঙ্গজেব তাঁহার এইরূপ নির্ভীকতার জন্য তাঁহাকে "নাহর (ব্যাঘ্র) খাঁ" উপাধি প্রদান করেন। নাহর খাঁ মাড়বারের চিরশত্রু ও বাদসাহের বশ্যতা স্বীকারে পরাঙ্মুখ শিরোহীরাজ সুরতানকে বন্দী করিয়া আরঙ্গজেবের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণত্যাগও এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। যশোবন্তের প্রপিতামহ ও সুপ্রসিদ্ধ মালদেবের পুত্র উদয়সিংহ এক আর্য্যপন্থী ব্রাহ্মণকন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হরণের চেষ্টা করিলে, কন্যার পিতা কন্যাটিকে হত্যা করিয়া নিজেও আত্মহত্যা সম্পাদন করেন। তাঁহারই অভিশাপে উদয়সিংহের আয়ুঃশেষ হয়। ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা রাঠোরবংশীয়গণের অবিনয় দর্শন করিলে, তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিবে বলিয়া অবস্থিতি করিতে থাকে। রাঠোরবংশীয়গণ চিরদিন সংযম শিক্ষা করিতেন। যশোবন্ত কুলাচারভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার কোন কর্ম্মচারীর কন্যার প্রতি আসক্ত হইলে, ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা তাঁহাকে আশ্রয় করে। ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করা হইলে প্রেতাত্মা প্রকাশ করে যে, যদি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাঁহাতে আমায় আশ্রয় করিতে দেন, তাহা হইলে আমি রাজাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। নাহরখাঁ সেই প্রেতাত্মা আকর্ষণ করিয়া লওয়ায় তিনি অবশেষে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এবং তিনি কম্পাবতগণের প্রাধান্য চম্পাবতগণকে প্রদানের জন্য স্বীয় পুত্রগণকে উপদেশ দিয়া যান। সেই জন্য রাজপুতরাজগণ নাহর খাঁকে "বিশ্বস্তের বিশ্বস্ত" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। নাহর খাঁর আত্মবিসর্জ্জন যে এক অদ্ভুত ব্যাপার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত সহচরের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় যশোবন্ত রাজপুতগৌরব ও রাঠোরপরাক্রম প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

১ম খণ্ড। | মাঘ ১৩২০ | ১০ম সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

লেখকগণের নাম।

শ্রীসাতকড়ি অধিকারী এম. এ. শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরেবতীরমণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীকামিনী-কান্ত নিয়োগী ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা শাশ্বতীর মূল্য প্রদান না করিয়াছেন, অগ্রহায়ণ সংখ্যা তাহাদের নামে ভি পিতে পাঠান হইবে। তবে কেহ অন্য মাসে ভি, পি করিতে বলিলে আমরা তাহাও করিতে পারি। গ্রাহকগণের কোন পত্র না পাইলে অগ্রহায়ণ মাসেই ভি পি করিব। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

নিয়মাবলী।

—:০:—

সাহিত্যে দেশীয় ভাববিকাশই শাশ্বতীর উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কোন লেখক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে পারেন। নবীন লেখকগণের প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

শাশ্বতীর জন্য প্রবন্ধাদি ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি এবং চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এথোড়া পোঃ ভায়া সীতারামপুর ই, আই, রেলওয়ে ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

এথোড়া (Ethora) পোঃ
ভায়া সীতারামপুর,
ই, আই, রেলওয়ে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

———

শাশ্বতী, ১ম খণ্ড। মাঘ, ১৩২০। ১০ম সংখ্যা।

নব্যহিন্দুর অভ্যুদয়।

(২)

প্রাণবিঘাতক কোনও রূপ ব্যাধি বা বিষের সংক্রমণে যখন মনুষ্যশরীরের স্বাভাবিক প্রাণের ক্রিয়া অবরুদ্ধ হইয়া আসে, সংজ্ঞা লোপ পায়, জড়ের ন্যায় শরীরের স্পন্দনহীন অসাড়ভাব আসন্ন মৃত্যুর অশুভবার্ত্তার প্রচার করিয়া আতঙ্কের সঞ্চার করিতে থাকে, তখন সেই মৃতপ্রায় মানবশরীরে কোনও সদ্বৈদ্যনির্ব্বাচিত উপযুক্ত ঔষধের প্রয়োগ করিলে, সেই ঔষধের সহায়তায় বাতাহতদীপকলিকার ন্যায় অতিক্ষীণ, নির্ব্বাণোন্মুখ তাহার সেই প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি, কথঞ্চিৎ বললাভ করিয়া শরীরপ্রবিষ্ট ব্যাধি বা বিষের প্রতিকূলে একরূপ ক্রিয়ার সৃষ্টি দ্বারা তাহার আক্রমণ হইতে শরীরকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। তখন সেই চেষ্টার সঙ্গে আগন্তুক ব্যাধি বা বিষের প্রতিকূল ক্রিয়ার একটা বিরোধ উপস্থিত হয়। একদিকে যেমন ব্যাধি বা বিষের তীব্রশক্তি সমস্ত শরীরকে দূষিত করিয়া আত্মার ক্রিয়া প্রচারের অযোগ্য বা আত্মার অধিষ্ঠানের অনুপযোগী করিয়া তুলিতে চায়, অপরদিকে ঠিক সেইরূপ আত্মশক্তি আপনার বলে ব্যাধি বা বিষের সেই প্রতিকূল ক্রিয়াকে ঠেলিয়া দিয়া, শরীরের সমস্ত অনুপযোগিতা—সকল অক্ষমতাকে দূর করিয়া, শরীরকে আকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করে। যে পর্য্যন্ত শরীরের প্রতিকূল ব্যাধি বা বিষের প্রাবল্যহেতু তাহাদের ক্রিয়া অতিমাত্রায় চলিতে থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার বিপরীত প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তির উল্লিখিত রূপ শরীরসংরক্ষণক্রিয়া আরব্ধ হইলেও তাহা প্রায়ই অনুভূত হয় না। পরে সেই ক্রিয়া যখন উপযুক্ত বললাভ করিয়া ব্যাধি বা বিষের প্রবল প্রতিকূল ক্রিয়ার বিপরীতে ঠিক তদনুরূপ ক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হয়, তখন মুমূর্ষুর পতনোন্মুখ শীর্ণ শরীরের আপেক্ষিক সুস্থতা, সজীবতা বা সুপ্রসন্নতার মধ্য দিয়া তাহা অভিব্যক্ত হইতে থাকে, কিন্তু ব্যাধি ও বিষের মূলগত প্রাবল্য

অক্ষুণ্ণ থাকে, সে পর্য্যন্ত রুগ্ন শরীরের সেই সুস্থ সজীব সুপ্রসন্নতাব অধিকক্ষণ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। পরক্ষণেই আবার মৃত্যুর করাল কৃষ্ণছায়া দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। এইরূপে যে পর্য্যন্ত ব্যাধি ও বিষের প্রাবল্য অব্যাহত থাকে, সেই পর্য্যন্ত প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তির শরীরসংরক্ষণক্রিয়া বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় রোগীর আপেক্ষিক সুস্থতা সজীবতা বা সুপ্রসন্নতা রূপে কখনও কখনও দেখা দিয়া পরক্ষণেই আবার বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া অন্তর্হিত হয়। ব্যাধি ও বিষের মূলগত প্রাবল্যের হ্রাসের সঙ্গে যখন প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি প্রবল হইতে থাকে, তখন তাহার ক্রিয়ার স্থায়িত্বও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়, তখন আর তাহা তেমন দেখা দিয়াই পরক্ষণে লুকাইয়া যাইতে চায় না। এইরূপে ব্যাধি ও বিষের তীব্রতার হ্রাসের সঙ্গে জীবনীশক্তির বল যতই বাড়িতে থাকে, তাহার ক্রিয়াও তখন তত ঘন ঘন ও অধিকক্ষণস্থায়ী হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকূল ব্যাধি ও বিষের ক্রিয়াও ঠিক সেইরূপ অল্পক্ষণস্থায়ী ও ক্রমে বিরল হইয়া শেষে অন্তর্হিত হয়।

শরীরাভ্যন্তরে ব্যাধি ও বিষের প্রতিকূলে বিপরীত ক্রিয়া আরব্ধ হইলেও সকল প্রকার শারীরিক বাধা অতিক্রম করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা বাহিরে প্রকাশিত না হয়, প্রকাশিত হইলেও যে পর্য্যন্ত তাহা প্রকাশিত হইয়া, আবার পর মুহূর্ত্তেই প্রতিকূলক্রিয়ার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, সে পর্য্যন্ত কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। কিন্তু ক্রমে সেই ক্রিয়া যখন অপেক্ষাকৃত বল লাভ করিয়া আপনার স্থিতিকালকে আরও কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া লইতে সমর্থ হয়, এবং স্বীয় বিরলতা ও অস্পষ্টতার পরিবর্ত্তে ক্রমেই আপনাকে অধিক সুস্পষ্ট ও অবিরলরূপে প্রচারিত করিতে চেষ্টা করে, তখন আর তাহা তেমন অবিশ্বাসের ঔদাস্যদৃষ্টিতে নিরীক্ষিত বা উপেক্ষিত হয় না, পক্ষান্তরে আরব্ধ সংগ্রামে ক্রমিক বলবৃদ্ধি বা স্বীয় জয়শীলতার পরিচয়-দানের সঙ্গে ব্যাধি ও বিষের কবল হইতে জীবনের ভবিষ্যৎ মুক্তির ভরসা সঞ্চারিত করিয়া আশ্বস্তি প্রদানই করিয়া থাকে। এইরূপে তাহার ক্রিয়া যতই ঘন, তাহার স্থিতিকাল যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই তাহা তাহার প্রতিকূল ব্যাধি ও বিষের মূলগত শক্তি হ্রাসের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিয়া বিশ্বাস ও আশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

মানবশরীরের ন্যায় মনুষ্যের সমাজশরীরেও যখন কোনও রূপ প্রতিকূল শক্তির ক্রিয়া আরব্ধ হইয়া সমাজকে ব্যাধিযুক্ত করিয়া তুলে, এবং সেই ক্রিয়া যখন সমাজের জীবনীশক্তিকে নিপ্প্রভ করিয়া, সমাজশরীরের অভ্যন্তরে একটা অস্বাভাবিক বিপর্য্যাসের সৃষ্টি করিয়া, সমাজের ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের সূচনা করে, তখন সমাজের জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তি যে কোনও কারণে কিঞ্চিৎ বল লাভ করিয়া, সেই প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে ক্রিয়া আরম্ভ করিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপযুক্ত বললাভের সহিত সেই ক্রিয়া, প্রতিকূল শক্তির ক্রিয়াকে পরাজিত করিয়া তাহার উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, ততক্ষণ 'পর্য্যন্ত সমাজের সেই প্রতিক্রিয়া, প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে স্বীয় জীবনীশক্তি সঞ্জাত সমাজের সেই আত্মসংরক্ষণক্রিয়া আরব্ধ হইলেও, তাহা সেরূপ বিশ্বা-সের সহিত সাগ্রহ দৃষ্টিতে নিরীক্ষিত হয় না। তখনও তাহার অন্তরালে, সেই অচিরস্থির ক্ষণভঙ্গুর ক্রিয়ার অভ্যন্তরপ্রদেশ হইতে নৈরাশ্যের ছায়া, অবি-শ্বাসের কৃষ্ণমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া, হৃদয়কে আশঙ্কিত ও আতঙ্কিত করিতে কিছুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করে না। কিন্তু ক্রমিক বলবৃদ্ধির সঙ্গে সেই ক্রিয়া যখন স্বীয় প্রতিকূল শক্তির ক্রিয়াকে পরাজিত করিয়া তাহার উপর আপনাকে প্রতি-ষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়, সমাজশরীরে প্রতিকূল শক্তির পরিবর্ত্তে স্বীয় জীবনী-শক্তি বা প্রাণশক্তির ক্রিয়ার লক্ষণনিচয় অধিকাধিকরূপে ফুটিতে থাকে, তখন আর তাহা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে নিরীক্ষিত হয় না; পক্ষান্তরে সমাজের ভবিষ্যৎ ব্যাধিমুক্তির সম্ভাবনাকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নৈরাশ্যের অন্ধকারে আশার আলোক প্রজ্বালিত করে।

হিন্দু সমাজে যখন নূতন বিদেশীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফলস্বরূপ স্বীয় জাতীয় প্রকৃতির প্রতিকূল কতকগুলি বিরুদ্ধ ভাব দেশের শিক্ষিতসমাজে আশ্রয়লাভ করিয়া প্রবলপরাক্রমে সামাজিক শক্তির উপর প্রভুত্ব সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল, দেশীয় সাহিত্য, চিন্তা ও বাগ্মিতার মধ্যদিয়া সেই বিরুদ্ধভাবের [illegible] যখন এদেশের প্রাচীন সমাজকে এক অনির্দ্দেশ্য গতিতে কোথায় ভাসাইয়া [illegible] চলিয়াছিল, দীর্ঘকাল অদৃষ্ট বিপর্য্যয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া; হতবল সামা-

শিক্ষাব্যতীত জাতীয়ভাবপরিবর্ত্তনের আরও কতকগুলি-কারণ আছে।

জিক-শক্তি যখন আপনার বলে প্রতিকূলতাবের সেই প্রবলবন্তাকে ঠেকাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না, সমাজের লোকের আহার বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ,হাসি, কাশি, ভাবভাষা যখন সেই বিরুদ্ধভাবের দ্বারা অতিক্রন্ত রূপান্তর গ্রহণ করিতেছিল, দেশীয় ভাব, দেশীয়চিন্তা, যখন আর এদেশের শিক্ষিত সমাজের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছিল না, বিরুদ্ধভাবের চাকচক্যে, নূতন ভাবের মাদকতায়, তাহা যখন ক্ষিপ্রগতিতে অতিদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছিল, দেশের সকল চিন্তা, সকল সাহিত্য যখন বিরুদ্ধভাবের দ্বারা পুষ্টিলাভ করিতেছিল, দেশের প্রাচীনশিক্ষা, প্রাচীনসংস্কার, প্রাচীনভাবের সঙ্গে আপনার অতীতবন্ধন, পুরুষপরম্পরাগত সম্বন্ধের কথা মনে করিয়া যখন এদেশের শিক্ষিত হিন্দুসমাজ লজ্জায় অধোবদন হইয়া পড়িত, এক কথায় যে সময়ে নূতন ভাবের নূতন শিক্ষা এদেশের হিন্দুসমাজে, নূতন এক প্রতিকূল শক্তির সঞ্চার করিয়া নিষ্ঠুর আক্রমণে সমাজের শক্তিকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া মৃত্যুর প্রথম কক্ষে উপনীত করিয়াছিল, সেইদিন সেই মুহূর্ত্তে, সেই প্রতিকূল শক্তির প্রচণ্ড অভিঘাতে সমাজের মৃতপ্রায় জীবনীশক্তি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত, কথঞ্চিৎ বললাভ করিয়া সেই প্রতিকূলশক্তির বিপরীতে একপ্রকার ক্রিয়ার সৃষ্টির দ্বারা তাহার আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইতেই সমাজের পূর্ব্বোক্ত আত্মসংরক্ষণক্রিয়ার সূত্রপাত, সেই দিনই সমাজের উল্লিখিত জীবনীশক্তির বিশেষ ক্রিয়ার আরম্ভ।

যে পর্য্যন্ত প্রতিকূলশক্তির প্রাবল্য অতিমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে, মনুষ্যশরীরে জীবনীশক্তি বা আত্মসংরক্ষণীশক্তির বিশেষ ক্রিয়া আরব্ধ হইলেও সে-পর্য্যন্ত তাহা যেমন প্রায়ই লক্ষিত হয় না, হিন্দুসমাজের তদানীন্তন নবজাত আত্মসংরক্ষণক্রিয়াও ঠিক সেইরূপ বিরুদ্ধক্রিয়ার আতিশয্যে সে সময়ে প্রায় কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু সেই ক্রিয়াই যখন পরে আরও কিঞ্চিৎ বললাভ করিয়া প্রতিকূলশক্তির প্রবলক্রিয়ার উপরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত শক্তিমান পুরুষ কয়জনকে আশ্রয় করিয়া বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং তখনই তাহা সাধারণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যেই সকল শক্তিমান্ পুরুষের ধর্ম্ম ও সমাজরক্ষার

শুভচেষ্টা ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের ইচ্ছাকৃত কৃত্রিমপ্রযত্নমূলক কোনও রূপ অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। তাঁহারা স্বেচ্ছায় কোনও রূপ লৌকিক স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে তাহাতে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহাদের সেই চেষ্টা প্রতিকূলশক্তি দ্বারা নিপীড়িত ও নিগৃহীত সমাজের জীবনীশক্তি বা আত্মসংরক্ষণী শক্তির বিশেষ ক্রিয়াব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই সকল শক্তিমান্ পুরুষগণের মধ্যদিয়া সমা-জের আত্মসংরক্ষণীশক্তিরই এক একটা বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু তখনও তাহা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ দৃষ্টিতে অবলোকিত হওয়ার উপযুক্ততা লাভ করিতে পারে নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজশরীরে প্রতিকূলশক্তির বিরুদ্ধে সমাজের জীবনীশক্তি বা আত্মসংরক্ষণশক্তির ক্রিয়া আরব্ধ হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়া আবার পরক্ষণেই প্রতিকূলশক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, অথবা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত প্রতি-কূল শক্তির অসংখ্য তরঙ্গমালার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে জীবনী-শক্তির ক্রিয়া আবির্ভূত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিকূলশক্তির প্রাবল্য হেতু জীবনী-শক্তির সেই অচিরস্থির ক্ষণভঙ্গুর ক্রিয়ার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। সেই ক্ষেত্রেও সেরূপ সমাজের আত্মসংরক্ষণক্রিয়ার ফলস্বরূপ সেই সকল শক্তিমান্ পুরুষগণের ধর্ম্ম ও সমাজরক্ষার শুভচেষ্টা যেমন এক দিকে সময়ে সময়ে সমাজের স্থানে স্থানে প্রতিকূলশক্তিকে প্রত্যাঘাত করিতে সমর্থ হইতে-ছিল, অপরদিকে আবার পরক্ষণে প্রতিকূলশক্তির দ্বারা যে তাহা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলনা এরূপ নহে। কাজেই সেই ক্রিয়ার মধ্যদিয়া সমাজের জীবনী-শক্তির বলবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেলেও তাহার প্রতিকূলশক্তির মূলগত প্রাবল্যের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া সে সময়ে অনুমিত হইত না। এইরূপে সেই সময়ে সমাজের আত্মসংরক্ষণক্রিয়া আরব্ধ হইয়া প্রতিকূলশক্তির বিরুদ্ধে আত্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেও অনেকের নিকট তাহা তেমন বিশ্বাসের চক্ষে নিঃসন্দেহ দৃষ্টিতে নিরীক্ষিত হইতে পারে নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীরেবতীরমণ ভট্টাচার্য্য।

বেদ।

(৫)

দেবতার আকার।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, এক আত্মাই ইন্দ্রাদি নানা দেবতারূপে উপাসিত হইয়া থাকেন। এই প্রবন্ধে ইন্দ্রাদি দেবতা সাকার কি না এই বিষয়ে আলোচনা করিব। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তগ্রন্থে মন্ত্রার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিতরূপে বিচার করিয়াছেন। "অথাকারচিন্তনং দেবতানাং পুরুষবিধাঃ স্যুরিত্যেকং চেতনাবদ্ধি স্তুতয়ো ভবন্তি,তথাভিধানান্যথাপি পৌরুষবিধিকৈরঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্তে।" দেবতার আকার সম্বন্ধে চিন্তা করা যাইতেছে, দেবতাগণ পুরুষের ন্যায় অর্থাৎ মনুষ্যের ন্যায় আকার বিশিষ্ট, কারণ স্তুতি বা মন্ত্র দেবতাগণের চেতনাবত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকে। বেদমন্ত্রে দেবতাদিগের পরস্পর উক্তি প্রত্যুক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্যগণের যেরূপ অঙ্গাদি দৃষ্ট হয়, বেদমন্ত্রে দেবতাদিগেরও সেইরূপ অঙ্গাদি বর্ণিত আছে। "ঋষাত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ" "যৎ সংগৃভ্ণা মঘবন্ কাশিরিৎ তে" এই দুই মন্ত্রে মনুষ্যের ন্যায় ইন্দ্রের হস্ত ও মুষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ মনুষ্যের যেরূপ উপকরণাদি দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও ঐরূপ উপকরণাদির বর্ণন আছে—"আ দ্বাভ্যাং হরিভ্যামিন্দ্র যাহি" "কল্যাণী জায়া সুরণং গৃহে তে" এই দুই মন্ত্রে ইন্দ্রের অশ্ব ও গৃহ ও পত্নী আছে, এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মনুষ্যের ন্যায় ইন্দ্রাদি দেবগণের কার্য্যাদিও বর্ণিত আছে "অদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য" "আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবম্" এই দুই মন্ত্রে ইন্দ্রের সোমপান ও যজমানের আহ্বান শ্রবণ বর্ণিত হইয়াছে। মন্ত্রে দেবতাগণের বর্ণন দেখিয়া দেবতাগণ মনুষ্যের ন্যায় বিগ্রহবান্ এইরূপ অনুমান করা যায়, কিন্তু যখন আবার বেদবর্ণিত অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা, পৃথিবী প্রভৃতি দেবতার বিষয় পর্য্যালোচনা করা যায়, তখন দেবতাগণ মনুষ্যের ন্যায় বিগ্রহবান্ নহেন, এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। কারণ, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা, পৃথিবী প্রভৃতিকে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি ও তাঁহারা যে মনুষ্যের ন্যায় বিগ্রহবান্ নহেন

তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর ; সুতরাং দেবতাগণ মনুষ্যের ন্যায় বিগ্রহবান্ একথা আর কিরূপে বলা যাইতে পারে।

"অপুরুষবিধাঃ স্যুরিত্যপরম্ অপিতু যদ্দৃশ্যতে অপুরুষবিধং তদ্ যথা অগ্নির্বায়ুরাদিত্যঃ পৃথিবী চন্দ্রমাইতি যথো এতচ্চেতনাবদ্বিদ্বস্তয়োভবন্তীত্যচেতনান্যপ্যেবংস্তূয়ন্তে যথাক্ষপ্রভৃতীন্যোষধিপর্য্যন্তানি" ইত্যাদি—নিঃ ৭।২।৩।

যদি বল যে বেদমন্ত্রে চেতনাবান্ দেবগণের প্রতি স্তুতি প্রযুক্ত হইয়াছে—তাহার উত্তরে বলি অচেতন পদার্থ অক্ষ, ওষধি প্রভৃতিও স্তূত হইয়া থাকে। যদি বল দেবতাগণের মনুষ্যগণের ন্যায় অঙ্গাদি বর্ণিত আছে, তাহার উত্তরে বলি "অভিক্রন্দন্তি হরিতেভিরাসভিঃ" সোম অভিষবকারী প্রস্তর সকল হরিত বর্ণ মুখ দ্বারা সোমপাতাদিগকে আহ্বান করিতেছে এই মন্ত্রে প্রস্তর সকলের মনুষ্যের ন্যায় মুখ ও তদ্দ্বারা অপরের আহ্বান বর্ণিত হইয়াছে। প্রস্তরের অবশ্য মুখ নাই সুতরাং এস্থলে রূপক বর্ণন বুঝিতে হইবে। এইরূপ ইন্দ্রাদি দেবতার হস্তাদির বর্ণনাও রূপক নহে তাহা কে বলিল? যদি বল মনুষ্যের ন্যায় দেবতাগণের উপকরণাদি বর্ণিত আছে, তাহার উত্তরে বলি "সুখং রথং যুযুজে সিন্ধুরশ্বিনম্" এইমন্ত্রে নদীর রথের বর্ণনা আছে। নদীর রথ থাকা সম্ভব নয় ; সুতরাং এখানেও রূপক বর্ণনা বুঝিতে হইবে—এইরূপ অন্য দেবতার উপকরণ বর্ণনস্থলেও রূপক বর্ণনা মনে করিতে হইবে। যদি বলি দেবতাগণের মনুষ্যের ন্যায় কার্য্যাদি বর্ণিত আছে, তাহার উত্তরে বলি "হোতুশ্চিৎ পূর্ব্বে হবিরদ্যমাশত" এই মন্ত্রে প্রস্তর খণ্ডের হবির্ভক্ষণ বর্ণিত আছে। প্রস্তরের ভক্ষণক্রিয়া সম্ভব নহে ; সুতরাং রূপক বর্ণনা বুঝিতে হইবে। এইরূপ অন্য দেবতার স্থলেও রূপক মনে করিতে হইবে। বেদমন্ত্রে ইন্দ্রাদি দেবগণের ও অক্ষপ্রস্তর প্রভৃতি অচেতন পদার্থনিচয়ের মনুষ্যের ন্যায় বাহনাদির বর্ণন দেখিয়া, দেবতাগণ তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যহেতু ইচ্ছানুসারে বিগ্রহবান্ ও আকার-বিহীন উভয়ই হইয়া থাকেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। অথবা দেবগণ মনুষ্যের ন্যায় বিগ্রহবান্, কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মাত্মা ক্ষিতি জল প্রভৃতি অচেতন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ইতিহাসাদিতে এইরূপ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন পৃথিবী স্ত্রীরূপে নিজের ভারাবতারণ জন্য ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অগ্নি ব্রাহ্মণরূপে বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নিকট খাণ্ডবদাহ প্রার্থনা করিয়া-

ছিলেন। * যাস্কের এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তই উত্তরমীমাংসার "অভিমানিব্যপদেশাত্ত" এই সূত্রের সিদ্ধান্তানুরূপ অর্থাৎ উত্তরমীমাংসায় ক্ষিতিজলাদি দেবতা স্থলে যেরূপ অধিষ্ঠাত্রী বা অভিমানিনী দেবতা স্বীকার করা হইয়াছে, যাস্কও সেইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসায় দেবতার বিগ্রহাদি স্বীকৃত হয় নাই, পূর্ব্বমীমাংসামতে দেবতাপ্রসাদ যজ্ঞফলপ্রাপ্তির কারণ নহে। বেদবিহিত মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া যজ্ঞসম্পাদন করিলে, ধর্ম্ম বা অপূর্ব্বাখ্য সংস্কার জন্মে, তাহাই যজ্ঞ কার্য্যের ফলদানে সমর্থ। উত্তরমীমাংসায় দেবতার বিগ্রহাদি অর্থাৎ—

"বিগ্রহো হবিষাং ভোগ ঐশ্বর্য্যঞ্চ প্রসন্নতা।
ফলপ্রদানমিত্যেতৎ পঞ্চকং বিগ্রহাদিকম্॥"

বিগ্রহ (শরীর) হবিরাদির উপভোগ, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, প্রসাদ ও ফলপ্রদান এই পাঁচটী বিষয় দেবতাগণ সম্বন্ধে স্বীকৃত হইয়া থাকে (বেদ মন্ত্রাদি দ্বারাই এই বিগ্রহাদি পঞ্চক সমর্থিত হইয়া থাকে) যাস্কোদ্ধৃত মন্ত্র দ্বারাই দেবতার শরীর, হবিরাদির উপভোগ সমর্থিত হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবতাগণের ঐশ্বর্য্য ও বহু মন্ত্র দ্বারা কথিত হইয়াছে "আহুতিভিরেব দেবান্ হুতাদঃ প্রীণাতি তস্মৈ প্রীতা ইষমূর্জ্জঞ্চ যচ্ছন্তি" "তৃপ্ত এবৈনমিন্দ্রঃ পশুভিস্তর্পয়তি" ইত্যাদি শ্রুতি দেবতার প্রসাদ ও যজমানের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ফলদান সমর্থন করিতেছে।

দেবতাগণের বিগ্রহ স্বীকার করিলে যজ্ঞকার্য্যে তাঁহাদের উপস্থিতি স্বীকার করিতে হয়। কারণ যজ্ঞকার্য্যে তাঁহাদের আহ্বান সন্নিধান হবির্গ্রহণাদি বর্ণিত

---

* অপি বোভয়বিধাঃ স্যুরপি বা পুরুষবিধানামেব সতাং কর্ম্মাত্মান এতে স্যুর্যথা যজ্ঞোযজমানস্যৈষচাখ্যান সময়ঃ। ইতি নি ৭।৭

† "অপি বা পুরুষ বিধানামেব সতাং" পৃথিব্যাদীনাং "কর্ম্মাত্মান এতে স্যুঃ ক্ষিতিজলাদয়ঃ। পরেতু অধিষ্ঠাতারঃ পুরুষবিগ্রহাঃ, এবমুভয়োঃ প্রত্যক্ষাগময়োঃ রূপানুগ্রহঃ কৃতো ভবিষ্যতি। যথা যজ্ঞঃ যজমানস্য কর্ম্মাত্মা। "এষচ আখ্যানসময়ঃ" ভারতে চাখ্যানসময়ে এব এব সিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ পৃথিবী স্ত্রীরূপেণ ভারাবতারণায় ব্রহ্মাণং যযাচে। অগ্নিশ্চ পুরুষরূপেণাগ্নিরূপেণচ খাণ্ডবং দদাহ ইত্যেবমাদি ইতি দুর্গাচার্য্যঃ।

আছে, কিন্তু যজ্ঞকার্য্যে আমরা তাঁহাদের উপস্থিতি দেখিতে পাইনা। আর এক কথা যখন বহু যজমান যজ্ঞ করিয়া থাকেন, তখন ইন্দ্রাদি দেবতার সমস্ত যজ্ঞে বিগ্রহবান্ হইয়া এক সময়ে উপস্থিতি কিরূপে সম্ভব হইবে? এইরূপ আপত্তির উপরে উত্তরমীমাংসায় "বিরোধঃ কর্ম্মণীতিচেন্নানেকপ্রতিপত্তি-দর্শনাৎ" এই সূত্রটী দৃষ্ট হইয়া থাকে, যদি দেবতার শরীরাদি স্বীকার কর তাহা হইলে যজ্ঞাদি ক্রিয়া স্থলে তাঁহাদের সন্নিধি স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহার সম্ভব হয়না, সুতরাং যুক্তি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে দেবতাগণের শরীরাদি স্বীকার করিলেও যজ্ঞক্রিয়া স্থলে তাঁহাদের সন্নিধি যুক্তি বিরুদ্ধ হয় না, কারণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ মহিমা (ঐশ্বর্য্য) বলে বহু শরীর গ্রহণ করিয়া এক সময়ে অনেক যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতে পারেন। বেদেই একথা প্রমাণিত হইয়াছে। যদি বল তাঁহারা যদি যজ্ঞে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সকলের দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভব, কিন্তু তাঁহাদিগকে যজ্ঞাদিস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়না। ইহার উত্তরে বলা যায় যে তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানশক্তি হেতু তাঁহারা সাধারণের নিকট অদৃশ্যভাবে অবস্থান করেন। আর এককথা শাস্ত্রে যোগিগণ সম্বন্ধে এইরূপে বর্ণন আছে।

> আত্মনা বৈঃ সহস্রাণি বহূনি ভরতর্ষভ।
> কুর্য্যাদ্ যোগী বলং প্রাপ্য তৈশ্চসর্ব্বৈর্মহীং চরেৎ ॥
> প্রাপ্নুয়াদ্বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ।
> সংক্ষিপেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যোগিগণ ঐশ্বর্য্যবলপ্রাপ্ত হইয়া বহু শরীর ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। কোন কোন শরীর দ্বারা উগ্র তপস্যা করিয়া থাকেন, কোন কোন শরীর দ্বারা বিষয় উপভোগ করেন, আবার সূর্য্য যেরূপ স্বকীয় রশ্মি সংহরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ যোগিগণও ঐ সকল শরীর সংহৃত বা আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। তপস্যা দ্বারা ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া যোগিগণ যখন এক সময়ে বহু শরীর ধারণ করিতে পারেন, তখন জন্মকাল হইতে সিদ্ধ অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত দেবগণ এককালে বহু শরীর ধারণ করিয়া বহু যজ্ঞস্থানে সন্নিহিত থাকিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?*

স্মৃতিরপি—ইত্যেবং জাতীয়কাপ্রাপ্তাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণাং যোগিনামপি

নিরুক্তে যেরূপ আদিত্য চন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ মনুষ্যের ন্যায় শরীর-ধারী নহেন, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, সুতরাং একমতে দেবগণ শরীরধারী নহেন এইরূপ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সেইরূপ উত্তরমীমাংসায় "জ্যোতিষি ভাবাচ্চ" এইসূত্রে ঐরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। যে সকল মণ্ডলাকার জ্যোতিঃ পদার্থ অন্তরীক্ষ স্থানে দিবারাত্র ভ্রমণ করিয়া জগৎ প্রকাশ করিতেছে, তাহারাই আদিত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। লোকে ও বেদে ঐ সকল মণ্ডলাকার জ্যোতিষ্কগণকে দেবতা বলা হইয়া থাকে। ঐ সকল জ্যোতিষ্ক নিচয় মনুষ্যের ন্যায় বিগ্রহবান্ নহে, উহারা সকলেই অচেতন, জড়। এইরূপ অগ্নি পৃথিবী প্রভৃতি দেবতারূপে স্বীকৃত পদার্থ নিচয়ও জড় এবং অচেতন সুতরাং তাহাদেরও শরীর নাই। এই আপত্তির উত্তরে উত্তরমীমাংসায় "ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি" এই সূত্রে কথিত হইয়াছে যে বাদরায়ণ আচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই যে দেবগণের বিগ্রহবত্তাদি হেতু (শরীরাদি পঞ্চক থাকা হেতু) ব্রহ্ম বিদ্যায় অধিকার আছে। আদিত্যাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডল অচেতন অথচ দেবতা বলিয়া স্বীকৃত, উহাদের মনুষ্যের ন্যায় শরীরাদি নাই। অতএব দেবগণ বিগ্রহশূন্য এইরূপ যেআপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার উত্তর এই যে আদিত্যাদি শব্দ আদিত্যাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডল অর্থে ব্যবহৃত হইলেও ঐশ্বর্য্য বান্ চেতন বিগ্রহবান্ দেবতারূপে অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ। বেদের মন্ত্র ও অর্থবাদে আদিত্যাদি শব্দ ঐরূপ চেতন দেবতা অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। দেবগণ ঐশ্বর্য্য বলে জ্যোতির্ম্মণ্ডল ভাবে অবস্থান করিতে ও ইচ্ছানুরূপ বিগ্রহ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। শ্রুতিতে দেখা যায়,—কাথায়ন মেধাতিথিকে ইন্দ্র মেষরূপ ধারণ পূর্ব্বক হরণ করিয়া ছিলেন। মহাভারতাদি স্মৃতিতেও আদিত্যের পুরুষরূপ গ্রহণ, পৃথিবীর স্ত্রীরূপ গ্রহণ ও অগ্নির ব্রাহ্মণরূপ গ্রহণাদি বর্ণিত আছে। শ্রুতিতে মৃত্তিকা প্রভৃতি জড়পদার্থে চেতনের অধিষ্ঠান আছে

যুগপদনেক শরীরযোগং দর্শয়তি কিমু বক্তব্যং আজা নাসদ্ধানাং দেবানাম্। অনেকরূপপ্রতিপত্তিসম্ভবাচ্চৈকৈকা দেবতা বহুভীরূপৈরাত্মানং প্রবিভজ্য বহুষু যাগেষু যুগপদঙ্গভাবং গচ্ছতি পরৈশ্চন দৃশ্যতে অন্তর্দ্ধানাদিশক্তি যোগাদিত্যুপপদ্যতে। ইতি শাঙ্করভাষ্যম্।

এইকথা স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ "সেই মৃত্তিকা বলিল" "সেই জল বলিল" এইরূপ বর্ণন বেদে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আদিত্যাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডলের দৃষ্ট অংশ ভৌতিক ও অচেতন তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য, কিন্তু ঐদৃশ্য অচেতনাংশে সকলের যাঁহারা অধিষ্ঠাতা বিদ্যমান আছেন, তাঁহারাই আদিত্যাদি দেবগণ নামে বেদের মন্ত্রেও অর্থবাদে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। আমাদের দেহের ভৌতিকাংশ যেরূপ জড় ও অচেতন কিন্তু তাহার অধিষ্ঠাতা আত্মা যেমন চেতন, সেইরূপ দৃশ্য জ্যোতির্ম্মণ্ডলাদি জড় ও অচেতন কিন্তু তাহার অধিষ্ঠাতা বা অভিমানী দেব চেতন আত্মস্থানীয়া। উত্তরমীমাংসার এই সিদ্ধান্ত যাস্কোক্ত চেতন, দেবতার কর্ম্মাত্মা ক্ষিতি জল ইত্যাদি এই চরম সিদ্ধান্তের অনুরূপ, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন যে দেবগণ আমাদের প্রত্যক্ষ নন বলিয়া যে কাহারও প্রত্যক্ষ নহেন একথা বলা চলেনা; কারণ ব্যাসাদি মুনিগণ দেবতাগণকে প্রত্যক্ষ করিতেন ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিতেন একথা মহাভারতাদি স্মৃতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রে আছে স্বাধ্যায় বা মন্ত্র জপ দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ হয়। স্মৃতিতে যোগ দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হয় এইরূপ বর্ণিত আছে, সুতরাং বলপূর্ব্বক যোগবল প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। শ্রুতিও যোগের মাহাত্ম্য এইরূপে কীর্ত্তন করিতেছেন।

পৃথ্যপ্ তেজোঽনিলখে সমুত্থে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং॥

পৃথিবী, জল, তেজ, অনিল ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বে ধারণায় সিদ্ধি জন্মিলে তাহা হইতে পাঁচপ্রকার যোগগুণ বা যোগসিদ্ধি প্রবৃত্ত হয়। ঐ সিদ্ধি দ্বারা যোগী নূতন একপ্রকার যোগজ তেজোময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ শরীর হেতু তাঁহার রোগ জরা ও মৃত্যু থাকেনা। আর এককথা, আমাদের শক্তির সহিত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দ্রষ্টা ঋষিগণের শক্তির তুলনা হইতে পারেনা। তাঁহারা অলৌকিক শক্তিবলে অতীন্দ্রিয় পদার্থনিচয় দর্শনে সমর্থ ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা যে দেবগণকে প্রত্যক্ষ করিতেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? অতএব ইতিহাস ও পুরাণে যে দেবগণের বিগ্রহাদি বর্ণিত আছে, তাহা অমূলক নহে—ঐসকল বর্ণন বেদমূলক। লোকপ্রসিদ্ধিও সম্ভব স্থলে অমূলক বলিয়া

প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্রেও তদাশ্রিত যুক্তিদ্বারা দেবতার বিগ্রহবত্তাদি সিদ্ধ হওয়ায় দেবতাগণের মুক্তিকামনা সম্ভব হেতু তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে ইহা সিদ্ধ হইল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পূর্ব্বমীমাংসামতে দেবতাপ্রসাদ যজ্ঞাদিকার্য্যে ফলপ্রাপ্তির কারণ নহে; ধর্ম্ম বা অপূর্ব্ব নিরপেক্ষভাবে যজ্ঞফলদানে সমর্থ। উত্তরমীমাংসামতে ঈশ্বরই সর্ব্ব-যজ্ঞাদি কার্য্যের ফলদাতা। উত্তরমীমাংসার তৃতীয় অধ্যায়ে "ফলমতউপপত্তেঃ" "শ্রুতত্বাচ্চ" "ধর্ম্মং জৈমিনিরতএব" "পূর্ব্বন্তুবাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ" এই চারিসূত্রে জৈমিনীর মতকে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া ঈশ্বরই ফলদাতা ইহাই সমাহিত হইয়াছে। এই কয়েকটী সূত্রের মর্ম্ম সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। ধর্ম্ম ফলপ্রদানে সমর্থ কি ঈশ্বর ফলদাতা এই সংশয়ের মীমাংসকমতে ধর্ম্মই ফলপ্রদ এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এইরূপভাবে বিচারিত হইয়াছে। অচেতনধর্ম্ম বা অপূর্ব্ব অন্যের দ্বারা অনধিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং ফলপ্রদ? কি অন্য চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া ফলপ্রদ? (প্রথমপক্ষে) অচেতনধর্ম্ম বা অপূর্ব্ব স্বয়ং ফলদাতা হইতে পারেনা। কারণ অচেতন বিভিন্নকার্য্যের তারতম্য জ্ঞানে অসমর্থ, সুতরাং যথোচিত ফলদানে সম্পূর্ণ অক্ষম। যদি বল ধর্ম্ম বা অপূর্ব্ব চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া ফলদানে সমর্থ, তাহা হইলে সেই অধিষ্ঠিত চেতনই ফলদাতা বলনা কেন? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তাহা হইলে ধর্ম্মের থাকা না থাকা দুইই সমান হইয়া যায়। ধর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অপরদিকে যদি এক চেতন ঈশ্বর ফলদাতা হন, তাহা হইলে তিনি কাহাকে সুখী, কাহাকে দুঃখী কাহাকে উত্তম ও কাহাকে অধম করেন বলিয়া পক্ষপাতী ও নির্দ্দয় হইয়া পড়েন। এই উভয় দোষ পরিহার জন্য বলিতে হয় ঈশ্বর ধর্ম্ম বা অপূর্ব্ব অনুসারে ফলের বিধান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ জীবগণ স্বকীয় কর্ম্মদ্বারা যে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম অর্জ্জন করিয়া থাকে, ঈশ্বর তদনুসারে ফলদান করিয়া থাকেন। যদি বল সৃষ্টির আদিতে জীবগণকে যখন ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, তখনত জীবের কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্ম ছিলনা; তখনত ঈশ্বর সকলকে সমান করিয়া সৃষ্টি করেন নাই; সুতরাং ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দোষ খণ্ডিত হইল না। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সৃষ্টির আদি নাই, সংসার অনাদি সুতরাং সৃষ্টির প্রবাহ বর্ত্তমান থাকা হেতু

জীবগণেরও প্রবাহ বর্ত্তমান আছে ও তাহাদের কর্ম্মেরও প্রবাহ বর্ত্তমান আছে অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর বিভিন্নভাবে ফলের বিধান হেতু পক্ষপাতিত্বাদি দোষ-দুষ্ট নহেন।

এক্ষেত্রে আর একটী বিচার্য্য বিষয় উপস্থিত হইতেছে যে পূর্ব্বে "তৃপ্তএবৈনমিন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তর্পয়তি" এই শ্রুতিবলে ইন্দ্রাদিদেবগণ যজমানগণের যজ্ঞাদিকার্য্যের ফলদান করিয়া থাকেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এখন আবার সিদ্ধান্ত হইল যে, পরমেশ্বরই সর্ব্বকর্ম্মের ফলদান করিয়া থাকেন। এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের বিরোধী। ইহার উত্তর এই যে, পরমেশ্বরই অন্তর্যামিরূপে ইন্দ্রদেবতায় অবস্থিত হইয়া ফলপ্রদান করিয়া থাকেন।* সেইজন্য ইন্দ্র দেবতা ফলপ্রদান করিয়া থাকেন এইরূপ কথিত থাকে। এক মহান্ আত্মাই ইন্দ্রাদি দেবতারূপে অবস্থিত হইয়া থাকেন, সুতরাং তিনিই সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা ইহাতে কোন বিরোধ নাই। পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসায় যজ্ঞাদিকর্ম্মের ফলদাতা সম্বন্ধে যে বিরোধ দৃষ্ট হয়, মাধবাচার্য্য নিম্নলিখিতরূপে তাহার পরিহার করিয়াছেন। তিনি বলেন কর্ম্মফলদান সম্বন্ধে জৈমিনি ও ব্যাসের মতের কোন বিরোধ নাই, বিবক্ষাহেতু উভয় মতের সমাধান হইতে পারে; দেবদত্তের পাককার্য্যে অগ্নির জ্বলন প্রাধান্য লক্ষ করিয়া যেমন কাষ্ঠদ্বারা পাক সম্পাদিত হইতেছে এইরূপ বলা যায়, সেইরূপ পরমেশ্বরের ফলপ্রদান কার্য্যে তারতম্য সম্পাদন নিমিত্ত ধর্ম্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বমীমাংসায় ধর্ম্ম ফলপ্রদ এইরূপ অর্পিত হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। অতএব এক জগদীশ্বরই সর্ব্বকার্য্যের ফলপ্রদ ও সর্ব্বত্র পূজনীয় দেব।†

শ্রীসাতকড়ি অধিকারী।

* অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামিতি শ্রুতেঃ।

† "নচ জৈমিনীয়বৈয়াসিকয়োর্মতয়োঃপরস্পরং বিরোধঃ বিবক্ষাবশেন তৎসমাধানাৎ। যথা দেবদত্তস্যৈব পক্তৃত্বে সম্যগভিজ্বলনং বিবক্ষিত্বা "কাষ্ঠানি পচন্তি" ইতি ব্যবহারঃ তথা পরমেশ্বরস্যৈব ফলপ্রদত্বেঽপি তারতম্যাপাদননিমিত্ততয়া প্রাধান্যং বিবক্ষিত্বা ধর্ম্মঃ ফলপ্রদ ইতি ব্যবহারঃ কিং ন স্যাৎ। তস্মাদবিরোধাৎ ফলপ্রদ জগদীশ্বর এক এব সর্ব্বত্র পূজনীয়-দেবঃ॥ ইতি পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্যঃ।

শুভদিনে।

—:•:—

(দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশোন্মুখ হিন্দুসন্তানের প্রতি)

আজি এই পুণ্যদিনে কিবা দিব উপদেশ ?
সবি জান হে ভ্রাতঃ ধীমান !
মনে হয় বুকে টানি বুলাইয়া শিরে পাণি
লভি শুধু ললাটের ঘ্রাণ।
সর্ব্বাঙ্গে পরশ দিয়ে দেই বর্ম্ম বিরচিয়ে
অশুভের হোক পরাজয়।
রক্ষা-কবচের ডোর দেই বেঁধে হাতে তোর
চিরসুখী, রও নিরাময়।
আনন্দেতে রুদ্ধ কণ্ঠ, কূলে কূলে ভরা হৃদি
বুদবক্ষে বুদ্বুদের সম
দুটী সোহাগের বাণী দুটী চির উপদেশ
শুন ভাই শুন প্রিয়তম !
আজি হতে এ সংসারে কর্ম্মের প্রাঙ্গণ' পরে
আরম্ভিলে অনন্ত সাধনা,
সংসার দেউলতলে কর্ম্ম দেবতার পায়ে
নিত্য নব পুণ্য আরাধনা।
সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু দেবতায় ঘেরি ঘেরি
আরতির অম্লান আলোক।
কল্যাণ কঙ্কণক্বণে নিয়ত মঙ্গলক্বণে
গৃহে নিত্য পূজা বাদ্য হোক।

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নদীবুকে অম্লান আনত মুখে
তরণীর হও কর্ণধার।

জীবন-সংগ্রাম-মাঝে কবচ-কুণ্ডল সাজে
রক্ষা করি রও ব্যূহদ্বার।

আপন আঁখির লাগি সঙ্কেতে নিমেষমাঝে
নমে যথা আঁখি পাতাদুটী।

বিপন্নে তেমনি দোঁহে সন্তান-স্নেহের মোহে
বুকে করি লয়ো যেন ছুটি।

হৃদি-তরুছায়া যেন অন্তরের অনুরাগে
নমি পড়ে তাপিতের গায়।

অসহায় বিহগের লাগিয়া দুর্দ্দিনে যেন
মুক্ত রহে প্রাণের কুলায়।

দেহের লাবণ্যে যেন প্রাণের লাবণ্যটুকু
দর্পণের মত চিরভায়

যৌবনের সার্থকতা বিতরিয়া কর্ম্মবল,
নহে ভোগ-দৈত্যের পূজায়।

নহে বিলাসের লাগি, ব্যথাশ্রু মুছিতে যেন
রহে চির অঞ্চল কোমল।

তোমার ডঙ্কার নাদে গৃহদ্বারে জুটে যেন
পূর্ণকাম ভিখারীর দল।

সম্পদে নবাম্বুনত সুদূর-বিলম্বী শ্যাম
নীরদের হয়ো অনুকারী।

বিপদে শৈলের সম অচল অটল রও
উর্দ্ধশীর্ষ লভি ঝঞ্ঝাবারি।

অলস আঁখির নেসা মোহময় ইন্দ্রধনু
আজিকার সোনালী স্বপন।
কর্ম্মক্ষেত্র-মাঝে যেন বিবেকের সূর্য্যালোকে
লভে পুণ্য পূর্ণ জাগরণ।
ভোগ কুসুমের রাঙ্গা দলগুলি ঝরি ঝরি
বাহিরায় যেন যোগফল।
দেহের উদ্বেল বন্যা বিদূরিলে যেন ভাই
হয় আত্মা পবিত্র শ্যামল।
ঘুমাইলে রণক্লান্ত হে বীর, শিবির-মাঝে
অসি চর্ম্মে করো উপাধান,
ফেলে দিয়ে ফুলধনু তুলে নিতে শরাসন
হয়ো নাক যেন ম্রিয়মাণ।
আজিকে লীলার লাগি লালসার রক্তপদ্ম
তুল, যদি নব অনুরাগি!
এ মোহ টুটিয়া গেলে শুভ্র শতদল তুলো
বিধাতার চরণের লাগি।
স্মরো' ভাই ক'টী কথা পবিত্র মন্ত্রের মত
সংসারের কল্পতরু-মূলে
গাহ খুলি মন প্রাণ বিভুর বন্দনা-গান
আনন্দের মন্দাকিনী-কূলে।

শ্রীকালিদাস রায়।

কবিকথা।

(কালিদাস)

মালবিকাগ্নিমিত্র।

(৫)

বিদর্ভের বর্ত্তমান রাজা যজ্ঞসেন অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীরসেন প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। মাধবসেনও মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছেন। বিদর্ভ হইতে বহুমূল্য রত্ন, বাহন, শিল্পকারিকা প্রভৃতি পরিজন উপহার লইয়া একজন দূত আসিয়াছে। মহিষী ধারিণী বীরসেনের প্রেরিত পত্র হইতে তাঁহার বিজয়বার্ত্তা শুনিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি আবার সেনাপতি পুষ্পমিত্রের যজ্ঞ-তুরঙ্গরক্ষণে নিযুক্ত কুমার বসুমিত্রের কল্যাণকামনায় ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণাদানের জন্য পুরোহিতের নিকট একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দেন। মালিনী মধুকরিকা তাহার নিকট হইতে মহিষীর সংবাদ অবগত হইয়া, তাঁহার দর্শনে অগ্রসর হয়। মধুকরিকা স্বর্ণাশোকের দোহদের পর তাহার চারিদিকে বেদী বাঁধাইয়া যত্ন লইতেছিল। স্বর্ণাশোক মুকুলিত হইলে মালবিকার প্রতি মহিষীর অনুকম্পা-সঞ্চার হইবে, মালিনীর হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস জন্মে। এক্ষণে সত্য সত্যই অশোকের কুসুমোদ্গম হওয়ায় মালবিকার প্রতি মহিষী প্রসন্ন হইবেন বলিয়া সে মনে করিতে লাগিল। সে যাহা হউক, মধুকরিকা অশোকের কুসুমবিকাশের কথা মহিষীকে জানাইয়া আসিল।

স্বর্ণাশোকের কুসুমোদ্গমে মহিষীর মনে অত্যন্ত আনন্দসঞ্চার হইল। তিনি মালবিকার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুরস্কার ছলে তাঁহাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করার ইচ্ছা করিলেন। রাণী মালবিকাকে বিবাহ-বেশে সজ্জিত করার জন্য পরিব্রাজিকাকে অনুরোধ করিলে, তিনি মালবিকাকে বেশ ভূষায় সাজাইয়া দিলেন। তাহার পর মহিষী অশোকতলেই মালবিকাকে অর্পণ করিতে অভিলাষিণী হইয়া মহারাজের সহিত অশোকের কুসুমশোভা দর্শন করিবেন বলিয়া প্রতিহারীর দ্বারা রাজাকে অনুরোধ করিয়া পাঠান, এবং নিজেও

মালবিকা প্রভৃতিকে লইয়া প্রমদবনের দিকে অগ্রসর হন। অগ্নিমিত্র সে সময়ে ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তজ্জন্য প্রতিহারীকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। রাজা আসন হইতে উত্থিত হইলে বৈতালিকেরা গাহিতে লাগিল, "রতি সনাথ অঙ্গবান অনঙ্গ যেমন বসন্তকে লইয়া বনবিহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও চতুরঙ্গ বলান্বিত হইয়া প্রীতি সৎকারে কোকিল-কূজিত বিদিশাতীরোদ্যানে মধুকাল যাপন করিতেছেন। আর আপনার বিজয় করিকুলের আলানস্বরূপ বরদাতীরজ বৃক্ষসকলের সঙ্গে অরি মস্তকও অবনত হইতেছে।" তাহারা আবার গাহিয়া উঠিল, "হে সুরোপম! দণ্ডদ্বারা তোমার বিদর্ভরাজলক্ষ্মীর অধিকার ও পরিঘ বাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী-হরণ, বীরপ্রীতিহেতু পণ্ডিতগণের রচিত এই উভয় চরিত্রগাথা বিদর্ভবাসিগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে।" রাজা তখন বয়স্যের সহিত অগ্রসর হইতে হইতে বলিতেছিলেন, "দুর্লভসমাগমা প্রিয়াকে চিন্তা করিয়া এবং বিদর্ভাধিপতির পরাজয় শুনিয়া ধারাভিহত আতপক্লান্ত সরোজের ন্যায় আমার মন দুঃখ ও সুখ উভয়ই অনুভব করিতেছে।" বিদূষক উত্তর দিলেন যে, তুমি নিশ্চয়ই সুখী হইবে, কারণ মহিষীর আদেশে পরিব্রাজিকা আজ মালবিকাকে বিবাহবেশে সাজাইয়াছেন, তাহাতে মনে হইতেছে, মহিষী তোমার অভিলাষ পূরণ করিবেন। রাজা মহিষীর পূর্ব্বাচরণ স্মরণ করিয়া তাহা অসম্ভব নহে বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রতিহারী রাণীর অভিলাষের কথা জানাইয়া কহিল যে, মহিষী মহারাজের সহিত স্বর্ণাশোকের কুসুমশোভা দেখিবার জন্য মালবিকা প্রভৃতি পরিজনের সহিত প্রমদবনে অপেক্ষা করিতেছেন। রাজা তখন হৃষ্টচিত্তে বিদূষক ও প্রতীহারীর সহিত সেইদিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রমদবনে প্রবেশ করিয়া বিদূষক কহিলেন যে, সখে! প্রমদবনে বসন্তের যৌবন যেন ফুরাইয়া আসিতেছে। রাজা উত্তর দিলেন, "তাহা সত্য বটে, সম্মুখস্থিত বিকীর্ণ-কুরুবককমল ও সহকারকে দেখিয়া বসন্তের গতপ্রায়যৌবন বুঝিয়া আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।" তাহার পর তাঁহারা স্বর্ণাশোকের নিকট অগ্রসর হইলে বিদূষক তাহার অপূর্ব্বশোভা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখ কুসুমস্তবকে ভূষিত অশোকটিকে দেখিয়া

বোধ হইতেছে, কে যেন ইহাকে সুবেশে সাজাইয়া দিয়াছে।" রাজা উত্তর দিলেন "এই অশোকতরুর কুসুমবিকাশে বিলম্ব হওয়াই উচিত হইয়াছে, কারণ এক্ষণে বৃক্ষটি অপূর্ব্বশোভাই ধারণ করিয়াছে। বসন্ত-বিভব-সূচিত সকল অশোক তরুরই কুসুমরাশি এই দোহদ-লব্ধ বৃক্ষটিকে যেন আশ্রয় করিয়াছে।" তাহার পর বিদূষক কহিলেন যে, মহিষী আজ মালবিকাকে নিকটে রাখিবেন বলিয়াই মনে হইতেছে। সেই সময়ে ধারিণী ও মালবিকাকে দেখিতে পাইয়া রাজা কহিলেন সখে, দেখ বিনয়নম্রা দেবী প্রিয়ার সহিত বসুমতীর ন্যায় বিস্তৃতকরকমলা রাজলক্ষ্মীসহ আমার অভ্যর্থনার জন্য অবস্থিতি করিতেছেন।

মহিষী মালবিকা প্রভৃতিকে লইয়া মহারাজের জন্য স্বর্ণাশোকের তলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। মালবিকার হৃদয় হর্ষ ও উদ্বেগে আন্দোলিত হইতেছিল। তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন যে, আমার এই কৌতুক বেশ বিন্যাসের কারণ জানিলেও আমার হৃদয় পদ্মপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছে, আমার বাম চক্ষুও স্পন্দিত হইতেছে। বিদূষক বিবাহবেশে সজ্জিত মালবিকার রমণীয় শোভার কথা রাজার নিকট প্রকাশ করিলে, রাজা বলিতে লাগিলেন, "সখে, আমিও তাহা লক্ষ্য করিতেছি, অনতিলম্বি-দুকূলনিবাসিনী অনেকাভরণযুতা প্রিয়াকে উদয়োন্মুখ জ্যোৎস্নান্বিতা ও হিমমুক্তনক্ষত্র-পরিশোভিতা চৈত্রবিভাবরীর ন্যায়ই বোধ হইতেছে।" সেই সময়ে মহিষী অগ্রসর হইয়া রাজার জয় উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদূষকও রাণীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়া উঠিলেন। পরিব্রাজিকাও রাজার জয় উচ্চারণ করিলে রাজাও তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তাহার পর মহিষী স্মিতবদনে রাজাকে কহিলেন, "আমরা এই তরুণীজনসহায় অশোককে আর্য্যপুত্রের সঙ্কেতগৃহ স্থির করিয়াছি।" রাজা উত্তর করিলেন, "যে অশোকটি বসন্তলক্ষ্মীর নিয়োগ অবজ্ঞা করিয়া পুষ্পোদ্গম দ্বারা তোমার যত্নের আদর করিয়াছে, সে যে তোমার এরূপ সৎকারের পাত্র হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? বিদূষকের মনে কিন্তু মালবিকার কথাই উদয় হইতেছিল, তিনি রাজাকে বলিয়া উঠিলেন, "সখে, বিশ্বস্ত মনে এই তরুণীর প্রতি নিরীক্ষণ কর," তখনও

পর্য্যন্ত মহিষী মালবিকাসমর্পণের কথা ব্যক্ত করেন নাই, সেইজন্য বিদূষক কাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন জানিবার ইচ্ছায় তাহাকে কহিলেন, "কোন্ তরুণীটীর কথা বলা হইতেছে." চতুর বিদূষকও উত্তর দিলেন যে, আমি স্বর্ণাশোকের কুসুম-শোভার কথাই বলিতেছি। আজ মালবিকাকে নিকটে থাকিয়াও ছাড়াছাড়ি দেখিয়া রাজা কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং তিনি মনে মনে বলিতে ছিলেন। "চক্রবাক-চক্রবাকীর ন্যায় আমার ও প্রিয়ার পক্ষে রজনী-সমা ধারিণী মিলনের বাধা জন্মাইতেছেন।" এই সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া জানাইলেন যে, মন্ত্রী বলিয়া পাঠাইয়াছেন, বিদর্ভ হইতে প্রেরিত শিল্পকারিকা দুইটী পথশ্রমে ক্লান্ত থাকায় মহারাজের সহিত সাক্ষাতের জন্য পাঠান হয় নাই, এক্ষণে তাহাদিগকে পাঠান যাইতে পারে, সুতরাং এই বিষয় মহারাজের কিরূপ অনুমতি হয়, তাহাই জানিতে চাহেন। রাজা তাহাদিগকে লইয়া আসিতে আদেশ দিলে, কঞ্চুকী তথা হইতে প্রস্থান করিয়া আবার তাহাদিগকে লইয়া আসিলেন।

শিল্পকারিকা দুইটী সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিল। রাজার নিকটে যাইতে তাহাদের হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠায়, তাহারা ভবিষ্যৎ সুখের আশা করিতেছিল। রাজা তাহাদিগকে সঙ্গীতনিপুণা জানিয়া মহিষীকে তাহাদের একটীকে সহচরী স্বরূপে লইতে বলিলেন। মহিষী মালবিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি ইহাদের মধ্যে কাহাকে লইতে চাহ। মহিষীর কথা শুনিয়া শিল্পকারিকা-দুইটী মালবিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে তাহাদের রাজকন্যা বলিয়া বুঝিতে পারিল। মালবিকা ও পরিব্রাজিকা তাহাদিগকে পূর্ব্বেই চিনিতে পারিয়াছিলেন। শিল্পকারিকা দুইটি মালবিকাকে তাহাদের রাজকন্যা বলিয়া ব্যক্ত করিলে সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। রাজা তাহাদিগকে মালবিকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা তাঁহাকে মাধবসেনের কনিষ্ঠা ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিল। শুনিয়া রাণী কহিলেন যে, তাহা হইলে আমি দেখিতেছি,—চন্দনকে পাদুকাকারে দূষিত করিয়াছি। রাজা মালবিকার এরূপ দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল যে, মাধবসেন যজ্ঞসেনকর্ত্তৃক বন্দীভূত হইলে অমাত্য সুমতি ইঁহাকে লইয়া আসেন, তাহার পর আমরা আর কিছু অবগত নাহি। তখন পরি-

ব্রাজিকা কৌশিকী সমস্ত ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এবং তিনি আপনাকে সুমতির ভগিনী বলিয়াও পরিচয় দিলেন। শিল্পকারিকারাও তাঁহাকে চিনিতে পারিল এবং তাহাদিগকেও সকলে তাহাদের আপ্তবর্গ বলিয়াও জানিতে পারিলেন। পরিব্রাজিকা বলিতে লাগিলেন যে, মাধবসেনের এরূপ অবস্থা ঘটিলে তাঁহার অমাত্য ও আমার অগ্রজ সুমতি আমার সহিত মালবিকাকে লইয়া মহারাজের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য বিদিশাভিমুখে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে আমরা এক বণিক্‌সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হই। কতকদূর আসিয়া এক অরণ্যমধ্যে বণিকেরা বিশ্রামলাভে প্রবৃত্ত হইলে, শিখিপুচ্ছধারী তূণীরবদ্ধ ধনুর্ধর একদল দস্যু বণিক্‌দিগকে আক্রমণ করিল। বণিক্‌সম্প্রদায় কিছুকাল তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। অগ্রজ কাতরা মালবিকাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধারের ইচ্ছায় নিজ প্রাণ দিয়া ভর্ত্তৃঋণ পরিশোধ করিলেন। আমিত্ত সে সময়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ি। সংজ্ঞালাভ করিয়া মালবিকাকে আর দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর ভ্রাতৃ-দেহের অগ্নি-সংস্কারের পর কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া বিদিশায় উপস্থিত হই। মালবিকাও বীরসেন-কর্ত্তৃক দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া দেবীর নিকট প্রেরিত হন।

এই অপূর্ব্ব আখ্যান শুনিয়া রাজা সুমতির দেহত্যাগের কথায় পরিব্রাজিকাকে বলিতে লাগিলেন যে, মরণশীল প্রাণী মাত্রেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, মহাত্মা সুমতি ভর্ত্তৃঋণ পরিশোধ করিয়াছেন এবং আপনার কাষায় বস্ত্র ধারণও যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। রাজা এক্ষণে কি করেন, মালবিকা মনে মনে তাহাই ভাবিতেছিলেন। রাজা আবার বলিতে লাগিলেন, “মালবিকারও অধঃপতনে পদে পদে অবমাননাই সার হইয়াছে। কারণ দেবীপদবাচ্যা রাজকুমারীকে ধৌতকৌশেয় বসনের স্থানীয় বস্ত্রে পরিণতির ন্যায় পরিচারিকা-বৃত্তি পর্য্যন্ত অবলম্বন করিতে হইয়াছে।” মহিষী তখন পরিব্রাজিকাকে কহিলেন যে, মালবিকার পরিচয় না দেওয়া আপনার পক্ষে ভাল হয় নাই। পরিব্রাজিকা উত্তর করিলেন যে, একটী বিশেষ কারণে এ কথা গোপন রাখা হইয়াছিল। মালবিকার পিতা জীবিত থাকিতে একজন সন্ন্যাসী আমার সমক্ষে ইহার সম্বন্ধে আদেশ করেন যে, ইনি এক

বৎসর পরিচারিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরে অনুরূপ পতিলাভ করিবেন। সেই জন্ম আপনার শুশ্রূষায় সেই সাধুবাক্য সফল হওয়ার কালপ্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তাহার পর রাজা বিদর্ভ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, বিদর্ভ রাজ্য বরদার উত্তর দক্ষিণ দুইভাগে বিভক্ত হইবে, এবং যজ্ঞসেন ও মাধবসেন উভয়েই সেই দুইটী পৃথক্ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। রাজা কঞ্চুকীর দ্বারা মন্ত্রিপরিষদের নিকট সে কথা বলিয়া পাঠাইলে, তাঁহারাও তাহাতেই অনুমোদন করিলেন, এবং মন্ত্রিপরিষদও পূর্ব্ব হইতেই তাহাই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কঞ্চুকী মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনের কথা নিবেদন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, দ্বিধা বিভক্ত রাজশ্রীকে বহন করিয়া এক্ষণে তাঁহারা দুইজনে রথযোজিত অশ্বদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের অভিভবে নির্ব্বিকার হইয়া আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে থাকুন। তাহার পর বিদর্ভের ব্যবস্থা বীরসেনকে লিখিয়া জানাইবার জন্ম রাজা কঞ্চুকীর দ্বারা মন্ত্রিপরিষদকে বলিয়া পাঠাইলেন।

কিছুক্ষণ পরে কঞ্চুকী রাজ-সকাশে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন যে, মহারাজের সেনাপতি পুষ্পমিত্র একখানি সোপহার পত্র পাঠাইয়াছেন, এই বলিয়া তিনি সেই সোপহার পত্রখানি রাজার হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা পরিজন দ্বারা পত্রখানি খুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন, "স্বস্তি যজ্ঞশালা হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বিদিশানগরীস্থ আয়ুষ্মান্ পুত্র অগ্নিমিত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক জানাইতেছেন সুবিদিত হউক, আমি রাজযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া রাজপুত্র-শত-পরিবৃত কুমার বসুমিত্রকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া বৎসর মধ্যে প্রত্যাগমনের নিয়মে যে অশ্বটীকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, সেই যজ্ঞীয় অশ্বটী সিন্ধুনদের দক্ষিণ-তীরে বিচরণের সময় অশ্বারোহী যবন-সৈন্ত কর্ত্তৃক ধৃত হয়, তাহার পর উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ধনুর্দ্ধর বসুমিত্র শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়া সেই লজ্জিত অশ্বটী ফিরাইয়া আনিয়াছেন। আমি এক্ষণে পৌত্র অংশুমান্‌কর্ত্তৃক প্রত্যাহৃত অশ্বে সগর যেমন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানেরই অভিলাষী হইয়াছি। সেইজন্য আপনি কাল-বিলম্ব না করিয়া অক্রোধ-চিত্তে বধূদিগের সহিত যজ্ঞ দর্শনে আগমন করিবেন।" পাঠ শেষ করিয়া রাজা

বলিলেন যে, অনুগৃহীত হইলাম। পরিব্রাজিকা বলিয়া উঠিলেন, "রাজদম্পতী এক্ষণে পুত্রের বিজয় বার্ত্তায় সুখী হইলেন। তাহার পর তিনি মহিষীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "স্বামীর জন্য আপনি প্রশংসনীয়া বীরপত্নীগণের অগ্রণী হইয়াছেন, আবার পুত্রের নিমিত্ত 'বীরপ্রসূ' এই আখ্যাও লাভ করিলেন।" মহিষী উত্তর দিলেন যে, আমার পুত্র পিতার অনুরূপ হওয়ার আমি যারপরনাই আনন্দলাভ করিয়াছি, রাজাও কঞ্চুকীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কেমন করিশিশু যূথপতি মাতঙ্গেরই অনুকরণ করিয়াছে ত?" কঞ্চুকী উত্তর করিলেন, "মহারাজ, কুমারের এইরূপ বীর্য্যপ্রকাশে আমাদের চিত্তে কিছুমাত্র বিস্ময় জন্মে নাই. কারণ ঔর্ব্ব হইতে বাড়বানলের উৎপত্তির ন্যায় মহারাজ হইতেই তাঁহার উদ্ভব হইয়াছে।" তাহার পর রাজা যজ্ঞসেনের শ্যালক প্রভৃতি বন্দীদিগের মুক্তিদানেরও আদেশ প্রদান করিলেন। মহিষী ইরাবতী প্রভৃতি অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে পুত্রের বিজয় সংবাদ প্রদানের জন্য প্রতিহারী জয়সেনাকে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। যাইবার সময় রাণী চুপি চুপি জয়সেনাকে বলিয়া দিলেন যে, আমার নাম করিয়া ইরাবতীকে বলিও যে, আমি অশোকদোহদের জন্য মালবিকার নিকট একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এক্ষণে আবার তাহাকে উচ্চবংশীয়া জানিয়া বলিতেছি. যেন আমি সত্যভ্রষ্ট না হই। প্রতিহারী মহিষীর আজ্ঞায় অন্তঃপুরে গমন করিয়া আবার কিছুপরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, কুমারের বিজয়সংবাদ শুনিয়া অন্তঃপুরবাসিনীরা আমাকে আভরণ পারিতোষিকে একটী সিন্দুকের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন। মহিষী কহিলেন যে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি, পুত্রের বিজয়লাভ আমার ও তাহাদের সাধারণ সৌভাগ্যই বলিতে হইবে। তাহার পর প্রতিহারী চুপি চুপি মহিষীকে বলিল যে, ইরাবতী আপনার প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

তাহার পর ধারিণী পরিব্রাজিকাকে বলিতে লাগিলেন, "সুমতি প্রথমে যে সংকল্প করিয়াছিলেন, সেই সংকল্প পূরণের জন্য আপনার অনুমতি লইয়া মালবিকাকে আজ আর্য্যপুত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।" পরিব্রাজিকা উত্তর দিলেন যে, আপনি এক্ষণে ইঁহার সম্বন্ধে

যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। মহিষী তখন মালবিকার হস্তধারণ করিয়া রাজাকে বলিলেন, "প্রিয়-সংবাদের অনুরূপ এই পারিতোষিকটী আর্য্য-পুত্র গ্রহণ করুন।" মহিষীর কথায় রাজা কিছু লজ্জিত হইয়া উঠিলেন। তিনি মালবিকাকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ না করায়, মহিষী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন যে, আর্য্যপুত্র কি আমায় অবজ্ঞা করিতেছেন? বিদূষক উত্তর দিলেন, "তাহা নহে, তবে লোক-ব্যবহার এইরূপই বটে, কারণ নূতন বরেরা লজ্জাতুরই হইয়া থাকে"। তাহার পর রাজা বিদূষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিদূষক বলিতে লাগিলেন যে, দেবীর প্রণয়-পাত্রী ও তাহাকর্ত্তৃক দেবী-নামে অভিহিতা মালবিকাকে মহারাজ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। মহিষী উত্তর দিলেন যে, এই রাজকন্যা কুলগৌরবেই দেবী-পদবাচ্যা, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। পরিব্রাজিকা কহিলেন তাহা যথার্থ নহে, কারণ, আকরসমুৎপন্ন শ্রেষ্ঠ-রত্নের কাঞ্চনের সহিতই সংযুক্ত হওয়া উচিত। মহিষী কথায় কথায় মালবিকার অবগুণ্ঠন বস্ত্র আনাইতে বিস্মৃত হওয়ায় প্রতিহারীকে তাহা আনিতে বলিলে প্রতিহারী লইয়া আসিল। তখন মহিষী মালবিকাকে অবগুণ্ঠনবতী করিয়া রাজাকে গ্রহণ করিতে বলিলেন, রাজাও 'আমরা চিরদিনই তোমার শাসনানুবর্ত্তী' বলিয়া মালবিকাকে গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে মহিষীর ইঙ্গিতে পরিজনেরা মালবিকার নিকট অগ্রসর হইয়া "রাজ্ঞীর জয় হউক" বলিয়া অভিবাদন করিল। মহিষী পরিব্রাজিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ইহা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে, কারণ ভর্ত্তৃবৎসলা সাধ্বী মহিলারা সপত্নীর সহিতই পতিসেবা করিয়া থাকেন, সমুদ্রগামিনী নদী অন্য সরিৎদিগকে সঙ্গে লইয়াই সাগরপ্রান্তে উপস্থিত হয়।" এই সময়ে নিপুণিকা উপস্থিত হইয়া রাজাকে জানাইল যে, ইরাবতী বলিয়া পাঠাইয়াছেন, মহারাজের অনুনয় উপেক্ষা করিয়া তিনি যে অপরাধিনী হইয়াছেন, পূর্ণমনোরথ মহারাজ এক্ষণে তাঁহার সে অপরাধ ক্ষমা করুন। মহিষী উত্তর দিলেন যে, মহারাজ অবশ্যই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। তাহার পর পরিব্রাজিকা মাধবসেনের নিকট গমন করিতে অভিলাষ করিলে মহিষী তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। রাজাও স্বীয় পত্রে মাধব-

কাশী বিশ্বেশ্বর মন্দির

Engraved & Printed by the Mohlia Press, Calcutta
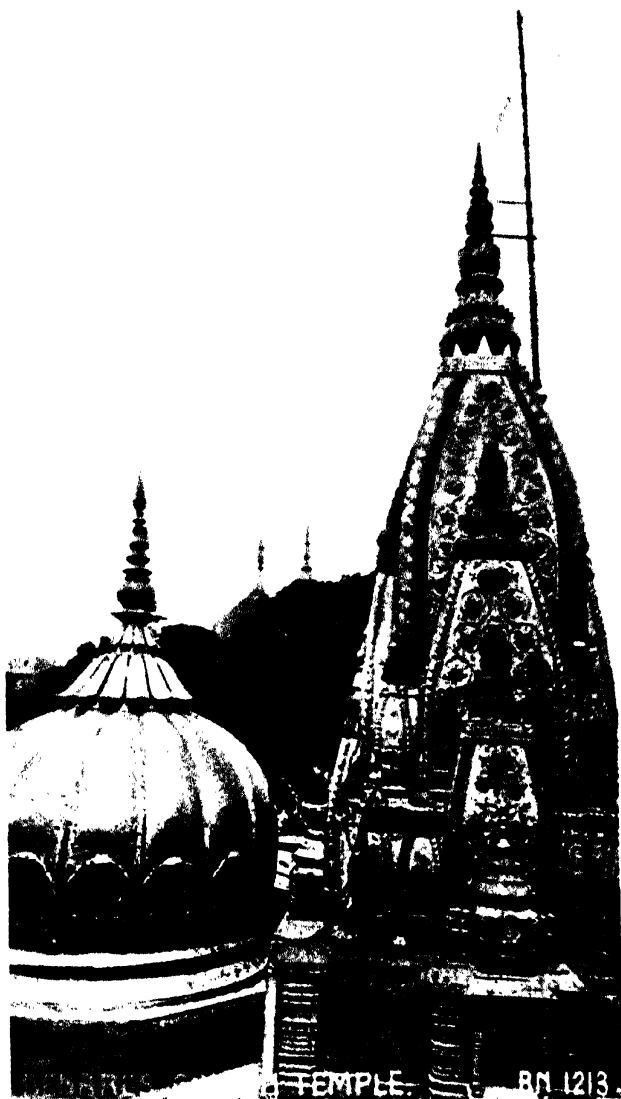
সেনকে পরিব্রাজিকার সম্ভাষণাদি জানাইলেন বলিলে, পরিব্রাজিকা অবশেষে তাঁহাদের স্নেহবন্ধনেই আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। মহিষী রাজাকে তাঁহার জন্য আর কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা উত্তর দিলেন "তুমি নিত্য প্রসন্ন হইয়া থাক, ইহাই হৃদয়ের একমাত্র অভিলাষ"। তাহার পর রাজা অগ্নিমিত্র প্রজাপালনে রত থাকিয়া যথারীতি রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

বিদেশিনী।

বড়দিনের ছুটীর পূর্ব্ব হইতেই ক্ষিতীশচন্দ্র আরম্ভ করিল, এবারে নূতন কোথাও বেড়াতে যেতে হবে। আমরা উভয়েই এক আফিসে কাজ করি, বাড়ীও এক পাড়ায়—বাল্যকাল হইতেই উভয়ের প্রণয়। আমা অপেক্ষা ক্ষিতীশচন্দ্র ৪।৫ বৎসরের ছোট, তাহার পিতামাতা উভয়েই বর্ত্তমান। বিবাহ অল্পদিন হইল হইয়াছে।

ক্ষিতীশের শ্বশুর ধনীব্যক্তি। একটি কন্যা ভিন্ন তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান নাই। ক্ষিতীশচন্দ্র শ্বশুরবাড়ী না যাইয়া অন্যত্র বেড়াইতে যাইবার কল্পনা করিতেছে কেন? আমি বলিলাম "হ্যাহে, ছুটীতে শ্বশুরবাড়ী যাবে না?" ক্ষিতীশ দৃঢ়ভাবে বলিল, "না" আমি এ নার অর্থ কিছুই বুঝিলাম না।

যাহা হউক, বড়দিনের ছুটী আসিল, সত্যসত্যই একদিন ক্ষিতীশচন্দ্র জিনিষপত্র গুছাইয়া মুটের মাথায় ট্রাঙ্ক দিয়া একেবারে আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। সবিস্ময়ে আমি বলিলাম, "ব্যাপার কি?" ক্ষিতীশ বলিল, "ভাই তৈয়ারী হও—চল ওয়ালটেয়ার বেড়াইয়া আসি।"

আমি অবিবাহিত। পিতার বহুকাল কাল হইয়াছিল, গর্ভধারিণী ছিলেন—তিনিও একদিন কলিকাতায় প্রথম প্লেগের পদার্পণে অভাগা সন্তানকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিয়া গঙ্গালাভ করিলেন। আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইলাম। কেরাণী-

গিরিতে ৮০৲ টাকা মাহিনা ও এলাউয়েন্স হিসাবে মাসে ৩০।৩৫৲ টাকা পাইতাম। বাড়ীতে একটা চাকর ও একজন বামুন ঠাক্‌রুণ ছিলেন। ব্রাহ্মণী অনেকদিন আমাদের বাড়ীতে আছেন, কাজেই তাঁহার কৃপায় সময়ে বাড়া ভাতের অভাব হইত না। আমি ক্ষিতীশকে বলিলাম, "বেশ বস, তামাক খাও, তাই যাওয়া যাবে। ট্রেণ কটায়?" ক্ষিতীশ বলিল, "রাত্রি সাড়ে আটটায়। মেলে যাওয়া যাবে। পরদিন ৪টার সময় ওয়ালটেয়ারে পৌঁছিব।" বামুনদিদির উপর সংসারের ভার দিয়া দুই বন্ধুতে হাওড়ায় রওনা হইলাম।

হাওড়ার নূতন প্লাটফরমে টিকিট লইবার গোলযোগ নাই। আমরা টিকিট করিয়া মাদ্রাজ মেলে গিয়া উঠিয়া বসিলাম। গল্পগুজব করিয়া খানিকটা সময় বেশ কাটান গেল। তবে গাড়ীতে বড় ভিড়, শেষরাত্রি পর্যান্ত শুইবার সুযোগ ঘটিল না। ভোরবেলা ভিড় কমিলে একটু শুইবার সুবিধা করা গেল।

প্রাতঃকালে আবার উঠিয়া বসিলাম। দুইদিকে শ্যামলক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে বড় বড় পাহাড় যেন আকাশের গায়ে মেঘের মত মিশিয়া রহিয়াছে। রম্ভা ষ্টেসনের পর হইতে চিল্কাহ্রদ বেশ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অনন্ত জলরাশি, তাহার মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, আশে পাশে জল, স্বল্পতরঙ্গায়িত সুনীল জলরাশির স্নিগ্ধদৃশ্য প্রভাতে বড়ই মধুর লাগিতেছিল।

চিল্কাহ্রদের ধার দিয়া দিয়া আমাদের ট্রেণ চলিতে লাগিল। আমরা বেশ একটা আমোদ অনুভব করিতে লাগিলাম। পথের মধ্যে একদিকে উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী, অন্যপার্শ্বে উন্মুক্ত চিল্কাহ্রদ একদিকে যতদূর চাওয়া যায়; কেবল জলরাশি, একদিকে পর্ব্বত আবরণে দৃষ্টি আবদ্ধ। খানিকটা চিল্কাহ্রদের মধ্য দিয়া ট্রেণ চলিতে লাগিল। দুই দিকেই জল।

এইখান হইতে ভাষারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা গেল, ভদ্রক হইতে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত উড়িয়াভাষা প্রচলিত। ষ্টেসনে গাড়ী থামিলেই দেয়াশলাই চুরুট প্রভৃতি লইয়া ফেরিওয়ালারা হাঁকিতে লাগিল,—আগিপেটি, সিগারেটপেটি, গিলুজিরাটা কদলী পেয়ারা, কমলালেবু প্রভৃতি ডালায় সাজাইয়া হাঁকিতে লাগিল, আণ্ডিকায়লু, জম্পালু, কমলা আণ্ডাবড়বড়ম্; দধি দুগ্ধ লইয়া হাঁকিতে লাগিল, মাজ্জিপালু, মাজ্জিপেরগু; একজন শালপাতা মোড়া অবাক্ জলপানের ঠোঙ্গার মত লইয়া হাঁকিতেছিল, পকোড়ি! পকোড়ি! আকার-

হঠাৎ ক্ষিতীশ বলিল, ভাই ইহাকে চিনিতে পার? মুহূর্ত্তমধ্যে সে তাহার স্ত্রীর মুখের আবরণ খুলিয়া ফেলিল; আমি বিস্মিত নেত্রে দেখিলাম, যেন সেই বিদেশিনী, সেই সুকুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ, সেই অমল-ধবল জ্যোৎস্নানিভ মসৃণ কপোল, সেই রক্ত-ওষ্ঠ, সেই সুবঙ্কিম কৃষ্ণ চক্ষু, সেই শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি, সেই বয়স—সেই সব; আমি নির্ব্বাক হইয়া বিস্মিত-নেত্রে এই বালিকার সহিত সেই বিদেশিনীর অপূর্ব্ব সাদৃশ্য দেখিতেছিলাম। পশ্চাতে সমুদ্রতরঙ্গ গম্ভীর গর্জ্জনে কূলে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আমার পদতল ধৌত করিয়া দিয়া যাইতেছিল। আমার বাহ্যজ্ঞান কিছুই ছিল না। বিদেশিনীর মৃত্যুর এই সুদীর্ঘ ১৬ বৎসর যেন কোন কুহকবলে আমার অন্তর হইতে অপসৃত হইয়া গেল।

আজ ক্ষিতীশের বিবাহের অর্থ বুঝিলাম—জন্মান্তরের আকর্ষণ অবিচ্ছিন্ন, আত্মা অবিনশ্বর। ওয়ালটেয়ার তাহার স্ত্রীর পরিচিত কেন, তাহাও বুঝিলাম। আজ মনে পড়িল, প্রথম ওয়ালটেয়ার হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় একটী পুরাতন সমাধি ক্ষেত্রের প্রবেশদ্বারে উপরে লেখা দেখিয়াছিলাম **"Mors Januavitae"** মৃত্যুই জীবনের প্রবেশ দ্বার। যুগে যুগে জীব ভাবানুযায়ী জন্ম গ্রহণ করিতেছে, করিবে। বাসনার ক্ষয় নাই, আত্মারও বিনাশ নাই। যুগে যুগে জীব আকাঙ্ক্ষিত আত্মার সহিত মিলিত হইতেছে; এও বুঝি সেই মিলন। ইহার উৎপত্তি কোথায়, কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে, এই নববধূ দেহান্তরে আজ ক্ষিতীশের পত্নীরূপে সেই মিলনাকাঙ্ক্ষিতা বিদেশিনী কি না?

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

দিল্লী।

(প্রাচীন ইতিহাস—হিন্দু রাজত্বকাল)

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মাসন ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে হস্তিনাপুরে অন্তরিত হইলেও প্রবাদ-মুখে বহুদিনই তথায় পাণ্ডুবংশীয়গণের রাজত্বের কথা শ্রুত হওয়া যায়। এমন কি, দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ তোমর তুয়ার রাজগণও পাণ্ডুবংশীয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। হস্তিনাপুর গঙ্গাগর্ভস্থ হইলেও তাহারও স্থান নির্দ্দেশ চলিয়া আসিতেছে। (১) ক্ষেমক রাজা হইতে কুরুবংশের অবসান ঘটিলে তাঁহাদের কোন শাখা ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতিতে রাজত্ব করিয়া ছিলেন কি না, তাহা পুরাণ বা ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় না। রাজাবলী গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, যুধিষ্ঠির হইতে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত হিন্দুরাজগণ দিল্লীতেই রাজত্ব করিয়া ছিলেন। (২)

---

(1) "The city of Hastinapur was built by Hasti, a name celebrated in the Lunar dynasties. The name of this city is still preserved on the Ganges, about forty miles south of Haridwor."

Tods Rajasthan vol. I

(2) "এই কলির আরম্ভ অবধি ৪২৬৭ চারি হাজার দুইশত সাত-ষটি বৎসর পর্য্যন্ত ১১৯ একশত উনিশ জন নানাজাতীয় হিন্দু দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট হন। ইহার বিবরণ রাজা যুধিষ্ঠির অবধি ক্ষেমক পর্য্যন্ত ২৮ আটাইশ জন ক্ষত্রিয় জাতি পুরুষেতে ১৮১২ আটার শত বারবৎসর। এই পর্য্যন্ত কলিতে বাস্তব ক্ষত্রিয় জাতির বিরাম হইল। তাহার পর মহানন্দি নামে ক্ষত্রিয়ের ঔরসেতে শূদ্রা গর্ভজাত নন্দের বংশজ, বিশা-রদ (বিসর্জ্জ) অবধি বোধমল্ল পর্য্যন্ত ১৪ চোদ্দ জনেতে ৫০০ বৎসর। এই নন্দ অবধি রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয়। তাহার পর গৌতম বংশ-জাত বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্য্যন্ত নাস্তিক মতাবলম্বী ১৫ পনের জনেতে ৪০০ চারিশত বৎসর। এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিকধর্ম্ম উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছিল। তাহার পর ময়ূরবংশীয় ধুরন্ধর অবধি

৯ টার সময়েই এই বিদেশিনী রমণীরও ঘাতকের ছুরিকাতে মৃত্যু হইয়াছিল। ক্ষিতীশের সংস্রবযুক্তা দুইটী রমণীর ঠিক একই সময় মৃত্যু,—আমার একটা ভবিতব্যের প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইল।

আমরা সেইদিনই দেশে রওনা হইলাম। দুই বন্ধুতে বাড়িতে বসিয়া আছি; দুইজনেই নীরব, কথা কহিবার প্রবৃত্তিও নাই; হৃদয়ে একটা গুরুতর ভার, বিদেশিনীর সেই শান্ত চক্ষু দুইটী চোখের উপর দেখিতেছিলাম; দুই জনে দুই দেশের, জীবনে আর কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই, এই তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ। কি একটা অতীতের আবরণ ছিন্ন করিয়া দুইজনে দুইজনের নিকট পরিচিত হইবার আকুল চেষ্টা করিতেছিল, দুইজনের মনের ভাব দুইজনকে ভাষায় বুঝাইবার শক্তি ছিল না, কিন্তু নীরব ভাষায় একের হৃদয়ের ভাব অন্যের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতেছিল, প্রতিধ্বনির মত একের হৃদয়ের ধ্বনি অন্যহৃদয়ে বুঝি আঘাত লাগিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল, সেই চোকে চোকে কথা বুঝি দুইজনের অতীত স্মৃতি দুইজনকেই স্মরণ করিয়া দিতেছিল সে নীরব দৃষ্টি মুখরা-বাণীকে পরাজিত করিয়া আপনার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতেছিল, হয় ত জন্মজন্মান্তরের প্রেম, মৃত্যু পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল, ক্ষুধিত আত্মা নিয়ত লালায়িত হইয়া আকুলচিত্তে প্রিয় মিলনের অপেক্ষায় সুদূর দেশে অপেক্ষা করিতেছিল; আকুল আহ্বানে তাহার প্রিয়কে তাহার নিকট টানিয়া আনিয়াছিল; কিন্তু এজনমে মৃত্যুই তাহাদের মিলনের ব্যবধান হইয়া রহিল; তাই বুঝি এই মৃত্যু। এমন সময় দেখিলাম, একটী পুরাতন সমাধি প্রাঙ্গণের দ্বারে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে :—

MORS JANUAVITAE.

"মৃত্যুই জীবনের প্রবেশ দ্বার"

আমরা দেশে ফিরিলাম। ক্ষিতীশ আর বিবাহ করিল না। তাহাকে আর কোন আনন্দে উৎসবে যোগ দিতে দেখিলাম না; সর্ব্বদাই গম্ভীর হইয়া থাকিত। এই বিদেশিনীর মৃত্যুর পর হইতেই তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গেল।

পনর বৎসর হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ একদিন শুনিলাম, ক্ষিতীশ কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়া সেইখানে একটী পাত্রী দেখিয়া নিজে উপযাচক হইয়া বিবাহ

করিয়াছে। সংবাদ শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

ইদানীং ক্ষিতীশের সঙ্গে বড় আমার দেখা হইত না। একদিন বাসায় গিয়া তাহাকে ধরিলাম, দেখিলাম সে ক্ষিতীশ আর নাই, আবার যেন সে সেই পূর্ব্বের ক্ষিতীশ হইয়াছে। সে ম্রিয়মাণ ভাব নাই, সে পূর্ব্বের মত সর্ব্বদাই প্রফুল্ল,—আমায় দেখিয়া আনন্দ হইল। কিন্তু হঠাৎ বিদেশিনীর কথা মনে পড়িয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল।

ক্ষিতীশের সহিত তাহার বিবাহের কথা হইল। সে একটু মৃদু হাসিল মাত্র, বিশেষ কিছু বলিল না। কিন্তু ভাবে বোধ হইল, একটা নিহিত গূঢ় রহস্য কিছু আছে। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার কিছুদিন পর ক্ষিতীশ আমাকে আর একবার ওয়ালটেয়ারে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। যে ওয়ালটেয়ারে সেই ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, আমার আবার সেখানে যাইবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ক্ষিতীশের অনুরোধে যাইতে হইল।

ক্ষিতীশ, ক্ষিতীশের স্ত্রী ও আমি একদিন শুভদিনে ওয়ালটেয়ার রওনা হইলাম। ওয়ালটেয়ার তেমনই আছে, তেমনই শুভ্র জ্যোৎস্না, তেমনই রজতোৎফুল্ল সমুদ্রতরঙ্গ, সবই তেমনই আছে, কিন্তু আমার মনের ভাব আর তেমন নাই। ক্ষিতীশের নিকট শুনিলাম, ওয়াল টেয়ার দেখিয়া তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিয়াছে, ইহা যেন তাহার পূর্ব্ব পরিচিত স্থান। সে যেন বহুবার ইহা দেখিয়াছে,—এস্থলে সবই যেন তাহার পরিচিত ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ক্ষিতীশের স্ত্রী ইতিপূর্ব্বে কখন ওয়ালটেয়ারে আসে নাই, এই সে স্বামীর সঙ্গে প্রথম আসিয়াছে। ক্ষিতীশের সহিত এ বিষয় আলোচনা করিলাম, ক্ষিতীশ একটু মৃদু হাসিল মাত্র ; ভাবে বোধ হইল, সে যেন ইহার একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে, কিন্তু আমাকে খুলিয়া কিছুই বলিল না।

সেদিন পূর্ণিমা, ভরা জ্যোৎস্নায় সমুদ্রের ঢেউ নাচিয়া নাচিয়া দুলিয়া দুলিয়া কূলে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ; জ্যোৎস্নায় শ্বেতফেনরাশি ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে ; তীরের বালুকাকণারাশি জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ শীতলবায়ু। ক্ষিতীশ সস্ত্রীক সমুদ্রের জ্যোৎস্নায় শোভা দেখিতে আসিয়াছে, আমিও সঙ্গে আছি ;

ইঙ্গিতে বুঝিতে পারা গেল, ইহা খাইবার জিনিষ, আমরা এক পয়সার কিনিলাম। জিনিষটা পেঁয়াজ ফুলুরির মত, মুখে দিয়া দেখি কি ভয়ঙ্কর ঝাল! তার বারোআনা ভাগ কাঁচা লঙ্কা; এতদ্দেশে লঙ্কার প্রচলন অত্যন্ত অধিক। প্রায় ৩৷৹টায় ৪টার সময় আমরা ওয়ালটেয়ারে আসিয়া পৌঁছিলাম। টিকিট দিয়া বাহির হইব, একটা চাপরাসি কিছুতেই বাহির হইতে দিবে না। সে আমাদের কথা বোঝেনা আমরাও তাহার কথা বুঝিনা, এমন সময় একজন খুব মোটা কৃষ্ণকায় ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিধানের বস্ত্র সম্মুখে খানিকটা কোঁচার মত ঝোলান, পিছনে কতকটা কোঁচার মত ঝোলাইয়া দেওয়া। গায়ে কোট, মাথায় পাগড়ী, হাতে একটী পাঞ্চ—সে ষ্টেসনের টিকিট কলেক্টর বুঝিতে পারিলাম। সে আমাদিগকে ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিল, কলিকাতা হইতে কেহ আসিলে তাহাকে এখানে প্লেগডাক্তারের নিকট সার্টিফিকেট লইয়া ষ্টেসনের বাহিরে যাইতে হইবে।

ষ্টেসনের বাহিরে প্লেগডাক্তারের আড্ডা। তিনিও একজন মাদ্রাজী। পিতা মাতার নাম লিখিয়া দিয়া আধঘণ্টা পর তাঁহার নিকট হইতে মুক্তি পাইলাম। একখানি কাগজ দিলেন,প্রত্যহ সেইখানি হস্তে তাঁহার নিকট উপর্য্যুপরি ৭দিন হাজিরা দিতে হইবে। এই মাদ্রাজী প্লেগারির হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিবার জন্য আসিলাম। কাঠের ছত্রী দেওয়া স্প্রিং বিশিষ্ট দুই চাকার একরূপ গাড়ী এখানে আছে. তাহার নাম বাণ্ডি। গাড়ীগুলি একটী গরু কিম্বা একটী ঘোড়াতে টানে। গাড়ীর ভিতরে দুই দিকে বসিবার গদী আছে। আমরা একখানি গাড়ী ভাড়া লইয়া টার্ণার ছত্রাভিমুখে রওনা হইলাম।

ওয়ালটেয়ার স্থানটী একটী পাহাড়ের উপর, তিনদিকে পর্ব্বতশ্রেণী, একদিকে সমুদ্র। রাস্তাগুলি স্থানের অনুপাতে নিম্নউচ্চ হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর।

গাড়োয়ানকে লইয়া বড় বিপদ হইল। সে আমাদের ভাষা বোঝেনা। যাহা হউক, অনেককষ্টে ছত্রে আসিয়া পৌঁছিলাম। ছত্রটী ভিজাগাপটমের মার্কেটের নিকট। তিনদিন পর্য্যন্ত যাত্রীরা সেখানে থাকিতে পায়। রসিদ দিয়া বেড়ী,হাতা, কড়াই প্রভৃতি ছত্রের ম্যানেজারের নিকট লইতে পারে, যাইবার সময় আবার

সেইগুলি বুঝাইয়া দিতে হয়। ছত্রের সম্মুখেই কল আছে, আমরা হাতমুখ ধুইয়া শান্ত হইলাম।

ক্ষিতীশ পায়খানা হইতে আসিয়া বলিল, "ভাই এছত্রে আর মুহূর্ত্ত থাকিয়া দরকার নাই,যেখানে হয় একটা বাসা কর"। আমি বলিলাম "ব্যাপার কি?" ক্ষিতীশ বলিল, "তুমি একবার পায়খানায় যাওনা, বুঝিতে পারিবে।" জল লইয়া পায়খানায় গেলাম। অদ্ভুত বটে, খানিকটা জায়গা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, লম্বা উনানের মত সারি সারি প্রস্তর বিছান আছে। বাহ্যে করিতে বসিয়াছি—সর্ব্বনাশ! একবেটা মাদ্রাজী আসিয়া আমার সম্মুখে বাহ্যে করিতে বসিল; কোন লজ্জা নাই, কোন দ্বিধা নাই। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। বাস্তবিকই এ ভয়ানক অসুবিধা, ক্ষিতীশ আমাকে দেখিয়াই হাসিয়া উঠিল "কেমন হে আর ছত্রে থাক্‌বে"! আমি বলিলাম "না ভাই, আজ রাতটা কোনরকমে কাটাও, কল্য যেখানে হয়, একটা বাসা স্থির করিব।"

বাজার করিতে বাহির হইলাম, একটা মাড়োয়ারীর বড় দোকান আছে, ডালচাল সবই পাওয়া গেল, তরকারীর মধ্যে আলু পাইলাম। সেই দূরদেশে আলু বাজালী দম্পালু নামে পরিচিত হইয়াছে। শুনিলাম প্রাতে বাজারে সবই পাওয়া যায়।

পরদিন বাসা খুঁজিতে বাহির হইলাম। ভিজাগাপটম্ ছোট খাট সহর, খুঁজিলে সবই পাওয়া যায়। সমুদ্রধারে ফ্রেমজির হোটেল, টাউনহল, লাইট্‌হাউস, হাঁসপাতাল প্রভৃতি সবই আছে। এখানকার অধিকাংশই বাংলা, খোলা দিয়ে ছাওয়া দেখিতে খুব সুন্দর। এখানকার সাধারণ ভদ্রলোক অল্প বিস্তর ইংরাজী বলিতে পারে। একজন ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, আপনারা ওয়ালটেয়ারে থাকুন, সেস্থান ফাঁকা ও উচ্চ এবং এস্থান অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যকর। ক্ষিতীশের ইচ্ছা, সে দিন কতক এখানে থাকে, আমারও অমত ছিলনা। একখানি বাড়ি ভাড়া করিয়া আমরা ভিজাগাপটম হইতে ওয়ালটেয়ার রওনা হইলাম।

দুইদিকে পাহাড়, মধ্যে রাস্তা। দুই পার্শ্বে পাহাড়ের সমতল ভূমিতে অনেক গুলি সুন্দর সুন্দর বাংলা, দু' একখানি বাংলার নামও সুন্দর। অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরে একখানি অতি সুন্দর বাংলো আছে; শুনিলাম তাহার নাম "ঈগল-

নেই"। রাস্তাটীও সুন্দর, সুপরিচ্ছন্ন। রাস্তায় কোন কোন স্থান হইতে সমুদ্র দেখা যায়। সুনীল জলরাশি মেঘের মত পড়িয়া আছে। অনন্ত অসীম-তরঙ্গ-উৎক্ষিপ্ত ধবল ফেণরাশি তবকে তবকে উঠিতেছে; পড়িতেছে সেমহান্ দৃশ্য দেখিলে চোক্ ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। প্রায় ৩ মাইল পর ক্লাবহাউস পার হইয়া আমরা ওয়ালটেয়ার পোষ্টাফিস্ দেখিতে পাইলাম। ওয়ালটেয়ারে বাড়ী পাওয়া দুর্ঘট; যাহা দুই চারিখানি আছে, তাহার ভাড়া অত্যন্ত বেশী। সাধারণ খোলার ঘরের অভাব নাই। পোষ্টাফিসের আশে-পাশে ছোটখাট কতকগুলি খোলার বাড়ী আছে, একটা ক্ষুদ্রবস্তির মত। আমরা ইহারই নিকটে ৫৲ টাকা দিয়া একখানি ঘর ভাড়া লইলাম। ঘরের পাশে রান্নাঘর একসঙ্গে লাগা, তাহার উপর বাড়ীর উঠান, তাহার ভিতর আরো ৩।৪ খানি ঘর আছে, তাহাতে অন্যান্য ভাড়াটীয়া ও বাড়ীওয়ালা থাকে।

এখানে স্ত্রীলোকের কোন সঙ্কোচ নাই। ওয়ালটেয়ার পোষ্টাফিসের পাশে একপ্রকাণ্ড চতুষ্কোণ ইঁদারা, ইহাই এই স্থানের প্রসিদ্ধ ইঁদারা; প্রায় ওয়ালটেয়ারের সমস্ত পল্লীবাসী ইহারই জল পান করে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, প্রাতঃকাল হইতে অনবরত ইঁদারার জল তোলে, তাদের একরূপ ঠোঙাতে জল তোলা হয়। তাহার নাম বেকা। এখানে তালগাছ প্রচুর। তালপত্রের ব্যবহারও অত্যন্ত, পত্রবিহীন তালগাছ দেখিলেই তাহা অতি সহজেই অনুমিত হয়। গরীব গৃহস্থেরা তালপত্র দ্বারা গৃহ আচ্ছাদন করে, তাড়ি ও তিসির মদ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয়।

আমরা দুইখানি চৌকি আট আনা হিসাবে মাসিক ভাড়া করিলাম। দুইখানি চেয়ারও ছয় আনা হিসাবে ভাড়া লওয়া হইল। একজন স্ত্রীলোক জল দেয় ও বাসন মাজে, তাহার সহিত মাসে দুইটাকা বন্দোবস্ত করিলাম।

এখানকার চালচলন অনেকটা ইংরেজী ধরনের, ভদ্রলোকের অভ্যর্থনা অনেকটা ইংরেজী কায়দায়। সকলেই চা কিম্বা কাফি ব্যবহার করে। এখানকার সাধারণ গৃহস্থেরা দুই চারিখানি চেয়ার রাখে এবং কোটপ্যান্ট্‌লেন ব্যবহার করে। অনেকে আবার এই পরিচ্ছদের সহিত পাদুকা ও টুপি ব্যবহার করে না। এখানে অনেক দেশী খৃষ্টান দেখা যায়, অনেকগুলি চার্চ্চ আছে; কতকগুলি বালিকাবিদ্যালয় আছে। আমাদের বাসার নিকটেই ৩।৪টী স্কুল। অনেক স্কুলে

বালক ও বালিকা একসঙ্গে পড়ে। স্কুলগুলি আমাদের দেশের পাঠশালার মত। একটা বড় ঘরের মেজেতে বালি বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ছেলেরা সেই বালির উপর বসিয়া লেখা পড়া করে। ছোট খাট উৎসবেই বালকদের কদলী ও পকৌড়ি উপহার দেওয়া হয়। বালকেরা সেই সময় সারি দিয়া দাঁড়াইয়া রাজার মঙ্গলকামনাসূচক একখানি গান করে এবং অপেক্ষাকৃত একটী বয়স্কবালক ড্রিলের সঙ্গীত আবৃত্তি করে। বালকেরা সেই সঙ্গীত সমস্ত আবৃত্তি করিয়া দর্শককে ড্রিল দেখায়। এই সময় একজনকে সভাপতি করা হয়, তিনি বালকদিগকে কদলী প্রভৃতি বিলি করেন।

এখানে একটা জেলে পাড়া আছে। সমুদ্রের ধারে খানিকটা জায়গায় অসংখ্য জেলে বাস করে, ইহাদের সন্তানবাহুল্য দেখিলে রাবণের "একলক্ষ পুত্র মোর, সওয়া লক্ষ নাতি," একেবারে কবিকল্পনা বলিয়া মনে হয় না। ইহারা অধিকাংশই সিংহলী। ইহাদের ছোট ছোট বালকেরা সমুদ্রের ভীষণতরঙ্গে যাইতে ইতস্ততঃ করে না। ইহারা কাউনের মত একরূপ কৃষ্ণবর্ণ শস্য অন্নের পরিবর্ত্তে লবণ সাশ্রয়ের জন্য সমুদ্রজলে সিদ্ধ করিয়া সাধারণতঃ আহার করে।

দিন যাইতেছিল মন্দ নয়, রান্নাবান্না করিতেই অনেক সময় কাটিয়া যাইত; তাহার পর দুই বন্ধুতে সকালে সন্ধ্যায় বেড়াইতাম। ওয়ালটেয়ারে একটা ছোট বাজার আছে, মোটামুটী তরীতরকারি ও মাছ সেখানে পাওয়া যায়; আলু, চাল, ডাল, ঘৃত প্রভৃতি ভিজাগাপটম হইতে আনিতে হয়; ঘিয়ের দাম খুব সস্তা এবং উৎকৃষ্ট, চাউল কিছু মহার্ঘ্য।

একদিন প্রাতঃকালে আমরা দুইজনে বারান্দায় বসিয়া আছি, জল লইয়া স্ত্রীলোকেরা পথ দিয়া যাইতেছে; কাহারও কাছা দিয়া কাপড় পরা, রবি বর্ম্মার ছবির মত, কিন্তু গায়ের রং ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। কেহ কেহ পশ্চিমা রমণীদের মত কোঁচা দিয়া কাপড় পরিয়াছে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা বড় স্বর্ণপ্রিয়, অতি গরীব গৃহস্থের স্ত্রীরও গলার হার সোণার। এখানকার স্ত্রীলোকের কেশ প্রায় সকলেরই ঘনকৃষ্ণ, দীর্ঘ ও সুন্দর।

দুই বন্ধুতে কথা কহিতেছিলাম, কি একটা বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল, মনে নাই। ক্ষিতীশচন্দ্র একবার অন্যমনস্কে আমার কথায় হুঁ করিয়া উত্তর দিল; পরমুহূর্ত্তেই সে লজ্জিত হইয়া আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত

করিল। আমি পথের দিকে চকিতে চাহিয়া দেখিলাম, এক ষোড়শী সুন্দরী সুবঙ্কিম দৃষ্টিতে ক্ষিতীশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের বাড়ীর উঠানের ভিতর প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্তদৃষ্টিতে আমি দেখিলাম, যুবতীর চোক্ দুইটী বড় বড় সুকৃষ্ণ ও সুন্দর, দৃষ্টি শান্ত। আমি ক্ষিতীশকে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিলাম না। যে বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল, তাহাই হইতে লাগিল। এমন সময়ে দূরে সানাইয়ের বাজনা আমরা শুনিতে পাইলাম। কিছু পরেই দেখি, ৩।৪টী স্ত্রীলোক সুবেশে সজ্জিত হইয়াছে ; তাহারা সকলেই যুবতী,হাতে এক একখানি রেকাব, তাহার উপরে পান ও সুপারি। তাহাদের অগ্রে অগ্রে সানাই ও ঢোলের মত ছোট চর্ম্ম-যন্ত্র (যাহা আমাদের বঙ্গদেশে নাই) বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছে, সে চর্ম্ম-যন্ত্রের শব্দ অতি কর্কশ। অন্য লোকের নিকট অবগত হইলাম, তাহাদের বাটীতে বিবাহ, নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেছে, এদেশে নিমন্ত্রণের ইহাই পদ্ধতি।

বৈকালে আমরা সমুদ্রধারে বেড়াইতে গেলাম, আমাদের বাসা হইতে সমুদ্র ৫।৭ মিনিটের পথ। সমুদ্রের ধার দিয়া প্রকাণ্ড রাস্তা, তাহার নাম Sea Beaeh Road। আমরা রাস্তা হইতে বালুকা-ভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সমুদ্রতীরে গেলাম। তখন সমুদ্রে ভাটা পড়িয়াছে, সমুদ্রতীর-গর্ভে উপলশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, জোয়ারের সময় তাহা দেখা যায় না। কোন কোন স্থলে ঘন-নিবিষ্ট উপলশ্রেণী এরূপ উচ্চ যে, জোয়ারের সময় তাহা ডোবেনা। জলের ঢেউ লাগিয়া লাগিয়া, তীরের বালুকারাশি মসৃণ ও দৃঢ় হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর দিয়া চলিলে পা বসিয়া যায় না। আমরা কিছু দূরে গিয়া একটা প্রস্তরের উপর বসিলাম। এই উপলশ্রেণীর কোন কোনটী শৈবাল আচ্ছন্ন। উত্থিত তরঙ্গ শ্বেতফেণ উদ্গীরণ করিয়া উপলখণ্ডের উপর দিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। উপলখণ্ডের মধ্যে মধ্যে মসৃণ বালুকা, এক এক বার তাহার জলের তরঙ্গে ডুবিয়া যাইতেছে আবার ভাসিয়া উঠিতেছে। এই অনন্ত বারিরাশি দেখিলে, মনের সঙ্কীর্ণতা থাকে না, একটা উদারভাবের সঞ্চার হয়। আমি নির্ব্বাক হইয়া এই তরঙ্গভঙ্গ-নির্ঘোষে একটা অচিন্ত্য ভাবে ডুবিয়া যাইতেছিলাম।

সম্মুখে অনন্ত জলরাশি, তরঙ্গশ্রেণী প্রস্তরে লাগিয়া লাগিয়া চূর্ণীকৃত হইয়া

পড়িতেছিল। একএকবার হাওয়ায় আস পদ্মের মত একটা গন্ধ নাকে আসিতেছিল। আমরা কোন ডাক্তারের মুখে শুনিয়াছিলাম, ইহার নাম "ওজোন" ইহা পরম উপকারী।

দেখিতে দেখিতে রক্তিমাকার পতনোন্মুখ সূর্য্য যেন দূরস্থিত পাহাড়ের অন্তরালে ডুবিয়া গেল। আকাশ তখন রক্তবর্ণ, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আকাশের রংয়ের পরিবর্ত্তন হইতেছিল। আমরা বাসার দিকে ফিরিতেছিলাম, আমাদের ঠিক সম্মুখে তরঙ্গবিধৌত মসৃণ বালুকাখণ্ডের উপর স্বচ্ছ জল, পাতলা ঢাকাই মসলিনের মত পড়িয়াছিল, তাহার উপর আকাশের রং প্রতিফলিত হইয়া যেন সমুদ্রসৈকতে বিস্তৃত রামধনুর সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা যতই অগ্রসর হই, মরীচিকামত সে সৌন্দর্য্য আমাদের সম্মুখ হইতে ক্রমশঃই সরিয়া যায়, আমরা যত অগ্রসর হই, সেও তত অগ্রসর হয়; এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

নিকটেই বিবাহবাড়ী, সানাই ঢোল প্রভৃতি বাজিতেছিল। কিছুক্ষণ পরেই একটা বড় মহাপায়ায় বর ও ক'নেকে বসাইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হইল। যেখানে যেখানে গ্রাম্য দেবতার মন্দির, বর সেইখানে সেইখানে মহাপায়া হইতে নামিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। এখানকার বিগ্রহ অধিকাংশ বিষ্ণুর চতুর্ভুজ পিতলের মূর্ত্তি। আমরাও দুইবন্ধু তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলাম, একটী গ্রাম্যদেবতার মন্দিরের সম্মুখে বরের মহাপায়া দাঁড়াইল। চতুর্দ্দিকে মশালের আলো জ্বলিতেছিল, আমার পিছনে ক্ষিতীশচন্দ্র। আমি একবার চাহিয়া দেখিলাম, ক্ষিতীশচন্দ্র অনিমেষলোচনে কি দেখিতেছে। আমিও সন্দিগ্ধ-লোচনে চাহিয়া দেখিলাম, ক্ষিতীশচন্দ্রের ঠিক সম্মুখে পথের অপর পার্শ্বে একটী উচ্চজায়গায় দাঁড়াইয়া সেই ষোড়শী, সেই সুবঙ্কিম কৃষ্ণচক্ষু—লজ্জাসঙ্কোচ-বিহীনা যুবতী শান্তস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষিতীশের মুখপানে চাহিয়া আছে। আমার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, কেন উঠিল, জানি না। আমি ক্ষিতীশের গায়ে হাত দিয়া ডাকিলাম, ক্ষিতীশ! অপ্রতিভ হইয়া ক্ষিতীশ চক্ষু নত করিল।

গৃহে আসিয়া মনে করিলাম, ক্ষিতীশকে বলিব—বিদেশে একটু সাবধান হইয়া চল। বলি বলি মনে করিয়া বলা হইল না। বিশেষ কিছু অন্যায়ও দেখি নাই। যুবতী তাহার প্রতি চাহিয়া আছে, সেও তাহার প্রতি চাহিয়াছিল।

হয় ত সে ঔৎসুক্য বশতঃ ওরূপ ভাবে চাহিয়াছিল। বিশেষ লজ্জা পাইবে বিবেচনা করিয়া কিছুই বলিলাম না।

আমাদের বাসার নিকটেই কুরূপমরাজার বাগান, বাগানের খুব সন্নিকটেই সমুদ্র,—সমুদ্র উপকূলের বিস্তৃত ময়দানে সাহেবদের হার্গ প্রভৃতি খেলিবার আড্ডা। উদ্যানটী নানারূপ লতাপুষ্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ। বাগানের রাস্তার দুইধারে সারি দিয়া বটগাছ বসান, ভিতরে একটী পাথরের মন্দির আছে। মন্দিরটী কাশীর মন্দিরের অনুরূপে প্রস্তুত, ভিতরে কুরূপমমহিষীর প্রস্তর মূর্ত্তি; বাহিরের দেওয়ালে নানারূপ প্রেমের কবিতা কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত। রাজা বিপত্নীক হইবার পর আর বিবাহ করেন নাই। তিনি পত্নীর স্মৃতির জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

আমরা উদ্যান দেখিয়া বাসায় আসলাম। সেইদিন বৈকালে আবার "ডলফিন্সনোজ ও ভ্যালিগার্ডেন" দেখিতে গেলাম। ভিজাগাপটমের শেষ সীমায় খানিক সমুদ্র অপরিসর হইয়া একটী ছোট নদীর মত চলিয়া গিয়াছে, তাহারই পরপারে ভ্যালিগার্ডেন; বিশেষ কিছু দর্শনীয় দেখিলাম না। দুইদিকে পাহাড়, মাঝখানের লম্বা সমতল ভূমিতে বাগান; বাগানেও বিশেষ কিছু বৈচিত্র্য নাই, কতকগুলি নারিকেলগাছ আছে মাত্র। পাহাড়ের একপ্রান্তে সমুদ্র, সমুদ্র-উপকূল হইতে এই পাহাড় উঠিয়াছে, তাহার উপরে একখানি বাংলা আছে, বাংলাখানি ভাঙ্গা। একটা কূপও আছে, সেখান হইতে দাঁড়াইয়া সমস্ত সহরের একটা দৃশ্য পাওয়া যায়। সমুদ্রও অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। আমরা মাথাপিছু একপয়সা দিয়া পার হইয়াছিলাম, আবার একপয়সা দিয়া ভিজাগাপটমে ফিরিয়া আসিলাম। এই পারেই একটী পাহাড়ে একঅংশে একটী হিন্দুবিষ্ণুমন্দির ও একটী বড় মসজিদ আছে। এই পাহাড়ের মধ্য কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া; সেই অংশে একটী সুন্দর গির্জ্জা আছে। এই পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন পথ দেখিলে, "যাইবার পাশ" কল্পনা হয়। নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত দেখা যায় না। আমরা পাহাড়ের ভিতরের পথ দিয়া পাহাড়ের অন্যপার্শ্বে গেলাম, তাহার পর গির্জ্জা দেখিতে যাওয়া হইল। সর্ব্বাপেক্ষা পাহাড়ের এই অংশ উচ্চ, ইহা অপেক্ষা নিম্ন হিন্দুমন্দির, তাহা অপেক্ষা নিম্ন মুসলমান মন্দির। একই পাহাড়ের তিনঅংশে তিন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের তিনটী ধর্ম্মমন্দির

স্থাপিত হইয়াছিল; মধ্যে পাহাড় কাটিয়া গির্জ্জা আলাহিদা করিয়া লওয়া হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান মস্‌জিদ অবিচ্ছিন্ন পাহাড়ের উপর আছে। মুসলমান হিন্দু বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় নাই।—এই সমতা দেখিয়া আনন্দ হইল।

গির্জ্জাটী সুন্দর, ভিতরে ক্রুশাবদ্ধ যীশুর মূর্ত্তি আছে,—দেখিলে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। খ্রীষ্ট-ক্রোড়ে মেরীর মাতৃমূর্ত্তি অতিসুন্দর; গির্জ্জা দেখিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। উঠিবার বরাবরই সিঁড়ি আছে, উঠিতে যেরূপ কষ্ট হইয়াছিল, নামিবার সময় ততটা হইল না।

পরদিন সীমাচলে যাইবার ব্যবস্থা করা হইল। ভোর বেলায় দেড়টাকা ভাড়ায় একখানি বাণ্ডি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, আমরা দুই বন্ধুতে গাড়ীতে উঠিলাম। সেদিন সীমাচলে একটা পার্ব্বণ, খুব ভিড় হইয়াছিল। আমরা সিঁড়ি দিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম, অগাধ সিঁড়ি ফুরায় না। সিঁড়ির পার্শ্বদিয়া নিম্নের রাজার উদ্যান দেখাইতেছিল। পাহাড়ের গায়ে লাইন করিয়া আনারসের গুচ্ছ। এখানে পাহাড়ে আনারসের রীতিমত আবাদ হয়, উপরের ঝরণার জল সিঁড়ির পাশের নর্দ্দামা দিয়া হুহু করিয়া পড়িতেছিল; সেইজল নিম্নের বাগানে গিয়া পড়ে। আমরা উপরে উঠিলাম। পাহাড়টার উপরে যেন একখানি গ্রাম, সমতলভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম বলিয়া মনে হইল। চতুর্দ্দিকে কলাবাগান, অনেকে সেখানে বসবাস করে, লোকের গরু বাছুরও আছে। মন্দিরের সম্মুখ দরজার পার্শ্বে প্রকাণ্ড যাত্রীশালা, সকলে সেখানে ইচ্ছামত রন্ধন করিয়া আহারাদি করিতে পারে। সে ঘরগুলিও বেশ সুপরিচ্ছন্ন; আমরা তেল মাখিয়া ঝরণায় স্নান করিতে গেলাম। মোটা লোহার পাইপ বসাইয়া অনেকস্থানে এই ঝরণার স্রোত লইয়া জলের কলের মত করা হইয়াছে। আমরা মূলঝরণায় যাইয়া স্নান করিলাম। পাহাড়ের ভিতর দিয়া ঝরণা সেইখান হইতে প্রথম দেখা দিয়াছে। সেখানে ও তাহার দুই পার্শ্বে মন্দির, একপার্শ্বের মন্দিরে যাত্রীরা চুল ফেলে; দেখিলাম,—গৃহমধ্যে বিস্তর চুল জমা রহিয়াছে। ঝরণায় তলাও বেশ বাঁধান।

তাহার পর বিগ্রহ দর্শন করিতে গেলাম, দ্বারে প্রত্যেককে চারিটী করিয়া পয়সা দিতে হয়। মন্দিরটী অনেকটা জগন্নাথদেবের মন্দিরের ছাঁচে গড়া, এখা-

সেও খিঁচুড়ীভোগ বিক্রয় হইয়া থাকে। চন্দনঢাকা শিবলিঙ্গের মত প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, বৎসরে একবার এই মূর্ত্তি দর্শন হয়। অন্য সময়ে মূর্ত্তি চন্দন-ঢাকা থাকে। খানিক পথ অন্ধকারে গিয়া দেব-দর্শন করিতে হয়। আমরা দেবদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, পশ্চাতে আরও অনেক যাত্রী আসিতেছে। আমি পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, হঠাৎ দেখিলাম দুইটী উজ্জ্বল চক্ষু, এচক্ষু আমার চেনা; আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে যুবতী ক্ষিতীশের প্রতি চাহিয়া আছে। আমি সন্দিগ্ধভাবে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, রমণীর পশ্চাতে এক বিশালকায় ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মাদ্রাজী যুবক। তাহার মাথায় বাব্‌রিচুল কপালের কাছে কামান, হাতে সোণার বালা, চক্ষু বড় বড় গাঢ় রক্তবর্ণ, দৃষ্টি তীব্র ভয়াবহ। সে একবার রমণীর মুখের দিকে চাহিল, রমণী তখনও অনিমেষ লোচনে ক্ষিতীশের প্রতি চাহিয়াছিল. সেই কৃষ্ণবর্ণ মাদ্রাজী যুবক একবার তীব্র দৃষ্টিতে আমার বন্ধুর পানে দৃষ্টিপাত করিল। পরে রমণীর হাত ধরিয়া লইয়া মন্দিরের পার্শ্বে সরিয়া গিয়া দ্রুত বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমার বুকের ভিতর দুরু-দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেই মাদ্রাজীর তীব্র-কটাক্ষ আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না,একটা দারুণ অস্বচ্ছন্দতায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল।

এদেশের লোকগুলা বাহিরে সাধারণতঃ খুব মিষ্টভাষী, কিন্তু ভিতরে ইহাদের তেমন পরিষ্কার নয়। অত্যন্ত স্বার্থপর ও কুটিল।

মন্দিরের বাহিরে আসিয়া পাহাড়ের উপর বেড়াইতেছিলাম, একজন বলিল, এই পাহাড়ের উপর দিয়াই মাধোধারা পর্য্যন্ত বরাবর সিঁড়ি আছে। পাহাড়ের অধিবাসীরা এইপথ দিয়া ভিজাগাপটম যাতায়াত করে। আমার সেই পথ দিয়া ফিরিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু নীচে আমাদের বাণ্ডি অপেক্ষা করিতেছিল, এজন্য যাওয়া হইল না। আমরা পাহাড়ের নীচের দোকান হইতে ঘৃত, চাউল, ডাল কিনিয়া আনিয়াছিলাম, উপর হইতে কাট হাঁড়ি সংগ্রহ করিয়া খিঁচুড়ী ভুলিয়া দেওয়া হইল। বৈকালে আমরা পাহাড় হইতে নামিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রে মনে করিলাম, ক্ষিতীশকে সেই যুবতীর কথা জিজ্ঞাসা করিব, কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচ আসিল—জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। সমস্ত রাত্রি আমি মাদ্রাজীর সেই তীব্রচক্ষু স্বপ্নে দেখিলাম।

পরদিন মাধোধারায় যাওয়া হইল। এখানে একটা ঝরণা আছে, দুইটী মন্দির আছে।—অনেকটা বৌদ্ধমন্দিরের মত। কে বলিতে পারে, এই মন্দির বৌদ্ধের ছিল, হিন্দুর প্রাধান্তে ইহার আকার হিন্দুত্বে পরিণত হইয়াছে কি না! পাহাড়ের উপর অনেক কাঁঠালগাছ। এখানে অসময়ে কাঁঠাল ফলে। এইস্থান হইতেই সিঁড়ি, আরম্ভ হইয়াছে। এই সিড়ি দিয়া বরাবর সীমাচলে যাওয়া যায়। বহু সিঁড়ি আমরা কিছুদূর উঠিলাম, সিঁড়ির উপর হইতে ভিজাগাপটম ও সমুদ্র পরিষ্কার দেখা যায়। দুই একস্থানে আবার সিঁড়ির পার্শ্বে আলিসা নাই, নীচের দিকে চাহিলে মাথা ঘুরিয়া উঠে। যাহা হোক্, আমরা আর অধিকদূর অগ্রসর হইলাম না। এই সিঁড়ি দিয়া সীমাচল হইতে ভিজাগাপটম যাতায়াত করে। সীমাচল ভিজাগাপটম হইতে ১২ মাইল, মাধোধারা ৫॥ মাইল। ফিরিয়া আসিবার সময় ভিজাগাপটম হইতে হাতীর দাঁতের কাজ করা চন্দনের কৌটা ও অন্যান্য শিংয়ের খেলনা কিছু ক্রয় করিলাম। এস্থান হস্তিদন্তের কারুকার্য্যের জন্য বিখ্যাত।

ক্ষিতীশের শরীর ভাল ছিল না জন্য আমাকে আফিসে ছুটী লইয়া ওয়ালটেয়ারে থাকিতে হইয়াছিল; কিন্তু এই সমস্ত ঘটনায় আমার আর একদিনও ওয়ালটেয়ার থাকিবার ইচ্ছা ছিল না। ক্ষিতীশকে সেই কথা বলিলাম, সে আরও ২।৪ দিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল।

এদেশে পঙ্গল নামক একটা পর্ব্ব আছে। আমাদের দুর্গাপূজার মত এই সময় সকলেই বাড়ীঘর লেপিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে এবং নানারূপ আলিপনা দেয়। এখানে প্রত্যহই বাড়ীর সম্মুখে গোবর দিয়া আলিপনা দেওয়ার প্রথা আছে; সেই সমস্ত আলিপনা এত কারুকার্য্য সম্পন্ন, যেন মনে হয়, কম্পাস ধরিয়া রীতিমত ভাবে লতা পাতা পুষ্প অঙ্কন করা হইয়াছে। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা এতই সুনিপুণ যে, কতকটা চালের গুঁড়ার মত পদার্থ হাত দিয়া ছড়াইয়া ছড়াইয়া এই বিচিত্র আলিপনা অতি সহজে দেয়। এই পঙ্গলের সময় সকলেই নূতন বস্ত্র পরিধান করে। মান্দ্রাজীরমণীরা দরিদ্র হইলেও বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র ও স্বর্ণ সকলেরই কিছু না কিছু আছে। এই সময় বঙ্কেটেশ্বরের মন্দিরে একটা মেলা বসে। আলিপুরম্ নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর এই মন্দির স্থাপিত। এখানে কয়েকটী প্রস্তর খোদিত চরণচিহ্ন আছে।

পাহাড়ের উপর অংশে মাত্র একখানি পদচিহ্ন দেখা যায়, সেখানি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এখানকার অধিবাসীরা বলে, ইহা রামচন্দ্রের পদচিহ্ন। বড় বড় পিতলের আলোর ঝাড়; ৬০০।৭০০ শত প্রদীপ এক একটাতে জ্বলে। ৮।১০ জনে তাহা বহিয়া বহিয়া লইয়া আসিয়াছে। সেই প্রদীপ ঘিরিয়া আমাদের দেশের সঙ্কীর্ত্তনের মত খুব বড় একরকম করতাল বাজাইয়া, দল বাঁধিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছে। কতকগুলি বালককে কতকটা কৃষ্ণযাত্রার ছেলের মত রাখাল বেশ পরাইয়া, একজন দলের অধিকারী হইয়া গান গাওয়াইয়া নাচাইতেছে। গোয়ালারা তাহাদের প্রকাণ্ড ষাঁড় বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত করিয়া সেই ভিড়ের ভিতর পাহাড়ে লইয়া আসিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই প্রকাণ্ড ষাঁড় এই লোকারণ্যের ভিতর স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে; কাহাকেও আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে না। ভাল ভাল সাড়ী পরিয়া অনেক স্ত্রীলোক এই মেলায় আসিয়াছে, সকলের মুখে হলুদের রং। আমরা মেলা দেখিয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিলাম; পথে আসিতে দেখিলাম প্রায় সকলের হাতেই এক একগাছি ইক্ষুদণ্ড, ইহাই তাহাদের মেলার প্রধান বাজার।

অনেক দূর আসিয়াছি, একবার পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, সেই বিদেশিনী যুবতী আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তাহার সুদীর্ঘবেণী পৃষ্ঠে লম্বিত, পরিধানে একখানি নীলরংয়ের সাড়ী, পায়ে একরকম বাঁকাল নূপুরের মত অলঙ্কার, হাতে অনেক গুলি চুড়ি। তখন চন্দ্র উঠিয়াছিল, সমুদ্র ধারের মত জ্যোৎস্না—অত স্বচ্ছ বোধ হয় কোথাও হয় না। আমি সেই জ্যোৎস্নার আলোয় সুন্দরীকে দেখিতেছিলাম। সুন্দরীর সেই সুবঙ্কিম চক্ষু, তাহাতে আবার কাজল পরিয়াছে, তাহাকে আজ বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। আজ তাহার পশ্চাতে সেই মাদ্রাজীকে দেখিলাম না, কিন্তু আমার সন্দেহ কিছুতেই যাইতেছিল না। আমি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখিতে দেখিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম; সুন্দরীও আমাদের সঙ্গে আসিতেছিল। সে আমাদের ভাড়াটীয়া বাটীর অন্য একটী কক্ষে থাকে। সুন্দরী বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল, আমরা ভিতরে ঢুকিব এমন সময় ক্ষিতীশের গা ঘেঁসিয়া সেই মাদ্রাজী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। এ মাদ্রাজী যে কোথায় ছিল, আমরা এতক্ষণ তাহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আমার সন্দেহ হইল, নিশ্চয়ই এই মাদ্রাজী আমাদের

অলক্ষ্যে আমাদের অনুসরণ করিতেছিল। তাহার গোলাকার রক্ত চক্ষু, সেই জিঘাংসাপূর্ণ দৃষ্টি আমার ভাল বলিয়া বোধ হইল না। আমার মনটা খারাপ হইয়া গেল। আমরা কয়েক দিন এই বাড়ীতে আছি, সুন্দরীকে অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু এই যুবককে সীমাচলে প্রথম দেখিয়াছিলাম, আজ আবার এই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিলাম। আমার মনে একটা আশঙ্কা হইল, ক্ষিতীশকে ভাজিয়া কিছু বলিলাম না। তত্ত্ব করিয়া জানিলাম, এই মাদ্রাজী বিদেশিনী যুবতীর স্বামী। সে দূরে কোথায় কর্ম্ম করে,সম্প্রতি আসিয়াছে। যুবতীর ইহা পিত্রালয়।

এখানকার পাগলা গারদ দেখিবার জিনিষ। আমরা পরদিনই পাগলা গারদ দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড পাগলাগারদ, অনেকগুলি পাগল আছে। স্ত্রীলোক পাগলদের স্থান আলাহিদা, পুরুষদের আলাহিদা ; পাগলা গারদটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। এই সমস্ত পাগলদের দ্বারা পাগলাগারদের ভিতর চাষ করা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে একটু জলকষ্ট, সমুদ্রধারের কূপগুলিতে গ্রীষ্মের সময়ও জল থাকে, সে জল কিন্তু তেমন লবণাক্ত নয়। পাগলাদের দ্বারায় গরুর গাড়ীতে বড় বড় পিপা বোঝাই করিয়া কূপের জল তোলাইয়া আনা হয় ; রাস্তায় ইহারা বেশ শান্ত শিষ্ট ভাবে যায়। গারদের উদ্বৃত্ত তরীতরকারীও এই পাগলদের দ্বারায় বহাইয়া বাজারে আনিয়া বিক্রয় করা হয়। দেখিলাম, পাগলারা বেশ স্বাভাবিক-মস্তিষ্ক ব্যক্তির মত কার্য্য করিতেছে। একজন পাগল আছে, তাঁহাকে সকলে পণ্ডিতজী বলে, বাহিরে তাঁহাকে দেখিলে পাগল বলিয়া বোধ হয় না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত চেহারা। কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেই তিনি তাহার কর-কোষ্ঠি বিচার করেন, তাঁহার ধারণা—যাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়, তাহারা সকলেই রাজা মহারাজা, অনবরত সংস্কৃত শ্লোক অনর্গল বলিতে পারেন।

আহারের ঘণ্টা হইল, সকলে একটা বাঁধান চত্বরে লাইন দিয়া আহার করিতে বসিল। প্রত্যেকেরই সম্মুখে এক একটা করিয়া টিনের বাল্তি দেওয়া হইল। এই বাল্তিতে খানিকটা ভাত ও ডাল বেগুন প্রভৃতি একসঙ্গে ঘাঁটিয়া একটা তরকারীর মত করা হইয়াছে,—সেই খানিকটা খানিকটা তরকারী

ভাতের উপরে দেওয়া। পাগলদের সপ্তাহে দুই দিন করিয়া মাংস ও মাছের বন্দোবস্ত আছে। পাগলাদের মধ্যেই কতকগুলি পাগল ইহাদের পরিবেশন করিতে লাগিল; যতক্ষণ পরিবেশন শেষ না হইল, সকল পাগলই আহার সম্মুখে করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল; পরে সকলে একসঙ্গে আহার করিতে লাগিল। আমরাও বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন আমরা জলের কল দেখিতে গেলাম, ইহা সহর হইতে ৫ ক্রোশ দূরে। বিমলিপটম পর্য্যন্ত সুন্দর পাকারাস্তা আছে, এই পথ দিয়া যাইতে হয়। দূর হইতে দেউলের মত একটা প্রকাণ্ড পাহাড় দেখা যাইতেছিল; আমরা মনে করিয়াছিলাম, বোধ হয়, এই পাহাড়ের নীচেই জলের কল, কিন্তু যাইয়া দেখিলাম—তাহা নয়, এই পাহাড়ের মধ্য দিয়া একটা সংকীর্ণ পথ আছে, দূর হইতে তাহা দেখা যায় না, অবিচ্ছিন্ন পাহাড় বলিয়া মনে হয়। আমরা সেই পথ দিয়া পাহাড়ের অপর পার্শ্বে গেলাম, বরাবর বিমলিপটমের রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তার পাশ দিয়া পাহাড়ের পাশে পাশে সীমাচলের রাস্তা গিয়াছে। আমাদের গাড়ী সেই পথ দিয়া চলিল, একপাশে পাহাড় ও অন্য পার্শ্বে পাহাড়িয়া নদীর মত অপ্রশস্ত একটা জলস্রোত দেখিতে পাইলাম; তাহার উপরের ক্ষেত্র খুব উর্ব্বরা বলিয়া বোধ হইল। এস্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে সমতল শ্যামল শস্যক্ষেত্র। আমরা এই পথের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলাম। এই খানেই জলের কল; এইখান হইতেই ভিজাগাপটম কলের জল গিয়াছে। প্রকাণ্ড একটা বাঁধ দিয়া খানিকটা জল বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। শুনিলাম, এই জল পাহাড়ের ঝরণা হইতে আসিয়া জমে, এই জল পরিষ্কার করিবার ও পম্প করিবার কল স্থাপিত আছে। আমরা কল দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম,—পথে দেখি, পাহাড় হইতে অসংখ্য ছাগল নামিতেছে, একজায়গায় খানিকটা ঘিরিয়া অনেকগুলি ছাগশিশু রাখা হইয়াছে। এখানকার অনেকে ছাগলের ব্যবসা করে। ফিরিতে আমাদের রাত্রি হইল, গায়ে একটা সামান্য পাতলা জামা ছিল। এখানে শীতের সময় শীত নাই, গ্রীষ্মের সময় অতিরিক্ত গ্রীষ্ম নাই। ওয়ালটেয়ারে ঋতুর সমতা অনেকটা দেখা যায়। সঙ্গে যাহা শীতবস্ত্র লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা ব্যবহার করিতে হয় নাই। অনেকের মুখে শুনিলাম, গ্রীষ্মের সময় এখানকার স্বাস্থ্য

উৎকৃষ্ট। এখানকার অধিবাসী অনেকেই মুরগী ও শূকর পোষে, কুক্কুট-মাংস হিন্দুর খাইতে দোষ নাই; ছাগ-মাংস খুব সস্তা—চারি আনা সের।

আমাদের ফিরিতে রাত্রি হইয়াছিল, বাড়ীর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, আমাদের বাত্তির শব্দ পাইতেই সেই বিদেশিনী সুন্দরী চকিতে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল; এবং আমাদের দেখিয়া একটু মৃদু হাসিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। এই একটু হাসির ভিতরেই যেন তাহার হৃদয়ের সমস্ত রুদ্ধ উল্লাস একসঙ্গে চোকে মুখে ফুটিয়া উঠিল। বিদেশিনী রমণী আমাদের ভাষা বোঝে না, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু আমাদের দর্শনে তাহার এ উল্লাস কেন? তাহার দৃষ্টি শান্ত পবিত্র, তাহাতে কুৎসিত লালসা নাই, কিন্তু সে স্বপ্নদৃষ্টের মত পূর্ণ আগ্রহে ক্ষিতীশের প্রতি চাহিয়া থাকে, ক্ষিতীশের দর্শনে তাহার কি যেন একটা অতীতের স্মৃতি মনে পড়ে; এ স্মৃতির মূল কোথায়? বিদেশিনীকে দেখিলে ক্ষিতীশেরও ভাবান্তর হয়। আমি ভাবিয়া ইহার তাৎপর্য্য কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কুৎসিত মিলনের বাঞ্ছা উভয়ের মধ্যে কাহারও নাই, কিন্তু উভয়ে উভয়কে দেখিবার জন্য উৎসুক নেত্রে চাহিয়া থাকে,—এ ঔৎসুক্য কেন?

পরদিন প্রাতঃকালে বসিয়া আছি, আমাদের বাসার সম্মুখের রাস্তার ঠিক পর পারে অনেকগুলি খোলার ঘর, তাহাতে অনেক লোক বাস করে। একটা খোলার ঘরের সম্মুখে ভারি ভিড়, ভিতর হইতে ক্রন্দন শোনা যাইতেছিল; ব্যাপার কি জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। শুনিলাম, সেই বাড়ীতে একটী বালকের মৃত্যু হইয়াছে। আমরা বারান্দায় বসিয়া দেখিতেছিলাম—কতকগুলি লোক সানাই ঢোল প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র লইয়া আসিল; এবং ২।৩টা লোক বাঁশদিয়া একটা চৌদোলার মত তৈয়ারী করিল। তাহা রঙ্গিন বস্ত্র দিয়া মুড়িয়া চারিদিকে কার্ণিসের মত পান ঝুলাইয়া দিল। তাহার পর সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া বালকের মৃতদেহ আনিয়া সেই চতুর্দ্দোলায় বসাইয়া দিল। মৃতকে মূল্যবান বস্ত্র পুষ্পমালা প্রভৃতিতে সজ্জিত করিয়া দেওয়া হইল। মৃত বালককে এমনভাবে চতুর্দ্দোলায় বসাইয়া দেওয়া হইল যে, তাহাকে ঠিক জীবিতের মত মনে হইতে লাগিল। মৃত বালকটীর

মুখে হলুদ মাখান এবং মুখ-গহ্বরে তুলসী পাতা দেওয়া। এখানকার স্ত্রীলোকেরাও হলুদের গুঁড়ো মুখে দিয়া প্রসাধন করে। একটু পরেই বালকের শোকাতুরা মাতাকে ধরাধরি করিয়া আনা হইল। তাহার হাতে বরণ ডালা, প্রদীপের আলো জ্বলিতেছে। বালকের মাতার সম্মুখে চৌদোলা খানি উঁচু করিয়া ধরা হইল। মাতা তিনবার মৃত পুত্রকে চুম্বন করিয়া বরণ করিল। তাহার পর সকলে খুব বাজনা বাজাইয়া খই ছড়াইতে ছড়াইতে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গেল।

আমার মনটা রাত্রি হইতে ভাল ছিল না, এই করুণদৃশ্যে আরও মন খারাপ হইয়া গেল। সেদিন আর কোথাও বেড়াইতে বাহির হইলাম না, দুই বন্ধুতে সমস্তদিন বাড়ীতেই রহিলাম। ক্ষিতীশেরও মন ভাল নয়, দেখিলাম—সে আজ একটু বেশী অন্যমনস্ক।

আমরা বৈকালে বাজারে গেলাম; এখানে যথেষ্ট সমুদ্রের মাছ আমদানী হয়। আরব্য উপন্যাসের জেলে ও দৈত্যের গল্পের মত নানাপ্রকার বিচিত্র বর্ণের মৎস্য দেখা যায়; শ্বেত পীত নীল লাল;—মাছের কত প্রকারের রং। আমরা একটা বড় লাল রংয়ের মাছ ক্রয় করিলাম, দামও খুব সস্তা। মাছটা অনেকটা আমাদের দেশের রুইয়ের মত, কিন্তু গোলাপী রং। আমরা বাজার হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, পথে একটা মদের দোকান; দোকানে বসিয়া একটী যুবতী স্ত্রীলোক বেশবিন্যাস করিয়া মদবিক্রয় করিতেছে। দোকানে বেজায় ভিড়, এদেশের ইতরলোকেরা যাহা রোজগার করে, তাহা সমস্তই মদ খাইয়া নষ্ট করে, স্ত্রীলোকের উপার্জ্জনের উপর সংসার নির্ভর করে। এদেশের স্ত্রীলোকেরা খুব কষ্টসহিষ্ণু। আমরা আসিতেছিলাম, হঠাৎ দেখি সেই কৃষ্ণবর্ণ বিশালদেহ মাদ্রাজী, যাহার সহিত সীমাচলের মন্দির মধ্যে দেখা হইয়াছিল। সেই মাদ্রাজী লোকটা শুঁড়িখানার সম্মুখে মদ খাইয়া হল্লা করিতেছিল; হঠাৎ একবার তাহার দৃষ্টি আমার বন্ধুর উপর পড়িল। সে দৃষ্টি অতিতীব্র—পৈশাচিক ভাবাপন্ন। আমার দেখিয়া বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, নিজেকেই রাঁধিতে হয়, ঘরের সঙ্গে লাগা একটী ছোট রান্নাঘর। আমার বন্ধু ক্ষিতীশ ঘরের ভিতরে শুইয়া আছে, দরজাটা

জেনান, আমি রান্না করিতেছি। সন্ধ্যার পরেই এদেশের পথে লোক-চলাচল বন্ধ হইয়া যায়; শুনিয়াছিলাম ইহারা বড় ভূতবিশ্বাসী। কেহ কেহ বলে, অত্যন্ত সর্পের ভয়, তাই লোকে সন্ধ্যার পর রাস্তায় বাহির হয় না। পল্লী নির্জ্জন, কোন সাড়াশব্দ নাই, আমিও নীরবে রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত; মনের স্বচ্ছন্দতা নাই। হঠাৎ ঝড়ের মত সেই বিদেশিনী সুন্দরী দরজা ঠেলিয়া ভীত ত্রস্তভাবে আমাদের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই দুর্দ্ধর্ষ সুরাপায়ী মাদ্রাজী, হাতে একখানি প্রকাণ্ড ছোরা; গৃহের আলোকে ছোরাখানি ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিব, শব্দ কণ্ঠে আসিয়াছে, পরিস্ফুট হয় নাই—ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই মাদ্রাজী বিদেশিনীর বক্ষে ছোরাখানি আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। বিদেশিনী অস্ফুট চীৎকার করিয়া ঘরের মেজের উপর পড়িয়া গেল। আমি "খুন খুন" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। মাদ্রাজী একবার তাহার সেই রক্তচক্ষে আমার প্রতি তীব্রকটাক্ষ করিয়া মুহূর্ত্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ক্ষিতীশ স্বভাবতঃ দুর্ব্বলচিত্ত, সে এই নৃশংস ব্যাপারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

আমার চীৎকারে চতুর্দ্দিক হইতে অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষিতীশের তখন চৈতন্য হইয়াছে। সে উন্মত্তের মত বিদেশিনী যুবতীর মস্তক আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। যুবতীর কথা বলিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু বোধ হয় অল্প অল্প চৈতন্য ছিল। সে স্নিগ্ধ শান্ত আকুল আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাহার বড় বড় চোখ দুইটী আমার বন্ধুর মুখের প্রতি ন্যস্ত করিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল, সে চক্ষু আর উন্মীলিত হইল না। বিদেশিনীর সেই শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমার অন্তরে একটা ছাপ দিয়া গেল, যাহা আজ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

পুলিস আসিয়া আমাদের জবানবন্দী লইয়া রমণীর মৃতদেহ থানায় লইয়া গেল; মাদ্রাজী যুবককে আর পাওয়া গেল না। সকলের মুখে শুনিলাম, স্ত্রীলোকের চরিত্রের উপর সন্দেহ হইলে এদেশের পুরুষেরা তাহাকে হত্যা করিতে কিছুমাত্রই ইতস্ততঃ করে না।

প্রাতঃকালে একখানি টেলিগ্রাফ আসিল, তাহাতে লেখা আছে "গত-রাত্র ৯টার সময় ক্ষিতীশের পত্নীর কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে।" রাত্র

সুপ্রসিদ্ধ টডসাহেব রাজাবলী, রাজতরঙ্গিণী ও রাজপুতনার পণ্ডিতগণের সংগৃহীত কোন কোন গ্রন্থ আলোচনা করিয়া যুধিষ্ঠির হইতে বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত রাজগণের ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করার কথা উল্লেখ করিয়া শেষোক্তের

রাজপাল পর্য্যন্ত ৯ নয় জনেতে ৩১৮ তিনশত আটার বৎসর। তাহার পর শকাদিত্য নামে পার্ব্বতীয় রাজা একজনেতে চৌদ্দ বৎসর। এইরূপে কলির প্রথম অবধি ৩০৪৪ তিন হাজার চৌয়াল্লিশ বৎসর গত হইল এবং মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির দেবের শকেরও নিবৃত্তি হইল। তারপর বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ হইল। এই সম্বতের আরম্ভ অবধি বিক্রমাদিত্যেরা-পিতাপুত্রে দুই জনেতে ৯৩ তিরানব্বই বৎসর। তারপর সমুদ্র পাল অবধি বিক্রমপাল পর্য্যন্ত ১৬ ষোল জন যোগীতে ৬৪১।৩ ছয়শত একচল্লিশ বৎসর তিন মাস। তাহার পর তিলকচন্দ্র অবধি গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী প্রেমদেবী পর্য্যন্ত ১০ দশ জনেতে ১৪০।৪ একশত চল্লিশ বৎসর চারি মাস। তাহার পর হরিপ্রেম বৈরাগী অবধি মহাপ্রেম পর্য্যন্ত ৪ চারিজন বৈরাগীতে ৪৫।৭ পঁয়তাল্লিস বৎসর সাত মাস। তাহার পর ধীসেন অবধি দামোদর সেন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় বৈদ্যজাতি ১৩ জনেতে ১৩৭।১ এক শত সাইত্রিশ বৎসর এক মাস। তাহার পর দীপসিংহ অবধি জীবনসিংহ পর্য্যন্ত চোহান রাজপুত জাতি ৬ ছয় জনেতে ১৫১ একশত একান্ন বৎসর। তাহার পর পৃথুরায় একজনেতে ১৪।৭ চৌদ্দ বৎসর সাত মাস। এইরূপে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ অবধি ১২২৩ বারশত তেইশ বৎসর গত হইল। এবং কলির প্রথম অবধি ৪২৬৭ চারি হাজার দুইশত সাতষট্টি বৎসর গত হইল। এই পর্য্যন্ত হিন্দু রাজাদের সাম্রাজ্য ছিল।

(মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের রাজাবলির পৃঃ ৬—৭ অনুবাদ)

টড সাহেব রাজতরঙ্গিনী হইতে আবার এইরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন।—

The twenty-eighth prince Khemraj was the last in lineal descent from Parikshit, the grand nephew of Yudhisthira. The first dynasty lasted 16th years. The second dynasty was of Viserwa, and consisted of fourteen princes, this lasted five hundred years. The third dynasty was headed by Mahraj and terminated by Untinai, the

অবশেষে অবন্তী বা উজ্জয়িনীতে রাজধানী স্থাপনের কথা লিখিয়াছেন। তাহার পর আটশতাব্দী ব্যাপিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানীর গৌরবলাভে সমর্থ হয় নাই। তুয়ারবংশীয় অনঙ্গপাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দিল্লীবক্ষে পুনর্ব্বার সিংহাসন স্থাপন করিয়া—ইহার গৌরব ঘোষিত করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি ইন্দ্রপ্রস্থনামের পরিবর্ত্তে দিল্লীনামই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। (৩) কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ ও দিল্লী দুইটী স্বতন্ত্র নগরী বলিয়াও উল্লিখিত হইয়া থাকে। টলেমির ডাইডালা (Daidula) ও ইন্দবরা (Indabara) দিল্লী ও ইন্দ্রপ্রস্থ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হয়। (৪) কোন্ সময় হইতে দিল্লী সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠে, তাহা নির্ণয়

---

fifteenth prince. The fourth dynasty was headed by Dhoodsen, and terminated by Rajpal the ninth and last king (Rajtarangini).

(Tod's Rajasthan foot Note.)

(3) Indraprastha ceased to be a regal abode for eight centuries, when it was re-established by Anungpal, the founder of the Tuar Race claiming descent from rhe Pandus. Then the name of Delhi superseded that of indraprastha.

"Sukwanta, a prince from the northern mountains of Kumaon, ruled fourteen years. When he was slain by Vicramaditya and from the Bharat to this period 2,915 years have elapsed" such a period asserted to have elapsed while sixty six princes occupied the throne, gives an average of forty four years to each which is incredible, if not absolutely impossible.

In another passage the compiler says "I have read many Books (shastras) and all agreed to make one hundred princes, all of Kshetri race, occupy the throne of Delhi from Yuahisthira to Prithwiraja a period of 4, 100 yearsp after which the Rewad race succeeded."

(Tods Rajasthan Vol I)

(4) কানিংহাম উক্ত দুই নগরীর অবস্থান সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন।

করা সুকঠিন। প্রবাদ মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, দিলু নামে একজন রাজা দিল্লীর অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতেই দিল্লীর নামকরণ হয়; রাজা দিলীপ কর্ত্তৃকও যে দিল্লীর নামকরণ হইয়াছিল, এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে।(৫) আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ফেরিস্তা রাজা দিলুকে আলেকজাণ্ডারের প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুর সমসাময়িক বলিয়া থাকেন, এবং তিনি পুরুকে কমাউনরাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহা কর্ত্তৃক দিলুর পরাজয়ের কথাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।(৬) রাজাবলী গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, রাজপাল

"Indaprastha and Delhi were therefore two different cities 5 miles apart. Former on bank of Jumna above Humayun's tomb, latter on a rocky hill surroundihg the Iron pillar."

তিনি অন্যত্র আবার বলিতেছেন।

"The ancient city of Delhi may with tolerable certainty be considered to have occupied almost the same site as the fort of Rai Pithora as it is to be presumed that the Ironpillar conspicuous position either in the old city or close to it."

(5) তুয়ার বংশের প্রতিষ্ঠাতা অনঙ্গপাল কর্ত্তৃক দিল্লীর লৌহস্তম্ভ স্থাপিত হয় বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। লৌহস্তম্ভ স্থাপনের পর তাহা বাসুকির মস্তক স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। অনঙ্গপাল তাহার পরীক্ষার জন্য স্তম্ভ উত্তোলন করিয়া তাহাতে রক্তের চিহ্ন দেখিতে পান। তাহার পর স্তম্ভ পুনঃস্থাপন করিতে গিয়া উহা ঢিলা হইয়া যায়। তজ্জন্য ঢিল্লী হইতে দিল্লী নামকরণ হয় বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। উক্ত বিষয়ের এইরূপ গাথা শুনিতে পাওয়া যায়।

"কিল্লী তো ঢিল্লী ভই..
তোমর ভয় মত হিন্

(6). Jyechund lept an infant son whom his widow raised to the throne, and who would have ruled the empire in his name, fut Dehloo the uncle of the young

নামে ময়ূরবংশীয় শেষরাজা রাজপাল কমাউনরাজ শকাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত হইলে দিল্লী তাঁহার করায়ত্ত হয়। শকাদিত্য রাজা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। এক্ষণে প্রবাদ ও ফেরিস্তার কথিত দিলু ও পুরু এবং রাজাবলীর লিখিত রাজপাল ও শকাদিত্য অভিন্ন কি না, ইহাই বিবেচনার বিষয়। দিলু ও রাজপাল দিল্লীর রাজা এবং পুরু ও শকাদিত্য কমাউনের রাজা হওয়ায় তাঁহাদের অভিন্নতা প্রতিপাদন নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আবার কেহ কেহ রঘুবংশীয় রাজা শঙ্খধ্বজ কর্ত্তৃকও পাণ্ডুবংশীয় শেষ রাজা নীলাম্বপতির পরাজয় ও হত্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে শঙ্খধ্বজও বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।(৭) কিন্তু উক্ত-প্রবাদ এবং ফেরিস্তা ও রাজাবলী প্রভৃতির বর্ণনায় কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সে যাহা হউক যে সময়ে বিক্রমাদিত্য উত্তর ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন, তৎকালে যে দিল্লী বা ইন্দ্রপ্রস্থ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

---

king aided by the nobles having deposed him ascended the musnud. This prince, as famous for his justice as for his valour devoted his time to the good of his subjects, and built the city of Dehly. After having reigned only four years P'hoor a raja of Kumawn collecting a considerable force attacked Dehloo, took his prisoner, and sent him into confinement in the fort of Rohtas, himself usurping the empire. Raja P'hoor pushed on his conquests through Bung as far as the oceon and having collected a great army refused to pay tribute to the kings of Persia. The brahminical and other historians are agreed that P'hoor merched his army to the frontiers of India in order to oppose the progress of Alexander, on which occasion P'hoor lost his life in Battle after reigned seventy three years. (Briggs. Vol I ixxiii)

(7) গোয়ালিয়রে ভট্ট খড়্গরায় এইরূপ বলিয়া থাকেন;

বিক্রমাদিত্য কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতি হইয়াছিলেন। প্রাচ্য পণ্ডিতগণের মতে তিনি সম্বতের আরম্ভে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৫৬ বৎসরে, অথবা শকাব্দের আরম্ভে অর্থাৎ ৭৮ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। আবার কোন কোন মতে সম্বৎ প্রবর্ত্তক ও শকাব্দা-প্রবর্ত্তক দুইজন স্বতন্ত্র বিক্রমাদিত্য। তদ্ভিন্ন বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী অনেক রাজারও আবিষ্কার হইয়াছে। সুতরাং সেই সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। সে যাহা হউক, তাঁহাকে যদি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে অথবা উক্ত শতাব্দীতে ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রবাদানুসারে সে সময় হইতে দিল্লী রাজধানী গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়; কারণ, বিক্রমাদিত্য অবন্তী বা উজ্জয়িনীতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পর তুয়ার বা তোমর বংশের রাজত্বকালে দিল্লীতে পুনর্ব্বার রাজসিংহাসন স্থাপিত হয়। কিন্তু দিল্লীর লৌহস্তম্ভের লিপি আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, চন্দ্র নামে (৮) কোন পরাক্রান্ত নৃপতি বঙ্গ, সিন্ধু বাহ্লিক প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া উক্ত লৌহস্তম্ভকে বিষ্ণুধ্বজরূপে স্থাপিত করিয়াছিলেন। উক্ত চন্দ্ররাজের সময় নির্ণয় করা সুকঠিন। (৯) সে যাহাহউক, সে সময়ে দিল্লীর যে প্রসিদ্ধি ছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এক্ষণে আমরা তুয়ার বংশের কথা উল্লেখ করিতেছি।

এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে, ৭৯২ সম্বৎ বা ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজপুত তুয়ার বা তোমর বংশীয় রাজা বীনন দেব বা অনঙ্গ-

---

(৪) প্রিন্সেপ ইঁহাকে "ধব" বলিয়াছেন, কিন্তু লৌহস্তম্ভের প্রকৃত পাঠোদ্ধারে ইঁহার "চন্দ্র" নাম স্থির হইয়াছে।

(৯) প্রিন্সেপ স্তম্ভের অক্ষরকে গুপ্তবর্ণমালা স্থির করিয়া তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দী বলেন। কানিংহামও চতুর্থ শতাব্দী গুপ্তবংশের অবসান বলিতে চাহেন। কিন্তু গুপ্ত রাজগণের সময় নিসংশয় রূপে স্থির হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

পাল দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করেন। চাঁদভট্টের মতে তুয়ারগণ পাণ্ডু-বংশীয় ছিলেন। টড ইঁহাদিগকে যদুবংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজা বিক্রমাদিত্যও তুয়ারবংশে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। কিন্তু দিল্লী প্রতিষ্ঠাতা রাজা প্রথম অনঙ্গপাল হইতেই তুয়ার বংশের নাম সুপ্রসিদ্ধ হয়। তুয়ারবংশীয়গণ দিল্লীতে আধিপত্য বিস্তার করিলেও আজমীর ও সম্বরের চৌহানগণ উত্তর ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম নরপতিরূপে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। চৌহান বংশের বীর বীননদেব বা বেন্নদেব ধর্ম্মগজ উপাধি লাভ করিয়া মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিসন বা বিশালদেব হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। তদ্বংশধর বিগ্রহরাজ দিল্লীর অশোকস্তম্ভে সে কথা খোদিত করিয়াছেন। উক্তস্তম্ভে বিশাল শাকম্বরীন্দ্র নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। শাকম্বরী সম্বরহ্রদের প্রকৃত নাম, তথায় শাকম্ভরী দেবীর মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। শাকম্ভরী চৌহান বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিশালদেব আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ম্লেচ্ছদিগকে বিদূরিত করিয়াছিলেন বলিয়াও উক্তস্তম্ভে লিখিত আছে। উক্ত স্তম্ভলিপি অনুসারে বিগ্রহরাজের সময় ১২২০ সম্বৎ পর্য্যন্ত চৌহানগণ উত্তর ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম নরপতিরূপে বিদ্যমান ছিলেন। চাঁদভট্টের গ্রন্থেও রাজপুত নৃপতিগণের বিশল দেবের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করার বিষয় উল্লেখ আছে, এবং তুয়ারগণের কথা সুস্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে (১০) চাঁদভট্ট বিশল দেবকে ৯২১ সম্বৎ বা ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সময় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত ভেদ আছে। (১১)

---

(10) Tod's Rajasthan Vol II Boondi.

(11) টড দিল্লীর অশোকস্তম্ভের খোদিত লিপির ১২২০ সংবৎকে ১১৩০ পাঠ করিয়া ১০৬৬ হইতে ১১৩০ পর্য্যন্ত বিশাল দেবের সময় স্থির করিয়া থাকেন। স্যার উইলিয়ম জোন্স ১২২০ র পরিবর্ত্তে ১২৩০ পাঠ করেন। কোলব্রুক ১২২০ ই পাঠ করিয়াছেন। তিনি বিশাল দেব ও বিগ্রহ রাজকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিতে চাহেন। কানিংহাম ১২২০ সংবৎই বিশাল দেবের সময় স্থির

পিথৌরা গড় ।

Engraved & Printed by the Mohila Press, Calcutta

প্রথম অনঙ্গপালের পর দিল্লী বহুদিন পর্য্যন্ত তুয়ার বংশীয়গণের রাজধানী ছিল কি না বলা যায়না। কেহ কেহ মনে করেন যে, কনোজ ইহার পর তুয়ার বংশীয়গণের রাজধানী হইয়া উঠে। এবং তাহার পর অযোধ্যার ধারী নামক স্থানে তাঁহারা রাজধানী স্থাপন করেন। (১২) কিন্তু এ কথার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুলতান মামুদের ১০০৮ খৃষ্টাব্দের ভারত আক্রমণে উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালীঞ্জর, কনোজ, দিল্লী ও আজমীরের রাজগণ মিলিত হইয়া বাধা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। মামুদ ১০১১ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বর ও দিল্লী অধিকার করেন। দিল্লীরাজ তাঁহাকে বাধা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন।(১৩) ১০১৮ খৃষ্টাব্দে মামুদ কর্ত্তৃক কনোজ অধিকৃত হয়, সে সময়ে কুমার রায় কনোজের রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং দিল্লী ও কনোজ যে দুইটি সতন্ত্র রাজ্য ছিল তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। দিল্লী প্রতিষ্ঠিতা প্রথম অনঙ্গপালের পর তুয়ার বংশে জয়পাল নামে একজন রাজার কথা আইন আকবরী প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যশল্মীরের বিবরণেও ভট্টবংশীয় রাজা শালভান দিল্লীর তুয়াররাজ জয়পালের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। রাজা শালভান— শালভান নামে নাগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পঞ্জাব ও গজনী অধিকার করিয়াছিলেন।(১৪) জয়পালের পর তুয়ার বংশে রাজা

করেন। কিন্তু অশোক স্তম্ভের লিপিতে বিগ্রহ রাজকে সতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া বুঝায়। এবং তিনি বিশাল দেবের স্মৃতির জন্যই উক্ত স্তম্ভগাত্রে তাঁহার কীর্ত্তিগাথা খোদিত করিয়াছিলেন। ১২২০ সংবৎ বিশাল দেবের সময় বলিয়া অনুমিত হয়। টড চাঁদভট্টের ৯২১ সংবৎকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে চাহেন। যতদিন বিশাল দেবের সময় নিসংশয় রূপে স্থির না হইতেছে ততদিন আমরা উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে সাহসী হইতেছিনা।

(12) Cunninghams' (archaeological survey of India vol I)

(13) Briggs মামুদের দিল্লী অধিকারের কথা বলেন না কিন্তু Dow তাহা বলিয়াছেন। উভয়েই ফেরিস্তার অনুবাদ করিয়াছেন।

(14) Tod's Rajasthan vol II Jessulmeir.

কুমার পাল সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। কেহ কেহ বলেন খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কুমারপাল বিদ্যমান ছিলেন। এই সময়ে কনোজ রাঠোর বংশীয় চন্দ্রদেব কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় বলিয়া তাঁহারা অনুমান করিয়া থাকেন।(১৫) মাড়বারের বিবরণে কিন্তু সংবৎ ৫২৬ বা ৪৭০ খৃষ্টাব্দে রাঠোররাজ নয়নপাল কর্ত্তৃক কনোজ অধিকারের বিষয় লিখিত আছে। চন্দ্রনামে নয়নপালের এক পৌত্রের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার সহিত কনোজের কোন সম্বন্ধ ছিলনা। চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-কনোজের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক দিল্লী যে কিছুদিন তুয়ারবংশীয়দিগের রাজধানী রূপে বিদ্যমান ছিল না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের বিবেচনায় সুলতান মামুদের দিল্লী অধিকারের পর হইতে দ্বিতীয় অনঙ্গপালের দিল্লীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত উহা তুয়ার বংশীয়গণের রাজধানী রূপে পরিগণিত হয় নাই।

দিল্লীর লৌহস্তম্ভের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ১১০৯ সম্বৎ বা ১০৫২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় অনঙ্গপাল দিল্লীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কুতুবমিনারের নিকটস্থ লালকোট অনঙ্গপালের দুর্গের ভগ্নাবশেষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পৃথ্বীরাজের পিথৌড়া গড় নির্ম্মাণ অনঙ্গপালের স্থাপিত দুর্গের আয়তন বৃদ্ধি মাত্র। কুতুবমিনারের উত্তর পশ্চিম অনঙ্গতাল নামে বৃহৎ পুষ্করিণী দ্বিতীয় অনঙ্গপাল কর্ত্তৃকই নিখাত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অনেকপুরের নিকটস্থ সূর্য্যকুণ্ড অনঙ্গপালের পুত্র সূর্য্যপালের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু অনঙ্গপালের পুত্রগণের যে সকল নাম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে সূর্য্যপালের উল্লেখ দেখা যায় না। তেজপাল, ইন্দ্ররাজ, রঙ্গপাল, অচলরাজ, দ্রৌপদ ও শিশুপাল নামে অনঙ্গপালের এই কয় পুত্র বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় অনঙ্গপাল অত্যন্ত সুবিচারক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি প্রাসাদ দ্বারের নিকট দুইটি প্রস্তর নির্ম্মিত সিংহ স্থাপন করিয়া তাহাদের গলদেশে ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিতেন। বিচার প্রার্থীরা ঘণ্টাধ্বনি করিলে রাজা তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের বিচার মীমাংসা করিতেন। একদিন একটী কাক সিংহমস্তকে উপবেশন

(15) Cunningham.

করায় ঘণ্টাধ্বনি হয়। রাজা ধ্বনি শ্রবণে অবগত হন যে একটি কাক আগমন করিয়াছে তিনি তাহাকে আহারপ্রার্থী বুঝিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রদানে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। এইরূপ অনেক প্রবাদ দ্বিতীয় অনঙ্গপালের স্মৃতির সহিত বিজড়িত আছে।

দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পর তৃতীয় অনঙ্গপালের নামই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সময়ে চোহানবংশীয় সম্বর বা শাকম্ভরী নৃপতি বিগ্রহরাজ সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। তিনি ১২২০ সম্বতে অশোকস্তম্ভে বিশাল দেবের কীর্ত্তিকথা খোদিত করিয়া তাহাকে তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপে প্রসিদ্ধ করিয়া তুলেন; এবং উক্ত স্তম্ভে নিজেরও বিজয়বার্ত্তা লিপিবদ্ধ করেন। চোহান বংশীয় রাজা সোমেশ্বর তৃতীয় অনঙ্গপালের কন্যা রুক্মা বাইর পাণিগ্রহণ করেন। রুক্মা বাইর গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজের জন্ম হয়।(১৬) তৃতীয় অনঙ্গপাল নিঃসন্তান হওয়ায় পৃথ্বীরাজকে ১২২৬ সম্বৎ বা ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে দত্তক গ্রহণ করেন, সে সময়ে পৃথ্বীরাজের বয়স ১৬ বৎসর

(16) কানিংহাম বিজলির ১২২৬ সম্বতের শিলালিপির পৃথ্বীরাজকে সোমেশ্বর উপাধি ধারণ করার উল্লেখ দেখিয়া অনঙ্গপালের জামাতা সোমেশ্বরকে পৃথ্বীরাজ ও দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকে পিথৌরা বলিতে চাহেন। কিন্তু ঢড়ের লিখিত উক্ত শিলালিপি হইতে বুঝা যায় যে, উক্ত পৃথ্বীরাজ ইর্ণরাজের পৌত্র কুণ্ডপালের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন এবং তিনি সোমেশ্বর কর্ত্তৃক রাজকীয় মহিমা লাভ করায় সোমেশ্বর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম সোমেশ্বরই আজমীর ও সম্ভররাজ সার্ব্বভৌম নরপতি ও অনঙ্গপালের জামাতা। তাঁহার পৃথ্বীরাজ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। টড আবার হাঁসীর ১২২৪ সংবতের শিলালিপিকে সুপ্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজের শিলালিপি বলিতে চাহেন। উক্ত লিপির পৃথ্বীরাজ চন্দ্রবংশীয় এবং তাঁহার মাতুল কিরণ গিহ্লোট বংশীয় ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজ চোহান বংশীয়, তাঁহারা অগ্নি কুলোদ্ভব। তাঁহার মাতামহেরা তুয়ার বংশীয়। তাঁহার কোন মাতুল ছিলনা। ১২২৪ সংবতে তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক মাত্র ছিলেন। সুতরাং হাঁসীর লিখিত পৃথ্বীরাজ যে সতন্ত্র ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মাত্র ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। সোমেশ্বর সৌরাষ্ট্র ও গুজরাটের রাজার সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার পর পৃথ্বীরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম নরপতি হইয়া উঠেন। (১৭)

---

(17) নিম্নে তুয়ার ও চোহান রাজগণের বংশ তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

তুয়ার বংশ।

(আইন আকবরী)

(Twenty princes of the family of anungpaul reigned 437 years I month and 28 days.

	Ys.	ms	D
Anungpaul Tenore	18	0	0
Bassdeo	19	1	18
Gangoo	21	3	28
Peerthy Mull	19	6	19
Jydeo	20	7	28
Nirpaul	14	4	9
Adereh	26	7	11
Bitchraj	21	2	13
Beek	22	3	16
Reckpaul	21	6	5
Sook paul	20	4	4
Gopaul	18	3	15
Selekhen	25	10	2
Jypaul	16	4	13
Koonwerpaul	29	3	11
Anung paul	29	6	18
Bejsal	24	1	6
Mehetsal	25	2	23
Aksal	21	2	15
Peerthyraj	22	2	16

গোয়ালিয়রের পুথি

736—3

Anangpal
Vasu Deba
Gongya
Prithvi malla
Jayadeba
Nira or Hirapal
Ndiraj or Aderch
Nejaya or Vacha
Biksha or Auck
Ricksha pal
Sukh or Nek pal
Gopala
Soleakshana pal
Joya pal
Kemwaj pal
Ananga or Auck
Vijaya sat or pal
Mahapal or Mohipal
Akr pal (Akhpal) 1130—5
Prithvi Raja 1151—7

টড সমগ্র চোহান বংশের এইরূ
দিয়াছেন। (TOD Vol.

Chohan Genealogy
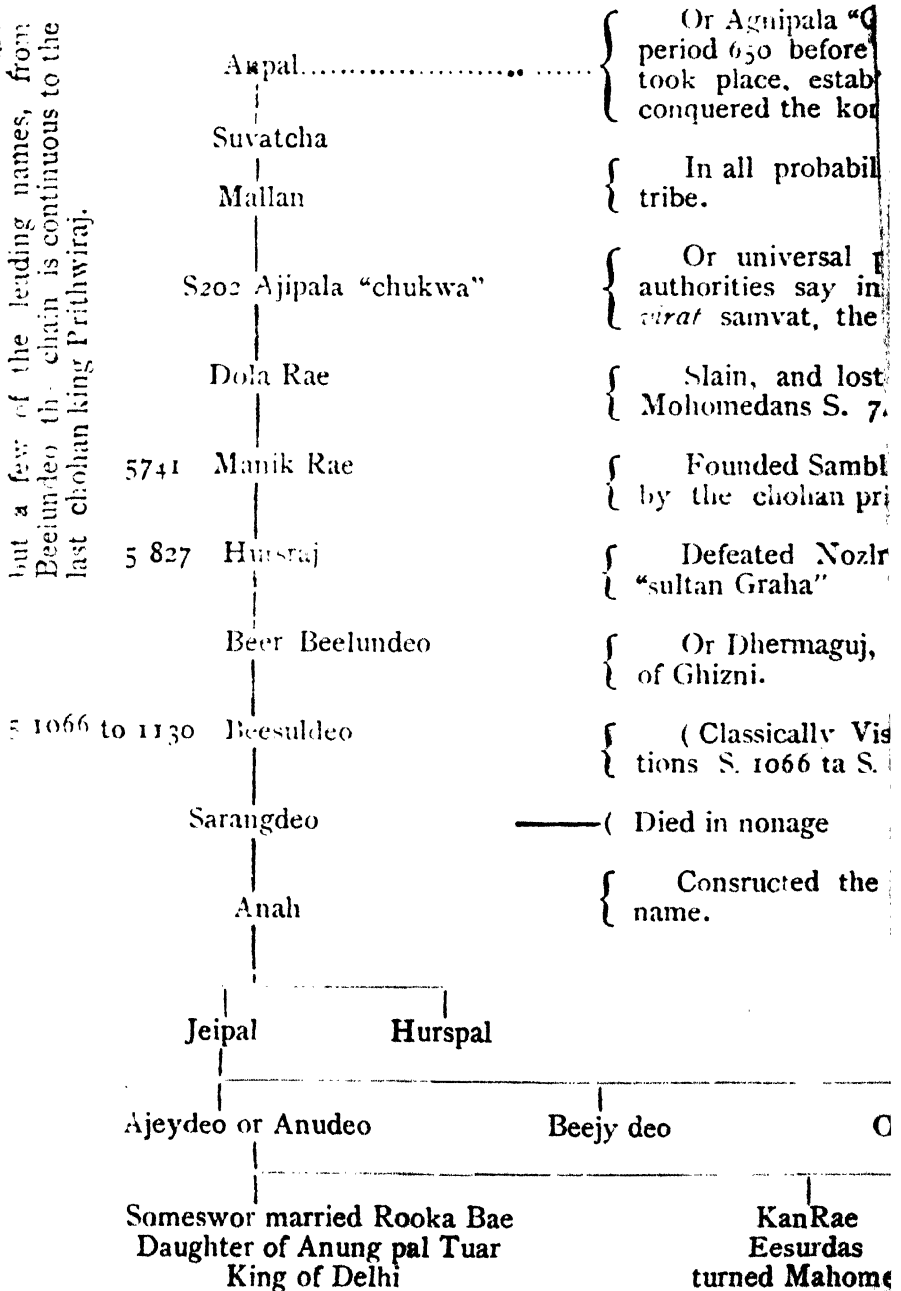
চোহান বংশ

Abul Fazl sayed ahmed	Gwalier Kumaen and Jushauemecr	y. m. a.	Prithvi Raj Rasa	Inscription
Bil Deo	Visala Deo	6 1 4	Visala deba	Visala Deva S 1220 or Ad 1163
Amara Gungn	Gangeva or Amaradeva	5 2 3		
Kehar Pal	Pahadi or Pada Deba	8 1 5		
Sumer	Samas or Sameraj	7 4 2	Someswora	Someswor S Ad
Jahir	Vehan De or Bala Deba	4 4 1		1224=1167 1229=1169
Nag Deo	Jaga deo or Jae	3 1 5		
Pithora or Prithvi Rai	garmangor	6 1 1		
	Prithvi Ray		Prithvi Ray	

বামাচরণ। *

বাবা ক্ষেপা কৃপা-সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। অর্থাৎ আত্মস্বরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী দেবী স্বয়ং প্রকাশ হইয়া বামার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় যতগুলি সিদ্ধ পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া দেশকে পবিত্র এবং জাতিকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকেই কৃপাসিদ্ধ। সাধু সন্ন্যাসিগণ বলিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালা কৃপাসিদ্ধির স্থান, এখানে মায়ের কৃপা অতি প্রবল। অতীত বহুজন্মের সঞ্চিত কর্ম্মফলেই কৃপা-সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। কৃপাসিদ্ধ পুরুষ মায়ের আদুরে ছেলে—আবদার করে, দুষ্টামী করে, জোর-জবরদস্তি করে। সংসারের আদুরে ছেলে মায়ের আঁচল ধরিয়া যে স্নেহের খেলা খেলিয়া থাকে, সাধন-জগতের কৃপা-সিদ্ধ পুরুষ ঠিক তেমনি খেলাই খেলিয়া থাকেন। রামপ্রসাদ কৃপাসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,

"ধন্য দারা, স্বপ্নে তারা,
প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত,
বৈমুখ আমারে?
জন্মে জন্মে বিকায়িছি,
ঐ রাঙ্গা পায়।
কহিবার কথা নয়,
কহন না যায়॥"

ইহা কৃপালিপ্সু সাধকেরই কথা। একটা মোটা কথা বলিব। তন্ত্র সাধনায় পুরুষকার ছাড়া অন্য কিছু নাই। তন্ত্র বলেন, আত্মাই সর্ব্বস্ব—সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বব্যাপী। সেই আত্মাই কুণ্ডলিনী রূপে আমার দেহ ভাণ্ডে অবস্থিত, তখন সেই আত্মশক্তির সাহায্যে আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে

* ইহার প্রতিকৃতি পৌষ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

পারি। তা যদি না পারিলাম ত সাধনা কিসের! তাই ভক্ত গান করিয়াছেন।

"যা আছে কপালে আমার,
তাই যদি মা ঘটিবে।
জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা বলে
কেন মা ডাকি তবে?
ব্রহ্মময়ী নাম ধর,
জীব সঞ্চারিতে পার,
বিধির বাদ উঠাতে নার,
এ ঠাট শিখিলে কবে?"

বিধি-নিয়তি-কর্ম্মফল, এ সকলই সিদ্ধ তান্ত্রিকের কাছে ব্রহ্মময়ীর ঠাট্টা-তামাসা-ব্যঙ্গ-মনুষ্যের সহিত উপহাস মাত্র। যে বন্ধনের মধ্যে থাকে, সে ব্রহ্মময়ীর রঙ্গের ক্রীড়নক হইয়া থাকে। যে সাধনায় সিদ্ধ, সে কর্ম্মফলকে ক্রীড়ার কন্দুকের মত পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দেয়। কৃপাসিদ্ধ পুরুষ মাতৃ-ক্রোড়ের শিশু—মায়ের রোজগেরে তৈয়ারী ছেলে নহে। যে ছেলে মানুষ হইয়াছে, সে ছেলের আনুকূল্য জননীকে করিতেই হয়, সে ছেলেকে একটু সম্ভ্রম করিয়া চলিতেই হয়। আবার যিনি কোলের ছেলে, তাহার আবদার মাকে সহিতেই হয়। কৃপাসিদ্ধ পুরুষ মায়ের কোলের ছেলে-মা-ময় হয় নাই, শিবোহহম্ বলিবার অধিকারী হয় নাই, পরন্তু মাতৃদর্শন হইয়াছে, মাতৃ অনুভূতি হইয়াছে। তাই আদর আবদারের জোরে মায়ের নিকট হইতে ঈপ্সিত লাভ করিতে পারে।

বামাচরণ কৃপাসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, মায়ের কোলের ছেলে ছিলেন। তিনি একজন প্রচণ্ড জাপক ছিলেন। জপে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে মায়ের কৃপায় বঞ্চিত থাকা যায় না। সে কৃপা বামাচরণ পাইয়াছিলেন। তিনি মাতৃকথা ছাড়া অন্য কথা কহিতেন না, অন্য প্রসঙ্গ তিনি জানিতেন না; মায়ের মন্দির ছাড়া অন্যত্র বাস করিতেন না। তাঁহার রাগ, মান, অভিমান আব্দার আখট-জীব জীবনের সকল সাধ মায়ের সহিত হইত। দেখিতে তিনি দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা ভীম ভৈরব

ভাব মাখান থাকিত। পরন্তু তাঁহার মুখখানির দিকে তাকাইয়া দেখিলে মনে হইত যেন কোমলতার আধার, স্নেহের ও সারল্যের ছবি ফুটিয়া রহিয়াছে,—যেন একটি পাঁচ বছরের ছেলের মুখ প্রৌঢ়ের দেহের উপর বসান রহিয়াছে। কৃপাসিদ্ধির ইহাই লক্ষণ।

বামাচরণ নাদসিদ্ধ ছিলেন। যখন তার-তারা বলিয়া প্লুত স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিতেন, তখন তারাপুরের সে বিশাল মাঠ যেন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। তেমন ডাক আমরা আর কখনও শুনি নাই; যেন অনাহতকে ভেদ করিয়া রব উঠিতেছে। আর ডাকের সঙ্গে দুই নয়নে বারিধারা বহিত;—ভাবে, ভক্তিতে, আদরে, অভিমানে গলিয়া যেন পঞ্চপ্রাণ উছলিয়া উথলিয়া দুই নয়নের কোণ দিয়া বাহির হইত। বামাচরণের যখন ভাবের বেগ আসিত, তখন বিভোর হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিত,—সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা ফুটিয়া যাইত, শ্মশানের হাড় ফুটিয়া যাইত, সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্তের ধারা ছুটিয়া বাহির হইত—বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বামা মাকে ডাকিত। ইহাও কৃপাসিদ্ধির আর একটা লক্ষণ। এ সকল কথাও আর বুঝাইবার উপায় নাই; কেন না, তন্ত্রসাধনা পদ্ধতি দেশ হইতে একরূপ লোপ পাইয়াছে। উহার গোড়ার কথা গুলিই ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ তেমন জানে না। ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালার বহুগ্রামে এক একজন সিদ্ধপুরুষ—তন্ত্র সাধক ছিলেন। আমরা কিশোরে এবং প্রথম যৌবনে যে সকল সিদ্ধ সাধক দেখিয়াছি, এখন আর তাহাদের মত একজনকেও দেখিতে পাই না। তাহার উপর তন্ত্র সাধনার সামগ্রী,—করিয়া কর্ম্মিয়া দেখ, হাতে হাতে ফল পাইবে। উহার কতকটা আস্বাদ না পাইলে, উহার সিদ্ধান্তের অনেক কথা বুঝা যায় না, বুঝান যায় না। তবে বামাচরণকে অনেকে দেখিয়াছেন, তাহার সঙ্গ অনেকে করিয়াছেন, তাই তাহাকে ধরিয়া গোটাকয়েক কথা বলিয়া রাখিতে হই-তেছে। ইংরেজি শিখিয়া আমাদের বুদ্ধির যে প্রকারের মাপকাটি হইয়াছে, সে মাপকাটির সাহায্যে তান্ত্রিক সাধককে মাপিয়া দেখিলে থৈ পাওয়া যাইবে না, বিস্ময়ে বিহ্বল হইতে হইবে। তান্ত্রিক সাধক জাতিস্মর হয়; কেবল নিজের পূর্ব্ব-জন্মের কথা জানিতে পারেনা, ইচ্ছা করিলে অন্যেরও পূর্ব্বজন্মের কথা জানিতে পারে। আমি বামার কথা অনুসারে গোটা দুই

জাতিস্মারক বিবরণ পরখ করিয়া দেখিয়াছি। এ সব কথা বলিলে গাল্-গল্প বলা হয়; এবং এসব কথা প্রকাশ করিতেও নিষেধ আছে। কাজেই বলিতে হয় যে, তান্ত্রিক সাধকের সাহচর্য্য যিনি করেন নাই, হাতে হাতে তন্ত্র সিদ্ধির ফল যিনি লাভ করেন নাই, তাঁহার কাছে বামার মতন সাধকের কথা কহিতে নাই।

বাঙ্গালায় ও কামরূপে তিন চারিটা বাশিষ্ঠ পীঠ আছে। এই সকল পীঠে জপ-সিদ্ধি উৎকট সাধনাসাপেক্ষ। বামাচরণ তারাপুরের বাশিষ্ঠ পীঠে জপসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাই মায়ের কৃপা করামলকবৎ তিনি মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সে কৃপার প্রভাবও অপূর্ব্ব ছিল। কৃপাসিদ্ধ পুরুষ মায়ের আহ্বানে মাতৃধামে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা মূঢ়তাবশতঃ সে কৃপার কোন সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম না। সমাজে তন্ত্রের প্রাবল্য থাকিলে হয় ত এ কৃপায় লাভ হইত; হয় ত বা বহু গুপ্ত সাধক বামের সাহায্যে প্রশস্ত পথ দেখিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সে সকলই প্রচ্ছন্ন রহিয়া গেল, সমাজের কল্যাণের জন্য প্রযুক্ত হইল না। বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা নহে, তাই এমন ঘটিতেছে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধুর মিলন।

১

ধীরে চল প্রিয়তমে সংসারের পথ হায়
বড়ই দুর্গম,
দুইটী কোমল-করে ধর এ আশ্রয়-তরু
ত্যজিয়া সরম ;
চাহিও না কোন-দিকে চলহ সম্মুখস্থিত
পথে ধীরে ধীরে,
—হিংসা দ্বেষ পরিহরি রঞ্জিয়া হৃদয়-তল
আনন্দ আবীরে !

২

আমাদের হৃদিবনে বিরাজিবে ঋতুরাজ
বিচ্ছেদ-বিহীন,
বহিবে বসন্ত বায়ু চুমিয়া চামেলী-কলি
গোলাপ নবীন ;
রজত কৌমুদীজালে যাইবে ভাসিয়া এই
দরিদ্র কুটীর,
আমাদের মুগ্ধমনে বাজিবে সে শেষতান
প্রণয় গীতির !

৩

লুকাইয়া কণ্ঠে বীণা, পাপিয়া ডাকিবে শুধু
থাকিয়া থাকিয়া,

কোকিল গাইবে শুধু অখিল সংসার ভরি,
সুধা বরষিয়া ;
ভ্রমর ভ্রমিবে শুধু নিন্দিয়া মধুর ধ্বনি
—নূপুর নিক্কণ,
কুসুম ফুটিবে শুধু সৌরভ সম্পদে তুষি,
দম্পতির মন !

৪

এ জীবন-নাটকের কেবল প্রথম অঙ্ক
আরম্ভ এখন,
কতই গর্ভাঙ্ক হায় ভবিষ্যৎ-পট-পিছে
রয়েছে চেতন ;
কত হাসি কাতরতা কত সুখ ব্যাকুলতা
আছে এর পরে,
সে সব স্মরিয়া হায় রে'খনা মলিন-রেখা
নির্ম্মল অন্তরে !

৫

এ সংসার হবে শুধু আমাদের রঙ্গভূমি
ক্রীড়ার প্রাঙ্গণ,
দুখী-দুখে অভিনীত হইবে করুণ রস
সুন্দর কেমন ;
দুষ্টের চরিত্র হেরি' বীর রৌদ্রে দু'টী হিয়া
হবে বহ্নিময়,
সাধুর সাধুত্ব হেরি' শান্তি রসে চল চল
করিবে হৃদয় !

আমরা সবারি হব   সকলের কাছে যাব

—হাসি মুখ নিয়ে,

দারিদ্র্যের খর-তাপ   ক্ষুদ্র শত দুঃখ শোক

হৃদয়ে চাপিয়ে ;

আমরা চুম্বক-সম   নিখিলের লৌহ-প্রাণ

করি' আকর্ষণ,

হিংসা-দ্বেষ-জর্জ্জরিত   জগতে দেখাব কিবা

মধুর মিলন !

শ্রীকামিনীকান্ত নিয়োগী।

শ্রীগুরবে নমঃ।

১ম খণ্ড। | ফাল্গুন ১৩২০ | ১১শ সংখ্যা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

লেখকগণের নাম।

শ্রীগুরুদাস সান্যাল, শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্রেয়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিরঞ্জন সান্যাল, শ্রীমতী সুশীলা দেবী ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা শাশ্বতীর মূল্য প্রদান না করিয়াছেন, চৈত্র সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভি পিতে পাঠান হইবে। তবে কেহ অন্য মাসে ভি, পি করিতে বলিলে আমরা তাহাও করিতে পারি। গ্রাহকগণের কোন পত্র না পাইলে চৈত্র মাসেই ভি পি করিব। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

নিয়মাবলী।

—:•:—

সাহিত্যে দেশীয় ভাববিকাশই শাশ্বতীর উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কোন লেখক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে পারেন। নবীন লেখকগণের প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

শাশ্বতীর জন্য প্রবন্ধাদি ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা কড়ি এবং চিঠি পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এথোড়া পোঃ ভায়া সীতারামপুর ই, আই, রেলওয়ে ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

এথোড়া (Ethora) পোঃ
ভায়া সীতারামপুর,
ই, আই, রেলওয়ে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

———

প্রার্থনা।

মুখে দাও সুধা ভাষা,
বুকে করমের আশা,
তুষিতে বিশ্বেরে প্রাণে মনে।
দাও ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষা,
প্রেমমন্ত্রে দাও দীক্ষা,
কাঁদিতে আতুর দুঃখী সনে।
পুষ্প বীথিকার সম,
এ দীন জীবন মম,
কর দেব সুরভি মধুর।
ঊষর মরুভূ প্রাণে,
তোমার আশীষ দানে,
হোক্ দেব! রসের অঙ্কুর।
হিংসা দ্বেষ লোভ মোহ
পর-পীড়া আত্ম-দ্রোহ,
যাক্ দূরে আবর্জ্জনা সম।
তোমার মোহন হাসি,
কুসুম সুষমা-রাশি,
নাচুক মুদিত, তৃণাঞ্চল।

শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্রেয়।

সমাজ-চিন্তা।

(২)

কোথায় গেলে আর্য্য-পথ মিলিবে, তাহা স্থির করিতে হইলে কি কারণে সে পথ নষ্ট হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব হইতে জানা আবশ্যক; কেন না, নাশের কারণ জানিতে না পারিলে সংস্কারকার্য্যে বাধা পড়িতে পারে, সংস্কার অসম্পূর্ণ, অশোভন হইতে পারে। কিন্তু তাহা জানিবার উপায় নাই, আমাদের সামাজিক ইতিহাস নাই। যে সকল খণ্ডাংশ ইতিহাস বলিয়া আমাদের হাতে আসিয়া পড়ে, সে গুলির রচয়িতৃগণ একাধারে কবি ও ঐতিহাসিক। তাঁহাদের অধিকাংশ ঐতিহাসিকের পরিচ্ছদে খাঁটি কবি। বৌদ্ধযুগের আমল হইতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গসমাজের যে সকল ঐতিহাসিক খণ্ড-চিত্র দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই লেখকগণের কল্পনা-নৈপুণ্য ও অতি-স্বদেশী ভাবের পরিচায়ক; এমন কি অনেক সময়ে পাঠ শেষ করিয়া হতাশ্বাস হইতে হয়। এক্ষেত্রে কার্য্যকারণের নিরূপণ অতি কঠিন। তবে পরবর্ত্তী কালের সামাজিক ইতিহাস স্পষ্ট ও সজীব। একালের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, দম্ভ, লোভ, অর্থ ও যশোলিপ্সা, অন্তরে অন্তরে নাশ-চিকীর্ষা, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনপন্থার অনুপযোগিতা একত্র হইয়া বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিয়াছে। এই সকল প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষকে বাঙ্গলা দেশেই নেতৃত্ব করিতে দেখা যায়, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের সমাজে ইঁহাদের মত মানুষের নেতৃত্ব করিবার অধিকার ছিল না, এখনও নাই। ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে New Learning নামে ইতিহাসে পরিচিত গ্রীক সাহিত্যবিজ্ঞানের চর্চ্চা যখন ইউরোপের ইটালি জর্ম্মানি প্রভৃতি দেশ হইতে মধ্যযুগের অন্ধকার দূর করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া জ্ঞানের বাতি জ্বালে, তখন,—ইংরাজী বিদ্যা ভারতে আসিয়া যতদূর যুগপ্রলয় ঘটাইয়াছে, তাহা অপেক্ষা সেদেশে অনেক অধিক পরিমাণে প্রলয়কাণ্ড ঘটাইয়াছিল। সে সময়ে ইউরোপের Renaissance বা নবজাগরণ। সেই মহাপ্রলয়ের

ফলে আমরা বর্ত্তমান সভ্য ইংরাজকে পাইয়াছি। ইংলণ্ডে সেই নবজাগরণের প্রথম অবস্থায় Erasmus, Sir Thomas More প্রভৃতি সংস্কারকগণ তীক্ষ দৃষ্টির বলে বুঝিয়া ফেলিলেন যে, গোড়া হইতে ধর্ম্মের বহিরঙ্গগুলির উপর করাত চালাইলে সমাজে বিষম অনর্থ ঘটিবে; তাহা না করিয়া বরং পুরুষ-পরম্পরাগত যে সকল পাপ, অজ্ঞতা বা কদাচার সমাজদেহকে চিররুগ্ন করিয়া রাখিয়াছে, সে গুলাকে অল্পে অল্পে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করা যাউক,—পঙ্গুকে রোগমুক্ত করিয়া পরে অশ্বারোহণে যোগ্য করিবার চেষ্টা করা হউক। সেরূপ করিলে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চরিত্র আচার প্রভৃতি সুসংস্কৃত হইয়া উঠিবে, এবং ধর্ম্মের আগাছা গুলা আপনা হইতেই মরিয়া যাইবে, কাঁচা ডালে করাত বসাইবার প্রয়োজন নাই। রক্ষণ ও সংস্কার এ দুয়ের সামঞ্জস্য-সাধনায় ইংরাজ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাই ইংলণ্ডে এই নবজাগরণের প্রথম অবস্থায় সমাজসংস্কারকগণ যেরূপ সাবধানে সমাজ-অঙ্গে হস্তার্পণ করেন, তাহা বুঝাইবার জন্য ঐতিহাসিক গ্রীণের কথাগুলি উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"It is plain that the men of the New Learning looked forward, not to a reform of doctrine, but to a reform of life, not to a revolution which should sweep away the older superstitions which they despised, but to a regeneration of spiritual feeling before which they would inevitably vanish."

ইহার ভাবার্থ পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাঙ্গলার অদৃষ্টদোষে ইংরাজিশিক্ষা-বিস্তারের প্রথম অবস্থায় বাঙ্গালী ইংরাজ-দত্ত সংস্কারমন্ত্রের ঠিক বিপরীত অর্থ করিয়া ব্যাপারটা একবারে উল্টা বুঝিয়া ফেলিল। বলিতে কি, রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত সেকালে আর কোনও সংস্কারক সমাজের মূলতত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, বা চেষ্টা করেন নাই। তখন আদি ব্রাহ্মসমাজ একপ্রকার হিন্দুসমাজই ছিল। ঠাকুরবাড়ী হইতে দুর্গোৎসব উঠিয়া গেলেও তৎকালীন প্রাচীনা মহিলাদের জন্য,—অর্থাৎ যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই অথচ এক পরিবারভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের

জন্ত,—বিজয়ার দিনে পূজার দালানে আদি সমাজের বিখ্যাত গায়ক 'বিষ্ণু' বাবু বিজয়াগীতি শুনাইতেন, এরূপ কথা সেকালে শুনা যাইত। তখন ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীতে বাৎসরিক কালীপূজা হইত; আদিসমাজের সহিত হিন্দুসমাজের যৌন সম্বন্ধ বিছিন্ন হয় নাই, আহারাদিও চলিত। কিন্তু বাঙ্গালীর অদৃষ্টদোষে বজায় রাখিয়া সংস্কারে বাধা পড়িল। অন্ধ চক্ষুতে চসমা পরিয়া, ইউরোপীয় সংস্কার-বিপ্লবের ইতিহাস পড়িয়া বাঙ্গালীর মাথা গরম হইয়া গেল। যে উপনেত্র দৃষ্টির সহায়তা করে, অস্পষ্ট স্থান স্পষ্ট করিয়া দেখায়, সে উপনেত্র অকালে ধারণ করিলে চক্ষুর অপকার করে। এক্ষেত্রে তাহাই হইল। শিক্ষিত বাঙ্গালী রসাশ্রিত বায়ুগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ প্রকাশ্যে, অপরে গোপনে আচার-বর্জ্জিত হইয়া উঠিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে নীতিচর্চ্চা কিয়ৎ পরিমাণে হইতে লাগিল বটে, কিন্তু যাঁহারা হিন্দু থাকিয়া গেলেন (এবং তাঁহারাই প্রায় সব), তাঁহারা আচার ও নীতিকে প্রায় তুলা-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, এবং বোধ হয় সেই জন্যই অনেকে অচিরে ধনবান্ হইয়া Gnostic হিন্দুরূপ ধারণ করিলেন। সে সময়ে ব্রাহ্মনাম গৌরবার্থে ব্যবহৃত হইত, প্রমাণ,—লীলাবতী, প্রমাণ,—সধবার একাদশী। তখন ধর্ম্মকথা শুনিতে হইলে ব্রাহ্মসমাজে বা সময়বিশেষে টাউনহলে গিয়া মনের সাধ মিটাইতে হইত। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও ইংরাজি-শিক্ষিতের মধ্যে ভাববিনিময়ের নিতান্ত অভাব হইয়া উঠিয়াছিল। পূজাবাড়ীতে 'বাবু' সবান্ধবে Bacchus দেবের অর্চ্চনায় ব্যস্ত থাকিতেন। পূজার দালানে পুরোহিত, তন্ত্রধারক, আর সরকার বা গমস্তা মহাশয়, এই পর্য্যন্ত; বাকি সব বৈঠকখানায় যথায় বাইজি হ্লাদিনীরূপে চতুর্ব্যূহসহ—অর্থাৎ সারঙ্গীয়, তবলজি এবং মন্দিরাদারসহ—নিমন্ত্রিতগণের নিমন্ত্রণ রক্ষা সার্থক করিতেন।

সৌভাগ্যক্রমে কিছুকাল পরে মাদাম ব্লাভাস্কি কলিকাতায় আসিয়া গভীর নিশীথে সুষুপ্ত হিন্দুর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বংশীধ্বনি করিলেন। দুই একটীর নিদ্রাভঙ্গ হইল মাত্র, অবশিষ্ট লোক নৈশ অন্ধকারে পূর্ব্ববৎ প্রসুপ্ত, আড়ষ্ট, নিশ্চেষ্ট। ঐতিহাসিক যুগে শিক্ষিত হিন্দুর হৃদয়ে এরূপ ধর্ম্মাভাব কখনও হইয়াছিল কি না সন্দেহ। আর বলিয়া রাখি, যদি কখনও বাঙ্গলার সামাজিক

ইতিহাস লিখিত হয়, তাহাহইলে ঐ রুষরমণীর নাম যেন তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হয়; কেননা, সেই ধর্ম্মরাজ্যে অরাজকতার কালে ঐ রমণীর বংশীরবে অনেকের হৃদয়ে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য যে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃজন করে, তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। এদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী তখন বিশ্রাম-সুখরত; বঙ্কিমবাবু প্রতাপ, লবঙ্গলতা প্রভৃতির চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত, তথাপি 'রামচন্দ্র' নামে ষ্টেটস্‌ম্যানের স্তম্ভে আবির্ভূত হইয়া অধ্যাপক হেষ্টির বড় বড় কামান গুলাকে নীরব ও নিষ্ক্রিয় করিয়া কতকটা মুখরক্ষা করিয়াছিলেন। মোটের উপর তখন সমাজদেহের একরূপ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইয়াছিল। যতদূর স্মরণ পড়ে, তাহাতে বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, কেবল একটীমাত্র ব্রাহ্মণকুল-তিলক পুরুষ-শার্দ্দূল শিক্ষিত সমাজের ঈদৃশ ধর্ম্মাভাব দেখিয়া দুঃখে, ক্ষোভে বদ্ধব্যাঘ্রের ন্যায় হুঙ্কার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন;—বদ্ধব্যাঘ্রের ন্যায় কেননা, সে শোচনীয় অবস্থার প্রতীকার করিতে যে অমোঘ ঔষধের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ভাণ্ডারে ছিল না; যাহা ছিল তাহা তীব্র মুষ্টিযোগ মাত্র, এবং সামান্য হইলেও উহা অতি যোগ্যতার সহিত ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই পুরুষশার্দ্দূল আর কেহ নহেন, ইন্দ্রনাথ।

কিন্তু দেবতা আছেন। অঘটন ঘটাইতে কেবল তিনিই। তাই ইহার অল্পকাল পূর্ব্বেই সেই নৈশ অন্ধকার দূর করিতে দক্ষিণেশ্বরের দেব-মন্দির হইতে দেবতার প্রিয়পুত্র শতরাকাচন্দ্ররূপী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব উদিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটী নিদাঘে দ্বিতীয় মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডরূপী মহাপুরুষ কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া, পঞ্চাশ বৎসরে পরিপুষ্ট বাঙ্গালীর সাধের অ-হিন্দু হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিলেন। ইনি আর কেহ নহেন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়। একদিক হইতে পরমহংস দেবের তান-লয়-বিশুদ্ধ মাতৃকাসরস্বতীদত্ত বীণার ঝঙ্কার, অন্যদিক হইতে চূড়ামণি মহাশয়কৃত অবশ-অশান্ত-বিচলচ্চিত্তে যুগপৎ ক্ষোভ-কল্যাণকর তীব্রমধুর তূর্য্যনিনাদ, সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনাথবাবুর প্রতোদপরিচালন। ইহার ফলে বাজারে কোশাকুশী, কুশাসন দুর্মূল্য হইয়া উঠিল, একাদশীর দিনে মুদী আটা ময়দা যোগাইতে হিমসিম খাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং গ্রন্থপ্রকাশকদের মধ্যে কেহ কেহ সুযোগ পাইয়া একদিক হইতে ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞান,

সমাজনীতি, রাজশাসন প্রভৃতির নিন্দাবাদে অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত লোক-দিগের মস্তিষ্ক উত্তেজিত করিয়া সমাজের কল্যাণসাধন ও তৎসহ প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীর মাথাটা পূর্ব্বে রসে গরম হইয়া পড়িয়াছিল, এখন হইতে আবার কষে গরম হইয়া উঠিল। এই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে কেবল বঙ্কিমবাবু একটু অন্যমনা হইলেন,—'প্রচারে' ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার কালীন এমন একটা কথা ফুট নোটে লিখিয়া ফেলিলেন, যাহার কৈফিয়ৎ তিনি দিয়া যান নাই বটে, কিন্তু কালে কথাটার একটা দিক বেশ ফলিয়াছে. অন্যদিকটা তাদৃশ ফলে নাই, বা ফলিবে না। কিন্তু তখন 'নবজীবনে' অক্ষয়বাবু প্রাণ খুলিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার ভাবটা আজিও মনে আছে।

যখনকার কথা বলিতেছি, তাহার প্রায় দশবৎসর পরে, একদা একটা নির্জ্জনস্থানে, গভীর নিশীথে, দেশের ধর্ম্মনৈতিক দুরবস্থার আলোচনা-প্রসঙ্গে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মুখ হইতে গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত হঠাৎ এমন একটা কথা নির্গত হইল, যাহাতে মনটা বিচলিত হইয়া পড়িল। কথাটার ভাবার্থ এই ;—'পৃথিবীতে ধর্ম্মসম্বন্ধে মানুষ যত ভ্রমে পড়িয়াছে, অন্য বিষয়ে তত নহে, আবার হিন্দুজাতি এ বিষয়ে যত ভ্রমে পড়িয়াছে, অন্য জাতি তত পড়ে নাই। তুমি দেখিও, দেশের লোক উত্তরোত্তর যেরূপ উন্মার্গগামী হইতেছে, তাহাতে অচিরে এদেশে লোকক্ষয়কারী একটা নূতন ব্যাধি আসিয়া বিস্তর লোক নাশ করিবে।' বলিয়া রাখা ভাল, ইহার অল্পকাল পরেই বম্বেতে বিউবনিক প্লেগ দেখা দিয়াছিল।

ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস অতি সংক্ষেপে সূচিত হইল মাত্র। এখন নিবেদন এই যে, কেহ যেন না বুঝেন যে, গড়া হইয়াছে বা হইতেছে। গড়া হইত যদি সেই তুমুল আন্দোলনের সময় হইতে সুযোগ পাইয়া স্বামীজি-পরম-হংসপ্রভুপাদ-সিদ্ধতান্ত্রিক-অবধূত-ব্রহ্মচারী প্রভৃতি যুগে যুগে বিচরণ করিয়া দেশের মধ্যে এত অত্যধিক সাধুসঙ্ঘ গড়িয়া, ঈশ্বর-প্রণিধান ব্যাপারকে একটা সখের জিনিষ বুঝিয়া ও বুঝাইয়া, বঙ্কিমবাবুর ভবিষ্যৎ বাণীর কথঞ্চিৎ সফলতা সম্পাদন না করিতেন। বাঙ্গালীকে একটু কম করিয়া রস খাইতে, এবং তৎসঙ্গে কিছু কিছু কষ খাইতে ধরিয়াছিলেন মাত্র,

ইহা ছাড়া তর্কচূড়ামণি মহাশয়কৃত আর কোনও গুরুতর অপরাধের কথা আমাদের স্মরণ হয় না। কিন্তু এটুকুও সহিল না। গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ হিন্দুত্বের দোহাই দিয়া, আমাদের মধ্যে আবার যেরূপ রসের বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বড়ই আশঙ্কা হয়, পৃথিবীর মধ্যে দুই কোটি মাত্রাবশিষ্ট তীরুধী বাঙ্গালী হিন্দু, বুঝি বা সংখ্যায় আরও নামিয়া ১৯২০ সালে (গুণবান্ আমাদের মনে যত হউক না হউক), গবর্ণমেণ্টের মনে ভীতি উৎপাদন করে। Doctrine of Fortitude বা কঠোর নিয়মপালনধর্ম্ম না মানিলে, না সাধিলে কখনই দরিদ্রতা ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে নিস্তার প্রাপ্তির উপায় নাই, একথা ইউরোপের বর্ত্তমান যুগে Stoicism বলিয়া উপেক্ষিত বা উপহসিত হইলেও কথাটা খুব খাঁটি কথা। আমরা না বুঝিয়া যে ইংরাজের ভোগৈশ্বর্য্য অপবাদ দিয়া স্বদেশীর অভিমান করিয়া থাকি, সেই ইংরাজের ইতিহাসেই আমরা দেখিতে পাই যে, Puritanismই ইংরাজকে এত বড় করিয়া তুলিবার প্রধান কারণ। একথা পরে আলোচিত হইবে, এখন গড়ার কথা বলিব।

অবস্থা শোচনীয় হইলেও আমাদের একটা আশার স্থল আছে। বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ইহার অপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। যখন বৌদ্ধযুগ গতপ্রায়, হিন্দু আবার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় উদ্যত, তখন হিন্দু যে পথে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল, এখন যদি আবার সেই পথ আশ্রয় করে, তাহা হইলে ভাঙ্গা সমাজ যুড়িতে পারে, সমষ্টি-শক্তির বিকাশ, প্রসার, বিসর্পণ হইতে পারে, Cohesiveness of Force জন্মাইয়া ধ্বংস নিবারিত হইতে পারে। সে পথ বেদের পথ নয়, বেদ এখন বীর্য্যহীন বিষহীন সর্পবৎ, কেননা হিন্দুর এখন সে সামর্থ্য নাই, কখনও হইবে এমন আশা নাই। সে পথ স্মৃতির পথ নয়। স্মৃতি পুণ্য, শুদ্ধি, স্বাস্থ্য, যশ প্রভৃতি দিতে পারেন, তাহার অধিক দিতে হইলে তাঁহাকে শ্রুতির নিকট হইতে কর্জ্জ করিতে হইবে। আর দেশে যেরূপ উন্মার্গ প্রসারিত হইয়াছে, তাহাতে স্মৃতির নাম শুনিলে লোক সন্ত্রাসিত হইয়া দশহাত দূরে সরিয়া পড়িবে।

সে পথ তন্ত্রের পথ। তন্ত্রই একালের আর্য্য পথ।

তন্ত্র বেদোদ্ভূত, অতএব 'মতং শ্রীবাসুদেবস্য'। তন্ত্র আচারপূত ব্যক্তির জন্য ত বটেই, অপিচ, আচারবর্জ্জিত লোকের পক্ষে তন্ত্রই একমাত্র গতি।

তন্ত্রবক্তার প্রতিজ্ঞা এই যে, তিনি মুখ্যতঃ নিম্নবর্ণিত লোকদিগের জন্য তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন।—

দেব্যুবাচ। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কথমত্রাধিকারিতা।
বেদব্রতবিহীনানাং ব্রাত্যাদীনাং কৃতাগসাং॥
তথৈবাম্নুপনীতানাং স্ত্রীশূদ্রাণাং ভবেচ্ছিব।
কথমেতে মহাদেব মুক্তিং গচ্ছন্ত্যনুত্তমাং।
ন বিনা ব্রাহ্মণং মুচোচ্ছেহবন্ধাদিতি শ্রুতিঃ॥ গন্ধর্ব্বতন্ত্র।

ভগবান বিষ্ণুও ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যথা ;—

ভগবানুবাচ। ইমে দুর্ম্মতয়ঃ সর্ব্বে বেদাচারবহিষ্কৃতাঃ।
অন্যায়মৈথুনে সক্তাঃ সুরাপানপরায়ণাঃ॥
আত্মজ্ঞানবিহীনানাং যোগাভ্যাসাবহেলিনাং।
কথমেষাং ভবেন্মুক্তি স্তদুপায়ং বদ প্রভো।
শূদ্রাদীনাং কথং দেব দীক্ষায়ামধিকারিতা॥ গন্ধর্ব্বতন্ত্র।

বৌদ্ধযুগের অবসানে হিন্দুসমাজের ইহা একটী সুন্দর চিত্র। ইহার ভিতরে যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্নভাবে নিবদ্ধ আছে। যাহা হউক, দেবীর ও বিষ্ণুর প্রশ্নের উত্তর দান মানুষের সাধ্য নহে, কারণ তখন সমাজদেহে যদি প্রাণ থাকিত, তাহা হইলে মনু, পরাশর প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষগণের সবিশেষ চেষ্টায় ফল হইতে পারিত। কিন্তু সমাজে তখন স্পন্দন ছিল বলিয়া বোধ হয় না, এবং সেই জন্যই ভূতনাথের পুনঃ সৃষ্টির সঙ্কল্প হইয়া থাকিবে। আর এক কথা এই যে, মানুষ তেলা মাথায় তৈল দিতে পারে। শমদমাদিসাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন জিজ্ঞাসুকে যোগজ্ঞান, আত্মানাত্মবিবেক দিতে মানুষ পারিয়াছে, পারিবেও; কিন্তু, যে রোগ চিকিৎসার অতীত, তাহার চিকিৎসা করিতে মৃত্যুঞ্জয় ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই। বাঙ্গালী এখন মৃত্যুরোগগ্রস্ত, মৃত্যুমুখে পতিতপ্রায়, অতএব তাহাকে জগৎগুরু মৃত্যুঞ্জয়ের শরণ লইতে হইবে।

তন্ত্রবক্তার প্রথম কথা তিনি অধমকে উদ্ধার করিবেন। আর তিনি

স্ত্রী-শূদ্র অব্রাহ্মণ-কুব্রাহ্মণ-সুব্রাহ্মণ আচণ্ডাল মনুষ্যের পক্ষে সমান, তিনি কেবল হিন্দুর জন্যই নহেন, সকল জাতির জন্যও। নৈশযুগে একদিন বৌদ্ধ তান্ত্রিকের প্রভাব জাপান হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, একথা ঐতিহাসিকেরা এখন স্বীকার করিতেছেন। তন্ত্র সার্ব্বজনীন।

তন্ত্রের দ্বিতীয় কথা, তিনি কেবল অধিকার বা যোগ্যতার বিচার করিবেন। শূদ্রও স্বগৃহে ইষ্টপূজা করিবার জন্য স্বয়ং পূজকের আসনে বসিতে পারেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হইবে না। এই স্বকৃত পূজাই পূজা। সুতরাং শূদ্রকে জোর করিয়া উপবীত ধারণের প্রয়োজন হইতেছে না, 'আমি তোমার কাছে কিছুতেই ছোট হইব না' এ বায়না করিবার কারণ থাকিতেছে না। আগে কায দেখাও, পরে পা বাড়াইয়া দিও, দেখিবে তখন তোমাকে প্রণাম করিতে লোকে ইতস্ততঃ করিবে না,—হয় ত পা লইয়া কাড়াকাড়ি হইতেও পারে। সে কালে ব্রাহ্মণেতর বংশজাত বৈষ্ণবরত্ন তান্ত্রিকসাধক নরোত্তম দাস ব্রাহ্মণের মন্ত্রগুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণশিষ্যের বংশধরেরা এখন ঢাকা জেলায় বাস করিতেছেন। আবার, একালের বিশে পাগলা, কেশে পাগলা (কেশবদাস, নমশূদ্র), তৎকন্যা ঢাকেশ্বরী, মুসলমান সালাল ফকীর (শৈব তান্ত্রিক), ফুলমহম্মদ ফকীর,—কত নাম করিব, সকলেই প্রণাম পাইয়াছেন, প্রণাম পাইয়া থাকেন।

তন্ত্রোপদিষ্ট ব্যক্তিকে প্রথম হইতেই গায়ত্রী, বর্ণময়ী বা শব্দব্রহ্মের সাধনা করিতে হয়। কি উপায়ে শব্দব্রহ্মের উপলব্ধি করিবার শক্তি জন্মে, তন্ত্র সাধককে গোড়া হইতে তাহা দেখাইয়া দেন, এবং কল্যাণের পথে জিজ্ঞাসুকে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইবার জন্য প্রোৎসাহিত করিতে ক্ষান্ত হন না। সেই সকল উৎসাহদায়ক বাক্যগুলি অর্থবাদ অথবা ছেলে ভুলান কথা নহে; অনেকস্থলেই দেখিবে, সেগুলি কতকটা Oracular, কোথাও বা Equivocal, কিন্তু কুত্রাপি ছেলে ভুলান কথা নাই। এরূপ ভাষা প্রয়োগের যথেষ্ট কারণ আছে। মতিমানের পক্ষে সে সব বাদ দিলেও বড় একটা আসে যায় না, কিন্তু যে মতিমান্ নহে, তাহার পক্ষে ফলশ্রুতির

যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। সন্দেশের লোভে ছেলে ঔষধ খায়; বুনো হাতী ধরিতে হইলে কুন্‌কী হাতীর দরকার হয়।

তন্ত্র কেন যে বিবিধ আশা সম্মুখে ধরিয়া সাধককে শব্দব্রহ্মের নিকট একটু একটু করিয়া টানিয়া লইয়া যান, তাহার কারণ একরূপ বুঝা গেল। এখন, সেই শব্দব্রহ্ম যাহাকে আশ্রয় করিয়া বা যে পদার্থে ওত-প্রোত হইয়া আছেন, তাহার নাম 'প্রাণ'। এই প্রাণকে ধরা চাই। তন্ত্রের উপদেশ এই যে, আগে দেহ গড়িয়া পরে তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন করিও না, যত্ন নিষ্ফল হইবে; গঠন-নৈপুণ্যের ফলস্বরূপ দেহটা আপনা হইতে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে, ইহা দুরাশা মাত্র। কেন্দ্র ছাড়িয়া বৃত্ত আঁকিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। প্রাণকে ধরিবার মত ধরিতে পারিলে লিঙ্গ-দেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে। লিঙ্গ-দেহই স্থূলদেহের আলম্বন, ইহাকে The thing in itselfও বলা যাইতে পারে; সুতরাং তাহার উপচয়ে স্থূল-দেহের উপচয় স্বীকার করিতে হইবে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাণকে আয়ত্ত করিয়া—আপনার করিয়া লইতে হইবে। এ প্রাণ কোথায় থাকে এবং পদার্থ-টাই বা কিরূপ, তাহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক। প্রাণের পরিচয় এইরূপ;—

মূলকাণ্ডে তু যা শক্তির্ভুজগাকাররূপিণী।
তদ্‌ভ্রমাবর্ত্তিতং তোয়ং প্রাণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
কিঞ্চিন্নাব্যক্তিমধুরা কূজন্তী সততোত্থিতা।
গচ্ছন্তী ব্রহ্মরন্ধ্রে তু প্রবিশন্তী স্বকেতনে॥ নীলতন্ত্র।

ঈশ্বর (এখানে শব্দব্রহ্ম) দেহে কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহার একটা সন্ধান বা সূত্র বাহির করিবার জন্য এমন স্থানে মনকে ধরিয়া রাখিতে হইবে যে, ধারণাকালে যাহার 'ও পারে' আর কিছু অনুভব করা যায় না। সেই স্থানের নাম মূলকাণ্ড বা মূলাধার। তাহাকে দেহমধ্যও বলা হইয়া থাকে, পাতাল বলিতেও পার। এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ তথায় কোনও বিশেষ-বর্ণ বিশিষ্ট একটা তরল পদার্থের আশ্রয়ে থাকিয়া নিরন্তর প্রকম্পিত, ভ্রাম্যমাণ আবর্ত্তনশীল। অবশ্য এই ভ্রাম্যমাণ অবস্থাটী জ্ঞাতার দৃষ্টিতে তাহার সাধনসামর্থ্যানুরূপ ক্রম পরিবর্ত্তনশীল, তাহা বলাই বাহুল্য; জ্ঞানের পরি-পাকের সহিত কম্পনের মৃদুতা, অভাব বা রূপান্তর হইতে পারে; তাহাতে

আসে যায় না। এখন, উপরে যে তরল পদার্থটার কথা বলা হইল, উহাকে জ্ঞানিগণ (বুধৈঃ) 'প্রাণ' বলিয়া থাকেন। শব্দব্রহ্ম এই তরল পদার্থের সহিত মাথামাখি ভাবাপন্ন। মুচিতে সোণা গলাইলে যেরূপ দেখায়, ইহা কতকটা তাহার কাছাকাছি। তপ্ত-তরল স্বর্ণের উজ্জ্বলতার সহিত পূর্ব্ব-কথিত পদার্থের (শব্দব্রহ্মের) ভাসন বা দীপ্যমানতার কিছু সাদৃশ্য আছে। সেই দেহব্রহ্মাণ্ডবিদ্রাবীস্ফুরজ্জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের সহিত প্রথম পরিচয় হইলে, একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা আবশ্যক হইয়া পড়িবে। তন্ত্র তখন বলিবেন,—বাপু একবার চোখের জল মুছিয়া ঐ পদার্থকে আপাততঃ ঈশ্বর বা ইষ্ট-দেবতার 'আভাস' বলিয়া ধরিয়া লও, সংশয় করিও না, তর্ক চালাইও না, ঠকিবে। গুরুকৃপায় সম্বন্ধটা ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইলে, তখন রত্নদীপের সাহায্যে হৃদয়ের রত্নবেদীর উপর চিন্তামণিকে বসাইতে পার, আর ঐ যে তোয় বা তরল পদার্থের কথা বলা হইল, উহার নাম প্রাণ বটে, কিন্তু আমাদের পরিচিত পঞ্চপ্রাণ নহে, উহাকে বরং প্রাণের প্রাণ বলা যাইতে পারে। এই পঞ্চপ্রাণ ঐ জলতরল প্রাণের নিকট হইতে আপন আপন সত্ত্বা কর্জ্জ লইয়া মহাজনের আদেশ প্রতিপালন করিতেছে;—শেষের দিনে মহাজনের কর্জ্জ শোধ করিয়া অনুমতির অপেক্ষায় রহিবে মাত্র। আর যেমন কোনও কোনও হীরকের মধ্যে জল নড়িতে দেখা যায়, হীরক ও তন্মধ্যগত জল কখনও স্বতন্ত্র কখনও বা একই পদার্থের গুণবিশেষ বলিয়া বোধ হয়, জল-সামান্য ঐ অনির্ব্বচনীয় পদার্থও সেইরূপ জলাশ্রয় বশতঃ কম্পমানা, অত-এব কম্পনের ফলে ঝিল্লীরবা এবং নাদাশ্রয়বশতঃ ঝিল্লীরবটী অতি মধুর।

পঞ্চপ্রাণের সাহায্যে অনুলোম বিলোম প্রক্রিয়া দ্বারা প্রাণের প্রাণকে ধরিবার জন্য যে ব্যাপার, তাহা সাধক-জীবন-নাটকের প্রথম অঙ্কের ঘটনা। পঞ্চতত্ত্বসাধনের পঞ্চাঙ্ক নাটক খানি অভিনয় করিতে যে বহুজন্ম লাগিবে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু প্রথম অঙ্ক ব্যতীত অন্য অঙ্কগুলির সহিত 'সমাজ-চিন্তা' প্রবন্ধের সম্বন্ধ নাই। আর, যে সাধক-জীবনের কথা বলা হইল, তাহা ধর্ম্ম-জীবনের অবান্তর ভেদ মাত্র। যেমন হিমালয়ের মধ্যে কাঞ্চনশৃঙ্গ, ধবলগিরি নহে; যেমন অন্নের মধ্যে খেচরান্ন, শাদাভাত নহে; যেমন রসের

মধ্যে ঔৎসুক্য-রস অন্য রস নহে, তত্ত্ব। এ-জীবন ধর্ম্ম-জীবন বটে, কিন্তু বিশিষ্ট ধর্ম্ম-জীবন। ধর্ম্মাচরণের জন্য শত শত পন্থা বিদ্যমান থাকিলেও সব পথ ছাড়িয়া এই পথ ধরিতে হইবে, হারাণ প্রাণকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সহস্র সহস্র বৎসরের হারাণ প্রাণকে তন্ত্রপথে মন্ত্রবলে যন্ত্রস্থ দেখিতে হইবে। তাহা হইলে লিঙ্গদেহের উপচয়, লিঙ্গদেহের উপচয়ে স্থূল-দেহের উপচয়, ব্যষ্টি স্থূল-দেহের উপচয়ে সমষ্টি-দেহের অর্থাৎ সমাজের উপচয় হইবে। প্রাণের মধ্যে দেহ আছে, দেহের মধ্যে প্রাণ নাই, দেহ পুড়িলে প্রাণ পোড়ে না; বীজের মধ্যে বৃক্ষ আছে, বৃক্ষের মধ্যে বীজ নাই; বৃত্তের আশ্রয় কেন্দ্র, বৃত্ত না থাকিলেও কেন্দ্র-বিন্দুর অস্তিত্ব লোপ পায় না। সর্ব্ব কর্ম্মই যজ্ঞ, সর্ব্ব যজ্ঞের সার প্রাণ-যজ্ঞ। এই প্রাণ-যজ্ঞ সাধন করে গুরু-যাজ্ঞিক ধরিতে হইবে। ইহাই তন্ত্রবক্তার তৃতীয় কথা।

ইহাই যদি তথাকথিত আর্য্য-পথ হয়, তবে এ পথের যাত্রী যুটিবে না, কারণ এখন আমাদের জন্য এমন একটা পথ চাই, যাহার আশ্রয়ে সাধক অসাধক সকলেই সহজে চলিতে পারে,—এরূপ আপত্তি করিবার লোকাভাব হইবে না। এ আপত্তির সদুত্তর দিতে পারিব কি না, বলিতে পারি না। তবু একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক।

চতুষ্কোণ-বৃত্ত কল্পনার অসাধ্য; একমণ সরিষাতে আধমণ তৈল ও আধমণ খইল দিতে কোনও তৈলকার সম্মত হইবে না; একটা হংসীর পুরোভাগটা ব্যঞ্জনার্থে ব্যবহার করিব, আর তাহার পশ্চাৎভাগ হইতে ভবিষ্যতে ডিম্ব প্রসব করাইয়া ব্যঞ্জনের অভাব পূর্ণ করিব, এ ব্যবস্থা সমীচীন নহে; ইন্দ্রিয়সেবা অক্ষুণ্ণ অব্যাহত রাখিয়া সংযমীর সাধ্য দুষ্কর কার্য্যসাধন অসম্ভব; আর প্রবল প্রাণবন্ত জাতির অধিকারে থাকিয়া দেশী বিলাতী যে কোন পন্থা আশ্রয় করি না কেন,—ক্ষীণ-প্রাণ আমরা এই প্রতিযোগিতার দিনে কর্ম্মক্ষেত্রে জাতীয় ভাগ্যচক্রকে স্ববশে রাখিতে পারিব, এটা একেবারেই অসম্ভব। পৃথিবীতে কোনও জাতি কস্মিন্‌কালে প্রাণশক্তির যথাসাধ্য যথাসম্ভব অপচয় সাধন করিয়া, কেবল প্রতিভাশিল্পসাহিত্যপাণ্ডিত্যের বলে, অথবা পরিণামদৃষ্টিশূন্য অফলপ্রসূ অঙ্কবিক্রমের বলে সমাজকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। বল, বুদ্ধি ও একতা সমাজের

দ্বারপাল, যেখানে ইহারা আছে, সেখানে সমাজ নিরাপদ। বল, বৃত্ত অর্থাৎ চরিত্র ও একতা ধর্ম্মের একতরবিকাশ, এজন্য অভ্যুদয়ের দ্যোতক। এ সকল যেখানে নাই, সেখানে 'সভ্যতা' অসতীর রূপের তুল্য। ভাবা উচিত যে, গথ-গল-হূণ-ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি ছিল বলিয়াই বর্ত্তমান ইউরোপকে দেখিতেছি, গ্রীস রোম ইহার উত্তরসাধক মাত্র। শিল্প সাহিত্য-সঙ্গীতে অত্যুচ্চস্থান অধিকার করিলেও ইটালি ভিক্টর ইমান্যুয়েলের পূর্ব্বে ইউরোপে রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় উচ্চ আসন পায় নাই। ইহাও ভাবিতে হইবে যে, সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব এক পদার্থ নহে, এমন কি অনেক সময়ে মনুষত্বের অবনতির সহিত সভ্যতারও চাকচিক্যের বাহার ফুটিয়া উঠে। সভ্যতায় অত্যুচ্চস্থান অধিকার করিলেও ধর্ম্মে হীন গ্রীক কারোণিয়ার মহাসমরে সপুত্র ফিলিপ পরিচালিত মাসিদনীয় বাহিনীকর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত। বলগর্ব্বিত স্বজাতিদ্রোহী ভবিষ্যদ্দৃষ্টি-বিমুখ হিন্দু ধর্ম্মোন্মত্ত নববলদৃপ্ত মুসলমান কর্ত্তৃক নারায়ণের রণক্ষেত্রে পর্য্যুদস্ত। বিদ্যা-বলবীর্য্য সভ্যতাভিমানে ধরাকে শরা জ্ঞান করায় সীদানের বিষম আহবে ফরাসী সর্ব্বাঙ্গীনতার সুষ্ঠু সাধক জর্ম্মান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত।

অধিক উদাহরণের প্রয়োজন নাই। এইসকল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইতে একটা ঐতিহাসিক তথ্যে উপস্থিত হইতে পারা যায়, এবং তাহা নির্ভরযোগ্য।

ধর্ম্মই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের মূল। প্রবৃত্তিমার্গস্থিত মানবের যখনই কোনও রূপ অভ্যুদয় দেখিতে পাইব, তখনই ধরিয়া লইতে হইবে—উহার মূলে অল্পাধিক ধর্ম্মসঞ্চিত আছে। অতএব যে স্থলে বলবীর্য্যকে মুখ্যকল্পে অভ্যুদয়ের হেতু বলিয়া বুঝিব, সে স্থলে বলবীর্য্যের সহিত ধর্ম্মের অন্বয় আছে স্বীকার করিতে হইবে। বলা বাহুল্য,—এ বল পশুবল নহে, ইহা মস্তিষ্কস্থিত ওজঃশক্তির দেহাশ্রয়ে ক্রিয়া। এই ওজঃশক্তিই দেহের সার পদার্থ, এবং ইহা অঘটনঘটনপটীয়সী। ইহার বলে নিরাশ্রয়া ত্রৈলোক্য-সুন্দরী একাকিনী অশোকবনে রক্ষপতি হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার বলে একাকিনী অসহায়া সুন্দরী রমণী বিজনবনে শূরবীর সিন্ধু-রাজকে একধাক্কায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ইহার বলে বৈজয়ন্ত-ধামে বিলাসগৃহে অনিন্দ্যসুন্দর ক্ষত্রিয়বীরকেশরী,—রূপের সার, সুখের সার, স্মৃতির সার,—দেবঋষিসিদ্ধমানবচিত্তবিপ্লাবিনী যোষিচ্চিত্তবিদ্রাবিণী

যাচমানা অপ্সরারত্ন উর্ব্বশীর লীলান্দোলিত দিধক্ষু কটাক্ষ হইতে আত্ম-রক্ষা করিয়া উত্তরকালে ধর্ম্মক্ষেত্রে গীতোপনিষৎ শুনিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। আবার, ঐতিহাসিকযুগে দেখিতে পাই—ইহার বলে, ইতিহাসে দুর্ল্লভ-চরিত্র—চাঁদসুলতানা আহম্মদনগরের দুর্গে অঘটন ঘটাইয়া দিগ্বিজয়ী মোগল সম্রাট্‌কে নারীমাহাত্ম্য বুঝিবার অবসর দিয়াছিলেন, বুঝাইয়াছিলেন যে, খোসরোজায় আহৃত পুঞ্জীকৃত সৌন্দর্য্যরাশিকে স্তব্ধকৃত করিয়া এ দুনিয়ায় আরও সৌন্দর্য্য, আরও সুরের সুর আছে, সে সুর কামানের মুখে বুকে অশ্বপৃষ্ঠে বিজলীর ন্যায় খেলিয়া বেড়াইতে পারে। আবার সেদিন দেখিলাম, এই ওজঃশক্তির বলে ক্ষুদ্রকায় গুর্খাসেনা দর্গাইয়ের গিরিশঙ্কটে ব্রিটিশ সেনাপতির বিস্ময় উৎপাদন করিয়া পুরুবিয়া, শিখ, Dorset, এমন কি Gardon Highlanderকে লজ্জা দিয়া বজ্রদেহ, বিপুলকায়, অবার্থলক্ষ্য আফ্রিদী শত্রুর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। বলিয়া রাখি, ইহা Sentiment নহে। বাঙ্গালীর Sentiment আছে বটে, কিন্তু প্রাণাভাব। ইহা প্রাণের দ্যোতক, অতএব ভাবের উচ্ছৃঙ্খ-লতার বাধক।

বলিয়াছি, এ বল পশুবল নহে। পশুবলে বলীয়ান্ রাজপুত দিল্লীর সিংহাসন টলাইতে পারে নাই, পক্ষান্তরে পশুবলে দুর্ব্বল মাহারাট্টা দিল্লীর রাষ্ট্রীয় শক্তি উন্মূলিত করিয়া সিন্ধুতীরে বিজয় নিশান উড়াইয়াছিল। ইহা ওজঃ-শক্তি,—সাধনার ধন। সে সাধনার জন্য আমাদিগকে এখন জীবন পণ করিয়া আসনে বসিতে হইবে। হিন্দু পূর্ব্বে একবার বৌদ্ধ-যুগের অবসানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে কঠোর সাধনা করিয়াছিল, কতশত অনিন্দ্যসুন্দর রূপ ধরিয়া শ্রুতিসাগর মন্থন করিয়া বংশধরদিগের-জন্য অমৃতের প্রস্রবণ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। সেই দেশ, সেই জাতির বংশধর, সেই মার্গ, সেই আসন সবই আছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশে চিরশান্তি আছে। রাজা অপ্রতিহত প্রতাবান্বিত, ইহা অতি শুভযোগ। এ শুভ যোগ ছাড়িলে চলিবে না। হইলেনইবা রাজা ভিন্নধর্ম্ম, তাহাতে কায করিতে জানিলে বড় একটা বাধিবে না; বরং রাজপ্রতিষ্ঠিত চিরশান্তির আশ্রয়ে সাধনায় সুবিধা হইবারই কথা। এখন ওজঃশক্তির সহিত পূর্ব্ব-

বর্ণিত 'প্রাণের' কিরূপ সম্বন্ধ, তাহার সূত্র বাহির করিতে হইবে, ওজঃ-শক্তি ও প্রাণ কেমন আধার-আধেয় ভাবাপন্ন হইয়া দেহমধ্যে লীলা করিতেছে, তাহা দেখিতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীগুরুদাস সান্যাল।

কবিকথা

(ভবভূতি।)

মহাবীর-চরিত।

(১)

একটী ক্ষুদ্রকায় পর্ব্বতের নিকটে ঘনসম্বদ্ধ তরুরাজি মেঘমালার ন্যায় দেখা যাইতেছিল, তাহাদের তল-দেশে মৃগকুল স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিতেছিল, পক্ষিগণ শাখায় বসিয়া দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল, অদূরে পবিত্রসলিলা জাহ্নবী কুলুকুলু স্বরে বহিয়া যাইতেছিলেন, এই পরম রমণীয় স্থানটীর নাম সিদ্ধাশ্রম, এখানে পূর্ব্বে বামনরূপী বিষ্ণু বাস করিতেন, পরে উহা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম স্থল হইয়া উঠে, বিশ্বামিত্র কৌশিকী পরিবেষ্টিত হিমারণ্য পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভের জন্যই সিদ্ধাশ্রমে আগমন করেন। যক্ষরক্ষগণের উপদ্রবে যজ্ঞ-বিঘ্ন ও তপোবিঘ্ন ঘটায় মহর্ষি বিঘ্ননাশের জন্য অযোধ্যাধিপ মহারাজ দশরথের নিকট হইতে তাঁহার পুত্রদ্বয় রাম-লক্ষ্মণকে চাহিয়া আনিলেন। এদিকে মহর্ষির যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠ রাজা কুশধ্বজ রথারোহণে জনককন্যা সীতা ও উর্ম্মিলাকে লইয়া সিদ্ধাশ্রমের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

পথে আসিতে আসিতে রাজা কুশধ্বজ সীতা ও উর্ম্মিলাকে চতুর্থ মেধ্যাগ্নি, পঞ্চমবেদ, জঙ্গম তীর্থ বা মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে শ্রদ্ধাসহকারে মনে মনে প্রণাম করিতে বলিলেন, রাজকন্যারাও সঙ্গে সঙ্গে পিতৃব্যের আদেশ প্রতিপালন করিলেন। সারথিও বিশ্বামিত্রের অলৌকিক ব্যাপারসকল স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল যে, যাঁহার দ্বারা ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গলাভ, শুনঃশেফের পরিত্রাণ ও রম্ভার পাষাণত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছিল, তিনি যে ঋষিগণের মধ্যে মহত্ত্বে শ্রেষ্ঠ, একথা কে অস্বীকার করিতে পারে? আবার ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত শান্তি-লাভে সমর্থ তপস্তেজের আধার, নিজ চেষ্টায় লব্ধব্রাহ্মণ্য, বিদ্যানিবাস সেই গুরু বিশ্বামিত্রের সহিত কুটুম্ব ব্যবহারে আপনারাও এজগতে গৃহস্থদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। রাজা সারথির সত্যবাক্যের জন্য তাহাকে সাধুবাদ দিয়া কহিলেন যে, এই সাক্ষাৎকৃত ব্রহ্ম, সত্যসন্ধ, ভগবান্ মহর্ষিগণের সহিত সম্পর্কে প্রকৃষ্ট কল্যাণই লাভ হইয়া থাকে, ইঁহাদের সহিত একবারমাত্র আলাপনে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া যায়, অপরিসীম শক্তিলাভ হয়, এবং ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইঁহাদের সঙ্গ এক অপূর্ব্ব মহিমা বিতরণ করে এবং ইঁহাদের প্রসন্ন বাক্যে অপরিমেয় ফল প্রসূত হয়। রথ ক্রমে অগ্রসর হইলে আশ্রমের শ্যামশোভা তাঁহাদের নয়ন-পথে নিপতিত হইল, এবং তাঁহারা রামলক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রকেও তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। সারথি রাজাকে তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলে, রাজা কন্যাদ্বয়ের সহিত রথ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং অনুচরবর্গ যাহাতে আশ্রমসীমা অতিক্রম না করে, তজ্জন্য সারথিকে উপদেশ দিলেন। পরে আপনারাও ধীরে ধীরে আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র তখন মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন যে, কিরূপে শুভদিনে রাক্ষসনাশরূপ মঙ্গল ক্রিয়া, রাম-সীতার পরিণয় এবং নিজের যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন। তদ্ভিন্ন জগতের কল্যাণকামনায় রামরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর অদ্ভুত চরিত্রসকলের প্রবর্ত্তনার বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি

পুলকিত হইয়া উঠিতেছিলেন, সেই সময়ে সীতা ও উর্ম্মিলার সহিত কুশ-ধ্বজকে উপস্থিত দেখিতে পাইয়া মহর্ষি তাঁহাদের অভ্যর্থনায় উদ্যত হই-লেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, রাজা জনক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকি-লেও আচারানুসারে তাঁহাকে আমার যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া সীতা ও উর্ম্মিলার সহিত কুশধ্বজকে পাঠাইবার জন্য সংবাদ দিয়াছিলাম, এক্ষণে দেখিতেছি, প্রিয়-সুহৃৎ আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। কুশধ্বজকে আগত ও বিশ্বামিত্রকে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উদ্যত দেখিয়া রাম-লক্ষ্মণ কহিলেন যে, ভগবন্, কোন্ মহাত্মার অভ্যর্থনার জন্য আপনি এরূপ ব্যগ্র হইতেছেন? বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন যে, তোমরা বিদেহাধিপতি রাজর্ষি নিমিজনকবংশীয়দের কথা শুনিয়া থাকিবে। জ্ঞান-বয়ঃ-প্রবীণ রাজা শীরধ্বজ এক্ষণে সেই বংশের উত্তরাধিকারী, ইহাকে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সমগ্র শুক্ল যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। রাম-লক্ষ্মণ বলিলেন যে, শুনিয়াছি ইহার গৃহে নাকি মাহেশ্বর ধনু ও অযোনিজা কন্যা আছে। বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন যে, "তাহা সত্য বটে, রাজা সীরধ্বজ নিজে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হওয়ায়, আমার যজ্ঞের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য কনিষ্ঠ কুশধ্বজকে পাঠা-ইয়া দিয়াছেন, তোমরা এই রাজশ্রোত্রিয়ের সহিত বিনয়-নম্র ব্যব-হার করিবে; রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া রাজা কুশধ্বজ বলিতেছিলেন "স্বাভাবিক পুণ্য-শ্রীতে শোভমান, কৃতোপনয়ন এই রাজন্য-বালক দুইটী কে? নবীনবয়স্ক এই ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী দুইটীর মূর্ত্তি কি রমণীয়! চূড়াচুম্বিত জঙ্ক পত্রযুক্ত শরপরিপূর্ণ তূণীরদ্বয় পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে বহন, ভস্মপূত বক্ষঃস্থলে রুরুচর্ম্ম ধারণ, মৌর্ব্বিমেখলায় বদ্ধ মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত অধোবাস পরিধান, একহস্তে ধনু ও অক্ষসূত্র বলয় এবং অপর হস্তে অশ্বত্থদণ্ড গ্রহণ করিয়া ইহারা অতীব সুন্দর বলিয়াই প্রতীত হইতেছে"। সেই সৌম্যদর্শন রাম-লক্ষ্মণের প্রতি সীতা ও উর্ম্মিলার চিত্ত ও চক্ষু আকৃষ্ট হইল। তাহার পর রাজা কুশধ্বজ অগ্রসর হইয়া মহর্ষিকে অভিবাদন করিলে, বিশ্বামিত্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "পুত্র তুল্য তোমাকে গৃহাগত দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আরব্ধযজ্ঞ বিদেহাধিপতি ও জনকবংশের কুলপুরো-

হিত গৌতম শতানন্দ সুখে আছেন ত? রাজা উত্তর দিলেন "আর্য্য ও পুরোহিত শতানন্দ উভয়েই সুখে আছেন, যাঁহার সহিত আপনি কুটুম্ব-ব্যবহারে সম্বন্ধ, তাঁহার অমঙ্গল কোথায়"? সীতা ও উর্ম্মিলা মহর্ষিকে প্রণাম করিলে, রাজা তাঁহাদের পরিচয় দিয়া কহিলেন যে, এটী সীতা, লাঙ্গলকর্ষণে ইনি যজ্ঞভূমি হইতে সমুত্থিতা হইয়াছিলেন, আর অপরটী জনকাত্মজা উর্ম্মিলা। বিশ্বামিত্র তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিলেন। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে সীতার বিস্ময়করী উৎপত্তির কথা লক্ষ্য করিতে বলিলেন। রামের চিত্ত তখন সীতার প্রতি ধাবিত হইতেছিল, তিনি বলিতে লাগিলেন "দেবযজ্ঞ হইতে যাঁহার উৎপত্তি, পিতা যাঁহার ব্রহ্মবাদী নৃপ, তাঁহার প্রসন্ন ও উজ্জ্বল মূর্ত্তি আমার যে স্নেহাকর্ষণ করিবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?" রাজা রাম-লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্, ধর্ম্মানুসারী আবির্ভূত প্রতাপ ও বিক্রমের ন্যায় আপনার অনুগত এই ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী দুইটী কে?" বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে দশরথ-পুত্র রাম-লক্ষ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেন। রাম লক্ষ্মণ তখন বিনয়সহকারে অগ্রসর হইয়া রাজা কুশধ্বজকে অভিবাদন করিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন যে, অদ্য মহারাজ দশরথ-তনয়ের সাক্ষাৎ লাভ হইল। রঘুবংশ ব্যতীত ইঁহাদের জন্ম আর কোথা হইতে হইবে? ক্ষীর সমুদ্র ভিন্ন অন্য কোন স্থানে চন্দ্র ও কৌস্তভের কি উৎপত্তি হইতে পারে? আমরা এই শ্রুতিমধুর কথা শুনিয়াছি বটে, মহারাজ দশরথ বহুকষ্টে ঋষ্যশৃঙ্গের পূজা করিয়া পুণ্য শ্রী-সম্পন্ন চারিটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে প্রদীপ্তশ্রেয়োলাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতেছেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে ইঁহাদের কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আশা হইতেছে। সত্য সত্যই রঘুবংশীয়দিগের উৎকর্ষ সিদ্ধ হইয়াছে। বেদপারগ বিধি অনুসারে ভগবান্ বশিষ্ঠ যাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, প্রজাগণের অনন্যসাধারণ রক্ষাধিকার সর্ব্বদাই যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া আছে, বৈবস্বত-মনুর পূজ্যতম বংশে জাত সেই নৃপতিনিকরের মহিমা আমাদের বাক্য-জ্ঞানের অগোচর"। বিশ্বামিত্র উত্তর করিলেন, "তাহা হইলেও অভ্রান্ত পুণ্যকর্ম্মা, পবিত্রকীর্ত্তি, মহাভাগ্যবান তোমরাই

তাঁহাদিগের গুণ-কীর্ত্তনে সমর্থ।”—তাহার পর মহর্ষির কথানুসারে সকলে আশ্রম-মধ্যে অগ্রসর হইয়া একটী বঁইচ বৃক্ষতলে বিশ্রামলাভের জন্য উপবেশন করিলেন।

এই সময়ে অদূরে ‘জগৎপতি রামচন্দ্রের জয় হউক’ বলিয়া এক ধ্বনি উত্থিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। রাজা কুশধ্বজ মহর্ষিকে ইনি কোন দেবতা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, বিশ্বামিত্র কহিলেন যে, ইনি গৌতম-পত্নী অহল্যা। ইঁহার গর্ভে আঙ্গিরস শতানন্দ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। অহল্যা ইন্দ্রস্পর্শ-দোষে গৌতমকর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া অন্ধতামিস্র নরকভোগে পাষাণত্ব প্রাপ্ত হন, রামভদ্রের তেজে এক্ষণে ইনি পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন। শুনিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন যে, এই তপন-কুলকুমারের কি অপরিসীম শক্তি ও প্রভাব! সেই সময়ে সীতার হৃদয়ে বিস্ময় ও অনুরাগের সঞ্চার হইতেছিল, তিনি চুপে চুপে বলিতেছিলেন যে, ইঁহার প্রভাব সুকান্তিরই অনুরূপ বটে। রাজা আবার বলিতে লাগি-লেন, “রাজর্ষি জনক যদি হর-ধনু আকর্ষণরূপ অনিবার্য্য পণ না করিতেন, তাহা হইলে পুণ্যতেজা দাশরথিচন্দ্রমা-অনুরূপ পাত্র রামচন্দ্রের হস্তে সীতাকে নিশ্চয়ই অর্পণ করিতেন। এই সময়ে একটী তাপস উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, রাবণ-পুরোহিত সর্ব্বমায় নামে একটী বৃদ্ধ রাক্ষস আগমন করিয়াছেন। তিনি রাজকার্য্যের জন্য আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। সীতা ও উর্ম্মিলা রাক্ষসের আগমনের কথা মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন। রাম-লক্ষ্মণের কিন্তু অত্যন্ত কৌতুক উপস্থিত হইল। রাজা ও বিশ্বামিত্র তাঁহাকে আসিতে বলিলে, তপস্বী সেস্থান হইতে অপসৃত হইয়া রাক্ষসটীকে পাঠাইয়া দিলেন। লঙ্কাধিপতি রাবণ মাতা-মহ মাল্যবান কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াও বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া পতিত্বে বরণ করার ইচ্ছায় সর্ব্বমায়কে মিথিলায় পাঠাইয়া দেন। সর্ব্বমায় যজ্ঞদীক্ষিত রাজা জনকের নিকট হইতে সীতার সংবাদ জানিয়া কুশধ্বজ ও বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হন। তিনি যখন ইঁহাদের নিকট অগ্রসর হইতেছিলেন, সে সময়ে রাম-সীতা ও লক্ষ্মণ-উর্ম্মিলার মধ্যে অনুরাগের

সঞ্চার হইতেছিল। রাম-লক্ষ্মণ সীতা ও উর্ম্মিলাকে নেত্রস্নিগ্ধকরী অমৃত-ময়ী অঞ্জনরেখা বলিয়া মনে করিতেছিলেন। আবার কুমারী দুইটীও রাম-লক্ষ্মণের লোচনানন্দকর দেহ হইতে আপনাদের দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতে ছিলেন না। রাক্ষস নিকটে আসিয়া সীতার অপূর্ব্ব আকৃতি দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার জন্য রাবণের চেষ্টা যে অন্যায় নহে, তাহাও মনে করিতে লাগিলেন। রাক্ষস মহর্ষিকে প্রণাম ও রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা উভয়ে তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন যে, শিথিল মুকুট-মস্তকে পাকশাসন যাঁহার শাসন-পালনে ব্যগ্র, আপনার সেই প্রভুর মঙ্গল ত? সর্ব্বমায় উপবেশন করিয়া প্রভুর মঙ্গলের কথা বলিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ এইরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আপনাদের গৃহে যে অযোনিজ কন্যারত্ন আছে, আমি তাহার প্রার্থনা করিতেছি। রত্ন যে কোন স্থানে থাকিলেও তাহা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটেই আসে। আবার কন্যা যে পরার্থ, ইহাও চিরপ্রসিদ্ধ। সেই জন্য তাহার প্রদানে আমি আপনাদের বন্ধুশ্রেণী-ভুক্ত হইব; এবং পুলস্ত্যাদি ঋষিগণের সহিতও আপনাদের সম্বন্ধ স্থাপন হইবে।" রাবণের প্রার্থনা শুনিয়া সীতা আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, উর্ম্মিলাও কেন এরূপ ঘটিল, ভাবিয়া দুঃখিত হইয়া উঠিলেন। লক্ষ্মণ চুপে চুপে রাম-চন্দ্রকে বলিলেন যে, দেবী সীতাকে রাক্ষসে প্রার্থনা করিতেছে। শুনিয়া রাম কহিলেন, "তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সমভাবে অধিকার থাকায় যে কেহ কন্যা প্রার্থনা করিতে পারে; ব্রহ্মার প্রপৌত্র জগজ্জয়ী রাবণের ত কথাই নাই।" লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন যে, আর্য্যের অতি সৌজন্যের জন্য স্বভাবশত্রু নিশাচরের প্রতিও তাঁহার সম্মান প্রদর্শনে সঙ্কোচ নাই, কিন্তু এই রাক্ষসাধিপতি রাবণ বেদমার্গের নাশে আমাদের ক্ষাত্র তেজ অভিভূত করিতেছে, এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অনরণ্যকেও বধ করিয়াছে। রাম বলিলেন, "শত্রু হইলে তিনি বধ্য হইতে পারেন, তাই বলিয়া সেই বীর্য্য-বান অপ্রমেয়তপা অসাধারণ পুরুষকে নীচ-জনের ন্যায় অবজ্ঞা করা কদাচ উচিত নহে।" লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন, "যে বীরপুরুষের আচার পরিত্যাগ

করিয়াছে, তাহার আবার বীরত্ব কি?" রাম বলিলেন, "বৎস, সে কথা প্রকৃত নহে। উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াও রাবণের এই সকল কার্য্যানুষ্ঠানে তাঁহাকে ধর্ম্ম পথ হইতে ভ্রষ্ট ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? তবে সমস্ত গুণ একাধারে থাকিতে পারে না। কোন কোন বিষয়ে তাঁহার দোষ থাকিলেও, যিনি হেলায় কার্ত্তিকেয়কে জয় করিয়াছেন, সেই ভগবান্ পরশুরাম ব্যতীত রাবণ সদৃশ আর কোন্ বীর নির্ব্বিঘ্নে বিশ্ববিজয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন?" সর্ব্বমায় বিশ্বামিত্র ও কুশধ্বজের কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন "আপনারা এ বিষয়ে কি চিন্তা করিতেছেন? আমি বলি, আমার প্রভু জগদেকবীরের যে বক্ষে ইন্দ্রের বজ্র নিষ্পেষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ব্রণগ্রন্থি উৎপাদনে তাহাকে মণিময় করিয়া রাখিয়াছে। যাহাতে ঐরাবতের দন্তোদ্যম নিষ্ফল হইয়া যায়, এবং যাহাতে নন্দন দেবতাগণের গ্রথিত মন্দারমালা শোভা পাইতেছে, তাহাতে ভূমি-সুতা বীর-শ্রীর ন্যায় বিশ্রাম লাভ করুন।

সেই সময়ে চারিদিক হইতে এক মহা কলরব উত্থিত হইল। রাজা কুশধ্বজ তাহাকে পুত্রদারসহ আগত ঋষিগণের বালক-বালিকার রোদনধ্বনি বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে তাহা যখন প্রবল হইয়া উঠিল, তখন সকলে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সহসা রাক্ষসী তাড়কার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভগবন্, এ আবার কে অন্ত্রধারা গ্রথিত বৃহৎ কপাল ও নলাকাস্থিতে অসংখ্য কঙ্কণ শব্দের ন্যায় সমস্ত আকাশ নিনাদিত এবং ঘন কর্দ্দমের ন্যায় পীত রক্তসমূহের বমনে চঞ্চল স্তনযুগল ভয়ঙ্কর করিয়া, ভৈরব দেহ লইয়া সদর্পে ধাবিত হইতেছে? বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন যে, এই ভীষণদর্শনা সুকেতুর কন্যা সুন্দাসুরের ভার্য্যা ও মারীচের জননী, ইহার নাম তাড়কা রাক্ষসী। তাড়কার আকৃতি দেখিয়া ও তাহার পরিচয় শুনিয়া সীতা ও উর্ম্মিলা ভীত হইয়া উঠিলেন, কুশধ্বজ তাঁহাদিগকে শান্ত করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া তাড়কাকে বধ করিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। সুকুমার রামচন্দ্রকে অতি দুষ্কর কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া সীতা

উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "ভগবন্ তাড়কা, স্ত্রীজাতি"। উর্ম্মিলা সীতাকে রামচন্দ্রের কথা লক্ষ্য করিতে বলিলে, সীতা বিস্ময় ও অনুরাগের সহিত, রামচন্দ্রের স্ত্রীবধে অনিচ্ছার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা কুশধ্বজও সাধুবাদ দিয়া কহিলেন যে, রামচন্দ্র সত্য সত্যই ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত। সর্ব্বমায় সে সময়ে মনে মনে বলিতেছিলেন, "এই কি সেই দাশরথি রাম, যে তাড়কার উৎপাত দর্শনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত নহে, এবং তাহার বধে নিযুক্ত হইয়াও উহাকে স্ত্রীজাতি মনে করিয়া বাণক্ষেপে ইতস্ততঃ করিতেছে"? তাড়কার উপদ্রব ক্রমে ঘোরতর হইয়া উঠিলে, বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে বলিলেন, "বৎস, সত্বর অগ্রসর হও, দেখিতেছ না, সম্মুখে ব্রাহ্মণগণের সংঘাত মৃত্যু উপস্থিত"। রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, "ভাল-মন্দ ভগবানই জানেন, দোষমাত্রের সম্পর্ক না থাকায় আপনারা বেদতুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং আপনাদের আদেশ পুণ্য-পাপের প্রমাণ স্বরূপ"। তাহার পর রামচন্দ্র তাড়কাবধের জন্য অগ্রসর হইলেন। রামচন্দ্রকে নিকটস্থ দেখিয়া দুষ্টা রাক্ষসী চক্রবাতার ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল, সীতা তাহা দেখিয়া সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিলেন। রাজা কুশধ্বজ ধনুক আস্ফালন করিয়া রামচন্দ্রের সাহায্যে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র নিমেষমধ্যে তাড়কার সংহার কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলেন; তখন লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন, "তাড়কার কি দশা ঘটিয়াছে, অবলোকন করুন। হৃদয়ের মর্ম্মভেদী প্রচণ্ড শর-সমূহের পতনে তাহার অঙ্গসকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যুগল নাসিকা-বিবর হইতে যুগপৎ বুদ্বুদধ্বনিসহ শোণিতধারা নির্গলিত হইতেছে, সুতরাং সে যে মৃতা, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে। তাড়কা-নিধন সীতা ও উর্ম্মিলার নিকট প্রিয় ও বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হইল। রাজা কুশধ্বজও রামচন্দ্রের সুদৃঢ়-প্রহারে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বমায় বলিতে লাগিলেন "আর্য্যে তাড়কে, একি ঘটিল? অলাবু কি শেষে জলমগ্ন হইল, এবং শিলা কি জলে ভাসিয়া উঠিল? আর দেখিতেছি রাক্ষসপতির প্রতাপ স্খলিত হইল, মনুষ্য শিশু হইতে তিনি এই বিস্ময়কর পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, আমিও উপস্থিত থাকিয়া সম্মুখে স্বজনবধ নিরীক্ষণ করিলাম, কিঙ্করিষ, দৈত্য ও

জরা যে তাঁহাকে প্রতিকারপরাঙ্মুখ করিয়া রাখিয়াছে"। সেই সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাড়কাবধ ব্যাপারকে সমগ্র রাক্ষস-সংহাররূপ বেদাধ্যয়নের ওঁকার স্বরূপ মনে করিতেছিলেন।

সর্ব্বমায় তখনও সীতার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি বিশ্বামিত্র ও কুশধ্বজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, আপনারা আমার কথার কি উত্তর দিতেছেন? তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন যে, সে কথার উত্তর সীরধ্বজই জানেন। কুশধ্বজ তাহার কনিষ্ঠ, জনকই এইকন্যার পিতা, কুলজ্যেষ্ঠ এবং প্রভু। সর্ব্বমায় উত্তর দিলেন যে, তিনিই আবার বলিতেছেন, কুশধ্বজ ও কৌশিকই সমস্ত জানেন। বিশ্বামিত্র সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই মঙ্গল মুহূর্ত্তকে রামচন্দ্রের কল্যাণস্বরূপ দিব্যাস্ত্রসকল প্রদানের অবসর মনে করিতেছিলেন। তিনি রাজা কুশধ্বজকে বলিলেন "সখে গুরুসেবার বলে ভগবান কৃশাশ্বের নিকট হইতে প্রাপ্ত সহরস্য জৃম্ভকাস্ত্রের প্রয়োগ সংহারের সহিত দিব্যাস্ত্রমন্ত্র পারায়ণের বিদ্যাতত্ত্ব বীজ সকল আমার অনুগ্রহে অর্থতঃ ও শব্দতঃ রামভদ্রের নিকট প্রকাশিত হউক, ইহাই ইচ্ছা করিতেছি। ব্রাহ্মাদি পুরাতন গুরুসকল বেদ ও ব্রাহ্মণরক্ষার জন্য বহুসহস্র তপস্যা করিয়া আপনাদের তপোময় তেজস্বরূপ এইসকল দিব্যাস্ত্রের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ছিলেন"। রাজা শুনিয়া বলিলেন যে, ইহাতে রঘুকুল অনুগৃহীত হইল। তাহার পর মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ধ্যানমাত্রে দিব্যাস্ত্রসকল আবির্ভূত হইতে লাগিলেন। দেবতারা দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মণের হৃদয় মহানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সর্ব্বমায় এইসকল দেব কার্য্যকে রাবণ-বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিতেছিলেন। দিব্যাস্ত্র সমূহের আবির্ভাবে সহসা দিক্ সকল তপ্ততরলকনকে যেন সিক্ত হইয়া উঠিল, কপিল বর্ণ প্রকাশে দিবসে সন্ধ্যাসমাগম বোধ হইতে লাগিল। দ্যুতিমান্ ধ্বজসমূহের ন্যায় দিব্যাস্ত্রসকলে আচ্ছাদিত হইয়া নভোমণ্ডল যেন নিরন্তর চঞ্চল বিদ্যুদ্দামে কনকাভ লক্ষিত হইল। সর্ব্বদিকে ও সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত সূর্য্যরশ্মিকে প্রতিহত করিয়া দিব্যাস্ত্রসকলের তেজোরাশি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে কারণে চক্ষুর জ্যোতিঃ প্রথমে আকৃষ্ট পরে পরিত্যক্ত হওয়ায় দর্শন-সামর্থ্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ দিব্যাস্ত্রনিকরের এই

সকল মহিমা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কুমারীদ্বয়ের চক্ষুও প্রজ্বলিত বিদ্যুৎপুঞ্জের প্রভাপরিস্পন্দনের ন্যায় অস্ত্রসমূহের তেজঃপ্রভাবে দগ্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। তাঁহাদের দুর্দ্ধর্ষ তেজসংঘাত নিরীক্ষণ করিয়া রাবণ-পুরন্দরের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের কথা সর্ব্বমায়ের মনে পড়িল, তিনি বলিতে লাগিলেন সর্ব্ববলান্বিত ইন্দ্রকর্ত্তৃক মুক্ত বজ্রায়ুধ রাবণ-বক্ষে প্রতিহত হইয়া যখন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহা হইতে বিনির্গত বিদ্যুৎ-সহস্রের প্রভা রাবণের মুখাগ্নিকপিশ ক্রোধাট্টহাসের সহিত ব্যোমমণ্ডলকে এইরূপ করিয়াই তুলিয়াছিল। "দিব্যাস্ত্র সকলের আবির্ভাব দেখিয়া বিশ্বা-মিত্র রামচন্দ্রকে তাঁহাদিগের অভিবাদনের জন্য উপদেশ দিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, প্রাচীনবর্হির্মরুৎ, কাল ও অগ্নির অতিরিক্ত বেদ-মন্ত্রাত্মক তপস্যার ন্যায় অপ্রতিহত তেজোদীপ্ত ভগ-বান্ দিব্যাস্ত্রসকলের মধ্যে যে কেহ জগত্রয় নাশে ও রক্ষণে সমর্থ"। বিশ্বা-মিত্রের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র দূর হইতে উত্তর করিলেন যে, আমি ইঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছি, কিন্তু আমার প্রার্থনা এই যে, এই দিব্যাস্ত্রনিকরের দান আমিও লক্ষ্মণ উভয়েই যেন লাভ করিতে পারি। বিশ্বামিত্র তাহাই হউক বলিয়া উত্তর দিলেন। মহর্ষির অনুগ্রহলাভ করিয়া লক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন, "সহসা এই বিদ্যা প্রকাশে আমার প্রজ্ঞা উন্মীলিত ও অচিন্ত্য-শক্তিসমূহ সঞ্চারিত হওয়ায়, আপনাকে জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া মনে করিতেছি। তখন দিব্যাস্ত্রসকলের মুখ হইতে এই বাণী নির্গত হইল, "মহাবাহো-রাম, বিশ্বামিত্রের আদেশে এক্ষণে আমরা তোমার অধীন হইয়াছি, আমাদিগকে কি করিতে হইবে, তুমিও লক্ষ্মণ তাহার অনুমতি প্রদান কর"! "দিব্যাস্ত্রদেবতার বাক্য শুনিয়া কুমারীদ্বয় বিস্মিত হইয়া উঠিলেন, রামচন্দ্র অস্ত্রদেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্ দিব্যাস্ত্র-নিকর, বিশ্বের মিত্র বিশ্বামিত্র হইতে পুণ্যবলে আপনাদিগকে লাভ করিয়া রাম কৃতার্থ হইয়াছে, যখন আপনাদিগকে ধ্যান করিব, তখন আপনারা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। এক্ষণে স্বস্থানে গমন করুন, আমি আবার আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।" রামচন্দ্রের বচনে দিব্যাস্ত্রসকল অন্তর্হিত হইলেন। লক্ষ্মণও তাহা লক্ষ্য করিলেন।

বিশ্বামিত্রের এই অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া রাজা কুশধ্বজ তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "ভগবন্ প্রজ্বলিত তপস্তেজা অমিতবল আপনার অখণ্ড মাহাত্ম্যের স্তবে সাহসী হইয়া, স্তবকর্ত্তা বাক্যে ও মনে স্তবানুরূপ যথার্থ জ্ঞানের শক্তি লাভ না করায়, তাহার প্রবৃত্তি ও রচনা প্রতিহত হওয়ায় সে বিপদ গণনা করিতে থাকে, ও লোকের নিকট কৃপার পাত্র হইয়া উঠে, তাই আমার ইচ্ছা, আপনার অনুগৃহীত রামভদ্রের দ্বারা অলঙ্কৃত রাজা দশরথের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করি, কিন্তু আর্য্যের ধনুর্ভঙ্গপণের জন্য আমাদের ভাগ্যে এরূপ জামাতা ঘটিয়া উঠিতেছে না। বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন যে, এখনও কি আমাদের দ্বারা কোন কার্য্য অসম্ভব বলিয়া তোমার মনে হইতেছে? রাজা কুশধ্বজ তখন বলিতে বাধ্য হইলেন যে, না আমি তাহা মনে করিতেছি না, তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন "তবে ধ্যানমাত্রে যে হরধনু তোমাদের নিকট আগমন করে, এক্ষণে তাহা রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হউক" 'তাহাই হউক' বলিয়া রাজা কুশধ্বজ মাহেশ্বর ধনুর ধ্যান ও প্রণাম করিতে লাগিলেন, সর্ব্বমায় রাজা ও বিশ্বামিত্রকে তাঁহাদের বিরুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রভো কুশধ্বজ, কতকাল আর প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া আমাদের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিবেন? রাজা উত্তর দিলেন যে, কেন, পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে, রাজা জনক তাহা জানেন। রাজা কুশধ্বজের ধ্যানে ও প্রণামে গর্জ্জনকারী বজ্রসহস্রের তিরস্কারে সমর্থ, ত্রিপুরান্তকর, দেবগণের তেজে প্রদীপ্ত সেই মাহেশ্বর ধনু রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাজা কুশধ্বজ সে কথা ব্যক্ত করিলে, সীতার হৃদয় সংশয়ে আন্দোলিত হইতে লাগিল। করিশাবকের পর্ব্বতগাত্রে শুণ্ডার্পণের ন্যায় রামচন্দ্র ধনুকে হস্তার্পণ করিয়া তাহার গুণ আকর্ষণ করিবামাত্র তাহা হইতে ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই বিশাল ধনু ভগ্ন হইয়া গেল। 'উর্ম্মিলা আমাদের কি সৌভাগ্য' বলিয়া আনন্দসহকারে সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া উঠিলেন। সীতার মুখমণ্ডলে তখন লজ্জার ও হর্ষের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। রাজা কুশধ্বজ সবিস্ময়ে রামচন্দ্রের পরাক্রমের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বমায়ও তাঁহার অদ্ভুত প্রভাবে চমকিত হইয়া উঠিলেন। লক্ষ্মণের হৃদয় আনন্দে

পরিপূর্ণ হইতেছিল, তিনি বলিতে লাগিলেন "আর্য্যের বাহুলীলায় ভগ্ন হরধনু হইতে উত্থিত তাঁহার বালচরিতারম্ভের ডিণ্ডিম স্বরূপ, সহসা বিক্ষিপ্ত কপালসম্পুটতুল্য ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে ভ্রমণশীল, পুঞ্জীভূত চণ্ডতাবসম টঙ্কার ধ্বনি এখনও পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হয় নাই।" রামচন্দ্রের প্রভাব আলোচনা করিতে করিতে রাজা কুশধ্বজ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এস বৎস রঘুনন্দন রামচন্দ্র, আমি তোমার শিরশ্চুম্বন করিব, বা তোমায় গাঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিব, অথবা দিবা-নিশি হৃদয়ে রাখিয়া তোমাকে বহন করিতে থাকিব, কিম্বা তোমার চরণকমলদ্বয় বন্দনা করিব, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

এই সময়ে রামচন্দ্র সকলের সমীপস্থ হইলেন। তিনি অতি বাৎসল্যে রাজা কুশধ্বজের সম্বন্ধাধিক্রমের কথা তাহাকে জ্ঞাপন করিলে, বিশ্বামিত্রও কুশধ্বজকে কহিলেন যে, রাজন্ তুমিই গুরুজন, বৎস রামচন্দ্র তোমার পুত্র তুল্য। রাজা তখন মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,! "ভগবন্ রামকে পতিভাবে লাভ করায় সীতার প্রতি আপনার আশীর্ব্বাদ পূর্ণ হইল; এই উৎসব সময়ে, আমি উর্ম্মিলাকেও লক্ষ্মণের হস্তে অর্পণ করিলাম"। কুমারীদ্বয়ের নয়নে আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরকে বলিলেন, "আমাদের সম্প্রদান হইয়া গেল"। রাক্ষস সর্ব্বমায় এই সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণে সীতোর্ম্মিলার সম্প্রদান সমীচীন বলিয়াই প্রশংসা করিতে লাগিলেন; এবং তিনি ভরত-শত্রুঘ্নের জন্য কুশধ্বজাত্মজা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির প্রার্থনা করিলেন। তাহা শুনিয়া সর্ব্বমায় মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, তপস্বী বনবাসী সাধু ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়দিগের কুটুম্ব ব্যবহারে ইহা ত কম ধৃষ্টতা নহে! রাজা কুশধ্বজ বিশ্বামিত্রের বাক্যের এইরূপ উত্তর দিলেন যে, এ বিষয়ে আপনি, রাজা জনক ও শতানন্দই কর্ত্তা, বিশ্বামিত্র জনক ও শতানন্দকে আমিই প্রতিবোধিত করিয়া থাকি বলিয়া কুশধ্বজকে আশ্বস্ত করিলেন। কুশধ্বজ বলিলেন যে, ভগবান্ই সমস্ত জানেন, জনক ও রঘুবংশে সম্বন্ধ স্থাপন কাহার প্রিয় নহে? বিশেষতঃ কল্যাণের মধ্যস্থ স্বরূপ স্বয়ংই আপনি যেখানে দাতা ও গৃহীতা রূপে অবস্থিত।" বিশ্বামিত্র তখন শিষ্য শুনঃশেফকে আহ্বান

করিয়া কহিলেন যে, তুমি অযোধ্যায় গিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠকে নিবেদন কর, আমি জনকগৃহে শতানন্দ ও বশিষ্ঠের আচরণ করিয়া চারিটী রঘুনন্দনের হস্তে জনক-কুমারী-চতুষ্টয়ের দান, পরে আবার প্রতিগ্রহ করিতেছি। তাহার পর সমস্ত ব্রহ্মর্ষিদিগেকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহারাজ দশরথের সহিত বিদেহ নগরে আগমন করিবে। রাজর্ষি জনকের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে গোদান মঙ্গলানুষ্ঠানের পর কুমারদিগের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। রাম-লক্ষ্মণের নিকট এই সকল ব্যাপার প্রিয় বলিয়াই বিবেচিত হইতেছিল। কুমারী-দ্বয়ও ভগিনীদিগের মধ্যে প্রবাস-দুঃখ ঘটিবে না বলিয়া আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বমায় আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি বলিতে লাগিলেন "এখনও ধর্ম্মকথা শুনুন, অন্যের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া অনর্থ ঘটাইবেন না। রাবণ সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছে, এই শ্লাঘ্য বিষয়ে অনাদর প্রকাশ, সেই লোকপতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে বন্ধুত্ব ঘটিবে, কিন্তু তাহাতেও অনিচ্ছা, এ সকল কদাচ শুভকর নহে। বিশেষতঃ আপনারা জানিবেন যে, সীতাকে অন্যভাবে লঙ্কায় যাইতে হইবে। সেইজন্য বলিতেছি, আপনা-দের আদরিণী সীতার যেন সুর-সুন্দরীগণের ন্যায় বন্দি-দশা না ঘটে।" সেই সময়ে মহাকলরব উত্থিত হওয়ায় সকলে দেখিলেন যে, অকাল-মেঘের ন্যায় ভীমদর্শন দুইটী রাক্ষস অনুচর সহ ধাবিত হইতেছে। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাদিগকে সুন্দো-পসুন্দর পুত্র সুবাহু-মারীচ বলিয়া প্রকাশ করিলেন, এবং সেই যজ্ঞ-বিঘ্নকারীদিগকে বধ করিবার জন্য রাম-লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন। রাম-লক্ষ্মণও মহর্ষির আদেশ পালনে রত হইলেন। কুমারী-দ্বয়ের মনে আবার ভীতি ও সংশয়ের সঞ্চার হইল। সর্ব্বমায় বলিতে লাগিলেন যে, এইবার ভালই ঘটিবে দেখিতেছি। বিধি বিপর্য্যস্ত হইবে। শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া পরে মাল্যবানকে সমস্ত অবগত করাইব। রাক্ষস-মথনে রাম-লক্ষ্মণকে প্রবৃত্ত দেখিয়া রাজা কুশধ্বজ তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অপ্রমত্ত ভাবে প্রমত্ত নিশাচরদিগকে পরাজয় করিতে উপদেশ দিলেন, এবং নিজেও তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন যে, তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নাই,

তুমি এইখান হইতেই অনুজসহায় রামচন্দ্রের অনুপম বল প্রত্যক্ষ কর, অথর্ব্ববেদোক্ত তীব্র অভিচারের ন্যায় দেখ, তিনি কিরূপে ব্রহ্মদ্বেষিগণকে নিহত করিতেছেন।

(২)

সর্ব্বমায় সিদ্ধাশ্রম হইতে লঙ্কায় প্রত্যাগত হইয়া রাবণের মাতামহ ও সচিব মাল্যবানকে সমস্ত সংবাদ অবগত করাইলেন। মাল্যবানের চিত্ত রাবণের ভবিষ্যৎ চিন্তায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের পর্ব্বত-প্রতিম মারীচকে অতিদূরে নিক্ষেপ, সুবাহু ও তাড়কার বধ তাঁহার হৃদয়ে পীড়া জন্মাইতেছিল। একাকী লক্ষ্মণ কর্তৃক মারীচ সুবাহুর অসংখ্য অনুচরের বিনাশে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিলেন। ব্রহ্মাকর্তৃক দেবগণের বীর্য্যোৎকর্ষে নির্ম্মিত হর-ধনুর ভঙ্গে, কৃশাশ্বশিষ্য বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে রাম-লক্ষ্মণের বিজয়-জননী দিব্যাস্ত্রোপনিষদ্ বিদ্যার প্রাপ্তিতে তিনি অধিক-তর বিস্মিত হইয়া উঠিতেছিলেন, বিশেষতঃ সর্ব্বমায়ের সম্মুখে প্রৌঢ় মুনির রাবণের অনিষ্টকর অস্ত্র-প্রদান অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়াই, তিনি মনে করিতে-ছিলেন। তাহার পর আবার সীতার বন্দিদশায় জনকের উপেক্ষা, রাবণের প্রতি দেবগণের শৈথিল্যপ্রকাশ, এবং জনকের নান্দীদান ও দেবতাদিগের দুন্দুভিধ্বনি প্রভৃতি মঙ্গলানুষ্ঠানে রাবণের প্রতাপ খলনে যে নানারূপ বিকৃতি ঘটিতেছে, ইহাই তাহার ধারণা হইল।

তাহার এইরূপ চিন্তার সময়ে রাবণ-ভগিনী শূর্পণখা উপস্থিত হইয়া মাতামহকে অভিবাদন করিলেন। মাল্যবান তাঁহাকে বসিতে বলিয়া জন-কের নিকট কোন সংবাদ পাঠাইতে হইবে কি না জানিতে চাহিলেন। শূর্প-ণখা উত্তর দিলেন যে, মিথিলায় পাণিগ্রহণ-মঙ্গল সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আবার মহর্ষি অগস্ত্যও রামের জন্য মঙ্গলোপহার স্বরূপ মাহেন্দ্র ধনুও পাঠাইয়া দিয়াছেন, সেকথা শুনিয়া মাল্যবান বলিতে লাগিলেন, শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকল দেখিতেছি, ব্রহ্মর্ষিদিগের নিকট হইতে রামের সমীপে উপস্থিত হইতেছে। ব্রাহ্মণের অনুগ্রহই ক্ষত্রিয়ের অমোঘ অস্ত্র, ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ-নীত ক্ষাত্র তেজই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। শূর্পণখা রামচন্দ্রকে মনুষ্যমাত্র বলিয়া অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিলে, মাল্যবান বলিতে লাগিলেন "বৎস,

ও কথা বলিও না। রামচন্দ্র স্বভাবতই অদ্ভুত ও অনিবার্য্য পর-ব্রহ্ম বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। দেবাসুরে যাঁহার চরিত্র গান করিয়া থাকে, তাঁহার মর্ত্ত্যত্বে কি আসে যায়? কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে যাঁহারা তর্কের অতীত, সেই দেবতা ও ঋষিগণ সত্তামাত্রেই শক্তিসঞ্চার করিতে পারেন। সহজ-শক্তিসম্পন্ন বস্তুতে ত কথাই নাই। আবার একথা স্মরণ রাখিও যে, ব্রহ্মা বর দান কালে মর্ত্ত্য হইতে অভয়ের কথা বলেন নাই। রাঘব স্বভাবতই ধর্ম্মগোপ্তা এবং আমরা ধর্ম্মদ্রোহী, সুতরাং বলবান প্রতিযোগীর সহিতই আমাদের বস্তুস্বভাবপ্রযুক্ত নাশ্য-নাশকভাবরূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।" স্পর্ণখা উত্তর দিলেন যে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? দশাননের ঈষদুন্মীলিত লোচন ও অবনত বদন দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, তিনি হৃদয়ে দারুণ অবমাননা অনুভব করিতেছেন। সুতরাং লঙ্কাধিপতি যে সহজে ক্ষান্ত হইবেন, এরূপ মনে হয় না। তাহা শুনিয়া মাল্যবান বলিতে লাগিলেন, "সেকথা যথার্থ বটে, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বিশ্বস্রষ্টা যুগাদিগুরু স্বায়ম্ভুব-পূজ্য সপ্তর্ষির ও আমাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন বিদেহরাজের কি প্রিয় বলিয়া বোধ হইল না? ভাল, সে বিষয়ের উল্লেখ নাই করিলাম, কিন্তু দুষ্কর তপস্যায় প্রদীপ্ত, দীপ্তশ্রী, জগৎপতি পৌলস্ত্যের ন্যূনতা কি কারণে তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল? কন্যা-প্রার্থনা প্রকাশ করিয়াও আমাদের প্রভুর ফলপ্রাপ্তি ঘটিল না। বরঞ্চ তাঁহার ঘোরতর অপকারী ও বিরোধী রামের হস্তে তিনি কন্যা সমর্পণ করিলেন! শত্রুর মান-যশের উৎকর্ষ, নিজের তৎসমুদায়ের শিথিলতা, এবং স্ত্রীরত্ন পরহস্তগত হওয়ায়, জগৎপতি গর্ব্বিত দশানন কিরূপে এ সমস্ত সহ্য করিবেন"?

যখন তাঁহারা এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্রতীহারী আসিয়া নিবেদন করিল যে, পরশুরামের নিকট যে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, সে এই তমালরস-লিখিত তালীপত্র আনয়ন করিয়াছে, প্রতীহারী পত্র প্রদান করিয়াই নিষ্ক্রান্ত হইল। পত্র লইয়া মাল্যবান পড়িতে লাগিলেন, "স্বস্তি, মহেন্দ্র দ্বীপ হইতে পরশুরাম লঙ্কার অমাত্য মাল্যবানকে অভিবাদন করিতেছেন, তোমরা অবগত আছ যে, আমরা দণ্ডকারণ্য তীর্থোপাসকদিগকে অভয় প্রদান করিয়াছি, কিন্তু শুনিতেছি

যে, তথায় বিরাধ, দনু, কবন্ধ প্রভৃতি কেহ কেহ অত্যাচার করিতেছে, অতএব তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া তোমাদের ও আমাদের মাহেশ্বর প্রীতির অনুসরণ কর। ব্রাহ্মণাতিক্রমের পরিত্যাগই তোমাদের পক্ষে শুভকর বলিয়াই জানিবে, অন্যথা তোমাদের মিত্র পরশুরাম অসন্তুষ্ট হইবেন, ইতি।" শূর্পণখা পত্রখানির পাঠারম্ভে লঙ্কাধিপতিকে অতিক্রম করিয়া অমাত্যের সম্ভাষণে কিছু বিরক্ত হইয়া উঠেন, পাঠ শেষ হইলে তিনি পত্রের লিখন-ভঙ্গিকে ঈষৎ মসৃণ—কিন্তু কর্কশ ও গুরু-গম্ভীর বলিয়া অভিহিত করেন। মাল্যবান উত্তর দিলেন, আমার পত্রে লঙ্কেশ্বরকেই অভিনন্দন করা হইয়াছে, আর লিখন ভঙ্গির কথা কি বলিতেছ? ইহা স্বয়ং জামদগ্ন্যের পত্র। এই ভগবান্ পরশুরাম স্বকীয় বাহুবল তপস্যা, বিদ্যা ও বীর্য্যের কার্য্যাবলীর উৎকর্ষে দর্পান্বিত হইয়াও আবার সর্ব্বত্যাগে নিরীহভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, কোন কারণে অনাস্থা হওয়ায় শৈব প্রীতিরই জন্য আমাদিগের প্রতি এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন, আবার কার্য্যবিশেষে প্রচুর ন্যায় অতি কর্কশও হইয়া উঠিতেছেন।

তাহার পর মাল্যবান এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। শূর্পণখা তাঁহার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মাল্যবান বলিতে লাগিলেন যে, রাম কর্ত্তৃক হরধনু ভঙ্গের কথা শম্ভুশিষ্য জামদগ্ন্য জানিতে পারিলে কদাচ তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন না, কোপবশে যুদ্ধারম্ভ করিয়া যদি উভয়েই হত হন, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা আমাদের প্রিয়তর আর কিছুই নাই, তবে ক্ষাত্রয়ান্তক পরশুরাম জয়লাভ করিলে রামকে বধ না করিয়া তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না, এ বিষয়ে আমাদেরই মঙ্গল। কিন্তু রাম বিজয়ী হইলে সেই ব্রাহ্মণ-ভক্ত কদাচ ব্রহ্মর্ষিকে হত্যা করিবেন না, মুক্তপ্রায় ভার্গবও অস্ত্রধারণে মনোযোগ দিবেন না, ইহাতে আমাদেরই অমঙ্গল ঘটিবে। শূর্পণখা পরশুরামের পরাজয়ের বিশিষ্টতা কি জানিতে চাহিলে, মাল্যবান আবার বিশদরূপে তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, জামদগ্ন্য আরণ্যক ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, রামকে নিহত করিয়া তিনি তাহাতেই রত থাকিবেন, কিন্তু রামচন্দ্র যদি উৎকর্ষ লাভের জন্য উৎসাহ শক্তি-সম্পাদে প্রকৃষ্টতম, ধর্ম্ম-

বিজয়ী ভগবানকে পরাজিত করিতে পারেন, তাহা হইলে দেবতারা তাঁহাকে সর্ব্বজয়ী বলিয়া জানিতে পারিবেন, এবং রাবণ-পরাক্রমে নিভৃত-ক্রুদ্ধ সেই দেবগণ রাবণকেও পাইয়া বসিবেন, আর তাঁহাদিগের অপমানের জন্য বিশ্বরাজ্যের কোপ যে নিত্য বিরাজিত, তাহাতেও সন্দেহ নাই। পৌলস্ত্যজয়ী প্রচণ্ডচরিত কার্ত্তবীর্য্যের বধে যে মুনি সর্ব্বক্ষত্রিয়ের নাশানুষ্ঠানের মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে উপযুক্ত রূপে দমন করিতে পারিলে আমাদের ভয় উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্মময় সৌম্যচরিত রামই বিশ্বপতি হইবেন। এই সমস্ত শুনিয়া সূর্পণখা কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে, মাল্যবান পরশুরামের উত্তেজনাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন, সূর্পণখা তাঁহার পরাজয়ে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা ব্যক্ত করিলে, মাল্যবান শক্তিপ্রয়োগে তাহার প্রতিকার করিতে হইবে বলিয়া উত্তর দেন, তবে ইহাও বলেন যে, রামের পঞ্চভূতাত্মক দেহ ও শক্তি যদি লোকসাধারণ হয়, তাহা হইলে পরশুরামের পরাভব ঘটিবে না, কিন্তু রামদেহ ভূত-সঙ্ঘের সংস্থানাতিরিক্ত অপ্রাকৃত মূর্ত্তি ও তাঁহার শক্তিনিচয় পরা শক্তি হইলে আশঙ্কার কথা বটে, অবশেষে পরশুরামের উত্তেজনার বিষয়ই স্থির করিয়া মাল্যবান সূর্পণখাকে বলিলেন যে, এখন চল, মিথিলা গমনের জন্য জামদগ্ন্যকে উত্তেজিত করা যাউক, মহেন্দ্রদ্বীপে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সেই মাহাত্ম্যে গম্ভীর, ক্ষমাগুণে পবিত্র, সৌজন্যপরিপূর্ণ, প্রসন্ন পুণ্যরাশিতুল্য সর্ব্ব সুখদ, মহামুনির দর্শনে তাঁহার প্রভুত্বের উৎকর্ষ ও তপঃপরাকাষ্ঠায় জাত বিশুদ্ধির অনুভবে বল বর্দ্ধিত ও পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পরশুরাম হরধনু ভঙ্গের সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি ইহাকে স্বীয় গুরু মহেশ্বরের অবমাননা মনে করিতে লাগিলেন, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ভার্গব মহেন্দ্রদ্বীপ হইতে মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে মিথিলায় বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, রামচন্দ্র অন্তঃপুর মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছিলেন, পরশুরাম ধৈর্য্য-ধারণে অশক্ত হইয়া অন্তঃপুরমধ্যেই প্রবেশেরই অভিপ্রায় করিলেন। প্রথমে তিনি অন্তঃপুররক্ষীদিগের দ্বারা রামচন্দ্রকে সংবাদ দিবার জন্য তাহাদিগকে এইরূপ

অবগত করাইলেন যে, কৈলাসোত্তোলনের বল ও ত্রিভুবন-বিজয়ের সামর্থ্য যাহার বাহুতে বিদ্যমান, সেই রাবণের রণমদ যে হেলায় অপহরণ করিয়াছিল, সেই কার্ত্তবীর্য্যের বাহুশাখাসকল কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়া যিনি তাহাকে স্থাণুতুল্য করিয়াছিলেন, যাঁহাকর্ত্তৃক পৃথিবী একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, যিনি ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতের ভেদে ভূতলে হংসাবতরণ করাইয়াছিলেন, এবং যিনি হেরম্ব, ভৃঙ্গী, প্রমথগণ ও কার্ত্তিকেয়ের বিজেতা; সেই জামদগ্ন্য স্বীয়গুরু শঙ্করের ধনুর্ভঙ্গ-রোষে উত্তেজিত হইয়া আগমন করিয়াছেন, এবং রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন।

রামচন্দ্র অবিলম্বে পরশুরামের আগমন সংবাদ পাইলেন। তিনিও সেই মহাভাগ, মহানিধি, শম্ভুশিষ্য, বেদ্যাভাগে বিশুদ্ধচরিত জামদগ্ন্যের দর্শনে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু নম্রা সীতা ভার্গবভয়ে, লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কুলোচিত নিভৃত অনুরাগ-বন্ধনে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখায় রামচন্দ্র মহাশঙ্কটেই পড়িলেন। সীতার কাতরতায় সখীগণও রামচন্দ্রকে অন্তঃপুর বাহিরে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র উৎসবানুষ্ঠান পরাবজ্ঞায় নীরস করা উচিত নহে বলিয়া, তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। তাহারা কিন্তু পরশুরামের একবিংশতিবার জীবলোক নিঃক্ষত্রিয় করার কথা উল্লেখ করিয়া রামচন্দ্রকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। রামচন্দ্র ভার্গবের সে দোষ অন্যান্য গুণের তুলনায় সামান্য বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, এই ভার্গবই একবিংশবার ক্ষত্রিয় ধ্বংস ও কার্ত্তিকেয়ের জয়ে বাহুবলে প্রশংসা লাভ করিয়া অশ্বমেধে সমস্ত পৃথিবী কাশ্যপকে দান করিয়াছিলেন এবং শস্ত্র দ্বারা সমুদ্রকে দূরে অপসারিত করিয়া তাহার প্রদত্ত স্থানে তপোনুষ্ঠান করিতেছেন, রামচন্দ্রের উপস্থিতির বিলম্ব দেখিয়া পরশুরাম অন্তঃপুরমধ্যেই প্রবেশে উদ্যত হইলেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই রক্ষিগণের বলনাশ হওয়ায় তাহারা বিপন্ন হইয়া উঠিল, এবং পুরবাসিগণের হাহাকার রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, ভার্গবের অন্তঃপুর-প্রবেশ চেষ্টা রামচন্দ্রের ভাল লাগিল না। শিষ্টাচার পদ্ধতির প্রণেতা ও বিধান হইয়াও পরশুরামের অনব-

ধানতা ঘটিতেছে দেখিয়া তিনি একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে চারিদিক হইতে হা দেব চন্দ্রমুখ রামচন্দ্র, হা জামাতা ইত্যাদি ধ্বনি উঠিতে থাকায়, সখীরা সীতাকে নিজেই পরিজনবর্গের এই কাতরোক্তি রামচন্দ্রকে জানাইতে বলিল। সীতাও রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। সখীরা রামচন্দ্রকে বেগ-বিশৃঙ্খলা মরালবধূর ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তগমনা সীতাকে লক্ষ্য করিতে বলিলে, রামচন্দ্র তাহা-দিগকে তাঁহার সান্ত্বনা করিতে বলিলেন। সখীরা তখন সীতাকে বলিতে লাগিল যে, সুরাসুর সমস্ত ত্রৈলোক্যের মঙ্গলকর ও তুঙ্গ জয়শ্রী লাঞ্ছিত বলিয়া যে কুমারকে বিভ্রমবিকশিত নেত্র-কুবলয়ে শোভিত মুখ-পুণ্ডরীকে লজ্জা ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিকট সর্ব্বদা বর্ণনা করিতে, এক্ষণে তাঁহার বিজয়গমনে উৎকম্পিত হইতেছ কেন? সীতা পরশুরামকে সর্ব্ব-ক্ষত্রিয়সন্তাপকারী বলিয়া উল্লেখ করিলে রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, প্রিয়ে তুমি নির্ভয়ে ফিরিয়া যাও, আতঙ্ক শ্রম ও ভয়ের সিপ্রাণজাত উৎকম্প তোমার মুগ্ধমধুপপুষ্পরুচি ও লাবণ্যসার অঙ্গে কিরূপে সহ্য করিবে? আমার আশঙ্কা হইতেছে, পাছে তোমার বক্ষোভারে ও দীর্ঘশ্বাসে ক্ষীণ মধ্যটী ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেই সময়ে পরশুরাম চীৎকার করিয়া পরিচারকদিগকে বলিতেছিলেন যে, রামচন্দ্র কোথায় আছেন বলিয়া দেও। সীতা তাহা লক্ষ্য করিতে বলিলেন। সেই সরল সাহসী ও প্রচণ্ডকর্ম্মার পুষ্করাবর্ত্তক-গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর বচননির্ঘোষ শুনিয়া রামচন্দ্রের কর্ণবিবর পরিতৃপ্ত হইল বলিয়া তিনি মনে করিতে লাগিলেন। তাহার পর আবার তিনি অগ্রসর হইতে উদ্যত হ[illegible], সীতা তাঁহার ধনুকধারণ করিয়া পথাবরোধ করিলেন, এবং বলিলেন যে, যতক্ষণে পিতা আগমন না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি যাইতে পারিবেন না। লজ্জা অপেক্ষা সীতার অনুরাগের প্রাবল্য দেখিয়া সখীরা তাহার আলোচনা করিতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতার অনুরাগে পরাজিত হইয়া পড়িলেন। তিনি অবশেষে ধনুক পরিত্যাগ করিয়াই যাইবার অভিলাষ করিলেন, সেই সময়ে আবার পরশুরাম চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রামচন্দ্রের যাওয়ার অভিপ্রায় দেখিয়া সীতা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিবেন বলিয়া জানাইলেন, এবং তাহাই করিতে প্রবৃত্ত

হইলেন। রামচন্দ্র তখন বলিতে লাগিলেন; "গর্ব্বিত তপঃপরাক্রমনিধির আগমনে একদিকে সংসর্গপ্রিয়তা ও বীরহর্ষোন্মাদ আকর্ষণ করিতেছে, অপরদিকে আনন্দকর হরিচন্দনসেক ও ইন্দুকরপতনের ন্যায় স্নিগ্ধ বৈদেহী-স্পর্শ মুহুর্ম্মুহুঃ চৈতন্য বিলোপ করিয়া আমায় যেন ফিরাইয়া আনিতেছে"।

এই সময়ে পরশুরাম নিকটবর্ত্তী হইলে সখীরা বলিয়া উঠিল যে, প্রদীপ্ত সূর্য্যালোকের ন্যায় দেহদীপ্তিতে উজ্জ্বল, বিশৃঙ্খল ও উদ্বেল সহস্র অগ্নিশিখার ন্যায় জটাগ্রপ্রভায় ভয়ঙ্কর ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম সুনিশিত কুঠার সহ বিকট উরুভারে বসুন্ধরা কম্পিত করিয়া একেবারেই সম্মুখে উপস্থিতপ্রায় দেখিতেছি। রামচন্দ্রও ভার্গবকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইনিই ত সেই ত্রিভুবনৈকবীর ভার্গব মুনি, যিনি মহান্ তেজোরাশির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, প্রতাপ ও তপস্যার মূর্ত্তিমান ও স্ফূর্ত্তিমান্ মিলন স্বরূপ এবং পিণ্ডীভূত প্রচণ্ড বীররস তুল্য। এই তপোনিধিও অমিতশক্তি পুণ্যশীল হইয়াও ভীমকর্ম্মা, অভিরাম ঘোরা মূর্ত্তিধারণে ইনি অথর্ব্ববেদের ন্যায়ই প্রকাশ পাইতেছেন। কল্পক্ষয়-কর কালরুদ্রাগ্নিভাব ধারণ করিয়া ভার্গব ত্রিপুরবিজয়ী ক্রুদ্ধ রুদ্রদেবের তীক্ষ্ণ নিখিলভুবনধ্বংসযোগ্য ব্রাহ্মণবেশে রাশীকৃত পুনরুপিত সামর্থ্যসারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। পরশুরামের অপূর্ব্ব বেশ-সমাবেশ দেখিয়া রামচন্দ্রের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল, তাঁহার কণ্ঠে প্রদীপ্ত কুঠার, স্কন্ধে তূণীর, শিরে জটা, বামহস্তে ধনুক। কটিভাগে বল্কল, উরুদেশে অজিন, দক্ষিণ হস্তে বাণ এবং মণিবন্ধে অক্ষসূত্র বলয় দেখিয়া রামচন্দ্র উগ্র ও শান্তরসের মিলনে এক বিচিত্র শোভার কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। তাহার পর তিনি গুরুজনের নিকট হইতে অপসৃত হইয়া সীতাকে অবগুণ্ঠনবতী হওয়ার জন্য উপদেশ দিলেন। ভার্গবকে সমাগত দেখিয়া সীতা করযোড়ে রামচন্দ্রকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন। শুনিয়া রামচন্দ্র উত্তর করিলেন। "প্রিয়ে! ভার্গব মুনি এবং সেইজন্য এই অপূর্ব্ব মিলন আমার প্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি ভীত হইও না, এবং মনে রাখিও যে তুমি ক্ষাত্রিয়া, জগতে বিস্তৃতকীর্ত্তি ও রণপ্রিয় ভার্গবের সেবায় রাঘব ক্ষত্রিয় অসমর্থ নহে।

পরশুরাম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া চলিতে চলিতে বলিতেছিলেন "কি আশ্চর্য্য, এই দুরাত্মা ক্ষত্রিয়শিশু একেবারে আত্মজ্ঞান শূন্য দেখিতেছি। সর্ব্ব-

ভূতে যাঁহার করুণা প্রবাহিত, সেই শান্তাত্মা ভগবান্ ভবানীপতি হইতে এই ধনুর্ভঙ্গকারীর যদি বা ভয় না হইতে পারে, কিন্তু মদান্ধ তারকবধে বিশ্বানন্দদাতা তাঁহার পুত্র স্কন্দের অথবা স্কন্দতুল্য তাঁহার প্রিয়শিষ্য আমার কথা কি একেবারেই শুনে নহে? আমার শান্তভাব অবলম্বনের এই দারুণ পরিণামই বটে। সর্ব্ব ক্ষত্রিয়ধ্বংসের পর যাহারা আবার জগতে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল, সেই ক্ষত্রিয়গণ আবার দেখিতেছি ধনুর্দ্ধারণ করিতেছে। ভুজবলে উন্মত্ত তাহাদের উশৃঙ্খল চরিতকথা আমার কর্ণগোচরও হইতেছে।" তপস্যা, তেজ ও বীর্য্যে গরীয়ান্ যশোনিধি গর্ব্বিত জামদগ্ন্যকে রোষভরে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, রামচন্দ্রের হস্ত অভিনব ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা-প্রদানের ও ঋষির পদস্পর্শের জন্য স্ফুরিত হইতে লাগিল। কিন্তু, তিনি কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সময়ে পরশুরাম সমীপবর্ত্তী হইয়া দাশরথি রাম কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র স্বয়ংই নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন। স্বয়ং রামচন্দ্রের পরিচয়ে ঋষি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে সত্য সত্যই ইক্ষ্বাকুবংশীয় বলিয়া অভিহিত করিলেন, তিনি রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিতে লাগিলেন, "তোমার বিনাশের জন্য তোমাকে অন্বেষণ করায় বিশুদ্ধ-হৃদয় তুমি দর্পভরে গন্ধগজ-শিশুর করিকুম্ভবিদারক বজ্রহস্ত সিংহের নিকট উপস্থিতির ন্যায় আমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছ." এই কথা শুনিয়া নারীগণ 'পাপ শান্ত হউক' 'অমঙ্গল দূরে যাউক' বলিয়া উঠিল। জামদগ্ন্য তখন রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার সেই সৌম্যমূর্ত্তি ভার্গবের হৃদয় অধিকার করার উপক্রম করিল, রামচন্দ্রের চঞ্চল পক্ষশিখা বাল্য ও প্রৌঢ়ভাব মিশ্রণের ন্যায় শিশুগম্ভীর মনোহর প্রকৃতি, তাঁহার লাবণ্যপূর্ণ রূপ এবং সৌন্দর্য্যসার শোভা ভার্গবের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার বধ করিতে হইবে বলিয়া পরশুরাম বীরব্রতের নিষ্ঠুরতাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি রামকে বলিয়া উঠিলেন। "পূর্ব্বে যে হরধনু সামান্যমাত্র আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার ভঙ্গে জাতমহাক্রোধের প্রেরণায় ভীম ভার্গবের ভুজস্তম্ভক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত পরশু তোমার কণ্ঠপীঠের অতিথি হউক। এই পরশু দ্বারাই ভগবান্ মহেশ্বর খণ্ডপরশু নামে খ্যাত হইয়াছেন" পরশু-

রামের প্রজ্বলিত ভাব দেখিয়া নারীগণ ভীত হইয়া উঠিল। রামচন্দ্র ধৈর্য্য সহকারে ও সসম্মানে কহিলেন যে, সসৈন্য কার্ত্তিকেয়জয়ে ভগবান্ নীল-লোহিত সন্তুষ্ট হইয়া সহস্র বৎসর শিষ্যত্ব স্বীকারের পর আপনাকে ত এই পরশুই প্রদান করিয়াছিলেন? তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া সখীরা সীতাকে বলিতে লাগিল যে, রাজকুমারী দেখ, রাজপুত্র কেমন মনে মনে সম্মান করিয়া অথচ নিষ্কম্প ধীর-গম্ভীর ভাবে ভগবান ভার্গবের অস্ত্রকে উপহাস করিতেছেন। শুনিয়া সীতা সবিস্ময়ে অস্ত্রের প্রতি দৃঢ় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

জামদগ্ন্যের নিকটও রামচরিত্র বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হইতেছিল। ভার্গবের পূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বিগণ অপেক্ষা রামচন্দ্র অন্য প্রকারই প্রতীত হন। রামের অনির্ব্বাচ্য ও অনিরূপণীয় মাহাত্ম্য সেজন্য এবং উৎসাহ-গম্ভীর পৌরুষ-স্থৈর্য্য দেখিয়া পরশুরামের চিত্তে মহান্দোলন উপস্থিত হয়। তিনি কিছু শান্ত-ভাবে রামকে বলিলেন যে, তুমি যে পরশুর কথা বলিতেছিলে, এই সেই আমার গুরুদেবের প্রিয় পরশু। জামদগ্ন্যের আলাপনে সখীরাও কিছু আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। এবং ভার্গবের ক্রোধোপশম হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিতে লাগিল। পরশুরাম আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "অস্ত্রপ্রয়োগের অভ্যাস-পরীক্ষায় গণসৈন্য-পরিবৃত কুমার আমাকর্ত্তৃক পরাজিত হন, এই সামান্য কারণেই আমাকে আলিঙ্গন করিয়া গুণগ্রাহী ভগবান্ গুরুদেব অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পরশুই প্রদান করিয়াছিলেন।" ভার্গবের কুমার-বিজয়কে সামান্য ব্যাপার বলিয়া নির্দ্দেশ করা রামচন্দ্রের নিকট তাঁহার গর্ব্বপ্রকাশই বলিয়া অনুমিত হইল। বিরক্তির ভাব না দেখাইয়া রামচন্দ্র বলিলেন, "এই জন্যই স্বর্গে-মর্ত্ত্যে আপনার বীরবাদ ঘোষিত হইয়াছে। যাহার জন্য ভগবান্ গুরুদেব প্রচণ্ড চণ্ডীপতি ত্রিভুবনে খণ্ডপরশু নামে বিখ্যাত, কুমারবিজয়ের পর তাহা লাভ করিয়া আপনিও পরশুরাম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। জমদগ্নি হইতে যাঁহার উৎপত্তি, ভগবান্ পিনাকী যাঁহার গুরু, যাঁহার শৌর্য্য বাক্যের অগোচর, কেবল কর্ম্মেই ব্যক্ত হয়, সপ্ত সমুদ্রবেষ্টিত মহীর অকপট দান যাঁহার ত্যাগ বলিয়া খ্যাত, সেই ধনুর্ব্বেদ ও তপস্যার আধার ভগবানের কোন্ কার্য্যই বা অলৌকিক নহে?" সখীরা গুরুজনের প্রতি রামচন্দ্রের এই রমণীয় সম্ভাষণের প্রশংসা করিতে লাগিল। রামচন্দ্রের কথায় জাম-

দগ্ন্যের মনে অত্যন্ত প্রীতির সঞ্চার হইল। তিনি আনন্দোৎফুল্ল বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন। মানসানুরূপিণী নয়নাভিরামতায় শোভিত হইয়া রাম, তুমি না জানি কি অচিন্ত্যরূপ রমণীয় হইয়া উঠিয়াছ, তাই আমার এত প্রিয় বলিয়া অনুমিত হইতেছ। সত্যই বলিতেছি, হেরম্ব-দন্তে যাহার এক পার্শ্ব অঙ্কিত, কুমারের শরক্ষেপে যাহা ব্রণ-লাঞ্ছিত, আমার সেই বক্ষ অদ্ভুত বীরলাভে রোমাঞ্চিত হইয়া যেন তোমার আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে।" সখীরা রামচন্দ্রের এই সৌভাগ্যের কথা সীতাকে শুনাইল, তাহারা আরও বলিল যে, তুমিই কেবল লজ্জাভয়ে সঙ্কুচিতা হইয়া থাক; শুনিয়া সীতা অশ্রুপাত ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ভার্গবের বাক্যে রামচন্দ্র উত্তর দিলেন যে, ভগবন্, আলিঙ্গন ব্যাপরটী কিন্তু উপস্থিত কার্য্যের বিপরীতই বোধ হইতেছে? রামচন্দ্রের ধীর-মসৃণ মাহাত্ম্যশোভিত বিনয়ে সীতার হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। জামদগ্ন্যের মনেও এই ক্ষত্রিয় শিশুর পরগুণগ্রাহী সৌজন্যপূত অন্তঃকরণের এবং পারমার্থিক বিনয়-দুর্জ্ঞেয় নিপুণ-বুদ্ধি-গ্রাহ্য অহঙ্কারভাবের কথা জাগিয়া উঠিতেছিল। তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন "অসাধারণ মহচ্চরিত্রের অত্যদ্ভুত স্বভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও আমার অনাস্থা দূর হয় নাই। এই বীর-বালকাকৃতি অপ্রমেয়-সামর্থ্যসার অনির্ব্বচনীয় পদার্থটী কি? ইহার শুভাকৃতি সপ্ত-ভুবনের অভয়দান পুণ্যের সম্ভারই বলিয়া মনে হয়। তাহাতে আবার লাবণ্য শোভায় সাত্ত্বিক-গুণ-দীপ্ত তেজ, ধর্ম্ম, মান, বিজয় ও পরাক্রম বিস্ফু-রিত হইতেছে। লোকসকলের পরিত্রাণের জন্য, মূর্ত্তিমান্ অস্ত্রবেদতুল্য ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষার নিমিত্ত শরীরী ক্ষাত্র-ধর্ম্মসম রাশীভূত সামর্থ্য ও পুঞ্জীভূত গুণের ন্যায় জগতের পুণ্য-নির্ম্মাণরাশি যেন প্রাদুর্ভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে। কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন করিয়া কঠোরতা প্রকাশচ্ছলে সীতাকে অভ্যন্তরে লইয়া যাওয়ার জন্য সখীদিগকে বলিলেন। রামচন্দ্রও বুঝিলেন যে, ভার্গব শান্তভাবে নিবৃত্ত হইতেছেন না। সেই সময়ে এইরূপ ধ্বনি উত্থিত হইল যে, ধনুর্ধর সীরধ্বজ ও জনকবংশের পুরোহিত শতানন্দ আগমন করিতেছেন। সখীরা তখন সীতাকে বলিলেন যে, পিতা আসি-তেছেন চল, আমরা অভ্যন্তরে যাই। সীতা সংগ্রামলক্ষ্মীর নিকট অঞ্জলি-

বদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের মঙ্গল কামনা করিতে করিতে সখীগণের সহিত সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাজা জনকের আগমন শুনিয়া জামদগ্ন্য বলিতে লাগিলেন যে, এই কি সেই মনীষী রাজা জনক, যিনি পুরোহিত শতানন্দ কর্তৃক রক্ষিত এবং যাঁহাকে আদিত্যশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যমুনি পরব্রহ্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। ইনি সচ্চরিত্র বটেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় বলিয়া আমার শিরঃশূল উপস্থিত হইতেছে। জনক ও শতানন্দ পরস্পরে আলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ভার্গবের আগমনে তাঁহারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। শতানন্দ জনককে কি করা কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে, জনক উত্তর দিলেন যে, ঋষি যদি অতিথিভাবে আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই শ্রোত্রিয়কে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, পরে মধুপর্ক ও দান করিতে হয়। আর যদি তিনি শত্রুভাবে আমাদের পুত্র-ধনের প্রতি অকারণে দ্বেষ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই ন্যায়হীনে কার্মুকাধিকারেরই ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত। রামচন্দ্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে জামদগ্ন্যের নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছিল। রাম তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভার্গব উত্তর দিলেন "এমন কিছু নহে, তবে তোমার দর্শনে সর্ব্বসুখ মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব ভূমানন্দের সৃষ্টি করিতেছে। নেত্রানন্দে পরমা প্রী[illegible]র সঞ্চার হইতেছে। কিন্তু নববিবাহিত শ্রীমান্ চিত্তপ্রিয় তোমাকে গুরুর অবমাননার জন্য বধ করিতে হইবে বলিয়া, পূর্ব্ব হইতেই পরিতাপ উপস্থিত হইয়াছে"। শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন যে, জানি, আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুকম্পা আছে। পরশুরাম উত্তর দিলেন যে, তুমি অত্যন্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়াছ দেখিতেছি। অমৃতপূর্ণ মেঘ-স্নিগ্ধকায় তোমার কম্বু-কণ্ঠে আহা এই কুঠার এখনই নিপতিত হইবে। রামচন্দ্র তখন একটু উত্তেজিত হইয়া ব্যঙ্গভাবে বলিলেন যে, তাহা হইলে দেখিতেছি, সত্য সত্যই আমার প্রতি করুণা বিতরণ করিতেছেন। ভার্গব কহিতে লাগিলেন, "আমার প্রতি তুমি ভ্রূকুটী-ভঙ্গি করিতেছ? অরে ক্ষত্রিয় শিশু! সম্প্রতি তুমি একটী বালিকা নববধূর পাণিগ্রহণ করিয়াছ এবং নিজেও সুন্দর, সেইজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার এভাব পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই, লোকপরম্পরা এইরূপ প্রবাদ

চলিয়া আসিতেছে যে, জামদগ্ন্য পরশুরাম মাতার মস্তক ছেদন করিয়া-ছিলেন। আর একথা সর্ব্বভূতেই বিদিত আছে যে, ক্ষত্রিয়জাতির প্রতি রোষপরবশ হইয়া ভার্গব গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়শিশুদিগকে খণ্ড খণ্ড, একবিংশতিবার সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সংহার, তাহাদের রক্তপরিপূর্ণ হ্রদে স্নান এবং তজ্জনিত মহানন্দে ক্রোধাগ্নির শান্তি করিয়া সেই রক্ত দ্বারাই পিতৃতর্পণ সমাধা করিয়া-ছিলেন"। শুনিয়া রামচন্দ্র উত্তর করিলেন যে, নৃশংসতা পুরুষের গুণ নহে। সে বিষয়ে শ্লাঘাই বা কি? তখন পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "অরে নির্ভয় ক্ষত্রিয় শিশু, তোমাকে অত্যন্ত ধৃষ্ট বলিয়াই বোধ হইতেছে? শীঘ্রই ধনু আকর্ষণ করিয়া আমায় প্রহার কর, আমি পূর্ব্বেই প্রতিহত হইতে ইচ্ছা করিয়া থাকি। আমি আঘাত করিলে পরে আর কিছুই হইবে না। বহ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে যখন প্রদীপ্ত কুঠার স্কন্ধচ্ছেদ করিবে, তখন কবন্ধ হইয়া আর কি করিতে পারিবে?"

তাঁহাদের এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডার সময় জনক ও শতানন্দ নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা রামচন্দ্রকে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে অপেক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন। রামচন্দ্রও গুরুজনের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইলেন। শতানন্দকে দেখিয়া জামদগ্ন্য সুখপ্রশ্ন করিলে, শতানন্দ তাঁহার দর্শনে বিশেষ সুখানুভব করিয়াছেন বলিয়া উত্তর দিলেন, এবং তাঁহার আতিথ্যের জন্য সমস্তই প্রস্তুত আছে জানাইলেন। জামদগ্ন্য, যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য গৃহমেধী সুচরিত পুরোহিতের কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে, আমি আতিথ্যকামী নহি। "তবে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুরমর্য্যাদা লঙ্ঘন করা কি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে" বলিয়া শতানন্দ উত্তর দিলেন। জামদগ্ন্য তাহার উত্তরে বলিলেন যে, অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণেরা প্রভুদিগের গৃহব্যাপারে অনভিজ্ঞই হইয়া থাকে। ভার্গবের কথায়, রামচন্দ্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ইহার উত্তর ত্রিভুবনদাতার সামন্তের প্রতি উপযুক্ত গর্ব্ব প্রকাশই হইয়াছে।" জনক রামচন্দ্রের প্রতি ভার্গবের পাপেচ্ছার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, জামদগ্ন্য উত্তর দিতে না দিতে কঞ্চুকী আসিয়া রামচন্দ্রের কঙ্কণমোচনের কথা জানাইলেন। জনক ও শতানন্দ তাহাকে শ্বশ্রূজনসমীপে গমন করিতে উপদেশ দিলে, রামচন্দ্র

ভার্গবের অনুমতি চাহিলেন। জামদগ্ন্যও তাহাকে লোকধর্ম্ম পালন করিতেই বলিলেন; কিন্তু অরণ্যবাসী তিনি অধিকক্ষণ যে জনপদে থাকিতে পারিবেন না, সে কথাও জানাইলেন। তাহার পর রামচন্দ্র অন্তঃপুরে গমন করিলেন, এই সময়ে দশরথ-সারথি সুমন্ত্র আসিয়া সকলকে জানাইল যে, মহারাজ দশরথের নিকটে মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন সকলে তাঁহাদিগের দর্শনের জন্য সেস্থান হইতে অপসৃত হইলেন।

সীতা।

আহা মরি রাজকন্যা রাজ-পুত্রবধূ
ছল ছল আঁখিসম ঢল ঢল প্রাণ,
বনে ঝরে পড়া ফুল বুক ভরা মধু
কবি মরে যা'ক দুখে গেয়ে তব গান।
কমল-কোমল দেহ অনলে দাহন,
চেড়ীর ভীষণ দণ্ডে দারুণ প্রহার,
চির বাসস্থান তব কানন গহন
একবিন্দু স্থান তোমা দিল না সংসার?
হা সীতা! যে দেশে তব হয়েছে সম্ভব
সে দেশের নারী কভু ইচ্ছে হর্ম্ম সুখ?
চাহে কি গো বিলাসিতা প্রাধান্য-বৈভব?
চেয়ে কি গো লয় না'ক গৌরবের দুখ?
মনে হ'লে তব কথা হয় না কি সাধ
বনে চ'লে যেতে ভাঙ্গি সংসারের বাঁধ?

সুকৃতি।

—:০:—
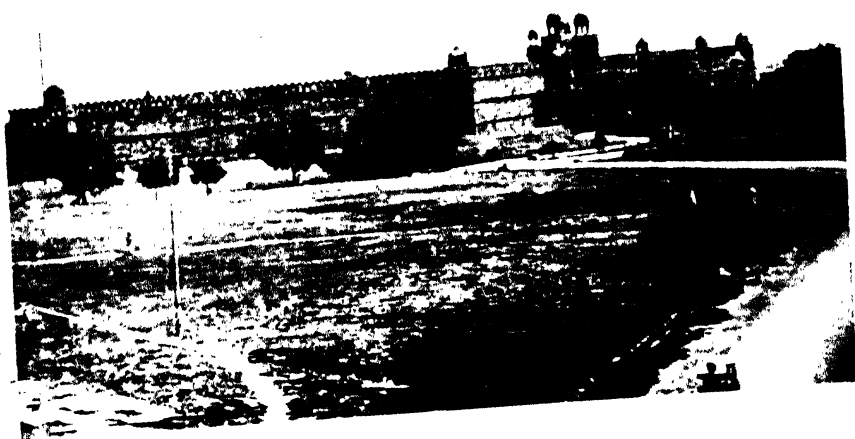
নাদিরা।

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌ সাহজহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্বীয় পিতৃব্য, সুলতান পরভেজের কন্যা নাদিরাকে বিবাহ করেন। নাদিরার গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র—সোলেমান শেকো ও শিপহর শেকো এবং কন্যা জুহন্‌জেবের জন্ম হয়।

বৃদ্ধ বয়সে শাহজহান্‌ যখন অসুস্থ হইয়া পড়েন, তখন তিনি সাহজাদা দারার সাহায্যে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ভবিষ্যতে রাজ্যলক্ষ্মী যে দারার অঙ্কশায়িনী হইবেন, বহুদিন হইতে সম্রাটের অন্যান্য পুত্রেরা একরূপ স্থির জানিয়াছিলেন। এই সময়ে রাজকার্য্য পরিচালনার ভার দারার উপর ন্যস্ত হওয়ায় তাঁহাদের ধারণা সুদৃঢ় হইয়া উঠিল। দুর্ব্বল হস্তে সম্রাট্‌ তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারিবেন না জানিয়া, ময়ূর-সিংহাসন-লোলুপ ভ্রাতৃগণ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুখে সকলেই প্রচার করিয়া দিলেন,—মুমূর্ষু পিতার অন্তিমশয্যার পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিবার অধিকার লইবার জন্যই তাঁহাদের এই অভিযান; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের প্রাণের বাসনা কার্য্যে পরিণত হইতে বসিল।

সুজা সর্ব্ব প্রথমে আগ্রার নিকট ছাউনি করিলে দারা তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অগ্রসর হ'ন; এ যুদ্ধে সুজা পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তৎপরে ঔরঙ্গজেব স্বীয় ভ্রাতা মুরাদকে হস্তগত করিয়া আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলে, দারা যশোবন্ত সিংহকে তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পাঠান। যুদ্ধে যশোবন্ত সিংহের পরাজয়-বার্ত্তা শুনিয়া দারা যুক্ত-সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় দারার সমস্ত আশা ভরসা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়।

পরাজিত দারা লজ্জায় আর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তিনি কৌশলী ঔরঙ্গজেবকে বেশ চিনিতেন,—তাঁহার হস্তে একবার পড়িলে তাঁহার প্রাণরক্ষা কঠিন হইবে ভাবিয়া নাদিরা ও তত্রকন্যাগণকে

সঙ্গে করিয়া দিল্লী অভিমুখে গমন করিলেন, ও দিল্লী-দুর্গে আশ্রয় লইলেন; কিন্তু সেখানেও বেশী দিন নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারিলেন না। ঔরঙ্গজেবের অনুচরেরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করায়, তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া গোপনে দিল্লীর নিকট চিরবিদায় লইয়া দুর্গ-পরিত্যাগ করিলেন। দৈব-দুর্ব্বিপাকে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তাতাবাকার দুর্গে আশ্রয় লইবেন; কিন্তু শুনিলেন, ঔরঙ্গজেব-প্রেরিত সৈন্যের নায়ক মীরবাবা উহা পূর্ব্ব হইতেই অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া আর অগ্রসর হওয়া বিধেয় নয় ভাবিয়া, সিন্ধু নদী অতিক্রম করিয়া পারস্যদেশে যাইবেন স্থির করিলেন।

নাদিরা তাঁহার এই প্রস্তাব শুনিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—যদি তিনি তাঁহার এই সংকল্প ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে স্বচক্ষে তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী-কন্যাকে পারস্যরাজের দাসীরূপে দেখিতে হইবে। দারা বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তদ্ভিন্ন বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে এ সংকল্প ত্যাগ করিতে হইল; কারণ, নাদিরা অবিরাম পথভ্রমণে, অনাহারে, অনিদ্রায় একবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং কি করিয়াই বা তিনি নাদিরাকে লইয়া সুদূর পারস্যে উপনীত হইবেন? নাদিরা নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া স্বামীকে বলিলেন,—আমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই, অতএব আপনি পুত্রকন্যাগণকে লইয়া সত্বর নিজের মঙ্গলের জন্য এ স্থান ত্যাগ করুন।" *

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দারা স্থির করিলেন, এই সিন্ধুদেশের নিকটবর্ত্তী দাদর প্রদেশে পাঠান জমীদার জিহন্ খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

* Nadira the favowrite Sultans was dying. Spent with fatigue, the was altogether in capable of the journey. * * * She knew his (dara) situation of requested carnestly that they should more away. "Death", said she, "will soon relive the daughter of purvez from her mis fortunes; but let her not add to those of her lord."
'Dows' History of Hindostan—Vol. III. P. 307—8.

জিহন্ খাঁ দুইবার বিদ্রোহাপরাধে সম্রাট্ কর্ত্তৃক হস্তিপদতলে নিহত হইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু দারার চেষ্টায় দুইবারই রক্ষা পান। এক্ষণে তাঁহার নিকটে সৈন্য প্রার্থনা করিলে, বোধ হয় তাঁহাকে হতাশ হইতে হইবে না, ইহাই দারার মনে হইতেছিল; বিশেষতঃ সেই সৈন্যসাহায্যে তাতাবাকার দুর্গ অধিকার করিয়া, তথা হইতে কিছু ধনরত্ন সঞ্চয় করিতে পারিলে কান্দাহার ও কাবুল স্বচ্ছন্দে যাওয়াও ঘটিবে।

স্বামীর এই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া নাদিরা তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, জিহন্ খাঁ একজন বিদ্রোহী দস্যুবিশেষ, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোন কার্য্য করা উচিত নয়। এই দুর্দ্দিনে তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, নিশ্চয়ই সে আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে না। নাদিরা অধিকন্তু বুঝাইলেন যে, তাতাবাকার দুর্গ জয় করিবার এখন এমন কোন প্রয়োজন নাই; কারণ কাবুলের পথে যাইলে, মীরবাবা কখনই দুর্গ ছাড়িয়া তাঁহাকে বাধা দিতে আসিবে না।

দারা কিন্তু এ সমস্ত যুক্তির সারবত্তা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি সপরিবারে জিহন্ খাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন।

এদিকে নাদিরার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। জিহন্ খাঁর আবাসে গিয়া তাঁহার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। দারা সারারাত্রি বিনিদ্র-নয়নে পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া মূর্চ্ছা অপনোদনের শতচেষ্টা করিলেন,—কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। প্রভাতে যখন কুসুমকলিগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, সেই সময় নাদিরা-কুসুম অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িল। দারা নাদিরার মৃতদেহ বক্ষে করিয়া প্রাণের আবেগে শতচুম্বনেও সে গোলাপী অধরে রক্তিমরাগ ফুটাইতে পারিলেন না। অপলক দৃষ্টিতে নয়নের দিকে চাহিয়া চাহিয়াও যখন কোন উত্তর পাইলেন না—চিরাভ্যস্ত খঞ্জন-আঁখির কৃষ্ণতারার সে মধুর 'মধুর' চাহনি দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি ভাবিলেন, —অভিমানিনী বুঝি মান করিয়া শয়ান আছে, তাই মান-ভঞ্জনপ্রয়াসী হইয়া যখন বিফল-মনোরথ হইলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে স্বতঃই নির্গত হইল—"হা অদৃষ্ট"!

ঔরঙ্গজেবের নির্ম্মম ব্যবহারে অদৃষ্টের দারুণ পরিহাসে দারার হৃদয়

একপ্রকার বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; এক্ষণে জীবনের শেষ অবলম্বন, বিপদের একমাত্র সহচরী প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগে তিনি শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সমস্ত দিন তিনি মৃতপত্নীর শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দারা ভগ্নহৃদয়ে লাহোরের যেস্থানে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সমাহিত আছেন, পত্নীর শেষ অনুরোধে তথায় তাঁহার দেহ কবরস্থ করিবার ভার গোলাম মহম্মদ নামে তাঁহার একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর উপর প্রদান করেন। তিনিও এ আদেশ প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই।

নাদিরার মৃত্যু সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। কাফি খাঁর মতে নাদিরা আমাশয় রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। (১)বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন, দারা অকৃতজ্ঞ জিহন্ খাঁর নিকট উপস্থিত হইলে, সে তাঁহাকে বন্দী করিয়া প্রথমে লাহোরে লইয়া যায়। এই সময়ে নাদিরা স্বামীর ও নিজের পরিণামের বিষয় ভাবিয়া বিষভক্ষণে সর্ব্বযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।* টেভার্ণিয়ারের মতে জিহন্ খাঁর আবাসে আগমনকালে পথিমধ্যে নাদিরা জলাভাবে প্রাণত্যাগ করেন।

হৃতসর্ব্বস্ব বিগতশ্রী বুদ্ধিভ্রংশপ্রাপ্ত দারার শোচনীয় পরিণাম ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই। ঔরঙ্গজেবের প্ররোচনায় দুর্ব্বৃত্ত জিহন্ খাঁ উদার-প্রকৃতি দারার শিরশ্ছেদন করিয়া সম্রাট্‌কে উপঢৌকন প্রদান করেন। জ্যেষ্ঠ সহোদরের ছিন্নমস্তক দেখিয়া, ময়ূর-সিংহাসন-লাভের প্রথম ও প্রধান কণ্টক দূর হইল ভাবিয়া ঔরঙ্গজেব একটু প্রফুল্ল হইলেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

(১) Sir H. M. Elliot's Hist. P. 244; Vol. VII.
(২) Bernier—Contable. P. 103.

দেব-বংশম্।

(৩)

ঔরসস্তস্য চ জাতো দনুজারিদেবঃ কিল।
শস্ত্রবিদ্যা-বিশারদঃ কীর্ত্তিমাংশ্চ মহীতলে ॥ ২৬
বেদবিদো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সুহৃজ্জনহিতকারী।
কর্ণসমো দানশীলঃ যস্য কুলে স হি জাতঃ ॥ ২৭
যেন রাজসম্পর্কোঽসৌ লক্ষ্মণস্য সুহৃদ্গ্রহণম্।
বরেন্দ্রং পালরাজেভ্যো গৌড়রাজাভুক্তং চক্রে ॥ ২৮
ব্রাহ্মণ্যরক্ষণায় চ ব্রহ্মণ্যলক্ষণোপেতং।
সাগ্নিকং ব্রহ্মবিদঞ্চ বন্দ্য-মকরন্দ-সুতম্ ॥ ২৯
স্থাপয়ামাস যত্নেন দ্বিজার্দ্দিকৈঃ পরিবৃতম্।
কণ্টকদ্বীপে তু রাজা শ্রীশ্রীচণ্ডীপরায়ণম্ ॥ ৩০
শাস্তমিদং জনপদং বন্দ্যঘটী-নামধেয়ম্।
যত্র বন্দ্যকুলোদ্ভবা হ্যবসন্ দ্বিজাশ্চ সর্ব্বে ॥ ৩১
দাশরথেঃ প্রভাবেণ বন্দ্যকুলোদ্ভবস্য চ।
বন্দ্যঘটীপদমিদং সর্ব্বৈরেব সমাদৃতম্ ॥ ৩২
দনুজারিভূপালোঽপি পঞ্চভ্যো পঞ্চগ্রামাংশ্চ।
দাশরথেঃ পুত্রেভ্যশ্চ দ্বিজার্দ্দিকৈঃ সম্প্রদদৌ। ৩৩
হরিকোটি নৈহাটিশ্চ লাটগ্রামো পৈড়স্তথা।
নবচরো দ্বীপাঃ পঞ্চ ভাগীরথ্যাঃ সমীপেষু ॥ ৩৪
অথ তেন ভূপালেনাগ্রদ্বীপে নবদ্বীপে চ।
মহাকালমূর্ত্তিদ্বয়ং সামন্তেন প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩৫
অমুষ্যান্তর্দ্দশায়াঞ্চ ঘোরে কলাবুপস্থিতে।
গৌড়াধিপো লক্ষ্মণশ্চ যবনৈঃ সর্ব্বথাক্রান্তঃ ॥ ৩৬
সর্ব্বৈরমাত্যৈরপি হি পরিত্যক্তো বান্ধবৈশ্চ।
ক্লিষ্টশ্চাসৌ সেনরাজস্তীর্থক্ষেত্রং জগাম হ ॥ ৩৭

মাধবস্ত তস্যাত্মজঃ সসৈন্যো দনুজারিশ্চ।
দীর্ঘকালং যবনৈশ্চ যুযুধাতে তৌ সগর্কৌ ॥ ৩৮
এবমসৌ মহাবীরো দেবরাজো মহাকৃতিঃ।
ভাগীরথ্যাঃ সলিলেষু কলেবরং হি তত্যাজ ॥ ৩৯

অনুবাদ—সুরদেবের ঔরসে দনুজারিদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ও মহীতলে কীর্ত্তিমান হন। তিনি বেদবিৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সুহৃজ্জনহিতকারী কর্ণসম দানশীল ছিলেন। এই কর্ণের কুলেই তিনি উৎপন্ন হন। সেনরাজগণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল, এবং তিনি লক্ষ্মণের সুহৃৎ ছিলেন। ইনিই পালরাজগণের হস্ত হইতে বরেন্দ্র অধিকার করিয়া গৌররাজ্যভুক্ত করেন। রাজা দনুজারি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্রহ্মণ্যলক্ষণযুক্ত সাত্বিক ব্রহ্মবিদ্ শ্রীশ্রীচণ্ডীপরায়ণ বন্দ্য মকরন্দ পুত্রকে দ্বিজার্চ্চকজনসহ যত্নপূর্ব্বক কণ্টকদ্বীপে স্থাপন করিয়াছিলেন। বন্দ্যঘটী নামধেয় শান্ত জনপদে বন্দ্যকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন। বন্দ্যকুলোদ্ভব দাশরথির প্রভাবে বন্দ্যঘটী জনপদ সকলের কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিল। রাজা দনুজারি দাশরথির পঞ্চপুত্রকে ভাগীরথীর নিকটস্থ হরিকোটি, নৈহাটি, লাটগ্রাম, পৈড় ও নবচর নামে পঞ্চগ্রাম প্রদান করেন। এই সামন্ত রাজাকর্ত্তৃক অগ্রদ্বীপে ও নবদ্বীপে মহাকাল মূর্ত্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহার অন্তর্দ্দশায় ঘোর কলি উপস্থিত হইলে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ যবন কর্ত্তৃক সর্ব্বথা আক্রান্ত হন, সমস্ত অমাত্য ও বান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেনরাজ ক্লিষ্ট হইয়া তীর্থ ক্ষেত্রে গমন করেন। তাঁহার পুত্র মাধব ও সসৈন্য দনুজারি অনেকদিন পর্য্যন্ত গর্ব্ব সহকারে যবনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই মহাবীর মহাকৃতি দেব রাজ অবশেষে ভাগীরথীসলিলে কলেবর ত্যাগ করেন।

টিপ্পনী—সুরদেবের পুত্র দনুজারি দেবকে দেববংশকার নানাগুণ সম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইঁহাকে আবার কর্ণকুলজাতও বলিতেছেন। বল্লালচরিত প্রণেতা আনন্দভট্ট সেনরাজগণকেও কর্ণবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কল্যাণ কর্ণসেনের সহিত দাতাকর্ণ অভিন্ন হওয়ায় এক মহা গোলযোগ

উপস্থিত হইয়াছে। দেববংশকার দনুজারিকে "কর্ণসমো দানশীলঃ যস্ত কুলে স হি জাতঃ" বলিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে তদ্রূপ-কুলেই জাত বুঝাইতেছে। কারণ, পূর্ব্বে কর্ণবংশ হইতে দেববংশকে পৃথক্‌ভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে, সেন রাজগণের তদ্রূপ কর্ণসেন-বংশীয় হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। কারণ, বল্লালসেনের তীব্র শাসন হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অনেক কীর্ত্তিদ্বারা রাঢ় দেশকে ভূষিত করিয়াছিলেন। দেববংশকার দনুজারিকে সেন রাজগণের সম্পর্কীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, দেববংশের সহিত সেনবংশের কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। সে যাহা হউক, দনুজারি দেব হইতে ঐতিহাসিক পরিচয় সুস্পষ্টরূপেই অবগত হওয়া যায়। দনুজারিকে সেনরাজ লক্ষ্মণের ও বন্দ্য মকরন্দসুত দাশ-রথির সম-সাময়িক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কুলগ্রন্থসমূহের আলোচনা দ্বারা স্থির হয় যে, "ষড়্ বন্দ্যো জাহ্নলাখ্যোহি মহেশ্বর উদারধীঃ। দেবলো বামনো ধীমানীশানো মকরন্দকঃ" (জাহ্নল, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয়জন বন্দ্যবংশীয়) বল্লালসেনের নিকট হইতে মুখ্য কুলীন বলিয়া অর্চনা লাভ করিয়াছিলেন। এই মকরন্দ-পুত্র দাশরথিকে দনুজারিদেব কণ্টকদ্বীপ বা কাটোয়ায় স্থাপিত করেন। দাশরথি সাত্বিক ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণ্যলক্ষণযুক্ত ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপরায়ণ ছিলেন। এই চণ্ডীপরায়ণ বন্দ্যবংশের শিষ্য হওয়ায় দেববংশীয়েরা শ্রীশ্রীচণ্ডীপরা-য়ণ উপাধি গ্রহণ করেন; আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। দাশরথি বন্দ্যঘটীর অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। দনুজারি তাঁহাকে কাঁটোয়ায় লইয়া যান * এবং তাঁহার পাঁচ পুত্রকে ভাগীরথীর নিকটস্থ হরিকোটি, নৈহাটি, লাটগ্রাম, পৈড় ও নবচর নামে পাঁচখানি গ্রামও দান করিয়াছিলেন। †

* নগেন্দ্র বাবু কাটোয়ার স্থলে কাঁটাদিয়া লিখিয়াছেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, প্রথমভাগ, ব্রাহ্মণ কাণ্ড)। সম্ভবতঃ কণ্টকদ্বীপকে তিনি কাঁটাদিয়া করিয়াছেন।

† আদিশূরের প্রদত্ত পঞ্চগ্রামের মধ্যে হরিকোটিরও উল্লেখ আছে। কি নৈহাটি কাটোয়ার নিকটস্থ হওয়ায় এই হরিকোটি তাহারই নিকট হইবে।

লক্ষ্মণসেনের সময় রাঢ়ীয় কুলীনগণের প্রথম সমীকরণে মকরন্দের এবং তাঁহার পৌত্র দনৌজা মাধবের সময় পঞ্চম সমীকরণে দাশরথির নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং দনুজারিদেবের সময় অনায়াসেই স্থির করা যাইতে পারে। দেববংশের মতে দনুজারি মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের সময়ও বিদ্যমান ছিলেন। তিনি লক্ষ্মণের সুহৃৎ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাকে আবার সেনরাজগণের সামন্তরাজ-রূপেও জানা যাইতেছে। দনুজারি সেনরাজগণের পক্ষাবলম্বী হইয়া বরেন্দ্র ভূমি গৌড়-রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যাইতেছে। অবশ্য বিজয়সেন বরেন্দ্র ভূমি জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে সেন বংশের করায়ত্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বল্লাল পুত্র লক্ষ্মণের সহিত সেন সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হন। গৌড়রাজমালাকারও ইহাই অনুমান করেন। সেই সময়ে দনুজারিদেব যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করা নিতান্ত অসম্ভব নহে। বরেন্দ্র গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও প্রথমতঃ সমগ্র বরেন্দ্র সেনরাজগণের গৌড়-রাজ্যের অন্তর্গত না থাকিতেও পারে, সুতরাং বরেন্দ্রকে গৌড়-রাজ্যভুক্ত বলায় সমগ্র বরেন্দ্রের অধিকারই বুঝিতে হইবে। দনুজারি অগ্রদ্বীপে ও নবদ্বীপে মহাকাল-মূর্ত্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধহয়, তৎকালে নবদ্বীপ সেন সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিলেও দেবগণের অধিকারে ছিল। কিন্তু নবদ্বীপ যে সেনবংশীয়দিগের অন্যতম রাজধানী ছিল, তাহাও স্থির হইয়া থাকে।

দেববংশের মতে দনুজারিকে লক্ষ্মণসেনের ও তৎপুত্র মাধবসেনের সমসাময়িক বলিয়া জানা যাইতেছে। লক্ষ্মণ সেনের সময় সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতভেদ আছে। মিথিলায় প্রচলিত লঃ সং বা লক্ষ্মণ সম্বৎকে লক্ষ্মণ সেনের অব্দ স্থির করিয়া কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার রাজত্বের অবসান অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু লক্ষ্মণসম্বৎ প্রকৃত কোন সময় হইতে প্রচলিত হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অন্যদিকে বল্লাল সেন কর্ত্তৃক ১০৯১ শকাব্দ বা ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে দানসাগর রচিত এবং ১০৯০ শকাব্দ বা ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে অদ্ভুতসাগর আরম্ভ হয় বলিয়া জানা

যায়। অদ্ভুত সাগর বল্লাল শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, লক্ষ্মণের প্রতি তাহার সমাপ্তির ভার দেওয়া হয়। উক্ত গ্রন্থে আবার ১০৮১ শকাব্দ বা ১১৫৯ খৃষ্টাব্দকে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভের সময় বলিয়া লিখিত আছে। আবার শ্রীধরদাস রচিত সূক্তিকর্ণামৃত নামে গ্রন্থ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে ১১২৭ শক বা ১২০৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হয় বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়; তাহা হইলে লক্ষ্মণ সেন যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই বিদ্যমান ছিলেন, ইহাই অনুমান হয় এবং এই সময়েই বক্তিয়ার খিলিজী বঙ্গ আক্রমণ করেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০৭ পর্য্যন্ত বঙ্গ আক্রমণের সময় নির্ণীত হইয়া থাকে, আবার ১২০৫ খৃঃ অব্দে বক্তিয়ারের মৃত্যু হয় বলিয়াও উল্লেখ আছে। প্রকৃত কোন্ অব্দে বঙ্গবিজয় হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে তাহা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে যে ঘটিয়াছিল, ইহাই অনুমান হয়। লক্ষ্মণ সেনের সময় বঙ্গবিজয় হইলে দেববংশকারের মত তাহারই সমর্থন করিতেছে।

দেববংশকার বলিতেছেন যে, গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ যবনদিগের কর্ত্তৃক সর্ব্বথা আক্রান্ত এবং অমাত্য ও বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তীর্থযাত্রা করেন। লক্ষ্মণ সেনের জগন্নাথে পলায়নের প্রবাদ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। দেববংশকার সেই প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই ঐরূপ লিখিয়াছেন। মিন্‌হাজ তাঁহার তবকতিনাসিরি গ্রন্থে লক্ষ্মণ বা লখ্‌মনিয়া সেনের সাঁকনাট (Sanknat) ও বঙ্গে (Bengal) পলায়নের কথা লিখিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট সাঁকনাটের স্থলে জগন্নাথ বলিতেছেন। আইন আকবরীতে লক্ষ্মণ কোথায় পলায়ন করেন, তাহার উল্লেখ নাই। মিন্‌হাজের সাঁকনাট ও বঙ্গের একসঙ্গে উল্লেখে উহাকে সমতট বা সুন্দরবন বলা যাইতে পারে। জগন্নাথে গিয়া আবার বঙ্গে আসা সহজ সাধ্য নহে বলিয়াই বোধ হয়। যবনগণ গৌড়রাজ্যের কোন্ কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছিল, দেববংশকার তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি কেবল গৌড়াধিপকে সর্ব্বথা আক্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেববংশ হইতে সুস্পষ্টরূপে নবদ্বীপ অধিকারের কথা পাওয়া যায় না। কিন্তু কাটোয়া প্রদেশ যে যবনাধিকৃত হইয়াছিল, তাহা দেববংশে দেখিতে পাওয়া যায়। দেববংশের মতে নবদ্বীপ দেববংশের

অধিকারেই ছিল। সুতরাং তাহার পৃথক্ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া দেব-বংশকার মনে করিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নবদ্বীপ সামন্ত দেববংশের অধিকারে থাকিলেও তাহা সেন রাজগণের অন্যতম রাজধানী-রূপেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। বর্ত্তমান নবদ্বীপের পর-পারস্থ ও পূর্ব্বতন নবদ্বীপের সংলগ্ন বামনপুকুর নামক স্থানের "বল্লাল ঢিবি" ও "বল্লাল দীঘী" হইতে নবদ্বীপের সহিত বল্লাল সেনের সম্পর্ক ছিল বলিয়া বুঝা যায়, বিশেষতঃ নবাবিষ্কৃত বল্লাল সেনের তাম্রশাসনে "বংশে তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচারচর্য্যা নিরূঢ়িপ্রৌঢ়াং রাঢ়ীমকলিতচরৈর্ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ," ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা যে রাঢ়ের সহিত তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সম্বন্ধ ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। তদ্ভিন্ন তাঁহার মাতা সূর্য্যগ্রহণ দিবসে গঙ্গাতীরে স্বর্ণাশ্ব ও তাহার দক্ষিণা স্বরূপ ভাগীরথীর নিকটস্থ রাঢ়ের ভূমিই সুব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত এবং গ্রহণকালে অথবা অন্যান্য কর্ম্মের সময় গঙ্গাতীরে তাঁহাদের আগমনের জন্য কোন একটী স্থানও যে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট ছিল না, ইহা মনে করা নিতান্ত অসমীচীন বলিয়াই বোধ হয়; সুতরাং নবদ্বীপের সহিত সেন রাজগণের সম্বন্ধ থাকা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই সময়ে বিক্রমপুর তাঁহাদের রাজধানী ও নবদ্বীপ প্রভৃতি দেব-বংশকারের মতে সামন্ত দেবরাজগণের অধিকারে থাকিলেও সেনরাজগণ যে সময়ে সময়ে গঙ্গাতীরে আসিয়া নবদ্বীপে বাস করিতেন, ইহা একেবারে কল্পিত কথা নহে। তাহা হইলে মিন্‌হাজ বক্তিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক যে নদীয়া অধিকারের কথা লিখিয়াছেন, তাহা নবদ্বীপ বলিয়াই বোধ হয়। মিন্‌হাজের নদীয়াকে বরেন্দ্র ভূমির বিজয়নগর প্রতিপন্ন করার চেষ্টা আমরা কষ্টকল্পনা বলিয়াই মনে করি। তবে নবদ্বীপ হইতে লক্ষ্মণসেনের পলায়ন আমরা স্বীকার করি না। দেববংশকারও তাহার উল্লেখ করেন নাই। যে লক্ষ্মণসেন দক্ষিণ সমুদ্রের বেলায় পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে, অসিবরুণা ও গঙ্গাসলিলসিক্ত বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্র কাশীধামে, ব্রহ্মার যজ্ঞপূত ত্রিবেণীতীরক্রোড়ে উচ্চ যজ্ঞযূপাবলীর সহিত সমর জয়স্তম্ভমালা স্থাপিত করিয়াছিলেন, তিনি যে অষ্টাদশ অশ্বারোহীর ভয়ে নবদ্বীপ হইতে নগ্নপদে পলায়ন করিয়াছিলেন, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। তিনি সে সময়ে নবদ্বীপে ছিলেন না। বিক্রমপুরেই

অবস্থিতি করিতেছিলেন। বক্তিয়ার পশ্চিম বঙ্গে নিরাপদ মনে করিয়া লক্ষণাবতী ও নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের পুত্রেরা যে বক্তিয়ারের বঙ্গবিজয়ের পরও পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন, মিন্‌হাজ তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মনে হয়, লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন রচিতকাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বক্তিয়ার পশ্চিমবঙ্গ জয় করিলেও সেনরাজগণ একেবারে তাহা পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া দেববংশকার উল্লেখ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, দনুজারি ও লক্ষ্মণের পুত্র মাধব দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যবনদিগের সহিত গর্ব্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার পর দনুজারি ভাগীরথীসলিলে কলেবর ত্যাগ করেন। মাধব যে লক্ষ্মণের পুত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও তাঁহার দুইপুত্র কেশব ও বিশ্বরূপের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাপি নানাস্থানে মাধবের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি কেহ কেহ বলেন যে, কেশবের তাম্রশাসনে মাধব শব্দ কাটিয়া পরে কেশব শব্দ লিখিত হইয়াছে। তাহাতে বুঝায় যে, মাধবের জীবিত কালে উক্ত তাম্রশাসন লিখিত হওয়ায়, তাঁহার দেহত্যাগের পর কেশবই তাহা অর্পণ করায় মাধবের নাম কাটিয়া কেশবের নাম দেওয়া হইয়াছে। সে যাহা হউক, আইন আকবরী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে মাধবকে লক্ষ্মণের পুত্র বলিয়াই জানা যায়। কোন কোন গ্রন্থে কেশবকে মাধবের পুত্র ও মাধবকে কেশবের পুত্র বলিয়াও উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। লক্ষ্মণের পৌত্র দনৌজা-মাধবের নাম অবগত হওয়া যায়। মাধবের সহিত দনৌজা-মাধবের গোলযোগ করিয়া ঐ সমস্ত লিখিত হওয়াই সম্ভব ; ফলতঃ মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপ এই তিন জনই লক্ষ্মণের পুত্র ছিলেন।

শেষ আশা।

(১)

ঘুম-ঘোর কেটে গেছে উষার আলোকে
প্রাণ মন জাগিয়াছে আজ,
হৃদিখানি তব প্রেমে ভরা আছে তাই
তুমি মোর আছ হৃদি-রাজ।
বাজিয়াছে কুঞ্জে কুঞ্জে মধুর মুরলী,
শাখে শাখে পাখী গায় গান,
ভরা প্রেমে ভরা প্রাণে নদী নেচে যায়
ঢেউ সনে তুলি কত তান।
এসেছে মধুর গন্ধ এসেছে সমীর,
পেয়েছি সে প্রিয়-পরিজন ;
পেয়েছি নয়নে আলো তোমার আলোকে
হেরিতেছি নিতুই নূতন।

(২)

ধরা যবে অন্ধকার জাগায়েছ চাঁদ
হাসিয়াছে কি মধুর হাস,
তারায় তারায় তুমি স্বর্ণ-বিন্দু দিয়া
সাজায়েছ উদার আকাশ।
দেছ প্রেম দেছ প্রীতি দেছ কত আশা
দেছ হায়! আলো চিরকাল,
পরাণের মাঝে গীতি গাহিয়াছি নিতি
দেছ সুর দেছ কত তাল।
সব ত দিয়েছ তবু দেখিনি তোমায়
তাই শেষ আশা একবার,
শেষ নিদ্রা না আসিতে যেন প্রাণ মোর
খুঁজে পায় ও রূপ তোমার!

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রতিভা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শুভবার্ত্তা।

বেলা দ্বিপ্রহরের উপর হইবে, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, মাঠ খাঁ খাঁ করিতেছিল, কৃষকেরা অনেকক্ষণ প্রান্তর ত্যাগ করিয়াছে, গ্রামের পুরুষদিগের আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে, মেয়েদিগের আহার এখনও শেষ হয় নাই, চাড়ুয্যে ও বাঁড়ুয্যে বাড়ীর মেয়েদের খাওয়া দাওয়া অনেকক্ষণ শেষ হইয়াছিল, মিত্র, শিকদার, সরকার ও অন্যান্য বাড়ীর মেয়েদের খাওয়া দাওয়া হইতেছিল, রান্না ঘর এখন সরগরম,—আহারও চলিতেছিল, গল্পও চলিতেছিল, গল্প নানারূপ হইতে ছিল। কোন বাড়ী জমীদার পঞ্চানন বোসের মেয়েধরা গল্পটাও বিশেষ জাঁক জমকের সহিত হইতেছিল, বধূরা গ্রাস হাতে লইয়া অবগুণ্ঠনের মধ্যে পুরিতেছিল এবং এক চোক দিয়া শাশুড়ীর নথের পানে চাহিতে-ছিল। কোন বাড়ীর দুই একটা বদমায়েস্ ছেলে একবার মধ্যাহ্নের আহার সমাধা করিয়া তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া, পাকশালার দুয়ারে গিয়া উঁকি মারিতেছিল এবং সময়ে সময়ে পিতামহীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল।

কোন বাড়ীর বধূ বাড়ীর পিছনের পচা ডোবায় গোছা পোরা এঁটো বাসন ভিজাইয়া হাত-মুখ ধুইতেছিল। কোন বাড়ীর গৃহিণী আহারের পর শুচির অভিপ্রায়ে পচা ডোবাতে আসিয়া গা ডুবাইতেছিল। কোন বাড়ীর বধূ আপন বাসনগুলি মৃত্তিকাতে রাখিয়া ও বাড়ীর সইয়ের সহিত তাঁহার পিত্রালয়ের গল্প গুজব জুড়িয়া দিয়াছিল। পদী পিসী ওরফে পাড়ার ইনস্পেক্ট্রেস্ আহারাদি শেষ করিয়া, একগাল পান-দোক্তা মুখে পূরিয়া খিড়কীর ডোবার ধার দিয়া, হেলিতে দুলিতে দত্তবাড়ী আসর জমাইতে যাইতেছিল। সুরবালা, তরুবালা, সরোজিনী প্রভৃতি প্রাপ্ত-বয়স্কা নবীনাগণ তাস হাতে করিয়া, "আজ তোদের ঘাড়ে ছক্কা দিব" ইত্যাদি বলিতে বলিতে আকড়ায় যাইতেছিল।

গ্রামের পুরুষমহলের কথা। গ্রামের পুরুষেরা কেহ আহারাদির পর ঘুমাইতেছিল, কেহ গল্প করিতেছিল, কেহ তাস খেলিতেছিল, কেহ তাস খেলা দেখিতেছিল, কেহ তাম্রকূট পোড়াইতেছিল। প্রবীণবয়স্কেরা পাশা খেলিতেছিল। কেহ দান ফেলিতেছিল, কেহ গালে হাত দিয়া গুঁটি সরাইবে তাহাই ভাবিতেছিল; কেহ সেইখানে হুকা হাতে করিয়া কোন ব্যক্তিকে দান জিতিবার পরামর্শ দিতেছিল; কেহ চীৎকার করিয়া কুৎসিত ভাষায় দান ফেলাইতেছিল। কোন অহিফেনসেবী প্রাচীন পুরুষ তাঁহার পৌত্রকে পার্শ্বে শোয়াইয়া নিজে চক্ষু মুদ্রিত করিতেছিলেন। কোন বৃদ্ধের দুষ্ট নাতি তাহার ঠাকুরদাদা ঘুমাইয়াছে ভাবিয়া, ধীরে ধীরে পলায়ন করিতেছিল; অহিফেনসেবী ঠাকুরদাদা তাহা অবগত হইয়া, নাতির কর্ণ ধরিয়া আনিতে-ছিলেন।

দ্বিপ্রহরের আহারের পর প্রাচীন জমীদার পঞ্চানন বসু ত্রিতলের এক কক্ষে পালঙ্কোপরি দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। সম্মুখে বৃহৎ আল্‌বোলা, তাহাতে সুগন্ধি তাম্রকূট পুড়িতেছিল। বসু মহাশয় বাম হস্তে সট্‌কা ধরিয়া মুখের সহিত আলাপ করিতেছিলেন এবং দেহখানি তাকিয়ার উপর ন্যস্ত করিয়া মাঝে মাঝে মুখব্যাদান করিয়া হাই তুলিতেছিলেন। তাকিয়ার সন্নিধানে বৃহৎ রৌপ্যনির্ম্মিত পানের ডিবা রহিয়াছিল, দুই চারিটা তাম্বূল খাইয়াছিলেন। হর্ম্ম্যতলে পিত-লের বড় পিক্‌দানি বসান রহিয়াছিল। গলা ঝাড়া দিয়া তাহাতে মাঝে মাঝে পিক্ ফেলিতেছিলেন। পর্য্যঙ্কের সন্নিধানে এক খানি শ্বেত প্রস্তরের টেবিলের উপর এক গ্লাস জল ঢাকা রহিয়াছিল, একটা দস্তার ছোট ডিসে কতকগুলি দন্তশলাকা রহিয়াছিল। এত গুলি সুখের সমা-বেশ একাধারে হওয়াতে, বসু মহাশয়ের রক্তজবাসদৃশ বিঘূর্ণিত নয়ন-দ্বয় আর নীরব থাকিতে পারিতেছিল না; তাঁহার নয়নদ্বয় মাঝে মাঝে বুঁজিয়া আসিতেছিল।

ঠিক এমন সময়ে বসু মহাশয়ের বিশ্বস্ত খানসামা হরে ত্রস্তপদে এক খানা পত্র লইয়া বাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ত্রস্তপদে একজন লোক

গৃহে প্রবেশ করাতে বাবু চমকিয়া একবার সেই দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়ভৃত্য গৃহে প্রবেশ করিল।

বাবু ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে হরে, কি খবর?"

হরে বাবুকে বলিল, "আপনার নামের একখানা চিঠি আনিয়াছি।"

বাবু। কিসের চিঠি?

হরে। দেওয়ানজি মহাশয় চিঠি দিয়াছেন।

বাবু। অসময়ে চিঠি!—

হরে। আজ্ঞা হাঁ।

বাবু। আমি এখন চিঠি পড়িতে পারিব না।

হরে। আজ্ঞে, দেওয়ানজি মহাশয় বলিয়াছেন, বড় জরুরি পত্র।

তখন বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, জরুরি চিঠি, আচ্ছা, তুই এখন আমাকে চিঠি দে, আর ঐ দেরাজের মধ্যে আমার চসমা খানা আছে, সেখানা দে।

হরে বাবুর চসমা কোথায় থাকিত, তাহা জানিত। সে দেরাজ হইতে বাবুর চসমা খানি বাহির করিয়া বাবুর টেবিলের উপর রাখিল এবং চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তুই এখন যাইতে পারিস্।"

হরে বাবুর আদেশ পাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বাবু চসমা খুলিয়া পরিলেন। তাহার পর খাম খানা ছিঁড়িয়া চিঠি খানা বাহির করিলেন। তিনি চিঠি খানা পড়িতে লাগিলেন।

পত্র খানি এইরূপ লিখিত হইয়াছিল;—

"আমাদের প্রেরিত লোক অবন্তীপুরের ঘোষেদের বাড়ী দখল করিতে পারে নাই। লোকদিগের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহা অতি ভয়ানক। পেয়াদাকে নাকি তাহারা নোটিস্ জারী করিতে দেয় নাই, যাহা শুনিলাম, তাহা আমার প্রত্যয় হয় না। আদালতের পেয়াদা, তাহাকে নোটিস্ জারী হইতে নিবৃত্তি করিতে পারে, এমন কে আছে? আমার খুব বিশ্বাস, পেয়াদা বেটা ঘুস খাইয়াছে, বিশেষতঃ তাহারা নিরাশ্রয়া, তবে যদুনাথ চৌধুরী তাহাদের পক্ষে আছে। সেটাকে কোন প্রকারে জব্দ করিতে না

পারিলে আমরা কার্য্য উদ্ধার সহজেই করিতে পারিব না। এখন আপনার অভিমত কি? অসময়ে পত্র পাঠাইলাম। আমার ত্রুটি মাপ করিবেন। ইতি।

আপনার দাস—দেওয়ানজি"।

বাবু পত্র পাঠ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তিনি পত্র খানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। একখানা সামান্য পত্র পাঠ করিয়া বাবু এরূপ হইলেন কেন?—

বাবুর ভয় আশ্চর্য্যজনক! তিনি যাহাদের ভয় করেন, তাহারা কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে নহে। আর তিনি জমীদার; জমীদার হইয়া তিনি কত প্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার একগাছি কেশও নড়ে না, এ আবার কি প্রকার ভয়?

এখন উপায় কি? পঞ্চানন বসু নানারূপ ষড়যন্ত্র করিয়াও অনাথাদের গৃহচ্যুত করিতে পারিলেন না। ইহারা অনাথা বটে, কিন্তু বাবুর নিকট অনাথা নহে। বাবু এত চেষ্টা করিয়া ইহাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারিতেছেন না, ইহাই বাবুর আক্ষেপ, ইহাই বাবুর ভয়। বাবু জানেন, যতদিন তাহারা এ পৃথিবীতে থাকিবে, ততদিন বাবুর ঘোর শত্রু বর্ত্তমান রহিবে। অনাথাদের সহায় কেহ নাই। কেবল একমাত্র যদুনাথ চৌধুরী তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। বাবু জানেন, তাহারই কৌশলে তাঁহার সমস্ত মতলব ফাঁসিয়া যাইতেছে। বাবুর শত্রু বহু, তন্মধ্যে এ তিনটী শত্রুকে বাবু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করেন।

পত্র পাঠ করিয়া বাবু এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত শান্তি পাইলেন না। তাঁহাকে এককালে শতবৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। তিনি শয্যায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বাবুর সর্ব্বাঙ্গ স্বেদে ভিজিয়া গেল, গলা শুষ্ক হইয়া উঠিল। এখন বাবুর নিরুপায়!

বাবু শত্রুদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য যত উপায় স্থির করিতেছেন, সকলই ফাঁসিয়া যাইতেছে। একটা না একটা সফল হইবার কথা, কিন্তু কিছুই হইতেছে না। বাবু যন্ত্রণায় অর্থাৎ মনোবেদনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ডাকিলেন, "হরে"।

হরে বাহিরে ছিল, সে বাবুর ডাক শুনিতে পাইল না।

বাবু পুনরায় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "হরে, এদিকে আয় তো" ?

বাবুর আহ্বান শুনিয়া হরে সেইখানে ছুটিয়া আসিল। হরেকে দেখিয়া বাবু বলিলেন, "দেওয়ানজিকে গিয়া বল যে, আমি তাঁহাকে সন্ধ্যার সময় চাই"।

নবম পরিচ্ছেদ।

কৌশল।

পঞ্চানন বোসের বৈঠকখানায় নিত্য আমোদের মহলা বসিয়া থাকে। মদ্যপান, গানবাজনা আজ কয়েক বৎসর হইতে পূরাদমে চলিয়া আসিতেছে। আর একটী কার্য্য আজ কাল নূতন হইতেছে। সেটা আর কিছুই নহে,—কেবল বাই নাচ-ওয়ালীদিগের নাচ ও গান। কলিকাতা হইতে মাসে দুই তিন বার বাইনাচ-ওয়ালীরা পঞ্চানন বোসের বৈঠক খানায় নাচগান করিতে আসিয়া থাকে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে যশোহরের রেলপথ নির্ম্মাণ হয় নাই। বলাবাহুল্য, এই সকল দল তখন রাস্তা বহিয়া আসিত।

বাবুর অপেক্ষা তাঁহার মোসাহেবেরা অতি ভয়ানক লোক। আমোদ প্রমোদের যাবতীয় বন্দোবস্ত মোসাহেবেরা করিত। তাহারা টাকার ধার ধারে না, কিন্তু কুৎসিত আমোদ-প্রমোদের আবিষ্কারে তাহারা চিরদক্ষ। মোসাহেবেরা অন্যলোকদিগকে গ্রাহ্য করিত না। বাবুকে তাহাদের হাতের মধ্যে রাখিলেই হইল। বাবু কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন না, তাঁহাকে মোসাহেবদিগের ভরণ পোষণও যোগাইতে হইত। বাবুর প্রজারা বাবু অপেক্ষা মোসাহেবদিগকে অধিক ভয় করিত। কারণ, মোসাহেবেরা বাবুর আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, তাহাদিগের পীড়নের বন্দোবস্ত করিত। বাবুর নিকট প্রজারা কোন অভিযোগ করিলে বাবু হাসিয়া বলিতেন, "আমি করিলেও যাহা, ওরা করিলেও তাহাই"। সুতরাং পঞ্চানন বোসের জমীদারীর মধ্যে তাঁহার মোসাহেবদিগের একাধিপত্য ছিল। মোসাহেবেরা সুবিধা পাইলে প্রজাদিগের নিকট হইতে

টাকা কড়ি আদায় করিয়া আত্মসাৎ করিতে ক্রটী করিত না। উপযুক্ত জমীদার বটে!

মোসাহেবেরা সংখ্যায় অনেকগুলি ছিল। তন্মধ্যে শম্ভুনাথ দাস বলিয়া একটা লোক সর্ব্বাপেক্ষা বাবুর মনের মত এয়ার ছিল। শম্ভুনাথ জাতিতে ধীবর-পুত্র! সে দলে ঢুকিয়া অতি অল্পকাল মধ্যে বাবুর প্রধান পারিষদের আসন গ্রহণ করিয়াছিল। শম্ভুনাথ বাবুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গুপ্ত পরামর্শ শম্ভুনাথ যাহা করিত, তাহা সকলেই এমন কি বাবু পর্য্যন্ত শির নত করিয়া পালন করিতেন। শম্ভুনাথ অল্প কালমধ্যে বাবুর মন বুঝিতে পারিয়াছিল। সে অত্যন্ত ধড়ীবাজ ছিল, জগতে এমন কোন কার্য্য ছিল না, যাহা শম্ভুনাথ করিতে না পারিত। শম্ভুনাথ সৎকার্য্য খুব অল্পই করিত, তাহার স্থলে সে অসৎ কার্য্যে ডুবিয়া থাকিত। সে এমন কার্য্য করিত, যাহাতে বাবুর মনস্তুষ্টি হইত। বাবুকে নানা প্রকার কুৎসিত আমোদে সতত ডুবিয়া থাকিতে সেই শিক্ষা দিয়াছিল। সে বাবুকে এতদূর চিনিয়াছিল যে, বাবুর মুখ দেখিলেই সে বুঝিতে পারিত যে বাবু সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সেই ক্ষমতার বলে সে পঞ্চানন বসুকে এত সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল।

মনুষ্যের গুণ ব্যাখ্যা করিতে হইলে রূপটার ব্যাখ্যা আবশ্যক। শম্ভু-নাথের গুণ ব্যাখ্যা হইল; কিন্তু রূপের ব্যাখ্যা শুনিলে পাঠক চমকিত হইবেন। শম্ভুনাথ লোকটা খর্ব্বকায় ছিল। তাহার বাম পদ খানি জন্মাবধি হীন। তাহার মস্তকটা প্রকাণ্ড ছিল। চক্ষু দুইটা সদাই রক্তবর্ণ। তাহার গলায় একটা গণ্ডমালা ছিল, সেটা বেশ বড়। সে যখন তেড়ির অভিপ্রায়ে চুল ফিরাইত, তখন তাহাকে একটা বন্য শূকরের ন্যায় দেখাইত। তাহার চুল ঠিক শূকরের রোমের ন্যায় খাড়া খাড়া ছিল। শম্ভুনাথ বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল। তাহার রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গে অতিরিক্ত মাত্রায় রোম ছিল। শম্ভুনাথ উদরোন্নত ব্যক্তি। তাহার শৈশবাবধি ভুঁড়ি ছিল বলিয়া তাহার পিতা মাতা শম্ভুনাথ নাম রাখিয়াছিল। আর একটা কথা,—সেটা ভদ্র সমাজে প্রকাশ করা বিধেয় নহে। বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যাইত যে, শম্ভুনাথের জন্ম একটা রহস্য-বিজড়িত। কায়স্থ

কুলোদ্ভব প্রতাপান্বিত ভূম্যধিকারীর যে এরূপ একজন সহচর ছিল, এটা আশ্চর্য্যের বিষয়!

পঞ্চানন বোসের জঘন্য কার্য্যের চিত্র অঙ্কিত করিলে হস্ত কলুষিত হয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পঞ্চানন বোসের কার্য্য কলাপ না দেখাইলে আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। সংসারের চিত্র অতি ভয়ানক!

প্রভু যেমন, অধিকাংশ স্থলে ভৃত্যও সেইরূপ হইয়া থাকে। পঞ্চানন বসু ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কুটিল এবং মদ্যপায়ী ব্যক্তি। তাঁহার দেওয়ানজি এবং অতি বিশ্বাসী ভৃত্য হরেরও পানদোষ এবং অন্যান্য জঘন্য কার্য্যের অভ্যাস ছিল। কিন্তু ভৃত্য হইয়া প্রভুর সহিত একত্রে আমোদ-প্রমোদ তাহাদের চলিত না। তাহারা গোপনে সুরাপান এবং আমোদ উপভোগ করিত। পঞ্চানন বোসের প্রিয় সহচরদের অনুগ্রহে বিলাতী মদ গরুর গাড়ী বোঝাই দিয়া কলিকাতা হইতে আসিত। দেওয়ানজি জমীদারীর কর্ত্তা; সুতরাং মদের ঘরের চাবি তাহার নিকট থাকিত। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বাবুর আমোদ-প্রমোদের বৈঠক বসিলে, ভৃত্যেরা যথাসম্ভব সুরাপান করিয়া আপন আপন গন্তব্য স্থানে যাইত।

দেওয়ানজি মহাশয়ের পত্র পাওয়া অবধি পঞ্চানন বোসের চিত্ত চিন্তা-যুক্ত ছিল। অন্যান্য দিবসের ন্যায় সেই দিনও বহির্বাটীতে দ্বিতলের বৈঠক খানায় বাবুর নারকীয় আমোদ-প্রমোদের মহলা চলিতে লাগিল। চিত্ত খারাপ থাকাতে বাবু অন্যমনস্ক ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর অধিকক্ষণ চিন্তারূপ কাল-সাগরে ভাসিতে হইল না। প্রিয় সহচরের অনুরোধে তাঁহাকে একটু পান করিতে হইল। দেবীর প্রসাদ উদরে স্থান প্রাপ্ত হওয়াতে বাবুর দারুণ চিন্তার আগুন নির্ব্বাপিত হইল। তাহার পর অনবরত হাসি ও হুড়া-হুড়ি চলিতে লাগিল, বিকট চীৎকারে নীরব অবনী কাঁপিতে লাগিল। সেই সময়ে বৈঠক খানার সংলগ্নস্থিত একটা কক্ষে দুইটা অসহায় প্রাণী নবমী-পূজার উৎসর্গিত ছাগের ন্যায় দাঁড়াইয়া থরথরি কাঁপিতেছিল। বজ্র তুমি কোথায়! তুমি এই সময় ঐ গৃহে পড়িয়া নিরীহ প্রজাদিগের জাতি মান বাঁচাও!

সকলেরই ভগ্নকণ্ঠ,সকলেরই জড়িতকণ্ঠ; সকলেরই চক্ষু রক্তবর্ণ;—সকলে-

রই দেহ অবশ। রাত্রি অধিক হইলে তখনও আমোদ-প্রমোদ সমমাত্রায় না চলিলেও কিছু অল্পমাত্রায় চলিতেছিল। পঞ্চানন বসু জড়িতকণ্ঠে, হাত মুখ নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "শম্ভু, একটা কিছু বিহিত করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত কর"।—

বাবুর প্রিয় সহচর শম্ভুনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত হউন না। আমি সকল দিক ঠিক করিয়া দিতেছি। ঐ তিনটা মানুষের ভয়ে আপনি ভাবিয়া সারা হইলেন"—!

পঞ্চানন। হাঁ ভাই, সে কথা আর বলিও না;—

শম্ভু। আপনি ঐ কার্য্যের ভার আমার উপর দিলে এত দিনে আমি পথ পরিষ্কার করিয়া দিতাম।

পঞ্চানন। সেই একটা মস্ত ভুল করিয়াছি; যাহাই হউক, এখন আর উপায় নাই।

শম্ভু। আচ্ছা, ঐ তিনটাকে একবারে শেষ করলে কেমন হয়?

পঞ্চানন। সে অতি উত্তম কথা;—কিন্তু পারিলে হয়। না ধরা পড়ি।

শম্ভু। সে ভার আমি লইতেছি।

পঞ্চানন। তাহা হইলে আমার ভরসা হয়। কি উপায়ে শেষ করিতে চাও—

শম্ভু। কেন, ধরিয়া আনিয়া,—

পঞ্চানন। যদি কেহ জানিতে পারে, তাহা হইলে উপায় কি হইবে?

শম্ভু। এমন কার্য্য করিব যে লোকে জানিতে পাইবে?

পঞ্চানন। কি প্রকার—?

শম্ভু। রাত্রিতে ধরিয়া আনিব। তাহার পর যাহা করিলে আপনার বিপদ ঘুচে, তাহাই করিব। শুনিয়াছি নাকি মাগী সুন্দরী—?

পঞ্চানন। বলিহারি ভাই তোমার বুদ্ধির! এমন না হইলে আর বন্ধু!

শম্ভু। আপনি একবার দেওয়ানজিকে ডাকান। আমি কার্য্যের সময়ে তাহাকে সঙ্গে লইব।

শম্ভুনাথের কথামত বাবু ডাকিলেন "হরে"। ইতিমধ্যে হরে একবার পাড়া বেড়াইয়া আসিয়াছিল। সে সকল সময় বাহিরে থাকিতে পায় না। বাবু ডাকিয়া না পাইলে জুতার ভয় আছে—এটা তাহার প্রধান কষ্টের

কারণ। হরে বাহিরে শুইয়াছিল। সে বাবুর ডাক শুনিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং ত্বরায় বাবুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল!

বাবু হরের দিকে ঢুলু ঢুলু আঁখিতে তাকাইয়া বলিলেন, "দেওয়ানজি কোথায়?" হরেরও আঁখি ঢুলু ঢুলু করিতেছিল, বাবু তাহা দেখিলেন কি না, জানি না।

হরে ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আজ্ঞে তিনি আছেন,—"

বাবু কহিলেন, "তাঁহাকে ডাকিয়া আন"।

হরে জানিত,—দেওয়ানজি মহাশয় এরূপ সময় কোথায় থাকেন। সে আর কোথায় যাইবে? সে সরাসর নিজের বাড়ী চলিয়া গেল। এবং উঠানের উপর দাঁড়াইয়া, একটা ঘরের নিকটবর্ত্তী হইয়া ডাকিতে লাগিল, "দেওয়ানজি মহাশয়!"—

দেওয়ানজি এ সময় জাগ্রত ছিলেন। তিনি ভিতর হইতে উত্তর করিলেন, 'কেনরে হরে"?

হরে উত্তর করিল, "বাবু ডাকিতেছেন";—।

"বাবুর জ্বালায় গেলাম। এক দণ্ড এদিক্ ওদিক্ যাইতে পারিব না"। এই কথা বলিয়া দেওয়ানজি মহাশয় বাহিরে আসিলেন এবং উভয়ে বাবুর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, দেওয়ানজি মহাশয় এখানে কেন? এইমাত্র— শুনিয়া রাখুন যে, দেওয়ানজি মহাশয় ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ম নিত্য এখানে যাতায়াত করেন। ইহাতে হরেরও বেশ সুবিধা আছে। সে সময়ে অসময়ে দেওয়ানজির নিকট হইতে বেশ দুপয়সা পাইয়া থাকে। হরে ছোট জাত। তাহার জাত অপেক্ষা পয়সার দিকে নজর বেশী।

যথাসময়ে হরে দেওয়ানজি সমভিব্যাহারে বাবুর নিকট উপনীত হইল। কি করিবেন, বাবু প্রভু তাঁহার আদেশ না শুনিলে চাকুরির ভয় আছে। পয়সার খাতিরে দেওয়ানজি মহাশয় অতুল সুখভোগ করিতে করিতে বাবুর নিকট ভগ্ন অন্তঃকরণে আসিলেন।

দেওয়ানজিকে দেখিয়া বাবু বলিলেন, "আপনাকে এখানে বিশেষ প্রয়োজনে ডাকা হইয়াছে"।

দেওয়ানজি মহাশয় উত্তর করিলেন, "কি এমন বিশেষ কাজ বাবু?"

কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে শম্ভুনাথ বিকট চীৎকার করিয়া বলিল, "আপনাকে আমি চাই। আমার জন্য বাবু আপনাকে এখন ডাকিয়াছেন।

দেওয়ানজির আঁখি রক্তবর্ণ। তিনি ঘূর্ণিতনয়নে বলিলেন, "কি জন্য আমাকে আপনার আবশ্যক হইয়াছে"—?

শম্ভুনাথ কহিল, "সে কাজ বাবুরই; আমার উপর তাহা সম্পন্ন করিবার ভার পড়িয়াছে"।

দেওয়ানজি বলিল, "আমাকে খুলিয়া বলুন, সে কাজটা কি?"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "কাজ ত আপনি জানেন। সেই গোপন কাজ—বাবুর যাহা ভয়।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "বুঝিয়াছি। তা বেশ, যখন আমাকে আবশ্যক হইবে ডাকিবেন।"

শম্ভুনাথ মুখ সিঁটকাইয়া বলিল, কার্য্য খুব গোপনে করিতে হইবে। আপনি খুব সাবধানে চলিবেন। যখন সময় হইবে, তখন আপনি সংবাদ পাইবেন। কিন্তু সাহসে বুক বাঁধিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরঞ্জন সান্যাল।

—o—

প্রেমের ঈশ্বর।

আমার জগতে তুমি প্রেমের ঈশ্বর
প্রেমের ঈশ্বর তুমি
বিদিত ব্রহ্মাণ্ড-ভূমি
অনাদি অনন্তকাল ব্যাপ্ত চরাচর!
তব প্রেম মুখ-ছবি
গগনে উজলে রবি,
তব প্রেমসুধাধারা ঢালে শশধর
আমার জগতে তুমি প্রেমের ঈশ্বর!

আমার জগতে তুমি প্রেমের ঈশ্বর,
মলয় সুরভি বাসে
তব স্নেহপ্রীতি ভাসে,
তোমার লাবণ্যছটা কুসুমে সুন্দর।
পিক পাপিয়ার স্বর
মধুর মধুরতর,
তোমারই অমিয় মাখা শুনি নিরন্তর,
আমার জগতে তুমি প্রেমের ঈশ্বর।

আমার জগতে তুমি প্রেমের ঈশ্বর,
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস ভরে
নিশিদিন নৃত্য করে ;
তোমার মহতী গাথা গায় রত্নাকর।
ওই যে বিরাট বীর
উন্নত করিয়া শির
মগন তোমার ভাবে অটল ভূধর,
আমার জগতে তুমি প্রেমের ঈশ্বর।

আমার জগতে তুমি প্রেমের ঈশ্বর,
বহিতেছে নির্ঝরিণী
স্বর্গীয় বংশীর ধ্বনি
তোমার মহিমা যেন বাজে সপ্তস্বর।
অনাদি আকাশে তুমি
অনন্ত বসুধা ভূমি
তুমি সর্ব্ব ভূতাশ্রয় আছ নিরন্তর,
আমার জগতে তুমি প্রেমের ঈশ্বর।

আমার জগতে তুমি প্রেমের ঈশ্বর,
এ জীব জীবন-তারা
দেহের শোণিত-ধারা
জীবনের সঞ্জীবনী সুধার আকর,
দেহযন্ত্রে প্রাণবায়ু
আত্মার অনন্ত আয়ু,
আমার সর্ব্বার্থসার তুমি সর্ব্বেশ্বর,
আমার জগতে তুমি প্রেমের ঈশ্বর।

আমার জগতে তুমি প্রেমের ঈশ্বর,
এ দেহ পরাণ মনে
আছ তুমি সঙ্গোপনে,
তব প্রেম আঁখি প্রাণে জাগে নিরন্তর।
অন্তরে বাহিরে আমি
আমার অন্তরযামী
নিরখি অতুল শোভা পরম সুন্দর,
আমার জগতে তুমি প্রেমের ঈশ্বর।

আমার জগতে তুমি প্রেমের ঈশ্বর
তব স্নেহ প্রীতি গুণে
আজ এ বিজন বনে,
এ মরু শ্মশানে, এই প্রান্তরে ধূসর,
ভ্রমি আমি তব আশে,
অন্তিমে আনন্দ বাসে,
জুড়াব এ দগ্ধ হিয়া ভাবি নিরন্তর,
একান্ত আমারি তুমি প্রেমের ঈশ্বর।

শ্রীসতীশলীলা দেবী।